বাংলা সাহিত্যে

বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি

বাংলা সাহিত্যে
বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি

ডক্টর আশা দাশ, এম. এ., ডি. ফিল্

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি-এইচ্. ডি. লিখিত
পরিচায়িকা সংবলিত

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : : কলিকাতা-১২

প্রকাশক—
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—১৯৬৯

দাম—কুড়ি টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
মুদ্রণ ভারতী প্রাইভেট লিমিটেড
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৯

পরম পূজনীয়

স্বর্গত পিতৃদেবের

স্মৃতির উদ্দেশে

নিবেদন

'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি' গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব ফিলজফি (আর্টস) ডিগ্রীর জন্য লিখিত। পালি ভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আমি আমার শ্রদ্ধেয় আচার্য ডক্টর অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করি। তিনি আমার পরিকল্পিত বিষয়টি শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমাকে উৎসাহিত করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই আরো ব্যাপক দৃষ্টি লইয়া চর্যাপদ হইতে রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রসঙ্গকে আমার গবেষণার বিষয়রূপে নির্বাচিত করেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বিস্তৃতাকারে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির এক মহাপ্লাবনের যুগে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি। এইজন্য ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সেই স্বীকৃতি সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিফলিত হইয়াছে। চর্যাপদ, নাথ-সাহিত্য ও শূন্যপুরাণে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রভাব বিষয়বস্তুগত এবং ভাবগত উভয়তঃ। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী এবং বাউল গানেও বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগে বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের গবেষণার বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানতপস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা সাহিত্যে এই কার্যে প্রথম অগ্রণী হইয়াছেন। পরবর্তীকালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ মনীষিগণও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই পথে কাজ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বেণীমাধব বড়ুয়া, বিমলাচরণ লাহা ইঁহারা বুদ্ধের জীবন, তাঁহার ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংঘাত ও সমন্বয়ের বিষয়ে গভীর তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের বিরাট ব্যক্তিত্ব আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-মানসকেও প্রণোদিত করিয়াছে।

কবি নবীনচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিগণের কাব্যে বুদ্ধদেব, অশোক, বিজয়সিংহ অমর স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুরূপা দেবী, ইঁহারা বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া বৃহৎ উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন। আবার কৃষ্ণবিহারী সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ নাট্যকারগণ বুদ্ধদেব, অশোক, বিজয়সিংহ ও বিডূরথের জীবন অবলম্বন করিয়া সার্থক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। বৌদ্ধ চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্প এই যুগের শিল্পরসিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিত হালদার, কল্যাণ কুমার গাঙ্গুলী প্রমুখের রচনায় দীপ্তিময় ও রসঘন হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগে বৌদ্ধ চিন্তাধারা বা ভাবধর্ম এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত করিয়াছে। তাঁহার অনুপম সৃজনী প্রতিভায় এবং সার্বভৌম কবি মনীষার উজ্জ্বল দীপ্তিতে বুদ্ধদেব, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি রবীন্দ্র সৃষ্টিকর্মে এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়াছে। আধুনিক যুগে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ্য উত্তরাধিকার তিনিই রক্ষা করিয়াছেন। এইজন্য রবীন্দ্র সাহিত্য পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিয়া রবীন্দ্র-ধ্যান-ধারণায় বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতিফলন যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ পূর্বাচার্যগণ চর্যাপদ, শূন্যপুরাণ, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদিতে বৌদ্ধ প্রসঙ্গের সার্থক মূল্যায়ন করিয়াছেন। কিন্তু আদিযুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত বিপুল বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ তত্ত্ব ও তথ্যের প্রভাব প্রদর্শন করিয়া বিচারবিশ্লেষণধর্মী কোন আলোচনা আজ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই। বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট দিকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই গ্রন্থে আদিযুগ হইতে রবীন্দ্র সমসাময়িক কাল পর্যন্ত প্রায় হাজার বৎসরের বাংলা সাহিত্য হইতে তথ্য ও উপাদান যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া বৌদ্ধ চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাহা আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্যের আখ্যান এবং হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের পারস্পরিক সংঘাত ও সমন্বয় বাংলা সাহিত্যে কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আদি ও মধ্যযুগের, দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিক যুগের এবং তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্র

সাহিত্যের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। এই তিন খণ্ডে রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত বিশেষ ভাবে বিস্তৃতাকারে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশ করিতে গিয়া দেখা গেল আধুনিক যুগের ও রবীন্দ্র-পরবর্তীযুগের কয়েকজন বিদগ্ধ মনীষী যাঁহারা বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন তাঁহাদের বহু বিশিষ্ট রচনা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। পরিশিষ্টে বৌদ্ধ অনুবাদ-সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার সঙ্গে তাহাও সংযোজিত হইল।

আমার গবেষণা নির্দেশক আচার্য ডক্টর অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবিধ কাজে লিপ্ত থাকিয়াও সতর্ক যত্নে ও স্নেহশীল আগ্রহে গবেষণাকাজে আমাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। তিনি প্রতিনিয়ত আমার গবেষণা কাজের অনুসন্ধান লইয়া, প্রতিপদক্ষেপে নানাপ্রকার উপদেশ নির্দেশ দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও স্নেহদৃষ্টি আমার জীবনের এক মহান্ সম্পদ্। তাঁহার প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত গবেষণাকাজে সফলতা অর্জন করা সম্ভবপর হইত না। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগে ছাত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া আমার বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। পালিতে এম. এ. পড়িবার সময় তাঁহার সযত্ন তত্ত্বাবধান ও প্রেরণা আমাকে ভবিষ্যৎ জীবনে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা ও গবেষণায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছে। তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান পরিচায়িকা লিখিয়া দিয়াছেন। শিক্ষাজীবনে ও গবেষণা কাজে দীর্ঘকাল তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও স্নেহানুকূল্য লাভ করিয়া আসিয়াছি। তিনি সময়োচিত নানা নির্দেশ ও উপদেশ দিয়া আমার প্রতি সস্নেহ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিদগ্ধ মনীষীর কাছে চিরঋণী হইয়া থাকাই আমি আমার জীবনে গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-জীবনে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও পালি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং পালি ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম অধ্যাপক এবং স্নাতকোত্তর কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র মজুমদারের নিকট যে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছি পরবর্তীকালে গবেষণা কাজে তাহা আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। ইঁহারা আমার পূজনীয় অধ্যাপক। গভীর

কৃতজ্ঞতার সহিত আমি তাঁহাদের কাছে প্রাপ্ত শিক্ষার বিষয় স্মরণ করিতেছি। পালি সাহিত্য সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুত সুকুমার সেনগুপ্তের নিকট। আমার বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসমীক্ষণের তিনিই আদি আচার্য। এই গ্রন্থের বিষয় নির্বাচন, পরিকল্পনা তৈয়ারী ও নামকরণ হইতে প্রতিটি পরিচ্ছেদ রচনায় অজস্র ধারায় তাঁহার দান গ্রহণ করিয়াছি। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং দুরূহ তত্ত্বালোচনায় আমার অক্ষমতার বাধা তিনি অপসারণ করিয়াছেন। প্রতিদিন তাঁহার বিপুল অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ও উদার জ্ঞানভাণ্ডারের সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হইয়াছি; যাহা ব্যতীত কোন রকমেই এই গ্রন্থ রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। যদি এই গ্রন্থ রচনায় সামান্যতম কৃতিত্বের পরিচয়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে তাহা তাঁহারই কাছে লব্ধ শিক্ষার জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

দীর্ঘসময় এই গ্রন্থের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই ব্যাপারে কত জনের নিকট কত ভাবে সাহায্য পাইয়াছি; কত গ্রন্থ হইতে বিষয়বস্তু ও ভাব আহরণ করিয়াছি। সেই শ্রদ্ধাভাজন পথিকৃৎদের নিকট আমার ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। গ্রন্থ রচনাকালে শ্রদ্ধেয় ধর্মপাল ভিক্ষু, শ্রীজ্ঞানকীর্তি শ্রমণ, অধ্যাপক শ্রীসাধন চন্দ্র সরকার, অধ্যাপক শ্রীসুকোমল চৌধুরী, ডক্টর বিনয়েন্দ্র চৌধুরী এবং ডক্টর দীপককুমার বড়ুয়ার নিকট প্রচুর সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি। ইঁহাদের আমার প্রীতিশুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর ডেপুটি গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র এবং সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীশান্তিপদ ভট্টাচার্যের উৎসাহ ও আনুকূল্যের বিষয় বিমুগ্ধচিত্তে স্মরণ করিতেছি। এই গ্রন্থাগারের কর্মীদের নিকট যে আত্মীয়জনোচিত ব্যবহার পাইয়াছি তাহা আমার কাজকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটির কর্মকর্তাগণ তাঁহাদের গ্রন্থাগার হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকাদি ব্যবহারের অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। কল্যাণীয় শ্রীমান নরেশকুমার দাশ চৌধুরী ধৈর্যসহকারে গ্রন্থের শব্দসূচী সঙ্কলন করিয়াছে। তাহাকে আমার স্নেহশুভেচ্ছা জানাইতেছি। ক্যালকাটা বুক হাউসের কর্ণধার শ্রীযুত পরেশচন্দ্র ভাওয়ালের প্রীতিপক্ষপাতিত্বে এই গ্রন্থ অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত গ্রন্থটি প্রকাশে সহায়তা করিয়াছেন এবং শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার নাগ ও শ্রীযুত নরেশ

গোস্বামী সতর্কতাসহকারে গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন ও সর্বপ্রকার পারিপাট্য বিধান করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। গ্রন্থটিকে ছাপার ভুলমুক্ত করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। গ্রন্থশেষে একটি সংশোধনপত্র সংযোজিত হইল। ইতি—

৩, শম্ভু চাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৩৭৫

শ্রীআশা দাশ

সূচীপত্র

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

আধুনিক যুগ

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

রবীন্দ্রনাথ

পরিচায়িকা

১

শ্রীমতী আশা দাশ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগে আমার ছাত্রীরূপে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার মধ্যে আমি অনুসন্ধিৎসা এবং অধ্যবসায়ের যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহা হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম যে তিনি স্নাতকোত্তর উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বিষয়ে গবেষণার কার্যে নিযুক্ত করিব। এই কথা সত্য, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের বিষয়ে আজ ব্যাপক গবেষণা হইতেছে, প্রতি বৎসরই বহু ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক উপাধি লাভ করিতেছেন; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিতান্ত সহজসাধ্য কার্যেই গবেষকগণ নিজেদের পরিশ্রম সীমাবদ্ধ রাখিতেছেন, তাহাদের কাহারও চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যে এই পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য গবেষণা-কর্ম অতি অল্পই নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং গবেষক এবং গবেষণাকর্মের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা বাংলা সাহিত্যের যে যথার্থ কল্যাণ হইতেছে, তাহা অকপটে স্বীকার করিতে পারা যায় না। তবে এই কথা সত্য, ইহাদের দ্বারা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের বহু উপেক্ষিত দিকের প্রতি নূতন নূতন আলোক সম্পাত হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীমতী আশা দাশের মধ্যে আমি গতানুগতিক গবেষণা-কর্মের ব্যতিক্রম আশা করিয়াছিলাম। কারণ, প্রথম হইতেই পরিশ্রম করিবার একটি অসাধারণ শক্তি তাঁহার মধ্যে আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তথ্য সংগ্রহ এবং তাহা পরিবেষণ করিবার মধ্যেও তাঁহার এক বিশেষ নিপুণতা দেখিতে পাইতাম; সেইজন্যই তাঁহাকে দিয়া একটি বৃহত্তর গবেষণাকর্ম সম্ভব হইতে পারে বলিয়া আমার মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

শ্রীমতী দাশ বাংলায় স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় যথাসময়ে উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই যখন চাকুরির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, তিনি তেমন হইলেন না। তিনি গবেষণাকর্মেই নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করিতে চাহিলেন। তিনি এই বিষয়ে যখন আমার নিকট পরামর্শ চাহিলেন, তখন আমি তাঁহাকে একটি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, কেবল মাত্র বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিয়াই মহৎ কোন গবেষণাকর্ম করা সম্ভব হয় না, এই কার্যে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে ইংরেজি, সংস্কৃত কিংবা আরও কোন একটি ভাষায় অধিকার থাকা আবশ্যক। তবে ইংরেজি এবং সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষায় অধিকার লাভ করিয়া বহু গবেষকই কিছু কিছু গবেষণা-কর্ম ইতিমধ্যে করিয়াছেন; কিন্তু একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভাষা তখন পর্যন্ত উপেক্ষিত আছে, অথচ বাংলা সাহিত্যের বনিয়াদ রচনায় সেই ভাষার দান অপরিসীম, তাহা পালি ভাষা। আমি শ্রীমতী দাশকে পালি ভাষায় স্নাতকোত্তর বিভাগে পুনরায় ছাত্রীরূপে ভর্তি হইয়া দুই বৎসর কাল পালি ভাষা ও সাহিত্য পাঠ করিবার পরামর্শ দিলাম এবং তাঁহাকে গবেষণার বিষয় তাঁহার পালিভাষায় স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিবার পর স্থির হইবে বলিয়া আশ্বাস দিলাম।

বর্তমান যুগের ছাত্রছাত্রীদিগের যে প্রকৃতির সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে, তাহাতে শ্রীমতী দাশের পক্ষে আমার পরামর্শ গ্রহণ করিবার কথা ছিল না; কারণ, গবেষণা করিবার এক অনিশ্চিত সম্ভাবনা সম্মুখে লইয়া বর্তমান যুগে কাহারও বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিষয়ে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিবার পর আর এক বিষয়ে ভর্তি হইয়া আরও দুই বৎসর ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিবার মত ধৈর্য এবং ইচ্ছা না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, শ্রীমতী দাশের মধ্যে আমি এক অসামান্য অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং সেইজন্যই তাঁহাকে এই পরামর্শ দিতে আমি ভরসা পাইয়াছিলাম,

নতুবা গতানুগতিক পথে যাহারা গবেষণা করিবার জন্য আমাদের কাছে আসে, তাহাদিগকে সেই অনুযায়ী পথই দেখাইয়া দিবার অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে। কিন্তু তাঁহার মধ্যে অন্য কিছু দেখিয়াছিলাম বলিয়াই তাঁহার জন্য এই কঠিন ব্যবস্থারই পরামর্শ দিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় আমার পরামর্শ যত কঠিনই হোক, তাহা উপেক্ষিত হইল না এবং যখন তাঁহার সহপাঠী এবং সহপাঠিনীগণ কিংবা বন্ধুবান্ধবগণ কেহ কেহ চাকুরী লাভ করিয়া তাহার মধ্যেই জীবনের চরম এবং পরম প্রাপ্তি মানিয়া লইল, তখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পালি বিভাগে পুনরায় ছাত্রীরূপে ভর্তি হইলেন!

তারপর দুই বৎসর যে কি কঠিন পরিশ্রম করিয়া পালি ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে তিনি জ্ঞান অর্জন করিতে লাগিলেন, তাহাও আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগের সুযোগ্য অধ্যক্ষ বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডক্টর শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রী সুকুমার সেনগুপ্ত এবং অন্যান্য অধ্যাপকগণও তাঁহার মধ্যে অনুসন্ধিৎসা এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য এবং উৎসাহদান করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পালি ভাষায়ও স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিলেন! এইবার বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত মূল্যবান একটি বিষয় সম্পর্কে তিনি গবেষণার কাজ আরম্ভ করিলেন। তাহাই বর্তমান গ্রন্থটির বিষয় 'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি।'

কি উদ্দেশ্যে যে এই বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা করিতে মূল পালি ভাষা শিক্ষা প্রয়োজন, তাহা বিস্তৃতভাবে না বুঝাইয়া বলিলেও চলিতে পারে। প্রথমতঃ দেখা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক হাজার বছরের জীবনের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ইহা যত গভীর যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তত আর কোন ধর্মের সঙ্গেই তাহা সম্ভব হয় নাই। স্বর্গত দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গ

ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা ভাষার আদিযুগকে 'বৌদ্ধযুগ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, পরে অবশ্য তিনি তাহা 'হিন্দুবৌদ্ধ যুগ' নামে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন; বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের একটি বিশেষ অংশের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধ ধর্মের প্রচ্ছন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকেও নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল; তারপর বাঙ্গালীর সহজিয়া সাধনা, নাথধর্ম এবং বাউলের ধর্মতত্ত্বের মধ্যে বৌদ্ধ ভাবনা যে নানাভাবে সক্রিয় রহিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদিযুগ হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম কোন না কোন ভাবে বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে, বাঙ্গালীর জীবনাচরণে ইহার যে স্থানই থাকুক না কেন, বাঙ্গালীর সাহিত্য-ভাবনা এবং সাংস্কৃতিক জীবনে ইহার গভীর প্রভাব কোন যুগেই অস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; সুতরাং বাঙ্গালীর ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক কোন চিন্তাই বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে বাদ দিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিষয়ক কোন জ্ঞানও মৌলিক পালি ভাষায় অধিকার না থাকিলে সম্ভব হইতে পারে না।

২

এই পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ক যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই পালিভাষার কিংবা সংস্কৃত ভাষার ইংরেজি অনুবাদ হইতেই হইয়াছে, মূল পালিভাষার প্রাণলোকে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে বাংলাভাষা এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সন্ধান অল্প লোকেই করিয়াছেন। শ্রীমতী দাশ এই দুরূহ কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া লইয়া পালিভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার কোন বৈষয়িক সুবিধা হইবার উপায় ছিল না,

কেবল মাত্র তাঁহার মনের এক জাগ্রত অনুসন্ধিৎসাকে পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যই তিনি ব্রত হিসাবে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কার্যে যে তিনি কতখানি সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থের পাঠক মাত্রই বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন।

শ্রীমতী দাশ অত্যন্ত বিস্তৃত পটভূমিকার উপর তাঁহার আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন। অনেক সময় এই বিস্তারের হেতু অনুমান করা কঠিন হইতে পারে। তবে ইহার হেতু অনুমান করা কঠিন হইবার একটি কারণ এই যে বাংলা সাহিত্যের পাঠকগণ অনুরূপ আলোচনা পাঠে অভ্যস্ত নহেন, এই বিষয়ে এই গ্রন্থই একটি নূতন পথের নির্দেশ দিয়াছে। তারপর পালিভাষায় রচিত মূল গ্রন্থ পাঠ করিবার ফলে গ্রন্থকর্ত্রী অনুভব করিয়াছেন, প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের মর্মমূল উদ্ঘাটন করিতে হইলে এত বিস্তৃত পটভূমিকা রচনা ব্যতীত কোন উপায় নাই। কারণ, বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃতির রূপ আপাত দৃষ্টিতে আমাদের সম্মুখে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, ইহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সহজ এবং সংক্ষিপ্তভাবে আজ আর সম্ভব নহে; সেইজন্য এত বিস্তৃত পটভূমিকা রচনা অনিবার্যভাবেই ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা গবেষণা গ্রন্থের কোন ত্রুটি নহে, বরং একটি বিশেষ গুণ বলিয়াই স্বীকৃতি পাইবার যোগ্য। বিশেষতঃ বাঙ্গালী বিদগ্ধ সমাজের মধ্যেও আজ বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে কতকগুলি ভ্রান্ত বিশ্বাস স্থান পাইয়াছে, বিশদ আলোচনা ব্যতীত তাহা দূর হওয়া সম্ভব নহে; সুতরাং গ্রন্থকর্ত্রী সেই অনুযায়ী তাঁহার পরিকল্পনাকে রূপ দিয়াছেন। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের চরম সত্য কি, বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাহা কতকাল যাবৎ কি কি ভাবে স্থান পাইয়া আসিতেছে, এই সকল বিষয় সম্যক্ বুঝাইতে না পারিলে বাঙ্গালীর সাহিত্যে তাহার প্রভাব কি ভাবে স্থান পাইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

বৌদ্ধধর্ম আড়াই হাজার বছরের বিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। বুদ্ধের সত্যোপলব্ধি যাহাই থাকুক না কেন,

যুগে যুগে তাহা বিবর্তিত হইয়াছে, বিবর্তনের ভিতর দিয়াই ইহার ধারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহা ব্যতীত ইহা রক্ষা পাইবার কোন উপায় ছিল না; সেইজন্য বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ক কোন তথ্য এবং তত্ত্ব পরিবেষণ করিতে হইলে দুই হাজার বছরের বিবর্তনের ধারাও লক্ষ্য করিবার আবশ্যক হয়। বাংলাদেশেও এক হাজার বছরের বাংলা ভাষার ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম এক এবং অভিন্ন প্রেরণাই যে সঞ্চার করিয়াছে, তাহা নহে, যুগ-বিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহার মধ্যে নূতন নূতন উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছে: কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার একটি মৌলিক ধারা অনাবিল হইয়া ইহার আদি অন্তে, একটি অখণ্ড যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছে। তাহাই বিশ্লেষণ করিতে গিয়া গ্রন্থকর্ত্রীর দায়িত্বটি যেমন জটিল, তেমনই দুরূহ হইয়াছে; তিনি বাঁধা পথে চলিবার সুযোগ পান নাই বলিয়াই সহজে এবং অল্প কথায় তাঁহার বক্তব্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি' গবেষণা গ্রন্থ হইলেও মূলতঃ ইহা সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ, ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ নহে, ইহার মধ্যে কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক ঐতিহাসিক তথ্যই নাই, সেই সকল ঐতিহাসিক তথ্য কি ভাবে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে সাহিত্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়াছে, গ্রন্থকর্ত্রী তাহাই দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকথাও এই জাতি সরস সাহিত্যরূপের মধ্য দিয়া সার্থক ভাবে প্রকাশ করিতে পারে এবং বাংলা ভাষার জন্মকাল হইতে তাহাই সে করিয়া আসিয়াছে। যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধন-ভজনের যে কথা বাংলা ভাষার আদি নিদর্শনরূপে গৃহীত হয়, সেই বৌদ্ধগান বা চর্যাপদ কেবলমাত্র নীরস কিংবা গুহ্য তত্ত্বকথা নহে, তাহা সাহিত্য বলিয়াও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; কারণ; সাহিত্যের যাহা লক্ষ্য অর্থাৎ জীবনরস, তাহা হইতে ইহা বঞ্চিত নহে। বাংলা সহজিয়া, বাউল, দেহতত্ত্বের গান কেবলমাত্র তত্ত্বকথা নহে, তাহা

সরস জীবন-ধর্মী সঙ্গীত। এই ধারা বাঙ্গালী সংস্কৃতির জীবনের আদি-অন্ত প্রসারিত হইয়া আছে। বাঙ্গালী সাধকের কোন রচনাই কোন কালেই কেবলমাত্র নীরস তত্ত্বাশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তত্ত্বকথার মধ্যেও কবিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেইজন্য বৌদ্ধ ধর্মের ভাবাশ্রিত বাঙ্গালীর কোন রচনাই কেবলমাত্র নীরস তত্ত্বকথা বলিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে লেখিকা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ের উপরই গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টি বিস্তার করিয়া এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন; সেইজন্য তাঁহার আলোচনায় কোন তুচ্ছ বস্তুকেই তিনি তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ-কলেবর অনিবার্যরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা ক্ষতির কারণ কিছুই হয় নাই, বরং প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় তাঁহার আলোচনায় স্থান পাইবার ফলে তাহা বিস্মৃতি হইতে রক্ষা পাইবার সুযোগ পাইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকর্ত্রী নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা এবং তাহার ক্রমপরিণতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থখানি কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্য এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতির আলোচনা বিষয়ক গ্রন্থ না হইয়া ভারতে বিশেষতঃ পূর্ব ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও তাহার ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও একখানি মূল্যবান্ আকর গ্রন্থ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম পূর্বভারত অঞ্চলেই উদ্ভব এবং বিকাশ লাভ করিয়া কালক্রমে অর্ধেক পৃথিবী ব্যাপী বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাংলাদেশই এক দিক দিয়া বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ভূমির নিকটতম প্রদেশ। একদিন নানাভাবে এই ধর্ম এই অঞ্চলের জন-জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং তাহার উপরই বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বাংলা দেশ যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা প্রথম হইতে পরবর্তীকাল পর্যন্ত কি

কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তাহা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া না দিলে বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কেই আমাদের এক ভ্রান্ত ধারণা থাকিয়া যায়। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়াই বাংলার বৌদ্ধধর্মের ক্রম বিবর্তিত স্বরূপটি বিস্তৃত আলোচনা করা গ্রন্থকর্ত্রীর আবশ্যক হইয়াছে। কারণ, বুদ্ধের ধর্ম আর বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে কোন কালেই এক ছিল না। সেইজন্য সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সেই জ্ঞান লইয়া বাংলাসাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিষয়ে কিছুই অনুমান করা যাইতে পারে না। এই বিষয়গুলি বিস্তৃত বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ, বিভিন্ন যুগে বাংলাদেশে রচিত বৌদ্ধ প্রভাবিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে মূল বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের তুলনা করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি কেবলমাত্র অন্যের আলোচনা কিংবা অনুবাদের উপর নির্ভর না করিয়া সর্বদাই প্রামাণ্য·পালি এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্রন্থগুলির উপরই নির্ভর করিয়াছেন; সেইজন্যই তাঁহার আলোচনা একটি বিশেষ মূল্য লাভ করিয়াছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন বৌদ্ধগান বা চর্যাপদ; ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ইহা খৃষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত, কেহ আবার অনুমান করিয়াছেন, ইহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা আমাদের দেশের সুধীসমাজ সাধারণতঃ ভাষাতত্ত্বগত কৌতূহলই এই যাবৎ নিবৃত্ত করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার ধর্মের রহস্যও উদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু সেই প্রয়াস যে সার্থক হইতে পারে না, তাহার একমাত্র এই কারণই যথেষ্ট যে ইহার ধারা বহুকাল পূর্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র দুরূহ টীকাটীপ্পনীর মধ্য হইতে ইহার তত্ত্বকথা আজ আর উদ্ধার করিবার কোন উপায় নাই। ইহা একদিন গূঢ় সাধন-ভজনের অঙ্গরূপে গুরুমুখী তত্ত্বহিসাবেই বর্তমান ছিল, ইহার সাধন ভজনের ধারা লুপ্ত হইবার ফলে ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বকথাও আজ

দুর্বোধ্য হইয়াছে। সাধারণ ভাবে চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে বিদগ্ধ সমাজের এই বিশ্বাস যে ইহা যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের রচনা। অর্থাৎ ইহার মধ্যে যোগের কথা, তন্ত্রের কথা এবং বৌদ্ধধর্মের কথা সবই আছে, নাই কেবল হিন্দুতন্ত্র কিংবা হিন্দুধর্মের অন্য কোন কথা, কেহ কেহ ইহাদিগকে সহজিয়া বৌদ্ধসম্প্রদায়ের রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৌলিক বৌদ্ধধর্মের উপাদান ইহাদের মধ্যে কতখানি বর্তমান আছে, তাহা এই পর্যন্ত কেহই বিশ্লেষণ করিয়া দেখান নাই। তবে সাধারণভাবে এই কথা সকলেই মনে করিতেন যে, মৌলিক বৌদ্ধধর্ম অর্থাৎ পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের যে শাখা হীনযান বৌদ্ধধর্ম বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রভাব ইহার মধ্যে কিছুই নাই; কারণ; পূর্ব ভারত অঞ্চলে সেই যুগে ইহার বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতে এই কথাই মনে হইবে যে মৌলিক বৌদ্ধধর্ম বা হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের উপাদানও ইহাতে নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপাদান বরং ইহাদের মধ্যে সেই তুলনায় নিতান্ত উপেক্ষণীয়। মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায় তান্ত্রিক সাধনার যে পথটি ধরিয়াছিল, সহজিয়া বৌদ্ধগণ সেই পথ ধরিয়া চলে নাই। বরং তাহারা প্রচার করিয়াছে,

কিংতো মন্তে কিংতোরে তন্তে
কিং তোরে ঝান বাখানে,

অর্থাৎ মন্ত্রেই বা কি, তন্ত্রেই বা কি, ধ্যান ব্যাখ্যানেই বা কি। সুতরাং দেখা যায়, বৌদ্ধগান বা চর্যাপদগুলি তন্ত্রাচারকে স্বীকার করে নাই, সুতরাং তাহাদিগকে তান্ত্রিক বৌদ্ধ বলা সঙ্গত হয় না। তবে একথা সত্য, নৈরাত্মদেবী, ডোম্বী, শবরী ইত্যাদিকে সাধন-সঙ্গিনীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া ইহাদের রচয়িতাদিগকে তান্ত্রিক ভাবাপন্ন বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু রূপকচ্ছলে ইহাদের উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া ইহাদের প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া ইহাদের রচয়িতা-

দিগকে তন্ত্রাচারসিদ্ধ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গ্রন্থকর্ত্রীর আলোচনা হইতেও ইহাদের সঙ্গে যে মৌলিক বৌদ্ধধর্ম অর্থাৎ হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্কই বেশি ছিল, তাহাই মনে হইবে। গ্রন্থকর্ত্রীর আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ক একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অনেকখানি নিরসন হইবে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম কাল পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রভাব কি ভাবে কার্যকর হইয়াছে, লেখিকা তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই সূত্রেই 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র পরই বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কথা আসিয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে যে গ্রন্থের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না, গ্রন্থকর্ত্রী সেই সকল গ্রন্থও যে কত খুঁটিনাটি করিয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আলোচনাই তাহার প্রমাণ। ইহার মধ্যে কোন বৌদ্ধপ্রভাব থাকিতে পারে, এই কথা কাহারও মনে হইতে পারে না। কারণ, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' দেহ-লালসার কথাই বড় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শের সঙ্গে ইহার এইখানেই ভাবগত পার্থক্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কেবল মাত্র বাহির হইতে এই কথা জানিয়াই গ্রন্থকর্ত্রী ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বিরত হন নাই। তাই তিনি ইহার সম্পর্কে বলিতে পারিয়াছেন, 'এই কাব্য জয়দেব বিদ্যাপতির অনুসরণে রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ হইলেও ইহার যুগ-পরিবেশে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের সাধনার যে প্রতিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না (পৃ-৩৪)।'

প্রভাব দ্বারা ব্যক্তি কিংবা বস্তু যে কেবলমাত্র বশীভূতই হয়, তাহাই নহে, ইহা দ্বারা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্ট হয়। উড়িষ্যার প্রাচীন মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ মিথুন মূর্তিগুলি যে বৌদ্ধ ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের বৈরাগ্য ও জাগতিক অনাসক্তিরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া

রূপেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং যে দেশে বৈরাগ্য এবং অনাসক্তি একদিন সমাজ-জীবনের সর্বাত্মক আদর্শ হইয়াছিল, সেই দেশেই তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া রূপে দেবমন্দিরে মিথুন মূর্তির নির্লজ্জ যৌন আচারের অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছিল। সমাজ-জীবনের যখন স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থা থাকে, তখন তাহাতে কোন বহির্মুখী বিকার দেখা দিতে পারে না। কিন্তু সর্বাত্মক বৈরাগ্য এবং অনাসক্তি সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক সুস্থ লক্ষণ নহে বলিয়াই তাহার অবশ্যম্ভাবী বিকার সমাজের দেহে এবং মনে কদর্যরূপ ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং এই সকল বিকারগ্রস্ত মনোভাবের মধ্যেও ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং অনাসক্তি-প্রচারমূলক ধর্মমতের গৌণ প্রভাব থাকিয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' তাহাই হইয়াছে। যে সামাজিক মনোবৃত্তি হইতে প্রাচীন উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে মিথুন লীলার নগ্ন মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সেই সামাজিক মনোভাব হইতেই বাংলাসাহিত্যের আদিযুগে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধাকৃষ্ণের নামে নরনারীর নির্লজ্জ যৌন আচরণের প্রত্যক্ষ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রভাবকে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব বলিব না, বরং পরোক্ষ প্রভাব বলিব। বৌদ্ধধর্ম যদি সংসার বৈরাগ্য এবং পার্থিব অনাসক্তির নামে ভিক্ষুধর্ম এমন ব্যাপকভাবে একদিন প্রচার করিয়া সমাজের স্বাভাবিক জীবনাচরণের পথ কৃত্রিমভাবে রুদ্ধ করিয়া না দিত, তবে তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতীয় স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে এবং সাহিত্যে পরবর্তীকালে শিল্পের নামে যাহা রূপায়িত হইয়াছিল, তাহা আমরা পাইতাম না। সুতরাং এখানে বৌদ্ধধর্মেরই কৃত্রিম সামাজিক আচরণের গৌণ প্রভাব অনুভব করা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও তাহাই হইয়াছে বলিয়াই গ্রন্থকর্ত্রীর আলোচনায় ইহা বিস্তৃত স্থান লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ গৌণ প্রভাব ব্যতীতও প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলও ইহার মধ্যে তিনি কিছু কিছু

দেখাইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে যোগ-সাধনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য যোগসাধনার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কোন মৌলিক যোগ নাই, পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যোগসাধনা সংমিশ্রণ লাভ করিয়া যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের জন্মদান করিয়াছিল, ইহার সাধকগণই চর্যাপদের রচয়িতা। 'গীতগোবিন্দে'র মত বড়ু চণ্ডীদাসও তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বুদ্ধদেবকে দশাবতারের অন্যতম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এই কথা সত্য, এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অপেক্ষা জয়দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবই বর্তমান ছিল।

৩

বাংলাদেশের নাথধর্ম এক অতি প্রাচীন ধর্ম; ইহার উৎপত্তি বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। মধ্য যুগের বাংলায় নাথধর্মকে অবলম্বন করিয়া এক বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নাথ-সাহিত্য নামে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত। বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি মূল আদর্শ যেমন ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং চরিত্রশক্তি নাথধর্মের মূল ভিত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব রাজপুত্র হইয়াও যেমন তরুণ যৌবনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনই ইহাতেও এক তরুণ রাজপুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনী বিশেষ গুরুত্ব দিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কোন যোগ থাকা স্বাভাবিক। গ্রন্থকর্ত্রী নাথধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করিয়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় নাথসাহিত্যের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। কাজটি অত্যন্ত দুরূহ এবং বিতর্ক মূলক হইলেও গ্রন্থকর্ত্রী এই বিষয়ে তাঁহার সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া নিজের বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, নাথধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস কুয়াসাচ্ছন্ন। বিশেষতঃ নাথধর্ম সহজিয়া কিংবা বাউল ধর্মমতের মত কেবলমাত্র বাংলাদেশের চতুঃসীমাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইহা একটি

সর্বভারতীয় ধর্ম। ইহার ধর্মগুরুদিগের আবির্ভাব এবং ধর্মপ্রচার বিষয়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানেই নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে; মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারতেও ইহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সুতরাং বাংলাদেশের বিশেষ কোন রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া ইহা উদ্ভুত হইয়াছিল, এমন মনে করা কঠিন। তবে বিশেষ একটি যুগে বাংলাদেশে ইহা প্রবল প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল, বাংলাদেশ হইতেই আসামপ্রদেশ বিশেষ সুর্মাউপত্যকায় ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। নাথধর্মের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক খুবই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, এই সম্পর্ক বাংলাদেশেই প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা মনে করা কঠিন।

ব্রহ্মচর্য এবং যোগসাধনা দ্বারা পার্থিব জীবনেই আয়ুর্বল বৃদ্ধি নাথ ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। সেইজন্য নাথসম্প্রদায়কে যোগী (পূর্ববাংলার উচ্চারণে যুগী) সম্প্রদায়ও বলে। যোগসাধনা ভারতীয় ধর্মচিন্তায় এক অত্যন্ত প্রাচীন আচার। পাতঞ্জল তাঁহার যোগশাস্ত্র সংকলন করিবার বহু পূর্ব হইতেই তাহা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়, পাতঞ্জল যোগাচারের সূত্রগুলিকে একত্র সঙ্কলিত করিয়া প্রচার করিয়াছেন মাত্র। তবে বর্তমান গ্রন্থে এই বিস্তৃত পটভূমিকার উপর নাথধর্মের ইতিহাস রচনা করা গ্রন্থকর্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল না, বহু বিবর্তনের ভিতর দিয়া বাংলাদেশে নাথধর্ম যে রূপে এবং যে ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল, তিনি তাহারই বিষয় মাত্র ইহাতে আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার প্রত্যেকটি উক্তিই বাংলাদেশ সম্পর্কেই বুঝিতে হইবে; কারণ, বাংলাদেশই তাঁহার আলোচনার উদ্দেশ্য। সুতরাং তিনি যেখানে লিখিয়াছেন, 'সমাজের উচ্চকোটি হইতে অপস্রিয়মাণ বৌদ্ধধর্ম নিম্নকোটির কৌমদেবতা শিবকে আশ্রয় করিয়া নাথধর্ম ও সাহিত্যের অভ্যুদয় ঘটাইল (পৃ-৩৮)', তখন তাঁহার এই উক্তি সে যুগের বাংলাদেশের সমাজ সম্পর্কেই প্রযোজ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা বৃহত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক পটভূমিকায়

দেখা যাইবে যোগশাস্ত্রানুমোদিত নাথধর্ম বৌদ্ধ এবং শৈব ধর্ম নিরপেক্ষ স্বাধীনভাবেই উদ্ভব লাভ করিয়াছে। পরবর্তী কালে দেশের বিভিন্ন স্থানীয় লৌকিক ধর্মাচারের সম্পর্কে আসিলেও ইহা তাহার মৌলিক পরিচয় বিসর্জন দেয় নাই। বাংলাদেশে নিম্নকোটির কৌমদেবতা শিবকে আশ্রয় করিবার পূর্বেই প্রাচীন ভারতীয় যোগ ধর্ম শিবকে আদর্শ যোগী বা যোগীন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই ভাবটিই নিম্নকোটির কৌমসমাজে বিধৃত হইয়াছে মাত্র।

কিন্তু নাথধর্ম স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হইলেও বাংলাদেশের জন-জীবনে যখন একদিন বিস্তার লাভ করিল, তখন সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হইতে কিছুতেই মুক্ত থাকিতে পারিল না। বাংলার নাথ সাহিত্যের মধ্য হইতে গ্রন্থকর্ত্রী বৌদ্ধপ্রভাবের উপকরণগুলি নৈপুণ্যের সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং বৌদ্ধগান বা চর্যাপদের সঙ্গে বাংলার নাথসাহিত্য যে এক অখণ্ড ঐতিহ্যের যোগসূত্রে গ্রথিত, তাহাও যুক্তি এবং তথ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বিষয়টির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। যাঁহারা চর্যাপদকে বাংলাভাষার আদিরূপ বলিয়া মনে করেন না, তাহাদের যুক্তির বিরুদ্ধে ইহা একটি প্রধান বক্তব্য। বাংলাদেশে চর্যাপদের ঐতিহ্যের ধারা প্রাচীন যুগ হইতে মধ্যযুগ পর্যন্ত অখণ্ডভাবে অগ্রসর হইয়াছে, মধ্যযুগের নাথ-সাহিত্য তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অস্পষ্ট অধ্যায়কে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত 'শূন্যপুরাণ' মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক জীবনের ইতিহাসের একখানি পরম মূল্যবান্ উপাদান। বিভিন্ন সময়ে ইহার বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়া অন্ততঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আসিয়া ইহা বর্তমান আকার লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তথাপি বিষয়গত ভাবে ইহার মধ্যে একটি সামগ্রিক ঐক্য প্রকাশ পাইয়াছে। সাহিত্যের দিক দিয়া ইহার কোন মূল্য

নাই সত্য, কিন্তু তাহা সত্বেও যে সমাজে এবং ধর্মের প্রেরণায় মধ্য যুগের একশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার রস এবং রহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য ইহার বিশেষ একটি মূল্য রহিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী ইহারও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার ঐতিহাসিক এবং সামাজিক মূল্য বিচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থের একটি বিশেষ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ যে মধ্যযুগের বাংলায় বিকৃত হইয়া কোন্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া নিম্ন কোটির সমাজের মধ্যে তখনও সক্রিয় ছিল, ইহার মধ্যে তাহারই সন্ধান পাওয়া যাইবে। মূলতঃ বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের ইতিহাসে ইহাই বৌদ্ধধর্মবিষয়ক শেষ দলিল। সুতরাং ইহার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার আলোচনায় ইহার সম্পর্কে যথাযোগ্য স্থান দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইবে, গ্রন্থকর্ত্রীর এই গ্রন্থখানি কেবলমাত্র বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি মূল্যবান যোজনা নহে, বাংলার সামাজিক জীবনের ইতিহাসেরও একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন রূপে গৃহীত হইবার যোগ্য।

নাথ সাহিত্য এবং 'শূন্যপুরাণে'র আলোচনার পর গ্রন্থকর্ত্রী মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনধারা অনুসরণ করিয়াই মধ্যযুগের বাংলায় মঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার মধ্যে বৌদ্ধ উপাদানের পরিমাণ অধিক থাকিবে ইহাই প্রত্যাশিত। সেইজন্য একটি বিস্তৃত পরিচ্ছেদে (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) গ্রন্থকর্ত্রী বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে সমাজে হিন্দুধর্ম পুনরভ্যুত্থানের প্রয়াস পাইয়াছে এবং বৌদ্ধধর্মের নানা শাখা-প্রশাখাজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম সম্প্রদায় হিন্দুধর্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতেছে। সেই অবস্থায় সমাজের মধ্যে তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া যে নূতন দেবদেবীর সমাজ গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাদের মহিমাকীর্তন করিয়াই মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল। সুতরাং

ইতিপূর্বে বাংলার সমাজে বৌদ্ধধর্ম স্থূলভাবে অবস্থান করিলেও মঙ্গলকাব্যের যুগ হইতেই ইহার অবস্থান প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। সেইজন্য ইহাদের যথার্থ পরিচয় সম্পর্কে অনুসন্ধানও জটিলতর হইয়া উঠিল। জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, সহজিয়া ধর্ম, নাথধর্ম ইত্যাদি বেদপুরাণ-বিরোধী ধর্মমতের প্লাবন বাংলাদেশের উপর দিয়া বহিয়া যাইবার পর যখন তুর্কী আক্রমণের ভিতর দিয়া নূতন এক শক্তিশালী সমাজের প্রবলতর হিন্দুবিরোধী ধর্মমত বাংলাদেশের মাটিতে আত্মপ্রকাশ করিল, তখনই মঙ্গলকাব্যগুলির আবির্ভাব কাল সূচিত হইল। সুতরাং বাংলার মাটিতে বেদপুরাণের ধর্ম কোনদিনই সুদৃঢ় শিকড় গাড়িয়া তুলিতে পারিল না। তথাপি তাহার যে প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, মঙ্গলকাব্য রচনার মধ্যেই তাঁহার প্রথম সূচনা দেখা গিয়াছে। মনসা-মঙ্গলের মনসা প্রাচীন বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলী, কিংবা প্রাচীন জৈন দেবী পদ্মাবতী হইতে মনসার অন্যতম নাম পদ্মাবতী; বৌদ্ধ তান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুসারিণী শক্তিদেবী চণ্ডী, এমন কি, কাহারও কাহারও মতে প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী হারীতী শীতলা ইত্যাদি দেবদেবীর হিন্দুরূপ প্রতিষ্ঠা করাই মঙ্গলকাব্য-গুলির লক্ষ্য হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিই বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর সমন্বয় সাধনের প্রথম প্রয়াস পাইয়াছে। ক্রমে তাহাই বাঙ্গালীর সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং নাথ সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, বৌদ্ধ সাহিত্যের ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরই মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, রামায়ণ-মহাভারত কিংবা পুরাণের কোন ঐতিহ্য ইহা অনুসরণ করে নাই। প্রাচীন সাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াই উদ্ভূত হয়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের বনিয়াদ যে কত সুদৃঢ়, ইহা হইতে তাহাও অনুমান করা যায়।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মধ্যে কিছুকাল পূর্বে ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর সম্পর্কে পণ্ডিতদিগের মধ্যে কিছু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, প্রাচীন এক কৌম সমাজ হইতে এই দেবতা উদ্ভূত হইয়া সমাজ-জীবনের বিভিন্ন যুগে ক্রমে জৈন, বৌদ্ধ, নাথ, হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইয়াছেন এবং ইহার উপর প্রত্যেক ধর্মের প্রভাবের কিছু কিছু চিহ্ন বর্তমান রহিয়া গিয়াছে। যে অঞ্চলে যে ধর্মের প্রভাব অধিক হইয়াছে, সেই অঞ্চলে সেই ধর্মের রূপ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে; সেইজন্য কেহ বুদ্ধ, কেহ বিষ্ণু, কেহ বরুণ, কেহ যম, কেহ কূর্মরূপে ইহাকে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার উদ্ভব আরও প্রাচীন এবং ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া এই ধর্মের একটি মৌলিক পরিচয় এখনও বর্তমান আছে। পূর্ব ভারতীয় কৌম সমাজ-জীবনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিলেই ইহার যথার্থ পরিচয় এখনও উদ্ধার করা যাইতে পারে। কারণ, কোন দেশেরই ধর্মচিন্তা তাহার ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, জনসমাজের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ইহার সকল আঞ্চলিক সীমা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ধর্মঠাকুরের পূজারও তাহাই হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী এই বিষয়ে বিভিন্ন মতগুলি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া যথাযথ সিদ্ধান্তটিই গ্রহণ করিয়াছেন।

কালিকা-মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর উদ্ভবের সঙ্গে বৌদ্ধ জাতকের একটি কাহিনীর সম্পর্ক আছে, তাহা গ্রন্থকর্ত্রী বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন। এই বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানকারীদিগের মধ্যে ইতিপূর্বে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। কেহই এই পর্যন্ত পালিভাষার সঙ্গে ইহার সুগভীর সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারেন নাই বলিয়া এই তথ্যটি বিস্তৃত পরিবেষণ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থকর্ত্রীর আলোচনা হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হইবে, পালিভাষায় রচিত 'মহাউমমগ্‌গ জাতক' বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর

আঠের

ভিত্তি। বাংলাদেশের বহু ব্রতকথা, নীতিকথা এবং উপকথায় যে পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধ জাতক কাহিনীর প্রভাব অনুভব করা যায়, বাঙ্গালীর এই সুপরিচিত কাহিনীর উদ্ভবের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দিবে। বিবিধ মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তীর্থমঙ্গলকাব্যে যে বুদ্ধ গয়ার সশ্রদ্ধ বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাও মঙ্গলকাব্যের বুদ্ধভক্তির পরিচায়ক।

৪

গ্রন্থকর্ত্রীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আলোচনা বৈষ্ণব সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রভাব বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সেন রাজত্বের যুগ হইতেই বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব যে এত শক্তিশালী হইয়াছিল, তাহার মর্মমূল বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনার মধ্যে নিহিত ছিল বলিয়াই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনায় আদিবুদ্ধের শক্তির পরিকল্পনার মধ্যেই পরবর্তী কালে বাংলার রাধাতত্ত্বের বীজ নিহিত ছিল, ইহা ভাগবতের পথ ধরিয়া যে বাংলাদেশে প্রচার লাভ করে নাই, তাহা সকলেই অবগত আছেন; কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে রাধার কোন উল্লেখ নাই। এই বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন, বৌদ্ধসাধনায় যাহা ছিল কুঁড়ি মাত্র, বৈষ্ণবের সাধনায় তাহা ধীরে ধীরে দলে দলে বিকশিত হইয়া সহস্রদল পদ্মে আপনাকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে, এবং সৌন্দর্যে ও সৌগন্ধে, রসে ও পূর্ণতায় ভুবন-বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছে (পৃঃ ১৬৫)।

এই কথা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মধ্যযুগে বাংলা দেশে রাধাতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যে এত ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল, পূর্ববর্তী কোন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ না করিলে তাহা কদাচ সম্ভব হইতে পারিত না। বৈষ্ণব সাধক এবং পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির মধ্যে এই ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতই হউক কিংবা বিষ্ণু পুরাণই হউক ইহাদের কিছুই বাংলা, এমন কি, পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের আধ্যাত্মিক

চিন্তার ধারার সঙ্গে আদৌ সংযুক্ত নহে। বিদগ্ধ সমাজের জ্ঞান-সাধনার মধ্য দিয়া মুষ্টিমেয় জনসাধারণের মধ্যে যাহা একদিন প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহা কখনও একটি দেশের ঐতিহ্যের ধারা সৃষ্টি কিংবা বহন করিতে পারে না। প্রাক্‌বৈষ্ণবযুগে বাংলাদেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যে যে ধারায় সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ নহে, বরং জৈন-বৌদ্ধধর্মের ধারা, ইহাতে তন্ত্রেরও একটি প্রধান অংশ আছে। কিন্তু আমাদের দেশে কেবলমাত্র সম্প্রদায়গত ভাবে ধর্মের ইতিহাস রচিত হইয়াছে; অর্থাৎ বৈষ্ণব সাধকগণ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে পণ্ডিতগণ বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের সম্প্রদায়ের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পান নাই। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের কথা তাঁহারা এই বিষয়ে ভাবিতেই পারিতেন না; কারণ, বৌদ্ধধর্ম বেদবিরোধী এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী জড়বাদী ধর্ম। সুতরাং তাহার সঙ্গে প্রবল ঈশ্বরবিশ্বাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কোন দিক দিয়া কোন প্রকার যোগ আছে, তাহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকর্ত্রীর একটি প্রধান গুণ এই যে, ধর্মবিষয়ে তাঁহার কোন সংস্কার নাই; তাঁহার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যদি কিছু থাকিয়াও থাকে, তাহা তিনি সম্পূর্ণ সংযত রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে তথ্যগুলির আলোচনা করিয়াছেন, সেইসূত্রেই তিনি বৌদ্ধধর্মের উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে আসন্ন বৈষ্ণবধর্মের বীজের সন্ধান পাইয়াছেন। এই প্রকার সংস্কারমুক্ত হইয়া জ্ঞানের অনুশীলন না করিলে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়া দুরূহ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণকে উপেক্ষা করিয়াও বাংলাদেশে সেন রাজত্বের সূচনা হইতেই কেন যে রাধা চরিত্র এত শক্তিশালী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল, সেই সম্পর্কে অনেকেই বহু আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর শক্তিসাধনার কথাও অনেকে বলিয়াছেন; কিন্তু মহাযান বৌদ্ধ ধর্মচেতনার মধ্যে যে তাহার বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহা এমন যুক্তি-তর্ক সহকারে ইতিপূর্বে আর কেহ বলেন নাই। এক

কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বাংলাদেশে যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম একদিন সর্বাত্মক প্রসার লাভ করিয়া বাঙ্গালীর জন-মানসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহার চেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল, তাহার সঙ্গে যোগ নির্দেশ করিয়া বাঙ্গালীর ধর্মসাধনা যে কি ভাবে বিকাশলাভ করিতেছিল, তাহা এই পর্যন্ত কেহ আলোচনা করেন নাই। মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন বিষয় লইয়া বিচ্ছিন্নভাবে বহু উল্লেখযোগ্য আলোচনা হইয়াছে, অথচ তাহার ধারা যে বাঙ্গালীর হৃদয়রাজ্যের মধ্য দিয়া কি ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আধুনিকতম কাল পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এমন সার্থকতার সঙ্গে ইতিপূর্বে কেহই আলোচনা করেন নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় বৌদ্ধ ধর্মের কথা সর্বদাই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

প্রাক্‌চৈতন্য বৈষ্ণব কবি জয়দেব এবং বড়ু চণ্ডীদাস উভয়েই সহজিয়া সাধক ছিলেন; সুতরাং সহজিয়া সাধনার সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রত্যক্ষ যোগ রহিয়াছে। সহজিয়াকে গ্রন্থকর্ত্রী অবশ্য সহজিয়া বৌদ্ধ বলিয়াছেন। সহজিয়া নিজেই একটি স্বাধীন ধর্ম, তাহার মধ্যে বৌদ্ধত্ব কিছু নাই; তবে এ কথা সত্য, মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যে শাখা সহজিয়া মত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহাকেই সহজিয়া বৌদ্ধ বলা হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী জয়দেবের মধ্যে যে বৌদ্ধত্বও ছিল, তাহারও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। জয়দেব কর্তৃক বিষ্ণুর দশাবতার বর্ণনায় বুদ্ধের উল্লেখও সর্বজন-বিদিত। বড়ু চণ্ডীদাসও বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবীর উপাসক ছিলেন, তাহা তিনি নিজের কাব্য মধ্যেই উল্লেখ করিয়াছেন।

চৈতন্য পরবর্তী যুগেও বৈষ্ণব পদাবলী যে কি ভাবে বৌদ্ধ চর্যাপদের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছে, তাহা গ্রন্থকর্ত্রী নানা উদ্ধৃতি সহযোগে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চর্যাপদের কতকগুলি নিগূঢ় তত্ত্বকথা যে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে কি ভাবে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন। আমরা

বৈষ্ণবপদাবলী বিশ্লেষণ করিতে সাধারণত এই পথ কখনও অনুসরণ করি না। পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীমদ্‌ভাগবতের ঐতিহ্য দ্বারাই আমাদের বিদগ্ধ সমাজ বৈষ্ণব পদাবলীর টিকাটিপ্পনী রচনা করিয়াছেন; কারণ, বৌদ্ধ চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের সমাজের যোগ ইতিপূর্বেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রীর আলোচনার মধ্য দিয়া তাহাই নূতন ভাবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চৈতন্য জীবনচরিতের মধ্যেও বৌদ্ধ প্রসঙ্গের যেখানেই উল্লেখ আছে, সেখানেই গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টি বিস্তার করিয়া তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'পাষণ্ডী' বলিতে কি বুঝায়, কি ভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি শাখা 'পাষণ্ডী'তে পরিণত হইল, গ্রন্থকর্ত্রী তাহারও তথ্যনির্ভর আলোচনা করিয়াছেন। 'পাষণ্ডী' সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল 'পাষণ্ডী' সম্প্রদায়েরই একটি বিপুল অংশ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। নিত্যানন্দ এবং বীরভদ্রের প্রচারের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করিল, তখন অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা সকলই তাহার অন্তর্ভুক্ত হইল। সুতরাং এক সুবৃহৎ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী লইয়াই সেই যুগের বৈষ্ণব সমাজ প্রধানত গঠিত হইল। বৌদ্ধধর্ম হইতে নবদীক্ষিত বৈষ্ণব সমাজ যে সেই মুহূর্ত হইতেই বৈষ্ণবাচার সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে, বরং বৈষ্ণবধর্মের নামে তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধ আচারই পালন করিয়া যাইতে লাগিল। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ বৌদ্ধ উপাদানে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছিল। তাহার ফলেই দেখা গেল, অল্পদিনের মধ্যে, এমন কি, চৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণব সমাজ ইহার উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গেল। বহির্মুখী প্রয়োজনের তাড়নায় নানা পরস্পর বিরোধী সমাজের উপাদান একত্র সংযুক্ত

হইয়া সে দিন বৈষ্ণব সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাহার ভিত্তি শিথিল হইয়া গেল এবং নানা বিচিত্র উপাদানে ইহার অন্তর্লোক কদর্য হইয়া উঠিল। যুগের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম সেদিন যুগোত্তীর্ণ হইয়া আর নিজের শক্তিতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না।

৫

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান শাখা অনুবাদ শাখা। তাহাতে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণের অনুবাদই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য পুরাণের অনুবাদও ইহারই অংশ। এই সকল অনুবাদ রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা কদাচ আক্ষরিক অনুবাদ নহে, ভাবানুবাদ মাত্র এবং যখনই সুযোগ এবং অবকাশ দেখা গিয়াছে, তখনই দেশজ বা বহু লৌকিক কাহিনী এবং কিংবদন্তী তাহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই সূত্রেই দেশ প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের সমসাময়িক বহু উপকরণ তাহাদের মধ্যে গিয়াও অনুপ্রবেশ করিয়াছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে দশরথ জাতক নামে রামায়ণ কাহিনীর যে একটি বিশেষ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বৌদ্ধধর্মের সূত্রেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তী কালে বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ রচনাকালে তাহারও প্রভাব নানাভাবে তাহার মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থকর্ত্রী 'দশরথ জাতক'টির বাংলা অনুবাদ এখানে বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গালী রামায়ণে ইহার কি সম্ভাব্য প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে যে সকল দেশীয় উপকরণ গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কতখানি অংশ বৌদ্ধধর্ম হইতে আসিয়াছে এবং কতখানি উপকরণ অন্যত্র হইতে আসিয়াছে, তাহা এখন সুগভীর বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। তবে এই কথা সত্য, বৌদ্ধধর্ম যদি বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তিভূমি রচনা না করিত, তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকির বিশেষ কোন ব্যতিক্রম দেখা যাইত না।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে বৌদ্ধজাতকের কাহিনীর কোথায় এবং কি ভাবে ঐক্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা গ্রন্থকর্ত্রী গভীর অধ্যয়ন দ্বারা উদ্ধার করিয়া তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই পর্যন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পর্কে যত ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের ব্যতিক্রম দেখাইয়াই আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করিয়াছি; কিন্তু সেই ব্যতিক্রমগুলি কি ভাবে কোন সূত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখি নাই।

ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামানন্দ ঘোষ নামে রামায়ণের একজন কবি নিজেকে বুদ্ধ অবতার বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন, তখন বৌদ্ধধর্মের আর কিছু মাত্র অবশেষ বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান ছিল না, সবই অপ্রত্যক্ষ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি কেন যে তিনি নিজেকে বুদ্ধ অবতার বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন, তাহা সুগভীর তাৎপর্যমূলক। সমাজের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অপ্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাহা যে কোন কোন ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল, ইহা তাহারই প্রমাণ। জাতির অন্তস্তলে বৌদ্ধধর্মের চিন্তা তখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

মহাভারতের মধ্যেও যে বৌদ্ধ জাতকের বহু কাহিনী স্বাঙ্গীকৃত হইয়াছে, গ্রন্থকর্ত্রী তাহাও দেখাইয়াছেন। এই কথা সত্য, মহাভারত ভারতের সকল ঐতিহ্যকেই আত্মসাৎ করিয়া মহান্ হইয়াছে; সেইসূত্রে বৌদ্ধধর্মের মত এত বিশাল একটি ধর্মের প্রভাব ইহাতে কিছুতেই অস্বীকৃত হইতে পারে নাই। কাশীরাম দাস অনূদিত বাংলা মহাভারতেও মূলবহির্ভূত বহু কাহিনী বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়া একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদের মধ্যেও যে বৌদ্ধ জাতকের অন্তর্গত 'ঘটজাতকে'র কাহিনীর প্রভাব অনুভব করা যায়, গ্রন্থকর্ত্রীর বহু সন্ধানী দৃষ্টির গুণে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভাগবতের বাংলা

অনুবাদও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বুদ্ধকে যে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, গ্রন্থকর্ত্রী তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার বক্তব্য বিষয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি নানা গ্রন্থ যে রকম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে ইহার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল।

৬

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের পরবর্তী যুগই ভক্তিমূলক গীতিকবিতার যুগ; এই যুগে আসিয়া মধ্যযুগের বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনা হইতে উদ্ভূত দুইটি সমান্তরাল ভাবধারা একটি ধারার মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ বৈষ্ণব এবং শাক্তের ধারা ইহাতে একই অভিন্ন ধারায় আসিয়া পরস্পরের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী এই যুগেই বৌদ্ধসংস্কৃতির শেষ অবক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই ইস্‌লামি সাধনা বাংলার সংস্কৃতির উপর নিজের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রাখিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার মুখে বৌদ্ধ সংস্কৃতি নিজের সর্বশেষ রশ্মিটুকু কোন মতে সংবরণ করিয়া লইতেছে। এই যুগেই নূতন যে এক শ্রেণীর পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভব হইল, তাহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শাক্ত পদাবলী বলিয়া পরিচিত।

শাক্ত পদাবলী পরিচয়টির মধ্য দিয়াই শাক্ত এবং বৈষ্ণবের মিলনের ভাব বুঝাইতেছে। কারণ, পদাবলী শব্দটি বৈষ্ণব ভাবেরই দ্যোতক। এই যুগের সাহিত্যে বৌদ্ধ ভাবধারা যতই ক্ষীণ হোক না কেন, একটি কথা এখানে বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, আপাত দৃষ্টিতে ইহা ক্ষীণ হইলেও, ইহাও পূর্ববর্তী ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে যে শাক্ত উপাদান ছিল, তাহার মূল প্রেরণা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম হইতেই আসিয়াছে এবং যাহা বৈষ্ণব, তাহার মধ্যেও বুদ্ধ ও তাঁহার শক্তির কথা নিতান্ত গৌণভাবে হইলেও প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, সমগ্র

বাংলা সাহিত্যের শাক্ত এবং বৈষ্ণব ভিত্তি মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম-চেতনার উপরই স্থাপিত হইয়াছে। সে কথা পূর্বে আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে। বৌদ্ধ চর্যাপদের সঙ্গে শাক্ত পদাবলীর ভাবগত কোন পার্থক্য নাই, তাহা একটু গভীর ভাবে উভয়ের বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। গ্রন্থকর্ত্রী এই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, 'চর্যাপদ বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীত, কিন্তু শাক্ত পদাবলী বিশুদ্ধ সাধন সঙ্গীত এবং লীলা-সঙ্গীত দুই-ই (পৃ. ২৩১)।' তারপর অন্যান্য যে সকল বিষয়ে শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে বৌদ্ধ চর্যাপদের সম্পর্ক আছে, তাহাদেরও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

বৌদ্ধ চর্যাপদগুলি যে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বাঙ্গালীর গীতি-কাব্যের শাখায় নানাভাবে কি সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আমরা সচেতন ভাবে অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া দেখি না। অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে ছিন্ন করিয়াই আমরা বিষয়ের বিচার করিয়া থাকি ; কিন্তু জাতির সাহিত্য-ভাবনার মধ্যে যে ভাবের একটি অখণ্ড প্রবাহ বর্তমান, তাহা আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিতে পারি না। বৌদ্ধ চর্যাগীতিগুলি কেবল মাত্র এক যুগের কাজ শেষ করিয়া দিয়াই বাংলা সাহিত্য হইতে বিদায় লইয়া যায় নাই, বাঙ্গালীর সৃষ্টিকর্মের অখণ্ড চেতনার সঙ্গে তাহার যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সেইজন্য সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়াও বাঙ্গালীর হৃদয়-সরোবরে তাহার তরঙ্গ স্পন্দন অনুভব করিতে পারা যায়। শাক্ত পদাবলী-গুলিই তাহার প্রমাণ।

শাক্ত পদাবলীগুলিতে যে প্রচলিত হিন্দু আচার-ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হইয়াছে, তাহার প্রেরণাও বৌদ্ধ সংস্কৃতি হইতেই আসিয়াছিল। রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত

কাজ কি আমার গিয়ে কাশী,
ঘরে ব'সেই পাব আমি গঙ্গা বারাণসী।

চর্যাপদের এই পদগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়,

কিংতো মন্তে কিংতোরে তন্তে
কিংতো রে ঝান বাখানে।

ইহারা একই অখণ্ড সূত্রে গাঁথা। এমন কি, ইহাই অনুসরণ করিয়া বাংলার বাউল সাধনার বিকাশ হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা হইয়াছে। এই যুগেই প্রত্যক্ষ জীবন-চর্চায় বাঙ্গালীর উপর হইতে বৌদ্ধধর্মের সকল প্রভাব লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা গেল, মুষ্টিমেয় বুদ্ধি-জীবীর শিক্ষা এবং জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কৌতূহল বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী অবশ্য এই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'এই যুগে বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তি হইলেও বৌদ্ধ দর্শনের অবলুপ্তি হয় নাই।' তবে এই কথাও সত্য যে, বৌদ্ধ দর্শন তখন আর জীবন-চর্চার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাহা তখন কেবল মাত্র ব্যক্তি বা সমাজের জ্ঞানচর্চার বিষয় হইয়াছে। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, পাশ্চাত্ত্য গবেষকদিগের পথ অনুসরণ করিয়াই বাঙ্গালী জ্ঞানসাধকগণ এই পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি কোন আন্তরিক অনুরাগ বশতঃ কতদূর তাঁহারা এই বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে ইহার যে ব্যতিক্রম ছিল না, তাহা নহে।

৭

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল মনীষী তাঁহাদের আলোচনার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের বিষয়কে অবলম্বন করিয়াছিলেন, গ্রন্থকর্ত্রী তাহাদের কালানুক্রমিক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ, যথা প্রবন্ধ, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোট-গল্প ইত্যাদির লেখকগণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিভাগে আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের জন্য গ্রন্থকর্ত্রী একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অধ্যায় নির্দেশ করিয়াছেন। এই কার্যে উনবিংশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া

রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সমসাময়িক কাল পর্যন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক বিস্তৃত যুগ তাঁহাকে পরিক্রমা করিতে হইয়াছে। এই বিষয়ক আমাদের অজ্ঞাত এবং অবহেলিত বহু প্রয়োজনীয় তথ্য তিনি উদ্ধার করিয়া গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ যুগ-পরিক্রমার মধ্য দিয়া বিভিন্ন গ্রন্থকারের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যে ব্যক্তিগত মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সার্থকভাবে অনুসরণ করা যায়। আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম নব যুগের নূতন চিন্তায় কি মূল্যায়ন লাভ করিয়াছে, তাহা ইহা হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের নিরপেক্ষ আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্তি এবং ভাববাদী নানা ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যাইবে। যে বৌদ্ধধর্মকে সকলেই সাম্যবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, হিন্দু সনাতন ধর্মের আদর্শে বিশ্বাসী ভূদেব মুখোপাধ্যায় কি ভাবে যে তাহার মধ্যে সাম্যবাদের অভাব অনুভব করিয়াছেন, তাহাও জানিতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্মের আত্মগত (Subjective) ব্যাখ্যায় এই যুগের বিদগ্ধ সমাজ নানা মত পোষণ করিয়াছেন, তবে কাহারও রচনার মধ্যে এই মহৎ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের অভাব দেখা যায় না।

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গদ্য লেখকদিগের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি বাংলার প্রায় সকল লৌকিক ধর্মচিন্তার মধ্যেই বৌদ্ধ প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি সকলই বৌদ্ধদেবী এই তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি ইতিহাসের ভিত্তিতেই বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা করিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের মনোগত ভাব দ্বারা বহু বিষয়েরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাংলা দেশের সকল ক্ষেত্র হইতেই যখন বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া সকলেই অনুভব করিতেছিলেন, তখন তিনি এদেশে 'Living Buddhism'এর সন্ধান পাইলেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কিন্তু গভীরতর অনুসন্ধানের ফলে পরবর্তী কালে দেখা গিয়াছিল

এই বিষয়ক তাঁহার সকল অনুমানই প্রায় ভিত্তিহীন। তথাপি লৌকিক স্তরের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে বৌদ্ধধর্মের উপকরণ সন্ধানে যে তাঁহার একটি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা গতানুগতিক এই বিষয়ক আলোচনায় একটি নূতন দিকের সন্ধান দিয়া গিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য রচনায় বৌদ্ধধর্মের বিষয় এবং বুদ্ধজীবনীকে যিনি প্রধানত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি নবীনচন্দ্র সেন। তাঁহার 'অমিতাভ কাব্য' বুদ্ধজীবনীর প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ নিবেদন। যদিও তিনি তাঁহার রচনায় আরনল্ড্ রচিত *Light of Asia* গ্রন্থে উল্লেখিত বুদ্ধজীবনী দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার আবেগধর্মী রচনায় কবির এই সম্পর্কে আত্মগত মনোভাবেরও সার্থক প্রকাশ দেখা যায়।

বাংলা নাট্যসাহিত্যেও বুদ্ধজীবনী নানাভাবে চিত্রিত হইয়াছে, গ্রন্থকর্ত্রী আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম হইতে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্য আনুপূর্বিক পরিক্রমা করিয়া কয়েকটি বুদ্ধ কিংবা বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক নাটকের পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতেও তাঁহার যে তথ্যানুসন্ধান এবং তাঁহার পরিবেষণের নিপুণতা দেখা গিয়াছে, তাহা বাংলা গবেষণায় বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হইবে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বুদ্ধচরিত' নাটকখানিতে কতখানি আরনল্ডের *Light of Asia* এবং কতখানি বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি সংস্কৃত এবং পালি বৌদ্ধ সাহিত্যের মূল গ্রন্থগুলির উল্লেখ করিয়া গিরিশ চন্দ্রের তাহাদের প্রতি কতখানি আনুগত্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র ভক্তিবাদী ছিলেন, যুক্তিবাদী কিংবা জড়বাদী ছিলেন না, তথাপি ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে যাঁহারা মহতী সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিও পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিশেষত বুদ্ধদেবকেও তিনি বিষ্ণুর অবতার রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের 'অশোক' নাটকও গ্রন্থকর্ত্রী বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে মূল 'মহাবংশ', 'দিব্যাবদান' ইত্যাদি গ্রন্থের কতখানি যোগ ছিল, তাহা বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় ভাষাজ্ঞানের অভাবে মূলের অনুসন্ধান অনেক সময় দুরূহ হইয়া উঠে; কিন্তু এই ক্ষেত্রে গ্রন্থকর্ত্রীর অনন্যসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। মূল পালিভাষায় তাঁহার অধিকার থাকিবার ফলে অতি সহজেই তিনি গিরিশচন্দ্রের রচনা মূলের সঙ্গে কতখানি ঐক্য রক্ষা করিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাহাতে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার একটি বিশেষ দিকেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য নাট্যকাব্যের মধ্যেও বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব কতদূর কার্যকর হইয়াছিল, গ্রন্থকর্ত্রী তাহা বিস্তৃত বিশ্লেষণ সহকারে দেখাইয়াছেন। তাঁহার এই আলোচনা কেবলমাত্র ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারীর আলোচনা নহে, ইহা নাট্যসাহিত্যের পাঠক মাত্রেরই পরম উপকার সাধন করিবে। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই বাংলা কথাসাহিত্যেও বৌদ্ধ প্রসঙ্গ নানাভাবে গৃহীত হইতেছে। এই বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হইতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত যে সকল ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক বৌদ্ধযুগের জীবন অবলম্বন করিয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিস্তৃত উল্লেখ করিয়াছেন।

৮

গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার গ্রন্থের পরিশেষে একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, কাব্য, নাটক ও অন্যান্য বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম এবং সাহিত্যের প্রসঙ্গ হইতে সর্বাধিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন; সেইজন্য তাঁহার সম্পর্কিত আলোচনার যথাযথ মর্যাদা দান করিবার জন্য গ্রন্থকর্ত্রী স্বভাবতই তাঁহার সাহিত্য আলোচনার জন্য একটি

সুদীর্ঘ এবং স্বতন্ত্র খণ্ডের পরিকল্পনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য বর্তমান যুগে আমাদের অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য তাঁহার সম্পর্কে সকল বিষয়েই আমরা অত্যন্ত খুঁটিনাটি আলোচনা আশা করি। গ্রন্থকর্ত্রী আমাদের সেই আশা পূর্ণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা সত্য, বৌদ্ধধর্মের সামগ্রিক আদর্শ রবীন্দ্রনাথ গ্রহন করেন নাই। বৌদ্ধধর্মের মূল কথা নির্বাণ,—করুণা এবং মৈত্রী তাহার উপায় মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের মূল কথাটি বাদ দিয়া তাহার ত্যাগ, করুণা এবং মৈত্রীর উপায় দুইটি তাঁহার সাধনার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনার ভিতর দিয়া এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব নির্দেশ করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী যে তিনটি স্বাধীন পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রবন্ধ, কাব্য ও নাটক স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে সকল প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের কোন্ বিষয় রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কোন্ বিষয় তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার মতবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্মের মূল আদর্শের কোথায় বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা লেখিকা নিপুণ বিশ্লেষণ সহ আমাদের সম্মুখীন করিয়াছেন। একদিকে রবীন্দ্র নাথ বুদ্ধদেবের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল, তেমনই আর একদিকে কঠোর সমালোচক। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, দার্শনিক নহেন; সেইজন্য পৃথিবীর রস প্রাণ ভরিয়া পান করিবারই তিনি পক্ষপাতী; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা কোনখানে কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা গভীর দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করিতে না পারিলে কেবল বাহির হইতে দেখিলে কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে

না। গ্রন্থকর্ত্রী সুগভীর দৃষ্টি দিয়া তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। সাধারণভাবে আমরা জানি যে, রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাহা যে এই বিষয়ে সবটুকু জানা নহে, গ্রন্থকর্ত্রীর গ্রন্থের এই অংশ পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

ভারতে যে সকল ধর্মগুরু প্রাচীনতম কাল হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেব এবং তাঁহার ধর্ম সম্পর্কে যত কথা বলিয়াছেন, আর কাহারও সম্পর্কে তত কথা বলেন নাই। অথচ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের মৌলিক বিরোধ ছিল। গ্রন্থকর্ত্রী তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গ্রন্থে বুদ্ধ জীবনের মহৎ আচরণ, বৌদ্ধযুগের মহৎ ঘটনা, বুদ্ধশিষ্যগণের সুমহান্ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কাহিনী কীর্তিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কতখানি সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছেন, গ্রন্থকর্ত্রী তাহা মূল গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করিয়া বিচার করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যাইবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব কাব্যাদর্শ অনুযায়ী ইহাদিগকে কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।

রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ সাহিত্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে 'রাজা' এবং 'অচলায়তন' নাটক দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র নাটকের রস-বিচারের পক্ষে এই তথ্য যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সুতরাং সকল দিক হইতেই বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধচর্চার একখানি কোষগ্রন্থ (encyclopaedia) রূপে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য। এই অসাধারণ শ্রমসাধ্য গ্রন্থখানি রচনার জন্য গ্রন্থকর্ত্রী অভিনন্দনযোগ্য।

ভারতীয় ভাষা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কার্তিক, ১৩৭৫ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ভূমিকা

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি

আনুমানিক খৃঃ ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশ গৌড়, বঙ্গ, সুহ্ম, বজ্র, তাম্রলিপ্ত, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি আঞ্চলিক নামে বা জনপদের নামে পরিচিত ছিল। সমগ্র বাংলাদেশের পরিচয়বহনকারী কোন সাধারণ নামের ব্যবহার ছিল না। প্রাচীন জনপদসমূহ পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া বিরোধ-মিলনের মধ্যে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের সময়ে প্রথম ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল এবং 'চতুরুদধি-সলিল-বীচী-মেখলানিলীলায়াং সদ্বীপগিরি পত্তনবত্যাং'[১] রূপে অভিহিত বঙ্গদেশ কেবল পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ নামক তিনটি জনপদে খ্যাত হইয়াছিল। পাল ও সেন রাজত্বকালেও একটিমাত্র নামের দ্বারা বিভিন্ন জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলিয়াছে এবং গৌড় প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে। অবশেষে পুণ্ড্রবর্ধন ও গৌড়ও অবলুপ্ত হইয়া সমগ্র বাংলাদেশ কেবল বঙ্গদেশ নামেই পূর্ণতম পরিণতি ও পরিচয় লাভ করিয়া ভারতবর্ষের ভৌগোলিক কাঠামোর মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থেই সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাদেশ অর্থে 'বাঙ্গালা' নামের প্রয়োগ পাওয়া যায়।[২] 'বঙ্গ' শব্দ সংস্কৃত-জাত নহে। অনেকে মনে করেন 'বঙ্গ' তিব্বতী 'Bans-po' বা 'বঙ্‌স' শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। 'বঙ্‌স' অর্থ 'wet and moist'[৩] অর্থাৎ জলা ও নীচু। খালবিল সমাকীর্ণ নদীমাতৃক দেশের নাম বঙ্‌স>বঙ্গ হওয়াই সম্ভব।

মানব ইতিহাসের কোন্ স্মরণাতীত কালে বাংলাদেশে লোকবসতি শুরু হয় তাহা বলা কঠিন। পৃথিবীর সর্বত্র মানবসভ্যতা বিবর্তনের যে ধারাকে অনুসরণ করিয়াছে বাংলাদেশও সেই একই ধারায় অভিযান করিয়াছে। আদিম সভ্যতার নিদর্শন প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্রও বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরবর্তীযুগে আর্যগণ ভারতবর্ষের পঞ্চনদের তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু কোন্ সুদূর অতীতে বাংলার দিক্‌চক্রকে উদ্‌ভাসিত করিয়া আর্যসভ্যতার উষালোকের প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে বহুদিন আর্যসভ্যতা বাংলাদেশে

১. Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 143-44
২. Ain-i-Akbari, Tr. by, Jarret, Vol. 111 pp. 120, 141.
৩. S. C. Das, Tibetan English Dictionary, p. 864.

প্রবেশাধিকার পায় নাই, তাহার বহু নিদর্শন রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদ রচনাকালে আর্য ঋষিগণ বাংলাদেশ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। ঐতরেয় আরণ্যকেই প্রথম স্পষ্ট ভাবে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।[১] উন্নাসিক আর্যাভিমান বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদের অধিবাসীদের পক্ষীকল্প বা পাখীর ন্যায় অস্পষ্ট ভাষী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। অথর্ববেদের ব্রাত্যস্তোত্রে অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীদের শুধু যে ব্রাত্য বা পতিত শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহাই নয়, দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহারা যেন জ্বরে ভুগিয়া মরে। যজুর্বেদেও মগধের অধিবাসীদের বলিরূপে প্রদান করার প্রসঙ্গ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'পুণ্ড্র'নাম আর্যসীমানার বহির্ভূত দস্যুনামধারী জাতির তালিকায় স্থান পাইয়াছে। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে আরট্ট, সৌবীর, কলিঙ্গ ও বঙ্গবাসীদের ধর্মচ্যুত—'সংকীর্ণযোনয়ঃ' বলা হইয়াছে। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থ পুণ্ড্র গৌড়-বঙ্গ-সমতট ও হরিকেল জনপদের ভাষাকে অসুরভাষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই সমস্ত প্রাচীনতম গ্রন্থে পূর্বাঞ্চলের ভাষা, অশন, বসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের প্রতি প্রবল অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু আর্য-জাতির এই দর্পিত মনোভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। জাতিধর্ম, সমাজ, ভৌগোলিক ব্যবধান, আচার-ব্যবহার সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া দুঃসাহসী অভিযাত্রীদল পূর্বাঞ্চলে আসিয়াছে এবং প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে আর্যভাষাভাষী ও আর্য-সংস্কৃতিসম্পন্ন অভিযাত্রীদলের সঙ্গে আচারে-ব্যবহারে সভ্যতা সংস্কৃতিতে ও ভাবভাষায় বিপরীতধর্মী অনার্যদের সংযোগ ঘটিয়াছে। প্রথম দিকে অবশ্য বিরোধ-মিলনের মধ্য দিয়াই এই সংযোগ ঘটিয়াছিল। মহাভারতের জরাসন্ধের কৃষ্ণবিরোধিতায়, কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয়ে, রামায়ণে রঘুর দিগ্বিজয়ে এবং আচারাঙ্গসূত্রে মহাবীরের রাঢ়দেশে ধর্মপ্রচারের কাহিনীতে সেই বিরোধ ও সংঘাতের রেশ পাওয়া যায়। মহাকাব্যের যুগে আর্যাভিমান সংযত হইয়া আসিয়াছে এবং বাংলাদেশের আর্যীকরণ শুরু হইয়াছে।[২] মহাভারতের অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমস জাতি ও সমাজের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার পাঁচটি পুত্র—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। পরে এই পাঁচটি পুত্রই

১। "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গবগধাশ্চেরপাদাস্তন্যা অর্কমভীতো বিবিশ্র ইতি।" ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১

2. 'The Aryanization of Bengal may be said to have commenced in right earnest from the closing centuries of the first millennium B. C",

—R. C. Majumder, History of Bengal, Vol. I, ch. XII. p 376.

পাঁচটি জনপদের অধিকারী হইয়াছেন। এই মিলন ও মৈত্রী অভিযানের প্রথম পথিকৃৎ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিশ্বামিত্র ঋষির অভিশপ্ত পুত্রগণ। বিশ্বামিত্র শুনঃশেপ নামক কোন ব্রাহ্মণ বালককে যজ্ঞবলি হইতে রক্ষা করিয়া দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ঋষির পঞ্চাশজন পুত্র পিতার কাজের বিরোধিতা করিলে তিনি অভিশাপ দিয়াছেন—'তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণ পৃথিবীর শেষ সীমানা অধিকার করিয়া বাস করিবে।' এই অভিশপ্ত ঋষিপুত্রদের সন্তান-সন্ততিরাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, পুলিন্দ, শবর ও মূতিব নামে অভিহিত জাতিনিচয়। রামায়ণে প্রাচীন বঙ্গের রাজন্যগণ অযোধ্যার রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। জৈন আচারাঙ্গসূত্রে লাঢ়দেশে জৈনধর্ম প্রচারক মহাবীরের চরম দুঃখ, কষ্ট ও বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া ধর্ম প্রচারের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলের জনগণ তাঁহার প্রতি চরম দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। এই দেশের অশন-বসন, জীবনযাপন ও আবহাওয়া কোনটাই জৈনদের মনঃপূত হয় নাই। পথহীন 'লুকথ' লাঢ়দেশে ভ্রমণ করা যে কত কষ্টকর তাহাও সূত্রকার সক্ষোভে বিবৃত করিয়াছেন।[১] যে বঙ্গদেশবাসী জৈনধর্ম প্রচারকদের কুকুর লেলাইয়া দিয়া, ঢিল ছুঁড়িয়া নির্যাতনের একশেষ করিয়াছিল এবং পথে পথে 'এম্রাও পরং পলেহি' অর্থাৎ এখান হইতে ফিরিয়া যাও ধ্বনি তুলিয়াছিল সে দেশ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা প্রণিধানযোগ্য। সঠিক বলা যায় না সর্বপ্রথম কোন্ সময়ে বাংলাদেশ শাক্যসিংহের ধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তবে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির আনুকূল্যে সঞ্জীবিত হইয়া অচিরকাল মধ্যে বাঙালী রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে, ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে, চিত্রকলায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে এককথায় জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও প্রগতির পথে সুদৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 'বৌদ্ধ যুগের বাঙালীর ইতিহাস বাঙালীর আত্মজাগরণের ইতিহাস। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস লইয়া যদি বাঙালীর কিছু গৌরব করিবার থাকে তবে সে ইতিহাস রচিত হইয়াছে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের যুগে। বৌদ্ধপর্বের বাঙালীর শিল্প ও সাহিত্যসাধনার মধ্যেই সে যুগের বাঙালীর মনোলোকবাসী আত্মচেতনার ঐশ্বর্য জটানির্মুক্ত ভাগীরথীর ন্যায় অজস্রধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক নলিনীনাথ দাশগুপ্ত অনুমান করিয়াছেন, বুদ্ধদেবের জীবিতকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার স্বপক্ষে তিনি বহু যুক্তিও

১। Walther Schubring, Ācārāṅga Sūtra, 1910, pp 42-44,

আহরণ করিয়াছেন।[১] বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ভারত ষোড়শ মহাজনপদে বিভক্ত ছিল। কিন্তু বঙ্গ নাম ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় পাওয়া যায় না।[২] মহাপরিনির্বাণের পর ভগবান বুদ্ধের পূতাস্থি লাভ করিয়াছিল যে কয়টি ভাগ্যবান্ রাজ্য তাহার তালিকায়ও বাংলা দেশ স্থান পায় নাই এবং বুদ্ধদেবের প্রধানশিষ্য বা উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে বাঙালী কেহ ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। অবশ্য মহাপরিনির্বাণের অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের ক্ষীণ ইঙ্গিত বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই তথ্যসমূহও কবিকল্পনার দ্বারা রঞ্জিত, ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিশুদ্ধিকৃত নয়। অধ্যাপক দাশগুপ্ত এই অনৈতিহাসিক কাহিনীগুলিকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের আদি যুগে স্থান দিয়াছেন। আদি যুগের এই কাহিনীসমূহ ইতিহাসস্বীকৃত তথ্য নয় ঠিকই, কিন্তু সেই সুপ্রাচীন কালেও বৌদ্ধ কবি ও মনীষীরা যে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সংযুক্ত নিকায়েও 'শেতক' শহরের নাম পাওয়া যায়। 'তেলপত্ত'[৩] জাতকে বলা হইয়াছে বুদ্ধদেব সুম্ভের অন্তর্গত 'দেসক' শহরে অবস্থান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গে সুহ্মগণই 'সুম্ভ' নামে অভিহিত হইয়াছে। অঙ্গুত্তরনিকায়েও একজন বৌদ্ধ আচার্য 'বঙ্গন্তপুত্ত' নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই আচার্য সম্ভবতঃ বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। দিব্যাবদান ও অশোকাবদানে পুণ্ড্রবর্ধনের নাম পাওয়া যায়[৪]। বুদ্ধের গৃহীশিষ্য অনাথপিণ্ডদ তাঁহার কন্যা সুমাগধাকে পুণ্ড্রবর্ধনবাসী এক যুবকের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। সুমাগধা স্বামীর দেশে আসিয়া এদেশের ধর্মকর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয়ে বিব্রতবোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধ্যানে বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিলেন। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার অন্তর্গত 'সুমাগধা' অবদানেও এই কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন পালি সাহিত্যে এই কাহিনীর অনুরূপ কোন ঘটনা বিবৃত হয় নাই। বুদ্ধদেব তাঁহার সুদীর্ঘ ৮০ বৎসর জীবিত কালের মধ্যে অধিকাংশ সময়—প্রায় ৪৫ বৎসর ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সময় কোন্ রাজ্যে কত বৎসর করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার শিষ্য আনন্দ সারিপুত্ত প্রভৃতির বর্ণনায় পাওয়া

১। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম—আদিযুগ, পৃঃ ৩১-৪১।

২। পালি অঙ্গুত্তরনিকায় ইহার ব্যতিক্রম। দ্রঃ Aṅguttara Nikāya, Part I. ed. Morris 1885, p 218,

৩। Fausboll, Jataka, Vol, 1, no. 96, p 898.

৪। দিব্যাবদানম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, কুণালাবদানম্, পৃঃ ২৫৮।

যায়। চুল্লবগ্‌গ নামক পালি গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় সংগীতির যে বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে এবং সিংহল দেশীয় মহাবংস ও দীপবংস প্রভৃতি সাহিত্যে তৃতীয় বৌদ্ধসংগীতির যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে রাজগৃহ, বৈশালী ও পাটলীপুত্রের তিনটি মহাসংগীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এইখানে উল্লেখযোগ্য এই যে বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষুগণ এই সঙ্গীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন বঙ্গদেশবাসীর উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। 'দেবানং পিয়' অশোকের রাজত্বকালে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মপ্রচারের একটি কাহিনী পাওয়া গিয়াছে। কাহিনীটি কাল্পনিক হইলেও বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রথম যুগের সংঘাত ও আলোড়নের ইঙ্গিত বহন করে। কাহিনীটি এই—পুণ্ড্রবর্ধনে একজন বৌদ্ধধর্মবিরোধী নির্গ্রন্থ উপাসক ছিলেন। একসময়ে তাঁহার বৌদ্ধ বিদ্বেষ এত প্রবল হইয়াছিল যে তিনি নির্গ্রন্থের পদতলে বুদ্ধদেবের এক প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়াছিলেন।[১] সমস্ত রাজ্যে এই ব্যাপারটা একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। সংবাদটি অশোকের কানে যাইতেও বিলম্ব হইল না। তিনি ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন। দিব্যাবদান এই পুণ্ড্রবর্ধনবাসীর প্রতি অশোকের যথোপযুক্ত শাস্তির কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার বর্ণনা দিয়াছে—'পুণ্ড্রবর্ধনে সর্বে আজিবিকাঃ প্রঘাতয়িতব্যাঃ। যাবদ একদিবসে অষ্টাদশসহস্রাণ্য আজিবিকানং প্রঘাতিতানি।"[২] অপরাধী নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের একজন উপাসক, রাজরোষের উদ্যত খড়্গ নামিয়া আসিল আজীবিক সম্প্রদায়ের অগণিত উপাসকের শিরে—এই কাহিনী যতই নৃশংস ও ক্রোধান্ধতার পরিচায়ক হউক না কেন ইহার দ্বারা অশোক-যুগেও পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসারের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এই কাহিনী সত্য হইলে সম্রাটের নৃশংস অত্যাচারে পুণ্ড্রবর্ধনের জনগণের বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করাই স্বাভাবিক। অবশ্য পরবর্তীকালে এই হৃদয়হীন অশোকই 'সব পানিনাং হিতানুকম্পী' ধর্মাশোকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—'আৎপ্‌পাসংডপূজা ব পরপাসংডগরহা ব নো ভবে……পূজেতয়া তু এব পরপাসংডা ……এবং কুরুং আৎপপাসংডং চ বচয়তি, পরপাসংড চ উপকরোতি। তদংঞথা করোতো আৎপপাসংডং চ ছণতি পরপাসংডস চ পি অপকরোতি।"[৩]

১, ২। দিব্যাবদানম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, বীতশোকাবদানম্ পৃঃ ২৭৭

৩। শিলানুশাসন ১২।

সেইদিন বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীর বাণী ভারতবর্ষের তটরেখাকে প্লাবিত করিয়া বহির্ভারতকেও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং অশোকের রাজ্যসীমানার অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনের দিক্‌মণ্ডলও সেই মহাজাগরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্‌ও লিখিয়াছেন তিনি বাংলাদেশের চারিটি অংশে—পুণ্ড্রবর্ধনে, সমতটে, কর্ণসুবর্ণে ও তাম্রলিপ্তিতে অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তূপ দেখিয়াছেন। পুণ্ড্রবর্ধনে সদ্ধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণের শিলালিপিগত প্রমাণ মধ্যভারতের সাঁচীস্তূপের তোরণগাত্রেও পাওয়া গিয়াছে। এই বিপুলায়তন স্তূপের নির্মাণকার্যে মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়া এই শিল্পকার্যকে যুগোত্তীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল যে বদান্য জনগণ সেই তালিকায় সুদূর পুণ্ড্রবর্ধনের দুইজন উপাসিকার নামও স্থান পাইয়াছে। 'ধমতায় দানং পুঞ্জবদনিয়ায়ে'[১] (পুণ্ড্রবর্ধনের ধর্মদত্তার দান) এবং 'ইসিনদনস দানং'[২] এই শিলালিপিদ্বয়ে ধর্মদত্তা ও ঋষিনন্দন বাঙালীর শিল্পসাধনা ও সদ্ধর্মপ্রীতির পরিচয় বহন করিয়া আমাদের সেই অতীতের স্মরণতীর্থে উপনীত করিয়া দেয়। খৃঃ প্রথম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ সাহিত্যে ও স্থাপত্যে এমন বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যাহা দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ হয়, এই সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে এবং ভারতব্যাপী বৌদ্ধ চিন্তানায়কগণও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে আর অনবহিত নহেন। খৃঃ পূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে খোদিত নাগার্জুনীকোণ্ডা শিলালেখমালায় ভারতবর্ষের প্রধান বৌদ্ধ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে 'বঙ্গ' প্রথম স্থান পাইয়াছে।[৩] মহাবস্তু গ্রন্থের লেখক বঙ্গলিপির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ললিতবিস্তরে আছে রাজকুমার সিদ্ধার্থ অধ্যাপক বিশ্বামিত্রের নিকট অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ লিপিও শিক্ষা করিয়াছিলেন।[৪] খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে দ্বাদশজন মহাস্থবির অক্ষয়কীর্তি ও চারিত্রিক ঔদার্যের জন্য সমস্ত বৌদ্ধজগতে পূজা পাইয়াছিলেন। সেইদিন 'কালিক' নামে একজন বাঙালীও এই স্থবিরমণ্ডলীর অন্তর্গত ছিলেন।[৫] খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই যুগের অনুকূল পরিবেশে এবং উদার আবহাওয়ায় ভারতীয় মনীষার গৌরবচ্ছটা দিকে

১। Epigraphia Indica, Vol. II, no. 102, p 108. ২। Ibid. p 380. no 217.

৩। Epigraphia Indica. Vol, XX, p 22

৪। ললিতবিস্তর, মিথিলা ইন্‌ষ্টিটিউট, লিপিশালাসন্দর্শন পরিবর্তঃ, পৃঃ ৮৮

৫। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ৪০।

দিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্মে, দর্শনে, কাব্যে, নাটকে, জ্যোতিষে, গণিতে, স্থাপত্যে ও চিত্রকলায় গুপ্তযুগ ভারত-ইতিহাসের পাতায় এক অনুপম স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। গুপ্ত নরপতিগণ ছিলেন পরম ভাগবত বৈষ্ণব, কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামী তাঁহাদের ছিল না। এই সময় বিষ্ণুর অবতাররূপে ভগবান বুদ্ধও ব্রাহ্মণ্য দেবমন্দিরে এবং ধর্মীয় সাহিত্যে স্থান পাইয়াছেন। আপন আপন ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা ও পরমতসহিষ্ণুতার নিরাপদ আবহাওয়ায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সমন্বয় প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং লিখিয়াছেন—মহারাজা শ্রীগুপ্ত চীনদেশীয় শ্রমণদের জন্য মৃগস্থাপন স্তূপের নিকট 'চীন মন্দির' নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মৃগস্থাপন স্তূপ বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গে অবস্থিত।[১] ঐতিহাসিকগণ এই শ্রীগুপ্তকে গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শ্রীগুপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গুপ্তযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারণের নিদর্শনস্বরূপ কিছু মূর্তিশিল্প এবং তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজশাহী জেলার বিহারৈল গ্রামে ও বগুড়া জেলার মহাস্থানে বুদ্ধমূর্তি ও কয়েকটি মহাযানী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। সুচারু গঠন সৌষ্ঠব, কমনীয় দেহশ্রী ও স্থির প্রশান্ত সৌন্দর্যের দ্যোতকরূপে এই শিল্পকর্মসমূহ গুপ্তযুগের প্রতিমা শিল্পের লক্ষণসমন্বিত। গুপ্তনৃপতি মহারাজ বৈন্যগুপ্তের রাজত্বকালের একটি অনুশাসন ত্রিপুরা জেলার গুনাইঘর গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২] বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এই নৃপতি ছিলেন 'মহাদেবপাদানুধ্যাত' অর্থাৎ শৈবধর্মী, কিন্তু তিনি তাঁহার সামন্ত মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় (ত্রিপুরা জেলা) মহাযানী বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্য ভূমি রাজস্ব দান করিয়াছিলেন। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (৩৩৯-৪১৪ খৃঃ অঃ) আর্যাবর্ত ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি দুই বৎসর তাম্রলিপ্তি বন্দরে বাস করেন। এই জ্ঞানতাপস পরিব্রাজক এই সময়টা এ দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থের প্রতিলিপি এবং দেবমূর্তির চিত্র সংকলনে ব্যাপৃত ছিলেন।[৩] এই তথ্যটি গুপ্তরাজত্বকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধসাহিত্য ও শিল্পের ব্যাপক প্রসারতা ও উৎকর্ষের ইঙ্গিত বহন করে।

১। History of Bengal, Vol 1, op. cit. pp 69-70.

২। Indian Historical Quarterly, vol. VI p. 40.

৩। বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। পৃঃ ৩৬৯।

খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধ নৃপতি হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় বাংলাদেশের দিক্‌চক্ররেখাকে উদ্ভাসিত করিয়া আর একবার আত্মজাগরণ দেখা দেয়। এই জাগরণের হোতা গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক। এই সময়ের বাংলাদেশের ইতিহাস রণডঙ্কামুখর। হর্ষবর্ধনের সহিত শশাঙ্কের বিরোধিতা চরমে উঠিয়াছিল। রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দেশব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ এবং অশান্তির মধ্যে সপ্তম শতাব্দী বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। হুয়েন সাঙ লিখিয়াছেন—এই সময়ে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছে। বাংলার বিভিন্ন অংশে—কজঙ্গল পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তিতে সত্তরাধিক সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম ও বহু বৌদ্ধস্তূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[১] এই সমস্ত সঙ্ঘারামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় আট হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন। শশাঙ্ক বাংলাদেশের এই সমস্ত বৌদ্ধমন্দির ও কীর্তিকলাপের ধ্বংসসাধন করিয়াছেন বলিয়া হুয়েন সাঙ উল্লেখ করেন নাই। তিনি যদি প্রকৃতই বৌদ্ধবিদ্বেষী 'গৌড়ভুজঙ্গ' হইতেন তবে অবশ্যই বঙ্গ, রাঢ় ও বরেন্দ্রে বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারণে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেন। হুয়েন সাঙের উল্লেখিত শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ সম্বন্ধে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখিয়াছেন—In any case, the condition of Buddhism in Bengal and Bihar, as depicted by the pilgrim does not allow us to believe that any serious persecution had take place shortly before his time, and Buddhism in the very capital of Śaśāṅka in Karṇasuvarṇa was in a flourishing state."[২] অবশ্য শশাঙ্ক কর্তৃক গয়া ও কুশীনগরের বৌদ্ধদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ মনে করেন যে গয়া ও কুশীনগরের বৌদ্ধগণ হর্ষবর্ধনের পক্ষ অবলম্বন করার জন্যই শশাঙ্ক তাহাদের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভগবান বুদ্ধের উপাসনা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইয়াছে।[৩] সমসাময়িক যুগের বাঙালী মনীষার দুই গৌরবোজ্জ্বল স্তম্ভ প্রখ্যাত বৌদ্ধাচার্য শীলভদ্র এবং বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী। শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের কৃতি ছাত্র ও সুযোগ্য অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ ধর্মপালের আদেশে অন্তেবাসিক শীলভদ্র দক্ষিণভারতের দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে

১। বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৬০৫-৬০৬ ; P. L. Paul, Early History of Bengal, vol. II, pp 78-74.

২। History of Bengal, Vol. I, op. cit, p. 416.

৩। গৌড়রাজমালা, রমাপ্রসাদ চন্দ, পৃঃ ১৩।

তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই শীলভদ্রের নিকট সমগ্র ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত তাঁহার আস্পর্ধিত শির অবনত করেন। সেই দিন সেই অরিন্দমের চরণতলে একটি রাজ্যের সমস্ত রাজস্বই রাজ অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়। কিন্তু বাসনাজয়ী ভিক্ষু এই রাজ-ঐশ্বর্য লইয়া কী করিবেন? অবশেষে এই অর্থে মগধে একটি সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] আচার্য চন্দ্রগোমীর অন্যতম কীর্তি তাঁহার 'চান্দ্রব্যাকরণ'। ব্যাকরণে তিনি চান্দ্রনীতির প্রবর্তকরূপে খ্যাত। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চৈনিক ভ্রমণকারী ইৎ-সিং একবার তাম্রলিপ্তিতে বাস করেন। তিনি লিখিয়াছেন এই সময়ে তাম্রলিপ্তিতে 'বরাহ বিহার' নামে একটি সঙ্ঘারাম ছিল। এই সঙ্ঘারামের তরুণ বাঙালী শ্রমণ রাহুলমিত্রের বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানগরিমার গৌরবচ্ছটা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

খৃঃ অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে পূর্ববঙ্গে ২।৩টি বৌদ্ধ রাজবংশের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গে ও সমতটে খড়্গ বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজ দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তাম্রফলকের লিপিতে এই বংশের চারিপুরুষের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ এবং রাজরাজভট।[২] চৈনিক পরিব্রাজক সিংচি সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই বংশের রাজভট[৩] পরম সৌগত ত্রিরত্নের উপাসক ছিলেন। রাজভট প্রত্যহ বুদ্ধদেবের একলক্ষ মৃন্ময় মূর্তি গড়াইতেন এবং মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের একলক্ষ শ্লোক পাঠ করাইতেন। তিনি থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের মত পরম দানশীল রাজা ছিলেন। বুদ্ধদেবের সম্মানার্থে রাজভট সুসজ্জিত বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিতেন। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমা, পশ্চাতে শত শত শ্রমণ আর সর্বশেষে থাকিতেন রাজভট। সিংচির[৪] বিবরণীতে উল্লেখিত রাজভট এবং খড়্গরাজবংশের চতুর্থরাজা রাজভট এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। খড়্গ রাজবংশের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সমর্থনে সমতটে বৌদ্ধধর্ম গৌরবের উচ্চশিখরে আরূঢ় হইয়াছিল। এই রাজবংশের প্রতীক ছিল অর্হৎগণের বাহন বৃষ। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও অন্যধর্মের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও

১। বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৬৮৪।
২। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, no. I, p. 85.
৩। History of Bengal, vol. 1. p. 414.
৪। P. L. Paul, The Early History of Bengal, Vol. II., pp. 74—75.

আনুকূল্যের অভাব ছিল না। দেবখড়্গের মহিষী প্রভাবতী অষ্টধাতু নির্মিত একটি সর্বাণী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[১] ত্রিপুরা জেলার দেউলবাড়ীতে মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছে। খড়্গরাজগণের পরে পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ নৃপতি মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব হরিকেলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী শিবের উপাসিকা ছিলেন। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁহার প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

দশম শতাব্দীর শেষাংশে পূর্ববঙ্গে অন্য একটি বৌদ্ধরাজবংশ প্রতিপত্তি লাভ করে। ইহারা চন্দ্রবংশীয় নৃপতি। এই বংশের পূর্বপুরুষ রোহিতাশ্ব পর্বতের অধিপতি পূর্ণচন্দ্র এবং শ্রেষ্ঠপুরুষ 'পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' শ্রীচন্দ্র। মহারাজ শ্রীচন্দ্রের কয়েকটি পট্টোলী পাওয়া গিয়াছে। যুগল মৃগমূর্তি ও ধর্মচক্র ইহাদের রাজকীয় প্রতীক ছিল। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনসমূহের প্রথম শ্লোকেই[২] ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইয়াছে। পালযুগে কম্বোজনামে আরো একটি রাজবংশ উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বংশের 'কম্বোজবংশতিলক মহারাজাধিরাজ' রাজ্যপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। অর্ধশায়িত উন্নতশির মৃগমূর্তিসম্পৃক্ত ধর্মচক্র এই বংশেরও রাজকীয় প্রতীক ছিল।[৩] পাল নৃপতিগণের ন্যায় খড়্গ-চন্দ্র-কম্বোজ বংশীয় নরপতিগণও হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম সমন্বয়ে সহায়তা করিয়াছেন।

খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ বাঙালীর ইতিহাসের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। এই যুগ মাৎস্যন্যায়ের যুগ।[৪] এই সময় দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা, ক্ষমতার লড়াই ও পরস্পর হানাহানিতে দেশের অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিপর্যস্ত, মুহ্যমান ও হতমান হইয়া পড়িলেও বাঙালী তাহার চিন্ময় প্রাণসত্তাকে হারাইয়া ফেলে নাই। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার জনগণ গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌড়মণ্ডলে পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে গোপালদেবের রাজপদ প্রাপ্তির বিবরণ প্রদত্ত

১। Epigraphia Indica, Vol. XVII, p. 357.

২। Ins. of Bengal, Vol. III, ed, N. G. Majumder pp. 4, 11.

৩। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ৮০।

৪। তারানাথ লিখিয়াছেন—"In Odiviśa, in Bengal and in the other five provinces of the east, each Kshatriya Brahman and merchant constituted himself a king of his surroundings, but there was no King ruling the country."
The Indian Antiquary. Vol. IV, pp. 365—366.

হইয়াছে—মাৎস্যন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে জনগণ বপ্যটতনয় গোপালকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়াছিলেন।[১] গোপালদেবের সিংহাসন প্রাপ্তিতে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, মদনপালের অবসানে সেই রাজশক্তির পতন। এই সুদীর্ঘ চারিশত বৎসরকাল বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বিদ্যায়, ধর্মে, আচরণে, এবং শিল্পকলার অনুশীলনে প্রবর্তনা জাগাইয়া পাল নৃপতিগণ সোনার কাঠির যাদুস্পর্শে অর্ধশতাব্দীর সম্মোহিত বাঙালী জাতিকে আবার জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। নবজাগ্রত সেই জাতি কেবল জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনটি অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, প্রায় চারি শত বৎসর সমগ্র ভারতবর্ষকে উন্নত ধ্যানধারণা, সামগ্রিক জীবনবোধ ও শিল্প-চেতনায় নব নব কীর্তির পথেও পরিচালিত করিয়াছে। পালনৃপতিগণ পরম সৌগত মহাযান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের তাম্রশাসনসমূহের প্রারম্ভিক বুদ্ধ প্রশস্তি এবং তাম্রশাসন ও রাজমুদ্রার ধর্মচক্র ও ধর্মচক্রের উভয়পার্শ্বস্থ মৃগমূর্তি এই মতের পরিপোষকতা করে। বৌদ্ধধর্মের প্রধান তত্ত্ব 'ক্ষান্তি' বা 'খন্তি'কে পালনৃপতিগণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন। অশোকও ধর্মবিষয়ে সমস্ত সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া এই নীতিকেই তাঁহার রাজ্য পরিচালনার মূলনীতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হৃদয়ের প্রসারিত ক্ষান্তি ও মৈত্রী যাহা মৌর্য সম্রাটের হৃদয়কে অভিসিঞ্চিত করিয়াছিল, পালযুগে সেই ক্ষান্তি ও অনসূয়া কেবল রাজহৃদয়েই নিবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জও এই নীতিকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং হিন্দু-বৌদ্ধ একে অন্যকে হৃদয়ের অতি সন্নিকটে আহ্বান করিয়া লইয়াছিল। একের সুর-সঙ্গতি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অতি সহজে,অতি স্বচ্ছন্দে অপরে নিজকে সমন্বিত করিতে কোনও বাধা পায় নাই। এইখানেই পালযুগের বৈশিষ্ট্য, শুধু পালযুগেরই নয়, বাঙালীর স্বকীয়তাও এইখানেই। ধর্মবিষয়ে এই উদারতা ও অনসূয়াপরতন্ত্রতা বাঙালী কেবল আদর্শের ভাবলোকেই নিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। আচরণে, কর্মে ও চিন্তায় তাহাকে প্রতিফলিত করিয়াছে। তাহার ফলে বাঙালীর সৃষ্টি তাহার সাহিত্য, তাহার শিল্পকলা এক নূতন দীপালোকে শাশ্বত কালের জন্য চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। পালপর্বের বাঙালীর মানসিক কাঠামো বুঝিবার পক্ষে তাহাই পর্যাপ্ত মনে হয়।

১। Epigraphia Indica, Vol. IV, p. 248, গৌড় লেখমালা, পৃঃ ৯।

কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেবের কাব্যে বুদ্ধকে যে স্বাগত জ্ঞাপন করা হইয়াছে পাল পর্বের ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সেই আহ্বান জ্ঞাপনের জন্য মানসপ্রস্তুতি শুরু হইয়াছে। পাল পূর্ববর্তীযুগে রচিত 'বৃহৎসংহিতা' ও 'মানসার' গ্রন্থে বুদ্ধ প্রতিমা নির্মাণকৌশল লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে বৌদ্ধ দেবতা স্থান পায় নাই। পাল যুগের উদার আবহাওয়ায় ব্রাহ্মণ্য দেবতাগণ আপন দেবায়তনের মধ্যে বৌদ্ধ দেবতাকে ঠাঁই করিয়া দিয়াছে আবার নিজেরাও নিঃসঙ্কোচে বৌদ্ধ দেবায়তনে প্রবেশ করিয়াছে। সরস্বতী মঞ্জুশ্রীর শক্তিরূপে পরিগণিতা, বৌদ্ধ বাগীশ্বরী সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা, তাঁহার একহস্তে কুঠার যাহা দ্বারা তিনি অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করেন। ব্রাহ্মণ্য সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কুবের বৌদ্ধমণ্ডলীতে লম্বোদর, খর্বকায়, মুদ্রাভাণ্ড ও রত্নোদ্গীর্ণ নকুলসহ 'জম্ভল' নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র পূর্বাদেশাধিপতি বজ্রধর, বৌদ্ধ কুলদেবী তারা ব্রাহ্মণ্য কালী, দুর্গার নামান্তর। দশমহাবিদ্যার অন্যতমারূপে ভৈরবীচক্রেও বৌদ্ধ তারাদেবী স্থান করিয়া লইয়াছেন। সাধনমালায় তারাদেবী, গিরিদুহিতা উমা, দেবী পদ্মাবতী একই দেবীরূপে কল্পিতা হইয়াছেন।[১] শ্মশানকালী ভস্মবিভূতিকায় ব্রাহ্মণ্য ভৈরব বৌদ্ধায়তনে 'সর্বাঙ্গমহারাগরক্তং' ত্রৈলোক্যভস্মঙ্কর। ব্রাহ্মণ্য নীলকণ্ঠ মহাদেব যিনি সমুদ্রমন্থনজাত হলাহল কণ্ঠে ধারণ করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন বৌদ্ধ দেবায়তনে তিনি 'ব্যাঘ্রচর্মাম্বরধরং' 'নীলগুটিকাবিশিষ্টকণ্ঠং' বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের রূপভেদ—নীলকণ্ঠ।[২]

একাদশ শতাব্দীতে জাভায় বিষ্ণুবুদ্ধ ও শিববুদ্ধ যুগলমূর্তি পরিকল্পনা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল।[৩] মহারাজ দেবপালের রাজত্বকালে জাভার শৈলেন্দ্রবংশীয় নরপতি বালপুত্রদেবের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটিয়াছিল[৪] তাহারই পরিণতিস্বরূপ 'শিববুদ্ধ', 'বিষ্ণুবুদ্ধ' প্রভৃতি মূর্তির পরিচিন্তন জাভায় উপনীত হওয়া অসম্ভব নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত শিবলোকেশ্বর মূর্তি 'শিববুদ্ধ' পরিচিন্তনে বাঙালীই দিশারী বলিয়া অনুমান করিতে সাহায্য করে। মূর্তিটি[৫] বরিশাল জেলার

১। বাঙালীর ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১৫।

২। B. Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 1958, p. 140

৩। Eliot, Hinduism and Buddhism, Vol. III, pp. 118, 114, 181.

৪। K. A. Nilakanta Sastri, History of Sri Vijaya, pp. 55—57, 125—126

৫। ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বাংলার ভাস্কর্য' ১৯৪৭, পৃঃ ১১, ত্রয়োদশ চিত্র।

কেশবপুরে পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানক ধাতুময় মূর্তিটি দ্বিভুজ অর্ধ নিমীলিত দৃষ্টি, ঢলঢল মুখমণ্ডল প্রসন্ন, মৃদুহাস্যোজ্জ্বল, সুদীর্ঘ কমনীয় দেহকান্তি, প্রভাবলীতে ছোট একটি বুদ্ধমূর্তি—ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট। সমগ্র মূর্তিটির পরিকল্পনায় ও অলঙ্করণে পালশিল্পীর পরিমার্জিত রুচিবোধ ও আধ্যাত্মিকভাবের গভীরতা সুস্পষ্ট। প্রতিমার প্রভাবলীতে ছোট ছোট আকারের মূর্তি খোদাই বা অঙ্কনের পরিকল্পনা বৌদ্ধ প্রতিমা শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই রীতির অনুসরণ করিয়া শিল্পিগণ ব্রাহ্মণ্য প্রতিমার প্রভাবলীকেও অলঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে। 'শিববুদ্ধ' ও 'বিষ্ণুবুদ্ধ' অদ্বৈত প্রতিমা নির্মাণ ও পরিচিন্তন ভারতীয় শিল্পে ও সাহিত্যে স্থান লাভ না করিলেও শিব ও বিষ্ণুর প্রভাবলীতে ধ্যানীবুদ্ধের অবস্থিতি বাংলার জনমানসের উপর বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব স্মরণ করাইয়া দেয়।

বুদ্ধদেবকে প্রতিমায় রূপদান করিতে গিয়া বাঙালী শিল্পী সুন্দরের সাধনায় কতখানি আত্মনিষ্ঠ ও তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন বাংলা দেশে আবিষ্কৃত শৈল ও ধাতব বুদ্ধপ্রতিমাসমূহ তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বিহারৈলে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তিটি বাংলায় আবিষ্কৃত প্রথম বুদ্ধপ্রতিমা।[১] বাংলাদেশের অধিকাংশ বুদ্ধপ্রতিমা ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় সমাসীন। ভগবান শাক্যসিংহ গৌতম বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন। তাঁহার মুদ্রিত আঁখির দৃষ্টি নাসিকাগ্রে সংবদ্ধ, সমগ্র মুখমণ্ডল ধীর, প্রশান্ত। 'হয়ত আমি বোধি লাভ করিব অথবা এই আসনেই আমার শরীর ধ্বংস হইয়া যাউক'[২]—এই কঠোর প্রতিজ্ঞায় একটি অচঞ্চল দীপশিখার ন্যায় পুরুষসিংহ সিদ্ধার্থ বজ্রাসনে উপবিষ্ট। কঠিন সাধনায় একে একে অন্তরের প্রসুপ্ত কামনা ও সংস্কার ধ্বংস করিয়া তিনি চিরশুদ্ধ ও চিরনির্মল হইবেন। প্রদীপ যেমন নির্বাপিত হইবার পূর্বে একবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠে তেমনই বোধিসত্ত্বের অন্তরের কামনারাশিও শেষবারের মত বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। শুরু হইল কামলোকের অধিপতি মারের অত্যাচার। বোধিসত্ত্ব অবিচলিত চিত্তে বোধিমার্গ অবলম্বন করিয়া রহিলেন, মার বলিল—'গৌতম, তুমি ত বুদ্ধত্ব লাভ করিলে, কিন্তু কে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে?' অনন্যোপায় হইয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া তিনি জননী ধরিত্রীকে সাক্ষী

১। Histoy of Bengal, Vol, 1, op. cit p 466

২। ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎকায়মতশ্চলিষ্যতে॥
—ললিতবিস্তর, মিথিলা ইন্‌স্টিটিউট, ১৯৫৮ পৃঃ ২১০।

মানিলেন। এই বার মার চিরতরে পরাজিত হইল। সত্যের শুভ্র জ্যোতিতে তাঁহার অন্তর পরিপ্লাবিত হইয়া গেল। শাক্যসিংহ সমগ্র বিশ্বে 'বুদ্ধ' বলিয়া ঘোষিত হইলেন। বুদ্ধজীবনের আটটি প্রধান মহিমময় ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে সম্বোধি লাভের এই ঘটনাটি বাঙালী শিল্পীকে বেশী প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। হয়ত বাংলা ও মগধ একই রাষ্ট্রশাসনের আওতায় ছিল বলিয়াই মগধে অনুষ্ঠিত বুদ্ধ-জীবনের এই পরম প্রকাশ বাঙালী শিল্পীকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছে। অথবা শিব, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সূর্য, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিশ্রেষ্ঠগণও যে কামসুখের জন্য বিকৃতচিত্ত হইয়া অবনমিত হইয়াছেন সেই কামসুখকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া মারের সকল ভীতি ও প্রলোভন জয় করিয়াছিলেন বলিয়া গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের চিত্রই বাঙালী শিল্পীকে বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। নালন্দা ও বোধগয়ায় গৌড়ীয় শিল্পশৈলী চিহ্নিত বুদ্ধমূর্তিসমূহও অধিকাংশ ভূমিস্পর্শমুদ্রায় সমাসীন। এই উপলক্ষে খুলনা শিব বাটীতে প্রাপ্ত কষ্টিপাথরের একটি বুদ্ধমূর্তি স্তবক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্তবকটির মাঝখানে শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মূর্তির চতুর্দিকে অর্ধচক্রাকারে বুদ্ধায়নের সাতটি মহিমময় ঘটনা স্থান পাইয়াছে। স্তবকশীর্ষে কুশীনারায় মহাপরিনির্বাণের দ্যোতক শায়িত বুদ্ধ। প্রভাবলীতে ধর্মচক্রমুদ্রায় ইসিপতনে ধর্মচক্রপ্রবর্তন, অভয়মুদ্রায় রাজগৃহে নীলগিরি দমন, বরদমুদ্রায় শাংকাস্যে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে অবতরণ, শ্রাবস্তিতে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন, বৈশালীতে বানর কর্তৃক বুদ্ধদেবকে মধুদান এবং প্রধান মূর্তির বামপার্শ্বে একটি ছোট মন্দিরের অভ্যন্তরে বৃক্ষশাখা ধারণ করিয়া একটি নারী ও শিশু মায়াদেবী ও সদ্যোজাত সিদ্ধার্থ—লুম্বিনী উদ্যানে তাঁহার জন্মগ্রহণের দ্যোতক। স্তবকের নিম্নাংশের তিন সারির একটিতে মহাভিনিষ্ক্রমণ এবং অন্যটিতে স্ত্রীকন্যাসহ মার ও মারবাহিনী জয় করার চিত্র স্থান পাইয়াছে। প্রধান মূর্তিটির মুখমণ্ডল স্থির, শান্ত, সমাহিত অথচ প্রসন্নহাস্যে উদ্ভাসিত, মুদিত আঁখিতে ধ্যানযোগীর আত্মস্থতা। সুঠাম, সুডোল কলেবর পেলব কমনীয়তার প্রাচুর্যে স্নাত। ইহা বাংলাদেশে আবিষ্কৃত একমাত্র বুদ্ধমূর্তিস্তবক।[১] 'চিন্তামণিঠাকুর' নামীয় আর একটি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় অধিষ্ঠিত বোধিসত্ত্ব মূর্তি বিক্রমপুরের অন্তর্গত নালতা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।[২] মূর্তিটির পাদপীঠে 'লোকনাথ সাত্যম্' লিপি

১। History of Bengal, Vol. 1., p 466

২। প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২০, হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ, 'বঙ্গে বুদ্ধ মূর্তি পূজা' পৃঃ ৪৬৭—৪৬৯।

উৎকীর্ণ রহিয়াছে। লিপিটির অর্থ আত্মকল্যাণে রত লোকনাথ।[১] পূর্ণবিকশিত বিশ্বপদ্মে বজ্রপর্যাঙ্কাসনে সিদ্ধার্থ সমাসীন, দক্ষিণহস্ত ভূমিস্পর্শমুদ্রায় ধরিত্রীসংযুক্ত, ক্রোড়ের উপর বিস্তৃত বামহস্তে একটি কিশলয়। দীপ্ত ললাটে উর্ণা এবং মস্তকে কেশরাশি প্যাগোডার আকারে বিন্যস্ত, কর্ণে স্কন্ধ পর্যন্ত বিলম্বিত কর্ণভূষণ, শান্ত স্নিগ্ধ হাস্যে মুখমণ্ডল উদ্‌ভাসিত। চালচিত্রের উপরিভাগে বিভিন্ন মুদ্রায় পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ, মূর্তির দুইপার্শ্বে দুইটি দণ্ডায়মানা নারীমূর্তি। এই প্রতিমাটি অর্ধনারীশ্বর বা হরগৌরীর ধ্যানমন্ত্রে ব্রাহ্মণ্যদেবতারূপে পূজা পাইয়াছেন।

বাঙালী রূপকারের হাতে যে সমস্ত মহাযানী প্রতিমা রূপায়িত হইয়াছে তাহার মধ্যে অবলোকিতেশ্বর লোকনাথই সংখ্যাধিক। মনে হয় বাঙালী শিল্পী মৈত্রীকরুণার বিগলিত বিগ্রহ অবলোকিতেশ্বর—যিনি কঠোর সাধনায় করায়ত্ত সিদ্ধিকে অবহেলা করিয়া বিশ্বের কল্যাণে, জগতের দুঃখী অনাথদের কাতর আহ্বানে আনতদৃষ্টি, তাঁহাকেই সবচেয়ে বেশী প্রিয় দেবতারূপে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং সূর্যের গুণাবলী তাঁহাকে ঐতিহ্য-মণ্ডিত করিয়াছে। বাংলাদেশে লোকনাথের যে সমস্ত প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে পদ্মপাণি, সিংহনাদ, ষড়ক্ষরী ও খসর্পণ লোকনাথের প্রতিমাই বেশী। ঢাকা জেলার সোনারঙ্গে প্রাপ্ত লোকনাথ প্রতিমায় ব্রাহ্মণ্য বিষ্ণুর সঙ্গে মহাযানী অবলোকিতেশ্বরের ধ্যান ও রূপকল্পনার সামঞ্জস্য বিধানের ছাপ সুস্পষ্ট। জ্ঞান ও সংস্কৃতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী গুপ্তযুগেই বাঙালীর পূজা লাভ করিয়াছে। মহাস্থানে প্রাপ্ত স্বর্ণমণ্ডিত মঞ্জুশ্রী প্রতিমা ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ঢাকা জেলায় নাগধৃত পদ্মের উপর বজ্রপর্যাঙ্কাসনে উপবিষ্ট কষ্টি-পাথরের একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার বামহস্তে একটি পুস্তক বুকের কাছে ধৃত, ডান হস্ত ভগ্ন। সিংহের উপরে ললিতাসনে ধর্মচক্রমুদ্রায় আসীন একটি মঞ্জুবর মূর্তি রাজশাহী জেলায় পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটির বামবাহুসংলগ্ন একটি সনাল পদ্মের উপর একটি গ্রন্থ। দুইটি মূর্তিই সুশোভন, সালঙ্কৃত এবং উন্নত শিল্প সৌন্দর্যের নিদর্শন। বজ্রযান প্রতিমা ধন ও ঐশ্বর্যের দেবতা জম্ভল, হেরুক, হেবজ্র, কৃষ্ণযমারী, ত্রৈলোক্যবশংকর মূর্তিনিচয়ও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। মহাযান দেবায়তনের

১। প্রবন্ধকার নিম্নলিখিত অর্থ করিয়াছেন, সাত্যম্ আত্মনোহিতং কর্ম—আত্ম্যম্ (আত্মন+হিতার্থে যৎ) আত্মেন সহ বর্তমান ইতি সাত্ম্যম, অর্থাৎ আত্মহিত কর্মে নিয়োজিত বুদ্ধদেব। প্রতিমাটিকে তিনি প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে করেন।

দেবদেবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আবিষ্কৃত হইয়াছে তারা প্রতিমা। তারা অবলোকিতেশ্বরের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং বৌদ্ধদের কুলদেবীরূপে খ্যাতা। এ ছাড়া মারীচী, পর্ণশবরী, হারীতী চুণ্ডাই প্রভৃতি দেবী প্রতিমাও বাংলার মাটিতে পাওয়া গিয়াছে। এই অসংখ্য প্রতিমা অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম জেলায় অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব বাংলায়। কারণ এই জনপদের অধিবাসীদের সঙ্গে মহাযান-বজ্রযান ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর আত্মীয়তা ছিল। এই প্রতিমাসমূহে বাঙালীর পরিমার্জিত রুচি ও আত্মসংযম, অধ্যাত্মভাবের গভীরতা ও সৌন্দর্যবোধের এক অতুলনীয় সমন্বয় ঘটিয়াছে।[১]

বাংলার শিল্পী ভারতীয় শিল্পের প্রধান ঐতিহ্য আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিয়াও তাঁহার আরাধ্যদেবতাকে ধ্যানাসনে বসাইয়া 'নিবাতনিষ্কম্প' যোগীর ন্যায় নিস্পৃহ করিয়া আঁকিতে পারেন নাই। বাঙালী শিল্পীর করস্পর্শে নিষ্প্রাণ জড় ধাতুর মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে কল্যাণ-সুন্দর-দেবতা, তাঁহার মুখে প্রসন্ন হাসি, চোখে বরাভয়। ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্ববিভূতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে অতীন্দ্রিয় সত্যানুভূতি যাহা বাঙালীর শিল্পকে করিয়াছে মহত্তম।

এইবার বাংলাদেশে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের পথে বৌদ্ধ মহাবিহারসমূহের দান কতখানি আলোচনা করিতেছি। ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের, জীবনের সঙ্গে জীবনের যে সংযুক্তির মধ্য দিয়া পালপর্বের বাঙালী বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা তুলিয়া ধরিয়াছিল তাহার সার্থক প্রতিফলন হইয়াছে বাংলার বৌদ্ধ মহাবিহারসমূহে। বাংলার মহাবিহারসমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে পাওয়া যায় সে যুগের বাঙালীর জ্ঞানস্পৃহা ও মননশীলতা, ধর্মৈষণা ও জীবনদর্শনের ছাপ। ভগবান তথাগত তাঁহার সঙ্ঘের বিপুল সংখ্যক নাগরিক অশ্রমণ ভিক্ষুর জন্য পাঁচপ্রকার বাসস্থানের নির্দেশ দিয়াছিলেন।[২] যথা—বিহার, অদ্ধযোগ, পাসাদ, হম্মিয় ও গুহা। কালক্রমে বৌদ্ধবিহারসমূহই একদিন পরিবেণ বা বিদ্যানিকেতনে বিবর্তিত হইল। মগধের ও বাংলার নালন্দা, উদন্তপুর, সোমপুরী, বিক্রমশীলা, জগদ্দল ও পণ্ডিতবিহার এবং পেশোয়ারের কনিষ্কবিহার একদা ভারতের শাশ্বত ঐতিহ্যের যে প্রদীপ শিখাটিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল সেই

১। History of Bengal, Vol. 1, Ch. XIII, pp 466—474.

২। 'পঞ্চলেনানি—বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ ৬।১।২

আলোর পথ ধরিয়াই সমগ্র ভারত একদিন পথ চলিয়াছিল। ফলে বৌদ্ধ-ধর্মের আন্তর্জাতিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব সমগ্র এশিয়াখণ্ডে স্বীকৃতি লাভ করে।

ফা-হিয়েন, হুয়েন সাঙ এবং ইৎ-সিং-এর বৃত্তান্ত সাক্ষ্য দেয় বাঙলাদেশে পালরাজত্বের পূর্বেও বৌদ্ধ মহাবিহারের অস্তিত্ব ছিল, মহারাজ বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনে[১] 'আশ্রমবিহার', 'রাজবিহার', এবং 'জিনসেন নির্মিত বিহার-'এর নাম পাওয়া যায়। হুয়েন সাঙ বাঙলাদেশে ৭০টি বিহার বা সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি—পুণ্ড্রবর্ধন ও কর্ণসুবর্ণের বিহার বিদ্যাপীঠরূপে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। পাহাড়পুরের মাটি খননের ফলে বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত অধ্যায় সোমপুরী মহাবিহার অবলুপ্তির রাজ্য হইতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মহারাজাধিরাজ ধর্মপালদেবের সক্রিয় আনুকূল্যে এই বিহারের প্রতিষ্ঠা। তাছাড়া 'শ্রীমদ্‌বিক্রমশীলদেব মহাবিহার' এবং সম্ভবতঃ ওদন্তীপুর মহাবিহারও ধর্মপালদেবের কর্মকৃতির নিদর্শন[২]। সোমপুরী মহাবিহার একদিন সমৃদ্ধির ও গৌরবের কতখানি উচ্চ চূড়ায় উঠিয়াছিল তাহা আজ নির্ণয় করা কঠিন। তবে যদি কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যাচাই করার মাপকাঠি হয় তাহার আচার্য, উপাধ্যায় এবং অন্তেবাসিকগণ তবে আমরা সগৌরবে বলিতে পারি একদা সোমপুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র, ইহার কোন নিভৃত কক্ষে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ভারত-ভাস্কর অতীশ দীপঙ্কর। এই বিদ্যানিকেতনের সার্থক-নামা শিষ্য বা অন্তেবাসিক সমতটবাসী বিনয়পারদর্শী বীর্যেন্দ্র। কাশ্মীর, তিব্বত ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্যার্থিগণ সোমপুরী ও বিক্রমশীল মহাবিহারে সমবেত হইতেন। তান্ত্রিক সাধনা ও গবেষণার অন্যতম পুণ্যপীঠরূপে চট্টগ্রামের 'পণ্ডিতবিহার'ও একদা সমৃদ্ধি ও গৌরব অর্জন করিয়াছিল। মাতৃভাষার প্রথম কোবিদ চর্যাকার তৈলপাদের চরণরেণুতে এই মহাবিহার জাতির তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।[৩] একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত জগদ্দল মহাবিহার[৪] মহারাজ রামপালদেবের

১। Indian Historical Quarterly, Vol. VI, p 40.

২। History of Bengal, vol. 1, p 417,

৩। P. L. Paul. The Early History of Bengal, Vol. II, p 21,

৪। S. Dutt, Buddhist Monk and Monasteries of India p 377.

কর্মকৃতি। এই বিহারের অভ্যন্তরে অবলোকিতেশ্বর ও মহত্তরার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোক্ষাকর গুপ্ত, শুভাকর গুপ্ত, ধর্মাকর, রাজপুত্র বিভূতিচন্দ্র ও দানশীল এই বিহারের গৌরবোজ্জ্বল দীপশিখাটিকে আরো উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ ছাড়াও বাঙলার 'ত্রৈকূটকবিহার', 'কাপট্যবিহার', 'সুবর্ণবিহার স্তূপ', 'রাজবিহার' এবং 'আশ্রম-বিহার' ইত্যাদির কক্ষে কক্ষে সারস্বতবৃন্দ শিক্ষাদান ও গবেষণা কাজে লিপ্ত থাকিতেন। নালন্দা মহাবিহার বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখার বাহিরে অবস্থিত হইলেও এই বিহারটি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বাঙালীর কর্মপীঠ ছিল। বাঙালী আচার্যের দানে, বাঙালী রূপকারের হাতের যাদুস্পর্শে, বাঙালী অন্তেবাসিকদের একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চায় এবং বাঙালী রাজন্যবর্গের অর্থানুকূল্যে এই মহাবিহারের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল। বাঙালী আচার্যবৃন্দ নালন্দা মহাবিহারে যে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহার শুভ্র রশ্মি সম্পাতে শুধু ভারত-গগনই উদ্ভাসিত হয় নাই, সুদূর চীন, জাপান, তাতার, তিব্বত, শ্যাম, আনাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশসমূহেও সেই গৌরবচ্ছটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

বাঙলাদেশে যুগে যুগে বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে। বাঙালীর মানস প্রকৃতি এবং অধ্যাত্মচিন্তার গতিপ্রকৃতি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখার বিষয়ে আলোচনা অপরিহার্য। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে বাঙলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখা সম্মতীয়বাদ, সর্বাস্তিবাদ এবং মহাসাংঘিকবাদ প্রভৃতির প্রচার ছিল। কিন্তু খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব হইতে মহাযানী ঐতিহ্যে এক বৈপ্লবিক বিবর্তন দেখা দেয় এবং বিভিন্ন ধারায় ক্রমবিকশিত হইয়া এই পরিবর্তিত বৌদ্ধধর্ম বাঙলা ও মগধের জনমানসকে অষ্টম হইতে দ্বাদশ এই চারিশত বৎসর পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এই ধর্মবিশ্বাসই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম নামে অভিহিত। কেহ কেহ মনে করেন কোন এক বিশেষ শ্রেণীর শিষ্যদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বয়ং বুদ্ধদেবকে মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি লোকায়ত সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।[১] কিন্তু ত্রিপিটকে বুদ্ধ-জীবনের এবং তাঁহার ধর্মপ্রচার কার্যের যে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাহা এই মতকে সমর্থন করে না। তারনাথের মতে তন্ত্র প্রথম যুগে গুহ্য অবস্থায় প্রায় তিনশত বৎসর ছিল। পরে পাল রাজত্বকালে সমাজে সিদ্ধাচার্যদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তন্ত্রও প্রকাশ্যভাবে

১। Two Bajrayāna works, ed. B. Bhattacharyya, 1929, Intro. P. X.

আচরিত হইতে শুরু হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে তন্ত্রের আবির্ভাব এবং খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দী তান্ত্রিক ধর্মের শ্রীবৃদ্ধির সুবর্ণযুগ। তুর্কী আক্রমণের ফলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তন্ত্র ভারতে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে এবং ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত কল্পতন্ত্র ও গুহ্যসমাজতন্ত্র প্রাচীনতম তন্ত্রগ্রন্থ। নালন্দা ও বিক্রমশীলা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে তন্ত্রশাস্ত্র পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধতন্ত্রের পীঠভূমি ছিল বাঙলা দেশ।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের এই চরম পরিণতি লাভের কারণ কি? যে মহান্ আদর্শের প্রেরণায় মহাযান বৌদ্ধ সাধক একদিন বিশ্বের সকল দুর্গত নরনারীকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছিলেন—'সকলের কল্যাণ-বিধানের জন্য আমি কাজ করিয়া যাইব। বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর যতদিন বোধিজ্ঞান উদয় না হইবে ততদিন আমি আমার নির্বাণ চাই না।'[১] সেই বিশ্বব্যাপী করুণায় আপ্লুত হইয়াই মহাযান ধর্ম বিশ্বের মুমুক্ষু জনগণের 'যান'—এমন মহান্ 'যান' যাহাতে সর্বস্তরের সকল ধর্মবিশ্বাসের ও সকল বর্ণের অনায়াসে স্থান হইতে পারে। হইলও তাহাই। কিন্তু এই বৃহৎ অনুন্নত জনগণকে, সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষকে মহাযান কি দিবে? বৌদ্ধধর্মের প্রতীত্য সমুৎপাদ, আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ, চতুরার্যসত্য অথবা নাগার্জুনের শূন্যবাদ, অসঙ্গ-বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদ লইয়া সাধারণ লোকে কি করিবে? অবশেষে সাধারণের জন্য সাধারণ নিয়মকানুন, দৈববিশ্বাস ও পূজা-অর্চনাকে পথ করিয়া দিতে হইল। মহাযানী আচার্যগণ যে সমস্ত অনুন্নত জাতিকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন তাহারাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের পূর্ব ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়া-পদ্ধতি অবশ্যই ভুলিয়া যাইত না। মহাযান ধর্মের আড়ালে তাহারা মাতৃকা, যোগিনী, ডাকিনী, যক্ষ-রক্ষ ও পিশাচাদি পার্বত্য ও অরণ্যবাসী কৌম সমাজের দেবদেবীর পূজা করিত। দেবদেবীর পূজার মন্ত্র ও ধারণী রচিত হইতে শুরু হইল। ক্রমশঃ এক শ্রেণীর বৌদ্ধাচার্যের বিশ্বাস জন্মিল—মন্ত্রই বুদ্ধত্ব লাভের পথ। এই সময় মহাযান দুইভাগে বিভক্ত হইল—(১) পারমিতা যান এবং (২) মন্ত্র-যান। মন্ত্রযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রথম স্তর। মন্ত্রযানে মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডল এই তিনের সমন্বয় ঘটিয়াছে। পরবর্তী যুগে মন্ত্রযান

১। An Introduction to Buddhist Esoterism, Dr. B. Bhattacharyya, 1932, p 29. Outlines of Mahāyāna Buddhism, Suzuki, 1907, p 398 , Suvarṇa Prabhā Sūtra, Chap. 26.

মহাসুখবাদ তন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া বজ্রযান নামে অভিহিত হইয়াছে। বজ্রযানী ঐতিহ্যে নির্বাণের তিন অবস্থা—শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। বজ্রযানীদের বজ্র এই ত্রিগুণাত্মক। বজ্র কি? "দৃঢ়ং সারমসৌশীর্যম্ অচ্ছেদ্যাভেদ্য-লক্ষণম্। অদাহি অবিনাশি চ শূন্যতা বজ্রম্ উচ্যতে॥"[১] বজ্রই সত্য, বজ্রই পরমার্থ, বজ্রই অনির্বচনীয়, বজ্রই শূন্য। এই শূন্যই নির্বাণ। বজ্রযানীরা এই নির্বিকল্প শূন্যকে নৈরাত্মাদেবীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বোধিচিত্ত নৈরাত্মার আলিঙ্গনে নৈরাত্মাতেই লীন হইয়া মহাসুখপ্রাপ্ত হয়। এই মতবাদ হইতে বজ্রযানের উৎপত্তি। বজ্রযানে মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডলের সহিত নানা দেবদেবী যুক্ত হইয়াছেন। বজ্রশব্দের অর্থ শূন্যতা, বজ্রকে আশ্রয় করিয়াই নির্বাণ লাভ করিতে হইবে। সাধক কঠোর যোগ সাধনার দ্বারা চিত্তকে স্থির, শান্তস্বভাব এবং বজ্রের ন্যায় কঠোর করিয়া তুলিবেন। বোধিচিত্তের স্বরূপ কি? শূন্যতা ও করুণার অদ্বয় অবস্থাই বোধিচিত্ত। "শূন্যতা-করুণা-ভিন্নং বোধিচিত্তং ইতি স্মৃতম"।[২] শূন্যতা প্রজ্ঞার প্রতীক এবং করুণা উপায় বা বিশ্বজনীন কল্যাণ ও কুশলকর্মের প্রেরণাদাত্রী। এই দুই-এর—প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনে বোধিচিত্তের উৎপত্তি। মহাযানী তান্ত্রিকদের সাধনা—বোধিসত্ত্ব হইয়া বোধিচিত্ত লাভের সাধনা। বোধিচিত্ত যখন নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ এবং তাহাতেই লীন হইয়া থাকেন তখনই মহাসুখের উৎপত্তি। এই আনন্দলোকে সাধকের মন্ত্রশক্তিতে তাঁহার মনশ্চক্ষুর সামনে বিভিন্ন দেবদেবীরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করেন। এই দেবদেবীর ধ্যান করিতে করিতে সাধকের চিত্ত বজ্রের ন্যায় কাঠিন্য লাভ করে, তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি দমিত হয়। সাধকের মানসলোকবিহারী সেই কাল্পনিক প্রতিমা রূপদক্ষের হাতের স্পর্শে হেবজ্র-বজ্রবারাহী,[৩] বজ্রধর ও বজ্রসত্ত্ব প্রতিমার কণ্ঠলগ্না শক্তি[৪], এবং শক্তির সহিত দৃঢ়ালিঙ্গনাবদ্ধ হলাহল লোকেশ্বর[৫] এবং পদ্মনর্তেশ্বরের ঊরুতে সুখাসীনা দেবী-প্রতিমারূপে[৬] ধাতুর পিণ্ডে ও শিলার বুকে ধরা

১। অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ, জি. ও. এস. পৃঃ ৩৭, S. B. Dasgupta, An Introduction to Tantric Buddhism, 1950, p 86.

২। শ্রীগুহ্যসমাজ, জি. ও. এস অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, : An Introduction to Tantric Buddhism, op. cit. p 100.

৩। দ্রঃ নাহার সংগ্রহের হেবজ্র প্রতিমা।

৪, ৫, ৬। দ্রঃ—Dr. B. Bhattacharyya, An Indian Buddhist Iconography, 1958, Fig. 15, 48, 8A, 112, pp 58, 67, 401, 261

দিয়াছে। পরবর্তীযুগে বজ্রযানের আর একটি রূপ কালচক্রযান নেপাল ও তিব্বতে দেখা দেয়। কালচক্রযানীদের মতে শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবাহই কালপ্রবাহের প্রতীক। ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্য দিয়া কালস্রোত চক্রাকারে নিরন্তর প্রবহমান,—ইহাই কালচক্র। কালচক্রযানীরা শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কালগ্রাসী হইতে অর্থাৎ কালকে নিরস্ত করিয়া নিজে এই কালচক্রের ঊর্ধ্বে উঠিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বার, তিথি, গ্রহ, নক্ষত্র. রাশি প্রভৃতির বিচার করিতেন বলিয়া গণিত শাস্ত্রের উন্নতির জন্যও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তান্ত্রিক সাধনার অপর ধারা সহজযান। সহজযানীদের নিকট শুধু ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীরাই নয়, হীনযানী-মহাযানী, এমন কি বজ্রযানী ও কালচক্রযানীরাও কঠিন সমালোচনায় পর্যুদস্ত হইয়াছেন। তাহাদের দোহায় ও গানে সমস্ত ধর্মের গূঢ় ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং গুহ্য প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রখর প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। সিদ্ধাচার্যগণ সহজিয়া কারণ তাঁহাদের সাধ্য সহজ, সাধন পন্থাও সহজ আবার এই সহজকেই তাঁহারা জগতের আদিস্বরূপ এবং নির্বাণস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

'তস্মাৎ সহজং জগৎ সর্বং সহজস্বরূপমুচ্যতে।
স্বরূপমেব নির্বাণং বিশুদ্ধাকার চেতসঃ॥'[১]

এই সহজ দেহের মধ্যে বাস করিয়াও অদেহী। 'দেহস্থোঽপি ন দেহজ।"[২] ইহাই মোটামুটি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। ঠিক কোন্ সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম এই বিভিন্ন যানে বিভক্ত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন তবে পাল যুগের বাঙলাদেশের মননশীলতা ও ধর্মীয় জীবন বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান প্রভৃতি দ্বারাই নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। এই যুগেই কাহ্ন, সরহ, লুই, তিলোপাদ প্রভৃতি প্রখ্যাত সিদ্ধাচার্যগণ চর্যা ও দোহা রচনা করিয়াছেন। এই চর্যা ও দোহায় বাঙালীর প্রাণের প্রকাশের বেদনা ও রসের আবেগ সর্বপ্রথম বাঙালীর কণ্ঠে বাঙালীর নিজের ভাষায় স্ফূরিত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্নের পূর্বাহ্নে বৌদ্ধচিন্তানায়কগণের কর্মকৃতি কেবল বৌদ্ধশাস্ত্র রচনাতেই নিবদ্ধ ছিল না। তর্কবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ দর্শন, ব্যাকরণ-অভিধান প্রভৃতি প্রণয়নেও তাঁহাদের অপূর্ব চিন্তন-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ভাষায় রচিত এই গ্রন্থসমূহ

১, ২। হেবজ্রতন্ত্র—MS(A. S. B. No. 11817) p 36,(B), S. B. Dasgupta, Obscure Religious cults etc. 1962, p 78

বাংলা ভাষার জন্মের পূর্বযুগের বাঙালীর জীবনচর্যা ও মননধর্মের মহৎ ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে। এইজন্য বাংলা ভাষায় রচিত না হইলেও বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে হইলে এই সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা অপরিহার্য।

দার্শনিক তত্ত্ব ও চিন্তা বিষয়ে যে সমস্ত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে গৌড়পাদের 'আগমশাস্ত্র' তাহার মধ্যে অন্যতম। গ্রন্থকার বৌদ্ধ শূন্যবাদ এবং প্রাক্-শঙ্কর বৈদান্তিক ঈশ্বরতত্ত্বের সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[১] এই গ্রন্থটি পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ লেখকদেরও অনুপ্রেরণা দিয়াছে। শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে 'গৌরপাদকারিকা' হইতে শ্লোক আহরণ করিয়াছেন। ব্যাকরণ-অভিধান রচনায়ও বাঙালী বৌদ্ধাচার্যদিগের কৃতিত্ব স্মরণীয়। আচার্য চন্দ্রগোমীর 'চান্দ্রব্যাকরণ' একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। চন্দ্রগোমী বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রযান সাধনার উপর ৩৬টি গ্রন্থ, তারা ও মঞ্জুশ্রী স্তোত্র, লোকানন্দ নাটক এবং 'শিষ্যলেখধর্ম.' নামক একটি কাব্যও লিখিয়াছিলেন। সুভূতিচন্দ্র নামে অন্য একজন বৌদ্ধ অভিধানকারের নামও আমরা পাইয়াছি। তিনি 'কামধেনু' নামক অমরকোষের টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আনুমানিক খৃঃ অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলা দেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্যদের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা মহাযান ধর্মের বিভিন্ন শাখা—বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক মতবাদ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু গুরুমুখী ও সাধনসাপেক্ষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থসমূহ বাংলাদেশে পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী ঐতিহ্য 'তেঙ্গুরে'[২] এই সমস্ত সিদ্ধাচার্যদের নাম, তাঁহাদের গ্রন্থের নাম এবং গ্রন্থ পরিচয় বিবৃত হইয়াছে।[৩] একদা শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, শান্তিদেব, শান্তিরক্ষিত, প্রভৃতি বৌদ্ধ সারস্বতগণের দানে শুধু বাঙলাদেশ নয়, সমগ্র-ভারত এবং বহির্ভারতও গৌরব বোধ করিত। শীলভদ্রের 'আর্যবুদ্ধভূমি',

---

১। দ্রঃ—ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোহস্য ন বিদ্যতে।
এতদতদ্ উত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে॥ —গৌড়পাদকারিকা, ৪।৭১

২। তিব্বতী সাহিত্যে বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ অনুবাদ করিয়া দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—কেঙ্গুর গ্রন্থমালা ও তেঙ্গুরগ্রন্থমালা। কেঙ্গুরে কেবল বুদ্ধবচনই গৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। তেঙ্গুরে বুদ্ধবচন ব্যতীত, বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক সমস্ত গ্রন্থকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষায় রচিত পুস্তকসমূহ তেঙ্গুরে সংরক্ষিত আছে। তিব্বতী অনুবাদের সৌজন্যে আজ আমরা বাঙালী সিদ্ধাচার্যদের রচিত এই বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছি।

৩। History of Bengal, Vol. I. op. cit, Ch. XI.

শান্তিদেবের 'বোধিচর্যাবতার' লুইপাদের 'অভিসমরবিভঙ্গ' তিব্বতী অনুবাদের আনুকূল্যে পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃতভাষায় লিখিত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচনা মৌলিক সৃষ্টি হইলেও বিশুদ্ধ সাহিত্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ধর্ম বিষয়ে রহস্যাচারকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তাঁহাদের বক্তব্য দুরূহ, ভাব জটিল এবং দুর্বোধ্য ও ভাষা আলোআঁধারের কৃত্যাশ্রয়ী হইয়া পড়িয়াছে। জেতারি, পুরুষোত্তম দেব, শারণদেব, হরিভদ্র, জ্ঞানশ্রী, প্রজ্ঞাবর্মন প্রমুখ কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও মনীষিগণ প্রাচীন বাঙলার প্রতিনিধি স্থানীয় লেখকরূপে গণনীয়।[১] এ ছাড়াও বহু বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত ও আচার্য নালন্দা, বিক্রমশীলা, জগদ্দল, পণ্ডিতবিহার এবং বিক্রমপুরী বিহারে অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের নাম এবং কিছু কিছু রচনাবলীও পাওয়া গিয়াছে। এই যুগের নব-প্রবুদ্ধ বাঙালী মনীষা কেবল আপন দেশমাতার হিতসাধনেই নির্বিশেষে লীন হইয়া যায় নাই। দীপঙ্করের সর্বাত্মক মানবপ্রীতি তাঁহাকে আপন দেশের সীমানার গণ্ডী পার করিয়া পর্বতসঙ্কুল, বিঘ্নবহুল পথ পরিক্রমায় আহ্বান জানাইয়াছিল। তিনি কেবল ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং বিক্রমশীলা বিহারের প্রধান অধ্যক্ষই নহেন, তিনি পৃথিবীর অন্যতম ধর্মসংস্কারক—'দ্বিতীয় বুদ্ধ'। নেপালী-তিব্বতীদের ধর্মীয় জগতে তাঁহার মানব পরিচয়কে ছাড়াইয়া দৈব পরিচয় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। দীপঙ্করের প্রচেষ্টায় তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম কলুষমুক্ত হইয়াছিল। সত্যধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[২] তিনি প্রায় শতাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদও করিয়াছিলেন। বৌদ্ধজগতে তিনি মহতের মধ্যে মহত্তম, বরণীয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বরণীয় রূপে স্বীকৃত।

প্রতিমালক্ষণ বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাধনমালা' বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের এক অনবদ্য দান। গ্রন্থটি মহাযান-বজ্রযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার্যদের রচিত তান্ত্রিক দেবদেবীর সাধনা ও স্তবস্তুতি বিষয়ক সংগ্রহগ্রন্থ। সাধনমালার অনেকগুলি শ্লোকের রচনাকার—ধর্মাকরমতি, শবরপাদ, কৃষ্ণপাদ, রত্নাকর, শুভাকর, কুলদত্ত, অদ্বয়বজ্র, ললিতগুপ্ত, পদ্মাকর, অভয়াকর গুপ্ত, কুমুদাকর মতি, গুণাকর গুপ্ত, করুণাচল, কোকদত্ত, অনুপম রক্ষিত, চিন্তামণি দত্ত, সুমতি ভদ্র, মঙ্গলসেন, অজিত মিত্র প্রভৃতি সম্ভবতঃ বাঙালী ছিলেন। কবিগণ দেবদেবীদের রূপ ও দেহভঙ্গীর বর্ণনায় নৈর্ব্যক্তিক অধ্যাত্ম

১। P. L. Pal, The Early History of Bengal, Vol. II, Ch. VIII.

২। দ্রঃ বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, ১৩৪১, পৃঃ ৩১৬।

ভাব-কল্পনার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহী দৈহিক সৌন্দর্যের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। বাঙালী পণ্ডিত অভয়াকর গুপ্তের প্রণীত 'নিষ্পন্নযোগাবলী' গ্রন্থে ৬০০ দেবদেবীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্ভবতঃ অভয়াকর ১১৩০ খৃঃ-এর কাছাকাছি সময়ে বর্তমান ছিলেন।

বৌদ্ধ বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার উজ্জ্বল নিদর্শন শিলালিপি ও তাম্রানুশাসনের মধ্যেও স্থানে স্থানে প্রকীর্ণ রহিয়াছে। পালযুগে ভূমিদান ও অনুশাসনের মধ্যে 'রাজপ্রশস্তি' রচনা করার রীতি প্রচলিত ছিল। রাজা-মহারাজাদের সভাকবিরাই এই সমস্ত প্রশস্তি ও অনুশাসন রচনা করিতেন। এইগুলির মধ্য দিয়া সমসাময়িক বৌদ্ধ-প্রভাবিত বাঙালী কবির কাব্যানুরাগ এবং উপমা-রূপক-অনুপ্রাস ও অলঙ্কার প্রয়োগে তাঁহাদের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষ করিয়া অনুশাসনের 'প্রশস্তি' অংশ যথার্থই সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ হইত। বাঙালীর সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস প্রশস্তি রচনা হইতে শুরু হইয়াছে এবং শুরু হইয়াছে ভগবান বুদ্ধ, লোকনাথ এবং ধর্মের বন্দনা করিয়া। মল্লসারুলের তাম্রানুশাসন পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত তাম্রানুশাসনসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করিয়াছেন এই অনুশাসনটির প্রারম্ভ শ্লোক[১] বাঙালী কবির লেখা প্রথম কবিতা এবং কবিতাটিতে বাঙালীর প্রসিদ্ধ দেবতা ধর্মের প্রশস্তি গান করা হইয়াছে।[২] মহারাজ দেবপালের মুঙ্গের ও নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্রানুশাসনের প্রথম শ্লোকেও বুদ্ধদেবের বন্দনা করা হইয়াছে।[৩] নারায়ণ পালদেবের ভাগলপুর তাম্রানুশাসনে যিনি 'কারুণ্যরত্নপ্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রেয়সীরূপে ধারণ করিয়াছেন সেই দশবল লোকনাথের জয়গান করা হইয়াছে।[৪] পাল পরবর্তী নৃপতি শ্রীচন্দ্রের রামপালে এবং কেদারপুরে প্রাপ্ত তাম্রানুশাসনদ্বয়েও প্রথম শ্লোকে বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের বন্দনা স্থান পাইয়াছে।[৫] কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার সভাকবিও তাঁহার

১। ......ক নাথঃ যঃ পুংসাং সুকৃতকর্মফলহেতুঃ সত্যতপোময় মূর্তির্লোকদ্বয়সাধনো ধর্মঃ—Epigraphia Indica, Vol, XXIII, p 159

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১৪।

৩। Epigraphia Indica, Vol. XVIII, p 804 ; Vol. XVII, p 818.

৪। দ্রঃ অক্ষয়কুমার সম্পাদিত গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৫-৬৯।

৫। Epigraphia Indica, Vol. XII, p 186 , Epigraphia Indica, Vol. XVII, p 188.

রচিত অনুশাসনের প্রারম্ভ শ্লোকে শিব ও ধর্মের জয়গান করিয়াছেন।[১] অনুশাসনে উল্লেখিত ধর্ম ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের ধর্মঠাকুর। তিনি একাধারে ব্রাহ্মণ্যদেবাদিদেব মহাদেব এবং মহাযানদের শূন্য ও নির্বাণের প্রতীকস্বরূপ।

'রামচরিত' কাব্যের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী এবং অভিনন্দ দুইজনেই বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী নৃপতি রামপালের এবং অভিনন্দ নৃপতি দেবপালের সভাকবি ছিলেন। অভিনন্দের কাব্যের ষোড়শ সর্গে বর্ণিত দেবী-মাহাত্ম্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক নারী-দেবতার প্রভাব সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ পালরাজগণের সভাকবিগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী না হইলেও বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নয়। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভেই 'ওঁ শ্রীঘনায় নমঃ সদা' দ্বারা শ্রীবুদ্ধের প্রতি প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের মতে এই বুদ্ধ-প্রণাম বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লিপিকর শ্রীশীলচন্দ্রের অথবা স্বয়ং কবির দ্বারা রচিত।[২] পালবংশীয় নরপতিগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই হয়ত কবি কাব্যের প্রারম্ভে বুদ্ধকে বন্দনা করিয়াছেন। এই কাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদেও বৌদ্ধদেবী তারা এবং জগদ্দল মহাবিহারের উল্লেখ রহিয়াছে।[৩] বাঙলার কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেবের বুদ্ধপ্রশস্তিকে মঙ্গলাচরণরূপে গ্রহণ করিয়া বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতে পারে। দশাবতার বন্দনায় মহাকবি জয়দেব বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্॥
কেশবধৃত বুদ্ধ শরীর,
জয় জগদীশ হরে।[৪]

ইহা কেবল জয়দেবের একার প্রশস্তি নয়। জয়দেব ছিলেন সে যুগের উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়প্রয়াসী শিক্ষিত বাঙালী সমাজের প্রতিভূ।

প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় বাঙলাদেশে সাহিত্য রচিত না হইলেও বাঙালীর জীবনচর্যা ও বাঙালীর ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ও সাযুজ্য রহিয়াছে।

১। Epigraphia Indica, Vol. XII, p 65; কামরূপ শাসনাবলী, পদ্মনাভ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১।

২। রামচরিত, রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, ১৩৬০। অবতরণিকা, পৃঃ ৷৵৷৴।

৩। ঐ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, শ্লোক সং ৭, পৃঃ ৭৫।

৪। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১ম সর্গ, পৃঃ ১২

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামক সঙ্কলন গ্রন্থটির সঙ্কলয়িতার নাম জানা যায় নাই। গ্রন্থের প্রথমেই বুদ্ধপ্রশস্তি স্থানলাভ করায় অনুমান করা হয় সঙ্কলয়িতা বৌদ্ধ ছিলেন। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' আদি নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত। বাংলা-লিপির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। এই গ্রন্থের কয়েকজন লেখক—বিনয়দেব, বুদ্ধাকর গুপ্ত, অপরাজিত রক্ষিত, বন্দ্য তথাগত প্রভৃতি সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বাঙালী ছিলেন।[১] অনুমান করা হইয়াছে প্রাকৃত পৈঙ্গলের শ্লোকে ও কবিতায় বাঙলাদেশের বিশেষতঃ প্রাক্-তুর্কী বাঙলার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।[২] এই গ্রন্থে একদিকে যেমন জীবনের স্নিগ্ধ পরিপূর্ণতার ছবি—'পুহবীসগ্‌গহ নিলয়' ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি জীবনের বৈরাগ্যমুখিন নিস্পৃহতার ভাবও স্থান পাইয়াছে। কবি লিখিয়াছেন—

রাআ লুব্ধ সমাজ খল
বহু কলহারিণ সেবক ধুত্তউ
জীবন চাহসি সুক্‌খ জই
পরিহরি ঘর জই বহু গুণ জুত্তউ[৩]

সংসার-জীবনের তিক্ততা ও নৈরাশ্য কবির জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া বৈরাগ্যমুখিন করিয়াছে। ইহা কবি-মানসের উপর প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের নেতিবাচক ভাবাদর্শের প্রভাব বলিয়া মনে হয়। শ্লোকের মাত্রা সংস্থানে কবি ব্রাহ্মণ্য দেবী লক্ষ্মী, গৌরী ও মহামায়ার সঙ্গে বৌদ্ধদেবী চুন্দাকেও স্মরণ করিয়াছেন। বসুকল্পের লেখা দুইটি বুদ্ধ-বন্দনা পাওয়া গিয়াছে। কবি সৌগতমতাবলম্বী না হইলেও এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে বসুকল্প বাঙালী ছিলেন।[৪]

খৃঃ অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে মহাযানধর্ম লোকায়ত ধর্মের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন তান্ত্রিক উপযানে বিবর্তিত হইয়াছিল এবং বাঙলা, আসাম ও উড়িষ্যার জনগণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই তান্ত্রিক মতসমূহের প্রচারকগণ ছদ্ম ও অন্ত্যজ নামের আড়ালে নিজেদের আসল পরিচয় লুকাইয়া রাখিতেন এবং আভাসে ইঙ্গিতে নিজেদের সাধন-ভজনের প্রক্রিয়া

১। বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৭০৩।
২। ঐ, পৃঃ ৭৩৪।
৩। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ১৯৬৩, পৃঃ ১০৪ হইতে উদ্ধৃত।
৪। বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৪

ও স্ব স্ব ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে পদ রচনা করিতেন। এই সমস্ত পদ সংস্কৃত, সৌরসেনী অপভ্রংশ এবং প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় রচিত।[১] পরবর্তী যুগে তাঁহাদের শ্লোকসমূহের সংস্কৃত ভাষায় টীকাটিপ্পনীও রচিত হইয়াছিল। তেঙ্গুরে সংরক্ষিত দোহাসমূহের তিব্বতী অনুবাদ এবং সংস্কৃত টীকা সাহায্যে পণ্ডিতগণ তাহার মর্মোদ্ধার করিয়াছেন। বজ্রযানী, কালচক্রযানী ও সহজযানী আচার্যগণ মূলতঃ একই তত্ত্ব ও আচারে বিশ্বাস করিতেন। এইজন্য এক একজন আচার্য একাধিক যানের গুরুরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং একাধিক যানের গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন।

প্রাচীন হীনযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও তাঁহাদের উপর বড় কম পড়ে নাই। দীর্ঘকাল প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি বাণী এবং বিশেষ বাচনভঙ্গী যুগযুগ ধরিয়া পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দোহাকোষ চর্যাচর্যবিনিশ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থের তত্ত্বের স্থানে স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম বিবর্তিত আকারে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পংক্তিসমূহের ধ্বনি স্পন্দনও প্রায় একই প্রকার।

থেরী গাথায় শীতের রাত্রে নদীতে স্নানরত পুণ্যার্থী ব্রাহ্মণকে পুন্নিকা প্রশ্ন করিয়াছেন—কো নু তে ইদকৃখসি অজানন্তস্স অজানন্তো। উদকাভিসেচনা নাম পাপকম্মা পমুচ্চতি।[২] অর্থাৎ উদকে স্নান করিলে পাপমুক্তি ঘটে, এই কথা তোমাকে বলিয়াছে কে সে মূর্খাধিক মূর্খ; সহজাচার্যগণও বারে বারে বলিয়াছেন মন্ত্রতন্ত্র ও স্নানাদির দ্বারা পাপমোচন হয় না, মোক্ষলাভও ঘটে না। যেমন—

'তিত্থ তপোবন ম করহু সেবা' অর্থাৎ তীর্থ ও তপোবনে যাইও না।

১। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজ-গ্রন্থাগার হইতে হাজার বছরের পুরাতন বাংলায় রচিত বৌদ্ধগান ও দোহা উদ্ধার করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের নাম (১) চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজবজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নপাদের দোহাকোষ, (৪) ডাকার্ণব। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে চর্যাপদই কেবল প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন, অন্যগ্রন্থসমূহ সৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত। অবশ্যই এই সৌরসেনী প্রাচ্য ভারতীয় সৌরসেনীর নিদর্শন। ১৯২৯ সালে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী নেপাল হইতে দোহাকোষের আর একটি সংগ্রহ আবিষ্কার করেন। তিল্লোপাদের দোহা তাঁহার সংগ্রহের অন্তর্গত। শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগ্রহে তিল্লোপাদের দোহা ছিল না।

২। Thera & Therīgāthā, ed. Oldenberg and Pischel, 1888, p. 146.

অন্যত্র :—কিন্তু হ্ দীবেঁ কিন্তু হ নিবেজ্জঁ
কিন্তু হ কিজ্জই মন্ত হ সেব্ বঁ॥
কিন্তু হ তিত্থ তপোবণ জাই।
মোক্খ কি লব্ ভই পাণী হ্নাই ॥[১]

প্রদীপ ও নৈবেদ্য কি হইবে? মন্ত্র সেবায় কি কাজ? তীর্থ-তপোবনে গিয়াই বা কি ফল, জলে স্নান করিলেই কি মোক্ষ লাভ হয়?

মাঝে মাঝে বাচনভঙ্গীও প্রায় একইরূপ হইয়া গিয়াছে। যেমন, থেরীগাথায় :—

সগ্ গং নূন গমিস্সন্তি সব্বে মণ্ডূককচ্ছপা।
নাগা চ সুংসুমারা চ যে চঞ্ঞে উদকেচরা ॥
ওরবভিকা সূকরিকা মচ্ছিকা মিগবন্ধকা।
চোরা চ বজ্ঝঘাটা চ যে চঞ্ঞে পাপকম্মিনো ॥
উদকাভিসেচনা তে পি পাপকম্মা পমুচ্চয়ে ॥
সচে ইমা নদিয়ো তে পাপং পুব্বেকতং বহেয়্যুং।
পুঞ্ঞম্ পইমা বহেয়্যুং তেন ত্বং পরিবাহিরো অস্স ॥[২]

যদি উদকে স্নান করিলেই স্বর্গে যাওয়া যায় তবে মণ্ডুক, কচ্ছপ, শুশু, নাগ প্রভৃতি জলচর প্রাণীও স্বর্গে যাইবে? যাহারা ছাগল, শূকর, মৎস্য, মৃগ হত্যা করে, যাহারা চোর, নরহত্যাকারী উদকে পাপ ধৌত করিয়া তাহারাও স্বর্গে যাইবে?

প্রায় অনুরূপ ভাষায় দোহাকারগণও লিখিয়াছেন—

জই ণগ্গা বিঅ হোই মুত্তি, তা শুনহ শিআলহ
লোমোপ্পাট্টনে অচ্ছ সিদ্ধিঅ
তা জুবইনিত্যম্বহ।
পিচ্ছী গহণে দিঠ্ঠি মোক্খ
তা করিহ তুরঙ্গ হ।[৩]

যদি নগ্ন হইলেই মুক্তি হয় তবে শৃগাল মুক্তি পাইবে। যদি লোমোৎপাটনে মুক্তি হয় তবে যুবতী নিতম্বেরও মুক্তি ঘটিবে। ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিলে

১। Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, C. U. 1985, p. 11.
২। থেরথেরী গাথা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬।
৩। বৌদ্ধগান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৫৮, পৃঃ ৮৩।

যদি মুক্তি হয় তবে ময়ুরপুচ্ছ দ্বারা হাতী ঘোড়াকে সাজাইলে তাহাদেরও মুক্তি হইবে।

ভগবান বুদ্ধদেব পরম ভোগ, চরম কৃচ্ছ্রতা—দুই অন্তকে পরিহার করিয়া মজ্‌ঝিমপটিপদা বা মধ্যপন্থার অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সিদ্ধাচার্য কৃষ্ণপাদও সেই পথের উত্তরসাধক ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

অহণ গমই উহ ণ জাই।
বেণি রহিঅ তসু নিচ্চল পাই॥[১]

অধঃগমন করিও না, উর্দ্ধেও উঠিও না। দুইকে বা বেণিকে ত্যাগ করিলে চিত্তচাঞ্চল্য নিশ্চল হইবে।

সহজযানী আচার্যগণ পূজা, অর্চনা, শাস্ত্রপাঠ ও মন্ত্রজপে বিশ্বাস করিতেন না। দেহের মধ্যেই 'বুদ্ধ' বাস করিতেছেন, সুতরাং জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা বাহিরে তাঁহার সন্ধান না করিয়া তাঁহারা দেহেই তাঁহার সন্ধান করিয়াছেন। যথা—

পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্‌খাণই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই॥
অমণাগমণ ণ তেন বিখণ্ডিঅ।
তোবি নিলজ্জই ভণই হউ পণ্ডিঅ॥[২]

পণ্ডিতগণ কেবল নানা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া তাঁহারা কেবল নরকের পথ প্রশস্ত করেন। সদ্‌গুরুর উপদেশেই দেহস্থিত বুদ্ধকে জানা যায়, অন্যথা নয়। যিনি অক্ষর সাহায্যে তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন, তিনি নিজেও বিপথগামী হইয়া থাকেন, অন্যকেও ধ্বংস করেন।

সিদ্ধাচার্যদের কণ্ঠে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগও অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অভিযোগের ভঙ্গীতেও প্রাচীন ধারার অনুবর্তন সুস্পষ্ট। যেমন—

দেব ম পূজহু তিত্থ ন জাবা।
দেব পূজাহি ন মোক্‌খ পাবা॥[৩]

১। বৌদ্ধগান ও দোহা, হরপ্রসাদশাস্ত্রী, ১৩৫৮, পৃঃ ১২১।

২। ঐ. পৃঃ ১০৩।

৩। Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, C. U. 1935, p. 47,

অন্যত্র—

কজ্জে বিরহিঅ বভমবহ ইতি।
অক্খি উহাবিঅ কড়ুএঁ ধুমে ॥
... ...
ঘরহী বইসী দীবা জালী।
কোণেহিঁ বইসী ঘণ্ডা চালী ॥
অক্খি নিবেসী আসন বন্ধী।
কন্নেহিঁ খুসখুসাই জণ বন্ধী ॥[১]

আগম বেদ-পুরাণের নিদানের প্রতিও তাঁহাদের অনাস্থা সূচিত হইয়াছে। যথা—

আগম-বেঅ-পুরাণে পংড়িও মাণ বহংতি।
পক্ক সিরিফলে অলিঅ জিম বাহেরিত ভুময়ন্তি ॥[২]

অলি যেমন পক্ক শ্রীফলের চতুর্দিকে কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি পণ্ডিতগণও আগম বেদ-পুরাণ লইয়া ব্যস্ত থাকেন।

সাধনমার্গে একদিকে গুরুবাদ, অন্যদিকে দেহবাদ তাঁহাদের রচনায় প্রাধান্য পাইয়াছে। আচার্য সরহপাদের রচনায় দেহবাদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। যথা—

এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে সঙ্গসাঅরু।
এথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু ॥[৩]

এইখানেই সেই সুরেশ্বরী যমুনা, এইখানেই গঙ্গাসাগর। এইখানেই প্রয়াগ, বারাণসী, এইখানেই চন্দ্র দিবাকর।

দেহাসরিসঅ তিত্থ মাই সুহঅ ণ দীঠ্ঠও।[৪]

দেহসদৃশ তীর্থ ও সুখ অন্যত্র কোথাও নাই।

শরীরের মধ্যেই তাঁহারা অশরীরীর অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়াছেন। বলিয়াছেন—শরীরের মধ্যেই অশরীরী আছেন, বাহিরে জিজ্ঞাসা করিবার কি

১। বৌদ্ধগান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৫৮, পৃঃ ৭৮—৮১।
২। ঐ, পৃঃ ১১৭।
৩। ঐ, পৃঃ ৯৫।
৪। ঐ, পৃঃ ৯৬।

প্রয়োজন? আপন পতিকে স্বগৃহে দেখিয়া প্রতিবেশীর কাছে কে তাহার সন্ধান জানিতে চাহে?

ঘরে অচ্ছ ঘরে অচ্ছই বাহিরে কুই পুচ্ছই।
পই দেক্‌খই পড়বেসী পুচ্ছই ॥[১]

'বুদ্ধ' বা পরমজ্ঞান দেহের মধ্যেই অবস্থিত—

'দেহহি বুদ্ধ বসন্ত'। সুতরাং বাহিরে তাঁহার সন্ধান করার সার্থকতা কোথায়?

সিদ্ধাচার্যের সাধন গুহ্য, এইজন্য গুরুর সাহায্য ব্যতীত এই সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। দোহাকারগণ গুরুকে বুদ্ধেরও উপরে স্থান দিয়াছেন। সূক্ষ্ম সহজ তত্ত্ব জানিতে হইলে গুরুর আদেশ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই পালন করিতে হইবে। যথা—

জই গুরু কহই কি সব্ব বি জানী।
মোক্‌খ কি লব্বই সঅল বি জানী ॥[২]

ডাকার্ণবে[৩] ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের ভিত্তিতে বজ্রযান তত্ত্ব পরিবেশিত হইয়াছে। বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ ত্রিরত্নের স্থানে এখানে 'বজ্র' প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। 'বজ্র' হইতেছেন—'ত্রিসূচিকং ভাবয়েদ্বজ্রম্'।[৪] এই 'বজ্র' ত্রিরত্নের প্রতীক। পুঁথির অপভ্রংশ ভাষায় রচিত অংশ গুরুমুখী বলিয়া দুর্বোধ্য। এই দুর্বোধ্য অংশে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতাশ্রয়ী গভীর ভাব পরিবেশিত হইয়াছে। যথা—

সুণু সুণু বোহিয় পঞ্চু গঞো
ণকমস্তো উতানক চিত্তমায়
সই ইহাবই অটসি তুম্ম
তিহুঅণ সল্ল উতার অজিম্ম ॥[৫]

১। বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃঃ ১০১। ২। ঐ, পৃঃ ১০১।

৩। ডাকার্ণব ত্রয়োবিংশ পটলে বিভক্ত অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত, মধ্যে মধ্যে সুদীর্ঘ সৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষায় উদ্ধৃতি রহিয়াছে। ডাকার্ণব জ্ঞানবুদ্ধ বজ্রযানী আচার্যের রচনা। সম্ভবতঃ তিব্বতী 'গদ্‌গ' (প্রজ্ঞা, জ্ঞান) শব্দ হইতে ডাকের উৎপত্তি। অতএব ডাকার্ণব শব্দের অর্থ 'জ্ঞানার্ণব'। এই পুঁথির দুই জায়গায় ডাকার্ণবকে জ্ঞানার্ণব বলা হইয়াছে। (পুঁথির প্রথম শ্লোকে এবং প্রথম পটলের সমাপ্তিতে) সুতরাং ডাক ও জ্ঞান নিঃসন্দেহে অভিন্ন। ডাক স্থানে স্থানে বজ্রডাক এবং ভগবান ডাক বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন।

৪। বৌদ্ধগান ও দোহার অন্তর্গত ডাকার্ণব, দ্বাদশ পটল, পৃঃ ১৫৫।

৫। ঐ, প্রথম পটল, পৃঃ ১২৮।

অর্থাৎ প্রপঞ্চ গত বোধিকে জান, কামনাসক্ত চিত্ত উদ্ধার করিতে পারে না। তুমি মায়া স্বভাবে থাকিয়া ত্রিভুবনের সকলকে উদ্ধার কর।

ইহ ণ ভাব সভাব ণ রগ্‌গ, বিরগ্‌গ ম ণঠই ওবণ রজ্জ।
মজ্জঠিও অত্তধম্মু ণ রজ্জহু। রজ্জহু বজবিণিধম্মু পমেজ্জু॥[১]

এইখানে ভাব নাই, অভাবও নাই, রাগ নাই, বিরাগও নাই। কাজেই এইখানে অনুরক্ত হও। মধ্যস্থিত ধর্মে আসক্ত হইও না। যে বজ্র ধর্ম হইতে অভিন্ন সেই বজ্রে অনুরক্ত হও এবং তাহাকে লইয়া আনন্দ কর।

অন্যত্র—

রম রম পরম মহাসুখ বজ্জু।[২]

এই মহাসুখই মহাপ্রভু, মহাশূন্য। তিনি করুণা, তিনিই সর্বদেবতা, তিনিই পরমাত্মীয় এবং তিনিই বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ।

বৌদ্ধ ভাবধারা আশ্রয় করিয়া প্রধানতঃ সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় যে বিপুল সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দেওয়া হইল। পণ্ডিতগণের মতে মাগধী অপভ্রংশ স্বাভাবিক পরিণতির পথে প্রাচীনতম বাংলাভাষার জন্মদান করিয়াছে। খৃঃ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এই নবসৃজ্যমান ভাষায় প্রথম গান রচনা করেন।[৩] এই গানের সুরে, তাহার সান্ধ্যভাষায় এবং চিত্রকল্পে সাধকদের সহজ সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত এবং সিদ্ধকাম সাধকের প্রাণের আনন্দানুভূতি শাশ্বত কাব্যমূলে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে।

১। বৌদ্ধ গান ও দোহার অন্তর্গত ডাকার্নব, পৃঃ ১৩১।
২। ঐ, তৃতীয় পটল, পৃঃ ১৫৩।
৩। **History of Bengal, Vol. I, op. cit, p. 384**

প্রথম পরিচ্ছেদ

চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

স্বর্গত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তান্ত্রিক বৌদ্ধদের রচনাসংগ্রহ কার্য প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃঃ তাঁহার Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনটি সেই সময়ে বহু অনুসন্ধিৎসু ও সুধী ব্যক্তিকে নেপালের বিভিন্ন স্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত দুষ্প্রাপ্য এবং অবহেলিত পুঁথি সংগ্রহে প্রেরণা দিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও নেপাল পরিভ্রমণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে ধর্মঠাকুরের পুঁথিপত্রের মধ্যে বাঙলার বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় নিহিত আছে নেপালের বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য তাহারই সুশৃংখল সংস্করণ। ১৯১৬ খৃঃ চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদের ও কৃষ্ণপাদের টীকাসহ দোহা এবং ডাকার্ণব প্রভৃতি তাঁহার সংগৃহীত চারিখানি গ্রন্থ 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' এই নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রকাশনায় একদিকে যেমন নির্মীয়মান বাংলা ভাষার রূপরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের চরম পরিণতিও সূচিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ সহজযানী আচার্যদের রচনায় বাংলা ভাষায় প্রথম জাতকর্ম সম্পন্ন হইয়াছিল। সহজযানীরা শুধু ধর্মের তত্ত্বকেই সহজ করিয়া গ্রহণ করেন নাই, সহজ কথাকে সহজ ভঙ্গীতে ও সহজ ভাষায় বলিবার প্রয়াসও করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন বাঙলাদেশের জনগণের ভাষায় পদ রচনা করিলে তাহা অধিকতর লোকপ্রিয় হইয়া উঠিবে। এই জন্য তাঁহারা নবসৃজ্য বাংলা ভাষাতেই আপন আপন সাধনালব্ধ অনুভূতি প্রচার করিয়াছিলেন। চর্যাপদই সেই নিদর্শন।

চর্যাপদের কবিগণ প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের নঙর্থক নির্বাণকে সহজানন্দে পরিণত করিয়াছিলেন আবার মহাযানী আচার্যদের সংস্কৃত ভাষাপ্রীতিকেও বর্জন করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, জনগণের ভাষার ঐতিহ্যকে ধারণ ও বহন করিয়া তাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সৃজনকর্মও সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক কাজটির জন্য বাঙালী ও বাংলা ভাষার পাঠকের নিকট সহজাচার্যগণ চিরনমস্য। বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মের কুহেলিকাচ্ছন্ন

প্রচ্ছদপটের বুকে একটি প্রাণোজ্জ্বল কিশলয়ের ন্যায় চর্যাপদের বাংলা ভাষা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে সম্প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ দুই ধারার মিলনতীর্থ হইতে বাঙালীর সাহিত্য-মানস প্রথম উৎসারিত হইয়াছিল। দুইটি ধারার বিচিত্র সঙ্গমের ফলে চর্যার বাগ্‌বৈদগ্ধের কৌশলে, ছন্দে ও অলঙ্কারগত সৌন্দর্যে এক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় ঐতিহ্যের মহৎ স্বীকৃতি পরিস্ফুট হইয়াছে। বাংলা ছন্দের বিবর্তনেও চর্যাপদের দান কম নয়। বাংলা পয়ার ও ত্রিপদীর সুরঝঙ্কার প্রথম চর্যাপদেই শ্রুত হইয়াছে। চর্যাপদের ছন্দের সর্বাপেক্ষা বড় দান—ইহা সংস্কৃতের গতানুগতিক ধারাকে অনুসরণ না করিয়া বাংলা ছন্দের জন্য নূতন পথ তৈয়ার করিয়াছে। সংস্কৃত ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার কম, পদান্তমিল স্বাভাবিক নহে। কিন্তু চর্যাপদ সংস্কৃতের জাতিছন্দকে অনুসরণ না করিয়া বৃত্তছন্দকে গ্রহণ করিয়াছে এবং বাংলা ছন্দের আপন পথ নির্দেশ করিয়াছে। চর্যায় অন্ত্যানুপ্রাসে পদান্তমিলের প্রাবল্য লক্ষ্যণীয়। যথা—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥[১]

এবং

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥[২]

কিন্তু অক্ষরসমতা সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। যেমন :

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী ॥[৩]

দীর্ঘকাল পূর্বে বৌদ্ধ আচার্যগণ সংস্কৃত ব্যাকরণের গতানুগতিক নিয়মধারা ভঙ্গ করিয়া সেযুগের কথ্যভাষা প্রাকৃত হইতে শব্দ, পদ ও পদপ্রয়োগরীতি গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ-সংস্কৃত[৪] ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আদিযুগের প্রথম বাঙালী কবি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণও তেমনি ছন্দসচেতনতা এবং অক্ষরের নিয়মরক্ষা প্রভৃতি প্রচলিত নিয়মের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন নাই। তাঁহাদের পদে কখনও দেহাসক্তি পূর্ণ মনন কখন দুরূহ তত্ত্বকথা প্রাধান্য পাইয়াছে। পারিপাট্য বা ব্যাকরণের নিপুণ নিয়মাবলীর প্রতি কবিগণের সজাগ দৃষ্টি পতিত হয় নাই।

১। চর্যাপদ সংখ্যা : ৮ ২। চর্যাপদ সংখ্যা : ৩
৩। ঐ : ১৭।
৪। মহাবস্তু, ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক প্রভৃতি গ্রন্থ বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

সিদ্ধাচার্যগণ তাঁহাদের গান ও দোহার মধ্যে কোন নূতন জীবনাদর্শ বা দর্শন সৃষ্টি করেন নাই। বহু শতাব্দী পূর্বে যাহার উদ্ভব হইয়াছিল, দীর্ঘদিন যাহা পৃথিবীর দুঃখতাড়িত মুমুক্ষু মানুষকে মুক্তির মার্গ প্রদর্শন করিয়াছে সেই আদর্শ ও দর্শনই কাল প্রবাহে বিবর্তিত হইয়া তাঁহাদের সাধনতত্ত্বে ও দার্শনিক চিন্তায় অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। সুতরাং চর্যাপদের কবিগণকে বৌদ্ধবিহার নিবাসী ভিক্ষুগণের উত্তর-সাধক বলা যাইতে পারে। নির্বাণ ও মহাসুখবাদ, শূন্যতত্ত্ব ও করুণা এবং মজ্ঝিমপটিপদা বা মধ্যপন্থা প্রভৃতি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সিদ্ধাচার্যগণ স্থানে স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন আবার কখনও কখনও প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন এবং নবীন মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের সমন্বয়সাধন করিয়াছেন।

নির্বাণ ও মহাসুখবাদ

'নির্বাণ' শব্দের অর্থ কি? যাহা 'বাণ' হইতে অর্থাৎ বন্ধন হইতে মুক্তি দেয় তাহাই নির্বাণ। কিসের বাণ? তণ্হা বা তৃষ্ণার বাণ, অভিধম্মাত্থসংগহের টীকা বিভাবনীর ভাষায়—'খন্ধাদি ভেদে তেভূমক ধম্মে হেট্ঠু-পরিয়—বসেন বিননতো সংসিব্বন তো বাণ সঙ্খাতায় তণহায় নিক্খন্তত্তা বিসয়াতিক্কম—বসেন অতীতত্তা।'[১] তৃষ্ণা মানুষকে কাম রূপ ও অরূপলোকে আবদ্ধ রাখিয়া সর্ববিধ কর্ম সম্পাদন করাইতেছে। ত্রিভূমির ঊর্ধ্বে, অধেঃ জন্মমৃত্যুর চক্রে অবরুদ্ধ থাকিয়া মনুষ্য বিঘূর্ণিত হইতেছে। এই বন্ধন অতিক্রম করাই নির্বাণ। নির্বাণ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের কোন বিশেষ অভিমত পাওয়া যায় না। নিরঞ্জনা নদীর উপকণ্ঠে, বোধিবৃক্ষমূলে সত্যার্থী গৌতমের অন্তর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। নির্বাণে অধিষ্ঠিত হইবার পর নির্বাণ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম কণ্ঠনিঃসৃত বাণী—এই ধর্ম গভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিতবেদনীয়।'[২]

'নির্বাণ' জন্মমৃত্যু প্রবাহের চরম স্থিতি—ভবচক্রের ঘূর্ণনের চরম সমাপ্তি। নির্বাণ তৃষ্ণাক্ষয়কারী এবং পুনর্জন্মের নিরোধকারী। তৃষ্ণা তৈল এবং দুঃখ দীপশিখার প্রতীক। পালি সাহিত্যে ছোট একটি কাহিনী পাওয়া যায়।[৩] যুবরাজ সিদ্ধার্থ রথারোহণে নগর পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। রাজকুমারকে দর্শন করিবার জন্য প্রাসাদশীর্ষে ও গবাক্ষপথে উৎসুক নরনারীর ভীড়। তাঁহার

১। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি অনূদিত, ১৯৪০, পৃঃ ২০০।

২। মজ্ঝিমনিকায়, ১ম খণ্ড, P. T. S, পৃঃ ১৬৭,

৩। নিদানকথা, Fausboll, Jataka, Vol. I, pp. 60-61.।

অনুপম দেহকান্তি কিসা গোতমীর হৃদয়কে মুগ্ধ করিল। তাহার সপ্রশংস উক্তি রাজকুমারের কর্ণগোচর হইল :—

নিব্বুতা নূন সা মাতা, নিব্বুতা নূন সো পিতা।
নিব্বুতা নূন সা নারী যস্সায়ং ঈদিসো পতীতি ॥

কিসা গোতমীর "নিব্বুতা" শব্দটি পরম জিজ্ঞাসারূপে কুমারের হৃদয়কে স্পর্শ করিল—'কস্মিং নু খো নিব্বুতে হৃদয়ং নিব্বুতং নাম হোতি' : অবশেষে আপন অন্তরের আলোকে সমস্ত জিজ্ঞাসার সমাধানও পাওয়া গেল—'রাগগ্গিম্হি নিব্বুতে নিব্বুতং নাম হোতি, দোসগ্গিম্হি মোহগ্গিম্হি নিব্বুতে নিববুতং নাম হোতি'। হৃদয়ের রাগের আগুন, দ্বেষের আগুন, মোহের আগুন নির্বাপিত হইলে তবেই নিৰ্বাণ। সেই দিন হইতে যুবরাজ গৌতম নির্বাণের অনুসন্ধিৎসু হইলেন—'অহং হি নিব্বাণং গবেসন্তো চরামি।' রতনসুত্তেও এই মতের প্রতিধ্বনি শুনা যায়। যথা—

খীনং পুরাণং নবং নত্থিসম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আযতিকে ভবস্মিং
তে খীণবীজা অবিরুলহিচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো [১]

যাঁহাদের পুরাতন কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, নূতন কর্ম উৎপন্নের সম্ভাবনা নাই, পুনর্ভবেও আসক্তি নাই, যাঁহাদের জন্ম নিরোধ হইয়াছে, যাঁহারা তৃষ্ণাক্ষয় হেতু পুনর্জন্মে বীতস্পৃহ সেই ধীর ব্যক্তিগণ প্রদীপের ন্যায় নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ প্রশ্ন করিয়াছেন নিরোধই কি নির্বাণ? নাগসেন বলিয়াছেন, 'নিরোধই নির্বাণ'। নিরোধের প্রকৃতি সম্বন্ধেও বলিয়াছেন—শ্রুতবান্ আর্যশ্রাবক আধ্যাত্মিক ও বাহ্য আয়তনে অবস্থান করেন না, সেইজন্য তাঁহার তৃষ্ণার নিরোধ হয়। তৃষ্ণার নিরোধে ভবের নিরোধ হয়, ভবের নিরোধে জাতির নিরোধ হয়, জাতির নিরোধে জরা-মরণ-শোক-পরিবেদনা-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াসের নিরোধ হয়। এই নিরোধই নির্বাণ। নির্বাণ জন্মমৃত্যুর আয়ত্তের বাহিরে, রোগ শোক ও দুঃখের অতীত। ইহা কোন অবস্থা বিশেষ নয়, প্রাপ্তব্য বস্তুও নয়। 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'[২] বা

১। খুদ্দক পাঠ, Ed. Helmer Smith, 1959, p 5

২। অষ্ট আর্যমার্গ : সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

'সাইত্রিশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম'[১] ও নির্বাণ প্রদান করিতে পারে না। সাধকের মানস নেত্রে আলোকচ্ছটার ন্যায় (আভাস) ইহা উদ্‌ভাসিত হয়। সাধক ঊর্ধ্বায়নের পথে 'নেবসঞঞা নাসঞঞায়তন' ছাড়াইয়া 'সঞঞাবেদয়িতনিরোধ' স্তর যাহা মৃত্যুর সমতুল্য সেই স্তরে উপনীত হইয়াও নির্বাণলাভে বঞ্চিত হইতে পারেন; যদি তিনি এই ভাবনা হইতে মুক্ত হইতে না পারেন যে, তিনি ধ্যান দ্বারা সর্বোচ্চ মানসিক শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি যতক্ষণ 'নেবসঞঞা-য়তন' স্তরের সহিত তাঁহার যে সংযুক্তি তাহা হইতে নিজের চিত্তকে বিমুক্ত করিতে না পারেন ততক্ষণ তিনি 'সম্যক্ নির্বাণাধিমুক্ত' বলিয়া গণ্য হইবেন না। 'নির্বাণ' কেবল ধ্যান—সে ধ্যান যত সূক্ষ্মই হউক না কেন তাহা দ্বারা লভ্য নহে, প্রয়োজন সত্যোপলব্ধির জন্য মানসিক প্রস্তুতি। নির্বাণ লাভ করার প্রাথমিক প্রস্তুতি ধ্যানস্তরসমূহ উত্তরণ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত দেশনার মূল কথা পরম সত্য বা ধ্রুবসত্য জানিতে হইলে অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে হইবে। অহংবোধ বর্জন করিয়াই বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষমূলে 'দুক্খং সমুদয়ং নিরোধং মগ্‌গং'—এই চারি সত্যমন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। এই অহংবোধকে তিনি বলিয়াছেন কামনা। কেবল জাগতিক বস্তু নিচয়ের প্রতিই নয় 'অভিঞঞা' 'ঝাণ' এবং 'সমাপত্তির' প্রতি, 'দিট্‌ঠ' 'সুত' 'মুত', ও 'বিঞঞাত,'[২]—এর প্রতি এবং জাগতিক বস্তুর 'একত্ত', 'নানত্ত' এবং 'সব্বম'এর প্রতিও কামরহিত হইতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। বুদ্ধ এবং তথাগতগণ মৈত্রী এবং করুণারও ঊর্ধ্বে, তাঁহারা বহু কষ্টায়ত্ত নির্বাণকেও সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠতম স্তর বলিয়া মনে করেন না। এই পথেই সত্যার্থী গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহাই 'অদ্বয়ং অদ্বৈধীকারং' অর্থাৎ দ্বৈতবোধের বিলোপ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নির্বাণ 'শূন্যস্বভাব', নির্বাণ রাগদ্বেষ মোহশূন্য এবং সর্ববিধ সংস্কার-শূন্য। নির্বাণ 'অনিমিত্ত'—রাগাদি নিমিত্তরহিত, নির্বাণ 'অপ্রনিহিত'—প্রনিধি ও তৃষ্ণা বিরহিত, নির্বাণ 'অচ্যুত'—চ্যবনরহিত, নির্বাণ 'অনন্ত'—অন্ত

১। বোধিপক্‌খিয়ধম্মা: ৩৭টি বোধিপক্ষধর্ম সম্বোধিলাভের সহায়করূপে স্বীকৃত। এই ধর্মসমূহ ৭টি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—১। সতিপট্‌ঠান: ৪, ২। সম্মপ্পধান: ৪, ৩। ইদ্ধিপাদ: ৪, ৪। ইন্দ্রিয়: ৫, ৫। বল: ৫, ৬। সম্বোজ্ঝঙ্গ: ৭, ৭। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। দ্র:—N. Datta, Early Monastic Buddhism, Ch XII, 1960 pp 246-51.

২। মজ্ঝিমনিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০ (দিট্‌ঠে...সুতে মুতে বিঞঞাতে অনুপায়ো অনিস্‌সিতো অপ্পটিবদ্ধো বিপ্পমুত্তো ইত্যাদি)।

বা পর্যবসান রহিত, নির্বাণ 'অসংবৃত'—প্রত্যয়াদি দ্বারা কৃত নয়, নির্বাণ 'অনুত্তর' কারণ ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই।

কিন্তু নির্বাণ কেবলমাত্র বাসনার বিলোপ নয়, ইহা শাশ্বত শান্তিপূর্ণ, মুক্ত ও বিশুদ্ধ অবস্থা। নির্বাণলাভের পরেও বুদ্ধদেব নিষ্ক্রিয় শূন্য জীবন যাপন করেন নাই। জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত তিনি জীবকল্যাণে রত ছিলেন। সুতরাং নির্বাণ জীবনের চরম বিলুপ্তি নয়—শান্ত, বিশুদ্ধ, আনন্দপরিপূর্ণ অবস্থা। ক্লেশকর্মবিপাক এই ত্রিচক্র হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় সেই দুঃখের উপশমই নির্বাণ। এই জন্যই নির্বাণ শান্তিপ্রদ। ইহা তণ্হার পরিতৃপ্তিতে যে সুখ সেই সুখ নয়—ইহা তণ্হাক্ষয়জ সুখ, বেদায়িত সুখ নয়—পরমসুখ। 'ধম্মপদ' গ্রন্থে নির্বাণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'নিব্বাণং পরমং সুখং' (২০৪), 'অমতং পদং' (১১৪)। নির্বাণ এইখানে অনির্বচনীয় মোক্ষরূপে স্থান পাইয়াছে। ইহা অদুঃখ, অসুখ, অব্যাধি, অজর, অমর। ইহা ন অন্ত, ন অনন্ত, ইহা শান্তি ও আনন্দপরিপূর্ণ। এ ছাড়াও বহু পদে নির্বাণকে, 'সন্তিবরপদং', 'পরমং সন্তিং, 'অমতোপদং', 'একরসং' রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সমস্তই সংজ্ঞা, সুতরাং সংবৃত্ত সত্য, কোনটাই নির্বাণের যথার্থ অর্থ প্রকাশক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। কখনও অভাবাত্মক, কখনও ভাবাত্মকরূপে ইহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। নির্বাণ অভাবাত্মক অথবা ভাবাত্মক এই প্রশ্নেরও মীমাংসা হয় নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণের নঙর্থক স্বরূপই প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু নির্বাণ কেবল অভাবাত্মক নয়—ইহা ভাবাত্মকও বটে। 'মিলিন্দ প্রশ্নে' নাগসেন বলিয়াছেন—কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দ্বারা নির্বাণকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যেমন আমরা আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না, তেমনি নির্বাণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে না পারিলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। কতকগুলি সুন্দর উপমা সাহায্যে নির্বাণের গুণও তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পদ্ম যেমন জলে অনুলিপ্ত হয় না; নির্বাণও তেমনি কিলেস (ক্লেশ) দ্বারা সংক্লিষ্ট হয় না, জল যেমন শৈত্যগুণযুক্ত এবং পিপাসা-নিবৃত্তিকারী, নির্বাণও তেমনি কিলেসহীন হওয়ায় শীতল ও শান্ত স্বভাব। ঔষধ যেমন জাগতিক ব্যাধির উপশমকারী নির্বাণও তেমনি কিলেস বিষের উপশমকারী, সমস্ত ভবদুঃখের নিবৃত্তিকারী। খাদ্যের ন্যায় নির্বাণও সামর্থ্য দান করে, আকাশের ন্যায় নির্বাণ উৎপন্ন হয় না, উৎপাদন করেও না। মূল্যবান রত্নের ন্যায় নির্বাণও অমূল্য, অনন্ত, আশা-আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিকারী। রক্তচন্দনের ন্যায় নির্বাণও সুদুর্লভ ও

সুবাসিত। নবনীত প্রস্তুত সামগ্রীর স্থায় ইহাও গুণবর্ণসম্পন্ন, শীলগন্ধসম্পন্ন এবং রসসম্পন্ন। পর্বতশৃঙ্গের স্থায় নির্বাণ সুউচ্চ, দুরারোহ, অপরিবর্তনীয় এবং ক্লেশ বা কিলেস বীজধ্বংসকারী।

পর্বত শৃঙ্গের স্থায় যাহা দুরারোহ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে সেই নির্বাণকে ভগবান বুদ্ধদেব একটিমাত্র সূত্রে অতি সহজে অধিগম্য করিয়া তুলিয়াছেন। 'মজ্ঝিমনিকায়' গ্রন্থে বুদ্ধদেব শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মবিহারের—মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষার অনুশীলনকে নির্বাণ লাভের উপায়রূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন—'একায়নো অয়ং ভিক্খবে মগ্‌গো সত্তানং বিসুদ্ধিয়া...যদ ইদং চত্তারো সতি পটঠনা।"[১]

এই আদর্শ প্রাতিমোক্ষ নিয়ম পালনের প্রতি কম প্রাধান্য প্রদান করিয়া বৌদ্ধজগতে একটি নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছে। 'বত্থুপম সুত্তে' ভগবান শ্রদ্ধাদ্বারা নির্বাণ লাভের পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। ভিক্ষু প্রথমে 'অভিজ্ঝা', 'মচ্ছরিয়', মকৃখ', 'মায়া' ইত্যাদি আসব হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিরত্নে—বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবেন। এই শ্রদ্ধা তাঁহাকে সুখ প্রদান করিবে, সুখ আনন্দ ও গভীর প্রীতি উৎপাদন করিবে, তাঁহার দেহকে স্থির ও মনকে প্রশান্ত এবং সর্বশেষে মানসিক স্থিরতা প্রদান করিবে। মানসিক স্থিতি লাভ করিয়া বিশ্বের সর্বদিকে, সর্ব সত্তার প্রতি তিনি মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা বিস্তার করিয়া দিবেন। চারি ব্রহ্মবিহারে পারঙ্গম হইলে তিনি 'চারি আর্য সত্য' উপলব্ধি করেন, ত্রিদোষ বা আসব—'কাম', 'ভব', 'অবিজ্জা' হইতে মুক্তি লাভ করেন। তখন তিনি অনুভব করেন তাঁহার কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার পুনর্জন্ম রোধ হইয়াছে, এইভাবে তিনি নির্বাণে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। এই পন্থা দ্বারা যাঁহারা ভিক্ষু নহেন, ভিক্ষুণীও নহেন, যাঁহারা প্রব্রজ্যা উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করিতে এবং প্রাতিমোক্ষ পালন করিতে অসমর্থ তাঁহারাও নির্বাণ লাভ করিতে পারেন এই মতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। এই পথ গৃহীদের নিকট বৌদ্ধধর্মকে সহজ গ্রহণীয় ও জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। অশোকপূর্ব যুগেই শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মবিহারের অনুশীলন নির্বাণ লাভের সহজতম ও সরলতম পথরূপে একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। মজ্ঝিমনিকায় ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫—৫৬।

খৃঃ ১ম শতাব্দীতে দার্শনিকপ্রবর নাগার্জুন তাঁহার মাধ্যমিক কারিকায় নির্বাণের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। নির্বাণ হইতেছে—

অপ্রহীনম অসম্প্রাপ্তম অনুচ্ছিন্নম অশাশ্বতম।

অনিরুদ্ধম অনুৎপন্নম এতৎ নির্বাণম উচ্যতে॥[১] এইভাবে নাগার্জুন নির্বাণের নেতিবাচক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই নেতিবাচক নির্বাণ অস্তি নয়, নাস্তি নয়, তদুভয়ও নয়, ইহা চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত, এবং তাহাই শূন্য। নাগার্জুন এক নির্বিকার, নির্গুণ পরমার্থিক সত্তারও কল্পনা করিয়াছেন যাহা কেবল অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা অনুভবনীয়। তিনি ইহাকে বুদ্ধকায় বা তথাগত বলিয়াছেন। যাঁহারা তৃষ্ণাবিজয়ী, শুদ্ধচিত্ত তাঁহারাই এই নির্বিশেষ পরমার্থ সত্তা উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধিই নির্বাণ। অশ্বঘোষের মতে পরমার্থিক আত্মা বেদান্তের পুরুষের ন্যায় অথবা উপনিষদের ব্রহ্মের ন্যায় অসীম, সনাতন, নির্গুণ নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়, জন্মমৃত্যুর অতীত, শাশ্বত। এই অনন্ত অসীম আত্মাকে অশ্বঘোষ তথতা (Thatness) বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। তথতা এক নয়, বহুও নয়, ইহা সৎ নয়, অসৎও নয়,—তথতাই ইহার একমাত্র পরিচয়বাহী নাম। উত্তাল বায়ুপ্রবাহের অবসানে যেমন সমুদ্রবক্ষ স্থির শান্ত ও অবিক্ষুব্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তেমনই অবিদ্যার ও তৃষ্ণার বিলোপে অনির্বচনীয় তথতার বা ধর্মধাতুর প্রকাশ ঘটে। এই অবস্থাই নির্বাণ।

এইভাবে প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণ বহু স্তরপরম্পরা অতিক্রম করিয়া বজ্রযানী সাধকদের কাছে বিশেষ করিয়া সহজাচার্যদের দোহায় ও গানে মহাসুখরূপে বিবর্তিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে নির্বাণই হইতেছে ধর্মকায়, ধর্মকায়ই ভগবান বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবই বজ্রধর অথবা বজ্রসত্ত্ব—তিনিই মহাসুখ। মহাসুখই সহজানন্দ। যাহা সহজ তাহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ জ্ঞানই মহাসুখ। শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায়—With them nirvana is the ultimate reality,—it is the Dharma-Kaya,—and that is the Lord Buddha—that is the Vajra-dhara or the Vajra Sattva ;—it is the Mahasukha,—it is the Bodhicitta, it is the Shaja,—it is the pure consciousness, and the nature of pure consciousness is bliss. ।[২]

১। মাধ্যমিক বৃত্তি, পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫২১ (Levi's Edition)
২। An Introduction to Tantric Buddhism, 1950, pp 148-49.

বৌদ্ধতন্ত্র সাহিত্যে নির্বাণ 'সততসুখময়া' রূপে আখ্যাত হইয়াছে। এই 'সুখ' ধ্বংসহীন, সর্বগুণযুক্ত, ইহা সুখাবতী অর্থাৎ যাহারা চরম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন সেই বুদ্ধগণের বুদ্ধত্ব লাভের অবস্থা। তন্ত্রসাহিত্যে 'সুখ' বিকল্পরূপেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু নির্বাণ হইতেছে সকল প্রকার বিকল্পের সমাপ্তি। চর্যাকার ধামাপাদ মহাসুখের অনুভূতির উর্ধ্বে নির্বাণের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। সাধকের হৃদয়ে মহাসুখ-রাগরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তাঁহার বিষয়ানুভূতি বিদূরিত হয় এবং তিনি সবিকল্প জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া নির্বিকল্প জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। এই অবস্থায় তিনি মহাসুখ উপভোগ করেন। ধামাপাদ এইখানেই থামিয়া যাইতে পারেন নাই। বলিয়াছেন—

ডাহ ডোম্বীঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই সিঞ্চ হুঁ পানী ॥[১]

নির্বিকল্প জ্ঞানদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া 'মহাসুখ'রূপ অগ্নিকেও নির্বাপিত করিতে হইবে তবেই নির্বাণে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হইবে। সরহপাদের দোহার টীকায়ও চরম অবস্থারূপে মহাসুখকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। বলা হইয়াছে—জ্ঞানের সদর্থক অথবা নঙর্থক কোন অবস্থার প্রতীকরূপে সুখ-বাদকে গ্রহণ করা যায় না। কোন জ্ঞানীই বিকল্পে প্রবেশ করিবে না, কারণ স্বর্ণশিকল ও লৌহশিকলে কোন পার্থক্য নাই—দুই-ই বন্ধনের প্রতীক, দুই দুঃখ উৎপাদনকারী।

জ্বালানি কাষ্ঠের অগ্নি ও চন্দন কাষ্ঠের অগ্নি—দুইই এক, দুই-ই দাহিকাশক্তিশালী।

সহজযানী আচার্যেরা 'পঞ্চকাম' উপভোগের পথে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের মতে পঞ্চকাম উপভোগ করিতে হইবে, তবে উপভোগের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। 'সবই শূন্য'—এই বোধ হৃদয়ে জাগ্রত রাখিয়া বিষয়রস ও পঞ্চ ম-কারের সেবা কর। দেখা যাইতেছে হীনযান-মহাযান দর্শনের নির্বাণ যাহা কেবল বিশুদ্ধ তত্ত্বমাত্র ছিল সহজাচার্যগণ সেই বিশুদ্ধ তত্ত্বকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আলোকে প্রত্যক্ষীভূত করিয়া তাঁহাদের গানে পরিবেশন করিয়াছেন। এইভাব তান্ত্রিক মহাসুখবাদে আসিয়া বৌদ্ধ নির্বাণের চরম পরিণতি ঘটিয়াছে।

মন্ত্রযানের দ্বিতীয় স্তরে মহাসুখবাদ তত্ত্ব যুক্ত হইয়া বজ্রযানের আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। বুদ্ধদেব অনাত্মবাদী ছিলেন—আত্মার অস্তিত্ব তিনি স্বীকার

১। চর্যাপদ সংখ্যা: ৪৭।

করেন নাই। বজ্রযানে নৈরাত্ম দেবীরূপে কল্পিতা হইয়াছেন। বোধিচিত্ত—যে চিত্ত কেবল বোধি বা সম্যক্ জ্ঞান লাভের সঙ্কল্প দ্বারা বজ্রস্বরূপ স্থির স্বভাব সেই চিত্ত নৈরাত্মাদেবীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাতেই লীন হইয়া যাইতে পারিলে তবেই মহাসুখ লাভ ঘটে। কিভাবে লীন হইতে হইবে? যেমন জল নিঃশেষে জলের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।—

পিঅ মণ মুণহু রে ণিউণেঁ জোই।
জিম জল জলহিং মিলন্তেই ॥[১]

চিত্তে বোধিজ্ঞান বা সম্যক্ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে চিত্তের ঊর্ধ্বায়ন শুরু হয়। অবশেষে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া বোধিচিত্ত শেষ স্তরে সর্বোর্ধ্বে উপনীত হয়। বৌদ্ধতন্ত্রে এই স্তর পরম্পরাকে চারটি পদ্মে বা চক্রে ভাগ করা হইয়াছে। নাভিতে নির্মাণচক্র, হৃদয়ে ধর্মচক্র, কণ্ঠে সম্ভোগচক্র এবং মস্তকে উষ্ণীষ-কমলে মহাসুখচক্র। উষ্ণীষ-কমলে আসিয়া বোধিচিত্ত স্থিতি লাভ করে এবং উষ্ণিষ-কমলস্থিত অমৃতধারা পান করিয়া মহাসুখ লাভ করে। ইহাই মহাসুখ তত্ত্ব। এই মহাসুখকেই সহজিয়া সাধকগণ সহজস্বরূপ বা সহজানন্দ বলিয়াছেন। মহাসুখ লাভ করিয়া সাধক যে অনির্বচনীয় স্তরে উন্নীত হইয়া থাকেন তাহার সম্বন্ধে আগমশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

ইন্দ্রিয়াণি স্বপন্তীব মনোহন্তর্বিশতীব চ।
নষ্টচেষ্ট ইবাভাতি কায়ঃ সৎসুখমূর্ছিতঃ ॥[২]

পাণ্ডিত্যের মত্ততা এই সহজানন্দ লাভের পরিপন্থী। সুপক্ক বিল্বফলের চারিপার্শ্বে গুঞ্জনরত অলি যেমন কেবল গন্ধমাত্রই লাভ করে, আসল বস্তুর স্বাদে বঞ্চিত থাকে, পাণ্ডিত্যের দ্বারাও তেমনি সহজানন্দ উপলব্ধি করা যায় না। আবার তন্ত্রমন্ত্র ধ্যান-ধারণার দ্বারাও তাহা লভ্য নয়। বলা হইয়াছে—

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণেবখানে।

এই সহজানন্দের প্রকৃতি কিরূপ :

তস্মাৎ সহজং জগৎ সর্বং সহজং সরূপমুচ্যতে
স্বরূপমেব নির্বাণং বিশুদ্ধাকার চেতসঃ ॥[৩]

১। বৌদ্ধগান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৫৮, পৃঃ ৯০।

২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বৌদ্ধধর্ম' ১৩৫৫, ৭২ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।

৩। হেবজ্রতন্ত্র, MS. (A. S. B. No 11317) p 36 (B) ; S. B, Das Gupta, Obscure Religious Cults. 1962, p 78.

সহাজনন্দ বা মহাসুখ শাশ্বত, আদি-অন্ত রহিত এক অদ্বয় তত্ত্ব—

আই-রহিঅ এহু অন্ত-রহিঅ।
বরগুরু পাঅ অদ্দয় কহিঅ ॥[১]

এই 'অদ্বয়' মহাসুখস্তরে যখন বোধিচিত্ত প্রতিষ্ঠা অর্জন করে তখন সাধকের সমস্ত সঙ্কল্প বিকল্পের বিলয় ঘটে, জ্ঞাতৃত্ব—জ্ঞেয়ত্ব, গ্রাহ্যত্ব—গ্রাহকত্ব প্রভৃতির নিঃশেষ অবসান হয়।

বোধিচিত্ত কি? 'শূন্যতা' করুণাভিন্নং বোধিচিত্তং তদুচ্যতে।' শূন্যতা ও করুণার অভিন্ন অদ্বয় অবস্থাই বোধিচিত্ত। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যতাধর্মী নঙর্থক নির্বাণের সঙ্গে পরবর্তীযুগের মহাযান বোধিসত্ত্ব মতবাদের সর্বপ্রাণীর প্রতি প্রসারিত করুণার সংমিশ্রণে বোধিচিত্ত সংগঠিত। ইহা শূন্যতা ও নির্বাণের অদ্বয় যুগনদ্ধ রূপ। শূন্যতা 'প্রজ্ঞা' এবং করুণা 'উপায়'-এর প্রতীক। একটি নিবৃত্তিধর্মী, অন্যটি প্রবৃত্তিধর্মী, একটি সংহার, অন্যটি স্থিতি, একটি বিন্দু, অন্যটি নাদ, একটি পুরুষ, অন্যটি নারীর প্রতীক।

প্রজ্ঞা এবং উপায়ের মিলনের দুইটি মার্গ—নিম্নাভিমুখী ও উর্ধ্বাভিমুখী, নিম্নাভিমুখী মার্গে ভবের উৎপত্তি যাহার উপাদান অবিদ্যা, পরিণতি—দুঃখ, ব্যাধি ও জরামরণ। অপরটি অবধূতিকা মার্গ যাহা অবলম্বনে সাধকের চিত্তের উর্ধ্বগাগতি শুরু হয়। বোধিচিত্ত অবধূতিকা মার্গ অবলম্বনে দশটি ভূমি অতিক্রম করিয়া সর্বোর্ধ্বে অদ্বয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মহাসুখ প্রাপ্তি ঘটে।

চর্যাপদের মহাসুখতত্ত্বের স্থানে স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধমতের প্রতিধ্বনি শুনা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনে তৃষ্ণার নিঃশেষ নিবৃত্তিই নির্বাণলাভের উপায়। চর্যাকর লুইও বলিয়াছেন—

এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস
সুনুপাথ ভিতি লেহুরে পাস।[২]

বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগের আশা পরিত্যাগ করিয়া শূন্যতত্ত্ব চিন্তায় নিরত হও।

তণ্হা বা বাসনানিবৃত্তিই মহাসুখলাভের উপায়। বাসনানিবৃত্তির পথ প্রদর্শন করিতে গিয়াও চর্যাকার লুই প্রাচীন বৌদ্ধ মতেরই প্রতিধ্বনি

১। Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, C. U. 1935. p 42.
২। চর্যাপদ সং: ১

করিয়াছেন—'সুনু পাখ ভিতি লেহুরে পাস'। শূন্যতত্ত্ব অর্থাৎ জরা, মরণ, দুঃখ দৌর্মনস্য যাহার পরিণতি ভবের সেই চরম পরিণাম চিন্তা কর।

প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের 'অনাত্ম' সিদ্ধাচার্যদের নিকট নৈরাত্মা দেবীরূপে কল্পিতা হইয়াছেন।[১] সিদ্ধাচার্যদের মতে সাধকের দেহমধ্যে তিনটি প্রধান নাড়ী—ললনা, রসনা ও অবধূতিকা। ললনা-রসনা সৃষ্টি ও সংহার, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রতীক। এই দুই ধারাকে মধ্যগা নাড়ী অবধূতিকা মার্গে উর্ধ্বায়ণ করিতে পারিলে উষ্ণিষ-কমলে সহস্রার পদ্মে যোগিনী নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে বোধিচিত্তের মিলন ঘটে। এই মিলনের ফলে যে মহাসুখ উৎপন্ন হয় তাহাই সিদ্ধাচার্যদের 'সামরস' বা 'কমলরস'। 'সামরস' এমন এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যাহা লাভ করিলে আত্মপর ভেদোপলব্ধি থাকে না। কারণ জন্ম যাহা, মৃত্যুও তো তাহাই। দুইএর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ভুসুকুপাদের ভাষায়—আই-অণু-অণা রে জাম-মরণ ভাব নাহি।[২] বৌদ্ধ নির্বাণের ন্যায় এই কমলরসও অতীন্দ্রিয় ও অবাঙমনসোগোচর, শান্তি ও আনন্দপরিপূর্ণ, অনুত্তর ও পরমসুখ। সিদ্ধাচার্য তিল্লোপাদের ভাষায় তাহা দোষগুণরহিত, স্বসংবেদ্য, বর্ণবিবর্জিত আকৃতিবিহীন ও সর্ব আকারে সম্পূর্ণ।—

গুণ-দোস রহিঅ এহু পরমথ
সঅসংবেঅণ কেবি ণত্থ.........
বণ্ণ বি বজ্জই আকিই বিহুণ্ণা
সব্বাআরে সো সম্পূণ্ণা ॥[৩]

অন্যত্র সরহপাদও তাঁহার দোহায় বলিয়াছেন—

ণ সুণই সোণউ দীসই নঅণেঁ
পবণ বহন্তে ণউ সো হল্লই
জলণ জলন্তে ণউ সো উজ্ঝই
ঘন বরিসন্তে ণউ সো স্মই
ণউ বজ্জই ণউ খঅহি পইস্মই
ণউ বট্টই ণ তণুন্তে ণ বচ্চই
সমরস সহজানন্দ জাণিজ্জই ॥[৪]

১। ঐ, ৪ ২। ঐ সং: ৪৩।
৩। Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, C. U. 1935, pp 49-50.
৪. Ibid, p 7.

শ্রবণ তাহাকে শুনে না, চক্ষু তাহাকে দেখে না, পবন প্রবাহিত হইলে তাহা শব্দায়মান হয় না, অগ্নিতে তাহা দগ্ধ হয় না, প্রবল বর্ষণে তাহা সিক্ত হয় না, বৃদ্ধি পায় না, ক্ষয়প্রাপ্তও হয় না। তাহা একস্থানে থাকে না, বৃদ্ধি পায় না, স্থানান্তরিত হয় না—সামরসই সহজানন্দ।

এই অবস্থা প্রাচীন বৌদ্ধদের 'অর্হত্ব' স্তরের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে। 'নির্বাণ' যেমন 'পচ্চত্তখবেদিতব্বো' বা পণ্ডিত বেদনীয় সামরসও তেমনি কেবল যাহারা এই সহজ পথে গমন করিয়া ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদেরই গোচরীভূত। কিন্তু যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাও আর প্রত্যাবর্তন করেন না। কারণ ভবচক্রের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি হওয়ায় তাঁহাদের পুনর্জন্ম রহিত হইয়া যায়। এইজন্যই শান্তিপাদ বলিয়াছেন—

সঅ-সম্বেঅণ-সরুঅ-বিআরেঁ অলক্খলক্খণ ণ জাই।
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সেই ॥[১]

নাভিপদ্ম হইতে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া সহস্রারের দিকে (গঅণ-টাকলি বা গগনশিখর) ধাবিত হয়। ইহাই নির্বাণধাম। এইখানে উষ্ণীষ-কমলস্থিত চন্দ্র হইতে অমৃত ক্ষরণ হইতেছে। এই অমৃতরস পান করিলে ত্রিভুবনের ভাবাভাবগ্রাহ্যাদি বিকল্পে উপেক্ষা জাগ্রত হয়, পঞ্চ স্কন্ধের—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের উপর কর্তৃত্ব লাভ ঘটে এবং শত্রুমিত্র, আপন-পর ভেদাভেদ তিরোহিত হইয়া চিত্ত প্রশান্ত হয়। মহাসুখানন্দে নিমগ্ন সাধকের চিত্ত জলবিন্দু যেমন নিঃশেষে মহাসাগরের সঙ্গে মিশিয়া যায় তেমনি সহজানন্দে নিঃশেষে বিলীন হইয়া নির্বিকল্প হইয়া যায়। সাধক তখন সেই সুখের স্বরূপও আর উপলব্ধি করিতে বা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না। মহাসুখানন্দে অধিষ্ঠিত সাধকের চিত্তে কোন প্রকার অকুশল চৈতসিকের উৎপত্তি হইতে পারে না। গগনশিখরে উঠিয়া তাঁহার চিত্ত নির্বাণধামে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২] নির্বাণধামে প্রতিষ্ঠিত সাধকের আর পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদের অর্হত্বের অবস্থা। অর্হত্বস্তরে উন্নীত বৌদ্ধসাধকগণও মৃত্যুর পর আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না।

বাসনা দ্বিবিধ—শুদ্ধ বাসনা এবং মলিন বাসনা। মলিন বাসনাই অবিদ্যা, ভবচক্রের,—জন্মমৃত্যুর কারণ। শুদ্ধবাসনা মানুষের ঊর্ধ্বায়নের পথ প্রদর্শক,

১। চর্যাপদ সং ১৫।
২। দ্রঃ গঅণ-টাকলি লাগিরে চিত্ত পইঠ ণিবাণা : চর্যাপদ সং ১৬।

সুতরাং ভবচক্রের নিরন্তর গতি প্রবাহের শেষ স্থিতির দিকে ইহার গতি। মলিন বাসনাকে শুদ্ধ বাসনায় পরিণত করাই শৈক্ষ্যের কাজ। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনে আসব ক্ষয় ও নির্বাণাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে চিত্ত নির্বাণমুখী স্রোতে পতিত হয় এবং স্রোতাপত্তি মার্গস্থ চিত্তরূপে অভিহিত হয়। এই স্রোতের সমাপ্তি নির্বাণে। ১৯নং চর্যাপদে অবিদ্যা বা অপরিশুদ্ধাবধূতিকা মলিন বাসনা বা ডোম্বিনীর প্রতীক। বিবাহের রূপকের সাহায্যে অবিদ্যারূপিণী অপরিশুদ্ধাবধূতিকাকে পরিশুদ্ধাবধূতিকারূপিণীতে পরিণত করা হইয়াছে। এই বিবাহের পরিণতি স্বরূপ সাধক লোকোত্তর মহাসুখ কমলে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

২৭নং চর্যায় বলা হইয়াছে অর্ধরাত্রে—'প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকদান সময়ে' সাধকের চিত্তে শূন্যতা জাগ্রত হইয়াছে এবং এই বিশুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতির প্রভায় উষ্ণীষ-কমল বিকশিত হইয়াছে। সাধক সমগ্র দেহে একটা প্রশান্ত উল্লাস অনুভব করিতেছেন। ললনা-রসনা নাড়ীর নিম্নগাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তিনি অবধূতিকাপথে ঊর্ধ্বে সহস্রারের দিকে বোধিচিত্তকে প্রবাহিত করিয়াছেন। এইখানে শশধররূপ বোধিচিত্তের সঙ্গে নৈরাত্মাদেবীর মিলন ঘটিবে। এই মিলনজাত আনন্দই বিরমান্দ, ইহাই সিদ্ধাচার্যদের নির্বাণ। যিনি ইহা অনুভব করেন তিনিই বুদ্ধ—

বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ॥[১]

এই অবস্থায় চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইয়া যায়, গ্রাহ্যগ্রাহকত্ব, জ্ঞেয়-জ্ঞেয়ত্ব ভাব তিরোহিত হয়। জগৎ সম্বন্ধে অবিদ্যাজাত মোহের ইন্দ্রজাল বিদূরিত হয়। সমস্ত অকুশল চৈতসিক ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় সম্যক্ জ্ঞান বা সত্যজ্ঞানের আলোকে চিত্ত-গগন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।[২] ইহাই নির্বিকল্প, ইহাই পরম আনন্দ বা অনুত্তর নির্বাণ। এই নির্বাণে শুধু চিত্তই লয়প্রাপ্ত হয় না, চন্দ্রের অস্তগমনে যেমন জ্যোৎস্নার অবসান ঘটে তেমনি নির্বাণে জগতের উৎপত্তি ও বিলয় সম্বন্ধীয় সমস্ত বিকল্পেরও অবসান ঘটে।[৩]

সাধক কৃষ্ণাচার্য 'তথতা' খড়্গদ্বারা মোহ যবনিকার বিলোপ সাধন করিয়াছেন। এই 'তথতা' কায়বাক্‌চিত্তের অতীত অবস্থা, তাহা নির্গুণ ও নির্বিকার। তথতাই সহজানন্দ বা মহাসুখ। সুতরাং নির্বাণের প্রতীক।

১। চর্যাপদ সং: ২৭, ২। দ্রঃ চর্যাপদ সং: ৩০,
৩। ঐ, সং: ৩১

মহাযানী আচার্য অশ্বঘোষও তথতাকেই নির্বাণরূপে অভিহিত করিয়াছেন। পরমার্থিক আত্মা যাহা উপনিষদের ব্রহ্মের ন্যায় অসীম, সনাতন, নির্গুণ ও নির্বিকার তাহাই অশ্বঘোষের 'তথতা'। সাধক জয়নন্দীর মতেও চিত্ত মোহবিমুক্ত বাসনাদোষ রহিত হইলে নির্বাণে অধিষ্ঠিত হয় এবং তাহাই 'তথতা'।[১]

মহাসুখসাগরে নিমগ্ন সাধকের যাবতীয় তৃষ্ণা বিলুপ্ত হইয়া যায়, চিত্তচেতনা বিকল্পাদিও ধ্বংস হয়। তিনি যেন চেতনা বেদনাহীন অবস্থায় ঘোর যোগনিদ্রাগত—

চেঅণ ন বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা ॥[২]

এই ঘোর যোগনিদ্রা বৌদ্ধদর্শনের 'সজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ' নামক অবস্থার অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থায় জগতের জাগতিক বস্তুনিচয়ের স্বরূপ-অনিত্যতা বা ধ্বংসশীলতা প্রতিভাত হয়, ভবচক্রের নিরন্তর ঘূর্ণাবর্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তিনি অনুভব করেন—ত্রিভুবন যেন স্বপ্নবৎ এবং তাঁহার জন্ম-মৃত্যুর চক্র ঘূর্ণনরহিত—

স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সুণ।
ঘোরিঅ অবণাগমণ বিহুন ॥[৩]

সহজানন্দ বা মহাসুখ যাহা অবাঙমনসোগোচর, বাক্‌পথাতীত, যাহা আগমশাস্ত্র মন্ত্রজপের দ্বারা অগম্য সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিজাত মহাসুখের স্বরূপ কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায় : সিদ্ধাচার্য বলিয়াছেন—

ভণই কাহ্নু জিণ—রঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥[৪]

অর্থাৎ যেমনভাবে বধির সংকেত দ্বারা বোবাকে বুঝাইয়া দেয়।

মজ্ঝিমপটিপদা অর্থাৎ মধ্যমার্গ শাস্তা গৌতমের মহত্তম আবিষ্কার। মজ্ঝিমপটিপদা দুই চরম অন্তকে—একদিকে জাগতিক ভোগ, সুখ ও সম্ভোগ, অন্যদিকে চরম কৃচ্ছ্রতা ও আত্মনিগ্রহের প্রচেষ্টাকে পরিহার করিয়া দুই মার্গের

১। চর্যাপদ সং : ৪৬।
২। ঐ সং : ৩৬,
৩। ঐ, সং : ৩৬,
৪। ঐ, সং : ৪০।

মধ্যবর্তী পন্থাকে বরণ করিয়াছে। পরমার্থ লাভের এই যে দ্বিবিধ মার্গ—একদিকে পরম ভোগ, অন্যদিকে চরম কৃচ্ছ্রতা দুই-ই জনসাধারণকে একদা বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অঙ্গুত্তর নিকায়ে প্রথম মার্গকে 'আগাঢ়া পটিপদা' দ্বিতীয় মার্গকে 'নিজ্ঝামা পটিপদা' বলা হইয়াছে। যাঁহারা 'আগাঢ়া' তাঁহাদের 'নত্থি কামেসু দোসো সো কামেসু পাতব্যতং আপজ্জতি'[১] আর যাঁহারা 'নিজ্ঝামা' তাঁহারা—'অনেক বিহিতং কায়স্স আতাপনপরিতাপনানুযোগং অনুযুত্তো বিহরতি।[২] মজ্ঝিমপটিপদার দার্শনিক ব্যাখ্যা হইতেছে, ইহা সেই দেশনা যাহা অস্তি-নাস্তি, শাশ্বত-অশাশ্বত, অন্ত-অনন্ত তত্ত্বের একটাও নয়, সত্য এই সমস্তের অতিরিক্ত কিছু। বুদ্ধদেব তাঁহার প্রধান প্রধান দেশনায় তাঁহার সমসাময়িক ধর্মবিশ্বাসের সমালোচনা করিয়াছেন। গভীর আত্মপ্রত্যয় সহকারে তিনি বলিয়াছেন—তিনি এই সমস্ত তত্ত্ব জানেন, তিনি ইহার অপেক্ষা আরো বেশী (উত্তরিতর) জানেন।[৩] সত্যোপলব্ধির পথ ভোগসুখের পথ নয়, আবার চরম কৃচ্ছ্রতার পথও নয়—এই পথ দুইএর মধ্যবর্তী পথ; এই মধ্যমার্গ কি? চরম সত্যোপলব্ধির পর ঋষিপতন মৃগদাবে বুদ্ধদেব পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের বলিয়াছেন—ভিক্ষুগণ, এই দুই অন্ত সেবন করা অনুচিত, (১) কামসুখে লিপ্ত হওয়া, (২) শারীরিক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন। এই উভয় মার্গ পরিহার করিয়া আমি মধ্যমমার্গের আবিষ্কার করিয়াছি। ইহা চক্ষুদানকারী, জ্ঞানদায়ক ও শান্তিপ্রদ।

মজ্ঝিমপটিপদা বনাম উজুবাট

বৌদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরসাধক সহজিয়া আচার্যগণও তাঁহাদের গানে কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে মজ্ঝিমপটিপদার গুণগান করিয়াছেন। সরহ বলিয়াছেন অনুত্তর আনন্দলোকের পথ উজুবাট বা ঋজুবাট। এই পথেরও দুই অন্ত। এক অন্তে কঠিন জপতপ ধ্যান ধারণা। এই পথে গমন করিও না। কারণ—'নিঅড়ি বোহি মা' জাহুরে লাঙ্ক।[৪]

বোধি বা সহজ জ্ঞান সহজেই লভ্য—পাণ্ডিত্যের বা জপতপের প্রয়োজন নাই। অন্য অন্তে বিষয় আসক্তিরূপ গভীর আবর্ত। বাম ও দক্ষিণের এই দুই অন্তকে পরিহার করিয়া মধ্যপন্থা বা উজুবাট অনুসরণ কর।

১। অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম খণ্ড, মরিস, পৃঃ ২৯৫।
২। ঐ
৩। দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, ব্রহ্মজালসুত্ত। ৪। চর্যাপদ সং: ৩২।

বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভাইলা ॥[১]

চর্যাকারদের 'উজুবাট'ই প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের মজ্ঝিমপটিপদা। বুদ্ধদেবের মজ্ঝিমপটিপদার এক অন্তে ছিল তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য সমাজের চরম ভোগ-সুখ, অন্য অন্তে ছিল আজীবিক ও জৈন সম্প্রদায়ের আত্মনিগ্রহমূলক কঠোর কৃচ্ছ্রতা। চর্যাকারদের উজুবাটের এক দিকে তুরীয় মার্গ, অন্যদিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পরিভোগ্য দেহ-চেতনা। মজ্ঝিমপটিপদার সাধক শীল-চিত্ত-প্রজ্ঞার অনুশীলন দ্বারা 'আসব-মুক্তি', 'মহৎ ফল' ও 'মহামঙ্গল' প্রত্যাশা করিয়াছেন। কিন্তু উজুবাটের সাধক গর্তবাসনার সঙ্গে অনাসক্তির বিচিত্র সমন্বয় করিয়া ঊর্ধ্বায়নের প্রয়াস পাইয়াছেন। মজ্ঝিমপটিপদা পর্যটনের পরিসমাপ্তিতে বৌদ্ধদের যোগক্ষেম অনুত্তর, শান্তিবরপদ 'নির্বাণ'; উজুবাটের শেষ প্রান্তে সহজিয়া আচার্যদের অনুত্তর মহাসুখধাম।

সুতরাং বৌদ্ধ মজ্ঝিমপটিপদাই চর্যাকারদের গানে কখনও উজুবাট, কখনও অবধূতিকামার্গ, কখনও সহজ পথরূপে পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

গভীর ভবনদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার দুই ধারে বিষয়তৃষ্ণারূপ পঙ্ক, মধ্য নদীও গভীর অথৈ জলরাশিতে ভয়ঙ্কর—

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী ॥[২]

ভবনদীর পথিক কোন্ পথে তাঁহার জীবন-তরী প্রবাহিত করিয়া অনুত্তর ধামে উপনীত হইবেন? সিদ্ধাচার্য চাটিল দুই পথই পরিহার করিয়া এক সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। এই সেতু করুণা ও শূন্যতার অদ্বয় মিলনের প্রতীক। ভবনদীর দুই অন্তে বিষয় তরঙ্গরূপ পঙ্ক করুণার অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্রতীক। আবার মধ্যনদীর গম্ভীর প্রবাহ শূন্যতা অর্থাৎ নিবৃত্তি বা প্রজ্ঞার প্রতীক। করুণা ও শূন্যতার কুশলধর্মী প্রবৃত্তির ও জ্ঞানধর্মী নিবৃত্তির সুসমন্বিতরূপ সাধকের বোধিচিত্ত। ইহাই আচার্য চাটিলের সেতু—বৌদ্ধ মধ্যমার্গের প্রতীক।

বীণাপাদের একটি গানেও দুই অন্তের সুন্দর সমন্বিতরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক দিকে সূর্য, অন্যদিকে অলাবু মধ্যখানে চন্দ্রতন্ত্রী—অনাহত দণ্ডরূপিণী অবধূতিকামার্গ—

১। চর্যাপদ সং: ৩২।
২। ঐ সং: ৫।

সুজলাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দান্তী একি কিঅত অবধূতী।[১]

দেহের অভ্যন্তরে দুই চরম অন্তের প্রতীকরূপে দুইটি নাড়ীর অবস্থিতি তাঁহারা কল্পনা করিয়াছেন—একটি প্রবৃত্তি, অন্যটি নিবৃত্তি। একটি বামগা নাড়ী 'ললনা' যাহা সৃষ্টি ও ইতিবাচক, অন্যটি দক্ষিণগা নাড়ী 'রসনা' যাহা সংহার ও নেতিবাচক। এই দুই-এর মধ্যে—অবধূতিকা নাড়ী। সহজাচার্যদের সাধনা এই দুই চরমধর্মী মার্গকে পরিহার করিবার সাধনা। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দুই ধারাকে সমন্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহারা বোধিচিত্তকে মধ্যমার্গে—অবধূতিকাপথে ঊর্ধ্বায়নের স্রোতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। মধ্যমার্গে বিচরণকারী সাধক জগৎ এবং জাগতিক বস্তুনিচয়কে স্বপ্ন ও মায়াময়রূপেই শুধু দর্শন করেন না, তিনি অনুত্তর আনন্দধামও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কৃষ্ণাচার্য বলিয়াছেন—

তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ।।[২]

চর্যাপদের ধমন-চমন (লুই), দাহিন-বাম (সরহপাদ), আলিএঁ-কালিঁএ (কাহ্ন), থালবিথলা (সরহ) এবং সূর্য ও চন্দ্র (বীণাপাদ) প্রভৃতি দ্বৈততত্ত্ব বৌদ্ধ ঐতিহ্যের দুই চরম অন্তের প্রতীক। চর্যাকারগণ এই দুই চরম অন্তকে একীকরণের সাধনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধদর্শনে মৃত্যু বা চ্যুতি[৩] কেবল নামরূপের[৪] পরিবর্তনরূপ ক্ষণস্থায়ী ঘটনামাত্র। মৃত্যুতে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান ইত্যাদি পঞ্চ স্কন্ধাত্মক দেহের বিনাশ হয় না, অন্য এক দেহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তী দেহ পূর্ববর্তী দেহ হইতে অভিন্ন নয়, আবার একও নয়। সত্ত্বগণের মৃত্যুসময়ে যে কর্মস্রোত প্রবাহিত হয় তাহাই পরবর্তী দেহ উৎপন্ন করে? কর্মই জীবনপ্রবাহের পরিচালক। এক সুশৃঙ্খলাবদ্ধ বিধানানুযায়ী কর্মস্রোত নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এখানে আত্মার অবস্থান বা

মৃত্যু ও নামরূপ

১। চর্যাপদ সং: ১৭, ২। চর্যাপদ সং: ১৩।

৩। বৌদ্ধেরা মৃত্যুর পরিবর্তে 'চ্যুতি', ব্যবহার করেন। ইঁহাদের মতে পঞ্চস্কন্ধের মিলন হইতেছে জন্ম বা পটিসন্ধি এবং পঞ্চস্কন্ধের desolution হইতেছে চ্যুতি বা মৃত্যু।

৪। যাহা স্থূল তাহা 'রূপ', যাহা সূক্ষ্ম চিত্ত চৈতসিক ধর্ম তাহা 'নাম'। নামরূপ ধর্মদ্বয় অন্যোন্যাশ্রিত—উভয়ে একত্রই উৎপন্ন হয়।

ঈশ্বরের শুভেচ্ছার কোন অবকাশ নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে—তাহা হইলে কে জন্ম গ্রহণ করে?

'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেন এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন—মানুষ বর্তমান নামরূপের দ্বারা শোভন ও অশোভন কর্ম সম্পাদন করে এবং সেই কর্মদ্বারা অপর নামরূপ গ্রহণ করে। যেমন বৃক্ষের ফল উৎপন্ন হইবার পূর্বে বৃক্ষের কোন অংশে তাহা বিধৃত আছে তাহা দেখানো যায় না, সেইরূপ প্রবাহের অবিচ্ছেদ্যতার জন্য কর্মসমূহ কোথায় অবস্থান করিতেছে তাহাও বলা যায় না। যেমন সূর্যরশ্মি ও জলকণিকার সংমিশ্রণে ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি, তেমনি নাম ও রূপের সংমিশ্রণে 'আমি'র সৃষ্টি। বৌদ্ধ দর্শনেও বলা হইয়াছে—খঞ্জ যেমন পায়ে হাঁটিয়া পথ চলিতে পারে না, আবার অন্ধও যেমন দৃষ্টিহীনতা হেতু পথের নিশানা পায় না, উভয়ের সম্মিলিত শক্তিতে পারস্পরিক সাহায্যে পথ উত্তীর্ণ হয়, তেমনি নাম ও রূপ পরস্পর একত্র সংযোগে 'আমি'র সৃষ্টি করে। এই সংযোগের কারণ সংস্কার বা কর্ম। নাম ও রূপের মধ্যে কোন তৃতীয় পক্ষ বা আত্মার অবস্থিতি কল্পনা মিথ্যা দৃষ্টির পরিণাম। বর্তমান নামরূপ অতীত হেতুর ফল। অতীত জন্মের অবিদ্যা তৃষ্ণা জননীর ন্যায়, কর্ম জনকের ন্যায় এবং আহার ধাত্রীর ন্যায় একত্র কর্ম সম্পাদন করিলে বর্তমান নামরূপের উৎপত্তি ঘটে।

বৌদ্ধমতে জন্মসংস্কারে জীবনস্রোত বা ভবচক্র প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। যেমন প্রথম রাত্রির প্রদীপশিখা মধ্যরাত্রির প্রদীপশিখা ও শেষ প্রহরের প্রদীপ শিখা একও নয়, ভিন্নও নয়[১]—একই শিখা যেমন সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া জ্বলিতেছে, সত্ত্বগণের জীবনচক্রও সেইরূপ আদিঅন্তবিহীন, অথচ পূর্বাপর একও নয়, ভিন্নও নয়,—মনে হয় এক, অথচ ভিন্ন। তাহা হইলে কি করিয়া জন্মান্তর সম্ভবপর হইতেছে? বৌদ্ধদর্শন মতে পঞ্চস্কন্ধের সংযোগে জন্ম, বিয়োগে মৃত্যু। পঞ্চস্কন্ধের বিয়োগ হইলে ইহলোকে অথবা অন্যলোকে আবার সংযোজন ঘটে। অতীত জন্ম ও বর্তমান জন্মের মধ্যে যোগসূত্র হইতেছে কর্মফল। কর্মফলের দ্বারা জীবনচক্র ঘূর্ণমান রহিয়াছে। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ, তেমনি সৃষ্টিপ্রবাহ অগ্রসর হইতেছে। এইভাবে বৌদ্ধগণ অনাত্মবাদী হইয়াও জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

১। তুলনীয়: 'ন চ সো, ন চ অঞ্ঞো'।

পরবর্তীযুগে বৌদ্ধদের অনাত্মবাদ চর্যাকারদের রচনায় ক্রমশ আত্মবাদের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। চর্যাকার কাহ্নপাদ পঞ্চস্কন্ধাত্মক দেহের অবসানে তাঁহার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইবে তাহা স্বীকার করেন নাই।

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥[১]

মৃত্যুতে অস্তিত্বের অবসান হয় না। জীবনে প্রাণের যে ক্ষণিক অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয় মৃত্যুতে তাহাই মহাপ্রাণসাগরে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। যেমন একবিন্দু জল মহাসাগরের অনন্ত জলরাশির মধ্যে আপন অস্তিত্বকে নিঃশেষে হারাইয়া দেয়, তেমনি ভাবে মৃত্যুতে জীবনের অস্তিত্বও অনন্ত অসীম প্রাণপ্রবাহে মিশিয়া যাইবে। জীবনের অবসানে মূর্খেরাই কাতর হয়। সাগর হইতে উত্থিত তরঙ্গরাশি যেমন সাগরে লয়প্রাপ্ত হইলেও সাগর শুষ্ক হইয়া যায় না তেমনি মৃত্যুও তো জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। দুগ্ধের মধ্যে নবনীত যেমন পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে দেহের অবসানে জীবাত্মাও পরম প্রাণপ্রবাহে সেইভাবে অবস্থান করে।[২] এইজন্য সরহপাদ বলিয়াছেন জীবন ও মৃত্যুতে পার্থক্য নাই—দুই-ই সমান।

জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলে নাহি বিশেসো।[৩]

কর্ম হইতে জন্ম হইয়াছে অথবা জন্ম হইতে কর্ম হইয়াছে—প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের এই বিকল্পাত্মক কার্যকারণনীতি লইয়া চর্যাকারগণ চিন্তা করেন নাই। তবে অজড়, অব্যয়, অবিনশ্বর আত্মাকে পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান না করিলেও তাঁহারা ক্রমশ আত্মবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন তাহা অনস্বীকার্য।

বৌদ্ধদর্শনে বলা হইয়াছে যাঁহার তৃষ্ণার অবসান হইয়াছে অর্থাৎ যিনি 'অনুপাদান' হইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পর আর জন্মগ্রহণ করেন না। সুতরাং বুদ্ধগণ এবং অর্হৎগণ যাঁহারা নির্বাণে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের আর কোন অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকে না। ভিক্ষু নাগসেন বলিয়াছেন—যেমন মহান্ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা নিরুদ্ধ হইয়া গেলে তাহার আর কোন অস্তিত্ব

১। চর্যাপদ সং: ৪২। ২। দ্রঃ চর্যাপদ সং: ৪২, দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তে ন দেখই ইত্যাদি।
৩। চর্যাপদ সং: ২২।

অবশিষ্ট থাকে না, সেই রূপ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও কোনও অবস্থিতি নির্দেশ করা যায় না। চর্যাকারগণ পরিনির্বাণের এই নিঃস্বভাব প্রকৃতিকে মানিয়া লইতে পারেন নাই। কাহ্নপাদ প্রশ্ন করিয়াছেন—

ভণ কইসে কাহ্ন নাহি।[১]

তাঁহার মতে পরিনির্বাণের পরেও কিছু থাকে। তাহা হইতেছে এক ত্রৈলোক্য-পরিব্যাপ্ত, অখণ্ড ও শাশ্বত আনন্দময় সহজস্বরূপ। পঞ্চস্কন্ধের বিয়োগে ব্যক্তিজীবনের সসীম সত্ত্বা এই আনন্দ স্বরূপে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। এইজন্য মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণাচার্য—

করই অনুদিন তৈলোএ পমাই[২]।

বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে যে সমস্ত গভীর অর্থপূর্ণ ও সমস্যাসঙ্কুল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে 'শূন্যতা', তাহার মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন বৌদ্ধেরা শূন্যতা জ্ঞানদ্বারা নির্বাণ বা চরম সত্যোপলব্ধি করাই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল অর্হত্ত্বলাভের পন্থা। পরবর্তী যুগে মহাযানী সাধকদের চিন্তাধারায় শূন্যতা অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। থেরবাদীদের নিকট শূন্যতা ছিল অনস্তিত্ব বা বৈনাশিকতার প্রতীকদ্যোতক। কিন্তু মহাযানী শূন্যতা সৎও নয়, অসৎও নয়, আবার তদুভয়ও নয়, তদুভয় নয় এমনও নয়—ইহা চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত। ইহা বস্তুসমূহের পরমার্থিক সত্তা এবং তাহা—

চর্যাপদে শূন্যতত্ত্ব

'অবাচ্যনক্ষরাঃ সর্বশূন্যঃ শান্তাদিনির্মলাঃ।[৩]

অর্থাৎ তাহা বাক্যের অতীত, পরিবর্তনহীন, সর্বশূন্য এবং শান্ত ও নির্মল। ইহাই শূন্যতারূপ। সুতরাং মাধ্যমিকবাদের শূন্যতা বস্তুর নাস্তিত্ববোধক বৈনাশিকতা নয়—বস্তুর গ্রাহ্য-গ্রাহকরহিততা। নাগার্জুনের মতে যাহার উৎপত্তির কারণ আছে, যাহা সর্বদা পরিবর্তনশীল তাহাই শূন্যতা বা মধ্যপথ। মাধ্যমিকগণ একদিকে জাগতিক বস্তুনিচয়ের চিরস্থিতি বা নিত্যসত্তা, অন্যদিকে দৃশ্যমান জগতের সর্ববৈনাশিকতা বা নিঃস্বভাব শূন্যতা দুই-ই অস্বীকার করিয়াছেন। বিশ্বসৃষ্টি শুধুই শূন্য নয়—কার্যকারণনীতির সুশৃঙ্খল বিধানে নিয়ন্ত্রিত এক পরিবর্তনের ধারা। ইহার কোন ঘটনাই স্বয়ম্ভু বা কারণ নিরপেক্ষ

১ ও ২। চর্যাপদ সং ৪২।

৩। নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক বৃত্তি' Levi's Edition, p 539

নয়। বিনা কারণে কোন জাগতিক ঘটনার উৎপত্তি হয় না। প্রত্যেক ঘটনা ক্ষণিকের জন্য উৎপন্ন হইয়া, অন্য একটি ঘটনাকে উৎপন্ন করিয়া তবেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে। কার্যকারণ নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নিরন্তর পরিবর্তনশীল এই দৃশ্যমান জগতকে নাগার্জুন শূন্যতাধর্মী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিশ্ব-সৃষ্টি আপেক্ষিক, স্বভাববিহীন ও অসার সুতরাং শূন্যতাধর্মী। প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে পরম সত্য কি? চন্দ্রকীর্তি বলিয়াছেন—মাধ্যমিক বা শূন্যবাদীদের মতে নিস্তব্ধতাই পরম ও চরম সত্য। এই চরম সত্যই পরমার্থ সত্তা, ইহা নির্বিকার নির্বিশেষ তথাগত বা বুদ্ধকায়। চক্ষু ইহাকে দর্শন করিতে পারে না, মন ইহাকে মনন করিতে পারে না। ইহাই পরম সত্য।

বিজ্ঞানবাদীদের দর্শনকেও শূন্যতত্ত্ব প্রভাবিত করিয়াছে। লঙ্কাবতার সূত্রে এক সার্বিক বিজ্ঞানই তথতা। ইহাই তথাগত গর্ভ এবং শূন্যতার দ্যোতক। যোগাচার দার্শনিকগণ এক অবর্ণনীয় সনাতন বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় বিশ্বাসী। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞপ্তিমাত্রাই জগতের নির্বিশেষ আধার। ইহা হইতেই জগতের উৎপত্তি আবার তাহা শূন্যতাধর্মীও। শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও যোগাচারবাদের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া মন্ত্রযানের আবির্ভাব। বৌদ্ধ তন্ত্র যোগাচারবাদেরই ক্রমিক পরিণতিমাত্র। বজ্রযানিগণও শূন্যতার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বজ্রযানী শূন্যতা ও মাধ্যমিক মতবাদের শূন্যতা এক নয়। মাধ্যমিকদের নিকট গ্রাহ্য ও গ্রাহক দুই-ই-শূন্যতাধর্মী, মন বহির্জগৎ দুই-ই অবাস্তব। বজ্রযানীদের 'বজ্রই' শূন্যের প্রতীক। শূন্যতাকে তাঁহারা বজ্রলক্ষণ-যুক্ত অর্থাৎ বজ্রবৎ কঠিন ও সুদৃঢ় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ' গ্রন্থে বলা হইয়াছে শূন্যতাবোধের যথার্থ উপলব্ধি হইতে অক্ষর জ্ঞানের উৎপত্তি, অক্ষর হইতে মূর্তি ভাবনার উদ্ভব। মূর্তিভাবনা হইতে তাহার বহিরূপের প্রকাশ। সুতরাং শূন্যের প্রকাশমান রূপই দেবদেবীর অবয়ব।[১]

বৌদ্ধ ঐতিহ্যানুযায়ী এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পঞ্চস্কন্ধদ্বারা সৃষ্ট। এই পঞ্চস্কন্ধ আদিঅন্তবিহীন শাশ্বত বিশ্বশক্তি। বজ্রযানিগণ এই পঞ্চ বিশ্বশক্তির উপর দৈবত্ব আরোপ করিয়াছেন। পঞ্চস্কন্ধকে তাঁহারা পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ—অমিতাভ, পদ্মপাণি, বৈরোচন, সামন্তভদ্র, অমোঘসিদ্ধিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ক্রমশঃ পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের স্রষ্টারূপে বজ্রধরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বজ্রধরই

১। B. Bhattacharyya, Indian Buddhist Iconography, 1958, p 25.

বৌদ্ধায়তনের শ্রেষ্ঠ দেবতা—তিনিই আদিবুদ্ধ, আদি বুদ্ধই শূন্য। আদিবুদ্ধ যখন পরবর্তীযুগে মানবিক গঠনসৌষ্ঠবে বৌদ্ধ দেবায়তনে প্রবেশ করিয়াছেন তখন তিনি বজ্রধর নামে অভিহিত হইয়াছেন। বজ্রধরের দ্বিবিধ রূপ—একক এবং যুগনদ্ধ। বজ্রধরও শূন্যতার প্রতীক। প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে আছে শূন্যতারূপী বজ্রধর করুণাকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই গভীর মিলনে দ্বৈততত্ত্ব তিরোহিত হইয়াছে, বজ্রধর ও করুণা দুইএ মিশিয়া এক 'শূন্যে' পরিণত হইয়াছেন।

এই গভীর অর্থবহ শূন্যতা সহজযানীদের নিকট কখনও জ্ঞানবাদী নিবৃত্তি, কখনও নিঃসীম প্রজ্ঞা আবার কখনও সকল সঙ্কল্প-বিকল্প বিবর্জিত নেতিবাচক ও অনস্তিত্বের গ্রাহক প্রভাস্বর চিত্তরূপে স্থান পাইয়াছে। চর্যাকার লুই বলিয়াছেন—

এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লেহুরে পাস।[১]

বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগের পারিপাট্য পরিত্যাগ করিয়া শূন্যতত্ত্ব বা অসারতা চিন্তায় নিযুক্ত হও। বাসনার নিবৃত্তি হইলেই শূন্যতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি আকর্ষণ ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগের কামনাই মানুষের দুঃখভোগের কারণ। সুতরাং জাগতিক বস্তুনিচয়ের যথার্থ স্বভাব অসারতা ও পরিবর্তনশীলতা উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই শূন্যতত্ত্ববোধ। কাহ্নুও পরিদৃশ্যমান এই জগৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

গন্ধপরসরস জইসোঁ তইসোঁ।
নিংদ বিহুনে সুইনা জইসো॥[২]

জাগতিক গন্ধ স্পর্শাদিগুণযুক্ত বস্তুনিচয়ে তাঁহার চিত্ত আজ অনাসক্ত ও সঙ্কল্প-বিকল্প বিবর্জিত। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন পার্থিব বিষয়সমূহ কেবল স্বপ্নবৎ অলীক, অবিদ্যার ছলনা এবং মায়াজালবৎ প্রতিবন্ধকমাত্র। মাধ্যমিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুনও বলিয়াছেন—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়িক ও অবভাসিক অসার ও নিঃস্বভাব, স্ববিরোধী ও পরিবর্তনশীল। এই চরম সত্য উপলব্ধি করিয়া কাহ্নুও শূন্যতামার্গেই চিত্তকে প্রধাবিত করিয়াছেন। কবি ঢেণ্ঢণপাদও সবিকল্পজ্ঞানের অসারতা ও রূপজগতের অঙ্গহীনতা উপলব্ধি করিয়া পরমবিজ্ঞানে অর্থাৎ নির্বিকল্প নিরবয়ব শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

১] চর্যাপদ সং: ১। ২। ঐ. সং: ১৩।

নাগার্জুনের 'পঞ্চক্রম' নামক গ্রন্থে চতুঃশূন্য[১]—শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য সম্বন্ধে আলোচনা স্থান পাইয়াছে। এই চতুঃশূন্য চিত্তের ক্রমোন্নতির চারিটি সোপান বা স্তর। বৌদ্ধ দর্শনের চারিপ্রকার নির্বাণ—সাধারণ নির্বাণ, উপাধিশেষ নির্বাণ, অনুপাধিশেষ নির্বাণ এবং মহাপরিনির্বাণ-এর সঙ্গে তান্ত্রিকদের চারিশূন্যতত্ত্বের সাযুজ্য রহিয়াছে। চতুঃশূন্যের প্রথম শূন্যস্তরে চিত্ত অবিশুদ্ধির কারণ মুক্ত নয় বলিয়া শোক, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদনা, সমবেদনা, প্রত্যবেক্ষা ও কারুণ্য প্রভৃতি তেত্রিশ প্রকার দোষযুক্ত থাকে। এই স্তর পরতন্ত্র বা সর্বমায়ার আধার স্ত্রীমায়া নামেও অভিহিত হইয়াছে। আবার সর্বশেষ চতুর্থ শূন্যস্তর 'সর্বশূন্য' সর্বপ্রকার প্রকৃতি দোষমুক্ত, প্রভাস্বর। ইহা আদিও নয়, অন্তও নয়, ইতিও নয়, নেতিও নয়—ইহা পরম সত্য, অস্তিনাস্তিরহিত, পরম বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, ইহা লোকোত্তর, কেবলমাত্র বুদ্ধগণের অধিগম্য মহাপরিনির্বাণের সঙ্গে তুলনীয়। এই চতুঃশূন্য তত্ত্ব চর্যাকারদেরও প্রভাবিত করিয়াছে। কাহ্নুপাদ (১২ ও ৩৬ নং চর্যা), ঢেণ্ঢনপাদ (৩৩নং), দারিকাপাদ (৩৪নং) ও শবরপাদ (৫০নং) প্রভৃতির রচনায় চারিশূন্যতত্ত্ব বহু উপমা ও রূপকের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

করুণা চারি ব্রহ্মবিহারের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বৌদ্ধ অভিধর্মগ্রন্থে ইহা অপ্রমেয় চৈতসিকরূপে স্থান পাইয়াছে। পরের দুঃখ ও সর্বজীবের অকল্যাণ দর্শনে বেদনা অনুভব এবং তাহা অপনোদনের বাসনাই করুণা। করুণা সাধকের চিত্তকে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করিয়া চিত্তের অহংবোধকে দূরীভূত করিয়া দেয়। 'সব্বে সত্তা সব্ব দুক্খা পমুচ্চন্তু'—বিশ্বের সমগ্র প্রাণী দুঃখ-বিমুক্ত হউক ইহাই করুণা-ভাবনার মন্ত্র। পালি জাতক ও অপদানসমূহে পাওয়া যায় বিশ্বের সর্বজীবের প্রতি করুণাদ্রচিত্ত বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধের হৃদয়-উৎসের করুণা-স্রোত শুধু মানবের মধ্যেই সীমায়িত হয় নাই, নিখিল বিশ্বের জীবকোটির প্রতিও আকুল আগ্রহে তাহা ছুটিয়া গিয়াছে। মনুষ্য, যক্ষ-রক্ষ, পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর যোনীতে অবতীর্ণ হইতে তাঁহার বাধে নাই। নির্বাণে অধিষ্ঠিত হইয়া আপন জন্মমৃত্যু-চক্রের ঘূর্ণনের চিরনিবৃত্তি করিয়াও তিনি বিশ্ব-

করুণা

১। শূন্যঞ্চাতিশূন্যঞ্চ মহাশূন্যং তৃতীয়কম্
চতুর্থং সর্বশূন্যঞ্চ ফলহেতু প্রভেদতঃ—পঞ্চক্রম Ms., p 20(A) শশিভূষণ দাশগুপ্তের Obscure Religious Cults, 1962, p 45.

বিমুখ হইতে পারেন নাই—বিশ্বের দুঃখ প্রপীড়িত মানুষের পাশে নামিয়া আসিয়াছিলেন। এই মহাকরুণার তত্ত্ব ও বাণী মহাযানী সাহিত্যে অধিকতর পরিস্ফুট ও সম্প্রসারিত হইয়াছে। প্রাচীন স্থবিরবাদিগণ শূন্যতা জ্ঞানদ্বারা অর্হত্ব লাভ করিয়া আত্মমুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু মহাযানী সাধকগণ আত্মমুক্তির প্রলোভনকে জয় করিয়া বিশ্বজীবের মুক্তির জন্য বোধিসত্ত্বের জীবন বরণ করিয়াছেন। বোধিসত্ত্ব কে? তিনিই বোধিসত্ত্ব যিনি কুশলকর্ম ও সদাচার অনুষ্ঠান দ্বারা পরমমুক্তি (নির্বাণ) প্রাপ্ত হইয়াও অবলীলাক্রমে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বের কল্যাণ ও মুক্তি কামনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, এবং জগতের দুঃখদাহের মধ্যে অগণিত মানুষের দুঃখের বোঝা বহন করিয়া অনন্তকাল অবস্থান করিতে কৃতসঙ্কল্প। নিজের পুণ্যের বিনিময়ে যিনি পাপীর দুঃখের বোঝা বহন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পারমিতাসমূহ[১] আচরণ করিয়া এবং ঊর্ধ্বায়নের পথে দশভূমি[২] অতিক্রম করিয়া যিনি বুদ্ধত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, মহাকরুণা যাঁহার মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে তিনিই বোধিসত্ত্ব। শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে দুঃখী প্রাণীর জন্য করুণার্দ্রচিত্ত বোধিসত্ত্বের প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে।[৩] 'কারণ্ডব্যূহ' গ্রন্থে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর বিশ্বের শোকার্ত জনগণের আকুল আহ্বানে নির্বাণকেও তুচ্ছ করিয়া আনত নয়নে উত্তুঙ্গ শৈলশিখর হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। সমগ্র মহাযান সাহিত্যের পাতায় পাতায় এই মহাকরুণার বাণী প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। এই বিশ্বতোমুখী অনুপ্রেরণা এবং আশ্বাসবাণী একদা বিশ্বের দুঃখকাতর মুমুক্ষু জনগণের চিত্তের উৎকণ্ঠা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কোনও অলৌকিক ঘটনা দ্বারা নহে, এক সর্বতোমুখী কল্যাণের অনুপ্রেরণায় বৌদ্ধধর্ম নানা দিগ্‌দেশে আপন বিজয় অভিযান পরিচালনা করিয়াছে—দুঃখতাড়িত মানুষের হৃদয়-দুয়ারে মহাকরুণার আশ্বাসবাণী পৌছাইয়া দিয়াছে। 'সব্বে সত্তা সব্ব দুক্‌খা পমুচ্চন্তু'—করুণার এই বীজ প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছে কিন্তু মহাযানী ঐতিহ্যে সেই অঙ্কুরিত বীজ মুকুলিত ও শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

১। দশপারমিতা: দান, সীল, নেক্‌খম্ম, পঞ্‌ঞা, বিরিয়, খন্তি, সচ্চ, অধিট্‌ঠান, মেত্তা, উপেখা।

২। দশভূমি: প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চিষ্মতী, সুদুর্জয়া, অভিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, সাধুমতী, ধর্মমেঘা।

৩। বোধিচর্যাবতারঃ, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, বোধিচিত্ত পরিগ্রহো নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ, শ্লোক সংখ্যা: ৪—৬, ১০—১১, ১৩—১৫।

তান্ত্রিকসাধনার মূলনীতিও করুণা। যদিও তান্ত্রিক সাধকগণ মহাযানী করুণার ঐতিহ্য সর্বদা বজায় রাখিতে পারেন নাই, তবুও সেই আদর্শই তাঁহাদের দ্বিধাহীন উচ্চকণ্ঠে বারে বারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া স্থবির অনুপম রক্ষিতের গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদে (তেঙ্গুরে) করুণার সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে—ইহা সেই ইচ্ছা যাহা চায় সমস্ত জীবজগতকে যাহারা দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, ত্রিপাপ ভোগ করিতেছে এবং সংসার বন্দীশালায় আবদ্ধ আছে তাহাদের উদ্ধার করিতে। তান্ত্রিক সাধনায় ভূত প্রেত, যক্ষরক্ষ ও পিশাচাদির পূজাবিধি গৃহীত হইয়াছে, পূজার প্রারম্ভে সাধককে সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হয়—জগতের জীবকোটির দুঃখে করুণার্দ্র হইয়া তাঁহাদের কল্যাণ কামনায় তিনি এই পূজানুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহারা সমস্ত গুহ্য সাধনায় প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে সঙ্কল্প করিয়া থাকেন—এই সাধনায় সিদ্ধি অর্জনের সমস্ত পুণ্য তিনি বিশ্বজীবের জন্য প্রদান করিবেন। এই সঙ্কল্প গ্রহণ করাই করুণায় অধিষ্ঠিত হওয়া। যতক্ষণ তান্ত্রিক সাধক এই সঙ্কল্পে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না হইবেন অর্থাৎ মহাকরুণাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ না করিবেন ততক্ষণ তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভও অসম্ভব।

'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি' নামক গ্রন্থে করুণাকে 'উপায়' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে করুণাকে নৌকার সঙ্গেও তুলনা করা হইয়াছে। নৌকা মানুষকে নদীর এপার হইতে ওপারে উত্তীর্ণ করাইয়া দেয়। করুণা বা উপায়ও তেমনি সর্বজীবকে অনুকূলতীরে বা তটে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। তান্ত্রিক সাধকগণ শূন্যতা ও করুণা—নিবৃত্তিমূলক প্রজ্ঞা ও প্রবৃত্তিমূলক বিশ্বতোমুখী প্রেরণার সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। তাঁহারা শূন্যতা ও করুণা দুইকে সমান স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। কেবল করুণার চিন্তায় যাঁহারা দিন অতিবাহিত করেন তাঁহারা

জম্ম সহস্সহি মোক্খ ণ পাবই।[১]

আবার করুণাকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা শুধু শূন্যতার আরাধনায় মগ্ন তাঁহারাও—

ণউ সো পাবই উত্তিম মগ্‌গু।[২]

১। Journal of the Department of Letters, Vol. XXVII. C. U. 1285, p 29.

২। ঐ।

করুণাবিহীন শূন্যতা যেমন পঙ্গু, শূন্যতাবিহীন করুণাও তেমনি ক্লিষ্ট। সুতরাং দুই-এর অদ্বয় মিলনই পরম কাম্য। এই অদ্বৈত রূপ অনাদি, অনন্ত, জন্মমৃত্যুরহিত, শান্ত এবং ভাবাভাব ক্ষয়যুক্ত —

অনাদি নিধনং শান্তং ভাবা-ভাবা-ক্ষয়ং বিভুম।
শূন্যতা-করুণা ভিন্নং বোধিচিত্তম ইতি স্মৃতম॥[১]

দুধের সঙ্গে জল যেমন পরস্পর এক হইয়া মিশিয়া যায় শূন্যতা ও করুণাও তেমনি দ্বৈতভাব বর্জন করিয়া অদ্বৈতরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে।

করুণা বিশ্বের সৃজনীশক্তি, ইহা মানুষের মনে নৈতিক প্রেরণা জাগ্রত করে যাহা দ্বারা সে বিশ্বের সকলের সঙ্গে একটা গভীর সাযুজ্য অনুভব করে। এই নৈতিক প্রেরণা বিশুদ্ধ জ্ঞানদ্বারা পরিশোধিত হইলে মানুষ বিশ্বের কল্যাণ-কর্মে নিয়োজিত হয়। এই কর্ম তখন আর বন্ধন বা আসক্তির কারণ হইতে পারে না। বরং কর্মের অনুষ্ঠাতা ও কর্মের ফলভোগী দুই পক্ষকেই ইহা মুক্তি দেয়। এইজন্য তান্ত্রিক সাধকগণ শূন্যতা ও করুণার—প্রজ্ঞা ও উপায়ের মহামিলন সংগঠন করিয়াছেন।

চর্যাপদের কবিকণ্ঠেও শূন্যতা ও করুণার মিলন সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়াছে। যোগী কৃষ্ণাচার্য সুন্দর একটি উপমা সাহায্যে শূন্যতা ও করুণার মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। শূন্যতা ও করুণার বিবাহোৎসব। চতুর্দিকে জয়ধ্বনি উঠিয়াছে। পটহ ও মাদলের শব্দ শুনা যাইতেছে। বর ও কন্যা—শূন্যতা ও করুণা ধর্মকরণ্ডকালয়ে অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্বের আধাররূপ পাত্রে অভিন্নরূপে মিলিত হইয়াছেন। বিবাহের যৌতুকও অবশ্যই মিলিয়াছে—

জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম।[২]

শূন্যতা ও করুণার বিবাহ হওয়ায় অজ্ঞানের তিমির রজনী অবসান হইয়াছে এবং সাধক অনুত্তর 'মহাসুখলোকে' প্রবেশ করিয়াছেন।

শূন্যতা ও করুণার মহামিলন যখন সম্পন্ন হয় তখন বিশ্বের যাবতীয় বস্তু স্বপ্নময় ও অলীক বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থায় সাধকের করুণারূপী চিত্ত-নৌকা সর্বশূন্যতায় অর্থাৎ, জগৎ প্রপঞ্চের সীমাবদ্ধতা ও অসারতা জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

১। শ্রীগুহ্যসমাজ, জি. ও. এস, অষ্টাদশ অধ্যায়।
২। চর্যাপদ সং : ১৯।

এইজন্যই— সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥[১]

যে নৌকা সোনায়—সর্বশূন্যতায় ভরিয়া গিয়াছে সেখানে রূপা—'রূপবেদনা সংজ্ঞাসংস্কারবিজ্ঞানাদীনাম্' অর্থাৎ বস্তুজগতের ঠাঁই কোথায়?

সাধক দারিকাপাদও কায়বাকচিত্তের পরিশুদ্ধি সম্পন্ন করিয়াছেন এবং 'গঅণত পরিমকুলেঁ' অর্থাৎ শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য পার হইয়া সর্বোত্তম সর্বশূন্য স্তরের নিকটবর্তী হইয়াছেন।[২] তাঁহার চিত্তের করুণারূপী সংবৃতি সত্য শূন্যতারূপী পরমার্থসত্যে বিলীন হইয়াছে। ইহাই শূন্যতা ও করুণার মহামিলন।

এইভাবে করুণার বিশ্বপ্রসারী মহান্ ঐতিহ্য যাহা থেরবাদী সাহিত্যে অঙ্কুরিত এবং মহাযানী সাহিত্যে সুষ্ঠুরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল সিদ্ধাচার্যদের কণ্ঠে সেই মহা করুণাই আর একবার শ্লথগতিতে উচ্চারিত হইয়া চিরকুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

নির্বাণ, শূন্যতা, করুণা এবং মধ্যপথ প্রভৃতি তত্ত্ব ছাড়াও অবিদ্যা মোহ এবং চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতির বর্ণনা দিতে গিয়া চর্যাকারগণ বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসরণ করিয়াছেন। শুধু তত্ত্বগতই নয়, কখনও কখনও উপমা প্রয়োগেও তাঁহারা পূর্বসূরীদের অনুগমন করিয়াছেন।

বৌদ্ধদর্শনে মনোবৃত্তি হিসাবে অবিদ্যা মোহ চৈতসিক।[৩] সত্ত্বগণ যাহা দ্বারা মুহ্যমান হয় তাহাই মোহ বা অজ্ঞানতা। কুয়াশার আবরণ যেমন পৃথিবীর বস্তুনিচয়কে আবৃত করিয়া রাখে মোহও সেইরূপ চিত্তের সত্যদৃষ্টিকে ব্যর্থ করিয়া বস্তুজগতের যথার্থ স্বরূপ—অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বস্তুর প্রকৃত স্বভাব সম্বন্ধে ভ্রান্তি উৎপাদন করায়। অবিদ্যা দুঃখকে সুখের মুখোশ পরাইয়া, মিথ্যাকে সত্যের আবরণে ঢাকিয়া প্রকাশ করে। সিদ্ধাচার্য শান্তিপাদও বলিয়াছেন—মায়ামোহরূপ অবিদ্যায় ভুলিও না। মূর্খেরাই ভবের মোহে অবিভূত হইয়া বস্তুজগতকে ঋজুপথ বলিয়া মনে করে।

অবিদ্যা

১। চর্যাপদ সং: ৮।
২। চর্যাপদ সং: ৩৪।
৩। মুয্হতী'তি মোহো, মুয্হন্তি সত্তা এতেনা'তি মোহো

সুতরাং মায়ামোহরূপ বাধা অতিক্রম করিয়া সোনাবাঁধা রাজপথে অগ্রসর হও।[১] ভুসুকুও এই অবিদ্যা তিমিরাবৃত জগৎ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

মরুমরীচিগন্ধর্বনঅরী দাপণ পড়িবিম্বু জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দিঢ় ভইআ অপে পাথর জইসা॥
বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা।
বালুআতেলেঁ সসর সিংগে আকাশ-ফুলিলা॥[২]

লঙ্কাবতারসূত্রেও এই দৃশ্যমান জগৎকে মায়া, মৃগতৃষ্ণিকা, স্বপ্ন ও আকাশ-কুসুমের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট, অসার ও কল্পনার সৃষ্টি বলা হইয়াছে। বৌদ্ধদর্শনে প্রজ্ঞা মোহের প্রতিকূল। আলোকরশ্মি যেমন কুয়াশাকে দূরীভূত করে, প্রজ্ঞাও তেমনি মোহের যবনিকা অপসারিত করিয়া দেয়। সরহও বলিয়াছেন—

অদভুঅ ভবমোহরে দিসই পর অপ্পণা।
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজেঁ সুণ অপণা॥[৩]

চিত্ত যখন প্রভাস্বর শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় জাগতিক বস্তুনিচয়ও শূন্যগর্ভ বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

ভুসুকু অবিদ্যাকে 'ইন্দিআল' বা ইন্দ্রজাল বলিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শনে বলা হইয়াছে—মোহ মহাপাপ, ইহা বিদূরণও সময়সাপেক্ষ।[৪] কিভাবে এই অবিদ্যাকে দূর করা যায়? কাহ্নুপাদ বলিয়াছেন—

সুণ তরুবর গঅণ কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল॥[৫]

অবিদ্যাকে 'প্রকৃতিপ্রভাস্বর কুঠার' দ্বারা ছেদন কর। কেবল তাহার ডাল ছেদন করিলেই হইবে না, মূলশুদ্ধ উৎপাটন করিতে হইবে। যেন—'তরু পুণ ন উইজঅ'। ধম্মপদ গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে—

সবন্তি সব্বধি সোতা লতা উব্‌ভিজ্জ তিট্‌ঠতি।
তঞ্চ দিস্বা লতং জাতং মূলং পঞ্‌ঞায় ছিন্দথ॥[৬]

অর্থাৎ তৃষ্ণাস্রোত সর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে। তৃষ্ণালতা সর্বদা অঙ্কুরিত হইতেছে। যখনই তৃষ্ণালতা অঙ্কুরিত হইতে দেখিবে তখনই প্রজ্ঞাদ্বারা তাহার মূল ছেদন করিবে।

১। চর্যাপদ সং: ১৫ ২। চর্যাপদ সং: ৪১।
৩। চর্যাপদ সং: ৩৯।
৪। দ্র: 'মোহো মহাসাবজ্জো দন্ধবিরাগী।'
৫। চর্যাপদ সং: ৪৫। ৬। তণ্হাবগ্গো, ৭নং শ্লোক।

বৌদ্ধদর্শনে চিত্ত স্বভাবতঃ ভাস্বর। চৈতসিকের সংযোগে চিত্ত চৈতসিকের স্বভাবানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভবাঙ্গ তরঙ্গহীন নদীর স্রোতের ন্যায় প্রশান্ত ও স্থির। কিন্তু ঝঞ্ঝাঘাতে যেমন শান্ত নদীপ্রবাহ তরঙ্গসঙ্কুল হইয়া উঠে তেমনই চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-পথে আলম্বনের অভিঘাতে ভবাঙ্গপ্রবাহে চিত্ত উৎপন্ন হয়। এই ভবাঙ্গ-প্রবাহে চিত্ত চিরপ্রবহমান। বৌদ্ধদর্শনে বলা হইয়াছে চিত্তের একটি মাত্র ক্ষণ—এক নিমেষের শতসহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র সময়ে চিত্তে সহস্র বেদনার উৎপত্তি ঘটে। চিত্তের এই দ্রুতগামিনতার বিষয়ে ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়েও (একানিপাত) বলিয়াছেন। চর্যাকারগণও চিত্তের এই চিরচঞ্চল প্রকৃতি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং চিত্তকে দ্রুতগামিনী হরিণী, চঞ্চল মূষিক প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।[১]

চিত্তচাঞ্চল্য

জাগতিক বস্তুনিচয়ের প্রতি আকর্ষণ হেতু চিত্তে চাঞ্চল্য উৎপাদিত হয়। চর্যাকার কাহ্নুপাদ চিত্তকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা, বাসনাসমূহ তাহার পাতা ও ফল।[২] বৌদ্ধদর্শন এই চঞ্চল চিত্তের নিরোধ করিয়া বাসনার নিরোধ করাই চরম কাম্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ধম্মপদে আছে—

দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো যত্থকামনিপাতিনো।
চিত্তস্‌স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং।[৩]

অর্থাৎ দুর্নিগ্রহ, লঘু এবং যথেচ্ছ বিচরণশীল চঞ্চল চিত্তকে দমন করাই ভাল, সংযত চিত্ত সুখ প্রদান করে।

অন্যত্র :—ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্খং দুন্নিবারয়ং।[৪]

চিত্ত চপল, দুরক্ষ্য এবং দুর্নিবার।

এই চঞ্চল অনিত্য চিত্তকেই সাধকগণ—'উজুং করোতি মেধাবী উসুকারোব তেজনং।'

চর্যাকার কাহ্নুও বলিয়াছেন :—

বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী॥[৫]

১। চর্যাপদ সং : ৬, ২১,
২। চর্যাপদ সং : ৪৫। ৩। চিত্তবগ্‌গো, ৩নং শ্লোক।
৪। চিত্তবগ্‌গো, ১নং শ্লোক। ৫। চর্যাপদ সং : ৪৫।

অবিদ্যারূপ জল সিঞ্চনে সেই মন-তরু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গুরুর উপদেশে বিজ্ঞব্যক্তিগণ সেই তরু ছেদন করেন।

শাক্যসিংহ গৌতম কাশীর পথে আজীবিক উপকের নিকট আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

সব্বাভিভূ সব্ববিদূহং অস্মি
সব্বেসু ধম্মেসু অনূপলিত্তো
সব্বঞ্জহো তণ্হক্খয়ে বিমুত্তো
সয়ং অভিঞ্ঞায় কমুদ্দিসেয্যং ॥[১]

অনুবাদ—সকলের বিভূ আমি সর্ববিদ হয়েছি এখন।
কোনধর্মে নহি লিপ্ত, ছিন্ন মম সকল বন্ধন ॥
সর্বজ্ঞ, সর্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত মানস।
নিজ অভিজ্ঞায় যদি সিদ্ধ আমি পূরিত মানস ॥

(মজ্ঝিমনিকায় ১ম খণ্ড, অনুবাদক ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, পৃ ১৮৬)।

এই অধ্যাত্মচিন্তা ও অনুভূতি কালের ব্যবধান এড়াইয়া চর্যাকার কুক্কুরীপাদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। সহজ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

হাঁউ নিরাসী খমণ-ভতারি।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ॥
ফেটলিউ গো মাএ অন্তউরি চাহি।
জা এথু চাহাম সো এথু নাহি ॥[২]

ভাবানুবাদ :—

আসঙ্গ রহিত আমি, শূন্য মম ভর্তা।
কহন না যায় মোর বিজ্ঞান-বার্তা ॥
বিষয় ছেড়েছি মাগো অন্তঃকুটী চাহি।
বিষয়ারি যাহা দেখি তাহা হেথা নাহি ॥

(অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর 'চর্যাপদ', পৃঃ ১০৪।)

উভয় ক্ষেত্রে আত্মপরিচয় দানের ভাষাই শুধু পৃথক্, ভাব ও বিষয় প্রায় এক।

১। মজ্ঝিমনিকায়, ১ম খণ্ড, Ed. Trenckner. ১৮৮৮, অরিয়পরিয়েসনসুত্ত, পৃঃ ১৭১। ধম্মপদ, তণ্হাবগ্গ, শ্লোক সংখ্যা ২০।
২। চর্যাপদ সং ২০।

সহজযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাহিত্যমানস হইতে উৎসারিত হইয়া বাংলা সাহিত্য অনাগত যুগ সম্ভাবনার পথে যাত্রা শুরু করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে উপনীত হইয়া বিষয়বস্তু, ভাব ও রূপকর্ম সমস্ত কিছুতেই বাংলা সাহিত্য নূতনতর পথের যাত্রী হইয়াছে। এই অভিনব স্বাতন্ত্র্য গ্রহণ করার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে সহজযান বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত বাঙালীর সমাজ-জীবনের আলোচনা অপরিহার্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয়বস্তু ও ভাবাদর্শের মধ্যে সে যুগের সহজযান বৌদ্ধ-ধর্মের ঐতিহাসিক পরিণতি ঘোষিত হইয়াছে। সিদ্ধাচার্যদের ধর্মচেতনা গুরু-প্রদর্শিত পথে, দেহ সাধনার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সাধারণ জনগণের উপর তাঁহাদের প্রবল প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহাদের ধর্মও সহজ মানবিক আদর্শর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোনপ্রকার সংযম বা কৃচ্ছ্রতার দ্বারা নয়, কেবল সঙ্গীতে, সুরে ও আনন্দে এই ধর্ম সাধারণ মানুষের জীবনকে আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদের সাধ্য সহজ, সাধনও সহজ ছিল। সিদ্ধাচার্যেরা তাঁহাদের শিষ্যদের বলিতেন—

উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।
নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক॥[১]

এই পথ ঋজু, ঋজুকে ছাড়িয়া বাঁকা পথে যাইও না। নিকটে বোধি আছে, লঙ্কায় যাইও না।

শাস্ত্র-উপদেশ, ধ্যান-ধারণা, সংযম-কৃচ্ছ্রতা সমস্ত পরিহার করিয়া যে পথ তাঁহারা নির্দেশ দিলেন তাহা 'উজুবাট'। এই সরল সোজা পথে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আমাদের দেহের মধ্যে যে অদেহী, রূপের মধ্যে যে অরূপী রহিয়াছেন তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহাকে উপলব্ধি করিলেই মুক্তি।

অসরীর সরীরহি লুক্কো।
জো তহি জাণই সো তহি মুক্কো॥[২]

এইভাবে পরম সত্যকে দেহের মধ্যে অনুভব করিতে গিয়া বৌদ্ধ সহজযানী আচার্যগণ সাধনক্ষেত্রে দেহবাদকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। পরবর্তী যুগের বাঙলা

১। চর্যপদ সং: ৩২।
২। শাস্ত্রী, বৌদ্ধ গান ও দোহা হইতে উদ্ধৃত পৃঃ ১১০।

দেশের সামাজিক ইতিহাস ইহার শোচনীয় পরিণতির স্বাক্ষর বহন করিতেছে। ত্যাগব্রতী বুদ্ধদেবের দেশনায় মূল কথা ছিল ইন্দ্রিয়সংযম ও পঞ্চকামোপভোগে বিরতি, চরিত্রবিশুদ্ধি এবং নির্বাণলাভ। সিদ্ধাচার্যগণ নির্বাণলাভকে একেবারে সহজসাধ্য করিতে গিয়া বলিলেন—'মহাসুখই নির্বাণ'। আর এই 'মহাসুখ' লাভ করিতে গিয়া তাঁহারা দেশব্যাপী আদিরসের উদ্দাম স্রোত প্রবাহিত করিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নৈতিক অবনতি কোন্ স্তরে উপনীত হইয়াছিল তাহার নির্দেশ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের তৃতীয় সর্গে পাওয়া যায়। এই নাটকে বৌদ্ধভিক্ষুদের ব্যভিচার, স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসভোগের বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। সিদ্ধাচার্যদের প্রভাবে বাঙালীর সমাজ-জীবন ও নৈতিক চরিত্রের কী ভয়াবহ পরিণতি হইয়াছিল মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তাহার মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"গানে, নানা সুরে, নানা বাদ্যের সঙ্গে গান করিয়া তাঁহারা লোকদের বলিয়া দিতেন, 'বাপুহে সবই ত শূন্য, সংসারও শূন্য নির্বাণও শূন্য—তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই, এটা কেবল ধোঁকা মাত্র। এই ধোঁকার পসরা নামাইয়া ফেল। তখন দেখিবে, কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ কর। আনন্দই শেষ থাকিবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ। এই যে আনন্দময় উপদেশ তাহাতে দেশের লোক মাতিয়া উঠিয়াছিল। সে মাতার ফল যে ভালো হয় নাই তাহা ত আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু যাঁহারা মাতাইয়াছিলেন, তাঁহারা খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, মানুষের মনের উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতে হয় তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। তাঁহারা গুরুগিরি করিয়া বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু চেলাদের যে কি পরিণাম হইবে তাহা তাঁহারা একেবারেই ভাবেন নাই।"[১]

বৌদ্ধধর্মের প্রাণীহিংসা বিরতি, শীলরক্ষা, নৃত্যগীতমালাগন্ধ বিলেপন পরিহার প্রভৃতি দেশনাও এই নৈতিক অবনতির খরস্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। সিদ্ধিলাভের চরম উপায় সম্ভোগ, কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন নহে। সুতরাং—

দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈঃ সেব্যমানো ন সিদ্ধতি।
সর্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিদ্ধতি ॥[২]

১। বৌদ্ধধর্ম, ১৩৫৫, পৃঃ ৭৬।
২। ঐ, পৃঃ ৮৩ হইতে গৃহীত।

অবশেষে গুহ্যপূজার অন্তরালে কামাচার শুরু হইল। শম্বর নামীয় চরম অশ্লীল মূর্তি গুহ্যভাবে বৌদ্ধগণের পূজা পাইতে লাগিল। ডাকার্ণব, বজ্রডাক, গুহ্যবজ্র, চক্রসম্বরতন্ত্র, জালসম্বরতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ জনসমাজে প্রচারিত হইল এবং এই সমস্ত গ্রন্থে অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপও সমাজে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হইতে শুরু হইল। আবার এই চরম ভোগলালসা শাস্ত্রগ্রন্থও অনুমোদন করিয়া লইল—

দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ।
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ॥[১]

এই উৎকট দেহলালসা যেদিন শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে সেই চরম অন্ধকার যুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেই অনাবৃত ইন্দ্রিয়সম্ভোগ ও দেহলালসা বড়ু চণ্ডীদাসের সৃজনশীল ব্যক্তি-প্রতিভার স্পর্শে কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। এই কাব্য জয়দেব-বিদ্যাপতির অনুসরণে রচিত বৈষ্ণবগ্রন্থ হইলেও ইহার যুগ পরিবেশে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনার যে প্রতিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই সময়ে বাঙলা দেশের সমাজ-জীবনে এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব এবং প্রসার ছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন তিন প্রধান ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বৌদ্ধ অধিবাসীই সংখ্যাধিক্য ও প্রবলতর ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"বল্লাল সেনের সময়ে ব্রাহ্মণদের যে আদমশুমারী গ্রহণ করা হয় তাহাতে বাঙলাদেশে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে মোট আট শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। এই আটশত ঘর ব্রাহ্মণ যে কয়জন যজমান রাখিতে পারে বা হিন্দু রাখিতে পারে ততটা লোকসংখ্যা বাদ দিলে বাঙলাদেশের বাকী সমস্তটা অধিবাসী বৌদ্ধ ছিল।[২] সুতরাং এই বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ও ধর্মকর্মকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত এবং সাহিত্য-স্বভাব পরিস্ফুট হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধাকৃষ্ণ লীলা কাহিনী ভাগবত কাহিনীকে অবিকল অনুসরণ করে নাই, লৌকিক রাধাকৃষ্ণ লীলা বা সাধারণ নরনারীর প্রেমকাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছে। কৃষ্ণ নবীন রাখাল যুবক, রাধা কিশোরী গ্রাম্য বধূ। তাহাদের দেহ হইতে বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রতার আবরণ স্খলিত হইয়া

১। ঐ।
২। ঐ পৃঃ ৮৬—৮৭।

পড়িয়াছে। ভোগের পত্রতিলক ললাটে ধারণ করিয়া তাহারা ভাগবতের ঐশ্বর্যমিশ্রা ভক্তিকে অস্বীকার করিয়াছে। অমর্ত্য অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার জায়গায় মর্ত্যজীবনের উত্তপ্ত দেহচাঞ্চল্য এবং আত্মনিবেদনের প্রশান্তির বদলে আবেগের উদ্দাম প্লাবন দেখা দিয়াছে। কেবল দেহধর্মের উচ্ছ্বাস প্রকাশেই এই গ্রন্থ শেষ হয় নাই, আদিরসের উদ্দামতার মধ্য দিয়া দেহধর্মের বিজয় গৌরবও ঘোষিত হইয়াছে।

সে যুগে নিম্নজাতীয়া অস্পৃশ্যা ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী প্রভৃতি নারিগণ সিদ্ধাচার্যদের যোগসঙ্গিনী হইত।[১] এই রমণিগণ নৃত্যগীতপরায়ণা, কামশাস্ত্র-কুশলা ও মনোলোভা ছিল। চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়—

এক সো পাদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥[২]

নৃত্যগীত দ্বারা এই রমণিগণ পুরুষদের মনোহরণ করিত। স্বামীকে খাইয়া বা পরিত্যাগ করিয়া, আত্মীয়-স্বজন ঘর-সংসার পরিহার করিয়া ইহারা যোগিনী সাজিত। এই রমণিগণ যে ভ্রষ্টচরিত্র ছিল তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়—

ঘরবই খজ্জই সহজে রসই রাঅবিরাঅ
ণিল পাস বইঠ্ঠি চিত্তে ভঠ্ঠি জোইণি মহু পড়িহাঅ ॥[৩]

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাও কৃষ্ণবিরহে স্বামী সংসার পরিত্যাগ করিয়া যোগিনী হইতে চাহিয়াছে। তাহার নিকট কৃষ্ণবিহীন জীবন-যৌবন অসার, পৃথিবী শূন্য। কৃষ্ণ যদি যোগ সাধনা গ্রহণ করে, তবে সেও যোগিনী হইয়া তাহার সঙ্গিনী হইবে। রাধার উক্তি—

তোম্মে জবে যোগী হৈলা সকল তেজিঞাঁ।
থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ।
না জাইবোঁ ঘর আর তোম্মাক ছাড়িঁঞা।
বড় দুখ পাইলোঁ তোর বিরহে পুড়িঞাঁ।[৪]

সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদের গানে হরিণকে চারিদিকে ব্যাধেরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও তাহারা তাকে ছাড়ে না। এইভাবে আক্রান্ত হইয়া সে প্রাণভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে—সে তৃণ ছোঁয় না, জলও

১। চর্যাপদ সং: ১৮, ৫০। ২। ঐ, ১০।
৩। বৌদ্ধ গান ও দোহা, ১৩৫৮, পৃঃ ১০৯।
৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্ত রঞ্জন রায় সম্পাদিত, ১৩৬৪, পৃঃ ১৪৩।

খায় না। আজ— 'আপন মাংসে হরণী বৈরী'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে 'শিরীষকুসুমকোঅলী', 'নবজোবনী' রাধা যেন সেই মায়া হরিণী আর লোলুপ কাহ্নাঞি যেন ব্যাধের প্রতীক। কৃষ্ণের চক্রান্তে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাধাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। চরম লজ্জায় ও আত্মধিক্কারে সে বলিয়াছে—

আপনার মাসে হরিণী জগতের বৈরী।

চর্যাপদে আছে মায়াজাল প্রসারিত করিয়া একদিন ব্যাধ মায়া হরিণীকে বধ করিয়াছে।[১] শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বাণখণ্ডে কৃষ্ণও পুষ্পশর প্রয়োগ করিয়া রাধাকে সম্পূর্ণ জয় করিয়া লইয়াছে।

সে যুগে নৃত্য ও গীতের মধ্য দিয়া কোন বিশেষ ঘটনাকে রূপায়িত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। চর্যাপদে 'বুদ্ধ নাটক' অভিনয়ের উল্লেখ আছে। যেমন—'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী'।[২] বজ্রাচার্য নৃত্য করিতেছেন, দেবী গান গাহিতেছেন—নাটক অভিনয় হইতেছে। এই দৃশ্যও সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ইঙ্গিত বহন করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নাটকীয় পদ্ধতিতে রচিত। ইহার অভিনয় ভূমিকায় তিনটি চরিত্র—আয়নবধূ রাহী, গোপপুত্র কাহ্নাঞি এবং পরিচারিকা বড়ায়ি।

রাধা বিরহখণ্ডে রাধার বিরহ যখন নানা সুরে ও ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, অনুতাপ ও আত্মগ্লানির বোঝা লইয়া সে যখন সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত তখন কৃষ্ণের কণ্ঠে কৃত্রিম বৈরাগ্যের ও যোগসাধনার বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধাকে সে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—

অহোর্নিশি যোগ ধেআই।
মনপবন গগনে রহাই ॥
মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইএঁা আহ্মো ব্রহ্ম গেআন ॥
দূর আহ্নসর সুন্দর রাহী।
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞী ॥
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মনপবন তাত কৈল বন্দী ॥

১। দ্রঃ 'মাআজাল পসরি রে বধেলি মাআ হরিণী। পদ সং ২৩।
২। পদ সং ১৭।

দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥
গেআন বাণে ছেদিলোঁ মদন বাণ।
তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন ॥
এবে দেহে মোর নাহি বিকার।
আসার দেখীলো সব সংসার ॥[১]

মনপবন, মূল কমলে মধুপান, ইড়াপিঙ্গলা সুষমা এবং দশমী দুয়ার প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের প্রতীক দ্যোতনার সাহায্যে অধ্যাত্ম তত্ত্বের ইঙ্গিত সিদ্ধাচার্য-দের রচিত গান ও দোহার মধ্যেও পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তিনজন দেবী প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন—বাসলী, মঙ্গলচণ্ডী ও ষষ্ঠী। বাসলী কবির আরাধ্যা দেবী। ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতারূপে বাসলী 'ধর্মপূজা বিধানে'ও স্থান পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যের ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে—বাগীশ্বরীদেবী উচ্চারণ বৈষম্যের ফলে বাগীশ্বরী—বাইসরী—বাসরী—বাসলী বা বাসুলী হইয়াছে।[২] সুতরাং বাসলী ও সরস্বতী দেবী অভিন্না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বাসলী অনার্য সমাজ হইতে আগতা দেবী। পরবর্তী যুগে তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেবায়তনে স্থান পাইয়াছেন। বাসলী ও চণ্ডী আরো পরবর্তী যুগে রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা বিধানে[৩] একই ধ্যান ও আবাহন মন্ত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

চণ্ডীদেবীর পূজাও তখন সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। সন্তানদাত্রী ও সন্তানের কল্যাণকারিণী শক্তিরূপে ষষ্ঠীদেবীও নারী সমাজে আপন স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। (মঙ্গলচণ্ডী ও ষষ্ঠী দেবীর বৌদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কীয় আলোচনা মঙ্গল সাহিত্যে যথাস্থানে করা হইয়াছে।)

কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেবের অনুসরণে কবি বড়ু চণ্ডীদাসও বুদ্ধদেবকে নারায়ণের অবতারের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। কালিয়দমনখণ্ডে আত্মবিস্মৃত কৃষ্ণের প্রতি বলভদ্রের প্রশস্তিতে মীন, মাহাকেলি (বরাহ অবতার), নরহরি, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র এবং কলকী প্রভৃতি অবতারের সঙ্গে বুদ্ধদেবও এক পংক্তিতে স্থান পাইয়াছেন।[৪]

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১—১৪২। ২। ঐ, মুখবন্ধ, পৃঃ ৸৶।
৩। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজাবিধান', পৃঃ ১০২—১০৩।
৪। 'বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাথ-সাহিত্য ও শূন্যপুরাণ

ইতিহাসের দ্বন্দ্ব-জটিল চলার পথের একদিকে মিলন ও সহিষ্ণুতা, অন্যদিকে সংঘাত ও বিরোধ। এই জটিল পথে চলিতে চলিতে কোন এক সময়ে দুইটি ধারা পরস্পরের অতি নিকটবর্তী হইয়া পড়ে। অবশেষে সমন্বয়ের এক বিন্দুতে বিধৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে সঞ্জীবিত ও সাঙ্গীকৃত করিয়া লয়। বাংলা দেশের ধর্মীয় ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির বিশেষ সেই ক্ষণটিতে নাথধর্মের অভ্যুদয়। পালযুগের উদার আবহাওয়ায় পরধর্ম সহিষ্ণুতার নীতি গৃহীত হইয়াছিল। ইহার ফলে হিন্দু-বৌদ্ধ আপন আপন ধর্মের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও ঘনিষ্ঠ মিত্রতায় একে অন্যের অতি নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল এবং দুই ধর্মাবলম্বীর নির্বিবাদ সহাবস্থানও সম্ভবপর হইয়াছিল। ক্রমে শৈবধর্ম ও তান্ত্রিক ধর্মের মধ্যে আত্মস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও আত্মসম্প্রসারণের ইচ্ছা পারস্পরিক বিরোধের সৃষ্টি করিল। বাঙালীর চিন্তাকাশের পরিধিও সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। সেন রাজত্বকালে মৈত্রীকরুণার মিলনমুখী ধারাটি ক্রমে ক্ষীয়মাণ হইয়া আসিলে রাজসহায়তায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম আত্ম-সম্প্রসারণের পথ গ্রহণ করিল। সমাজের সাধারণের ধর্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে নিম্নকোটির অনুগামী হইয়া পড়িল। সমাজের উচ্চকোটি হইতে অপস্রিয়মাণ বৌদ্ধধর্ম নিম্নকোটির কৌমদেবতা শিবকে আশ্রয় করিয়া নাথধর্ম ও সাহিত্যের অভ্যুদয় ঘটাইল। বাঙলা দেশের ধর্মীয় জীবনের সেই চরম সঙ্কট মুহূর্তে একদিকে আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টা, অন্যদিকে আপন স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্টা এই দ্বিমুখী সংঘর্ষের মধ্যে নাথধর্ম সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণ নীতিকে গ্রহণ করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্মের মধ্যে মিলন সংস্থাপন করিয়াছিল।[১] শৈব ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের স্বতন্ত্র অথচ সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একাধিকধারা নাথধর্মকে ঐতিহ্যমণ্ডিত করিয়াছিল। সুতরাং তৎকাল প্রচলিত হিন্দুবৌদ্ধধর্মের বিচিত্র ঐতিহ্যসম্ভারের মধ্যেই সেই যুগের

নাথ-ধর্মের উৎপত্তি

১। স্বর্গত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন—'নবম, দশম এবং একাদশ খৃষ্ট শতাব্দে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষের সহিত শৈবধর্মমূলক যোগ ও তন্ত্রাচার মিশ্রিত হইয়া নাথপন্থের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মীননাথ, গোরক্ষনাথ ইত্যাদি এই পন্থা প্রবর্তকগণের অগ্রণী'। 'মীনচেতন' গ্রন্থের ভূমিকা, পৃঃ ॥৹

নাথধর্ম ও সাহিত্যের সমন্বয়ধর্মী প্রাণলক্ষণ বিধৃত রহিয়াছে। বিভিন্ন কালের, বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন জাতের মানুষের সাধনপদ্ধতি ও চিন্তাধারার ছাপ নাথধর্মের মধ্যে সুস্পষ্ট। প্রাক্ আর্য ও বৈদিক ঐতিহ্যের ধারাবাহী যোগ-সাধনার সঙ্গে জৈন এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সহজযান ও বজ্রযান ধর্মের সংমিশ্রণ ঘটে। তাহার উপর বাংলার পার্বত্য তিব্বতী চীনীয় ও অষ্ট্রীক জাতির প্রভাবে সমন্বয়ধর্মী বাংলার বুকে এই নূতন ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। একদা নাথ সম্প্রদায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ হইতে শুরু করিয়া রাজপুতনা, গুজরাট, পাঞ্জাব প্রভৃতি সমগ্র উত্তরভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অবশ্যই নাথধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের কেন্দ্ররূপে বাংলাদেশকেই চিহ্নিত করা যায়। এই দেশ হইতেই তাহার বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন দেশের দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল।[১] বাংলাদেশকে কেন্দ্র করিয়া দিকে দিকে প্রবাহিত হইলেও এই ধর্ম কেবল বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ্ নয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির চিন্তা ও আচরণ, সাধনপদ্ধতি ও ধ্যান-ধারণার সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণে এই ধর্ম আপন কলেবর সংগঠিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মানিকচাঁদের গীত, ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গীত, গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন প্রভৃতি নাথধর্ম বিষয়ক কাব্যকাহিনী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কাব্যকাহিনীসমূহে উল্লেখিত গোরক্ষনাথ, মীননাথ, হাড়িফা, কানুফা ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং খৃঃ দশম-একাদশ শতাব্দীতে ইঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইজন্য স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন, গ্রীয়ারসন সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বাংলা নাথকাব্যসমূহকে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে স্থান দিয়াছিলেন।[২] কিন্তু বাংলা নাথসাহিত্যের এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত পুঁথির লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে নহে। প্রধানতঃ এই কারণে ডঃ সুকুমার সেন বাংলা নাথ-সাহিত্যকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।[৩]

নাথসাহিত্যের কাল বিচার

১। দ্রঃ হাড়িফা পূর্বেতে গেল, দক্ষিণে কানফাই।
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল, উত্তরে মীনাই॥
—গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, ১৩৫৬, পৃঃ ৮।

২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ ৩৩—৩৪।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃঃ ২১৬—২১৮।
নাথ সাহিত্যকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়াও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—'অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে লেখা মীননাথ গোরক্ষনাথের কাহিনীর কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। তবে কাহিনী যে পূর্ববর্তী দুই তিন শতাব্দে অজ্ঞাত ছিল তাহাও বলা যায় না। ষোড়শ শতাব্দের প্রথমভাগে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মধ্যেও 'মীনচেতন' নাম প্রচলিত ছিল।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে তুর্কী আক্রমণের পূর্বে গোপীচন্দ্র ময়নামতী ও গোর্খ-মীননাথের কাহিনী বাঙলা তথা সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল।[১] সুতরাং কাল বিচারে নাথসাহিত্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত না হইলেও বর্তমান আলোচনার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া এই অধ্যায়ে তাহা উপস্থাপিত হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীযুগে রচিত সাহিত্যে পূর্বসূত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হইয়াছে।

বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের জীবনাচরণ, চিন্তা ও সাধনার সঙ্গে সিদ্ধাচার্য ও নাথগুরুদের গভীরতর মতদ্বৈধতা ছিল না। নাথধর্ম, কৌলধর্ম, সহজধর্ম, অবধূতধর্ম প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্রদায়ের গুরুগণ একে অন্যের সম্প্রদায়কর্তৃক আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে এই আচার্যদিগকে 'চুরাশী সিদ্ধা'[২] বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। চুরাশী সিদ্ধাদিগের কয়েকজন বজ্রযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মানস প্রভাব নাথপন্থীদের চিন্তন ও আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। সহজ পন্থিগণ ও নাথপন্থিগণও এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের আচার্যকে নিজেদের গুরুরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। নাথগুরুরূপে স্বীকৃত সিদ্ধপুরুষদের জীবনবাচ্যের সঙ্গেও বহু বৌদ্ধ ঐতিহ্য অপরিহার্যভাবে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। নাথসাহিত্যে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের যথার্থ মূল্যায়ন করিতে হইলে তাঁহাদের জীবনকাহিনীর সেই বিশেষ দিকটার আলোচনা আবশ্যক।

প্রধান প্রধান নাথসিদ্ধা

মৎস্যেন্দ্রনাথ :—যিনি মৎস্য অর্থাৎ পাশ বা বন্ধন ছেদন করিয়াছেন তিনিই মৎস্যেন্দ্রনাথ। নেপালী ঐতিহ্যে মৎস্যেন্দ্রনাথকে বৌদ্ধ দেবতা অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে স্বীকৃতি জানানো হইয়াছে। পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার অনুরূপ নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রা বাহির হয়। কথিত আছে মৎস্যেন্দ্রনাথ

১। The Stories of Gorakhanath and Gopichand, at least the skeleton of such stories, had been, in all probability, current in Bengal (and not only in Bengal, but in many other parts of India) before the time of the conquest of Bengal by the Muslims in the thirteenth century.

Obscure Religious Cults, op. cit, p 369.

২। তিব্বতী বৌদ্ধদের 'গ্রুবছেন গ্যবশি' বা ৮৪ জন মহাসিদ্ধাদের নাম ও পরিচয় Albert Grunwedel লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই তালিকায় নাথসাহিত্যের প্রখ্যাতযশসিদ্ধাগণ—মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরিপাদ, কানুপা, চৌরঙ্গীনাথও স্থান পাইয়াছেন।

আপন গুরুদর্শনে নেপালে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু নেপালের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় তাঁহার গতিরোধ করে। মৎস্যেন্দ্রনাথও ফিরিবার পাত্র নহেন, তিনি নবনাগের আসনে উপবিষ্ট হইয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। পরিণামে দ্বাদশ বৎসর নেপালে অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষও দেখা দিল। নেপালরাজ আপন রাজ্যকে এই দুর্যোগ হইতে রক্ষা করার জন্য অবলোকিতেশ্বরের অর্চনা করিলেন এবং গুহ্যমন্ত্র আয়ত্ত করিলেন। এই মন্ত্র প্রভাবে স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরকে তিনি কমণ্ডলুমধ্যে কৃষ্ণ ভ্রমররূপে আবদ্ধ করিয়া বুগাম নগরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নেপাল অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে মুক্তি পাইল। অবলোকিতেশ্বর এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ এক ও অভিন্ন। নেপালের বুগাম নগরে এখনও প্রতি বৎসর অবলোকিতেশ্বরের রথযাত্রা বাহির হয়।[১] কৌলজ্ঞাননির্ণয় গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথকে ভৃঙ্গীপাদ[২] নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই নামের দ্বারাও নেপাল নৃপতি কর্তৃক অবলোকিতেশ্বরকে কৃষ্ণ ভ্রমররূপে বুগামে আনয়ন করার কিংবদন্তীকে স্বীকৃতি জানানো হইয়াছে। এই কাহিনীটির যাথার্থ্য বিচারে অধ্যাপক লেভীর মত অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাঁহার মতে বুগাম নগরের বৌদ্ধ দেবতা অবলোকিতেশ্বর পরবর্তীযুগে মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত এক ও অভিন্নরূপে কল্পিত হইয়াছেন। খৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীর পরবর্তী যুগে নাথধর্মের দেশব্যাপী সম্প্রসারণ ঘটে এবং লোকপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। সম্ভবতঃ সেই সময়েই মৎস্যেন্দ্রনাথকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। মৎস্যেন্দ্রনাথ কেবল নাথপন্থীদের গুরুই নহেন, তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নেপালের উপাস্য কল্যাণদাতৃ দেবতা এবং নেপাল রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতাও। মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রণীত পাঁচখানা গ্রন্থ নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' মতে তিনি সিদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যেও তাঁহাকে 'আদি সিদ্ধ'রূপে স্বীকৃতি জানানো হইয়াছে।[৩] মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ধর্ম 'সহজসিদ্ধি' নামে অভিহিত। সহজসিদ্ধি তান্ত্রিক মন্ত্রযান ও বজ্রযানের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছে। নাথধর্ম ও কৌলধর্মের মূল এই সহজসিদ্ধির মধ্যে প্রোথিত। লুইপাদের 'অভিসময়বিভঙ্গ' গ্রন্থের পুষ্পিকায় স্বীকার করা হইয়াছে দীপঙ্করের প্রেরণায়

১। G. H. Briggs, Gorakhanath and the Kanphata Yogis, 1938, pp. 144—45, 231 etc. ; Levi, Nepal, Vol. I, p. 347.

২। কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত, ১৬ পটল, ১৭ শ্লোক।

৩। History of Bengal, Vol. I. op. cit, p. 342.

ও সাহায্যে তিনি এই গ্রন্থ এবং ইহার তিব্বতী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন।[১] পণ্ডিতগণের মতে চন্দ্রদ্বীপের মৎস্যেন্দ্রনাথ ও রাঢ়ের সিদ্ধাচার্য লুইপাদ একই ব্যক্তি।[২] গোরক্ষপদ্ধতি এবং জ্ঞানদেব রচিত 'জ্ঞানেশ্বরী' গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে পরম যোগী ও ঐন্দ্রজালিক অবলোকিতেশ্বরই শিবকে যোগশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। শিব সমুদ্রমধ্যে পার্বতীকে এই যোগশাস্ত্র শিক্ষা দিবার সময় মৎস্যেন্দ্রনাথ মীনরূপ ধারণ করিয়া তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে যোগধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথের সংস্কৃতায়িত রূপ বলিয়া মনে হয়। মীননাথ নেপালে 'মচ্ছঘ্ন' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। তিব্বতী কিংবদন্তী মতে মীননাথ কৈবর্ত ছিলেন। বাংলাদেশে প্রচলিত উপাখ্যান হইতে অনুমান করা যায় মৎস্যেন্দ্রনাথ বাখরগঞ্জের চন্দ্রদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন এবং ধীবরের কাজ তাঁহার পেশা ছিল।

জালন্ধরিপাদ :—নাথধর্মের প্রবর্তকরূপে তিনি স্বীকৃতি পাইয়াছেন। জালন্ধরিপাদকে অষ্টম শতাব্দীর উড্ডীয়ান-রাজ ইন্দ্রভূতির শিষ্যরূপেও কল্পনা করা হইয়াছে।[৩] তারনাথ লিখিয়াছেন—পাঞ্জাবের জলন্ধর নামক স্থানে দীর্ঘকাল বাস করার জন্য তাঁহার এই নামকরণ করা হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ জালন্ধরিপাদ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথকে বাঙালীরূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই। কেবল মৎস্যেন্দ্রনাথই এই গৌরব অর্জন করিয়াছেন। সুম্পার এবং তারনাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় জালন্ধরিপাদের অন্য নাম 'বালপাদ'[৪]। তিনি নেপাল, অবন্তী, উদ্যান ও চট্টগ্রামে ভ্রমণ করিয়া নিজ ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঞ্জুর তালিকায় এই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ পুরুষের নাম স্থান পাইয়াছে। তিনি বহু তান্ত্রিক যোগ সাধনার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ বজ্রযোগিনীসাধনা, শ্রীচক্রসম্বরগর্ভতত্ত্ববিধি, শুদ্ধিবজ্র-প্রদীপিকা (হেবজ্রতন্ত্রের টিপ্পনী), হুঙ্কারচিত্তবিন্দুভাবনাক্রম ইত্যাদির তিব্বতী অনুবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তেঙ্গুরে তাঁহাকে 'আদিনাথ' বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে।

১। History of Bengal, Vol. I. op. cit, p. 341

২। Introduction by Dr. P. C. Bagchi to Kaulajnana-nirnaya, Published in the Calcutta Sanskrit Series, no. 111, pp. 7, 12, 23, 24.

৩। History of Bengali, Vol, 1, pp 344, foot-note 5,

৪। ঐ, পৃঃ ৩৪৪, পাদটীকা নং ৫।

গোরক্ষনাথ :—কথিত আছে তিনি প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি নেপালী বৌদ্ধগণের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু গোরক্ষবিরচিত 'কায়াবোধ' নামক গ্রন্থে তিনি 'পশ্বারন্তক' অর্থাৎ পশুহত্যাকারীরূপে পরিচিত বলিয়া গোরক্ষনাথকে বৌদ্ধরূপে চালাইয়া দিতে অনেকে আপত্তি করিয়াছেন।[১] কিন্তু তিব্বতী বৌদ্ধেরা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। Pag-Sam-Jon-Zang গ্রন্থানুযায়ী গোরক্ষনাথ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন, পরবর্তীকালে নাথধর্ম প্রচার করেন। স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের মতে 'Gauraksa—a cowherd, who being initiated into Tantrik Buddhism become the well-known sage Gauraksa whose religious school survives in the Yogee sect who go under the designation of Nath.'[২]
বাঙলাদেশের নাথপন্থিগণ গোরক্ষনাথকেই তাঁহাদের আচার্যরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। তেঙ্গুর তালিকায় গোরক্ষনাথের রচিত একটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। 'গোরক্ষ-সংহিতা' এবং 'গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'ভক্তমাল' গ্রন্থে বলা হইয়াছে পরমযোগী গোরক্ষনাথ তাঁহার গুরু বিষয়াসক্ত এবং নারী সংসর্গে যোগভ্রষ্ট হইলে তিনি প্রশ্নচ্ছলে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং সমস্ত মায়ামোহের আবরণ ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় পরমার্থ পথে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত—

'চেৎ মৎছন্দর গোরক্ষা আয়া
চেৎ মৎছন্দর গোরক্ষা আয়া'

এই বাণী বিষয়াসক্ত মানুষকে আর একবার ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে, সংযম ও কৃচ্ছ্রতার পথে আহ্বান জানাইয়াছিল। গোরক্ষ চরিত্র যেমন প্রশান্ত নির্মল, তেমনি ধীর, স্থির। সুকঠিন চরিত্রবলে নারীর সমস্ত ছলনা ও কুহক-জাল তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়াছিলেন। গৌরীর অগ্নি পরীক্ষায় তিনিই একমাত্র বিজয়ী পুরুষ। তাঁহার অন্তরের কামনা—

১। Gopinath Kobiraj, Some Aspects of the History and Doctrines of the Nathas, S.B.S. Vol. VI, pp. 19 ff.

২। Pag-Sam-Jon-Zang, Index, p. xix.

এমত জননী যদি থাকএ আমার,
তাহার কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই,
এমত জননী যদি কভু আমি পাই।
মল মূত্র সহিয়া যদি পালে কাক-কোলে,
তার স্তনের দুগ্ধ খাইয়া থাকি কুতূহলে ॥[১]

মানুষ হইয়াও সকল মানবিক দৌর্বল্যের উর্ধ্বে তাঁহার স্থান। এইজন্যই তিনি মানুষ হইয়াও দেবতা—শিব হইতেও শ্রেষ্ঠ। গোরক্ষনাথ বিরচিত 'হঠযোগ-প্রদীপিকা', 'গোরক্ষসংহিতা', 'গোরক্ষবিজয়', 'গোরক্ষশতক', 'গোরক্ষকল্প' প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের হাতে আসিয়াছে। সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম সাহেব মনে করিয়াছেন গোরক্ষনাথ পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] কিন্তু বাঙলাদেশই তাঁহার ধাত্রী, বঙ্গভাষা তাঁহার মাতৃভাষা। গোরক্ষনাথ বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহার দুইটি বৌদ্ধ নাম প্রচলিত ছিল। এই নামদ্বয় হইতেছে 'রমণবজ্র' বা 'অনঙ্গবজ্র'[৩]। মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁহার গুরু ছিলেন এবং তিনিই গোরক্ষনাথকে বজ্রযান বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করাইয়া শৈবধর্মে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন।[৪]

কাহ্নুপাদ বা কানপা :—জালন্ধরিপাদের শিষ্য কাহ্নুপাদ নাথপন্থী এবং সহজ-পন্থীদের গুরুরূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন। চর্যাপদের মধ্যে এমন একটি পদ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহাতে কাহ্নুপাদ তাঁহার গুরু জালন্ধরিপাদের উল্লেখ করিয়াছেন।[৫]

ঐতিহাসিক তারনাথের মতে কানপা বা কৃষ্ণাচার্য পাণ্ড্যনগর বা বিদ্যা-নগরের অধিবাসী ছিলেন।[৬] Grunwedel-এর মতে তাঁহার জন্মস্থান ও দীক্ষাস্থান সোমপুরী।[৭] কাহ্নুপাদ, কাহ্নু, কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণবজ্র ইত্যাদি ভণিতায় কয়েকটি চর্যাপদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সমুদয় রচনা সিদ্ধা কাহ্নুপাদের না হওয়াই সম্ভব। একাধিক কাহ্নুপাদের অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না।

১। গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১১—১২।
২। সেখ ফয়জুল্লা প্রণীত, 'গোরক্ষ বিজয়ের ভূমিকা,' পৃঃ ২৪—২৫।
৩। নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী, কল্যাণী মল্লিক, ১৯৫০, পৃঃ ৪।
৪। N.N. Basu, Modern Buddhism in Orissa, Introduction.
৫। পদসংখ্যা : ৩৬ (শাখি করিব জালন্ধরি পাএ)
৬। History of Bengal, Vol. 1, op. cit, p. 347.
৭। ঐ।

চৌরঙ্গীনাথ :—ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করিয়াছেন নাথসিদ্ধা চৌরঙ্গী খঞ্জ ছিলেন।[১] এইজন্যই আদিনাথের শবদেহের চরণ হইতে তিনি উদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। 'চৌরঙ্গী পলুই লয়্যা ধায়'—এই পংক্তিটিকে তিনি চৌরঙ্গীনাথের খঞ্জত্বের প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

হাড়িফা :—সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের কোন অঞ্চলবিশেষের নিবাসী ছিলেন। পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে নৃপতি বা সামন্তরাজগণ সম্মানসূচক 'ফা' উপাধি গ্রহণ করিতেন। 'ফা' শব্দের মূল তিব্বতী 'ফ' যাহার অর্থ পিতা। সুতরাং হাড়িফা শব্দের অর্থ হাড়িবাবা। কোন কোন পণ্ডিতের মতে হাড়িফাই জালন্ধরিপাদ।[২] তিনি যোগী গোরক্ষনাথের শিষ্য এবং ময়নামতীর গুরুভাই। বাংলা নাথসাহিত্যে তিনি 'হাড়িসিদ্ধা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। হাড়িফা পরমযোগী মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ। বাংলা নাথসাহিত্যে হাড়িফার যোগক্ষমতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। পুত্র গোপীচান্দ হাড়ির জাতকুলের নিন্দা করিলে ময়নামতী বলিয়াছেন—

এদেশিয়া হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর।
চান্দ সুরুজ রাখ্ছে দুই কানের কুণ্ডল ॥
আপনি ইন্দ্র রাজা ঢুলায় চামর।
চন্দ্রের পিঠে আন্দে বাড়ে কুরুমের পিঠে খায় ॥[৩]

বাংলা নাথসাহিত্যেও হাড়িফা এবং জালন্ধরিপাদ এক ও অভিন্ন।[৪]

গাভুরসিদ্ধা :—ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করিয়াছেন গাভুরসিদ্ধা এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য গর্ভপাদ বা গর্ভরিপাদ একই ব্যক্তি হইতে পারেন।[৫] সম্ভবতঃ তিনি 'বজ্রযানমূলপত্তিটীকা' ও 'হেবজ্রৈকস্মৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। অতীশ দীপঙ্করের গুরু এবং নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ জেতারীর পিতার নামও গর্ভপাদ ছিল।[৬] অনুমান করা যাইতে পারে নাথসাহিত্যে গাভুরসিদ্ধা ও গর্ভপাদ একই ব্যক্তি।

১। বিচিত্র সাহিত্য, পৃঃ ২৪৩।

২। History of Bengal, Vol. I, op. cit, p 885.

৩। গোপীচন্দ্রের গান, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৫৯, পৃঃ ৪৪—৪৫।

৪। দ্রঃ—রাজা বলে, শুন গুরু, গুরুপা জলন্ধরী।
তোমার মহিমা আমি বুঝিবার না পারি॥ ঐ পৃঃ ১৯৪।

৫। বিচিত্র সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪।

৬। Early History of Bengal, Vol. II, op. cit, p. 20.

নাথসিদ্ধাদের কাহিনীসমূহের অপর পর্যায়ে—গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর গানে যজ্ঞবিরোধী ধর্মের পূজারিণী, নাথধর্মাবলম্বিনী রাজমাতা ময়নামতী এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের ভোগসুখে বঞ্চিত জীবনের মর্মান্তিক কাহিনী প্রাধান্য পাইয়াছে। ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা এবং হাড়িফার গুরু-ভগ্নি। অবিচলিত কর্তব্যনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যব্রত ময়নামতীর মাতৃহৃদয়কে একমাত্র পুত্রের প্রতিও বজ্রকঠিন করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি মহাজ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। ইহার প্রভাবে তিনি অনেক অসম্ভব কার্যও অতি অনায়াসে সমাধান করিয়াছেন। এই ক্ষমতার বলে তিনি তাঁহার স্বামীর আত্মা লইয়া পলায়নপর যমদূতের পিছন ধাওয়া করিয়া স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইয়াছেন এবং বহুবার কায়াবদল করিয়া যমদূতকে পরাস্ত করিয়াছেন।[১] যমদূত ও ময়নামতীর এই কায়াবদল করার কাহিনী বৌদ্ধসাহিত্যের 'কালি-যক্ষিণী'[২] গল্পের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়।

তারনাথের ইতিহাস পাঠে জানা যায় খৃঃ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে বাঙলাদেশে গোবিন্দচন্দ্র নামে চন্দ্রবংশীয় এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতী গ্রন্থ অবলম্বনে গোপীচন্দ্রের বংশ-পরিচয় নির্ধারণ করিয়াছেন।[৩] তাঁহার মতে গোপীচাঁদ বালপাদ বা হাড়িফার শিষ্য এবং তাঁহার নিবাস চট্টগ্রামে ছিল। এই তিব্বতী ঐতিহ্যানুযায়ী গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম বিমলচন্দ্র, পিতামহের নাম বালচন্দ্র এবং প্রপিতামহ সিংহচন্দ্র। তিব্বতী ঐতিহ্যে আরো বলা হইয়াছে গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছিল। গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীতে খৃঃ দশম ও একাদশ শতাব্দীর পাল রাজত্বকালের বাঙলার গৌরবোজ্জ্বল দিনের আভাস পাওয়া যায়। পালযুগের অবসানে বাঙলার নাথযোগিগণ গোপীচাঁদের মর্মস্পর্শী গীত গাহিয়া সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। শাক্যকুমার গৌতমের মহাভিনিষ্ক্রমণের কাহিনী যেমন ভারতবর্ষের মনোবীণায় এক করুণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি বঙ্গীয় রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের অশ্রুসজল কাহিনীও একদা সমগ্র ভারতের মর্মস্পর্শ করিয়াছিল।

১। গোপীচন্দ্রের গান, আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৫৯, পৃঃ ১৯—২৯।

২। The Commentary on the Dhammapada, ed. Norman, 1906, কালিযক্খিনী বত্থু, pp 45-53.

৩। J.A.S.B. Vol. LXVII, part 1, no. 1, pp 21—24.

'গোরক্ষসিদ্ধান্ত সংগ্রহ' গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে—'ইন্দ্রিয়াণাং মনোনাথো মনোনাথশ্চ মারুতঃ, মারুতস্য লয়ো নাথঃ স লয়ো নাদমাশ্রিতঃ।'[১] গোর্খবিজয়' গ্রন্থেও বিবৃত হইয়াছে—

নাথধর্মের বৈশিষ্ট্য

মন হএ পবন পবন হএ সাক্ষি।
হেন তত্ত্ব কহিয়াছে আপনে গোসাঞি॥[২]

মন ও পবনের সাক্ষি বা স্বামী অর্থে নাথ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ দমন করিয়া মন ও পবনকে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে আয়ত্ত করিয়াছেন তিনিই নাথ। 'না' অর্থ অনাদিরূপ এবং 'থ' অক্ষরের অর্থ অনাদিধর্ম এই ব্যাখ্যাও গৃহীত হইয়াছে।[৩] সুতরাং হঠযোগ সাধনার সঙ্গে নাথধর্মের ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে। যোগসাধনায় দ্বারা সিদ্ধ সাধকই নাথ বা ঈশ্বররূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন।

নাথধর্মাবলম্বী সাধকদিগকে অনেকে শৈবদের সঙ্গে এক পংক্তিভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু নাথধর্মের আদি শিব নহেন,—ধর্মনিরঞ্জন। নাথধর্মে তিনিই চরম এবং পরম। শিব ধর্মনিরঞ্জনের পুত্র, তবে তিনি অন্যতম যোগী এবং সিদ্ধ যোগীদের গুরু ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা।[৪] সুতরাং ধর্মনিরঞ্জনের গুরুত্বই নাথধর্মে সর্বাপেক্ষা বেশী সূচিত হইয়াছে।

নাথপন্থীদের মতে মায়া দ্বিবিধ—অশুদ্ধ মায়া ও বিশুদ্ধ মায়া। যোগীকে অশুদ্ধ মায়া পরিহার করিয়া বিশুদ্ধ মায়া অবলম্বন করিতে হইবে। সাধারণ মানুষ যোগহীন, অপক্কদেহ, সুতরাং শোক তাপদ্বারা দগ্ধ হইতেছে। যোগিগণ অপক্ক দেহকে যোগাগ্নিদ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া সিদ্ধদেহ লাভ করেন। সিদ্ধদেহ—ধ্বংসহীন, দৈবদেহ যাহা সাধককে জড়ত্ব হইতে মুক্তি দেয় এবং ঊর্ধ্বায়নের পথে পরামুক্তির দিকে তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করে। সিদ্ধগণ দেবদুর্লভ যোগক্ষমতার অধিকারী, পরমশক্তিধর পুরুষ, এক জীবনেই তাঁহাদের জীবন্মুক্তি ঘটে।

মৃত্যুকে জয় করিয়া তাঁহারা অমৃতত্বে বা অমরত্বে উপনীত হইয়া থাকেন। কায়াসাধনই এই উন্নয়নের মার্গ। ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁহারা উপলব্ধি

১। গোরক্ষসিদ্ধান্ত, গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত, পৃঃ ৩৮।

২। গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ৯২।

৩। নাথ সম্প্রদায়, হজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, পৃঃ ৩।

৪। দ্র: আন্তে গুরু মহাদেব পিছে আর সব—গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ৮।

করেন। ঊর্ধ্বে মস্তকে মহেশ্বরের অধিষ্ঠান ভূমি, মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিতা। এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সহস্রারে শিবের সঙ্গে মিলিত করিতে পারিলে জীবের জীবভাব অবলুপ্ত হইয়া যায়, জীব শিবত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চরমসত্য বা Absolute reality সম্বন্ধে নাথপন্থীদের চিন্তাধারা চন্দ্র ও সূর্য এই দ্বিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১] সূর্য ধ্বংস বা কালাগ্নির প্রতীক—বিনাশ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া যাহার প্রকাশ। চন্দ্র অমৃতত্ব বা Immortality-র প্রতীক—মস্তকের সহস্রদল পদ্মের নিম্নে তাহার অবস্থান। সূর্য ধ্বংস বা ক্ষয়ের কারক, চন্দ্র রক্ষা বা সৃষ্টির সহায়ক। নাভিপ্রদেশে জ্যোতির্ময় সূর্য এবং তালুতে অমৃত-প্রস্রবণ চন্দ্রের অধিষ্ঠান। অমৃতবর্ষী চন্দ্র অবনতমুখে অজস্রধারায় অমৃত বর্ষণ করিতেছে, সূর্য ঊর্ধ্বমুখে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, যাহার অনিবার্য পরিণতি—বার্ধক্য, জরা, মৃত্যু।[২] যিনি উল্টা সাধনদ্বারা যোগবলে চন্দ্রসূর্যের মিলন বা commingling ঘটাইতে পারেন তিনি দেহস্থ অমৃতধারাকে রক্ষা করেন।[৩] তিনি জরারোগজয়ী, মৃত্যুজিৎ এবং বিশ্বজিৎ।

নাথসিদ্ধাদের চরম ও পরম লক্ষ্য পরমপদ প্রাপ্তি। নাথসিদ্ধাগণ বলিয়াছেন এই ধাম 'নির্নাম' বা 'অনামা'। ইহা সর্বপ্রকার বাচ্যবাচক ভেদরহিত, কার্য-কারণ সম্বন্ধের অতীত, অনাদি ও অব্যক্ত অবস্থা, ইহাই অদ্বৈততত্ত্ব। এই স্তরে গমন করিলে সাধককে আর জন্মমৃত্যুর ঘূর্ণাবর্তে পতিত হইতে হয় না।[৪] তিনি ভাবাভাব বিনির্মুক্ত এবং সামরস্যাত্মক পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মৃত্যু

১। Cf. The Theory of the Sun and the Moon, Obscure Religious Cults, op. cit. pp 235-44.

২। নাভিমূলে বসেৎ সূর্যস্তালুমূলে চ চন্দ্রমা।
অমৃতং প্রসতে সূর্যস্ততো মৃত্যুবশো নরঃ। —গোরক্ষসংহিতা, ১।৮৫।

৩। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সুস্পষ্টভাবে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"This secretion of the nectar from the moon is associated with the rousing of Kundalini Sakti and it is held that the rousing of Sakti in the Sahasrara is instrumental to the trickling down of the nectar,—and sometimes Sakti herself is depicted as the drinker of the nectar. This liquid, trickling from the moon is also called the wine of the immortals (amara-varuni), and as the gods have become immortal by drinking Amrita or the ambrosial wine, so the Yogins become immortal by drinking this wine trickling from the moon."
Obscure Religious Cults, op.cit. p 242.

৪। তুলনীয় : যদ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম—গীতা ১৫।৬।

তাঁহার ইচ্ছাধীন। সিদ্ধদেহ এই যোগিগণই মানুষকে আত্মমুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। এইজন্য সিদ্ধাগণই পৃথিবীতে যথার্থ গুরুরূপে বরণীয়। অশুদ্ধ মায়া হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত বলিয়াই সিদ্ধাদিগের অনুষ্ঠিত জীব-কল্যাণব্রত তাঁহাদিগকে পৃথিবীর দুঃখভোগের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। তাঁহারা একদিকে যেমন পরম আকাঙ্ক্ষিত পরামুক্তির অধিকারী, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বের ধর্মপ্রাণ নরনারীর নিকট কল্যাণ ও মুক্তির পথপ্রদর্শকও। নাথসিদ্ধাদিগের এই গুণাবলীর মধ্যে মহাযানীদের বোধিসত্ত্ব মতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে। বোধিসত্ত্বগণও বিশ্বমৈত্রী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বিশ্বের দুঃখী জনগণের উর্ধ্বায়নের পথ প্রদর্শক হইয়াছেন, আবার নিজেও দশ-বোধিসত্ত্বভূমি অতিক্রম করিয়া পরামুক্তির অধিকারী হইয়াছেন।

নাথধর্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম

নাথধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাযুজ্য এত বেশী যে নাথধর্মকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক পরিণতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ন্যায় তাঁহারাও ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম ধর্মকে অস্বীকার করিয়াছেন। লক্ষ্মীঙ্করার 'অদ্বয়সিদ্ধি'তে বলা হইয়াছে—কাঠ, পাথর বা মাটির তৈয়ারী দেবমূর্তির নিকট প্রণত হওয়া বৃথা।[১] নাথগণও মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করিতেন না। তান্ত্রিক বৌদ্ধদের নিকট ভগবান বুদ্ধ বা বজ্রসত্ত্বই (হেবজ্র বা হেরুক) সমস্ত গুহ্য যোগশাস্ত্রের আদি প্রবক্তা। নাথদের বিশ্বাস আদিনাথই প্রথম নাথ এবং সমস্ত গুহ্য যোগশাস্ত্রের তিনিই স্রষ্টা। তিনি হিন্দুদের 'শিব', বৌদ্ধদের 'বজ্রসত্ত্ব'।[২] নাথধর্মের তত্ত্ব বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্মের দ্বারা শুধু প্রভাবিতই হয় নাই, ইহাকে সর্বভারতীয় সিদ্ধাচার্যগণের অধ্যাত্ম মতবাদের সমন্বয় বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জীবন্মুক্তিই নাথসিদ্ধাগণের চরম কাম্য। এই জীবন্মুক্তি ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের মৃত্যুর পরপারে স্বর্গলোকপ্রাপ্তি এক নয়। সিদ্ধাগণ স্বর্গ বা অপবর্গের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। জীবনের পরপারে মুক্তির সন্ধানে তাঁহারা সাধনায় লিপ্ত থাকেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন—এই জীবনেই, এই অপক্ক দেহকে যোগসাধনার দ্বারা শুদ্ধ, পক্ক, ধ্বংসরহিত করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিতে। নাথ-সাহিত্যে এই জীবন্মুক্তির চরম নিদর্শন যোগী গোরক্ষনাথ। যোগীশ্রেষ্ঠ এই

১। B. Bhattacharyya, Sādhanamālā, Vol. II, Intro. p IV,

২। Obscure Religious Cults, op. cit. p 195.

মহান্ পুরুষ শুধু নিজেই জীবন্মুক্ত নহেন, আপন গুরু সাধনভ্রষ্ট মীননাথকেও তিনি যোগবলে আগ্রাসী মৃত্যুর করাল স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই জীবন্মুক্তির পথেই জননী ময়নামতীও তাঁহার একমাত্র পুত্রকে উদ্দীপিত করিয়াছেন। পুত্রের প্রতি তাঁহার দেশনা—'অমৃতরস সূর্যের অনলে দগ্ধ হইয়া তোমায় মৃত্যুকে ঘনীভূত করিতেছে, সুতরাং মৃত্যুকে জয় করার জন্য অমৃতত্বের সাধনায় অগ্রসর হও'।

নাথধর্মে দীক্ষাদানের পূর্বে ছয়মাস শিক্ষানবীশ কাল। এই সময় দীক্ষার্থীকে সংযম শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা বৌদ্ধ সঙ্ঘের তরুণবয়স্ক শ্রমণগণের আচার্য ও উপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় সদাচার ও সংযম, ত্যাগ ও বৈরাগ্য শিক্ষা করার বিষয় আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। 'অওঘর' অনুষ্ঠানে দীক্ষার্থী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন—'তিনি বিবাহ করিবেন না। কার্যগ্রহণ বা ব্যবসা করিবেন না, হিংসা করিবেন না। অপমানিত হইলেও রাগ করিবেন না। কর্ণদ্বয় সযত্নে রক্ষা করিবেন।'[১] এই শপথ গ্রহণ বৌদ্ধ দশ শীল গ্রহণের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। নাথ সাধকগণের মতে মূলাধার হইতে প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ইড়াপিঙ্গলামার্গে বাহিত স্রোতকে সুষুম্নাপথে পরিচালিত করা আবশ্যক। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে বিশ্বসৃষ্টি চৈতন্যময়ী হইয়া উঠে, জীব ঊর্ধ্বায়নের মার্গে যাত্রা শুরু করে। এই অবস্থাকে প্রাচীন বৌদ্ধদের স্রোতাপত্তি মার্গস্থ সাধকের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। নির্বাণাভিমুখী স্রোতের চরম অন্তে বৌদ্ধ নির্বাণ। নাথ সাধক জাগ্রত চৈতন্যশক্তিকে বজ্রা ও চিত্রিণী নাড়ী ভেদ করিয়া ব্রহ্ম নাড়ীতে উপনীত করিয়া দেয়। ইহাই আনন্দলোক। যে সাধক এই অবস্থায়ও অনাসক্ত তিনি অনির্বচনীয়,, শাশ্বত, দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত সাম্যাবস্থা লাভ করেন। ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদের নির্বাণ, তান্ত্রিক সহজিয়াদিগের সহজানন্দধাম এবং নাথদিগের নাথনিরঞ্জনত্ব। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সংসারত্যাগী, বিহার বা মঠনিবাসী, ভিক্ষান্নভোগী ছিলেন, নাথপন্থীরাও সন্ন্যাসজীবনকেই আদর্শরূপে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও ভোগ-ঐশ্বর্যত্যাগী এবং ভিক্ষাজীবী ছিলেন। বাংলাদেশে গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, হাড়িফা প্রভৃতি নাথসিদ্ধাগণ বৌদ্ধ যোগী পুরুষরূপেও স্বীকৃতি পাইয়াছেন।

১। নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, ডঃ কল্যাণী মল্লিক, ১৯৫০, পৃঃ ১১৭।

বাংলা নাথ-সাহিত্য বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গানের সঙ্গে একই সূত্রে বিধৃত। চর্যাপদে যাহা কবিকণ্ঠে গীত হইয়াছে, নাথ-সাহিত্যের সুদীর্ঘ কাহিনীর আড়ালে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাহা চর্যাপদে সূক্ষ্মতত্ত্বমাত্র ছিল, নাথ-সাহিত্যে তাহাই কাহিনীরূপে পল্লবিত হইয়াছে। সুতরাং নাথ-সাহিত্য এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গান পরস্পর স্বাতন্ত্র্যধর্মী নহে, পরিপূরক। পণ্ডিতব্যক্তিগণ অনুমান করিয়াছেন চর্যাপদ ও নাথ-সাহিত্য একই উৎস হইতে উদ্ভূত। কারণ উভয় সাহিত্যই একই সাধকের নাম অঙ্গীভূত করিয়াছে। মীননাথ নাথপন্থী সিদ্ধারূপে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেও চর্যাপদের টীকাকার মুনিদত্ত তাঁহার গ্রন্থ 'পরদর্শন' হইতে উদ্ধৃতি আহরণ করিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না।[১] চর্যাকার কাহ্নপাদ ও নাথসিদ্ধ কানপা একই ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নহে। সিদ্ধাচার্য আর্যদেব তাঁহার গানে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞের উপলব্ধির বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।[২] আর্যদেব বলিয়াছেন—যোগ সাধনার দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং চিত্ত অনুভূতির অতীত এক অবস্থায় উন্নীত হয়। ইহা কার্যকারণ সম্বন্ধ রহিত, সর্বধর্মের উপলব্ধির অতীত, সমস্ত ভাবাভাববিবর্জিত অবস্থা। এই অবস্থায় সাধকের মন নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার ন্যায় স্থির ও অচঞ্চল থাকে। ইহাই নাথ-পন্থীদের সহজ অবস্থাপ্রাপ্তি। নাথ সাধকগণও বলিয়াছেন—সাধক যখন সহজ অবস্থা লাভ করেন তখন তাঁহার কাছে দেহ ও বিশ্বসৃষ্টি একাকার হইয়া যায়। কারণ এই অবস্থা অনুভূতি সাপেক্ষ নহে। যোগী ত্রিকালের অতীত হইয়া অজরত্ব, অমরত্ব এবং ঈশ্বরত্ব লাভ করেন। গোর্খ বাণীতে আছে—

মন থির তো পবন থির
পবন থির তো বিন্দু থির।
বিন্দু থির তো কন্ধ থির
বলে গোরখদেব সকল থির।[৩]

আর্যদেবের গানেও এই একই ভাবধারা বিধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণাচার্য গাহিয়াছেন—

১। বৌদ্ধগান ও দোহা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃঃ ৩৭—৩৮।

২। চর্যাপদ সং : ৩১।

৩। হঠযোগপ্রদীপিকায় ধৃত গোর্খবাণী, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১১৮। 'নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য'—ডঃ সুকুমার সেন; পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়' দ্রষ্টব্য।

এক সো পাতুমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥[১]

বৌদ্ধতন্ত্র শাস্ত্রে শরীরমধ্যে বহুপদ্মের কল্পনা করা হইয়াছে। ঊর্ধ্বমার্গে আরোহী সাধক আপন শরীরমধ্যে পদ্মসমূহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। সর্বোচ্চে উষ্ণিষ-কমল—চৌষট্টিদলযুক্ত, মহাসুখ স্বরূপিণী পরিশুদ্ধাবধূতীর লীলা-নিকেতন। যোগী কাহ্নপাদ যিনি 'নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ' নৈরাত্মাদেবীর সাহচর্য লাভ করিয়া এই পদ্মের উপরে অতীন্দ্রিয় সুখে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সহজাচার্যদের এই তত্ত্বোপলব্ধির প্রভাব নাথধর্ম ও সাহিত্যেও সুস্পষ্ট। নাথমতে মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ষট্‌চক্রমাধ্যমে শিবের সঙ্গে সহস্রদলকমলে মিলিত করিতে হইবে। এই অদ্বৈত মিলনের ফলে সাধকের চিত্তে ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের উপলব্ধি ঘটে এবং নিরুপাধিক আনন্দানুভূতি জাগ্রত হয়। এই স্তরে উন্নীত সাধকের চিত্ত বাক্‌-পথাতীত নিরালম্ব অধিমানসকে আশ্রয় করিয়া আনন্দোপলব্ধির প্রয়াস পাইয়াছে। তাঁহার অবস্থা—

লবণং তোয়সম্পর্কাৎ যথা তোয়সমং ভবেৎ।
মনোহপি ব্রহ্ম সম্পর্কাৎ তথা ব্রহ্ম ময়ং ভবেৎ ॥[২]

বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে এই আনন্দানুভূতির স্থল উষ্ণীষ-কমল, নাথমতে সহস্রার। সহজিয়া বৌদ্ধদের 'শূন্যতাকরুণা', নাথধর্মে 'হরগৌরী', সহজিয়াদের 'প্রজ্ঞা ও উপায়', নাথদের 'নাদ ও বিন্দু', বৌদ্ধ 'এবম্‌কার' নাথদের 'সামরস্য', বৌদ্ধ 'বজ্রদেহ' নাথদের 'সিদ্ধদেহ', বৌদ্ধ 'নৈরাত্মাদেবী', নাথদের 'কুণ্ডলিনীশক্তি' প্রায় সম ঐতিহ্যবাহী। নাথ সাধনায় প্রজ্ঞা, উপায় বা নৈরাত্মাদেবীর উল্লেখ নাই, কিন্তু শিব শক্তি যখন অদ্বৈতস্বরূপে অবস্থান করেন তখনই আসে সাধকের পরমপ্রাপ্তি—'সামরস্য'। ইহাই নাথদের 'উন্মনী' অবস্থা, সহজাচার্যদের তুরীয় আনন্দ।

হেঁয়ালীর মধ্য দিয়া গূঢ়ার্থবাচক দোহা ও গান রচনার ধারা সিদ্ধাচার্যদের কাল হইতে শুরু করিয়া নাথসাহিত্য পর্যন্ত চলিয়াছে। সিদ্ধাচার্যগণ দুর্বোধ্য প্রতীকের সাহায্যে সহজযানের মূলতত্ত্বসমূহকে এবং নিজেদের অধ্যাত্ম উপলব্ধিকে প্রহেলিকাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। নাথপন্থীসিদ্ধা-

১। চর্যাপদ সং: ১০।
২। অমনস্কবিবরণম্‌, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম অধ্যায়, ২৩—২৬।

গণ সেই প্রহেলিকার আবরণ উন্মোচন করিয়া তান্ত্রিক যোগ সাধনার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। চর্যায় ও দোহায় যাহা ছিল কেবল তত্ত্বমাত্রে পর্যবসিত, নাথ-সাহিত্যের কাহিনী ও ঘটনা-পরম্পরার মাধ্যমে তাহা স্থূল কায়াসাধনার গূঢ় আকার ইঙ্গিতবাহী হইয়া উঠিয়াছে। নাথ-সাহিত্যেও দুরূহ সাধনতত্ত্বের রূপকব্যাখ্যা, হেঁয়ালী, ছড়া ও প্রতীক সাহায্যে অধ্যাত্মতত্ত্ব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে নাথ-সাহিত্য চর্যাপদেরই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হইলেও চর্যা ও দোহার ভাবগাম্ভীর্য, মর্যাদাবোধ এবং ঔচিত্যজ্ঞানের মাত্রা নাথ-সাহিত্যে রক্ষিত হয় নাই। নাথ-সাহিত্যের প্রণেতাগণ সিদ্ধাচার্যদের গূঢ়তত্ত্বকে হীন ও অশোভন ক্রিয়া-কলাপের সহিত যুক্ত করিয়া অলৌকিক ও অপ্রাকৃত চিন্তার অভিব্যক্তিরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সিদ্ধাচার্যদের সাধনা শূন্যতা, করুণা ও বোধিচিত্ত এই তিনের সহায়ে অদ্বয় মহাসুখতত্ত্বে উপনীত হওয়া, নাথ সিদ্ধাদের সাধনা কঠোর যোগসাধনাদ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করা এবং ঐহিক অমরতা লাভ করা। সিদ্ধাচার্যগণ সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ এবং কঠোর কৃচ্ছ্রতাসাধন ও দেহসংযমের প্রতি ততটা গুরুত্ব প্রদান করেন নাই যতটা নাথসিদ্ধাগণ করিয়াছেন। কিন্তু নাথ-সাহিত্যে বিশেষতঃ হাড়িফা ও গোবিন্দচন্দ্রের জীবনে ত্যাগবৈরাগ্য ও সন্ন্যাসকে জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া অবাধ ভোগসুখকে অনায়াস-লভ্য করার জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে।[১]

সিদ্ধাচার্যদের একান্ত গুরুমুখিনতা নাথসিদ্ধাদেরও গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। সিদ্ধাচার্যগণ তাঁহাদের পদে মন্ত্রতন্ত্র পূজা অর্চনা প্রভৃতিকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা গুরুকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গুরুর উপদেশ ব্যতীত মোক্ষ লাভ করা অসম্ভব।[২] তাঁহারা ধ্যানসমাধিকেও গৌরব দান করেন নাই। কারণ ধ্যানসমাধির দ্বারাও দুঃখের নিবৃত্তি হয় না।[৩] তাঁহারা গুরুকে 'বজ্রগুরু' বা 'বজ্রধর' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। কারণ বজ্রগুরু হইতেছেন লক্ষ্যের সন্ধানদানকারী—

১। গোপীচন্দ্রের গান, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৫৯, পৃঃ ২৬৪—২৬৭।

২। জই গুরু কহই কি সব্ব বি জানী।
মোক্‌খ কি লববই সঅল বি জানী॥ বৌদ্ধ গান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পৃঃ ১০১।

৩। চর্যাপদ সং ১ (সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই। সুখ-দুখেতেঁ নিচিতমরি অই)।

বাজুলে দিল মো লকৃখ ভণিআ।[১]

নাথ-সাহিত্যে ও ধর্মে, শিব ও গুরু অভিন্নাত্মক ও অভেদাত্মক। যথার্থ গুরু পক্কদেহী, মৃত্যুঞ্জয়ী, জীবন্মুক্ত এবং কৃতকর্মের দ্বারা অলিপ্ত। নাথসাহিত্যে এই গুরুর মহিমা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করা হইয়াছে। গুরু অধঃপতিত হইলেও শিষ্যের চিরনমস্য।

গোরক্ষনাথ তাঁহার বিপথগামী গুরু মীননাথকে সংসার ও ভোগসুখের অনিত্যতা বুঝাইয়া মুক্তির পথে আহ্বান করিয়াছেন। শিষ্য এইখানে গুরুর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠে বারে বারে ধ্বনিত হইয়াছে—'জয় জয় মৎস্যেন্দ্র'। গোরক্ষনাথের কণ্ঠের এই জয়ধ্বনি যেন বারে বারে তাঁহার গুরুর চরণে অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হইয়াছে। কারণ গুরু যতই অধঃপতিত হউক না কেন তিনি শিষ্যের চিরনমস্য। পরমার্থ বর্ত্মের তিনিই প্রদর্শক—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম কুরঙ্গ সমাধি কপাট।[২]……

গুরুই মহাজ্ঞানের অধিকারী। এই অসার সংসারে গুরুই একমাত্র কাণ্ডারী—

অসার সংসার মৈধ্যে গুরুমাত্র সার।
তিনগুণ পরম কারণ মহাশয়,
তাহার সমান গুরু জানিহ নিশ্চয়।
জ্ঞানবন্তে জানিয় গুরুর সেবা মাথে,
ধন্ধ ভাঙ্গি জ্ঞানপথ দেখাইব সাক্ষাতে।[৩]

সহজযানী বৌদ্ধেরা বাহিরের বুদ্ধকে স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই। তাঁহাদের মতে বুদ্ধ দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সরোজবজ্র বলিয়াছেন—

দেহহি বুদ্ধ বসন্ত……[৪]

এই দেহস্থিত বুদ্ধকেই চিন্তা করিতে হইবে। দেহের মধ্যে যিনি বাস করেন তিনি অশরীরী, যে সাধক গুরু-উপদেশ দ্বারা এই অশরীরীকে জানিতে

১। চর্যাপদ সং: ৩৫।

২। 'পরদর্শন' নামে মীননাথ বিরচিত নিবন্ধ হইতে চর্যাগীতির টীকাকার মুনিদত্ত এই পংক্তি কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩। গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৬।

৪। বৌদ্ধগান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃ ১০৩।

পারেন তিনিই মুক্তি লাভ করেন।[১] নাথ-সাহিত্যেও এই ভাবধারার অনুবৃত্তি উদ্দীপিত হইয়াছে। সিদ্ধাচার্যদের 'বুদ্ধ' যেমন দেহমধ্যে বাস করেন, অশরীরী কেউ যেমন শরীরমধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছেন তেমন নাথদের নিরঞ্জনও তনুমধ্যে অবস্থিত। নাথকবির কণ্ঠও প্রায় একই অনুভূতির ব্যঞ্জনায় বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের মতে—

চমক উপরে যেন পাথর ঘষএ,
দীপ্তিমান আনল যেন হেন নিকলএ
তেন মতে তনুমধ্যে আছে নিরঞ্জন
গুরু পদেত ভজি কর দরশন।[২]

নাথ-সাহিত্যে গুরুবাদ প্রাধান্য পাওয়ায় তাহা রসের জগতে স্বীকৃতি পায় নাই। অস্পষ্ট ও গূঢ়ার্থবাচক পদে যোগসাধনা, হঠযোগ ও গুরুভক্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে, কিন্তু সার্বজনীন রসের আবেদন ব্যাহত হইয়াছে। বাংলাদেশের নাথপন্থী যোগিগণ আপন আপন গুরুর মাহাত্ম্য কীর্তন করিবার জন্য গীতিকা রচনা করিতেন এবং এই সমস্ত গীতিকা শুধু বাংলা দেশেই নয়, বহির্বাংলায়ও গান করিয়া প্রচার করিতেন। তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় পাঞ্জাব, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় রচিত বাংলার নাথগীতিকার কাহিনী হইতে। এই একান্ত গুরুমুখিনতা সহজিয়া বৌদ্ধদের প্রভাবজাত। সিদ্ধাচার্যদের গান ও নাথ-সাহিত্য দুই-ই ধর্মীয় সাহিত্য। চর্যাপদ ধর্মীয় সাহিত্য হইয়াও কাব্য কিন্তু নাথ-সাহিত্যকে সেই স্তরে উন্নীত করা যায় না। কারণ নাথ-সাহিত্যে ধর্মীয় মতবাদ প্রচার ও যোগবিভূতি প্রদর্শনের ইচ্ছা একান্ত প্রবল হইয়াছে। স্থানে স্থানে রুচি ও শালীনতার সীমানাও লঙ্ঘিত হইয়াছে।

নাথসিদ্ধাগণ আজ্ঞাচক্রে জ্যোতির্ময় নাদ বিন্দুর ধ্যান এবং কর্ণে নাদ শ্রবণ করিতে পারিলে সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত সাধনায় বলা হইয়াছে মনের সঙ্গে নাদের বিলয় ঘটাইতে পারিলে সাধক 'নাথনিরঞ্জনত্বের' স্বরূপ উপলব্ধি করেন। কিন্তু চর্যাকার লুইপাদ নাদোপাসনার ব্যর্থতা

১। দ্রঃ 'অসরীর সরীরহি লুকো, জো তহি জাণই সো তহি মুকো'। বৌদ্ধ গান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃঃ ১১০।

২। গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৭। ৩। চর্যাপদ সং : ৩২।

উপলব্ধি করিয়া মহাসুখ লাভকেই সাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মূকল ॥[৩]

নাদ-বিন্দু, রবি-শশী ইত্যাদি বিকল্প পরিহার করিয়া পরমার্থতত্ত্বজ্ঞমুক্তি লাভ করেন এবং নির্বাণে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। সহজযানের চরম কথা মহাসুখলাভ। নাথপন্থীদের শূন্যসমাধি মহাসুখলাভ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাকে মহাসুখলাভের পরবর্তী অধ্যায় বলা যাইতে পারে। কারণ তাহা সুখদুঃখ-বোধাতীত অবস্থা।

নাথগুরুদের চরিত্রে বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, অটুট ব্রহ্মচর্য এবং ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রভৃতি গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। নাথধর্মের প্রধান তত্ত্ব 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে যাহা পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা হইতেছে নারী সংসর্গ ত্যাগ, কঠিন কৃচ্ছ্রতার জীবন উদ্‌যাপন ও যোগসাধনা। গোপীচন্দ্রের গানেও প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সংসার বৈরাগ্য, ভোগসুখ পরিহার এবং যোগমাহাত্ম্য। নাথগুরুগণ বিন্দুধারণ, ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান এবং দেহশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান দ্বারা কালজয়ী হইবার সাধনা করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন—'বিন্দু থির'[১] হইলেই মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া যায়। এই সুকঠিন ব্রহ্মচর্য এবং অপরাজেয় চরিত্রবলে নাথসিদ্ধাগণ শুধু মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন নাই, মৃত্যুকে পর্যুদস্ত এবং পরাজিত করিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মেও অব্রহ্মচর্যকে ভিক্ষুদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধরূপে ধার্য করা হইয়াছে।[২] সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মচর্য পালন ও বিন্দুরক্ষা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করে নাই। নাথধর্মে ব্রহ্মচর্যের উপর প্রধানতঃ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। গোরক্ষের প্রথম জীবন এবং গোরক্ষ মীননাথের প্রশ্নোত্তর তাহার নিদর্শন। মীননাথ ব্রহ্মচর্যচ্যুত হইয়াই পতিত হইয়াছেন এবং অকালমৃত্যু ও বার্ধক্যকে স্বাগত জানাইয়াছেন। ব্রহ্মচর্য ক্ষয় হওয়ায় তাঁহার যোগবলও অন্তর্হিত হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস, ত্যাগবৈরাগ্য ও চরিত্রবল—

১। হঠযোগ প্রদীপিকায় ধৃত গোর্খবাণী, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১১৮। 'নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য'—ডঃ সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খ বিজয়' দ্রষ্টব্য।

২। পারাজিকা ধম্মা, ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৪

নাথ গুরুগণ ত্যাগ ও ভোগের সমন্বিত মূর্তি ছিলেন। নাথ লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।—

এক হস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশ্চৈককরে স্বয়ম্

অলিপ্তস্ত্যাগভোগাভ্যাম্[১]........

যাঁহার এক হস্তে ত্যাগ, অন্য হস্তে ভোগ, অথচ যিনি এই দুই-এর ঊর্ধ্ব তিনিই নাথ। সহজাচার্যগণও বাসনাবিরত ভোগের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন পালি সাহিত্যেও এই মতের সমর্থন একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। পালি সাহিত্যে আছে চতুর্ব্রহ্মবিহারে অধিষ্ঠিত ভিক্ষু উত্তমবস্ত্র পরিধান এবং শালি ওদন গ্রহণ করিলেও তাঁহার চিত্ত আবিষ্ট হয় না।[২]

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতি আবেদন ও শ্রদ্ধাবোধ ভারতীয় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাজর্ষি জনক, নরচন্দ্রমা রাম, পিতামহ ভীষ্মদেব, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, সম্রাট অশোক ইঁহাদের কাহিনীগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র হইলেও ইঁহাদের মূল একই সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। সেই সূত্র হইতেছে ভোগের মধ্যে ত্যাগ, প্রাচুর্যের মধ্যে তিতিক্ষা। সেই সর্বস্ব লাভ করিয়া সর্বস্ব ত্যাগের আহ্বান গোপীচাঁদের জীবনেও আসিয়াছে। অসার সংসার ও জীবন যৌবনের নশ্বরতা প্রতিপাদনের জন্য জননী তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিয়াছেন—

শুন পুত্র গোপীচন্দ্র যোগে কর মন।
ধর্মরাজ গোপীচন্দ্র শুনহ বচন॥
ব্রহ্মজ্ঞান সাধ পুত্র যোগী হইবার।
ব্রহ্মজ্ঞান সাধিলে নাহিক মরণ॥
ময়নামতী বোলে বাপু রাজা গোবিন্দাই।
আত্ম কথা কহি মায় তোম্মারে বুঝাই॥
পন্থের সম্বল লাগি কি ধন রাখিবা।
রতন খসিয়া গেলে হারাইবা প্রাণ॥[৩]

এই আহ্বানে সাড়া দিয়া গোপীচাঁদ ভারতীয় চেতনায় পরম শ্রদ্ধার আসনটি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। এই জন্যই বাঙলার দুলাল গোপীচাঁদের

১। গোরক্ষসিদ্ধান্ত সংগ্রহ, গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত, ১৯২৫ পৃঃ ১।

২। বত্থূপম সুত্ত : মজ্ঝিমনিকায়, P.T.S. ১ম খণ্ড, পৃ ৩৮

৩। গোপীচন্দ্রের গান, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৫৯, পৃঃ ২৭১

কাহিনী শুধু বাঙলায় নয়, সমগ্র ভারতে নানা ভাষায়, নানা ছন্দে, গানে, ছড়ায় কাব্যে বিচিত্ররূপে প্রসারিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সাজুয্য রক্ষা করিতে গিয়া নাথধর্মও প্রস্তর লিঙ্গের পূজা অপেক্ষা অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা, ক্রোধজয়, ধ্যান-জ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা মানস লিঙ্গ পূজার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।[১] অমরত্ব লাভের জন্য প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান ভাবনা, সর্বজীবে সমজ্ঞান, ক্ষমা, দান, সত্য আচরণ এবং সকলকে প্রতিপালন করিতে হইবে ; কাম ক্রোধ জয় করিতে হইবে। এই আদর্শ বৌদ্ধদর্শনের মৈত্রীভাবনার সমুন্নত মহিমা ও তাহার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের পরিচায়ক।

শূন্যবাদ বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় মনন ও চিন্তাধারাকে উদ্বুদ্ধ করিলেও মহাযান বৌদ্ধরাই এই মতবাদকে সঞ্জীবিত ও নবকলেবর প্রদান করিয়া ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছে।

শূন্যতত্ত্ব

মহাযান বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান কাল হইতে ভারতের সমস্ত অধ্যাত্মচিন্তা ও সাধনাকে শূন্যবাদ প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে প্রভাবিত করিয়াছে। পরবর্তীকালে শূন্যবাদ তান্ত্রিক বৌদ্ধদেরও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। নাগার্জুনপাদের 'পঞ্চক্রম' গ্রন্থে ৪ শূন্যতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[২] শূন্য চারি প্রকার—শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য এবং সর্বশূন্য। তৃতীয় শূন্যলোক অর্থাৎ মহাশূন্যস্তর পর্যন্ত সাধকের চিত্ত নানাবিধ দোষদ্বারা অনুলিপ্ত থাকে। কিন্তু চতুর্থ শূন্যস্তর অর্থাৎ প্রভাস্বর শূন্যলোক কামনাবাসনাহীন, নিরুপাধিক, দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত, জরামৃত্যুর অতীত এবং কর্মাশয়হীন তুরীয় লোক—ইহাই নির্বাণ। এই স্তরে উন্নীত সাধক প্রভাস্বরলোকের শূন্যতা কুঠারদ্বারা নিম্নস্থ ত্রিশূন্যলোকের সকল প্রকার দোষ ছেদন করিয়া তুরীয়ানন্দ উপভোগ করেন। নাথমতে শূন্য তিন প্রকার—আদিশূন্য, মধ্যশূন্য ও অন্তঃশূন্য। এই

১। দ্রঃ অহিংসা প্রথমং পুষ্পং দ্বিতীয়ম্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহম্।
তৃতীয়ঞ্চ দয়াপুষ্পম্ ভাবপুষ্পং চতুর্থকম্॥
পঞ্চমন্ত ক্ষমাপুষ্পং ষষ্ঠং ক্রোধবিনির্জিতম্।
সপ্তমং ধ্যানপুষ্পন্তু জ্ঞানপুষ্পন্তু অষ্টমম্।
এতৎ পুষ্পবিধিং জ্ঞাত্বা অর্চয়ে লিঙ্গমানসম্॥

ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী সম্পাদিত কৌলজ্ঞাননির্ণয়, তৃতীয় পটল—২৫-২৭ শ্লোক।

২। Obscure Religious Cult., op-cit, p. 45-47.

ত্রিশূন্য প্রণবের তিন অবস্থা—সূক্ষ্মত্ব, কারণত্ব, এবং নিরঞ্জনত্বের প্রতীক। মূলাধার হইতে অনাহত পদ্ম পর্যন্ত আদিশূন্য লোক, হৃদয়পদ্ম হইতে ভ্রূ-পদ্ম পর্যন্ত 'সোহং'—ইহা মধ্যশূন্যলোক। ভ্রূ-পদ্মের ঊর্ধ্বে সহস্রারে 'প্রণব' বা 'ওঁ'-এর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। ইহা অন্তঃশূন্যলোক। এই তিনশূন্য প্রণবের তিনরূপের প্রতীক। অন্তঃশূন্য প্রাপ্তিই নাথনিরঞ্জনত্বপ্রাপ্তি। নাগার্জুনপাদের চতুর্থ সর্বশূন্যলোক সর্বপ্রকার দোষগুণবর্জিত, আদিঅন্তহীন ও প্রভাস্বর। নাথধর্মের প্রাণবিন্দু 'নাথনিরঞ্জনত্ব' জ্যোতিস্বরূপ ও শূন্যময়। তাঁহার দুই রূপ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। বাহিরের স্থূলরূপ এই বিশ্বসৃষ্টি, তাহা নিরন্তর পরিবর্তনশীল এবং শূন্য অভিমুখে গতিশীল। সূক্ষ্মরূপেও তিনি শূন্যপদবাচ্য। বাংলা নাথসাহিত্যেও শূন্যতত্ত্ব নানাভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। পরমজ্ঞান বা মহাজ্ঞানকে এখানে শূন্যজ্ঞানরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। কদলীরাজ্যের রাণী মীননাথকে বলিয়াছেন—

কোন দুঃখে যাইবা তুমি গোর্খের বচনে।
পাগল করিল গোর্খে দিয়া শূন্যজ্ঞানে ॥[১]

নাথ সাধনায়ও 'শূন্য'-এর প্রভাব দৃষ্ট হয়। যথা—

নাভিতে জ্বালিয়া দিয়া শূন্যের পুথলি।
কোমরে ধরিয়া তোলে গগনমণ্ডলী ॥[২]

জননী ময়নামতীর উপদেশে এই বিশ্বসৃষ্টির শূন্যময় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াই রাজা গোপীচাঁদ গৃহত্যাগী হইয়াছেন।

শূন্য কাঁথা শূন্য ঝুলি রাজা কান্ধে দিয়া।
দেশান্তরী হইল রাজা ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া ॥[৩]

শূন্যত্বপ্রাপ্তিই নাথনিরঞ্জনত্ব প্রাপ্তি। নাথ সাধকগণ শূন্যমূর্তিতেই পরমাত্মার ধ্যান ও আরাধনা করিয়াছেন। বৌদ্ধতন্ত্রেও বলা হইয়াছে শূন্য হইতেই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি উদ্ভূত। আবার শূন্যেই বিলীন হইতেছে। শূন্য শক্তির প্রতীক। কুণ্ডলিনীর জাগরণ কল্পনাকেও শূন্যবাদ প্রভাবিত করিয়াছে। সাধক যখন চিরচঞ্চল চিত্তকে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার ন্যায় শূন্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম তখনই মহাশূন্যের ওঁ-কার ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়। এই ওঁ-কার

১। গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১০০।
২। ঐ পৃঃ ১৪৩।
৩। ভবানী দাসের 'গোপীচাঁদের পাঁচালী,' ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪।

হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি আবার সমগ্র বিশ্ব এই মহাশূন্যেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে।[১] বৌদ্ধ চিন্তাধারায়ও শূন্য প্রভাস্বর, স্বয়ং জ্যোতি। এই জ্যোতির রাজ্য হইতেই অন্ধকারের উৎপত্তি। বৌদ্ধ সৃষ্টি-কাহিনীতে যে শূন্যলোক হইতে বিশ্বের উৎপত্তি তাহাও স্বয়ংজ্যোতি।[২]

নাথধর্ম সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধদের পতনের সময়ে তাঁহারা শৈবধর্মের পক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন। অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে নাথগণ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নহেন, বৌদ্ধ ও শৈবধর্মের সংমিশ্রণ। একদিকে হিন্দু তন্ত্র ও শৈব আগম অন্যদিকে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম দুই-এর স্বাধর্ম্যকে অঙ্গীকার করিয়া নাথপন্থা একটি যুক্ত মার্গ বিশেষ। বৌদ্ধ-ধর্মের পতন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থান এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণকে নাথধর্মের অভ্যুদয় এবং সম্প্রসারণের কাল বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। নাথধর্মের শিব, এক দেহে শৈব শিব এবং মহাযানী বুদ্ধ দুই-এর সম্মিলিত মূর্তি। নাথধর্মের শিব রুদ্রমূর্তি নটরাজ মহাভৈরব নহেন, তিনি স্থিতধী যোগী—পদ্মাসনে ধ্যানী অলেক সহজ। বৌদ্ধ প্রভাবের মহিমায় তাঁহার শুধু রুদ্রত্বই নহে যাযাবরত্বও ঘুচিয়া গিয়াছে। তিনি অনাসক্ত ও নির্বাণপ্রিয়, কর্মবিমুখ ও ভিক্ষাব্রতী। নাথধর্মে শিব কেবল উপাস্য দেবতাই নহেন, তিনি অন্যতম সিদ্ধা এবং সিদ্ধাদের গুরুও। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা, কানুপা ইঁহারা শৈব হইয়াও বৌদ্ধ ভিক্ষুর চরিত্রবল, অটুট ব্রহ্মচর্য এবং ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা ও অনাসক্তিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্যরূপে বরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্যের ও ভিক্ষুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য ইঁহারা ভিক্ষাকে জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শৈব 'বিন্দুবাদ' এবং বৌদ্ধ 'শূন্যবাদ' নাথধর্মে এক ও অভিন্ন। বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধদেব জন্মমৃত্যুরূপ ভবরোগের চিকিৎসক, নির্বাণের পথপ্রদর্শক, নাথ সাহিত্যে 'কেবলঃ শিবঃ' মহাজ্ঞান ও মহাসিদ্ধিদাতা। বৌদ্ধ যৌগিক সাধনার প্রভাবে শিবের দেবত্ব অপহৃত হইয়াছে, তিনি আদিনাথের শবদেহ হইতে জাত যোগীন্দ্ররূপে কল্পিত হইয়াছেন।[৩] শিবও মীননাথ, গোর্খনাথ, হাড়িফা, কানুপা, চৌরঙ্গীনাথের ন্যায় ধর্মনিরঞ্জনের পুত্র।

নাথ শিব—শৈব শিব ও মহাযানী বুদ্ধ দুই-এর সমন্বয়

১। প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৯ (যোগিজাতি, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

২। বৌদ্ধধর্ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৫৫, পৃঃ ১৪১-১৪৭।

৩। দ্রঃ 'বদনে জন্মিল শিব জ্যোতিরূপ ধরি'—আবদুল করিম সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়, ১৩২৪, পৃঃ ৬।

তিনি জ্যেষ্ঠ, অগ্রজ, গুরু, ইঁহারা কনিষ্ঠ, অনুজ, ভক্ত এইমাত্র পার্থক্য।

এই পঞ্চশিষ্যের অবতারণা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পরিকল্পনা দ্বারা অনুরঞ্জিত।

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ বনাম পঞ্চসিদ্ধা

বজ্রযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় শূন্যের প্রতীক বজ্রধরকে আদি-বুদ্ধরূপে বৌদ্ধদেবদেবী সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।[১] আদিবুদ্ধই পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ—অমিতাভ, অক্ষোভ্য, বৈরোচন, অমোঘসিদ্ধি এবং রত্নসম্ভব-এর জন্মদাতা। নাথ-সাহিত্যে আদিবুদ্ধ আদ্যদেবের ভূমিকায় আবির্ভূত হইয়াছেন। আদ্যদেবও পঞ্চসিদ্ধার জন্মদাতা।[২] তাঁহার নাভিদেশ হইতে মীননাথ, কপোল বা জটাজুট হইতে গোরক্ষনাথ উদ্ভূত হইয়াছেন। হাড় হইতে হাড়িফা হইয়াছেন, কর্ণ হইতে কানফা বহির্গত হইয়াছেন, চরণে চৌরঙ্গীনাথ[৩] জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নাথ-সাহিত্যে ইঁহারা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের ভূমিকায় আবির্ভূত পঞ্চসিদ্ধা। বৌদ্ধদেবায়তনের উপাস্য দেবতা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধের প্রতীক। তাঁহারাই পঞ্চতথাগত। নাথদের পঞ্চসিদ্ধাও তাঁহাদের আদি গুরু। পঞ্চবোধিসত্ত্বের মধ্যে বৈরোচনের স্থান যেমন মানবদেহের মস্তকে, অক্ষোভ্যের স্থান হৃদয়ে, রত্নসম্ভবের নাভিতে, অমিতাভের মুখে এবং অমোঘসিদ্ধির স্থান চরণে তেমনি আদিদেবেরও মস্তক হইতে গোরক্ষনাথ, নাভিদেশ হইতে মীননাথ এবং চরণ হইতে চৌরঙ্গীনাথ উদ্ভূত হইয়াছেন।

জন্ম মৃত্যু নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধান। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে দেবদেবিগণ এই নিয়তিকে স্বাভাবিকভাবেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ দেবতনু

১। B. Bhattacharyya, Indian Buddhist Iconography, 1958, p. 42.

২। নাভিতে জন্মিল মীন গুরু মুচুন্দর।
সাক্ষাতে সিদ্ধার বেশ ধরে কলেবর॥
……হাড় হতে হাড়িপা জন্মিয়া নিকলিল।
সর্বাঙ্গে সিদ্ধার বেশ তাহাতে আছিল॥
কর্ণ হতে জন্মিল কানফা জুগাই।
অতি খরতর (যোগী) হইল সিধাই॥
জটা ভেদি নিকলিল যতি গোর্খনাথ।
সিদ্ধির ঝুলি সিদ্ধের কথা তাহার গলাত॥
—গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ৩।

৩। Cultural Heritage of India, Vol. IV. p 282.

অবিনশ্বর, দেবতা অমর। বৌদ্ধধর্ম সৃষ্টির শাশ্বতবাদকে অস্বীকার করিয়াছে।[১]

অনিত্যতা

বুদ্ধদেবের সমগ্র জীবনব্যাপী প্রদত্ত অজস্র উপদেশাবলীর সারনির্যাস একটিমাত্র বাণীতে বিধৃত—'বয়ো ধম্মা সঙ্খারা'। যাহার উৎপত্তি আছে তাহার ধ্বংসও আছে। বৌদ্ধধর্মের এই অনিবার্য সত্যকে নাথ-সাহিত্য চরম স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। অনাদিনাথ যিনি নিরঞ্জন, অব্যক্ত ও বিদেহী সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি যাঁহার ইচ্ছার প্রকাশ সেই অনাদি পিতাকেও দেহের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ও অসারত্বকে স্বীকৃতি জানাইতে হইয়াছে। নাথ-সাহিত্যে নিরঞ্জন অনাদিনাথ আদিনাথরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। আদিনাথই প্রথম স্রষ্টা। আদিনাথ ও আদ্যাদেবীর সম্মিলিত সৃষ্টি ত্রিদেব—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, দেবী গৌরী এবং আকাশ-পৃথিবী ও নক্ষত্রমণ্ডল। বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভিক কার্যটি সমাধা হইলে নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে তাঁহার মরদেহের অবসান ঘটিয়াছে। সাগরের ঘাটে ঘাটে তাঁহার গলিত শবদেহ নদীস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। গলিত শবের পূতিগন্ধে তীরের বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে।[২] মরদেহের, নশ্বর সৃষ্টির এই শেষ পরিণাম। এই চরম পরিণতিকে স্বয়ং স্রষ্টাও অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। দেহের ক্ষণভঙ্গুরত্ব সৃষ্টির নশ্বরত্ব এবং অসার দেহের ভোগসুখের অকিঞ্চিতকারিতা—ইহাই বৌদ্ধধর্মের পরম শিক্ষা। নাথ-সাহিত্য পরম আগ্রহ সহকারে সেই শিক্ষাকে বরণ করিয়া লইয়াছে। বৌদ্ধ পুনর্জন্ম মতবাদকেও নাথ-সাহিত্য স্বীকৃতি দিয়াছে। দেবতার মৃত্যু এবং এক দেবতার দেহ হইতে অন্য দেবতার উৎপত্তি পুনর্জন্ম-মতবাদের প্রভাবের ফল। অনাদি হইতে আদিদেব, আদিদেবের শবদেহ হইতে গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যোগীবৃন্দ জন্মিয়াছেন। আবার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের মাথায় আঘাত করিলে শিবের মাথা ফাটিয়া চৌচির হইল—ইহা শিবের মৃত্যুর প্রতীক। ইহার পর এক শিব পঞ্চশিবরূপে নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।[৩] আদি জননী গৌরীর শতজন্ম গ্রহণও জীবনের নশ্বরতা প্রতিপাদনে সহায়তা করে। প্রভু নিরঞ্জনের আদেশে গৌরী প্রথমে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নিকটে গেলেন।

১। ব্রহ্মজালসুত্ত, দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, ২। গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১-৫, ১৫১-১৫৪।

৩। দ্রঃ শিব ছিল একজন তাহে হল পঞ্চজন
তবে চৈতন্ত পাইল শঙ্কর। ঐ, পৃঃ ১৫৪।

বলিলেন—'প্রভুর আদেশে আমাকে গ্রহণ কর।' ব্রহ্মাবিষ্ণু অস্বীকার করিলে দেবী শিবের কাছে আসিলেন। শিব বলিলেন—

তবে তোমা ভজি যদি পারহ এমন,
একশতবার দেহ করহ পতন।
এতেক শুনিয়া শক্তি প্রফুল্ল হইল,
শতবার দেহত্যাগ তথনি করিল।[১]

শিবের মৃত্যু ও পঞ্চশিবের জন্ম এবং গৌরীর শতজন্ম দেবগণকেও নিয়তির অলঙ্ঘ্য অনুশাসনের অধীনে আনয়ন করিয়াছে।

আদি প্রজ্ঞা ও আদ্যাদেবী

আদ্যাদেবী শিবের জননী ও স্ত্রী দুই-ই। মহাযানী সাহিত্যেও তাহার নজির পাওয়া যায়। প্রজ্ঞা আদি বুদ্ধের জননী, ও জায়ারূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন।[২] নাথ-সাহিত্যেও আদ্যাদেবী আদিদেবের স্ত্রী ও কন্যা দুই-ই। বিশ্বের স্রষ্টা আদিদেব একদা—

দেখে সৃষ্টি সৃজন হেতু করিলেন যুক্তি,
শক্তি বিনে সৃষ্টি করে কার হেন শক্তি।
এত চিন্তি ফেলেন প্রভু এক বিন্দু ঘাম,
তাহাতে হইল আদ্যাশক্তি যার নাম।
তার গর্ভে হইল তিন পুরুষ প্রধান,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনজন।[৩]

আদিনাথের দেহস্থ ঘর্ম হইতে উদ্ভূতা এই নারী একাধারে তাঁহার কন্যা ও স্ত্রী দুই-ই। আবার মহেশ্বর-জননী গৌরীর সহিত মহেশ্বরের পরিণয় কাহিনী মহাযানী সাহিত্যের বুদ্ধের সঙ্গে বুদ্ধজননী প্রজ্ঞাপারমিতা ও বুদ্ধশক্তি তারার সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। আদিনাথ ও আদ্যাদেবী আদিবুদ্ধ ও প্রজ্ঞার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন। ইহারা আদিম পিতা ও জননীরূপে বাংলা সাহিত্যে এবং মহাযান দেবায়তনে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন।

১। ঐ, পৃঃ ১৫২-১৫৩।

২। মহাযানী বৌদ্ধমতে—"Buddha as the principle of active power first proceeds from nivṛtti or Ādi Prajñā and then associate with her and from their union proceeds the actual visible world. The principle is symbolized as Prajñā being the mother and then the wife of the Buddha." S. B. Dasgupta, An Introduction to Tantric Buddhism, 1950, p. 108.

৩। গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১৫১।

নাথ-সাহিত্যের মধ্যে মুখ্যতঃ তন্ত্র ও যোগসাধনার দুইটি বিশিষ্ট ধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি নারীসঙ্গবর্জিত জ্ঞানাশ্রয়ী যোগসাধনা, অন্যটি নারীসহায়তাপুষ্ট তান্ত্রিক যোগসাধনা। গোরক্ষ প্রথম ভাবধারার বাহক, মীননাথ, হাড়িফা প্রভৃতি দ্বিতীয় ভাবধারার উত্তরাধিকারী। এই দুইটি সাধনমার্গ পৃথক্ হইলেও ইহাদের মৌল আদর্শ অভিন্ন। ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস উভয় সাধনমার্গেই প্রাধান্য পাইয়াছে। সন্ন্যাস গৃহধর্মের বিরোধী, সুতরাং

নারী বিদ্বেষ

যুগে যুগে সকল দেশের সন্ন্যাসীই অকুণ্ঠিতভাবে নারীবিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যও নারীবিদ্বেষ প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। বৌদ্ধসাহিত্যে নারীচরিত্রের দুর্বলতার যে কাল্পনিক ছবি অঙ্কন করা হইয়াছে তাহা যেমনি ভয়াবহ তেমনি রুচিবিরোধী।[১] জাতকে বলা হইয়াছে নারিগণ কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর, আগুনের ন্যায় সর্বগ্রাসী[২], তাহাদের মন মানুষকে বিপথগামী করিবার নানা উপায় ও ছলনায় পরিপূর্ণ। নারীকে এইভাবে ছলাকলায় পরিপূর্ণ এবং হীনভাবে অঙ্কন করিবার বিশেষ একটা প্রয়োজনীয়তা হয়ত ছিল। নারীচরিত্রের ভয়াবহতা সম্বন্ধে অবহিত থাকিলে নারী সম্বন্ধে কোন সম্ভ্রমসূচক মনোভাব তরুণ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মনে জাগ্রত হইবে না এবং নারী ও সংসারের আকর্ষণ তাঁহাদের ভিক্ষুধর্মকে পরাভূত করিতে পারিবে না। এই ভাবে বৌদ্ধভিক্ষুগণ নারী ও সংসার দুই-এর আকর্ষণকে রূঢ় আঘাতে দূরে সরাইয়া রাখিতেন। পূর্বসূরীদের নারীবিদ্বেষ নাথ সন্ন্যাসীদেরও প্রভাবিত করিয়াছে। কারণ নাথধর্মও ব্রহ্মচর্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসধর্ম। নাথসাহিত্য নারীসংসর্গকে বাঘিনী সাহচর্যের সমতুল্য বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছে।[৩] নারী সাহচর্যকে ব্যাঘ্রের সম্মুখে গরু, বিড়ালের সম্মুখে দুগ্ধ, ইঁদুরের সম্মুখে মৎস্য, ডাকাতের সম্মুখে ধন, এবং সাপের মুখে ব্যাঙ বলা হইয়াছে। কদলীরাজ্যের রমণিগণ ইন্দ্রিয় লালসা ও চিত্তচাঞ্চল্যের মূর্তিমতী

১। Fausboll, Jātaka, Vol. I, pp 285-289, Asātamanta Jātaka.

২। do Vol. V, p 446.

৩। দ্রঃ অভাগিয়া নরলোকে কিছুই নাহি বুঝে রে
ঘরে ঘরে বাঘিনী সে পোষে,
দিবাতে যে বাঘিনী জগত মোহিনী রে
রাত্রি হৈলে সর্ব অঙ্গে শোষে।
—গোর্খ বিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১২৮।

প্রতীক। তাহাদের আচরণে এবং গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী অতুনাপতুনার ব্যবহারে যৌনভোগাসক্তির অসংযত প্রকাশ সুস্পষ্ট। জাতকে বলা হইয়াছে নারিগণের বাক্য, হাস্য, নৃত্য ও গীত পুরুষকে বশীভূত করিবার অব্যর্থ অস্ত্র।[১] কদলিগণও নারীচরিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যদ্বারাই সিদ্ধা মীননাথের হৃদয় জয় করিয়াছে। গোর্খবিজয়ে নগ্নদেহা পার্বতীর চিত্রে নারীদেবতাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাদের বশীভূত করিবার জন্য পার্বতীর যে মনোভাবের পরিচয় গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় তাহা উচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শের বিরোধী। নারী বা শক্তিসহ সাধনা নাথধর্মে স্বীকৃতি পায় নাই। গোরক্ষনাথ দেবীর মধ্যে মাতৃমূর্তির কল্পনা করিয়া স্ত্রীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া অটুট চরিত্রবলের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। বৌদ্ধসাহিত্যে নারী-চরিত্রের মন্দের দিক যেমন প্রদর্শিত হইয়াছে তেমনি উজ্জ্বল মহিমময় দিকও পরিস্ফুট হইয়াছে। বৌদ্ধ থেরী এবং উপাসিকাদের চরিত্রবল ঔদার্য ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বৌদ্ধ সাহিত্যের গৌরবের বস্তু। গোপীচাঁদের গানে রাণী ময়নামতী যোগবলে, বুদ্ধিতে এবং ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি বিরাগ ও একমাত্র পুত্রের প্রতি কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠায় বৌদ্ধযুগের সেই বিদুষী শীলপরায়ণা এবং বুদ্ধধর্মসঙ্ঘে উৎসর্গিতপ্রাণা রমণীকুলের সুযোগ্য উত্তরসাধিকা।

নাথধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সব সময় কেবল ভাগবত বা তত্ত্বগতই ছিল না। কিছু কিছু বৌদ্ধাচার্যদের ব্যবহৃত শব্দ, বাক্যাংশ এবং উপমা নাথসাহিত্যেও দুষ্প্রাপ্য নহে। নিরঞ্জন, আদিনাথ, কেতকা, রবিশশী, গঙ্গাযমুনা, মনপবন, সহজ, শূন্য, ধর্ম প্রভৃতি শব্দ বৌদ্ধ প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যে বহুল ব্যবহারের দ্বারা চিহ্নিত। নিরঞ্জন নাথসাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা পাইয়াছেন। যাঁহার কোন অঞ্জন নাই তিনিই নিরঞ্জন। নাথসাহিত্যে শিবই—গোসাঞি নিরঞ্জন নিরাকার শূন্যরূপ। নাথপন্থিগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধার ধারেন নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দেহরাজ্যের ঈশ্বর। স্রষ্টা যিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রকাশিত তিনি এই-খানে 'নিরঞ্জন', 'শূন্য', 'অনাদি' এবং 'আদিনাথ' রূপে আখ্যাত হইয়াছেন। নিরঞ্জন পরমাত্মা—তিনি প্রভাস্বর ও শূন্যমূর্তি। বিশ্বের ও প্রাণীজগতের মূলসত্তা এই শূন্যে বিধৃত। নাথ সাধকদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য নাথনিরঞ্জনত্ব লাভ করা। এই অবস্থা অস্তিনাস্তির অতীত, সর্বদ্বন্দ্বাতীত পরমপদ।

শব্দ ও বাচনভঙ্গী

১। Fausboll, Jātaka, Vol, V, p 452.

নাথসাহিত্যে 'আদিনাথ' আদিবুদ্ধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন আদিবুদ্ধ পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের স্রষ্টা, তেমনি আদিনাথের দেহ হইতেই পঞ্চসিদ্ধার উদ্ভব।

কয়েকটি নূতন শব্দ প্রয়োগ করিয়া নাথসাহিত্য বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তাহার সাযুজ্যকে আরো সুস্পষ্ট করিয়াছে। এইরূপ একটি শব্দ 'রাউল'। মনে হয় 'রাউল' যোগী সন্ন্যাসী ছিলেন।[১] তবে তাঁহারা গৃহস্থ যোগী ছিলেন এবং বিবাহাদি করিতেন।[২] এই গৃহস্থযোগিগণ ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলেও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের 'বুদ্ধের রঅলী' (রাউলী>রঅলী) বলা হয়। বুদ্ধের 'রঅলী'—বুদ্ধের শিষ্য বা উপাসক অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু।[৩]

গোরক্ষনাথ তাঁহার গুরু মীননাথকে ৩১টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সান্ধ্যভাষায় বিরচিত এই প্রশ্নসমূহের যথার্থ মূল্যায়নের জন্য আমাদের বৌদ্ধ সাহিত্যের দ্বারস্থ হইতে হয়। এই প্রশ্নসমূহে যে রূপক ও উপমার অন্তরালে নাথপন্থীদের সাধন সঙ্কেত আভাসিত হইয়াছে তাহা বৌদ্ধধর্মের মৌল চেতনার গণ্ডীকে অস্বীকার করে না। একদা বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন মহারাজ মিলিন্দকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'মহারাজ মহতো অগ্‌গিক্‌খন্ধস্‌স জলমানস্‌স যা অচ্চি অত্থঙ্গতা, সক্কা সা অচ্চি দস্‌সেতুং—ইধ বা ইধ বাতি'।[৪] অর্থাৎ মহারাজ, মহান্ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নির্বাপিত হইলে তাহাকে কি দেখাইতে পারা যায় যে তাহা এইখানে বা এইখানে আছে। এবং—'মহারাজ, মহতি মহা অগ্‌গিক্‌খন্ধো পজ্জলিত্বা নিব্বায়েয্য, অপি নু খো, সো মহারাজ, অগ্‌গিক্‌খন্ধো সাদিয়তি তিণকট্‌ঠুপাদানন্তি'।[৫] অর্থাৎ মহারাজ, অতি মহান্ অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া নির্বাপিত হইলে তাহা কি আর তৃণকাষ্ঠরূপ ইন্ধন গ্রহণ করে:

১। দ্রঃ— যোগধিয়ানি রাউল পরম গিয়ানি।
চিন্তিয়া পরমপদ হইল ধিয়ানি॥

২। দ্রঃ— একেক রাউআলের ঘরে সাত পাঁচ মাই।
—গোর্খ বিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ৩৪।
এবং নাথের বচন শুনি রাউলের ঝিয়াই— ঐ পৃঃ ৪২।

৩। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়ের ভূমিকা পৃঃ ২৮-২৯

৪। Trenckner. Milindapañho, 1880, p 78

৫। ঐ, p 96

নাথসাধকও অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—

দীপ নিবিলে জুতি কোথাএ গিয়া রহে,
শরীর বিয়োগে প্রাণী কোথা যাইয়া রহে ?[১]

এবং—প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিব তৈলে ?[২]

এই সেই চিরন্তন প্রশ্ন। মৃত্যুর পরপারে কী ? বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাহার উত্তর দিয়াছেন—বুদ্ধগণ মৃত্যুর পরপারে পরিনির্বাণে অন্তগত হইয়া থাকেন—তাঁহাদের কোন উপাধি থাকে না—'নিরুদ্ধা সা অচ্চি অপ্‌পঞ্ঞত্তিং গতাতি।[৩] অর্থাৎ সেই শিখা নিরুদ্ধ হইয়া অজ্ঞাত হইয়া যায়। নাথগুরু জবাব দিয়াছেন—

দশমেতে কহিব দীপ নিবাহিয়া জাএ,
পরাণ শরীর স্থিতি মনেত মিশাএ
শরীর বিনাশ ভাই ধন অবিচার
আনলে অনল জলে জলেত সঞ্চার।
থাথেত মিশিব থাক রৈব মাত্র সার,
ভস্ম-ছালি হৈয়া যাইব দেহা আপনার।[৪]

ভিক্ষু নাগসেন মিলিন্দকে প্রশ্ন করিয়াছেন—'মহারাজ, পুরিসো ভেরিং আকোটিত্বা সদ্দং নিব্বত্তেয্য, যো সো ভেরিসদ্দো পুরিসেন নিব্বত্তিতো, সো সদ্দো অন্তরধায়েয্য, অপি নু খো সো মহারাজ, সদ্দো সাদয়তি পুন নিব্বত্তাপন'ন্তি'।[৫] অর্থাৎ মহারাজ, কোন ব্যক্তি যদি ভেরী দ্বারা শব্দ উৎপাদন করে তবে সেই লোকের দ্বারা উৎপাদিত শব্দ অন্তর্হিত হইয়া যায়। মহারাজ সেই শব্দ কি পুনরায় উৎপাদিত হইতে চাহে ?

অনুভঙ্গীতে নাথসাধকও প্রশ্ন করিয়াছেন—

একাদশে কহি দেহ বচন ব্যবস্থা
শব্দ উঠিল ধ্বনি রহে গিয়া কোথা।[৬]

আরো বহু প্রশ্নে, যেমন—সুগন্ধি চন্দন গন্ধ কোথা থাকি পাএ।[৭]
অজপা কাহারে বলি জপে কোন জন।[৮]

১। গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১৩২।
২। ঐ, ৬৭। ৩। Milindapañho, op.cit, p 73
৪। গোর্খবিজয়, পৃ—১৩৭।
৫। Milindapañho, op.cit, p 98
৬, ৭, ৮। গোর্খবিজয়, পৃঃ ১৩৩, ১৩৪, ১৩১

এবং—কেবা কয়এ ধর্ম কেবা কয়ে পাপ ?[১] ইত্যাদি নবরূপে বৌদ্ধতত্ত্ব ও চিন্তাধারার পুনরুজ্জীবনের নিঃসংশয় বার্তা ঘোষণা করিতেছে।

বৌদ্ধভিক্ষুদের জীবনচর্যা ও আচরণ নাথপন্থী সাধকদের জীবন-যাত্রাকে প্রভাবিত করিয়াছে। ভিক্ষুগণ অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিকে পবিত্র তিথিরূপে গ্রহণ করিয়া প্রাতিমোক্ষপাঠ ও উপোসথ অনুষ্ঠানদ্বারা তাহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিতেন। নাথপন্থী সাধকগণও অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিকে পবিত্র তিথিরূপে উদ্‌যাপন করিতেন। নাথপন্থীদের ভিক্ষান্নে জীবনযাপন এবং কঠিন সন্ন্যাসধর্ম অনুশীলন প্রাচীন বৌদ্ধদের প্রভাব প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। নাথ আচার্যগণ জাতিবিচারের বিরোধী ছিলেন। নাথধর্মের ধারক ও বাহক যুগী সম্প্রদায় তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে নীচ জাতিরূপে গণ্য হইয়াছে। একদা বৌদ্ধধর্ম ভারতের অনার্য অস্পৃশ্য জাতিকে মানবিক অধিকার প্রদান করিয়াছিল। নাথধর্মও হাড়ি ডোম প্রভৃতি সমাজের নিম্নকোটির জনগণকে স্বীকৃতি দিয়া এক অসাম্প্রদায়িক শাশ্বত মানবিক আবেদনের জন্য মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করিয়াছিল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য নাথধর্মের ও সাহিত্যের এই গতিপ্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—'শাশ্বত মানবিকধর্মের জন্যই মানিকচন্দ্র গোপীচন্দ্রের গান সহজেই মানবমন অধিকার করিয়াছে, নাথধর্মের মাহাত্ম্যের জন্য নহে'।[২]

পৃথিবীর সকল ধর্মে বিশ্বের উৎপত্তি বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। এই সৃষ্টি বর্ণনার বিষয়বস্তু দেবদেবীর জন্ম, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র ও গ্রহলোকের সৃষ্টি, জলস্থল ও আকাশলোকের উৎপত্তি এবং পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষের পদার্পণ। বিশ্বের মনীষী ও চিন্তানায়কগণ পুরাণ ও বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় মনীষিগণও সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটনের এবং বিশ্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করিলেও বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহাদের পারস্পরিক মতবিরোধিতা বিশেষ নাই। মহাকাব্যে ও পুরাণে ঘোর তমসাচ্ছন্ন একার্ণব হইতে বিশ্বের উৎপত্তি কাহিনী কল্পিত হইয়াছে। ঋগ্বেদেও বলা হইয়াছে

সৃষ্টিতত্ত্ব—নাথ ও বৌদ্ধ

১। গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৫।

২। বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৯৭।

সৃষ্টির আদিতে কিছুই ছিল না, ছিল কেবল অনন্তুমের অন্ধকার।[১] এই গাঢ় তমসাকে কোন লক্ষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রত্যক্ষের অগোচর, অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারা সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন এই অন্ধকারের বুকে 'এক' জন্মগ্রহণ করিলেন। এই 'এক' কে? তিনি রূপরেখাহীন, ঘোর তিমিরলোকের পরপারের শূন্যনির্ভর আদিদেব ব্রহ্মা 'নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং'[২]- ছিল এবং ছিল না এই অব্যক্তভাবের রাজ্যে জাত আদিদেব বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বরবাদের মধ্য দিয়া মহাযান ধর্মবিশ্বাসকে আলোড়িত করিয়াছে এবং পরবর্তী সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায় ও ধর্মীয় সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে।

ভগবান বুদ্ধ শাশ্বত আত্মা বা স্থির ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। এইজন্য ব্রাহ্মণ্য পুরাণ ও সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্বাসকে স্বল্প পরিবর্তনের মধ্য দিয়া তিনি গ্রহণ করিলেও বৌদ্ধধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ তাহাতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদ, অনিত্য, অনাত্মা প্রভৃতি তত্ত্ব বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টিকল্পনাকে নূতনত্ব দান করিয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টিকল্পনায় দেবগণ অমরত্বের অধিকারী নহেন, তাঁহারাও সসীম ও মৃত্যুর অধীন এবং metempsychosis-এর সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করে—ব্যক্ত বিশ্বসৃষ্টি মহাপ্রলয়ে অব্যক্ত হইয়া প্রলীন অবস্থায় বীজরূপে অবস্থান করে। এই বীজই নূতন সৃষ্টি পত্তন করে। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি এইভাবে অনন্ত অনাদি যুগ হইতে কালচক্র চলিতেছে। পালি দীর্ঘনিকায় গ্রন্থের ব্রহ্মজালসুত্তে বুদ্ধদেব 'শাশ্বতবাদ' এবং 'একচ্ছ-শাশ্বতবাদ' মতদ্বয়কে খণ্ডন করিতে গিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তীযুগের সৃষ্টিকল্পনাকে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে তাহা প্রভাবিত করিয়াছে। আলোচনাটির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দীর্ঘসময় অতীত হইবার পর, কোন এক সময়ে বিশ্বসৃষ্টির বিলয় ঘটে, এবং জীবগণ আভস্বরলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। আভস্বরলোকের এই সত্ত্বগণ মনোময়, প্রীতিভক্ষ, স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী ছিল। দীর্ঘকাল তাঁহারা তথায় বাস করেন। কিন্তু এক সময় আবার মহাপ্রলয়

১। তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে
অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্ মহিনা জায়তৈকম্॥ ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত।

২। ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত।

আসে—জগতের বিবর্তন হয়, এই সময় শূন্য ব্রহ্মবিমান আবির্ভূত হয়। আভস্বরলোকের কোন সত্ত্ব আয়ুক্ষয় অথবা পুণ্যক্ষয়জনিত শূন্য ব্রহ্মবিমানে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কালপ্রবাহ চলিতে থাকে। দীর্ঘকাল তথায় বাস করিবার ফলে তাঁহার মনে উদ্বেগ, ভয় ও অসন্তুষ্টির শুরু হয়। তিনি চিন্তা করেন—'আহা, যদি অপর কোন জীবও এই লোকে আগমন করিত'। এই সময়ে অপর সত্ত্বগণও পুণ্যক্ষয় বা আয়ুক্ষয়জনিত কারণে তাঁহার সঙ্গীরূপে ব্রহ্মবিমানে জন্মগ্রহণ করে। তাহারাও মনোময়, প্রীতিভক্ষ, স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী ছিল। প্রথম জাত সত্ত্বের মনে এই চিন্তার উদয় ঘটে—'আমিই ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান্, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান্ পিতা। এই জীবগণ আমার দ্বারাই সৃষ্ট—আমার ইচ্ছানুযায়ীই তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পশ্চাৎজাত সত্ত্বগণের মনেও এই ধারণাই দৃঢ় হয়—ইনিই ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান্, ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান্ পিতা। আমরা সকলে এই ব্রহ্মারই সৃষ্টি। কারণ আমরা উৎপন্ন হইয়াই ইঁহাকে দেখিয়াছি। ইনি পূর্বে জাত, আমরা পরে জাত। কালচক্র আবার ঘূর্ণিত হয়। ব্রহ্মবিমান হইতে চ্যুত হইয়া কোন কোন সত্ত্ব এই লোকে—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, পৃথিবীতে জাত হইয়া যদি সে গৃহত্যাগ করিয়া মুক্তির পথ অবলম্বন করে তবে সাধনাদ্বারা সে চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হয়। সমাধিস্থ অবস্থায় সে তাহার পূর্বনিবাস স্মরণ করে, কিন্তু তৎপূর্ববর্তী নিবাস স্মরণ করিতে সক্ষম হয় না। সেই প্রথম সৃষ্ট সত্ত্বের বিষয় তাহার স্মরণপথে উদিত হয়। সে এইরূপ ভাবে—তিনিই মহিমময় ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূ, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, কর্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান্ পিতা, তিনিই আমাদের স্রষ্টা। তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিণামদর্শী—তিনি অনন্তকাল ধরিয়া অবস্থান করিতেছেন, ও করিবেন। আমরা অনিত্য ও অধ্রুব। এইজন্যই এই পরিবর্তনশীল জগতে উৎপন্ন হইয়াছি।[১] ইহাই প্রথম ঘটনা সমাবেশ যাহার দ্বারা ঈশ্বর এবং তাঁহার শাশ্বত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মজালসুত্তের অন্তর্গত আভস্বরলোকের প্রথম সৃষ্ট সত্ত্ব এবং নাথসাহিত্যের অনাদিনাথ একই ঐতিহ্যের ধারাবাহী।

১। দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, পি. টি. এস., ব্রহ্মজালসুত্ত।

একদা স্রষ্টার মনে সৃষ্টিবাসনা জাগ্রত হইলে অকস্মাৎ অনাদিনাথের অভ্যুদয় ঘটিল। তিনিই স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি। অনাদি দেখিলেন তাঁহার আশেপাশে দূরে নিকটে কেহ কোথাও নাই, তিনিই একমাত্র। অহঙ্কারে মদমত্তকণ্ঠে অনাদি ঘোষণা করিলেন—আমিই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, আমিই ঈশ্বর, আমিই বিশ্বের একমাত্র অধিকারী। 'হাড়মালা' গ্রন্থে এইভাব অতি সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।[১] নাথসাহিত্যেও আদিদেব মহানন্দময়, জ্যোতিস্বরূপ, চৈতন্যময় এবং আপন মহিমায় ভাস্বর। তিনিই প্রথমোৎপন্ন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু তাঁহারই হুঙ্কার হইতে আবির্ভূত।[২] পালি দীঘনিকায়ের অন্তর্গত অগ্‌গঞঞ- সুত্তেও[৩] অগ্রগণ্য অর্থাৎ কে সকলের আগে এই আলোচনা স্থান পাইয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ও পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধীয় চিন্তাধারায় নূতন অধ্যায় সংযোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই জগৎ সৃষ্টির আদিযুগ হইতে সম্বর্ত বা প্রলয় এবং বিবর্ত বা সৃষ্টি চলিতেছে। একবার মহাপ্রলয় বা সম্বর্তের অন্তে সত্ত্বগণ আভস্বরলোকে জন্মগ্রহণ করে। দীর্ঘকাল অন্তে আভস্বর হইতে কয়েকটি সত্ত্ব পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীবাসী এই জীবগণও দেবতার মতই স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর, মনোময়, প্রীতিভক্ষ, সুখস্থায়ী এবং কামচর। তাহাদের দেহের জ্যোতিতেই পৃথিবী আলোকিত।

১। জন্মিয়া অনাদি আর নাহি দেখে কেহ।
আপনাকে অনাদি আপনি বলে দেহ॥
জন্মিয়া অনাদি দেও না দেখিলা কেউ।
আপনাকে আপনি বলে মুঞি বড় দেও॥
—নাথধর্ম ও সাহিত্য, প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, ১৩৬৬, পৃঃ ৬।

এবং—মুই মুই করি ফুকারে অনাদি ঈশ্বর, ইহা শুনি তবে দিলেন উত্তর।
মুই করি কেন কর এত দাপ, অখনে সৃজিনু আমি মুই গুরু বাপ॥ ঐ পৃঃ ৬।

২। দ্রঃ— আদি অনাদি প্রভু (নিজ অবতার)
(নিজ অংশে করিলেক দুই) এ প্রচার
হুঙ্কারে জন্মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু হইল (মুখে)
(আপনা আকার তবে রাখিলা সম্মুখে)।
—গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১।

৩। দীঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, পি- টি. এস., সপ্তবিংশ সুত্ত।

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহনক্ষত্র, দিবারাত্রি, মাসবৎসর তখনও সৃষ্টি হয় নাই। নাথসাহিত্যেও পৃথিবীর এই আদিরূপের বর্ণনা স্থান পাইয়াছে।[১]

বৌদ্ধ ও নাথ দুই-ই শাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বেই স্বীকৃত হইয়াছে—'এক' হইতেই বহু হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে একের ইচ্ছার কোন কার্যকরী শক্তি নাই। তিনি সর্বশক্তিমান্ স্রষ্টারূপে অন্যদের দ্বারা বন্দিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিও অশাশ্বত ও অধ্রুব। কিন্তু নাথসাহিত্যে প্রভু নৈরাকার আদিনাথ হইতেই সৃষ্টিধারা প্রবাহিত, তাঁহার ইচ্ছা নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়।

'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের কবি সেখ ফয়জুল্লা এই সর্বশক্তিমান্ স্রষ্টার বন্দনা করিয়াছেন—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
নিয়মে সৃজিলা প্রভু সকল সংসার॥
স্বর্গমর্ত্য পাতাল সৃজিলা ত্রিভুবন।
নানারূপে কেলি করে না জাএ লক্ষণ॥[২]

মহাযান সাহিত্যে বলা হইয়াছে বোধিসত্ত্ব সাধনা দ্বারা সিদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করিয়া চারিদিকে অনন্তশূন্য দর্শন করেন। শূন্য নৈরাত্মাদেবীর প্রতীক। বোধিসত্ত্ব স্তূপের সর্বোচ্চ শিখর হইতে নৈরাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। বৌদ্ধতন্ত্রেও আছে নিরাকার শূন্যস্বরূপে স্বপ্রকাশের বাসনা জাগ্রত হইলে শক্তিস্বরূপিণী ইচ্ছাশক্তির অভ্যুদয় ঘটে। তিনিই এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় নিখিল বিশ্বের জন্মদাত্রী, সাকার রূপিণী এবং জগতের অধীশ্বরী। শক্তির প্রসারই সৃষ্টি। শক্তিহীন সৃষ্টি অসম্ভব। নাথসাহিত্যের সৃষ্টিপত্তন বর্ণনায়ও আদিদেবীই শক্তিস্বরূপিণী। তিনিই সৃষ্টিপ্রবর্তনার আধার—সর্বজীবের

১। দ্রঃ— না আছিল অগ্নি আর না আছিল পানি,
না আছিল গুরুশিষ্য ভাটি আর উজানি।
না আছিল চন্দ্র সূর্য না আছিল দিশ,
কালকূট সর্পেতে যে না আছিল বিষ।
হুঙ্কারে হৈল সব স্থান নৈরাকার,
না আছিল জলস্থল সকলি আন্ধার।
—গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, ১৩৫৬, পৃঃ ১২৩।

২। গোরক্ষবিজয়, আবদুল করিম সম্পাদিত, ১৩২৪, পৃঃ ১।

জননী। তাঁহাকে বাদ দিয়া সৃষ্টিক্রিয়া অসম্ভব।[১] এই আদ্যাশক্তির গর্ভে পুরুষপ্রধান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের আবির্ভাব। নেপালী ঐতিহ্য স্বয়ম্ভূপুরাণেও আদিদেবীই প্রজ্ঞাপারমিতা। তিনিই আদিমাতা, সর্বজীবের জননী এবং অনাদি অনন্তের প্রতীক। বজ্রযান মতে বলা হইয়াছে বজ্রধর আদিবুদ্ধ আপন আত্মস্বরূপ হইতে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের সৃষ্টি করেন। এই পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধের অধিদেবতা। নাথসাহিত্যেও আদিদেব আপন আত্মস্বরূপ হইতে সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। গাছ হইতে যেমন বীজের সঞ্চার তেমনি তাঁহার শরীর হইতে পঞ্চসিদ্ধার উৎপত্তি।[২]

বজ্রযান বৌদ্ধমতে আদিবুদ্ধ বজ্রধর শূন্যতার এবং তাঁহার শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতা করুণার প্রতীক। নাথসাহিত্যের নিরঞ্জনও শূন্যমূর্তি, নিরাকার; ঘোর অন্ধকার রাজ্যে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব। নিরঞ্জন এই বিশ্বাতীত তুরীয় অবস্থা অতিক্রম করিয়া আপন শক্তির সাহায্যে নিজেকে চিনিলেন। আদিবুদ্ধ ও প্রজ্ঞাপারমিতার যুগনদ্ধরূপে যেমন সকল দ্বৈততত্ত্বের বিলোপ ঘটে[৩] 'প্রভুর' মধ্যে যে শক্তিস্বরূপিণী (যে জন আছিল সঙ্গে)তিনিও, প্রভুর ছায়াস্বরূপিণী হইয়া তাঁহার মধ্যেই অন্তর্লীন ছিলেন।[৪] এইভাবে বাংলা নাথসাহিত্য বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বের এবং আদর্শের বহু ঐতিহ্যকে একত্র সংবদ্ধ করিয়া লইয়াছে। হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ ঐতিহ্যকেও স্বীকৃতি প্রদান করিয়া বাংলা নাথসাহিত্য ভাবে ও ভাষায়, রুচিতে ও চিন্তায় এবং কাহিনীতে ও শব্দ সংযোজনে একাধারে হিন্দু ও বৌদ্ধ জীবন-ধর্মের মহাসঙ্গম রচনা করিয়াছে।

১। দ্রঃ— চৈতন্য পাইয়া দেখে আপনা আকার।
আকার দেখিয়া তান জন্মিল বিকার।
পৃথিবী স্থাপিতে প্রভু যদি কৈলা মন,
শক্তিবিনে কিরূপেতে করিবে সৃজন।
—গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, পৃঃ ১২৪।

অন্যত্র:— দেখে সৃষ্টি সৃজন হেতু করিলেন যুক্তি,
শক্তি বিনে সৃষ্টি করে কার হেন শক্তি,
এত চিন্তি ফেলেন প্রভু এক বিন্দু ঘাম,
তাহাতে হইল আদ্যাশক্তি যাঁর নাম। ঐ পৃঃ ১৫১।

২। গোরক্ষবিজয়, আবদুল করিম সম্পাদিত, ১৩২৪, পৃঃ ৬-৭।

৩। Indian Buddhist Iconography, op. cit, p 48

৪। গোরক্ষবিজয়, আবদুল করিম সম্পাদিত, পরিশিষ্ট পৃঃ ৪—৫।

শূন্যপুরাণ

শূন্যপুরাণ রামাই পণ্ডিতের ভূমিকায় রচিত। গ্রন্থের সম্পাদক প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থটির 'শূন্যপুরাণ' নামকরণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শূন্যদেবতা ধর্মঠাকুরের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সাহিত্য-সমালোচকগণ অনুমান করিয়াছেন শূন্যপুরাণের রচনাকাল ১৬শ—১৭শ শতাব্দীর পরবর্তীকালে হওয়াই সম্ভব। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়শূন্যপুরাণের কাল নির্ণয় করিতে গিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন তিনি পাল নৃপতি দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—'উত্তর রাঢ়ে যে সময়ে প্রথম মহীপালের অভ্যুদয়, তাহারই অব্যবহিত পরে রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল, রামাই পণ্ডিত, মাণিকচান্দ, গোরীচান্দ বা গোবিন্দচন্দ্র ও লাউসেনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। তৎকালে সমস্ত গৌড়বঙ্গে শাক্ত তান্ত্রিকগণের প্রভাবের সঙ্গে অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন হাড়িপা, কানিপা, সেতাই, নীলাই, রামাই প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য-গণের আবির্ভাব। তাহারই ফলে গৌড়বঙ্গের রাজভবনে সর্বত্রই বৈরাগ্যের ও অপূর্ব স্বার্থত্যাগের পরিচয় সুপ্রকাশিত'।[১] ডঃ শহীদুল্লাহ গ্রন্থটিকে ষোড়শ শতকের প্রথমাংশে রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[২] শূন্যপুরাণকার রামাই পণ্ডিত হিন্দু-বৌদ্ধধর্মের সমন্বিত মূর্তি ধর্মঠাকুরের পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ সাহিত্যিক মূল্য বা কাব্যিক মর্যাদা দ্বারা বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। এই গ্রন্থের মূল্যায়ন করিতে হইলে সেই যুগের লোকধর্মের প্রকৃতি ও পরিণতি এবং উচ্চতর ও ভদ্রেতর সমাজের পারস্পরিক ধর্মবিরোধের পটভূমিকায় করিতে হইবে। এই দিক হইতে শূন্যপুরাণ সেই পথসূচনার যথার্থ পরিচয় বহন করিতেছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মবিরোধের অভিব্যক্তি

হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মবিরোধ অতি প্রাচীন যুগ হইতে কখনও প্রত্যক্ষে কখনও পরোক্ষে চলিয়া আসিতেছে। মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু প্রথমে বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। শঙ্করাচার্য বৌদ্ধশূন্যবাদ খণ্ডন করিয়া মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৌড়রাজ শশাঙ্কও বৌদ্ধশত্রু ছিলেন বলিয়া হিউয়েন-সাঙ্ উল্লেখ করিয়াছেন। সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের বিরোধী ছিলেন।

১। শূন্যপুরাণ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ১৩১৪, মুখবন্ধ, পৃঃ ২।৶
২। ঐ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৩৬, ভূমিকা, পৃঃ ৩৮।

বৌদ্ধদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিদ্বেষের নিদর্শনস্বরূপ হরিহরিহরিবাহন[১] নামক অবলোকিতেশ্বরের উল্লেখ করা যায়। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, রুদ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য দেবতাগণ বজ্রযানী বৌদ্ধদেবতা দশভুজসিত মারীচী[২], উভয়বরাহননা মারীচী[৩] এবং প্রসন্নতারা[৪] কর্তৃক পদদলিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন। বজ্রজ্বালানলার্ক[৫] বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে এবং পীত পর্ণশবরী[৬] গণেশকে পদদলিত করিয়াছেন। শূন্য-পুরাণগ্রন্থেও হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মবিরোধের নিদর্শন পাওয়া যায়। নিরঞ্জন ধর্মঠাকুরের চরণে বেদশাস্ত্র সমর্পিত হইয়াছে।[৭] হিন্দুর ত্রিদেব তাঁহার তনয়[৮], হিন্দুর দেবগণ তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত।[৯] শত্রুর প্রতি চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছে 'কালিমা জাল্লাল' ও 'নিরঞ্জনের রুষ্মায়'। অবশেষে এই বিরোধ ও দ্বন্দ্বের শেষ মীমাংসা হইয়াছে লিঙ্গার্চনতন্ত্রে। এই তন্ত্রে উলুকবাহন শূন্যরূপী ধর্মঠাকুর ও বৃষবাহন শিব এক ও অভিন্নরূপে কল্পিত হইয়াছেন।[১০]

পালযুগের অবসানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। এই সময়ে সমাজের উচ্চস্তরের হিন্দুগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুশীলন করিতেন এবং ভদ্রেতর জনগণ গোপনে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মাচার-প্রভাবিত অর্ধরহস্যবাদী গুহ্য কায়াসাধনা অনুশীলন করিত। উচ্চশ্রেণীর অবহেলায় এবং অত্যাচারে ভদ্রেতর সমাজ সঙ্কুচিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। শূন্যপুরাণের নিরঞ্জনের রুষ্মা তাহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। দুর্বল মানুষ যখন অত্যাচারীর প্রতি যথোচিত শাস্তি বিধান করিতে পারে না, বিশেষতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী যখন অধিকতর ক্ষমতাশালী তখন আপন মর্মজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া কল্পনায় তাহাকে পর্যুদস্ত করার মধ্যে একপ্রকার

ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ —নিরঞ্জনের রুষ্মা

১। B. Bhattacharyya, Indian Buddhist Iconography, p 394.

২। ঐ, পৃ ২১৩

৩। ঐ, পৃঃ ২১২। ৪। ঐ, পৃঃ ২৪৯। ৫। ঐ, পৃঃ ১৮৩। ৬। ঐ, পৃঃ ১৯৪।

৭। শূন্যপুরাণ : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত পৃঃ ১৬৩। ৮। ঐ, পৃঃ ১৬৫।

৯। ধর্মপূজাবিধান, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩২৩, পৃঃ ৮৯।

১০। ইন্দ্রিয়ৈ রহিতো দেবঃ শূন্যরূপঃ শিবঃ সদা।
বৃষরূপং সমাস্থায় উলুকোঽহং মহেশ্বরঃ॥
উলুকং ভাবয়েদ্ দেবং সাক্ষাদ্-ধর্ম্ম-স্বরূপিণম্।
কোটীচন্দ্র প্রভাকারং শ্বেতসিংহাসনস্থিতম্।
গঙ্গাতরঙ্গ-কর্পূর-শুভ্রাম্বরবিভূষিতম্॥
—শূন্যপুরাণের প্রবেশক, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১২৬।

স্বস্তি খুঁজিয়া পায়। নিরঞ্জনের রুম্মায় ধর্মভক্তগণও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার ও অবহেলার প্রতিশোধ কল্পনার সাহায্যে গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম-নিরঞ্জন এইখানে যবনরূপ ধারণ করিয়া প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিয়াছেন। খোদা ধর্মের, মুহম্মদ ব্রহ্মার, পেকাম্বর বিষ্ণুর, আদম শিবের, হাউও চণ্ডিকার, নূরবিবি পদ্মাবতীর, গাজী গণেশের এবং কাজী কার্তিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই নামগুলি তুর্কীবিজয়ের স্মৃতি বহন করিতেছে। তুর্কীগণ-কর্তৃক হিন্দুর দেবমন্দির বিধ্বংসের কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"কোন্ ঐতিহাসিক মুসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে করিয়া সদ্ধর্মীরা (বৌদ্ধগণ) যে হিন্দু দেবমন্দির প্রভৃতির উপর উৎপাত দর্শনে হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।"[১] শূন্যপুরাণের এই অংশটি পরবর্তীকালের সংযোজন হওয়াও অসম্ভব নহে। এক সময়ে সমাজে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম-বিরোধ ও সংঘর্ষ চরমে উঠিয়াছিল এবং তাহার চরম পরিণতিরূপে দেশের জনসাধারণ মুসলমানদের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া স্বর্গতঃ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্থির করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"মালদহ ও প্রাচীন গৌড় অঞ্চলে সম্ভবতঃ পালরাজ্য লুপ্ত ও সেনরাজ্য প্রবর্তিত হইলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সদ্ধর্মীদিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎকালে সেনরাজবংশ বৈদিক ব্রাহ্মণের বশীভূত ছিলেন। এই নিমিত্ত বৈদিকগণেরও অদম্য প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুবিধা পাইয়া বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রজাসাধারণের উপর অন্যায় কর আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহারা বৈদিক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা না দিত বা অসম্মান করিত, সমবেত বহু বৈদিক কর্তৃক তাহারা যথেষ্ট নিগৃহীত হইত। তখনও ধর্মভক্ত সদ্ধর্মীগণের প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হয় নাই।"[২]

রামাই-এর তাম্রদীক্ষা গ্রহণও সমাজের ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের প্রতি বিরুদ্ধাচরণরূপে গ্রহণ করা যায়। ব্রাহ্মণ বালক রামাই শৈশবে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন। একদিন গুরুর অনুপস্থিতিতে তিনি পথক্লান্ত দুর্বাসার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। হঠাৎ পার্শ্বপরিবর্তন সময়ে দুর্বাসার

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ ৩৩।

২। শূন্যপুরাণ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, মুখবন্ধ, পৃঃ ৪৵০।

যজ্ঞসূত্র ছিন্ন হইল। সদ্যনিদ্রোত্থিত দুর্বাসা রামাইকে অভিশাপ দিলেন—'তুমি জীবনে যজ্ঞসূত্র পাইবে না।'[১] কিন্তু ব্রাহ্মণ বালক যজ্ঞসূত্রে বঞ্চিত রামাই সেদিন বিধাতার ইচ্ছায় তাম্রসূত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অবশেষে রামাই-এর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাম্রসূত্রই যজ্ঞসূত্রের গৌরব অর্জন করিয়াছিল। ধর্ম পণ্ডিতগণের ব্যবহৃত তাম্রবলয়ই কালে যজ্ঞসূত্রের মত পবিত্র বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। যদিও ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রানুযায়ী তাঁহার চূড়াকরণ হয় নাই এবং যজ্ঞসূত্র-লাভ ঘটে নাই, তথাপি তিনিই ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্মের স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 'পঞ্চম বেদ' রচনা করিয়া কলিযুগে অক্ষয়কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধের যুগে শত্রুমিত্র, আপনপর এবং স্বধর্মী-বিধর্মী চিনিবার নানা কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ধর্মঠাকুরের মন্দিরে প্রবেশার্থীকে পরীক্ষা করিয়া মন্দিরে প্রবেশলাভের অনুমতি দেওয়া হইত। ধর্মঠাকুরের মন্দিরের দ্বাররক্ষক পণ্ডিতগণ প্রশ্ন করিতেন। পূজার্থী তাহার যথার্থ জবাব দিতে পারিলে পূজা করার অধিকার লাভ করিত। এই পরীক্ষা পদ্ধতি 'দ্বারভেট' নামে পরিচিত। ধর্মাধিকারী প্রশ্ন করিতেন—

দ্বারভেট

হাত পা হোক লুহার।
সক্র জাক খোয়ার॥
বাড়ি কোথা পণ্ডিতের কোন্ দেব ভজ?
কন্ মূর্তি ধ্যান কর কন্ দেবে পূজ।
কন্ মুখে পূজা কর কন্ বেদ পড়।
সিগ্রগতি কহিল্যাম চাতুরালি ছাড়॥
কোথা পালে তাম্র বালা, কেবা দিল করে,
কিরূপে জন্মিল তামা কহ না আমারে॥[২]

পূজার্থীর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর ধ্বনিত হইত:—

বাড়ী মোর বল্লুকার।
পূজি শ্রীনৈরাকার॥
সূন্যমূর্তি ধ্যান করি।
সাকার মূর্তি ভজি॥

১। শূন্যপুরাণ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভূমিকা পৃঃ ৬৫।
২। ধর্মপূজা বিধান, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৬৫-১৬৯।

পূর্বমুখে পূজা করি পঞ্চমবেদ পড়ি
সিত্রগতি কহিলাঙ চতুরালি ছাড়ি ॥
বিশ্বকর্মা এই তাম্র করিলা নির্ম্মান।
এই কথা কহিলাঙ আমি তব বিদ্যমান॥[১]

এইভাবে বহু প্রশ্ন ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়া ধর্মঠাকুরের দ্বাররক্ষক ধর্মঠাকুরের প্রকৃত ভক্তকে চিনিয়া লইতেন। সম্ভবতঃ নালন্দা বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারের দ্বারপণ্ডিত দ্বারা বিদ্যার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের অনুকরণে এই প্রথা ধর্মঠাকুরের মন্দিরেও গৃহীত হইয়াছিল। আচার্যগণ যে পদ্ধতির সাহায্যে বৌদ্ধ বিহারের অধ্যয়নেচ্ছু ছাত্রদের জ্ঞানের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন, হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মবিরোধের যুগে সেই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া ধর্মপূজারিগণ নিজেদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শূন্যপুরাণে পাঁচজন দ্বারপাল পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। সেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই ও গোসাঁই—এই পঞ্চদ্বারপাল পণ্ডিত পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের প্রতীকরূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন। এই তত্ত্ব প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম উদ্ভাবন করেন।[২] স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তিদ্বারা পঞ্চপণ্ডিত সাদৃশ্য মতকে আরো অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি অনুমান করিয়াছেন এই সাদৃশ্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্মকে বাংলাদেশে নূতনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার একটি উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।[৩]

পঞ্চবুদ্ধ ও পঞ্চ পণ্ডিত

শূন্যপুরাণের সেতাই-এর আবির্ভাব সত্যযুগে, তাঁহার গতিসংখ্যা বা অনুচর সংখ্যা ৪০০, তিনি শ্বেতবর্ণ। নীলাই-এর আবির্ভাব ত্রেতাযুগে, তাঁহার গতিসংখ্যা ৮০০, তিনি নীলবর্ণ। কংসাই-এর আবির্ভাব দ্বাপরে, তাঁহার গতিসংখ্যা ১২০০, তিনি পীতবর্ণ। রামাই-এর আবির্ভাব কলিযুগে, তাঁহার গতিসংখ্যা ১৬০০, তিনি রক্তবর্ণ। শূন্যযুগে গোসাঞীর আবির্ভাব, তাঁহার গতিসংখ্যা অগণিত। কলিযুগে চতুর্থবুদ্ধ গৌতমের অনুকরণে রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাব। গৌতম বুদ্ধ আর্য-অনার্য নির্বিশেষে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে সর্বমানবকে তাঁহার ধর্মে ও সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। রামাই

৩। ঐ।

১। প্রবাসী, ১৩২৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮, ৩২১, ৬৫০।

২। শূন্যপুরাণের ভূমিকা, পৃ ১২৩।

পণ্ডিতও সসাগরা পৃথিবীমধ্যে এবং ছত্রিশজাতির ঘরে ধর্মের স্থাপনা করিয়া অক্ষয়কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ যুগের বুদ্ধ—অমোঘসিদ্ধি মৈত্রেয়। তিনি শূন্যপুরাণে গোসাঞির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৌদ্ধ পঞ্চতারাকেও শূন্যপুরাণের পঞ্চ আমিনি বা পঞ্চ ঘটদাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। নিম্নে ধর্মঠাকুরের দ্বারপাল পঞ্চপণ্ডিত এবং পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের সাদৃশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইল।

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ	শক্তি	স্থান	বর্ণ
বৈরোচন	বজ্রধাত্রী	মধ্য	শ্বেত
অক্ষোভ্য	লোচনা	পূর্ব	নীল
রত্নসম্ভব	মামকী	দক্ষিণ	পীত
অমিতাভ	পাণ্ডরা	পশ্চিম	রক্ত
অমোঘসিদ্ধি	তারা	উত্তর	হরিৎ

পঞ্চপণ্ডিত	শক্তি বা আমিনী	স্থান	বর্ণ
সেতাই	বসুয়া বা বিজয়া	পশ্চিম	শ্বেত
নীলাই	চরিত্রা	দক্ষিণ	নীল
কংসাই	গঙ্গা	পূর্ব	পীত
রামাই	দুর্গা	উত্তর	রক্ত
গোঁসাই	অভয়া	শূন্য	হরিৎ

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ পঞ্চ স্কন্ধের—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের অধিদেবতারূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন।[১] পঞ্চপণ্ডিতও পঞ্চযুগে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এবং শূন্য বা অনাগতকালে আবির্ভূত বলিয়া পঞ্চযুগের ধারক ও বাহক।

পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন পরবর্তীযুগে ধর্মঠাকুর স্তূপাকৃতিতে পরিণত হইয়াছিলেন।[২] ধর্মঠাকুরের স্তূপের গায়ে ৫টি কুলঙ্গী থাকিত। মধ্যখানে একটি এবং চারিদিকে চারিটি এই পাঁচটি কুলঙ্গীও পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ—অক্ষোভ্য,

১। রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানম্ এব চ।
পঞ্চ-বুদ্ধ-স্বভাবন তু স্কন্ধোৎপত্তি-বিনিশ্চিতম॥

বজ্রবারাহীকল্পমহাতন্ত্র, Introduction to Tantric Buddhism, op. cit. p. 94, পাদটীকা: ২।

২। বৌদ্ধধর্ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৫৫, পৃঃ ১০১-১০২।

অমিতাভ, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধি এবং বৈরোচনের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। তাঁহাদের মতে স্তূপের আকৃতিও কতকটা কচ্ছপের ন্যায় ছিল। এইভাবে ধর্মঠাকুর ও কচ্ছপ এক হইয়া ধর্মঠাকুর 'কালাচাঁদ' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ক্রমশ কচ্ছপাকৃতি স্তূপ শিলায় বিবর্তিত হইয়া ধর্মঠাকুর ধর্মশিলায় পরিণত হইয়াছিলেন।[১]

ধর্মঠাকুরের পূজায় অস্পৃশ্য ডোমজাতির প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সঙ্গে ডোম পুরোহিতও ধর্মঠাকুরের পূজায় সমান অধিকারী।

নিম্নজাতির প্রাধান্য

ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম ধর্মের অস্পৃশ্যতাবোধদ্বারা ধর্মঠাকুরের কৌলিন্য ও পবিত্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয় নাই, বরং ব্রাহ্মণ-ডোম উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ হাতধরাধরি করিয়া পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছে। ধর্মঠাকুরের পূজায় সকল মানুষের সমান অধিকার এই নীতি বৌদ্ধ আদর্শেরই অবিস্মরণীয় দান। ত্রিপুরা-রাজ পদ্মাবতী নাম্নী কোন ডোম রমণীকে শুদ্ধাতনু ললনারূপে গ্রহণ করিয়া তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; এবং ডোম আচার্য বা 'ডোম্‌পা' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ডোম্‌পা শব্দের তিব্বতী অর্থ ডোমনীর পতি। 'ডোম্‌পা' সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ধর্মপূজার প্রবর্তন করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় বঙ্গে ও রাঢ়ে ধর্মপুজা প্রচারিত হইয়াছিল।[২] তিব্বতে 'গ্‌তুম-প' নামীয় পার্বত্য জাতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। 'গ্‌তুম-প' শব্দের তিব্বতী প্রতিশব্দ চণ্ডাল। এই জাতির কোন শাখা বাঙলাদেশে আসিয়া পরবর্তীযুগে 'ডোম' আখ্যা লাভ করাও অসম্ভব নহে। হেমচন্দ্রের গ্রন্থে ডোমগণ 'ডুম্ব' নামে অভিহিত হইয়াছেন।[৩] ডোমগণ সমাজের নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত, উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ তাহাদের স্পর্শজল গ্রহণ করেন না। 'যাত্রাসিদ্ধি রায়' নামক ধর্মঠাকুরের পদ্ধতি হইতে জানা যায় ধর্ম উপাসক সদা এবং কালিন্দীর বংশধরগণ ডোম নামে এবং রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ ডোমপণ্ডিত নামে পরিচিতি লাভ করে। ডোমপণ্ডিতের বংশধরগণই ধর্মঠাকুরের পূজার

১। প্রবাসী, ১৩৫৬, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৭৩-১৭৫। বসুমতী, ১৩৫৭, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ২০৪-২০৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কূর্মবাদের এই সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৫৩০।

২। J. R. A. S. 1895, pp, 61-64.

৩। দেশীনামমালা: হেমচন্দ্র ৪।১১

অধিকারী।[১] এইভাবে ধর্মঠাকুরের পূজায় অস্পৃশ্য ডোমজাতির প্রাধান্য স্বীকৃতি পাইয়াছে। বর্ণবৈষম্য নীতিকে অস্বীকার করিয়া এবং সমাজের নিম্নতম অস্পৃশ্য জাতিকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া ধর্মঠাকুরের ভক্তগণ বৌদ্ধধর্মের উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছেন। সিদ্ধাচার্যদের গানে ও দোহায়ও ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নজাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং বাংলাদেশের বৌদ্ধপ্রভাবিত আধ্যাত্মিক সাধনভজনের সঙ্গে ডোমজাতির অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। 'নিয়মকলসী'[২] প্রথাও ধর্মঠাকুরের কাজে নিম্নশ্রেণীর প্রাধান্য ও ধর্মপূজারীদের হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথার প্রতি বিরাগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর

শূন্যপুরাণ গ্রন্থের নায়ক নিরঞ্জন প্রভু ধর্মঠাকুর। তিনি স্বয়ং প্রকাশ, স্বয়ং জ্যোতি, অরূপ, অলক্ষ্য, সর্বব্যাপী মহাশূন্যতার প্রতীক হইয়াও মায়াধর, ভক্তজনের উপর দয়াপরবশ ও মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী। তিনি একাধারে শূন্যতা ও করুণার মিলিত বিগ্রহ। তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত্যও নাই। তিনি হস্তপদকায়াবিহীন, জন্মমৃত্যুরহিত[৩] হইয়াও সর্বকামফলপ্রদ এবং সহস্রবিঘ্নবিনাশন। তিনি মহাযানী শূন্যতা ও করুণার সম্মিলিত বিগ্রহ। শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন—"সুন্যত ভরমন পরভুর সুন্যে করি

১। ধর্মদাস হইতে ধর্ম পণ্ডিত জন্মিল।
এইরূপে পণ্ডিত বংশ বাড়িতে লাগিল॥
সদার বংশেতে ডোমের উৎপত্তি হয়।
ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়॥
—শূন্যপুরাণ ঃ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, মুখবন্ধ, পৃঃ ৮৵।

২। ধর্মঠাকুরের স্নানজলের প্রথম বিন্দু আহরণ করিয়া নূতন মাটির কলসীর মধ্যে ধরিয়া রাখা হয়। এই জলপূর্ণ কলসী 'নিয়ম কলসী' নামে পরিচিত। এই কলসী ধর্মঠাকুরের মন্দিরে সংবৎসর সংরক্ষিত থাকে। ইহার জল ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন—বন্ধ্যা নারীর সন্তান উৎপাদন, অন্ধকে দৃষ্টিদান ও সর্বপ্রকার মানসিক পূর্ণ করিতে সক্ষম। গ্রামের আব্রাহ্মণ ডোম বাউড়ী সকল শ্রেণীর জনগণ এই জল শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করে। শুধু তাহাই নহে এই জল পরিবেশিত হয় একজন নিম্নশ্রেণীর জল অনাচরণীয় ব্যক্তি দ্বারা। কিন্তু তাহার স্পর্শেও জল দূষিত বা অনাচরণীয় হয় না।
—বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪৬-৫৪৯

৩। ওঁ যস্যান্তং-নাদিমধ্যং ন চ করচরণং নাস্তি কায়ো নিনাদং।
নাকারং নাদিরূপং ন চ ভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব যস্য॥
— ধর্মপূজা বিধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

ভয়'[১]। কিন্তু এই শূন্যমূর্তিই আবার 'পরভু মাআধর'-এ পরিবর্তিত হইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের 'পরভু মাআধর' মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ হইয়া দয়াধর্মের প্রতিমূর্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার করুণায় মহাশূন্যে শ্বাসপ্রশ্বাস সৃষ্টি হইল। আবার—'অনিল হইতে পরভুর হও গেল দআ'।[২] বিশ্বকর্মার প্রতি দয়াপরবশ নিরঞ্জন—

আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ।
দয়ার সাগর পরভু হও গেল থিত।
দেহ হইতে পুনর্জন্ম জন্মে আচম্বিত॥[৩]

বিশ্বসৃষ্টিকারী প্রভু শুধু দয়ার সাগরই নহেন, তাঁহার আসনও দয়ার আসন। প্রভুর দয়াতেই উল্লুকের জন্ম। এই দয়াময় প্রভুই শূন্যমূর্তি ধর্মঠাকুর—শূন্যতা ও করুণার অভিন্ন মূর্তি। শূন্যপুরাণে তিনি করুণাঘন শ্রীবুদ্ধের বিবর্তিত রূপ। রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধদেবের স্থলে অভিষিক্ত করিবার জন্য লিখিয়াছেন—

ধর্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান।[৪]

ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধধর্মের বিবর্তিতরূপ, বৌদ্ধধর্ম যে 'সদ্ধর্ম' নামে অভিহিত হইত সেই দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—'আমরা শাক্যসিংহ-এর মতাবলম্বীদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগকে কি বলিত! তাহারা আপনাদিগকে সদ্ধর্মী বলিত, এবং আপনাদের ধর্মকে সদ্ধর্ম বলিত। অনেক জায়গায় 'দ' ও 'ধ'-এর যে সংযুক্ত বর্ণ তাহার পরিবর্তে শুধু 'ধ' বলিত। অশোকের শিলালিপিতে বৌদ্ধধর্মের নাম সধর্ম। অনেক সংস্কৃত পুস্তকেও উহার নাম সধর্ম। রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরঞ্জনের উষ্মা নামক যে ছড়া লিখিয়াছেন তাহাতেও ধর্মঠাকুরের পূজকদিগকে সদ্ধর্মী বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রামাই পণ্ডিতও মনে করিতেন যে ধর্মঠাকুরের পূজা ও বৌদ্ধধর্ম এক'[৫]। তিনি ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধদেবের বিবর্তিত রূপ এবং বৌদ্ধধর্মেরই অবশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অনুমান

১। শূন্যপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৪।
২। ঐ পৃঃ ৫। ৩। ঐ পৃঃ ৭,
৪। ঐ, পৃঃ ১০৬।
৫। বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

করিয়াছেন—ধর্মঠাকুর শূন্যমূর্তি বৌদ্ধ দেবতা নহেন, আদিম জনসাধারণের দেবতা। রাঢ় অঞ্চলে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল তখন আদিম জাতির দেবতা ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এই সময়েই বুদ্ধদেবের সঙ্গে ধর্মঠাকুর অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিলেন। ধর্মঠাকুরের 'যস্যান্তং নাদি মধ্যং' প্রভৃতি ধ্যানমন্ত্রটিও বৌদ্ধ-প্রভাবিত যুগে রচিত বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। এই মন্ত্রের স্রষ্টা রামাই পণ্ডিতকেও তিনি ধর্মঠাকুরের পূজার আদি প্রবর্তকরূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই। তাঁহার মতে আদিম জাতির ধর্মঠাকুরের উপর যখন বৌদ্ধ ভাবধারার প্রলেপ দেওয়া হয় রামাই পণ্ডিত সেই বৌদ্ধ প্রভাবের যুগে ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।[১]

শূন্যতত্ত্ব

'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থে বৌদ্ধনির্বাণের চরম পরিণতির নিদর্শন পাওয়া যায়। সৃষ্টিপত্তনের পূর্বাহ্নে প্রভুও যেন পরম নির্বাণে অধিষ্ঠিত হইয়া শান্তিপ্রাপ্ত অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। উর্দ্ধে অধেঃ চতুর্দিকে কেবল শূন্য—অনন্ত-প্রসারিত মহাশূন্য। কবি এই অনির্বাচ্য মহাশূন্যকে বাচন ব্যঞ্জিত করিতে গিয়া অপূর্ব এক রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।
মহাসুন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ॥[২]

পাহাড় নাই, পর্বত নাই; সুর-অসুর, ব্রহ্মাবিষ্ণু, ঋষিতপস্বী কেহ-ই সৃষ্টি হয় নাই। ছিল কেবল অস্পষ্ট ধুমান্ধকারের রাজ্য—'সবি ধুন্ধুকার'। পণ্ডিত-প্রবর নাগার্জুন—

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২৭।
২। শূন্যপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১-২।

অপ্রহীনম্‌, অসম্প্রাপ্তম, অনুচ্ছিন্নম্‌, অশাশ্বতম্‌।
অনিরুদ্ধম্‌, অনুৎপন্নম, এতন্নির্বণাম্‌ উচ্যতে ॥[১]

অর্থাৎ যাহা প্রতীতির অতীত, অপ্রাপ্য, অচ্ছেদ্য, অশাশ্বত, অনিরুদ্ধ, এবং অনুৎপন্ন তাহাই নির্বাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শূন্যপুরাণের লেখক বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাশূন্যলোকের পরিচয় দিতে গিয়া নাগার্জুনের নির্বাণের লক্ষণই নির্দেশ করিয়াছেন। 'সভি ধুন্ধুকার' রাজ্যে—'সুন্যত ভরমন পরভুর সুন্যে করি ভর'[২] মহাশূন্যলোকে ভাসমান শূন্যপ্রভু নিরঞ্জন যেন বৌদ্ধ মহাপরিনির্বাণে অন্তগত হইয়া গিয়াছেন। ইহা ভাবাভাবের অতীত, বাক্যমনের অতীত এক পরম অবস্থা। কিন্তু নঙর্থক হইয়াও তাহা সম্পূর্ণ নঙ্‌ নহে। এইজন্য—'কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মাআধর'।[৩] অবশেষে সেই অব্যক্ত ধুন্ধুকার রাজ্যে সৃষ্টির বাসনা জাগ্রত হইয়াছে, নাস্তির মধ্যে অস্তির সম্ভাব্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহা ছিল মহাযান সাধকদের কল্পলোকের উপলব্ধির সামগ্রী শূন্যপুরাণে তাহা শুধু চিন্ময় সত্তাতেই নয়, একেবারে কায়াগ্রহণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।[৪] শূন্যের এই প্রকাশমান রূপই নিরঞ্জন।[৫]

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দেবমণ্ডলের শীর্ষবিন্দুতে বজ্রসত্ত্ব বুদ্ধের অধিষ্ঠান। বজ্রসত্ত্বই শূন্যতত্ত্ব। তিনি দৃঢ়, সার, অচ্ছিদ্র, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহী এবং অবিনাশী।[৬] এইজন্য বজ্রসত্ত্ব শূন্যতার প্রতীক। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের উপাস্য দেবতা শূন্য 'পরভু' নিরঞ্জনও অরূপ, অলক্ষ্য শূন্যলোকে উদ্ভূত—মহাশূন্যমূর্তি। তাঁহার অবস্থানও শূন্যলোকে।[৭] বজ্রসত্ত্ব আদিবুদ্ধ যেমন শুদ্ধজ্ঞানময় তনু অথচ নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিসম্ভাবনা তাঁহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তেমনি শূন্য পরভু নিরঞ্জনও বিশ্ববীজ এবং বিশ্বসৃষ্টির আদিকারণ কিন্তু তিনি নিজে স্রষ্টা নহেন। এইভাবে নিরঞ্জনের কল্পনায় তান্ত্রিক শূন্যবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

১। Mādhyamika-Vṛtti, Levi's Edition, p. 521.

২। শূন্যপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪, ৩। ঐ, পৃঃ ৪।

৪। দ্রঃ—আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ। ঐ, পৃঃ ৭।

৫। দ্রঃ—দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন। ঐ পৃঃ ৭

৬। দৃঢ়ং সারমসৌশীর্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্‌।
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে ॥ —অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ, পৃঃ ৩৭ জি. ও. এস.

৭। সুন্যে বসি নিরঞ্জন দেখিবারে পাএ।—শূন্যপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৮।

শূন্যপুরাণে ও নাথ-সাহিত্যে সৃষ্টিপত্তন কাহিনী বিশেষ মর্যাদা পাইয়াছে। কেবল শূন্যপুরাণ ও নাথ-সাহিত্যেই নহে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একাধিক গ্রন্থে সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা স্থান লাভ করিয়াছে। সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণ, দ্বিজ কাশীরামের সৃষ্টিপুরাণ এবং ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমণ্ডলকাব্যের স্থাপনা পালায় কবিগণ সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা করিয়াছেন। বলরাম দাস, রতিরাম দাস, ব্রহ্মহরি দাস, প্রভৃতির রচিত নিবন্ধেও সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। এই সমস্ত কাব্য ও নিবন্ধে বর্ণিত সৃষ্টিপত্তন কাহিনী এক না হইলেও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বিশ্বসৃষ্টির উৎপত্তি, রূপবৈচিত্র্য এবং অভিনবতা ইহাদের মধ্য দিয়া ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছে। বাংলাসাহিত্যে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের মূল্যায়নের পক্ষে এই তথ্য অতি মূল্যবান। সৃষ্টিপত্তন কাহিনীর মাধ্যমে প্রাচীন কবিগণ কতখানি বৌদ্ধভাবধারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইলে বৌদ্ধ-সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করার আবশ্যকতা আছে।

সৃষ্টিপত্তন

প্রাচীন ভারতে বৃক্ষ পশুপক্ষী পূজা এবং অথর্ববেদীয় নানাপ্রকার ঐন্দ্রজালিক আচার-আচরণের যুগে বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকবর্তিকাবাহী জগজ্জ্যোতি বুদ্ধের আবির্ভাব। কুসংস্কার ও গতানুগতিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের বাণী তাঁহার কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি শুধু আধিভৌতিক জীবনসাধনার পথই নির্দেশ করেন নাই, স্বাধীন চিন্তা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে তিনি সমসাময়িক যুগসমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের সমসাময়িক কালে বিশ্বসৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিচিত্র চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল। তিনি ইহার কোনটিকেই সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে এই বিশ্বসৃষ্টি অনন্তপ্রবাহ—ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই। সৃষ্টির আদিতে তিনি সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বা স্রষ্টার অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন। সকল সাধুসন্ত সত্ত্বের কার্যের ফলস্বরূপ এই পৃথিবীর সৃষ্টি ও পরিবর্ধন হইতেছে।[১] সৃষ্টি ও ধ্বংসের সমস্ত অভিনয় লীলা মহাকল্পের অন্তর্গত। ইহাই মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম কালমাপের একক। বিশ্বসৃষ্টির বিবর্তনের কল্প বা মহাকল্প চারি অসংখ্যেয় বা অগণিত কাল বা কল্পে বিভক্ত। নিম্নলিখিত ভাবে তাহা ভাগ

১। Mogovern, Manual of Buddhist Philosophy, Vol. I, 1923, p 51.
See Saṁyutta Nikāya, Vol. II, pp. 181-82 ;

করা হইয়াছে—(১) ধ্বংসের কল্প বা সংবত্তকল্প, (২) ধ্বংসের সময় বা সংবত্তট্ঠায়িন—যখন পৃথিবী ধ্বংসীভূত হইতেছে। (৩) নবীকরণ বা বিবত্ত, (৪) পৃথিবীর নবীকরণের সময়। অসংখ্য কাল কত দীর্ঘ? বুদ্ধদেবের উত্তর—ইহা কঠিন, অসম্ভব, শত বা হাজার বৎসর পরিমাপের দ্বারা তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না।[১]

নবীকরণ বা নূতন সৃষ্টির সময়ে উচ্চতর স্বর্গলোকজাত সত্ত্বগণ সুকৃতির অবসানে নিম্নলোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। প্রথমেই ব্রহ্মবিমানে সৃষ্টিকার্য শুরু হয়। তাহার পর পরনির্মিতবশবর্তী, নির্মাণরতি, তুষিত এবং যমলোকে সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন এই বিশ্বসৃষ্টি অসংখ্য জগৎ দ্বারা পরিপূরিত। প্রায় সমস্ত জগতেই আমাদের পৃথিবীর ন্যায় পর্বতশ্রেণী, দেশমহাদেশ ও সমুদ্র আছে। প্রতি জগৎ ঊর্ধ্বে স্বর্গলোক এবং নিম্নে নরকস্থানকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। পৃথিবীর আকার সিলিণ্ডারের অনুরূপ। প্রতি জগতের নিম্নে, ঊর্ধ্বে ও চারিপাশে অনন্ত, অসীম আকাশ—শূন্য অথবা ইথারলোক। এই অনন্ত আকাশলোকেই পৃথিবীর স্থিতি। তাহার উপরিভাগে বায়ুমণ্ডল, তলদেশে জলভাগ, তাহার উপরে প্রস্তরের আস্তরণ। সর্বশেষ স্তর পৃথিবীপৃষ্ঠ পর্বত-অরণ্য-সমুদ্র-দেশ-মহাদেশ সমন্বিত ভূভাগ।[২] প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সুন্দর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আনন্দ ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলে বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন—'আনন্দ, এই মহান্ বিশ্ব জলের উপর প্রতিষ্ঠিত। জল বায়ুর উপর এবং বায়ু শূন্যে বা আকাশমার্গে অবস্থিত। যখন মহান্ বায়ুপ্রবাহ উত্থিত হয় তখন জল কম্পিত হয়। জল কম্পিত হইলে পৃথিবীও কম্পিত হয়।[৩] বৌদ্ধ-সাহিত্যের অন্য এক স্থলে ব্রাহ্মণ কশ্যপ প্রশ্ন করিয়াছেন—কিসের উপর এই পৃথিবী স্থিত? ভগবান উত্তর দিয়াছেন—জলচক্রের উপর।

—জলচক্র?

—বায়ুর উপর।

—আর বায়ু?

১. Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, 1958 'Ages of the world', p 188

২. Manual of Buddhist Philosophy, op. cit. pp 50-51.

৩. দীঘনিকায় 11, 107(S. B. E.XI. 45) of অঙ্গুত্তরনিকায়, IV. 312.

—আকাশের উপর।

—আকাশ?

—হে ব্রাহ্মণ, তুমি বহুদূর চলিয়া যাইতেছ, আকাশ কোন বস্তুর উপর স্থাপিত হয় না। আকাশের কোন আশ্রয় নাই।[১] প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্যে পৃথিবী চারি জগৎ দ্বারা পরিবৃত। পৃথিবীর কেন্দ্রে সুমেরু পর্বত বা হিমালয় পর্বত। সুমেরু পর্বতের পূর্বে বিদেহ, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ—আমাদের এই ভারতবর্ষ। ইহা ত্রিকোণাকৃতি। ইহার পশ্চিমে গোধন্য, উত্তরে উত্তরকুরু।[২]

পরবর্তী যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মে আদিবুদ্ধ মতবাদ গৃহীত হইয়াছে। আদিবুদ্ধতত্ত্বের প্রভাব বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টিপত্তন কাহিনীতে প্রাচীন বৌদ্ধ চিন্তাধারা অপেক্ষা স্পষ্টতররূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আদিবুদ্ধের রূপাবয়বে এবং তাঁহার অভিনব আত্মপ্রকাশের মধ্য হইতে বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টিপত্তন কাহিনী শুধু উপকরণ সংগ্রহই করে নাই, প্রাণরসও সঞ্চয় করিয়াছে।

মহাযান সাহিত্যে আদিবুদ্ধ[৩] দেবতা নহেন, অদৃশ্য, নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিসত্ত্বা। আদিবুদ্ধ বা পরম আদিবুদ্ধ অজাত, অসৃষ্ট, তিনি নিজেই নিজের দ্বারা সৃজ্য। তিনি স্বয়ম্ভূ। তিনি এই বিশ্বের আত্মসৃষ্ট রক্ষক। তিনি আর কাহারো সাহায্য ব্যতীত কেবল আপন প্রচেষ্টায় বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন। তিনি 'বিশ্বরূপ'—কারণ যে কোন রূপ তিনি পরিগ্রহ করিতে পারেন। তাঁহাকে কখনও দেখা যায় না—তিনি নির্বাণে অধিষ্ঠিত। তিনি শুদ্ধজ্যোতি প্রভাস্বর শূন্যলোক হইতে উদ্ভূত। প্রার্থনা দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করা যায় না, রূপলোকের উর্ধ্ব জগতে তাঁহার অধিষ্ঠান। তাঁহার দেহ বা সম্ভোগকায় সামন্তভদ্র নামে অভিহিত।

নাথ-সাহিত্যের 'আদিনাথ', শূন্যপুরাণের 'প্রভু নিরঞ্জন' এবং ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের 'ধর্মঠাকুর' ইহারা প্রায় এক ও অভিন্ন। বাংলা সাহিত্যে ইহারা মহাযানী আদিবুদ্ধের ঐতিহ্য বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইহারা আদিবুদ্ধ বা পরমাদিবুদ্ধের উত্তরসাধক নহেন, প্রতিবিম্ব। আদিবুদ্ধের সঙ্গে ইহাদের যেটুকু পার্থক্য তাহা কাল ও পরিবেশগত।

1. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. IV. op, cit. p 181. cf. also Milindapañho, ed. Trenckner, p 68.

2. Manual of Buddhist Philosophy, op. cit, p 55.

3. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, op. cit. 'Adibudha', pp 93-100.

পঞ্চধ্যান দ্বারা আদিবুদ্ধ পঞ্চধ্যানীবুদ্ধকে সৃষ্টি করেন। জ্ঞান ও ধ্যান এই দ্বিবিধ ক্ষমতাদ্বারা তাঁহারা পঞ্চধ্যানী বোধিসত্ত্ব—সামন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, অবলোকিতেশ্বর এবং বিশ্বপাণি প্রভৃতিকে সৃষ্টি করেন। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পঞ্চ মানুষী বুদ্ধও কল্পিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা অবতার নহেন—প্রতিবিম্ব, ঐন্দ্রজালিক প্রক্ষেপণ বা নির্মাণকায়। বোধিসত্ত্বগণই বিশ্বের প্রকৃত স্রষ্টা। সুতরাং আদিবুদ্ধ গৌরবের ও সম্মানের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত হইলেও বোধিসত্ত্বগণই অধিকতর পূজার্হ। চন্দ্রকীর্তি বলিয়াছেন, যেমন নূতন চন্দ্রের অভ্যুদয়ে তাঁহাকেই প্রার্থনা জানানো হয়, পূর্ণচন্দ্রকে নয়, তেমনি বোধিসত্ত্বগণেরই অর্চনা করা উচিত, বুদ্ধগণের নহে। অন্যত্র স্বয়ং বুদ্ধ বলিয়াছেন—হে কশ্যপ, যেমন নূতন চন্দ্রের পূজা করা হয়, এবং পূর্ণচন্দ্র সেইভাবে পূজা পায় না, সেইরূপ কশ্যপ, আমার অনুসরণকারী ও শিষ্যদের মধ্যেও বোধিসত্ত্বগণই তথাগত অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত হইবে। কেন? কারণ, তথাগতগণ বোধিসত্ত্ব হইতেই উদ্ভূত। বুদ্ধ অধিকতর ঐতিহ্যসম্পন্ন, কিন্তু বোধিসত্ত্ব অধিকতর প্রভাবশালী। বুদ্ধগণ পিতা, বোধিসত্ত্বগণ পুত্র এবং বৌদ্ধ চিন্তাধারার প্রতিপোষকও।[১] বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টিপত্তন কাহিনীতেও আদিনাথ, প্রভু করতার, ধর্ম নিরঞ্জন—ইঁহারা নিষ্ক্রিয়, বিমূর্ত, অরূপ।[২] কিন্তু ইঁহাদের ক্ষেত্রজ পুত্রকন্যা—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং আদ্যাশক্তি—ইঁহারা নিষ্ক্রিয় নহেন, ইঁহারাই বিশ্বের সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহারের অধিকর্তা।[৩] শূন্যপুরাণে

১। দ্রষ্টব্য:—Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, op. cit. p 97.

২। জনমিল পুরুষ তার নাহিক হাত পাও।
রজ বীজে জনম তার নহিক বাপ মাও॥
জনমিল পুরুস তার নহিক দুটি আঁখি।
আপনার কলেবর আপুনি সে দেখি॥
—শূন্যপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৭

৩। বম্ভারে বোলিল কর ছিসৃটির পত্তন।
বম্ভা ছিসৃটি করিব জে বিষ্টু করিব পালন॥
ত্রিলোচনে দিল ভার সংহারর কারণ।
আদ্যাসক্তি পানে চাইএ কহে মাআধর।
সুন্ন সুন্ন আদ্যাসক্তি আজ্ঞার উত্তর॥
নরলোকর জনম হেতু তুহ্মি দেহ মন।
তুহ্মা হইতে হঅ জেন ছিসৃটির পত্তন। ঐ পৃঃ ৪০

প্রভুর অন্তরে সৃষ্টিবাসনা জাগ্রত হইলে তাঁহার দেহ হইতে নিরঞ্জন প্রভুর উৎপত্তি হইয়াছে।[১] সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণে ধর্মঠাকুরের আত্মসৃষ্টির কল্পনা হইতে নিরঞ্জন নামক পুরুষের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। মানিকরাম গাঙ্গুলী এবং ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলেও নিরাকার নিরঞ্জন কর্তৃক মহাপ্রলয়ের পর জগৎ সৃষ্টির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীর গীতেও অনাদি নিরঞ্জন হইতে ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। কবিদিগের পরিকল্পিত এই সৃষ্টি পরিকল্পনা মহাযানী বৌদ্ধ ভাবাদর্শের দ্বারা অনুরঞ্জিত। কারণ্ডব্যূহগ্রন্থে বলা হইয়াছে সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর স্বয়ম্ভু আদিবুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন এবং ধ্যানদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার ধ্যানলোক হইতে অবলোকিতেশ্বর-উৎসৃজ্য হইয়া আপন দেহ হইতে দেবদেবিগণকে সৃষ্টি করেন। অবলোকিতেশ্বরের চক্ষু হইতে সূর্য ও চন্দ্র, কপাল হইতে মহেশ্বর, উদর হইতে বরুণ জন্মগ্রহণ করেন। শূন্যপুরাণেও প্রভুর দেহ হইতে নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর জন্মিয়াছেন। ধর্মঠাকুরের হাই হইতে উলূক, পদ্মহস্ত হইতে কূর্ম, কনকপৈতা হইতে বাসুকী এবং অর্ধ অঙ্গের ঘর্ম হইতে আদ্যাশক্তি উৎপন্না হইয়াছেন।

মহাযানী বৌদ্ধদের বিশ্বসৃষ্টির উৎপত্তি চিন্তার চরম পরিণতি 'সুখাবতী'-[২]লোক কল্পনায়। সুখাবতীলোক অসীম আলোকের রাজ্য—অস্তগামী সূর্যের ন্যায় দেহরশ্মিবিশিষ্ট বুদ্ধের দেশ। এই রাজ্যে কোন পাপের অস্তিত্ব নাই। স্বল্পসংখ্যক দেবদেবী, কয়েকজন অর্হৎ এবং বোধিসত্ত্বগণই কেবল বাস করেন। এইলোকে নরক নাই। স্বাভাবিক জন্ম নাই, প্রেত ও অসুরও নাই। অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এবং অসীম সৌগন্ধ্যে এই রাজ্য ভরপুর। অমিতাভ বুদ্ধ অনন্তকাল অহরহ এইখানে তপস্যারত। আনন্দ ও শান্তি, জ্ঞান ও পুণ্য এইখানে নিত্য বিরাজিত। এই 'সুখাবতী'ভাবী বুদ্ধ অমিতাভের রাজ্যের পরিকল্পনা বিচিত্র বাচনভঙ্গী ও রূপচিত্রের মাধ্যমে উত্তরযুগের সাহিত্যে দেব-লোকরূপে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে।

খৃঃ দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে রচিত 'নামসঙ্গীতি' গ্রন্থে আদিবুদ্ধ মঞ্জুশ্রীরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন।[৩] মঞ্জুশ্রী জ্ঞানের প্রতীক। তিনি শুধু বোধিসত্ত্বই নহেন, জ্ঞানসত্ত্বও। মূর্তি শিল্পে তাঁহার অনবদ্য দান তরবারি

১। দেহেত জন্মিল পরভুর নাম নিরঞ্জন, ঐ, পৃঃ ৭।

২। Waddell, Buddhism of Tibet or Lamaism, 1939, pp 129, 139.

৩। Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol., I, op. cit., p, 95.

যাহা অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করে এবং 'প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থ—পরবর্তীযুগে আদিপ্রজ্ঞারূপে যিনি পরিচিতা হইয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থে তিনিই বুদ্ধদিগের জননী, বিশ্বসৃষ্টির মাতৃরূপিণী শক্তি, দৃশ্যমান্ বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়া এই আদিম শক্তিরূপিণীর বিচিত্র প্রকাশ—তিনিই এই লীলাচঞ্চল বিশ্বের ঘনীভূত শক্তি। 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থেও প্রজ্ঞাপারমিতা মানুষীরূপে কল্পিতা হইয়াছেন। তিনি সকল বীরগণের স্নেহশীলা জননী এবং সর্বজীবের করুণাময়ী আদিমাতা। এই আদিমাতা বা বিশ্বসৃষ্টির মাতৃরূপিণী মহাশক্তি নাথসাহিত্যে, শূন্যপুরাণে, অনিলপুরাণে এবং ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে 'কাকেতুকা দেবী', জগজ্জননী 'গৌরী', 'আদ্যাশক্তি', 'পরাপ্রকৃতি' এবং 'মহামায়া' প্রভৃতি নামে পরিচিতা হইয়াছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থে আদিমাতা প্রজ্ঞা তথাগতের দেহ হইতে উৎপন্না।[১] পরবর্তী বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টিপত্তন কাহিনীতেও এই চিন্তাধারার সাধর্ম্য বজায় রহিয়াছে। গোরক্ষবিজয়ে অনাদ্যের শরীর হইতে জগজ্জননী গৌরীর আবির্ভাব।[২] শূন্যপুরাণেও আদ্যাশক্তি দুর্গা প্রভু নিরঞ্জনের দেহজাত কন্যা।[৩] ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে পরমব্রহ্মের বামে বা ঘামে পরাপ্রকৃতির অভ্যুদয়। মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীর গীতেও ধর্মঠাকুরের ঘামে আদ্যার জন্ম। অনিলপুরাণেও ঠাকুরের অর্ধ অঙ্গের ঘর্ম হইতে মহামায়ার উৎপত্তি।

বৌদ্ধসাহিত্যে প্রজ্ঞা বুদ্ধ-কন্যা ও বুদ্ধ-জননী দুই-ই। তারাদেবীও বুদ্ধমাতা ও বুদ্ধ-পত্নী দ্বিরূপেই স্বীকৃতা। বাংলা শূন্যপুরাণগ্রন্থে 'নবজোবনী' আদ্যা 'বিসমধু' পান করিয়া ধর্মনিরঞ্জনের তিন পুত্র—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জন্ম দিয়াছেন। ঘনরামের কাব্যেও পরমব্রহ্ম ও পরাপ্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের উৎপত্তি। বৌদ্ধ মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের মতে যখন মানুষের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্ন দেখা দেয় তখন তাহারা পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে

১। Introduction to Tantric Buddhism, op. cit. p 108.

২। জন্মিলেক এক কৈন্যা পরম সোন্দরি।
নতুন জোবন কৈন্যা নাম থুইল গৌরি॥
আবদুল করিম সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ৭।

৩। অর্দ্ধ অঙ্গের ঘাম পরভু ফেলিল মুছিআ।
তাহে আদ্যাসক্তির জনম হইল আচম্বিতে॥
—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্যপুরাণ, পৃঃ ২৭।

লাগিল—তাহারা একদৃষ্টে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া থাকিত। ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে পাপ দেখা দিল। ঘনরামের কাব্যে পরাপ্রকৃতিকে দেখিয়া পরমব্রহ্মের মনে বাসনা জাগ্রত হইয়াছে। অনিলপুরাণেও দেবীর রূপ যৌবন দর্শন করিয়া ঠাকুরের 'লোভে হল পাপ'।

বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা শুধু কাহিনীবিন্যাসেই বা বিষয়বস্তু নির্বাচনেই নয়, চিন্তাধারায়ও মহাযান বৌদ্ধধর্মকে অনুসরণ করিয়াছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের পঞ্চদ্বীপ বা জগৎযুক্ত পৃথিবী পৌরাণিক ঐতিহ্যে নবদ্বীপযুক্ত হইয়াছে। পরবর্তী বাংলাসাহিত্যেও পৃথিবী নবদ্বীপবিশিষ্ট।[১] বৌদ্ধ মতে জম্বুদ্বীপ বা আমাদের এই পৃথিবী ত্রিকোণাকৃতি। শূন্যপুরাণেও পৃথিবী ত্রিকোণযুক্ত।[২] বৌদ্ধসাহিত্যে সৃষ্টির প্রারম্ভে আদিম জলপ্রবাহ হইতে স্থলের উৎপত্তি স্বীকৃতি পাইয়াছে।[৩] শূন্যপুরাণেও সৃষ্টির প্রারম্ভে আদিম জলপ্রবাহ প্রলয় তাণ্ডবে প্রবাহিত হইতেছিল—চারিদিকে কেবল জল আর জল। ধর্মঠাকুর ভূ-ভাগ সৃষ্টির মানসে আপন কনক পৈতা সেই জলে ফেলিয়া দিলেন—জলমধ্যে—বাসুকীর সৃষ্টি হইল। এইবার—

আপনার গলেত পরভু দিলা পদ্ম হাত
গলার মলা লএ পরভু ভাবেন্ত তখন।

সেই অঙ্গ মলা দিল বাসুকীর মাথে।
ছিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেন মতে ॥

শূন্যপুরাণের বৌদ্ধপ্রভাবিত এই সৃষ্টিপত্তন কাহিনী অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভরতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকেও প্রভাবিত করিয়াছে।

এইভাবে বৌদ্ধশাস্ত্রের তথ্য এবং চিন্তার রূপায়বে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিপত্তন কাহিনী শুধু বিধৃতই হয় নাই, অনাগত যুগসম্ভাবনার পথে আপন জয়-যাত্রার পথও নির্দেশ করিয়াছে। ইহা বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ ফলশ্রুতিরূপে গ্রহণীয়।

১। নঅদীব বসুমতী রাখিল থিআতি। ঐ পৃঃ ২৫।
২। তিন কোন পৃথিবীর জল করিলা থাপন ॥ পৃঃ ২৬।
৩। Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I., op. cit. p. 190

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মঙ্গলকাব্য

'প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি'র আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি অনার্য-অধ্যুষিত বাংলাদেশ জৈনধর্ম প্রচারক মহাবীর ও তাঁহার অনুচরগণের প্রচেষ্টায় সর্ব প্রথম আর্যধর্মের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। পরবর্তীযুগে বৌদ্ধধর্মের বহুপ্রসারী প্রবাহ বাংলাদেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করিয়াছিল। বাংলার আদিম জনসাধারণ অনার্যবিদ্বেষী আর্যগণের সভ্যতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রসারকে কখনও সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। রাঢ় দেশে মহাবীরের ধর্ম প্রচারের অভিজ্ঞতা সেই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।[১] কিন্তু মূলতঃ আর্যসভ্যতার ধারাবাহী হইলেও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বাংলার সাধারণ জনগণের আত্মার সংযোগ সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহার কারণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের বেদ-বহির্ভূত আদর্শ ও ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা এবং সর্বজনীন আবেদন। সর্বধর্মের প্রতি সহিষ্ণু, জাতিভেদ ও বর্ণ-বৈষম্য প্রভৃতির নিগড়মুক্ত বৌদ্ধধর্ম সকল ধর্মাবলম্বী ও সকল শ্রেণীর মানুষকে আপন ছত্রতলে আহ্বান জানাইয়াছিল। ফলে বাংলার সাধারণ জনসমাজে বৌদ্ধধর্ম অধিকতর লোকপ্রিয়তা অর্জন করে এবং লৌকিক ধর্মাচরণেও বৌদ্ধ প্রভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম অভিজাতশ্রেণীর পরিপোষকতা লাভ করিয়া সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমায়িত হইয়া থাকে আর বৌদ্ধধর্মের লোকমুখিন্ প্রবাহ বাংলার বিপুল জনগণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বাংলার লৌকিক ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া লয়। বাংলার ইতিহাসের পালযুগ রাজশক্তির পরিপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ ও লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের সহিত বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ের স্বর্ণ যুগ। আর সেন-বর্মণ যুগের পটভূমিকা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার যুগ। সেন রাজসভার বিদগ্ধ মণ্ডলীতে বাংলার লোকজীবনের স্থান ছিল না, এই সময়ে তাহারা সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের পক্ষপুট আশ্রয় করিয়া সমাজের অন্তরালে গোপন সাধন পদ্ধতির সাহায্যে চরম অধঃপতনকে স্বীকার করিয়া

১। Walther Schubring, আচারাংগ সূত্র Leipzig, 1910, pp. 42-44.

লইয়াছিল। বাঙালী জীবনের এই চরম বিপর্যয়ের যুগে তুর্কী আক্রমণ সংগঠিত হইয়াছিল। এই ঐতিহাসিক রাষ্ট্রসংকটের ঝড়ঝঞ্ঝায় বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মঙ্গল দীপ অনির্দিষ্টকালের জন্য নিভিয়া যায়। তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের চরম অবলুপ্তিকে স্বীকৃতি জানাইয়াছিল এবং বৌদ্ধ ও লৌকিক জনজীবনের সমন্বয়ে সংগঠিত সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দন জানাইয়াছিল। এমন কি বৌদ্ধ ও লৌকিক ধর্মের যৌথমূর্তিধারী দেবদেবিগণও আর্য আভিজাত্যে মণ্ডিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। লোকজীবনের এই স্বীকৃতিদানের পরিণতিস্বরূপ ব্রাহ্মণ্যধর্ম আপন আত্মসম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত করে। ফলে জৈন-বৌদ্ধ-প্রভাবিত লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের ও সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটে। বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহ এই সমন্বয়ের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। মঙ্গলকাব্যসমূহকে যুগ-সন্ধিক্ষণের কাব্যও বলা যাইতে পারে। অবসিতপ্রায় বৌদ্ধযুগ এবং আগত ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠার যুগ—এই দুই যুগ-বৈশিষ্ট্য মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবদেবিগণ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ্যদেবদেবিগণের সঙ্গে দ্বন্দ-বিক্ষোভ ও প্রতিযোগিতায় নামিয়াছেন। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধে তাঁহারা বিজয়ীও হইয়াছেন। লৌকিক দেবদেবিগণের আত্মপ্রতিষ্ঠার এই সংগ্রাম-কাহিনীই মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু।

মঙ্গলকাব্যোক্ত দেবদেবীর পরিকল্পনা ও পূজাপদ্ধতির মধ্যে বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্ব এবং লোকাচার, ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীয় বিধি, লৌকিক আচার ও ধর্মবিশ্বাস সমন্বিত হইয়াছে। এইজন্য মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, শিব ও শীতলা প্রভৃতি দেবদেবিগণ অনার্য মূলোদ্ভূত হইয়াও বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবী পরিকল্পনার সঙ্গে বিমিশ্রিত হইয়া পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে একাসনে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিরুদ্ধ শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া বাঙালীমানস আপন পুরুষকার ও আত্মশক্তিতে নির্ভরতা হারাইয়া ফেলিয়াছিল, এবং দেবী মহিমায় একান্তনির্ভর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে যুগ-চাহিদার অনুরোধে কাব্যেও নারীদেবতাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেদ-উপনিষদে পুরুষ-দেবতা প্রাধান্য পাইয়াছে, কিন্তু হিন্দুবৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থসমূহে নারীশক্তিই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে নারীদেবতার প্রাধান্যের স্বীকৃতি বাঙালীর বিশিষ্ট মানসচিন্তার পরিণতি। বৈদিক দেবতার বিরোধিতা এবং সবভারতীয়

চিন্তন হইতে বিচ্ছিন্নতা—এই দুই-এর মাধ্যমে বাঙালী আপন বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সুতরাং বাঙালীমানসের একান্ত অভিলাষের প্রতিচ্ছবিরূপে বাংলা মঙ্গলকাব্যে নারীদেবতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবিগণের স্বরূপ নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। আদিম, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক দেবদেবিগণ আপন নামানুসঙ্গ কামনা ও পরিচয়সূত্রকে অবলুপ্ত করিয়া এখানে এক যৌথরূপ পরিকল্পনায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই রূপান্তরীকরণ প্রক্রিয়া চলিয়াছে। এইজন্য এই দেবদেবিগণ হিন্দু দেবায়তনের ছিলেন কি বৌদ্ধ দেবায়তনের ছিলেন, কে কাহার উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়া বর্তমান সঙ্কররূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন অথবা শুধু নামমাত্র পরিবর্তন করিয়া বৌদ্ধ দেবায়তনের দেবদেবী হিন্দু দেবায়তনে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করিতেছেন কিনা তাহা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করা কষ্টসাধ্য।

১। মনসা মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যগোষ্ঠীর মধ্যে মনসামঙ্গলকাব্য প্রাচীনতম ঐতিহ্য গৌরবে সমৃদ্ধ। এই কাব্যকাহিনী প্রাচীন ভারতের সর্পদেবতার পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঋগ্‌বেদে প্রথম 'সর্প' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] কিন্তু এইখানে সর্প বৃত্রাসুর, সরীসৃপ জাতীয় ভয়ঙ্কর জীব নহে। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে এবং মহাযান বৌদ্ধসাহিত্যে সর্প ও নাগদেবতার প্রচুর বিবরণ ও কাহিনী পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে আর্যজাতির নিকট পরাজিত দ্রাবিড়গণ বঙ্গদেশকেই সর্বশেষ আশ্রয়স্থলরূপে গ্রহণ করে। এই দেশে বসবাস করিয়া দ্রাবিড়গণ দীর্ঘকাল তাহাদের নিজস্ব সংস্কারসমূহ নিরুপদ্রবে পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাংলার সর্পপূজার মধ্যে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।[২]

তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 'জাঙ্গুলী' নামে একটি দেবী ছিল। পণ্ডিতগণ এই দেবীর সঙ্গে বাংলা মনসা মঙ্গলকাব্যের মনসাদেবীর মৌলিক সাদৃশ্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জাঙ্গুলীদেবীর প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের জন্য তান্ত্রিক গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে—ভগবান বুদ্ধ তাঁহার একান্ত অনুগত শিষ্য আনন্দকে জাঙ্গুলীদেবীর পূজার গোপনমন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। 'সাধনমালা' গ্রন্থে সর্পদেবী

জাঙ্গুলী দেবী ও মনসা

১। যৎতে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ—ঋঃ ১০, ১৬, ৬।

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৫।

'জাঙ্গুলী' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং সর্প বিষনিয়ন্ত্রী শক্তি। জাঙ্গুলীদেবী সেযুগে এতই প্রভাবান্বিতা ছিলেন যে সর্প চিকিৎসকও 'জাঙ্গুলিক' নামে অভিহিত হইতেন। 'সাধনমালা' গ্রন্থে জাঙ্গুলী-দেবীর বিভিন্ন রূপচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।[১] বৌদ্ধদের বিশ্বাস—এই দেবীর নামে বিষধর সর্প পলায়ন করে, জাঙ্গুলীর মন্ত্র একবার পাঠ করিলে সপ্ত বৎসর সর্পভয় থাকে না এবং যে ব্যক্তি এই মন্ত্রটি মুখস্থ রাখিতে পারে সে যাবজ্জীবন সর্পভয় হইতে পরিত্রাণ পায়।[২] সাধনমালা গ্রন্থে এমন একটি মন্ত্র আছে যাহা পাঠ করিলে সর্পের মস্তক সপ্তধা স্ফুটিত হয়। বাংলাদেশের মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাঙ্গুলীদেবীর ব্যাপক প্রসার ও লোকপ্রিয়তা ছিল। এই জাঙ্গুলীদেবী অথর্ববেদোক্ত সর্পবিষ বিদ্যানিপুণা কিরাতকন্যা বা ঘৃতাচী এবং সরস্বতী দেবীর সমন্বিত মূর্তি। এইজন্য তিনি কেবল 'সিতসর্পধারিণীং', 'শুক্লসর্পপরিভূষিতাং' এবং 'স্ফীতফণা মণ্ডলশিরস্থানং' নহেন, তিনি 'শুক্লাং', 'শুক্লবসনোত্তরীয়াং' এবং 'বীণাং বাদয়ন্তীং'ও বটে।[৩] সুতরাং অথর্ববেদের সরস্বতী, কিরাতকন্যা ও ঘৃতাচী এই তিনটি চরিত্রের প্রভাবে তান্ত্রিক জাঙ্গুলীদেবী রূপ কল্পিতা হইয়াছেন। পরবর্তীযুগে পাল রাজত্বের অবসানে সেনরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মহাযান সম্প্রদায়ের জাঙ্গুলীদেবী বাংলাদেশে মনসামূর্তিতে রূপান্তরিতা হইয়া গিয়াছেন। জাঙ্গুলী ও মনসাদেবী যে এক ও অভিন্না তাহা সুস্পষ্টভাবে তাঁহার ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে।[৪] এই ধ্যানমন্ত্রে বৌদ্ধ-দেবী জাঙ্গুলী শঙ্কর-কন্যা বিষহরিতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। বিপ্রদাসের কাব্যেও মনসার এক নাম 'জাগুলি'।[৫] তুর্কী

১। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু ময়ূরভঞ্জ হইতে জাঙ্গুলীতারার একটি মূর্তি আবিষ্কার করেন। এই মূর্তিটি দ্বিভুজা ও ললিতাসনে উপবিষ্টা। তাঁহার মতে মহাযানী বৌদ্ধ শ্রমণগণ ইহার পূজা করিতেন—"Archaelogical Survey of Mayurbhanja, Vol. I, 1911, Plate no. 47.

২। বৌদ্ধদের দেবদেবী, ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য. ১৩৬২, পৃঃ ৬৪-৬৫।

৩। Sādhanamālā, ed B. Bhattacharyya, G. O. S, pp. 253, 248

৪। দ্রঃ— কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাননাং শোভনাম্।
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাং ফণীময়ীং দিব্যাঙ্গরাগান্বিতাম্॥
চার্বঙ্গীং দধতীং প্রসাদমভয়ং নিত্যং করাভ্যাং মুদ্রা।
বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্॥
—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৮।

৫। দ্রঃ— জাগিয়া জাগুলি নাম নিজ বুকে স্থিতি।

আক্রমণের ফলে চতুর্দশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ এই দেশ ছাড়িয়া নেপাল তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জাঙ্গুলীতারাও বিলোপের পথে একবার মাত্র কবি বিপ্রদাসের কাব্যে দেখা দিয়া চিরতরে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও জাঙ্গুলীদেবীর এই চরম পরিণতি স্বীকার করিয়াছেন।[১]

বৌদ্ধ ভাস্কর্যে ও সাহিত্যে নাগদেবতা ও নাগগণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের সর্বজীবের প্রতি প্রসারিত মৈত্রীচেতনাদ্বারা পরিশ্রুত হইয়া নাগগণ বৌদ্ধঐতিহ্যে নবরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধসাহিত্যে ও শিল্পে নাগগণ হিংস্র ও ভয়ঙ্কর দেবতারূপে চিত্রিত হয় নাই, বরং বিপরীত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহারা মানুষের শত্রু নয়, মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাহারা জলভাগের অধিবাসী এবং বৃষ্টিপাত ও ঘনঘটার উপর তাহাদের বিশেষ আধিপত্য আছে। তাহারা অতি বর্ষণকে সংযত করে, বিদ্যুৎকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিমিত বর্ষণ আনয়ন করে। বৌদ্ধসাহিত্যে নাগগণের রাজা বিরূপাক্ষ। তিনি চতুর্লোকপালের অন্তর্গত দেবতা। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত সুমেরু পর্বতের পশ্চিমে তাঁহার রাজ্য। কিন্তু তাঁহার প্রধান বাসস্থান ভোগবতী—সমুদ্রতলের ৩০০০ যোজন গভীরে। বাংলা মঙ্গলকাব্যেও নাগরাজের রাজ্য পাতালপুরী। বর্ষণ ও ঘনঘটার উপর তাহাদেরও আধিপত্যের দুই একটি নিদর্শন পাওয়া যায়।[২]

বৌদ্ধ সাহিত্যে ও ভাস্কর্যে সর্প ও নাগদেবতা

বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত নাগদেবদেবিগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ললিতবিস্তর গ্রন্থে পাওয়া যায় যখন মহারাণী মায়াদেবী লুম্বিনী উদ্যানে শাক্যসিংহ গৌতমকে জন্মদান করেন তখন নন্দ ও উপানন্দ নামে দুইজন নাগরাজ লুম্বিনী উদ্যানে উষ্ণ ও শীতল দুইটি জল প্রবাহ আনয়ন করিয়া নবজাত শিশুর স্নানকার্যে সহায়তা করেন।[৩] বাংলা মঙ্গলকাব্যেও শিবকন্যা পদ্মাবতীর জাতকর্ম পাতালপুরীতে নাগগণের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছে।[৪]

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৯।

২। Vogel, Indian Serpent Lore or the Nagas in Hindu Legends, 1926, Ch, VI,

৩। ললিতবিস্তর, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত ১৯৫৮, জন্ম পরিবর্তঃ, পৃঃ ৬১-৬২।

৪। মনসামঙ্গল বা বাইশা, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৫৪, পৃঃ ৮।

বৌদ্ধ সাহিত্যে নাগগণের মেঘ বৃষ্টি ও ঘনঘটা সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য রহিয়াছে। মহাভিনিষ্ক্রমণ সময় আগত হইলে বিভিন্ন দেবদেবিগণ ভবিষ্যৎ বুদ্ধকে সাহায্য করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। এই সময় নাগরাজ বরুণ, মনস্বী, সাগর, অনবতপ্ত, নন্দ এবং উপানন্দ বলিল—'বোধিসত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য আমরাও 'কালানুসারি' মেঘ ও ঘনঘটা সৃষ্টি করিব এবং চন্দনচূর্ণের অনুরূপ সর্পনির্যাস বর্ষণ করিব।'[১] মনসামঙ্গলকাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী কালীদহের নিকটবর্তী হইলে মনসাদেবী বাসুকী, তক্ষক, উদয়কাল, মণিনাগ প্রভৃতি নাগগণের সাহায্যে কালীদহে কালোমেঘ ও ঝড়বৃষ্টির সৃষ্টি করেন[২]। সুতরাং মঙ্গলকাব্যেও নাগগণের ঝড়বৃষ্টি, মেঘ ও অন্ধকার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে। বৌদ্ধসাহিত্যে 'এলাপত্র' নাগ বিশেষ ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে। কাহিনীতে আছে কোন বৌদ্ধ, ভিক্ষু এলাবৃক্ষ ধ্বংস করার জন্য নাগরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এলাপত্র নাগ প্রত্যহ বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছদ্মবেশে বুদ্ধদেবের দেশনা শ্রবণ করিত। সর্বজ্ঞ বুদ্ধ তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন—'এলাপত্র, যদি তোমার উপদেশ শ্রবণ করিতে বাসনা হয় তবে স্বমূর্তিতে শ্রবণ কর, ছদ্মবেশ পরিত্যাগ কর।' পরের দিন শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে এক প্রকাণ্ড নাগ আবির্ভূত হইল। তাঁহার মস্তকে একটি এলাপত্র বৃক্ষ।[৩] এই এলাপত্র নাগকে মনসামঙ্গলকাব্যে কবি দেবীর প্রসাধন ও বেশবিন্যাসের উপকরণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন।[৪]

নাগগণের শত্রু পক্ষীরাজ গরুড়। গরুড় সর্পভক্ষক ও সর্পশত্রুরূপে হিন্দু-বৌদ্ধ উভয় সাহিত্যে ও ভাস্কর্যে স্বীকৃতি পাইয়াছে। বৌদ্ধকাহিনীতে আছে গরুড়ের অত্যাচারে উৎপীড়িত নাগগণ ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট নালিশ জানাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করে। বুদ্ধদেব বজ্রপাণি নামক দেবতাকে নিয়োগ করিয়া নাগকুলকে রক্ষা করেন। বজ্রপাণি বুদ্ধদেবের প্রদত্ত একটি চীবর অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নাগদের মধ্যে তাহা বিতরণ করেন। ইহার পর গরুড় আর নাগদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই।[৫] বজ্রপাণিকর্তৃক বুদ্ধদেবের

১। ললিতবিস্তর, প্রাগুক্ত, অভিনিষ্ক্রমণ পরিবর্তঃ পৃঃ ১৪৮।
২। মনসামঙ্গল বা বাইশা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০-১৫১।
৩। Senart, Mahāvastu, Vol. III, pp. 888 ff. Vogel. Indian Serpent Lore etc. 1926, p 105-107.
৪। এলাপত্র নাগে করিল তোড়লমল,—মনসামঙ্গল বা বাইশা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।
৫। Getty, The Gods of Northern Buddhism, 1914. p 155.

চীবর অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নাগগণের মধ্যে বিতরণের এই কাহিনী পরবর্তীযুগে মনসাকর্তৃক শিবের উদ্গীর্ণ কালকূট বিষ সর্পগণের মধ্যে বণ্টন করার কাহিনীকে প্রভাবিত করা অসম্ভব নয়।

বৌদ্ধকাহিনী অনুযায়ী গৌতমবুদ্ধ 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক পবিত্র গ্রন্থটিকে নাগগণের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্দেশ ছিল যতদিন মানুষের মধ্যে এই গ্রন্থের মর্যাদাবোধ জাগ্রত না হইবে ততদিন ইহা নাগদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইবে। আচার্য নাগার্জুন এই প্রজ্ঞাপারমিতাগ্রন্থ নাগদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া মহাযান মত প্রতিষ্ঠা করেন।[১] 'প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থের ন্যায় দেবী মনসাও নাগগণের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে শৈশব জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাবের প্রায় দুইতিন শতাব্দী পূর্বে তন্ত্রশাস্ত্রের ধ্যানে সাধকের অন্তরলোকবাসিনী বিষনাশিনী দেবী অপরূপ রূপে রূপান্বিত হইয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ বিনয়বস্তুর অন্তর্গত মহামায়ূরীবিদ্যা সূত্রেও মনসাদেবী 'অমলে, বিমলে, নির্মলে, মনসে'-রূপে অভিহিতা হইয়াছেন। তন্ত্রে যে দেবীকে সাধক মানসলোকে প্রত্যক্ষ করিয়া অধ্যাত্ম সৌন্দর্যে বিভোর হইয়াছেন সেই দেবী বাংলা মনসামঙ্গলকাব্যে কবিকে কাব্যরসের প্রেরণা দিয়াছেন। সাহিত্যের অগ্রদূতরূপে এই নাগদেবী ভাস্কর্যে ও মূর্তিশিল্পে খৃষ্টপূর্ব যুগ হইতে ভারতীয় চিন্তাধারায় এক আবেগময় অনুভূতি ও সুকুমার প্রেরণা জোগাইয়াছে। ভাস্কর্যে ভারতীয় দেবদেবিগণের নাগজাতিত্বের নিদর্শন দেবদেবীমূর্তির পশ্চাৎ-ভাগের তিনটি, পাঁচটি অথবা সাতটি ফণাযুক্ত নাগদেহ। দ্বাদশ শতাব্দীর পরে নাগগণ সর্প লেঙ্গুটি বা লেজযুক্ত দেহরূপ ধারণ করিয়াছে। এই যুগে নাগদেব-দেবিগণ অর্ধদেহে মানবমানবী, অর্ধদেহে সর্প। ভাস্কর্যে নাগদেবতার নয়নাভিরাম মূর্তি পরবর্তীযুগে সাহিত্যে তাঁহার বিশ্বমাতৃকা মূর্তি চিত্রণে সহায়তা করিয়াছে।[২] নালন্দার নাগমূর্তি এবং অজন্তার নাগরাজমূর্তি শিল্প-সৌন্দর্যের চরম নিদর্শন বহন করিতেছে। নালন্দার নাগমূর্তিটি[৩] দ্বিভুজ, ললিতাসন ভঙ্গীতে উপবিষ্ট, অঙ্গে অলঙ্কারসম্ভার, মস্তকে সপ্তফণাযুক্ত আচ্ছাদন, কমনীয় আনন প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত। অজন্তার মূর্তিটিও দ্বিভুজ, সপ্ত-

---

১। বৌদ্ধদের দেবদেবী : শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ১৩৬২, পৃঃ ৬৭।

২। See N. N. Basu, Archaeological Survey of Mayurbhanja, 1911, p. XX, pl, 15.

৩. Vogel, Indian Serpent Lore etc. op. cit. pl. XIV.

সর্পবিধৃত ফণাছত্রতলে ললিতাসনে উপবিষ্ট। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি নারী-মূর্তি—একজন উপবিষ্টা, তাহার মস্তকেও একটি সর্পফণা প্রসারিত, অপর নারী মূর্তিটি দণ্ডায়মানা।[১] বৌদ্ধসাহিত্যের আখ্যান এবং বৌদ্ধভাস্কর্যের নাগদেবদেবীর শাশ্বত শিল্পসৌন্দর্য বাংলা মঙ্গলকাব্যে নাগদেবী মনসার রূপকল্পনায় প্রেরণা দান করিয়াছে।

রাজগীরে পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে মণিয়ার মঠে কয়েকটি নাগিনীমূর্তি ও নাগমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই নাগনাগিনীমূর্তিগুলি সম্ভবতঃ এক সময়ে স্থানীয় জনগণদ্বারা পূজিত হইত। এখনও এই অঞ্চলের জনগণ মণিয়ার মঠে মণিয়ার নামক নাগের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করে। তাহাদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস মণিয়ার নাগই লৌহবাসরে লখিন্দরকে দংশন করিয়াছিল। মনসাদেবীর বৌদ্ধ ঐতিহ্যের স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন—"জাঙ্গুলীর সঙ্গে বৌদ্ধসমাজের সম্পর্ক ছিল, তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ-দেবী ছিলেন। পাল রাজত্বের অবসানে সেন রাজত্বের যখন প্রতিষ্ঠা হইল, তখন এদেশে বৌদ্ধধর্মের বিলোপ ও তাহার স্থানে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, সেই সময়ে যে সকল বৌদ্ধদেবদেবীকে নূতন নাম দিয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এই সর্পদেবী তাহাদের অন্যতম। বৌদ্ধ সংস্রবের জন্য তখনই তাঁহার জাঙ্গুলী নাম পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে মনসা নামকরণ হয়। বাংলার পূর্বোক্ত অর্বাচীন পুরাণগুলি ইহার কিছুকাল মধ্যেই রচিত হয় এবং তাহাদের মধ্য দিয়া মনসাকে শিবের কন্যারূপে দাবী করিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হয়। এই সময়েই সংস্কৃত মহাভারত হইতে বাসুকীর ভগ্নী জরৎকারুর কাহিনীটিও আনিয়া বাংলার তদানীন্তন বৌদ্ধ সর্পদেবীর উপর আরোপ করা হইল।"[২] সুতরাং দেখা যাইতেছে বাংলা দেশের মনসামূর্তির মধ্যে একাধারে বৌদ্ধ, পৌরাণিক এবং লৌকিক ঐতিহ্য এক সুষমাময় ও সুসমঞ্জস ঐক্যে সংহতরূপ ধারণ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে বৃক্ষপূজা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। বৌদ্ধসাহিত্যে নাগগণ বিশেষভাবে বৃক্ষদেবতা ও বর্ষণদেবতা। নিরঞ্জনা নদীতীরে অশ্বত্থমূলে সুজাতার পায়সান্ন বৃক্ষদেবতার উদ্দেশ্যে অর্পিত হইয়াছিল।[৩] ধম্মপদ অট্‌ঠকথায়ও

১। Vogel, Indian Serpent Lore etc. op. cit. pl. 1.

২। মনসামঙ্গল বা বাইশা, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃঃ ১৵

৩। Fausboll, Jātaka, Vol. I. (Nidānakathā) p 68-69.

বৃক্ষদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] এইখানেও বৃক্ষদেবতা ও নাগ অভিন্ন। ভারুতশিল্পে নাগরাজ তাঁহার পাঁচ শত অনুচরসহ বোধিবৃক্ষের নিকট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।[২] এলাপত্র নাগ কর্তৃকও বোধিবৃক্ষ পূজিত হইয়াছে।[৩] সাঁচীর তোরণগাত্রেও দেখা যায় সমস্ত জীবজগৎ আপন আপন প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া পবিত্র বোধিবৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য একই দৃশ্যে সমবেত হইয়াছে।[৪] বৃক্ষপূজার এই ধারা কালক্রমে আরো ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। এদেশে 'স্নূহী' বৃক্ষে বা সীজবৃক্ষে সর্পপূজা করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মঙ্গলকাব্যে দেবী মনসার অধিষ্ঠানক্ষেত্ররূপেও সীজবৃক্ষের উল্লেখ রহিয়াছে। বাংলাদেশে আবিষ্কৃত মনসামূর্তিতে সপত্র বৃক্ষশাখা স্থান পাইয়াছে। রাজশাহী এবং ময়মনসিংহ জেলা হইতে আবিষ্কৃত মনসা প্রতিমার প্রথমটিতে দেবীর দক্ষিণ-হস্তের পশ্চাৎ দিকে বৃক্ষশাখা এবং অন্যটিতে দেবীর দুই স্কন্ধের দুইদিকে দুইটি বৃক্ষশাখা রহিয়াছে। মেয়েদের ব্রতকথায় মনসার যে কাহিনী পাওয়া যায় তাহাতেও আছে মনসার অধিষ্ঠানক্ষেত্র সীজ মনসাবৃক্ষে। দশহরা নাগপঞ্চমীর দিনে এবং ভাদ্রমাসে অরন্ধনের দিনে ঐ গাছ পূজা করিলে সর্পভয় থাকে না।[৫]

মনসামঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা বৌদ্ধভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিপত্তন বর্ণনায় বিশেষ একটু অভিনবতা আছে। সৃষ্টির আদিতে চারিদিকে জল—কেবল জলময়। স্বর্গ, মর্ত্য, রবিশশী, দেবদেবী কিছুই নাই। অনন্ত প্রসারিত জলরাশির মধ্যে বটপত্রে অনাদি ঈশ্বর ভাসমান। তাঁহার অন্তরে সৃষ্টিবাসনা জাগ্রত হইলে তিনি চারিভ্রাতাকে সৃষ্টি করেন। ধর্মকে অনিল প্রশ্ন করিলেন—'কি উপায়ে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, কে তোমার মাতাপিতা ?' ধর্ম সগর্বে উত্তর করিলেন—

সৃষ্টিকাহিনী

১। Dhammapada atthakathā, Vol. I, Kāliykkhinī, pp 45—58.

২। Barua, Bhārut, Book, III, 1937, pl. LXI. Cunningham, The Stupa of Bharut, pl. XIV, Inscription—'Erapato nāgarāja Bhagavato va(m) date.'

৩। Barua, Bhārut, op. cit. pl. LXI.

৪। Fergusson, Tree and Serpent worship. pl. XV, 8 ; Grunwedel, Buddhist Art in India, pp 49 ff Fig. 26.

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৯।

ডাকিয়া বোলেন ধর্ম অনাদি আমার জন্ম
আপনে সে পিতামাতা আমি
... ...
সৃষ্টির অধিকার করিবারে রাজ্যভার
আমি হই জগতের স্বামী।[১]

পালি দীঘনিকায়ের অন্তর্গত ব্রহ্মজালসুত্তেও ব্রহ্মবিমানে জাত প্রথম সত্ত্ব তাহার পূর্ববর্তী সৃষ্টি সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং নিজেকেই ঈশ্বর, স্বয়ম্ভু, স্রষ্টা ইত্যাদি মনে করিয়াছে। জগজ্জীবনের কাব্যে এই গর্বিত উক্তি শ্রবণ করিয়া অনিল ধর্মকে অভিশাপ দিয়াছেন।—

মড়া পচা হইঞা তুমি ভাসিয়া যাবে নীরে।
লাগিবে পাণ্ডুর পোকা তোমার শরীরে॥[২]

এইভাবে মনসামঙ্গলকাব্য বৌদ্ধপ্রভাবিত শূন্যপুরাণের সৃষ্টিপত্তন কাহিনীকে অনুসরণ করিয়াছে। মনসাও শূন্যপুরাণের আগ্যার ন্যায় 'অযোনীসম্ভূতা' এবং পরে ধর্মের ইচ্ছায় নারীদেহের অধিকারিণী হইয়াছেন। পূর্ব ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিয়া মনসামঙ্গল কাব্যে শিব ধর্মের পত্নী মনসাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে মৃত্যুর আগুনে দগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নবদেহ ধারণ করিতে হইয়াছে। নবদেহা গৌরীরূপিণী মনসার সঙ্গে শিবের বিবাহ হইয়াছে। ধর্মের পত্নী মনসা নামে মনসা হইলেও সর্পের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। শিবকন্যা মনসাই সর্পবিষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শিবতেজে পাতালে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। মনসামঙ্গলকাব্যেও কবি ধর্ম ও শিবকে একদেহী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কবি বিষ্ণুপালের কাব্যে নেতার জন্মকাহিনী আগ্যাদেবীর জন্মকাহিনীদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলকাব্যে ঊষা স্বর্গলোক হইতে মনসাকে কয়েকটি শপথ করাইয়া তবে মর্ত্যে অবতরণ করিয়াছে। এই শপথানুষ্ঠানের গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান ইত্যাদি হিন্দু-বৌদ্ধ আদর্শের পাপবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের মনসামঙ্গলকাব্যের স্থানে স্থানে অশ্লীলতাদোষ প্রতিফলিত হইয়াছে। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মনসামঙ্গল-

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১ হইতে উদ্ধৃত।
২। ঐ

কাব্যের এই অশ্লীলতাদোষের জন্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিলয়োন্মুখ বৌদ্ধধর্মের অধঃপতিত নৈতিক আদর্শকে দায়ী করিয়াছেন।[১]

২। চণ্ডীমঙ্গল

মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী মিশ্রাদেবী। মহাদেব যেমন কখনও আশুতোষ, আত্মভোলা, শঙ্কর, আবার কখনও শ্মশানবাসী ভস্মবিভূতিকায় ধ্বংস বা বিনাশের দেবতা রুদ্র; চণ্ডীও তেমনি কখনও কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তিতে, কখনও ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিনী মহাকালী বা চামুণ্ডা মূর্তিতে প্রকাশিতা হইয়াছেন। হিন্দু-বৌদ্ধ এবং অনার্য-প্রতিমা আদর্শের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ তিল তিল আহরণ করিয়া বাঙালীর অনন্যসৃষ্টি চণ্ডীদেবী প্রমূর্তা হইয়াছেন। বৌদ্ধ বজ্রশারদা, নীলতারা, একজটা এবং বজ্রধাত্বীশ্বরীদেবীর ঐতিহ্যে বিভূষিত হইয়া তিনি সর্বাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরী, জাঙ্গুলীতারা এবং বাসুলী দেবীর সঙ্গেও চণ্ডীর নৈকট্য উপলব্ধি করিয়াছেন। স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী পৌরাণিক চণ্ডী নহেন, তিনি বৌদ্ধ দেবতার রূপান্তর মাত্র। তিনি মঙ্গলচণ্ডীর বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী বৌদ্ধ দেবদেবী (ধর্ম, নিত্যা, বাসুলী, বিশালাক্ষী) সম্মিলনে ও ব্রাহ্মণ্য দেবতা দুর্গার রূপভেদ স্বরূপে প্রকল্পিত হইয়াছেন।'[২] পণ্ডিত সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে বৈদিক সরস্বতীর সঙ্গে উগ্রা বা ভয়ঙ্করী দেবীর সমন্বয়ে চণ্ডীমূর্তি কল্পিতা হইয়াছেন।[৩] বৌদ্ধ বজ্রশারদা, নীলতারা, জাঙ্গুলীতারা, বজ্রধাত্বীশ্বরী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবিগণ উগ্রা বা ভয়ঙ্করী। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় বৌদ্ধ নীলতারার সহিত চণ্ডীদেবীর অধিকতর নৈকট্য আছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। নীলতারা একজটা নামেও অভিহিতা। এই দেবী ভয়ঙ্করী, বিদ্যুৎজ্বালা করালী, নীলবর্ণা, দ্বাদশমুখী, নাগভূষিতা, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাকরালবদনী। এই উগ্রতারা বা একজটা দেবী মঙ্গলচণ্ডী নামের আড়ালে কালিকাপুরাণে বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে বহন করিয়া আনিয়াছেন।[৪] দেবী কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী, রক্তদন্তিকা, নাগ এবং নৃমুণ্ডমাল্য-

দেবী ও তাঁহার বৌদ্ধ ঐতিহ্য

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫।

২। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী বোধিনী, ১ম ভাগ, ১৯২৫, পৃঃ ৮৫।

৩। মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ভূমিকা, ১৸।

৪। পীঠে দিক্করবাসিন্যা দ্বিরূপা রমতে শিবা।
তীক্ষ্ণকান্তাহ্বয়া হ্যেনা যোগ্রতারা প্রকীর্তিতা॥—কালিকাপুরাণ, ৮০, ৩৮।

ধারিণী, কর্তৃ, খর্পর, খড়্গ প্রভৃতি প্রহরণহস্তা এবং শবোপরি দণ্ডায়মানা। তান্ত্রিক একজটা দেবীও কৃষ্ণবর্ণা ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা, ত্রিনেত্রা, লম্বোদরা, লরোষকরাল-বক্ত্রা, মুণ্ডমালাপ্রলম্বিতা রুদ্রাদেবী।[১] বজ্রধাত্বীশ্বরী দেবীর প্রভাবও একদা চণ্ডীদেবীর রূপপরিকল্পনাকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল। 'বজ্রধাত্বীশ্বরী' বজ্রসত্ত্বের শক্তিস্বরূপিণী। 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ' মতে তিনি চারিবুদ্ধশক্তি—লোচনা, তারা, মামকী ও পাণ্ডরাদ্বারা পরিবৃতা থাকেন।[২] চণ্ডী দেবীও লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক প্রভৃতি দেবদেবিগণ পরিবৃতা হইয়া অবস্থান করেন। 'সাধনমালা' গ্রন্থ দ্বাদশভুজা মারীচীদেবীর রূপচিত্র অঙ্কন করিয়াছে—'বজ্রধাত্বীশ্বরীং মারীচীং দ্বাদশভুজাং রক্তাংযন্মুখীং লম্বোদরাং জ্বলৎপিঙ্গলোর্ধ্বকেশাং কপালমালিনীং সর্পমণ্ডিতমেখলাং ব্যাঘ্রচর্মাম্বরধরাং……নানাবরাহক্রম্যমাণরথাং……উর্ধ্বকৃষ্ণ-বরাহৈকমুখীং…ত্রিনেত্রাং ললজ্জিহ্বাং করালবদনামতিভয়ানকাকারাং চিন্তয়েৎ।'[৩] সম্ভবতঃ এই বজ্রধাত্বীশ্বরী দেবীও মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর ন্যায় বৌদ্ধদেবায়তনে পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী ও ব্যাধকুলের আরাধ্যা দেবী। তিনিও দ্বাদশভুজা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা এবং হিংস্রপশুপরিবৃতা দেবী। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করিয়াছেন বৌদ্ধ বজ্রধাত্বীশ্বরীদেবী বাংলাদেশের লৌকিক বাসুলীতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীদেবীর আবির্ভাবের ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতিক্রিয়ার ফলে এক বিশেষ সময়ে চণ্ডীদেবীর আবির্ভাব। বুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্করদের প্রভাবে শিব যখন নিষ্ক্রিয় উদাসীন হইয়া উঠিয়াছেন 'তখন বঙ্গদেশের এমন এক দেবতার আবশ্যক হইল যিনি উদ্যমপূর্ণ, যিনি শরণাগত বৎসল ও আত্মত্রাণে সক্ষম, শক্তিসম্পন্ন। সেই দেবতা আবির্ভূত হইলেন চণ্ডী—তিনি বৌদ্ধ ও শৈবধর্মকে আত্মসাৎ করিয়াই অবতীর্ণ হইলেন, তিনি একদিকে হইলেন শিবের পত্নী, অপর দিকে বৌদ্ধশক্তি বাসুলী ও বৌদ্ধত্রিরত্নের মধ্যমণি ধর্ম, অথচ তিনি পৌরাণিক শক্তির ন্যায় উদ্যমশীলা, তিনি নিতান্ত নিরীহ দেবতা হইলেন না—তাহা তাঁহার চণ্ডী নাম হইতেও বুঝিতে পারা যায়।'[৪] মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়-

১। Buddhist Iconography, op. cit. p. 198.

২। ঐ পৃঃ ৭৪।

৩। সাধনমালা, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বরোদা, সাধনা নং ১৩৬, পৃঃ ২৮০।

৪। চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০।

ভাষী মৃগয়াজীবী সমাজ হইতে বজ্রধাত্বীশ্বরী দেবী বজ্রযান বৌদ্ধদেবায়তনে প্রবেশ করিয়াছেন।[১] তাঁহার মতে বাসুলীও লৌকিক গ্রাম্যদেবতা এবং এই অনার্যাদেবী পরবর্তীকালে বৌদ্ধদেবায়তনে স্থান পাইয়াছেন।[২] চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় পদ হইতে জানা যায় বাসুলী দেবী নহেন, তান্ত্রিক বৌদ্ধদেবী নৃত্যার ডাকিনী বা সহচরী।[৩] আবার কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন বাসুলী ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন। বৌদ্ধদেবী নৃত্যার উপাসনা করিয়া বৌদ্ধসিদ্ধা বা ডাকিনীস্তরে উন্নীতা হইয়াছেন।[৪] যাহা হউক এই সমস্ত কিংবদন্তী ও অনুমান হইতে বাসুলী সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহাতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তাঁহার নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হইতেছে এবং আরো অনুমান করা যায় একদা এই বৌদ্ধ প্রভাবান্বিতা দেবীর সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। জাপানের সপ্তকোটি বুদ্ধমাতৃকা 'চনষ্টীদেবী' এবং চণ্ডীদেবী সম্ভবতঃ সম-ঐতিহ্যবাহী। কারণ জাপানী 'চনষ্টী' এবং সংস্কৃত 'চণ্ডী' একার্থবাচী।[৫] মহাবস্তু গ্রন্থে বুদ্ধদেব অভয়াদেবীর শরণ ও বন্দনা করিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যেও চণ্ডীর এক নাম 'অভয়া', 'অভয়ামঙ্গল' নামীয় চণ্ডীমঙ্গলকাব্যও লিখিত হইয়াছে। সিংহলী ঐতিহ্য মহাবংশেও মঙ্গলগীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন আনন্দোৎসব উপলক্ষে কয়েকদিন ব্যাপী এই গীতানুষ্ঠান পরিচালিত হইত।

ভক্তের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যেই সর্বমঙ্গলা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল।[৬] সুতরাং চণ্ডী আর্য বৌদ্ধ অথবা অনার্য যে সমাজের দেবীই হউক তাঁহার বিশিষ্ট কোন একটি পরিচয় লাভ করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও লৌকিক বিভিন্ন শক্তিদেবতার পরিকল্পনা চণ্ডীদেবীর রূপচিন্তনে যে সহায়তা করিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৯।

২। ঐ, পৃঃ ৩৪৪।

৩। দ্রঃ— শালতোড় গ্রামে অতি পীঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা
ডাকিনী বাসুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, ১৩২৩, ভূমিকা, পৃঃ ১৯।

৪। নব্যভারত: ১২, ২৮৩, (৬ষ্ঠ সংখ্যা)

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ১৯৬২, পঃ ১২৬।

৬। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৪ অধ্যায়।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে চণ্ডীর বিরোধীদলের মুখে শুনা যায়—এই দেবী ডাকিনী, তাঁহার পূজা—অর্চনাও ডাকিনী বিদ্যা। স্বপত্নী-সৌভাগ্যে ঈর্ষাতুরা লহনা ধনপতিকে নালিশ করিয়াছে—

তোমার মোহিনী বালা শিক্ষা করে ডাইনী কলা
নিত্যপূজে ডাকিনী দেবতা।[১]

শিবভক্ত ধনপতি সদাগর ডাকিনী দেবতা চণ্ডীর পূজাবেদী ও মঙ্গলঘট পদাঘাতে বিনষ্ট করিয়া পূজারিণী খুল্লনাকে কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ নারীসিদ্ধাদের 'ডাকিনী' নামে অভিহিত করিতেন। ডাকিনিগণ নানাপ্রকার ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারিণী ছিল। চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী হইতে জানা যায় তাঁহার আরাধ্যাদেবী বাসুলী বৌদ্ধ দেবী নিত্যার সাধনা করিয়া নানা ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারিণী হইয়াছিলেন। এই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার জন্য পরবর্তীযুগে তিনি দৈবত্বে আরূঢ়া হইয়াছিলেন। তান্ত্রিক ডাকিনিগণ তাহাদের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার জন্য সমাজের সাধারণ জনগণের নিকট ভীতির কারণস্বরূপা ছিলেন। স্বভাবতই ভয়ঙ্করী ও উগ্রস্বভাবা দেবীরূপেই তাঁহাদের পদোন্নতি হওয়া সম্ভব। মঙ্গল-কাব্যের চণ্ডীও শান্ত ও কল্যাণরূপিণী নহেন—উগ্রা ও অনিষ্টকারিণী দেবী। তাঁহার পূজাবিধিও সমাজে 'ডাকিনী কলা' নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং 'চণ্ডী' নামধারিণী কোন নারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকসাধনাবলে সিদ্ধান্তরে উন্নীতা হইয়া পরবর্তীযুগে ভক্তগণের ভক্তিপ্রবাহের প্রাবল্যে দেবীতে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন কিনা কে বলিবে? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও বিশেষ শক্তিসম্পন্না কোন ডাকিনী পরবর্তীযুগে মঙ্গলচণ্ডীর সহিত অভিন্না হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।[২]

বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের যুগে আত্মরক্ষার জৈবিক চাহিদা বৌদ্ধদেবদেবীদের মধ্যেও পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই সময়ে বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামরূপে, বুদ্ধাস্থি বিষ্ণুপঞ্জররূপে ও বৌদ্ধ যন্ত্রচিহ্নসমূহ জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের চোখ মুখ নাকরূপে এবং বুদ্ধপদচিহ্ন বিষ্ণুপদচিহ্নরূপে হিন্দুসমাজে গৃহীত ও সমাদৃত হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে বজ্রপাণি বুদ্ধও পিনাকপাণি শিবে পরিণত হইয়াছিলেন। এইভাবে বৌদ্ধ

১। চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫,

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৯।

দেবদেবিগণ হিন্দু দেবদেবীর নামের আড়ালে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। এই নিদর্শন মনসার 'জাঙ্গুলী' নামে এবং চণ্ডীদেবীর 'আগ্যা' ও 'ডাকিনী' নামের আড়ালেও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ভাব-ধারায় সমৃদ্ধ আগ্যাদেবী মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে চণ্ডীদেবীতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টিপত্তন কাহিনী মোটামুটি শূন্যপুরাণ ও নাথসাহিত্যকে অনুসরণ করিয়াছে। আদিদেবের হাস্য হইতে আগ্যার আবির্ভাব।[১] শূন্যপুরাণের আগ্যার ন্যায় তিনিও স্ত্রীআকারবিহীনা নারী। নাথসাহিত্য ও শূন্যপুরাণের অভিনবতাকে অনুসরণ করিয়া এইখানেও আদিদেব ও আদ্যাদেবী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের জন্মদান করিয়াছেন। অবশেষে সপ্তবার জন্মমৃত্যুর পারাপার উত্তীর্ণ হইয়া ঋষিগৃহে নবরূপে নবজন্ম লাভ করিয়া আশ্রমপালিতা আগ্যা শিবকে বিবাহ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন এই ভাবে বৌদ্ধ আগ্যা শিবপত্নী চণ্ডীতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। এই আঙ্গিক বিবর্তনের দ্বারা চণ্ডীদেবীর জীবনায়নকে অনুসরণ করিলেও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সংকেত স্থানে স্থানে আভাসিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা বৌদ্ধশূন্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত। মহাযান সাহিত্যের বিশ্বলোকসৃষ্টি পরিকল্পনা শূন্যপুরাণ ও নাথসাহিত্যের রূপায়বের মাধ্যমে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিপত্তন কাহিনীর পথনির্মিতির নির্দেশ দিয়াছে। মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীর গীতের মধ্য দিয়া সেই ধারা রাঢ় ও বারেন্দ্রের সমস্ত মঙ্গলকাব্যকে অভিসিঞ্চিত করিয়া অষ্টাদশ শতকে কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে ক্ষীণ অস্তিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। কবি মুকুন্দরাম মহাদেবকে 'নিরঞ্জন নিরাকার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দিগ্‌বন্দনায় আদিদেবকে এবং বুদ্ধরূপী জগন্নাথকে তিনি স্মরণ করিয়াছেন।[২] দ্বিজমাধবের কাব্যেও 'পুরুষপ্রধান নিরঞ্জনের' নিঃশ্বাসে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবী গৌরীদেহে বিলীন হইয়াছেন। তাঁহার বিষ্ণুর অবতার বন্দনায় বুদ্ধদেবও স্থান পাইয়াছেন।[৩]

১। হাস্যতে জন্মিঞা আগ্যা পড়ে ভূমিতলে।—মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী,—চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮।

২। বৌদ্ধরূপে বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ১ম ভাগ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, ১৯৫২, পৃঃ ২১।

৩। বুদ্ধ অবতারে প্রভু জগতমোহন। —মঙ্গলচণ্ডীর গীত, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৫২, পৃঃ ৫।

৩। ধর্মমঙ্গল

বাংলাসাহিত্যে ধর্মঠাকুর-সম্পর্কিত রচনাগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধান এবং (২) ধর্মমঙ্গলকাব্য-সমূহ। শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধানে যে বৌদ্ধপ্রসঙ্গের নিদর্শন পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গলকাব্যে তাহা ক্রমহ্রাসমান হইয়া আসিয়াছে।

ধর্মঠাকুর ও বিচিত্রচিন্তা

ধর্মমঙ্গলকাব্যের প্রধান দেবতা ধর্মঠাকুর। তিনি বিচিত্র গুণসম্পন্ন। কাহারো নিকট তিনি কূর্মবাহন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ব্রাহ্মণ্যদেবতা বিষ্ণু, কাহারো নিকট তিনি রজতগিরিনিভ শুভ্রবর্ণ শিব, কাহারো নিকট শ্বেত অশ্বারোহী উজ্জ্বলবর্ণ সূর্যদেবতা, কাহারো মতে তিনি আদিম জনগণের পূজিত অনার্য-দেবতা। আবার কোন কোন পণ্ডিতের নিকট ধর্মঠাকুর বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি—'স্বয়ং বুদ্ধ' যাঁহার প্রতীক বৌদ্ধচৈত্য। এই ভাবে ধর্মঠাকুরের ধ্যান ও চিন্তনে বিভিন্ন ভাবধারার বিচিত্র সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্য, বিশ্বাস ও প্রথা একত্র সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য বাংলা সাহিত্যে ধর্মঠাকুর এই বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কোন্ ঐতিহ্য কোন্ ধর্মের প্রভাবসঞ্জাত তাহা নিরূপণ করাও কষ্টসাধ্য। পর্বতগৃহত্যাগী নানা উপনদী একত্র মিলিত হইয়া সাগরবক্ষে বিলীন হইয়া গেলে সেই বিপুল জলরাশির কতটুকু কোন্ উপনদী-বাহিত তাহা নিরূপণ করা যেমন দুঃসাধ্য তেমনি আজ বহু ঐতিহ্যবাহী সর্বাত্মকধর্মের নির্বিশেষ প্রতিভূরূপে পরিণত ধর্মঠাকুরকেও কোন বিশেষ রূপে চিহ্নিত করা দুরূহ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ধর্মঠাকুর পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণার বিষয়ে পরিণত হইয়াছিলেন। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সর্বপ্রথম এই বিষয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে আনয়ন করেন।[১] এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ধর্মঠাকুরই প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ, ধর্মঠাকুরের পূজার মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণাম চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে।

পরবর্তীকালে স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণও ধর্মঠাকুরকে 'বুদ্ধ'-রূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ধর্মঠাকুরের আড়ালে বুদ্ধদেবই প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজ করিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার Discovery of Living Buddhism in Bengal (Calcutta 1897)

১। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Dec. 1894, 186.

এবং বৌদ্ধধর্ম (১৩৫৫) গ্রন্থদ্বয়ে এই মতকে আরো যুক্তিপ্রমাণদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—পালনৃপতিদের সময়ে রাঢ় অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং সেনরাজত্বকালে রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গে সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গভীরতর হইয়াছিল। কিন্তু পাল ও সেনরাজত্বের পূর্বে সর্বভারতীয় আর্যসভ্যতার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার দরুন রাঢ় অঞ্চলে লৌকিক আর্যেতর সংস্কৃতি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রাক্-আর্য এবং প্রাক-দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক ও পরিপোষক ছিল। ধর্মঠাকুর সেই প্রাক্-আর্য বা প্রাক্-দ্রাবিড় জাতির দেবতা। পরবর্তীযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রসারিত হইলে ধর্মঠাকুরের মূর্তি ও পূজাপদ্ধতিকে তাহা প্রভাবিত করে।[১] ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ধর্ম' শব্দ কূর্ম-বাচক প্রাচীন অষ্ট্রিক শব্দের সংস্কৃতায়িতরূপ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[২] ডঃ সুকুমার সেন ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শুভ্রবর্ণ, শুভ্রঅশ্বারোহী আরোগ্যদেবতা সূর্যের বহুল সাদৃশ্য আহরণ করিয়াছেন।[৩] কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্মঠাকুর সর্বদেবময় হইলেও মূলতঃ বিষ্ণুদেবতা।[৪] পণ্ডিতগণ প্রত্যেকেই যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বুদ্ধ, বিষ্ণু, শিব, যম এবং সূর্যদেবতার সাদৃশ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই মত বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"The Dharmacult is the result of a popular commingling of a host of heterogeneous beliefs and practices ; it will therefore be incorrect to style it purely Buddhistic or Hindu or indigenous either in origin or in nature—it is as much a hotch-potch its origin as it is in its developed form and nature."[৫]

সম্ভবতঃ এই বিচিত্র চিন্তার সমন্বয় হওয়ায় শিল্পসাধকের পক্ষেও তাঁহার কোন নির্দিষ্ট রূপ পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় নাই। কোথাও সুগোল, কোথাও

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৫২৭-৫২৮।

২। B. C. law, Vol. 1, Calcutta, 1945, pp 79-80.

৩। রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, ১৩৫১, 'ধর্মঠাকুরের স্বরূপ', পৃঃ ॥৶—৵

৪। শ্রীধর্মপুরাণ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৩৭, ভূমিকা ১॥

৫। Obscure Religious Cults, op. cit. p 260.

ডিম্বাকৃতি প্রস্তরখণ্ডে আবার কোথাও প্রস্তরখণ্ডের গায়ে পিতলের পেরেকের চক্ষুবিশিষ্ট ধর্মঠাকুরের অবয়ব কল্পিত হইয়াছে। কোন প্রতিমারূপ প্রদান করা সম্ভবপর হয় নাই। অনেকের মতে ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সম্ভবতঃ পৌরাণিক বিষ্ণুদেবতার প্রভাবের ফলে ধর্মঠাকুর বিষ্ণুর অন্যতম অবতার কূর্মের আকৃতিধারীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। অঞ্চল বিশেষে শালগ্রাম শিলা ও বিষ্ণুশিলার সঙ্গে ধর্মশিলাও এক ও অভিন্নরূপে পূজা পাইতেছেন। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ চৈত্যের এবং চৈত্যস্থিত পাঁচটি কুলঙ্গীকে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের প্রতীকরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন।[১]

প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধধর্মসঙ্ঘ—ত্রিশরণমন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তী-যুগে বুদ্ধধর্মসঙ্ঘ—জ্ঞান-কল্যাণ-শক্তির প্রতীকরূপে ত্রিমূর্তি ধারণ করিয়া বৌদ্ধগণের পূজার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। নেপালী বৌদ্ধরা ত্রিরত্নের অন্তর্গত দ্বিতীয় রত্ন ধর্মকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছিলেন। নেপালী বৌদ্ধ শাস্ত্র স্বয়ম্ভূপুরাণে 'ধর্ম' প্রজ্ঞাপারমিতা বা আদিমাতার প্রতীকরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। কালক্রমে বৌদ্ধগণ কেবল বুদ্ধধর্মসঙ্ঘের প্রতীক পূজা করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, ত্রিরত্নকে মানবীয় মূর্তিতে রূপান্বিত করিয়া দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। পণ্ডিত সিদ্ধিহর্ষের সংগৃহীত ধাতব মূর্তিত্রয়ের[২] একটি ধর্মদেবতার প্রতিমা। এইখানে ধর্ম বুদ্ধদেবতার দক্ষিণে পদ্মাসনে চতুর্ভুজা নারীমূর্তিতে উপবিষ্টা। তাঁহার দুই হস্তে পদ্ম ও চক্র, অন্য দুই হস্ত কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষের উপর ন্যস্ত। Cunninghum-এর মহাবোধিচিত্রে দেখা যায় বুদ্ধদেবের বামে সঙ্ঘ ত্রিভুজা নারীমূর্তিতে এবং ধর্ম পুরুষরূপে বুদ্ধদেবের দক্ষিণপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।[৩] এইভাবে সাধকের কল্পলোকবিহারী তত্ত্ব শিল্পীর কল্পনায় দেববাচকতায় উন্নীত হইয়াছে। বৌদ্ধ ত্রিশরণমন্ত্রের এই ক্রমবিবর্তন ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি নির্ণয়ে দিগ দর্শনের কাজ করিতেছে। পালি অভিধানেও বুদ্ধের এক নাম ধম্মরাজ।[৪] অমরকোষ গ্রন্থেও বুদ্ধের ধর্মরাজ নাম স্থান পাইয়াছে।[৫]

ধর্মঠাকুর ও তাঁহার বৌদ্ধ ঐতিহ্য

১। বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।

২। Indian Buddhist Iconography, op. cit. Buddhist Triad, Fig 9, 10, 11, pp 82, 40.

৩। Cunningham's Mahabodhi, p 56, pl. XXVI.

৪। অভিধান প্রদীপিকা, বা পালি শব্দকোষ, জ্ঞানানন্দ স্বামী, ১৩২০, সগ্গকণ্ডো, পৃঃ ১।

৫। সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ—শিবদত্ত সম্পাদিত অমরকোষ, ১৯৪৪, ৭, ২০, ৪০২।

পণ্ডিতগণের মতে রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ও ধর্মপূজাবিধানে ধর্মঠাকুর বুদ্ধদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরবর্তীকালে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্মঠাকুর বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবের আওতার বাহিরে আসিলেও রামাই পণ্ডিতের ধর্মঠাকুর বুদ্ধদেবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছেন। পণ্ডিতগণের মতে ধর্মঠাকুরের 'যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণো'[১] প্রভৃতি ধ্যানমন্ত্রে বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব সূচিত হইয়াছে। 'ধর্মপূজাবিধানে' বলা হইয়াছে ধর্মঠাকুর জলধি তীরে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।[২] সিংহলে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তির স্বীকৃতিও পাওয়া যায়।[৩] বাংলা সাহিত্যের এই ধর্মঠাকুরকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বুদ্ধদেবের সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ ধর্মঠাকুরকে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত বঙ্গের লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের স্তরে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার মতে "৬ষ্ঠ ৭ম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হয়। তাহারই ফলে বুদ্ধদেবকে হিন্দুর দেবতা ধর্মের নামে চালাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। শূন্যপুরাণ প্রভৃতি ধর্মপূজার পদ্ধতি খাঁটি বৌদ্ধও নয়, হিন্দুও নয়, দুয়ের মিশ্রণে প্রস্তুত বঙ্গের লৌকিক পদ্ধতিমাত্র।"[৪] প্রকৃতই ধর্ম সাহিত্যের নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নহেন, তিনি সর্বদেবময় দেবতা এবং সর্বদেবের উপাস্য। তাঁহার পূজা মন্ত্রেও আছে :—

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরং সেবা করে নিরন্তরং।
ইন্দ্র আদি ভজেন্নিত্যং সেই দেব নিরঞ্জনং শ্রীধর্মায় নমঃ।[৫]

মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মঠাকুরকে আদিম জাতির পূজিত সূর্যদেবতারূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে পূজিত ধর্মঠাকুর এবং মানভূম-সিংভূম জেলার অনার্যদেবতা 'ধরম দেওতা'-কে তিনি এক ও অভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 'ডোমরায়' হইতে 'ধর্ম' শব্দ

১। ধর্মপূজাবিধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

২। জলধির তিরে স্থান বোদ্দরূপে ভগবান
হয়্যা তুমি কৃপাবলোকন। ঐ, পৃঃ ২০৮।

৩। ধর্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান।
—শূন্যপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১০৬

৪। ঐ, প্রবেশক, পৃঃ ১৩০।

৫। ধর্মপূজাবিধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯।

ব্যুৎপন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[১] ডোমজাতির সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও নিবিড়। তাহারা যেখানেই গিয়াছে ধর্ম শব্দের প্রায় সমোচ্চারিত শব্দে তাহাদের দেবতার নামকরণ করিয়াছে। যেমন—ধরম, দেবাম, ধর্মেশ ইত্যাদি। তাঁহার মতে—'হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এইদেশে আসিবার পূর্বে ডোমগণ যে নামে এই দেবতার পূজা করিত বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত যুগে সেই নামটিকে একটি বৌদ্ধ বা হিন্দুরূপ দিবার প্রচেষ্টাতেই বর্তমানে 'ধর্ম' বা 'ধর্মঠাকুর' বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়াছেন।'[২] সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আদিম জাতির সূর্যোপাসনাই রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজার মধ্য দিয়া আত্মগোপন করিয়াছে এবং হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবের যুগে ধর্মঠাকুর আভিজাত্যপূর্ণ সংস্কৃতান্বিত 'ধর্ম' নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াও বলা যায় পরবর্তী যুগে বাংলাদেশ যখন বৌদ্ধধর্মদ্বারা নূতনভাবে দীক্ষা গ্রহণ করে তখন বুদ্ধদেবের ঐতিহ্য এবং তাঁহায় ভাবানুসঙ্গ ধর্মঠাকুরের আদিম আবরণের উপর বৌদ্ধভাবধারার অলঙ্করণের কাজ করিয়াছিল। ধর্মঠাকুরের আখ্যায়িকা ও পূজাপদ্ধতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় তিনি 'প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ' না হইলেও একেবারে বৌদ্ধ প্রভাবের বহির্গত হইয়া অবস্থান করিতে পারেন নাই। কালক্রমে তাঁহার কল্পনায় ও পূজাপদ্ধতিতে বৌদ্ধ উপাদান আসিয়া এমনভাবে মিশ্রিত হইয়াছে যে তাঁহার আদিম বিশুদ্ধ প্রকৃতি আর বজায় থাকে নাই। ডঃ শহীদুল্লাহ অনুমান করিয়াছেন ধর্মঠাকুর মুসলমান ধর্ম দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছেন।[৩] যদি ইসলাম আধিপত্যের যুগে তিনি ইসলাম ধর্মদ্বারা, হিন্দুযুগে হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারেন, বৌদ্ধযুগেই বা তাঁহার বিশুদ্ধ প্রকৃতি বজায় থাকিবে কিরূপে? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও স্বীকার করিয়াছেন— 'কালক্রমে এই অঞ্চলে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে, তখন তাহা এই অঞ্চলেই বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়, বর্তমান হিন্দুধর্মের প্রভাবের যুগে সেই ধর্মের উপরেই তাহা পুনরায় নূতন করিয়া হিন্দুধর্মদ্বারা প্রভাবিত হয়। কেহ আবার মনে করেন, কালক্রমে ইহার উপর মুসলমান ধর্মেরও কিছু প্রভাব বিস্তৃত

১। ডেম্‌রায়>ডোম্‌রা>ডোরম্‌>ডোরম্‌>ধরম>ধর্ম।

—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০৮।

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯৯—৬০০।

৩। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থের ডাঃ শহীদুল্লাহ লিখিত ভূমিকা পৃঃ ১২-১৩

হইয়াছিল। ইহার উপর এই বিভিন্নমুখী ধর্মমতের প্রভাবের জন্য এই দেবতা এই অঞ্চলে কখনও বুদ্ধ, কখনও বিষ্ণুরূপে পূজিত হন"।[১] যাহা হউক, ধর্মঠাকুর আদিম জাতির দেবতা হইলেও বৌদ্ধধর্মের এবং পরে হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া আদিম ধর্ম ও হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বিত রূপ লাভ করিয়াছেন। ধর্মঠাকুর 'বুদ্ধ' নহেন, কিন্তু বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রভাবে তিনি 'বুদ্ধরূপী' হইয়াছেন। আবার ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্লাবনের যুগে যখন বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তখন বুদ্ধরূপী ধর্মঠাকুরই কখনও বিষ্ণু, কখনও সূর্য, কখনও শিব ও যম[২]রূপে বন্দিত হইয়াছেন। আবার 'নিরঞ্জন'রূপে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের অভিনব সমন্বয়ের যৌথ বাহনও হইয়াছেন।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যের যুগে ধর্মঠাকুর-এর পূজা ধ্যান ও প্রতীক কল্পনা বৌদ্ধ চিন্তাধারা দ্বারা নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ভাস্কর্যে প্রতিভাত বুদ্ধের প্রতীক চিন্তার প্রভাব ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনাকে পরোক্ষে প্রভাবিত করা অসম্ভব নহে।

বৌদ্ধদের প্রতীকপূজা এবং ধর্মঠাকুরের প্রতীক চিন্তা

ধর্মপূজাবিধানে আছে ধর্মঠাকুর নারী নহেন, পুরুষও নহেন, লিঙ্গমূর্তিও নহেন, তাঁহার হস্তপদ, রূপছায়া কিছুই নাই।[৩] তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত। তাঁহার মূর্তিকল্পনাও সম্ভব নহে।[৪] তিনি নিরাকার, শূন্যরূপ, দেবনিরঞ্জন। কোন বিশেষ মূর্তিতে তাঁহাকে রূপায়িত করা যায় না।

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০০-৬০১।

২। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে তান্ত্রিক দেবতা ধর্মরাজ বা যমের সামান্য সাদৃশ্য হয় তো সন্ধান করিলে পাওয়া যাইতেও পারে। ধর্মরাজ বা ধর্মপাল অষ্ট ভয়ঙ্কর দেবতার অন্তর্গত। তিনি উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধধর্মের রক্ষক এবং বোধিসত্ত্বের সমপর্যায়ের দেবতা। বৌদ্ধধর্মের সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি নির্দয়ভাবে যুদ্ধরত। তিনি মৃত্যুর দেবতা রূপেও স্বীকৃত। তাঁহার বক্ষ চক্র লাঞ্ছিত, তাঁহার সহচরী ভগ্নি যমী। মনুষ্যদেহী যমের ষষ্ঠহস্তের দুই হস্ত উর্ধ্বে প্রার্থনাভঙ্গীতে ন্যস্ত। পদ্মসিংহাসনে তিনি অধিষ্ঠিত। দ্রঃ—Getty, The Gods of Northern Buddhism, 1914, p 185. pl. XLVII.

৩। ওঁ অধো ন উর্ধ্বং শিবো ন শক্তি।
নারী ন পুরুষো ন চ লিঙ্গমূর্তিঃ॥
হস্তং ন পাদং রূপং ন ছায়া।
তস্মৈনমস্তে নিরঞ্জনায়॥ —ধর্মপূজাবিধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।

৪। নাস্তি রূপং নাস্তি দেহং নাস্তি কায়ো নিনাদং।
নাস্তি জন্ম নাস্তি মূর্তিস্তস্মৈ শ্রীধর্মায় নমঃ॥
—ঐ পৃঃ ৯০।

এইজন্য বিভিন্ন প্রতীকের মধ্য দিয়া তিনি ভক্তগণের পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন, মানবীয় মূর্তিতে কোথাও আত্মপ্রকাশ করেন নাই। বৌদ্ধ ভাস্কর্যেও এই প্রতীক-প্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক-কালে তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রথা প্রচলিত ছিল না। বৌদ্ধসাহিত্যে পাওয়া যায় ভগবান শাক্যসিংহ মাতৃসন্দর্শনে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমনোদ্যোগী হইলে রাজা প্রসেনজিৎ গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা তাঁহার একটি মূর্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে প্রত্যাগত শাক্যসিংহ মূর্তিটিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি আমার পরিনির্বাণের পরে আমার চতুর্বর্গ শিষ্যের আদর্শ ও পূজ্য হইবে।[১] সুতরাং তাঁহার সমসাময়িককালে বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজা স্থান পায় নাই। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর পূত চিতাভস্মের উপর প্রতিষ্ঠিত স্তূপ বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র ও পূজার্হরূপে চিহ্নিত হইয়াছিল।

মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে স্তূপ, স্তম্ভ, হস্তী, অশ্ব, ষাঁড় এবং সিংহমূর্তি শিল্পে প্রাধান্য পাইয়াছিল। তখনও তাঁহার ধর্মের অম্লান জ্যোতিই মানুষের পথপ্রদর্শক। মূর্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করার প্রথা তখনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু কেবল স্তূপমূলে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া ভক্ত-হৃদয়ের পিপাসা বেশী দিন মিটে নাই। তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায় পরবর্তীযুগে তাঁহার দেহাবশেষ, বোধিবৃক্ষ, চরণচিহ্ন, উষ্ণিষ, বজ্রাসন এবং ত্রিরত্নকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আরম্ভ করে। ভারহুত ও সাঁচীর স্তূপের তোরণগাত্রে এবং বুদ্ধগয়ার শিল্পে উৎকীর্ণ চিত্রে ধর্মচক্র, বজ্রাসন, পদচিহ্ন, স্তূপ এবং ত্রিরত্ন প্রভৃতি বুদ্ধদেবের প্রতীকরূপে তাঁহার উপস্থিতির ইঙ্গিত বহন করিয়া ভক্তহৃদয়ের পূজার্ঘ্য আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া হস্তী, সিংহ, হরিণ, অশ্ব প্রভৃতিও ভগবান বুদ্ধের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনার প্রতীকরূপে শিল্পীর কল্পনার উদ্বোধন করিয়াছে। বোধিবৃক্ষতলে বজ্রাসন শাক্যসিংহ গৌতমের 'সম্বোধি' লাভের প্রতীক। ভারহুত্‌শিল্পে এই মহত্তম চিত্র একটি বৃক্ষতলে ঘনক্ষেত্রাকার নিরেট পাথরে প্রস্তুত একটি শূন্য আসন দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।[২] এই শূন্য আসন বুদ্ধদেবের দৈহিক উপস্থিতির প্রতীক। অবশ্য কালের পরিবর্তনে কেবল প্রতীকের মাধ্যমে বুদ্ধদেবের মহান্ আবির্ভাবকে চিহ্নিত করিবার চিরাচরিত

১। Beal, Travels of Fah-Hian and Sung-Yun 1869, pp.75-76

২। Barua, Bharhut, Book III, 1937, picture no. 30, 31, 32, 46, 48, 51, 69. etc.,

প্রথা শিল্পী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে শিল্পীর তুলির রেখায় রেখায় তাঁহার করুণাঘন মূর্তি রূপায়িত হইয়াছিল।

বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতীক পূজার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের রূপচিন্তনের কতকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুর করচরণহীন, আদিমধ্যবিহীন. রূপরেখার অতীত 'নির্বাণশূন্য'। এই দেবতাকে শিল্পী তুলির রেখায়, প্রস্তরখণ্ডে বা ধাতুর পিণ্ডে কিভাবে রূপায়িত করিবেন? এই দুরূহ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় নাই বলিয়াই ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তিও আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয় নাই।[১] ধর্মঠাকুরের পূজারিগণও বৌদ্ধউপাসক-উপাসিকাদের ন্যায় প্রতীক পূজাকে স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। ধর্মঠাকুর বহুরূপী—কোথাও সুগোল, কোথাও ডিম্বাকৃতি, কোথাও প্রস্তরখণ্ডের গায়ে পিতলের পেরেকের চক্ষুবিশিষ্ট। কোন কোন মতে তিনি স্তূপাকৃতিতে ধরা দিয়াছেন। এই মতে স্তূপের গায়ের চারিদিকে ৪টি ও মাঝখানে ১টি কুলঙ্গি পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধির প্রতীক। স্তূপাকৃতি ধর্মঠাকুর কতকটা কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। এইভাবে ধর্মঠাকুর ও কচ্ছপ এক হইয়া ধর্মঠাকুর 'কালাচাঁদ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। পরবর্তীযুগে কচ্ছপাকৃতি স্তূপ শিলায় পরিণত হইয়া ধর্মঠাকুর ধর্মশিলায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। ধর্মঠাকুরের এই অবয়বচিহ্নবিহীন, 'লেপামোছা' শিলামূর্তি তাঁহার নৈর্ব্যক্তিক উপস্থিতির প্রতীকরূপে বৌদ্ধ প্রতীকপূজার প্রভাব স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং ধর্মঠাকুরের রূপকল্পনা বৌদ্ধশিল্পের প্রতীকদ্যোতনাকে সাঙ্গীভূত করার সার্থক পরিচয় বহন করিতেছে।

মঙ্গলকাব্যসমূহে অবসিতপ্রায় বৌদ্ধযুগের নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে।

অহিংসার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

বাঙালী সমাজে তখনও পশুহত্যা-বিরোধী মনোভাব জাগ্রত ছিল। এইজন্য ধর্মঠাকুরের পূজায় নিরপরাধ পশুপক্ষী বলি দিবার কৈফিয়ত দিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন, বালখিল্য মুনিপুঙ্গগণের প্রতি করুণাপরবশ দেবী অন্নপূর্ণা ওদন পরিবেশন করিতেছিলেন।

১। Archaeological Survey of Mayurbhanja, 1911, p. XCVI গ্রন্থে স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ধর্মঠাকুরের একটি প্রতিমা পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৫২ নং মূর্তি)। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বসু মহাশয়ের উল্লেখিত এই প্রতিমাকে ধর্মঠাকুরের প্রতিমারূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই। তাঁহার মতে এই প্রতিমা স্থানীয় কোন লৌকিক দেবতার—বুদ্ধ ও পৌরাণিক বিষ্ণুর সমন্বয়ে গঠিত মূর্তি।

—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৩২

এই সময় মুনিপুত্রদের অসংযত আচরণে ক্ষুব্ধ দেবী তাহাদের প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন—

দুর হ রে পশুর অধম মূর্খগণ।
ছাগ পশুকুলে গিয়া জন্মহ সকলে॥
... ...
হইবে তোদের বলি মম সম্মুখেতে॥
ডাকিনী যোগিনী পান করিতে শোণিত।
নিরখিলে নয়নে হইব হরষিত॥[১]

সুতরাং এ হেন ছাগ বলিতে কোন দোষ থাকিতে পারে না। এইজন্যই—

বিধান রহিল আজ হইতে জগতে।
দেবী পূজায় ছাগ বলি রাজসিক মতে॥[২]

সম্ভবতঃ এইভাবে ব্রাহ্মণ্য পশুবলি এবং বৌদ্ধদের সর্ব জীবের প্রতি করুণা দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে।

ধর্মঠাকুরের পূজারীদের মধ্যে ডোম, চাঁড়াল, ধোপা, বারুই প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। উচ্চতর সমাজে ধর্মঠাকুরের পূজা নিন্দনীয় ছিল, এমন কি ধর্মপূজা করিলে জাতিচ্যুত হইবার ভয়ও ছিল। নিম্নশ্রেণীর জনগণের প্রতি ধর্মঠাকুরের পক্ষপাতিত্ব এবং ধর্মপুরোহিতদিগের সমাজভীতি প্রমাণিত করে ধর্মপূজারিগণ বৈদিক ও পৌরাণিক ঐতিহ্য অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত আদিম ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অধিকতর আনুগত্য প্রদান করিতেন। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও অনুমান করিয়াছেন—'যেখানে ধর্মঘরে যোগী ধর্মঠাকুরের পূজারী, সেখানে ধর্মঠাকুর এখনও বৌদ্ধই আছেন কেননা, এই যোগী পূজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন না। কিন্তু যেখানে অন্য জাতি পূজারী, সেখানে ধর্মঠাকুর হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণে তাঁহার পূজা করেন, অন্ততঃ পূজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন।" ৩

৪। শিবমঙ্গল

সৃষ্টির আদিযুগে নানাবিধ দুর্যোগ, ঝঞ্ঝাবাত হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ আর্য পিতামহগণ প্রকৃতির বিপরীত শক্তির মধ্যে এক অমঙ্গলকারী দেবতার

১। শ্রীধর্মপুরাণ, ময়ূরভট্ট, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৩৭, পৃঃ ১৩৬।
২। ঐ, পৃঃ ১৩৭।
৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৬, ১ম সংখ্যা, সভাপতির অভিভাষণ।

আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বৈদিক রুদ্র সেই দেবতা, তিনি ধ্বংসের ও ক্রোধের প্রতিমূর্তি। প্রকৃতির উন্মত্ত রণতাণ্ডবে তাঁহার প্রকাশ। এই প্রলয়ের দেবতা রুদ্রের প্রসন্নতাবিধানের জন্য অনলে আহুতি প্রদান করার প্রথা হইতে রুদ্র উপাসনার উৎপত্তি। বৈদিক রুদ্র উপাসনা ক্রমপরিণতির নানা স্তরপরম্পরা উত্তীর্ণ হইয়া সুন্দর ও কল্যাণমন্ত্রের উদ্‌গাতা 'শিব'-এ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

বৌদ্ধ ঐতিহ্যে শৈব সম্প্রদায়ের পূর্বাভাস

সম্ভবতঃ প্রাচীন পালি সাহিত্যে উল্লেখিত জটিল সম্প্রদায়ের[১] জীবনচর্যা ও ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে রুদ্র উপাসনার একটি স্তর আভাসিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কালে উরুবেলায় তিনজন জটিল ধর্মগুরু ছিলেন—উরুবেলা কশ্যপ, নদীকশ্যপ এবং গয়াকশ্যপ। উরুবেলা পঞ্চশত, নদী তিন শত এবং গয়া দুইশত জটিল সন্ন্যাসীর গুরু, আচার্য ও নেতারূপে স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের উপাসনাগৃহে পবিত্র যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। একটি ভয়ঙ্কর নাগরাজ এই উপাসনাগৃহে সম্ভবতঃ এই অগ্নির সংরক্ষকরূপে অবস্থান করিত। ভগবান বুদ্ধ আপন সিদ্ধিবলে নাগরাজের কালাগ্নিকে জয় করিয়া নাগরাজকে ভিক্ষাপাত্রে বন্দী করিলেন। ভগবান উরুবেলা কশ্যপকে আরো দশটি ইদ্ধি বা অপ্রাকৃত ক্ষমতাও প্রদর্শন করিলেন। অবশেষে উরুবেলা এবং তাঁহার দুইভ্রাতা নদীকশ্যপ ও গয়াকশ্যপ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের এক হাজার অনুগামী শিষ্যও তাঁহাদের দীর্ঘ জটাজূট মুণ্ডন করিয়া যজ্ঞ সামগ্রী নদীতে ভাসাইয়া দিলেন এবং ভগবানের নির্দেশে পরিপূর্ণ দুঃখমুক্তির সাধনায় রত হইলেন। মহাবগ্‌গের অনুরূপ ঘটনা 'উদান'[২] গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

'জাতকথবন্ননা' এবং 'অপদান' গ্রন্থেও জটিলদিগের সন্ন্যাস-জীবনের বর্ণনা আছে। জটিলগণ জটাজূটধারী তপস্বী সম্প্রদায়। তাঁহারা পরিব্রাজকের ন্যায় কোন নায়ক বা অগ্রবর্তী তপস্বীর অধীনে দলবদ্ধভাবে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতেন। তাঁহারা নৈষ্টিক ও কৃচ্ছ্রতাপ্রিয় ছিলেন। সুব্যবস্থিত জীবনযাত্রা, একতা বিন্যাস এবং সঙ্ঘ সংগঠনে তাঁহাদের কৃতিত্ব আছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিয়ুন সাঙ-এর বিবরণ হইতেও জানা যায় গয়া, নদী এবং উরুবেলায় তখন দশ সহস্র জটাজূটধারী ভস্মাচ্ছাদিতকায় দিগম্বর ও সর্বত্যাগী শিবোপাসক সন্ন্যাসী

১। বিনয় মহাবগ্‌গ, ১ম খণ্ড, পি. টি. এস. ২০, ১৫, পৃঃ ৩১।

২। 'সম্বহুলা জটিলা সীতাসু হেমন্তিকাসু রত্তিসু অন্তরট্ঠকে হিমপাতসময়ে গয়ায়াং উম্মুজ্জন্তি পি নিমুজ্জন্তি পি উম্মুজ্জনিমুজ্জং পি করোন্তি ওসিঞ্চন্তি পি" —উদান, পি. টি. এস., পৃঃ ৬

ছিলেন। শৈবসম্প্রদায় জটিলদিগের জীবনচর্যা ও ধর্মানুষ্ঠান আনুপূর্বিক অনুসরণ করে নাই। কিন্তু রুদ্র উপাসনার সঙ্গে জটিলদের সাধনার সাদৃশ্য রহিয়াছে। জটিলগণ অগ্নি উপাসক, কালনাগ এই অগ্নির সংরক্ষক। নাগ শিবোপাসনায়ও বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। নাগ তাঁহার জটা-ভূষণ, আবার যজ্ঞোপবীতের ন্যায় অঙ্গভূষণও। মহাকাল রুদ্রের জটায়ও অগ্নির লেলিহান শিখার সঙ্কেত। শৈব-সন্ন্যাসী ও জটিলদিগের ন্যায় জটাজূটধারী, কঠিন কৃচ্ছ্রতা তাঁহাদের ব্রত। লিঙ্গায়েৎ বা বীর শৈব সন্ন্যাসী সম্প্রদায় জটিলদিগের ন্যায় চিরকুমার ব্রতধারী। আহারাদি বিষয়ে সংযত, মঠে অবস্থানকারী। সম্ভবতঃ বৈদিক রুদ্র বিবর্তনের পথে পালি সাহিত্যের জটিল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি স্তর বিশেষের নির্দেশ দান করিয়া চরম পরিণতিতে শৈব সম্প্রদায় বিশেষের আরাধ্য দেবতারূপে পরিগণিত হইয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধ সাহিত্যে শিবের মূল্যবোধ বহু প্রাচীন কাল হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে। জাতকে ও মিলিন্দ প্রশ্নে শিব স্থান পাইয়াছেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতেও শিব-শিবানী উপস্থাপিত হইয়াছেন।

বাঙলার ও বাঙালীর অধ্যাত্মজীবনের এক বিরাট ও বিচিত্র প্রেক্ষাপটে দেবাদিদেব শিবের আবির্ভাব। তাঁহার পরিণাম এবং অনুধ্যান কেবল তুলনা-রহিতই নয়, বাঙালীর নবীন জীবন-চেতনা ও শিল্পবোধের নিঃসংশয় পরিচায়কও বটে। দেবাদিদেব শিবের ব্যাপক ইতিহাসের আঙ্গিক বিবর্তনে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সাধনার স্বতঃউৎসারিত প্রবাহ সাহায্যকারী হইয়াছিল। কৌম, বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিক সাধনার সমন্বয়ের ফলে বৈদিক শৈব সাধনা রূপান্তরিত হইয়াছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য শৈব সাধনার মধ্যে বিচিত্রমুখী এই উপাদানের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ও অনার্য—এই সকল ধর্মমত হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বাঙলার লৌকিক শৈবধর্ম এক অভিনব সঙ্করূপ পরিগ্রহ করিল।[১]

সাহিত্য ও ভাস্কর্যে শিব ও বুদ্ধের সমন্বয়

বৈদিক শিব একাধারে ধ্বংসের ও আনন্দের—চরম মৃত্যু ও পরম সৌন্দর্যের দেবতা, অনাসক্ত স্রষ্টা। তিনি মৃত্যু ও ধ্বংসের নর্তনানন্দে মাতোয়ারা আত্মভোলা বিশ্বপতি। বুদ্ধ ত্যাগ, সংযম ও প্রশান্তির প্রতীক। তিনি জ্ঞান সমাধিতে স্থিতধী, চিন্ময় দেহ, লোভ ও মোহ, কাম

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭।

ও ক্রোধ, আনন্দ ও নিরাশা সকল ভাবলেশহীন। তাঁহার অর্ধ-নিমিলিত চক্ষে স্থির নিস্পন্দ চাহনি,—নিবিড় শান্তিময় অধ্যাত্মরাজ্যের প্রদীপশিখার ন্যায় তাহা প্রসন্ন ও ভাস্বর। এক অপার্থিব নিশ্চেষ্টতায় নির্বিকল্প প্রতিমা। এই শিব ও বুদ্ধের মিলিত আদর্শে পরবর্তীকালে যে সর্বাত্মক প্রতিমা নির্মিত হইল তিনি হইলেন—আশুতোষ, প্রসন্ন হাস্যে নিখিল ভয়হরণ, যোগীশ্রেষ্ঠ, এবং বিগতস্পৃহ। বিশ্বের হিতার্থে কাল বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া তিনি নীলকণ্ঠ এবং সর্বত্যাগী মহাভিক্ষু। অর্ধ চন্দ্রের জ্যোতির স্ফুরণে তাঁহার ললাট পরিমার্জিত। তিনি একাধারে ত্যাগ ও ভোগ, সংযম ও আসক্তি, প্রেম ও বিরাগ দুইকে ধারণ করিয়া লইলেন। এই সর্বাত্মক পরিপূর্ণতার নিকট বৌদ্ধ-ধর্মকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। বুদ্ধের গরিমা ও ঔজ্জ্বল্য বরণ করিয়া শিব মানবহৃদয়কে জয় করিয়া লইলেন। অচিরকাল মধ্যে আবার বৌদ্ধ-ধর্মের পরিবর্তে শৈবধর্মের জয়ধ্বনিতে ভারতবর্ষের দিগ্‌বলয় প্রতিধ্বনিত হইল।

বুদ্ধের গুণাবলী শিবে আরোপিত হইবার পর শিবে ও বুদ্ধে বিশেষ আর তারতম্য রহিল না। প্রসন্ন শিবমূর্তি ও প্রশান্ত বুদ্ধমূর্তি প্রায় সমঐতিহ্যবাহী। বুদ্ধ ঐতিহাসিক পুরুষ, গিরিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে শাক্যরাজবংশে তাঁহার জন্ম। শিব ভারতীয় ধর্মৈষণা এবং কল্পনাশক্তির সামগ্রিক উৎকর্ষের পরিচয়বাহী। হিমাদ্রিশিখরে কৈলাস শৃঙ্গে তাঁহার অবস্থান। বুদ্ধদেব ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ—রাজসিংহাসন হেলায় পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসের রুক্ষ জীবন ও কৃচ্ছ্রতার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। শিব দেবাদিদেব, দেবী অন্নপূর্ণা তাঁহার গৃহিণী, রাজরাজেশ্বর হইয়াও অমৃতের প্রতি তিনি অনাসক্ত। বিশ্বের জরাব্যাধি, মৃত্যুশোক বুদ্ধদেবের হৃদয়ের করুণার জাহ্নবী ধারাটিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। এই জন্যই জাগতিক দুঃখের বিষ-কণ্টক উন্মোচনের পথে বিশ্বভিষক বুদ্ধের মহান্ যাত্রা। শিব সমুদ্র মন্থনজাত বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া সমগ্র বিশ্বকে বিষ দাহন হইতে রক্ষা করেন। বুদ্ধ মারজিৎ, মহাদেব কন্দর্পবিজয়ী। শিবের ঐতিহ্য যুগযুগান্তরের, বুদ্ধ তরুণ ভিক্ষু, মহত্তম অর্হৎ। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় বুদ্ধ ও শিবের এই তুলনা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—'বুদ্ধ ভিক্ষু—শিব ভিক্ষু, বুদ্ধ উপদেষ্টা, কৈলাশ শিখরে সমাসীন শিবও উপদেষ্টা! বুদ্ধ মারজয়ী—শিব কামভস্মকারী, বুদ্ধ নির্বাণালোক-প্রাপ্ত যোগী—শিব নির্বাণকল্প সমাধিমগ্ন, বুদ্ধ জগতের দুঃখে দুঃখী—শিব জগৎ

উদ্ধারের জন্য কালকূট ধারণ করিয়াছেন। তরুণ বুদ্ধ-বনাম যুগযুগান্তের বৃদ্ধ শিব।'[১] বুদ্ধদেবের প্রভাবে মহাদেব ভিক্ষুর কৃচ্ছ্রতা ও ইন্দ্রিয় সংযম, ত্যাগ ও প্রশান্তি, ধ্যানতন্ময়তা ও নির্বাণকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। শিব এখন আর কেবল ধ্বংস ও সৃষ্টির আনন্দে মাতোয়ারা আত্মভোলা নটরাজ নহেন, বুদ্ধের ঐতিহ্যকে বরণ করিয়া বেদের রুদ্র হইয়াছেন—শান্ত, সমাহিত, স্থিতধী আশুতোষ। শ্মশানবিহারী প্রমথনাথ হইয়াছেন জগৎভিখারী। বোধি-বৃক্ষমূলে ধ্যানী বুদ্ধ এবং বিল্বমূলে ধ্যানী শিবে বিশেষ কোন তারতম্য নাই।

বুদ্ধ ও শিব জ্ঞানরাজ্যের দুই অধীশ্বর। খৃঃ অষ্টম-নবম শতাব্দীতে শিব বুদ্ধের অনুধ্যানে বাঙালীর চিত্ত ব্যাপিত ছিল। দুই-ই বাঙলা দেশে সর্বাত্মক জনপ্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ সমাধির নিশ্চেষ্টতাকে বর্জন করিয়া বুদ্ধকে শিব অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ ধ্যানমগ্নতাকে বর্জন করিয়া পরবর্তীকালে বাঙালীর শিব জ্ঞানের রাজ্য হইতে প্রেমের রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন। পরিণামে বৌদ্ধ ভাবসমাধির হিমাদ্রিশিখর হইতে হরগৌরীর দাম্পত্য লীলার বা গার্হস্থ্য প্রেমের মধুর প্রাণধারা বাঙলা দেশে প্রবাহিত হয়। বৌদ্ধধর্মের চরম প্রতিক্রিয়ারূপে নূতনতর জীবনবোধের যুগাকাঙ্ক্ষা শৈবধর্মের এই ব্যাপক অনুবর্তনে সহায়তা করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের নিবৃত্তিমূলক সাধনা, দুঃখ পরিহারের বাণী, শূন্যবাদ এবং নির্বাণ মানবমনের চিরন্তন চাহিদা পূর্ণ করিতে পারে নাই। বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে ব্যাপক সন্ন্যাসধর্মের হোতা।[২] বুদ্ধদেবের বিরাট্ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে বিপুল সংখ্যক তরুণ সেইদিন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া রাজা ও রাজপুত্র, ধনভাণ্ডার তুচ্ছ করিয়া সার্থবাহ ও শ্রেষ্ঠিগণ, গৃহধর্ম বর্জন করিয়া গৃহস্থ নরনারী বৌদ্ধ সঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গৈরিক বসনের উজ্জ্বল আভায় ভারতের আসমুদ্র হিমাচল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। এইভাবে ভারতের চিরন্তন গার্হস্থ্য ধর্ম—স্ত্রীপুত্রকন্যা ও আত্মীয় পরিবৃত সংসারধর্ম সাময়িকভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। শৈব-ধর্মের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের এই আঘাত সহ্য করিয়া আবার গার্হস্থ্য

১। বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, ১৩৪১, পৃঃ ১৯৬-৯৭।

২। দীঘনিকায়ের (১ম খণ্ড) অন্তর্গত সামঞ্ঞ ফলসুত্তে শ্রামণ্যধর্মাদর্শের বিবিধ সম্ভাবনা সূচিত হইয়াছে।

ধর্মের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবরশ্মিকে পরিম্লান করিয়া পরবর্তিকালে বাঙলাদেশেও শৈব ধর্মের এই বিজয় যাত্রা শুরু হইয়াছে।

শৈবধর্মে শিব অর্ধ গৃহী, অর্ধ তাপস। বুদ্ধদেব স্থির অচঞ্চল, প্রাণের অন্তর্নিহিত ভাবের গভীর অনুধ্যানে শান্ত সমাহিত ও অনাসক্ত। ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় পৃথিবীকে আহ্বান করিলেও পৃথিবীর ঊর্ধ্বলোকে তাঁহার অবস্থান। শিব সমাধিস্থ অবস্থায় হিমাদ্রিসদৃশ মহান্, অঙ্গে যোগবিভূতি, কণ্ঠে হাড়মালা, মস্তকে ভয়ঙ্করী গঙ্গা, জটাজূটে কালনাগের বিস্তৃত ফণা। কিন্তু তিনি আদর্শ গৃহীও—জগন্মাতা অন্নপূর্ণা তাঁহার গৃহিণী, পরম স্নেহে মমতায় সর্বংসহা জননী শিবের সংসারে অমৃত বিতরণ করিতেছেন। আবার কখনও তিনি অর্ধ-নারীশ্বর, কখনও আপন উরুতে সুখাসীনা গৌরীর মুখমণ্ডলে আবদ্ধদৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে প্রেম ও শান্তি যেন বিগলিত হইয়া পড়িতেছে। এইভাবে শিব শান্ত ও অনন্তের, জ্ঞান ও প্রেমের, গৃহ ও সন্ন্যাসের, ত্যাগ ও ভোগের বিচিত্র ব্যাপ্তিময় ঐতিহ্যকে একাই ধারণ ও বহন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনে স্নেহ, প্রেম ও আসক্তির স্থান ছিল না। শৈব সাহিত্যে মানবিক প্রেম ও আসক্তি অধ্যাত্মমহিমামণ্ডিত হইয়া পূর্ণায়ত জীবনধর্মের ঐতিহ্যে প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শিব বৃষবাহন। বৌদ্ধশিল্পে বৃষকে বুদ্ধের প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ মাতৃকাদেবীদের শিব নির্বিচারে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছেন। 'তারা' শিবপত্নীরূপে গৃহীতা হইয়াছেন। বৌদ্ধদেবী বজ্রযোগিণী ছিন্নমস্তারূপে দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত হইয়া দুর্গার প্রকারভেদরূপে পরিচিতা হইয়াছেন। শিবকে স্বামীরূপে লাভ করার জন্য 'অপর্ণা' একটি মাত্র পর্ণ-আহারী তপস্বিনী। বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরীও পর্ণপরিহিতা। বৌদ্ধ নীলতারার সঙ্গেও শিবের ঘনিষ্ঠতা আছে। নীলতারা নীলবর্ণা উগ্রা দেবী, শিবও নীলকণ্ঠ, ফণিভূষণ।

কেবল বুদ্ধ প্রতিমাই যে শিবমূর্তিকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা নহে। শিব প্রতিমাও বৌদ্ধ প্রতিমাশিল্পকে অগ্রগমনের পথে সহায়তা করিয়াছে। বরিশালে প্রাপ্ত লোকেশ্বর শিব মূর্তি[১] শিববুদ্ধ দ্বৈত সত্তার সর্বাত্মক সমন্বয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই প্রতিমায় শিব ও বুদ্ধ এক দেহে গভীরতর অনুভূতিতে তদ্‌গত চিত্ত। তাঁহার হস্তে অক্ষমালা এবং ত্রিশূল। মহাস্থানের

১। **History of Bengal, Vol. I, op. cit,** গ্রন্থে সংযোজিত ১৫৫ নং চিত্র।

মঞ্জুশ্রী প্রতিমার জটাজুটে শিবমূর্তির অনুকরণে গঙ্গার ভূমিকায় ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য স্থাপিত হইয়াছেন।[১] ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত হেরুক প্রতিমা ভৈরব রুদ্রের ঐতিহ্য ও মণ্ডন কলাকে অনুসরণ করিয়াছে।[২] লোকেশ্বর প্রতিমা কেবল মহাদেবের শিল্প শৈলীকেই অনুসরণ করে নাই, দুই দেবতার অর্চনা এবং ধ্যানধারণাও পরস্পরনির্ভর।[৩] হেরুক এবং কাল ভৈরবরূপী নটরাজ প্রতিমায় শিল্পী যেন একই অনুভূতিকে ব্যঞ্জিত করার সাধনায় আত্মলীন। এইজন্য হেরুকও নীলবর্ণ ভস্মোদ্ধূলিতগাত্র, শতার্ধমুণ্ডমাল্যধারী, ঈষদ্দংষ্ট্রাকরাল, রক্তনেত্র এবং কর্ণকুণ্ডলধারী।[৪] তিনিও শবের উপর বামপদ স্থাপন করিয়া, দক্ষিণপদ বামপদের উরুতে ন্যস্ত করিয়া শিবের ন্যায় নৃত্যরত।[৫] বৌদ্ধদের নীলকণ্ঠ লোকেশ্বর এবং হলাহল লোকেশ্বর শিবমহিমার প্রতি তাঁহাদের একান্ত শ্রদ্ধার নিদর্শন। দিনাজপুরে প্রাপ্ত ত্রিমূর্তি[৬] প্রতিমা শিল্পে এক গভীরতর অনুভূতির ঐতিহ্যবাহী। এই সদাশিব প্রতিমায় ত্রয়ীসত্তা পরমাত্মীয়তার সীমাকে অতিক্রম করিয়া অখণ্ড সামগ্রিকতা ও সার্বিকতার সৃষ্টি করিয়াছে। বুদ্ধদেবের বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ[৭] শিবের প্রভাবে বিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের কুঞ্চিতকেশধামে আবৃত উচ্চ ব্রহ্মতালু বা উষ্ণিষ শিবের মস্তকে উচ্চ জটাজুটে পরিণত হয়। বুদ্ধদেবের কপালের উর্ণা শিবের তৃতীয় নেত্রে পর্যবসিত হয়। বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের মস্তকে অমিতাভ বুদ্ধ অধিষ্ঠিত, শিবের জটাজুটে সুরধুনী গঙ্গা বিধৃত। কবিকণ্ঠে শিববুদ্ধের এই ঐকতান ধ্বনিত হইয়াছে—

বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবা স ভগবাংস্ তস্মৈ নমস্কুর্মহে।—(ভক্তিশতক)

এইভাবে সাহিত্যে, শিল্পে এবং ধর্মীয় চিন্তায় শিব ও বুদ্ধ পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছে।

১। ঐ গ্রন্থে সংযোজিত ১১১ নং চিত্র।

২। ঐ গ্রন্থে সংযোজিত ৫৯ নং চিত্র।

৩। লোকেশ্বর বুদ্ধের ধ্যান প্রায় শিবের ধ্যানের অনুরূপ। যথা—

চতুর্ভুজম্ ত্রিনেত্রশ্চ চন্দ্রাঙ্কিত—জটাধরঃ।
সর্পাভরণসংযুক্তঃ শ্বেতবর্ণঃ লোকেশ্বরঃ।

৪। Indian Buddhist Iconography, op. cit, p. 156.

৫। ঐ, ১২৫ নং চিত্র।

৬। History of Bengal, Vol. I, op. cit গ্রন্থে সংযোজিত ১৭৮ নং চিত্র।

৭। লকখণসুত্তন্ত, দীঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, পি. টি. এস. ১৪২-১৭৯।

বৌদ্ধধর্মের চরম প্রতিক্রিয়ার প্রতীক কৃষকরূপী শিবঠাকুর। বৌদ্ধধর্মের কৃচ্ছ্রতা ও বৈরাগ্যের প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গার্হস্থ্যধর্ম নবরূপে বাঙালীর চিত্তকে দখল করিয়া লইয়াছিল। হরপার্বতীর কোন্দল, গৃহলক্ষ্মী উমার সর্বংসহা মূর্তি বাঙালীকে নব প্রেরণা দান করে। অনাসক্ত ধ্যানী শিবকে বাঙালী কবি কৃষকবেশী শিবে রূপান্তরিত করিয়া বৌদ্ধধর্মের চরম পরিণতির নিদর্শন রাখিয়াছেন।

শিবচরিত্রের ক্রম-বিকাশে বৌদ্ধ-চিন্তাধারার প্রভাব

শাক্যপুত্র গৌতম সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর শিব কৈলাসশিখরে গৌরীকে আগম-নিগমের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া তাঁহার গার্হস্থ্য কর্তব্যে রত রহিলেন। কারণ স্ত্রী ব্যতীত ধর্মচর্চা অপূর্ণ। কৃষক-বাগ্‌দী হইতে কোঁচ-শাঁখারী প্রভৃতি আপামর বাঙালীর প্রাণের দেবতারূপে সুখ-দুঃখের সমব্যথীরূপে বাঙলা মঙ্গলকাব্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের চরম অবহেলায় দেশের অনভিজাত জনগণ এক সময়ে বৌদ্ধধর্মের ছত্রছায়া-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির অবসানে আবার শৈবধর্মের পতাকাতলে তাহাদের স্থান হইল। শিব যখন কোঁচদের উপাস্য দেবতারূপে গৃহীত হইয়াছেন তখনও তিনি বৌদ্ধ সংসর্গ বর্জন করিতে পারেন নাই। তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় কোঁচদিগের মহাকাল মন্দিরের অধ্যক্ষপদে বৌদ্ধ লামা নিয়োগে।[১]

মানবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলনের ভাবমূর্তিরূপেও বাংলা মঙ্গলকাব্যে শিব বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কৃচ্ছ্রতার প্রতিক্রিয়া বহন করিতেছেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবদেবীদের কামুকতার প্রভাব মধ্যযুগের বাঙলার আকাশ-বাতাসকেও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। শিবের লম্পট রূপচিত্র ইহার প্রতিভাস হওয়া অসম্ভব নয়। এইভাবে বৈদিক রুদ্রমূর্তিকে পরিম্লান করিয়া, বৌদ্ধ ধ্যানময়তাকে অতিক্রম করিয়া বাংলা কাব্যে শিবের কৃষি ঘনিষ্ট আদিরসের আধেয়রূপ স্ফূর্ত হইয়াছে। কিন্তু কৃষক শিব, ভোগী শিব আবার কখনও কখনও বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষুত্বের নেপথ্য আহ্বানে তাঁহার লাঙল ও বলদ জোড়ার প্রতিও অনাসক্ত বৈরাগ্যে ভিক্ষাচারকে গ্রহণ করিয়া নির্বিকারমনে জগৎভিখারীরূপে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এইভাবে শিব ও শৈবধর্ম কখনও বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-

১। বাংলা কাব্যে শিব, গুরুদাস ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৪।

ধর্মের পরিপূরক, কখনও অনুপূরক আবার কখনও চরম প্রতিক্রিয়ারূপে যুগ-সত্যের বিভিন্ন দিককে বিচিত্ররূপে প্রতিভাত করিয়াছে।

বৌদ্ধ শিল্পাদর্শও কখনও নৈকট্যনিবিড়তায়, কখনও চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙলার শিবকাহিনীকে সরস ও সজীব করিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধসাহিত্যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রশিল্পে গৌতমবুদ্ধের জন্ম অপ্রাকৃত কাহিনীকে অনুসরণ করিয়াছে। জননী মায়াদেবীর বাম কুক্ষি ছেদ করিয়া তাঁহার আবির্ভাব। শিবের জন্ম-কাহিনীতেও কবির কল্পনা অবাস্তব কাহিনীকে অকুণ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছে।[১] বাংলা মঙ্গল সাহিত্য শিবের জন্ম-বর্ণনায় শূন্যপুরাণ ও নাথ-সাহিত্যকে অনুসরণ করিয়াছে। উপায় ও প্রজ্ঞার সংযোগে যেমন বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের উৎপত্তি তেমনি আদিদেব ও আদিদেবীর সংসর্গে শিবের জন্ম। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও পরমাপ্রকৃতি মহামায়া বিনাগর্ভে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জন্ম দান করিয়াছেন। এই কাহিনীর মধ্যে পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক বিশ্বাস শিবের জন্ম কাহিনীকে নূতনত্ব দিয়াছে।

শিব ও বুদ্ধের অপূর্ব সমন্বয় ও সংমিশ্রণের বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এই সমন্বয় ও সংমিশ্রণ কেবল উর্ধ্বতন মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। লৌকিক সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রেও শিব-বুদ্ধ পরম আত্মীয়তায় একদেহে লীন হইবার সাধনা করিয়াছেন। এইজন্য বাংলার শিব—

নিরঞ্জন নিরাকার নিগম পুরাণ সার
নিগূঢ়-বিষয় নারায়ণ।[২]

নাথদের আচার্য গোরক্ষনাথও—শিবগোরক্ষনাথ বা শিবরূপী। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী, যোগী, সমস্ত দৈহিক ভোগ-লালসার উর্ধ্বে তাঁহার স্থান। গৌতম বুদ্ধের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সংযম তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায়। 'ধর্মপূজা বিধানে' শিব, নিরঞ্জন ও ধর্মরাজ একাত্ম হইয়াছেন।[৩] কেবল নিরঞ্জনতত্ত্বকেই নহে বৌদ্ধশূন্যবাদকেও শিব নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

১। দ্রঃ—বজ্রনখ দিয়া সিব জোনিছেদ কৈল।
জোনি-দুআর দিয়া সিব বাহির হইল॥
—শূন্যপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৩৭]

২। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ১ম ভাগ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, ১৯৫২, পৃঃ ৮।

৩। ওঁ নিরঞ্জনং নিরাকারং মহাদেবং মহেশ্বরং।
শরণং পাপখণ্ডেন ধর্মরাজ নমোঽস্তু তে॥ —ধর্মপূজা বিধান, প্রাগুক্ত পৃঃ, ৭৯।

এইভাবে শিব এক নবোদ্ভূত সার্বিক জাতীয় চেতনার অধিদেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার গার্হস্থ্য বিলাস এবং বৌদ্ধ ভাবধারার প্রতি আসক্তি বাঙলার বৌদ্ধ নাগরিকদিগকেও শিবের প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। কোন কোন 'বৌদ্ধ কবি'ও শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়া শিবের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন করিয়াছেন।[১] শিবের সর্বাত্মক প্রাধান্য এবং শৈবধর্মের সর্বাঙ্গীণ প্রসারের অপর নিদর্শন চট্টগ্রামের বর্তমান হিন্দুতীর্থ আদিনাথ ও চন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের বর্তমান হিন্দুতীর্থ আদিনাথ ও চন্দ্রনাথ এক সময়ে বৌদ্ধতীর্থ ছিল।[২] শৈবধর্মের প্রভাবের যুগে এই বৌদ্ধতীর্থদ্বয় হিন্দুতীর্থ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। বৌদ্ধ স্মৃতিচিহ্নের ধ্বংসাবশেষ এখনও এইখানে পাওয়া যায়। আদিনাথ বুদ্ধের শেষ পরিণতি আদিবুদ্ধের প্রতীক। নাথসাহিত্যে, শূন্যপুরাণে ও মঙ্গলসাহিত্যে তিনি বৌদ্ধদেবতার রূপাবয়বে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই দুই তীর্থক্ষেত্র—আদিনাথে ও চন্দ্রনাথে এখনও বৌদ্ধদিগের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শৈব গাজনের[৩] অনুকরণে বৌদ্ধ আত্মার এবং ধর্মঠাকুরের গাজন প্রচলিত। ধর্মঠাকুর-প্রভাবিত অঞ্চলে ধর্মের গাজন এবং বৌদ্ধ-প্রভাবিত অঞ্চলে আত্মার গাজন শিবের গাজনের প্রভাবকে স্মরণ করাইয়া দেয়।[৪]

শৈবকাব্যের একটি স্বতঃস্ফূর্তধারা বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ শৈবতীর্থ চন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়াই এই ধারা নূতন জীবনমন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়াছিল। মৃগলুব্ধ কাহিনীর প্রাচীন কবি রামরাজা সম্বন্ধে বলা হয় তিনি জাতিতে মগ্ ছিলেন। চট্টগ্রামের অধিবাসী মগগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁহারা

কবি রামরাজা

১। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয় অনুমান করিয়াছেন 'মৃগলুব্ধ' কাব্যের কবি রামরাজা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার মতে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ মগদের মধ্যে 'রাজা' উপাধি প্রচলিত ছিল। রামরাজাকে বৌদ্ধরূপে গ্রহণ করার স্বপক্ষে তিনি আরো কয়েকটি যুক্তি আহরণ করিয়াছেন। যেমন গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে রুদুরা গ্রামবাসী কোন বৌদ্ধগৃহীর নিকট এবং ইহার লিপিকারও একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সুতরাং কবি নিজেকে 'শঙ্কর কিংকর'-রূপে অভিহিত করিলেও সাহিত্যবিশারদ মহাশয় তাঁহাকে মগবংশসম্ভূত বৌদ্ধ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (রামরাজা বিরচিত মৃগলুব্ধ সংবাদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২, ভূমিকা পৃঃ ৪-৫।

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১।

৩। শৈবধর্মের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম ধর্মানুষ্ঠান প্রবেশ লাভ করিয়া শিবের গাজন নামে পরিচিতি লাভ করে। ঐ পৃঃ ১১১।

৪। ঐ।

'রাজ' ও 'বড়ুয়া' উপাধি ধারণ করেন। চট্টগ্রামের কবির লেখনীতে 'মৃগলুব্ধ' কাহিনী প্রথম স্ফূর্তি লাভ করে। এই কাহিনীর বিচিত্র অভিনবতার জন্য বাঙলাদেশের অন্য অঞ্চলে ইহার প্রসার ঘটে নাই। এই কাহিনীর সঙ্গে জাতক কাহিনীরও যেন এক দূর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কবি রামরাজা পূর্ববর্তী জীবনে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাই সম্ভব। শিবমাহাত্ম্য কাব্যের 'মৃগলুব্ধ' ধারায় সেই পরিচয়ের সহজ অনুস্মৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

মৃগলুব্ধ কাহিনী ও জাতক

চুল্লহংস জাতক[১], মহাহংস জাতক[২] এবং মৃগলুব্ধ কাহিনী প্রায় একই স্রোতধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। জাতকে হংসরাজ পদ্ম সরোবরে পাশবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট। এমন সময় তাঁহার একান্ত অনুগত সেনাপতি সুমুখ নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া প্রভুর প্রাণ রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। তিনি হংসরাজরূপী বোধিসত্ত্বের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া নিষাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হংসরাজ বৃথা একটি জীবন অপচয় হইবার আশঙ্কায় সেনাপতিকে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। উত্তরে সুমুখ বলিলেন—দুর্দশাপন্ন প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া ভৃত্যের ধর্ম নয়। হে হংসেশ্বর, তোমার সঙ্গেই আমি মৃত্যু বরণ করিতে চাই। তোমার যে পরিণতি আমিও প্রহৃষ্টমনে তাহাই বরণ করিব। এমন সময় ভীমকান্তি যমসদৃশ ব্যাধ উপস্থিত হইল। সে দেখিল—পাশবদ্ধ একটি হংস আর তাহার পার্শ্বে অপর একটি হংস বিষণ্ণ বদনে বসিয়া রহিয়াছে। হংসসেনাপতি নানাবিধ মধুর বাক্যে এবং তত্ত্বকথায় ব্যাধের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। নিজের জীবনের বিনিময়ে তিনি মহাসত্ত্বের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। বলিলেন—আমরা দৈর্ঘ্যে আর স্থূলতায় উভয়ে সমকায়, দুইজনে সমবয়স্কও। সুতরাং হে নিষাদনন্দন, ইহার বিনিময়ে আমাকে গ্রহণ কর, এবং হংসরাজের বন্ধন মোচন করিয়া দাও। সুমুখের এই আত্মদান ব্যাধের কঠোর হৃদয়কেও দ্রব করিল। সে স্বহস্তে মহাসত্ত্বের পাশ ছেদন করিয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করিল। মৃগলুব্ধ কাব্যে আছে—একদা চিত্রসেন ব্যাধের জালে ভদ্রসেন নামক মৃগ আবদ্ধ হইয়াছেন। মৃগী রত্নাবতী স্বামীর আসন্ন মৃত্যু জানিতে পারিয়া স্বামীর পার্শ্বে

১, ২। Fausboll, Jātaka, Vol. V, no. 533, 534, p. 333, 354.

উপবিষ্ট হইলেন এবং ব্যাধের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভদ্রসেন তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলে রত্নাবতী দৃঢ়কণ্ঠে জানাইল—

আপনার প্রাণ লইয়া না জাইমু ঘর।
তোম্মাতে কহিল আমি শুন প্রাণেশ্বর॥
সে পাপিষ্ঠ প্রাণ মোর কোন প্রয়োজন।
তুম্মি হেন প্রভু যদি হইলা অদর্শন॥
... ...
তোম্মার বন্ধনে হইল আম্মার বন্ধন।
তোম্মার মোচন হইল আম্মার মোচন॥[১]

অবশেষে হস্তে ধনুর্বাণ ভয়ঙ্করমূর্তি ব্যাধ উপস্থিত হইল। রত্নাবতী মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিলেন—

যদি সে নিষ্ঠুর হও দয়া নাই চিত্তে।
প্রভুর বদলে আম্মা নেঅ সুনিশ্চিতে॥
আম্মা পাইআ যদি সে না ছাড় প্রাণেশ্বর।
স্ত্রীবধ দিব ব্যাধ তোম্মার উপর॥
প্রভুর মরণ যেন না দেখি নআনে।
স্বামী দান মাগম ব্যাধ তোম্মার চরণে॥[২]

কবি রামরাজার কাব্যেও মৃগী ব্যাধকে একই অনুরোধ করিয়াছে—

নিশ্চিন্তে মরিমু আমি শুন মহাশয়।
আগে আমারে মার ব্যাধ মহাশয়॥
বন্দী কৈল্লা স্বামী মোর দারুণ বন্ধনে।
স্বামীর কারণে মুঞি তেজিমু পরাণে॥[৩]

এই কাব্যে জাতকের বোধিসত্ত্ব হংসরাজ ভদ্রসেন মৃগের, সেনাপতি সুমুখ মৃগী রত্নাবতীর এবং নিষাদগ্রামবাসী চিত্রসেন ব্যাধের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ

১। মৃগলুব্ধ সংবাদ: রামরাজা, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত, ১৩২২ পৃঃ ৩৫—৩৬।

২। মৃগলুব্ধ: রতিদেব, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত, ১৩২২ পৃঃ ৪৬।

৩। মৃগলুব্ধ সংবাদ: রামরাজা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

করিয়াছে বলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে বাধা নাই। সেনাপতি স্নমুখ রক্ত-কলুষিত হস্ত ব্যাধের হৃদয় জয় করিয়া বোধিসত্ত্বের মুক্তি আদায় করিয়াছেন। মৃগীরূপী রত্নাবতীও তত্ত্বকথার দ্বারা তাঁহার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। স্নমুখ ও হংসরাজের এবং স্নমুখ ও ব্যাধের বচন-প্রতিবচনের ভাবরূপ মৃগমৃগী এবং মৃগী ও ব্যাধের বচন প্রতিবচনেও ক্ষীণভাবে আভাসিত হইয়াছে। স্নতরাং মৃগলুব্ধ কাহিনীতে জাতক কাহিনীর আনুপূর্বিক অনুস্মৃতি প্রতিপন্ন করা না গেলেও দুই কাহিনী নিঃসংশয়ে একই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। কেবল কাহিনীর প্রবাহেই নয়, তত্ত্ব পরিবেশনেও মৃগলুব্ধ কাব্যের কবি পৌরাণিক শিব উপাখ্যানের উপর বৌদ্ধ ঐতিহ্যের তাত্ত্বিক আবরণ টানিতে চাহিয়াছেন। প্রাণীহিংসক ব্যাধকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে মৃগী বলিয়াছেন—

প্রাণী হিংসা সম পাপ নাহি ত্রিভুবনে।
জে পুণি না হিংসে প্রাণী পালে সর্বদাএ।
সে সকল লোক উত্তম গতি হএ॥[১]

রতিদেবের কাব্যেও মৃগীকণ্ঠে শুনা যায়—

ধর্মাধর্ম জেবা করে পরলোকে পাএ তারে।
বিনি ভোগে না জাএ খণ্ডন।
জে কিছু আপনা দেখ মনেতে ভাবিআ লেখ
মিছা ধন পুত্র পরিজন।
অসার সংসার লাগি মরে দুষ্ট পাপভোগী
পরিণাম না চিন্তিআ মনে।[২]

কবি রতিদেব তাঁহার কাব্যারম্ভে আদিদেব নিরঞ্জনকেও স্মরণ করিয়াছেন।

বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন এবং লৌকিক সর্বাভিমুখী ও সর্বাত্মক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ শাশ্বত পরিচয় বাঙলার শিব বৈদিক আদর্শনিষ্ঠা ও বিশুদ্ধ আর্য মহিমাকে চরম অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। শিবের নিত্য নূতনতর সহজ ও অনাড়ম্বর প্রকাশ এবং নির্বিচার সহিষ্ণুতা আর্যদেবগণের গোষ্ঠীচেতনার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। শিবায়ণ কাব্যে যুগবিলম্বী ঐতিহ্যধারাকে নির্বিকার চিত্তে বর্জন করিয়া তিনি লৌকিক সংস্কার ও আচার-আচরণকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাব্যে শিব—

বাঙলার শিবের বেদ-বিরোধী ও নির্বাণমুখী স্বরূপ

২। মৃগলুব্ধ সংবাদ : রামরাজা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৮।
৩। মৃগলুব্ধ : রতিদেব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮।

শিরে জটা ধরে বেটা নাহি পরে বস্ত্র।
তপস্বী হইয়া করে ধরে নানা অস্ত্র॥
গৃহস্থের ধর্ম নহে শ্মশানে নির্বাস।
ভস্মবিভূষিত তনু ধরে কৃত্তিবাস্॥
বাণপ্রস্থ নহে আছে ঈশ্বরাভিমান।
ভিক্ষু পরিব্রাট্ নয় নাহি তত্ত্বজ্ঞান॥
কন্যা পরিগ্রহ করে নহে ব্রহ্মচারী।
কেবল পুরুষ নয় অর্ধ অঙ্গে নারী॥
গ্রাম্য ধর্ম আছে তার নহে সেই যোগী।
প্রলয় কালেতে শেষ হয় সর্বভোগী॥[১]

এইভাবে শাস্ত্রীয় আদর্শভ্রষ্টতাকে বরণ করিয়া তিনি আপন স্বভাব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন—

বৃষে চড়ে ব্রহ্ম বধী বিষাদী বিষাণ নাদী
নাহিক তাহার লোকধর্ম।
হেন লিখে ধর্মশাস্ত্রে কেশের পরশমাত্রে
অপবিত্র হয় সেই জন॥
হেন কেশ তার ঝারি জটার ভিতরে নারী
স্নান পান তাহাতে সকল॥[২]

সাহিত্যে তাঁহার অনভিজাত আত্মপ্রকাশে বৈদিক প্রভাবমুক্ত সার্বজনীন ঐতিহ্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন—

বেটা, আচার বিচারহীন শ্মশানেতে নির্ঘৃণ
অস্থি চর্ম যত্ন করি পরে।[৩]

অন্যত্র—

কদাচার দিগম্বর অস্থিমালা অমঙ্গল
দেবের সমাজে নাঞি সাজে

১। শিবায়ণ, রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১ম সংস্করণ পৃঃ ৪৫।
২। ঐ, পৃঃ ৫৪।
৩। ঐ, পৃঃ ৪৫।

শ্মশানের ছাই মাখে ভূতপ্রেত সঙ্গে থাকে
চূড়ামণি কলঙ্কের কলা।
ধুস্তূর তাহার ভক্ষ্য খেয়ালে ঘূর্ণিত চক্ষু
গরল যুড়িল সব গলা ॥[১]

সুস্থান, কুস্থান, চন্দনভস্ম, যবন-ব্রাহ্মণ, স্বর্গ-শ্মশান তাঁহার কাছে অনায়াসে এক হইয়া গিয়াছে। এক গভীর আত্মলীন উপলব্ধির রাজ্য হইতে তিনি ইহাদের প্রতি নির্লিপ্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্যই গরল ও অমৃত কোন স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের অধিকার তাঁহার কাছে দাবী করিতে পারে নাই। কেবল বৈদিক ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানই নয়, আর্যসভ্যতার দুই প্রধান দিক—বর্ণপ্রথা এবং চতুরাশ্রম ব্যবস্থাকেও তিনি অবলীলাক্রমে পরিহার করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য—

তিনি চারি বর্ণবহির্ভূত
কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ
বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন না হয় ঘটন
জটাভস্ম আদি ধৃত।
যদি বৈশ্য হয় চাষী কেন নয়
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা
নাগের পৈতা গলায় ॥[২]

আবার চতুরাশ্রম প্রথাকেও তিনি বর্জন করিয়াছেন—

গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়
না করে অতিথি সেবা
সতী ঝি আমার গৃহিণী তাহার
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা
বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিতে
কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনী বিহারী নহে ব্রহ্মচারী
একি মহাপাপ হর ॥[৩]

১। ঐ, পৃঃ ৫৪।
২। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৮।
৩। ঐ, পৃঃ ২৮-২৯।

'চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া' যে কবি 'মধুকর' কাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহার কাব্যেও শিব—

বেদপথ ছাড়ি তাঁর মতি স্বতন্তর।[১]

রামেশ্বরের এই বেদবিরোধী শিবের মধ্যে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। রামেশ্বরের শিব—

জ্ঞানদাতা গঙ্গাধর নির্বাণের গুরু।
বিশ্ববীজ বিশ্বনাথ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
আত্মারাম সূক্ষ্মধাম সদানন্দময়।
আর সব দেবে তানে মহাদেব কয়॥[২]

এইভাবে বৈদিক এষণা পালিত উচ্চাঙ্গের ধর্মাদর্শকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া বাঙলার শিব বেদবহির্ভূত লোকায়ত প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছেন। কালভৈরবের মধ্যে বুদ্ধের গুণাবলী অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বৈদিক রুদ্র শান্তম্ শিবম্-এ পরিণত হইয়াছিলেন। কেবল এই শান্তরসের সরোবরে অবগাহন করিয়াই শিব সন্তুষ্ট রহিলেন না, বাঙলার বিকৃত বৌদ্ধধর্মের নানা পরিণতিকে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার কামুক রূপচিত্রও উদ্ভাবিত হইল। শিবের এই বিবর্তন ইতিহাসের পরিচয় কবি তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন— 'বাংলাসাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণ সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবাল দ্বীপের মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম জীর্ণ হয়ে বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেমনি করেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব বেদবিরুদ্ধ, শিব সর্বসাধারণের। বৈদিক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মতো নির্বাণমুক্তির পক্ষে, প্রলয়েই তার আনন্দ।'[৩]

১। শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ণ : রামেশ্বর, যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, ১৯৫৭, পৃঃ ৩২।
২। ঐ, পৃঃ ৩৩।
৩। কালান্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৩৫-১৩৬।

৫। কালিকামঙ্গল

মঙ্গল কাব্যের যুগে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম সংঘাত-সমন্বয়ের আবর্তন ক্রমবিবর্তনে কেবল বাঙালীর সংস্কার ও বিশ্বাসই নয়, দেবদেবীরাও পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ দেবদেবীরা কখনও ছদ্মবেশে হিন্দু দেবায়তনে প্রবেশ করিয়াছেন, কখনও হিন্দু দেবদেবীরা নির্বিচারে বৌদ্ধ ভাবধারা ও ঐতিহ্যকে বরণ করিয়া বিচিত্র ব্যাপ্তিময় সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। আবার কখনও হিন্দুগণ বৌদ্ধ দেবদেবীদের একেবারে অবিকৃতরূপে নিজেদের দেবতার আসনে ঠাঁই দিয়া এক সর্বাত্মক জীবনবোধের পরিচয় দিয়াছেন। শিল্পীর হৃদপদ্মের শতদলরূপী এই দেবদেবিগণ ধর্মবিদ্বেষের প্রেক্ষাপটে বহু চেষ্টিত মিলনচর্যার সার্থক পরিচয়বাহী। হিন্দুর কালিকা এবং কয়েকটি তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবীর আলোচনা করিলে দেবায়তনের এই নব পরিণতির সার্থকতা সূচিত হইবে।

কালিকা ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ শক্তিদেবিগণ

কালিকামঙ্গল কাব্যে কালিকাদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে। হিন্দুতন্ত্রে কালী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির মূলীভূত কারণরূপিণী মহাশক্তির বিচিত্র রূপের একটি প্রকাশ মাত্র। ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, দক্ষিণাকালী, নিশিকালী, উন্মত্তকালী এবং মহাকালীরূপে তাঁহার বিচিত্র রূপের অভিব্যক্তি। দেবী অসুরদলনী, অষ্টমাতৃকা ও ডাকিনী-যোগিনী পরিবৃতা ও রণোন্মাদিনী মূর্তিতে সাধকের কল্পনায় আবির্ভূতা হইয়াছেন। এইরূপ ভয়ঙ্করী উন্মত্তা দেবীর পরিকল্পনায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধক এক বিশেষ শ্রেণীগত নির্মিতির পরিচয় দিয়াছেন। মহাচীনতারা, একজটা, বজ্রচর্চিকা, নৈরাত্মা, বজ্রযোগিনী এবং উড্ডীয়ান কুরুকুল্লা প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধশক্তি দেবীর সঙ্গে কালিকাদেবীর তুলনামূলক আলোচনা করিলে তাহা সুস্পষ্ট হইবে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের মহাচীনতারা এবং হিন্দুতন্ত্রের কালিকা ইহারা একই জীবনায়নকে অনুসরণ করিয়াছেন। মহাচীনতারা ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, চতুর্ভুজা এবং ভয়ঙ্কর দর্শনা। দেবী তরবারি, কর্তৃ, উৎপল ও কপালধারিণী। ইনিও কালিকাদেবীর ন্যায় প্রত্যালীঢ়পদে শবোপরি দণ্ডায়মানা। এই দেবীকে হিন্দুগণ 'তারা' নামে দশমহাবিদ্যায় স্থান দিয়াছেন বলিয়া ডঃ বিনয়তোষ

ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[১] হিন্দু তারাদেবীর ধ্যান, সাধনা ও মূর্তি পরিকল্পনায় মহাচীনতারার নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণ স্পষ্ট সূচিত হইতেছে।

বৌদ্ধ একজটা বা উগ্রতারা দেবী এবং কালিকাদেবী একই আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণে উগ্রতারা বা একজটা দেবীকে রক্তদন্তিকা, শববাহনা, নাগহার ও শিরোমালাভূষিতা, রক্তদন্তিকা, কর্তৃ-খর্পর-খড়্গ প্রভৃতি প্রহরণধারিণী কালিকারূপে আখ্যাত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ উগ্রতারা এবং কালিকাপুরাণোক্ত এই দেবী একই ঐতিহ্যবাহিনী। একজটা দেবীর দ্বিভুজা হইতে চতুর্বিংশতি ভুজা মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর কালিকাপ্রতিমাও চতুর্ভুজা হইতে চতুর্বিংশতি এমন কি শতভুজারূপেও মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। মহাকালীর ন্যায় একজটাও নীলবর্ণা, শবোপরি দণ্ডায়মানা, ব্যাঘ্র চর্ম পরিহিতা এবং ভীষণদর্শনা। তাঁহার কেশরাজি জলৎ অগ্নিশিখার ন্যায় মস্তকোপরি উত্থিত।[২] চতুর্বিংশতিভুজা মূর্তিতে তিনি 'বিদ্যুৎজ্বালা করালী' নামে অভিহিতা হইয়াছেন।[৩] দেবীর আঙ্গিকগত উপাদানসমূহ এবং 'করালী' অভিধা হিন্দুদিগের কালীর যিনি—

'দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।

'চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে'[৪]-রূপে বন্দিতা হইয়াছেন, তাঁহার পরিচয়সঙ্কেত আভাসিত করিতেছে।

হিন্দু 'চামুণ্ডা' ও বৌদ্ধ 'বজ্রচর্চিকা' দেবীর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের গভীরতর অনুধাবনের দ্বারা উভয় দেবীর রূপগত সংহতি ও সাদৃশ্য প্রমাণ করাও সহজতর। চামুণ্ডা প্রতিমার ন্যায় বজ্রচর্চিকাও অস্থিচর্মসার, প্রলয়ঙ্করী দেবী। প্রসারিত শবদেহের উপর এই ভয়ঙ্কর দর্শনা দেবী নৃত্যরতা। তিনি ত্রিনেত্রা, নরমুণ্ডধারিণী ও নর অস্থির দ্বারা অলঙ্কৃতা। তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম এবং হস্তে বজ্র, তরবারি, চক্র, কপাল, রত্ন ও পদ্ম।[৫] ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে চামুণ্ডা রণক্ষেত্রে দেবী আম্বিকার ললাটোদ্ভূতা। তিনি—

১। B. Bhattacharyya, Buddhist Iconography, 1958, pp 190-91.

২। ঐ, পৃঃ ১৯৩।

৩। ঐ, পৃঃ ১৯৪।

৪। ধর্মপূজাবিধান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯।

৫। Buddhist Iconography, op. cit. p. 199.

বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা॥[১]

অম্বিকার ললাটোদ্ভূতা সেই চামুণ্ডা দেবী, বিচিত্র নরকঙ্কালধারিণী, নরমুণ্ডমালিনী ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, অস্থিচর্মমাত্রদেহা, অতিভীষণা, বিশালবদনা, লোলজিহ্বায় ভয়প্রদা, কোটরগত আরক্তচক্ষুবিশিষ্টা এবং বিকটশব্দে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণকারিণী। সুতরাং চামুণ্ডা ও বৌদ্ধ বজ্রচর্চিকা উভয়দেবীর আঙ্গিকগত উপাদানে সমন্বয়মূলক ভাবধারা অনুসৃত হইয়াছে।

জগৎকারণ নিঃস্বভাব পরাশূন্যের গুণবিশেষ বৌদ্ধ ঐতিহ্যে নৈরাত্মা দেবী-রূপে রূপায়িতা হইয়াছেন। নৈরাত্মা অর্থাৎ নাই আত্মা যাহার। ইহার অপর নাম শূন্য—নির্বাণলাভের জন্য যে শূন্যলোকে বোধিসত্ত্বগণ ডুবিয়া থাকেন। ইহা বিমূর্তভাবমাত্র। ক্রমশ এই শূন্য দেবীরূপ পরিগ্রহ করেন। ইঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বোধিসত্ত্বগণ পরম সুখ ও শান্তি লাভ করেন। মহাশূন্যময় অনাদি অনন্ত পরমপুরুষের শক্তিরূপিণী মহামায়ারূপ প্রকৃতি যাহা হইতে বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে সেই জগৎকারণ মহামায়ার এক রূপ বিশেষ হইতেছেন মহাকালী। নৈরাত্মা দংষ্ট্রকরাল হেরুকের শক্তিরূপিণী আর মহাকালী শ্মশানবাসী প্রমথেশ কালভৈরবের সঙ্গিনী। কালী ও নৈরাত্মা দুই নীলবর্ণা, ভয়ঙ্করী, ঘোরা বা উগ্রা দেবী। উভয়েই শবাসনা, মুণ্ডমালিনী, ক্রোধে ঘূর্ণিতলোচনা। নৈরাত্মার লেলিহান অগ্নিশিখার ন্যায় পিঙ্গলকেশরাজি ঊর্ধ্বমুখী।[২] উভয়দেবীর মুখমণ্ডল ক্রোধবশে উদ্ভাসিত ও ভয়ঙ্করদর্শন, দেহ হইতেও যেন ক্রোধবহ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

হিন্দুদিগের দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবী ছিন্নমস্তার পরিচয় বৌদ্ধ দেবী বজ্রযোগিনীর রূপকল্পনায় আভাসিত হইয়াছে। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী বজ্রযোগিনী হিন্দুদিগের ছিন্নমস্তাদেবীতে পরিণত হইয়াছেন।[৩] বজ্রযোগিনী দিগ্‌বসনা। তিনি স্বয়ং নিজ মস্তক

১। শ্রীশ্রীচণ্ডী, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত, সপ্তম অধ্যায়, পৃঃ ২৩১।
২। ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত ৩৯৪১ নং মূর্তি দ্রষ্টব্য।
৩। Buddhist Iconography, op. cit. p.247.

দক্ষিণ হস্তধৃত কর্তৃদ্বারা কর্তন করিয়া বামহস্তে বক্ষের নিকট তাহা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার কবন্ধ হইতে উত্থিত তিনটি অবিচ্ছিন্ন রক্তধারার একটি তাঁহার কর্তিত মুখে প্রবেশ করিতেছে এবং অপর দুইটি ধারা দুই পার্শ্বস্থিত দুইজন যোগিনী পান করিতেছে। এক ভয়ঙ্কর শ্মশান পরিবেশে দেবীর অবস্থান। একই মণ্ডলকলা এবং আঙ্গিকগত উপাদানের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণ হিন্দু ছিন্নমস্তা এবং বৌদ্ধ বজ্রযোগিনী প্রতিমায় স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। এইখানে হিন্দুশিল্পী কেবল অভিধামাত্র পরিবর্তন করিয়া সশরীরে বৌদ্ধদেবীকে হিন্দুর দেবায়তনে স্থাপন করিয়াছেন। বৌদ্ধ বজ্রবারাহী দেবীও কালীর মত দিগ্-বসনা এরং শবোপরি নৃত্যরতা, দেবীর কণ্ঠে রক্তে আর্দ্র মুণ্ডমালা এবং বদন বরাহের অনুরূপ। এই বৌদ্ধদেবী বজ্রবারাহী—

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।

বরাহরূপিণী শিবে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥[১] প্রভৃতি ধ্যানোক্ত 'বরাহ-রূপিণী' কালিকার প্রতিমাকে উদ্ভাসিত করে।

উড্ডিয়ান কুরুকুল্লাদেবীও চতুর্ভুজা, করালবদনা, দংষ্ট্রাকরাল লোলজিহ্বা। তাঁহার কণ্ঠে মুণ্ডমালা এবং অঙ্গে সর্পের ভূষণ। এই দেবীর সঙ্গেও রণরঙ্গিণী, অসুরদলনী কালিকাদেবীর সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। দেবীর অষ্টরূপের—উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী ও তারা প্রতিমা চিন্তনে ও রূপাভিব্যক্তিতেও বৌদ্ধপ্রভাবের ছাপ পাওয়া যায়।

এই নারী দেবতাসমূহের চিত্রণে বাঙালী সাধকের অলৌকিক মাতৃ-মহিমাবোধ এবং নির্ভীক চিত্তের পরিচয় আভাসিত হইয়াছে। এই দেবিগণ কেবল পারম্পরিক সমধর্মিতার দ্বারা প্রভাবিতই নহেন, হিন্দুবৌদ্ধ প্রতিমাদর্শের সমুন্নত মহিমার ধারকও বটে। এই মিলন সমন্বয়ের আলোকস্পর্শে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে হিন্দুর দেবতা বৌদ্ধদিগের আরাধ্য হইয়াছেন, আবার বৌদ্ধদেবতা হিন্দুর পূজাবেদীতে আরোহণ করিয়াছেন।

কালিকা দেবীর উৎপত্তি চিন্তার পরও একটি প্রশ্ন আসিয়া পরে, এই মহাভয়ঙ্করী দেবী, যিনি মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রতীক, যিনি মহারুদ্রের শক্তি, যিনি কখনও মহাকালী, কখনও চণ্ডিকা, কখনও ডাকিনী যোগিনীপরিবৃতা চামুণ্ডা কেন তিনি কালিকামঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে সুন্দরের

১। রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা বিধান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।

কার্যের সহায়তাকারিণী, শৃঙ্গাররসের অনুকুলারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন? এই সমস্যা আজও অমীমাংসিত রহিয়াছে। মনে হয় এই সমস্যার সমাধানে তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের 'উড্ডীয়ান কুরুকুল্লাদেবী' কিছুটা দিগ্‌দর্শন করিতে পারেন। কালিকাদেবীর রূপচিত্রণে শৃঙ্গাররসের দ্যোতক কোন প্রতীক চিহ্ন কল্পিত হয় নাই। কিন্তু উড্ডীয়ান কুরুকুল্লাদেবী কালিকার ন্যায় ভয়ঙ্করী হইলেও তাঁহার আঙ্গিকে এক বিচিত্র ভাবরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই মহাভয়ঙ্করীদেবী প্রধান হস্তদ্বয়ে পুষ্পধনুতে পুষ্পশর যোজনা করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ করিতেছেন।[১] দেবীর অপর দুই হস্তেও পুষ্পনির্মিত অঙ্কুশ ও পদ্ম ধৃত রহিয়াছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ আকর্ষণ ও বশীকরণাদি কাজে কুরুকুল্লাদেবীর মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে এই মহাভয়ঙ্করী দেবীকে পুষ্পবাণ-ধারী প্রণয়দেবতা কন্দর্পের ভূমিকায় অবতীর্ণরূপে গ্রহণ করা যায়।[২] বাংলা মঙ্গলসাহিত্যে কালিকাদেবীও কন্দর্পের কাজের সহায়তাকারিণী হইয়াছেন। হাতে তাঁহার পুষ্পশর নাই বটে, কিন্তু তাঁহারই কৃপায় মালিনীর গৃহ হইতে বিদ্যার শয়নমন্দির পর্যন্ত সুড়ঙ্গপথ নিমেষে তৈয়ারী হইয়াছে এবং সেই পথে বিদ্যাসুন্দরের যৌথ ভোগাসক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং কালিকা-মঙ্গলকাব্যে কালিকাদেবী যে কার্যে অবতীর্ণা হইয়াছেন বৌদ্ধদেবী 'উড্ডীয়ান কুরুকুল্লা' তাহার অগ্রবর্তিনী পথপ্রদর্শিকা।

সৃষ্টিকাহিনী বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের অন্নদা বৌদ্ধ শূন্যবাদের বিবর্তিত রূপ নিরঞ্জনের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন। তিনিই শবরূপা হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের পরীক্ষক হইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদায় চণ্ডীদেবী তাঁহার উগ্রতা বহুলাংশে পরিহার করিয়া কল্যাণময়ী ভক্তবৎসলা মাতৃমূর্তিতে প্রকাশিতা হইয়াছেন। কেবল নারদনিগ্রহের মধ্যেই দেবীর উগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী তাঁহার কাব্যে বেদ বিদ্রোহীরূপে বুদ্ধকে বন্দনা করিয়াছেন।[৩]

কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মালিনী ও বিদ্যা কেবল সে যুগের একক সৃষ্টি নহে, বৌদ্ধসাহিত্যেও অনুরূপ নারীচরিত্র পাওয়া যায়।

১। Buddhist Iconography, op. cit. p. 149.

২। কুরুকুল্লা দেবীর বর্ণনা প্রসঙ্গে Getty লিখিয়াছেন—'She beams with the emotion of love in all the freshness of youth'.—Gods of Northern Buddhism, p. 112.

৩। বৌদ্ধরূপ বন্দো বেদ করিলে নিধন—কালিকামঙ্গল, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৩৫০, পৃঃ ৭।

পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মীয় সাহিত্যের ন্যায় জাতকে এবং অন্যান্য বৌদ্ধসাহিত্যেও নারীর দুশ্চরিত্রতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার প্রচুর দৃষ্টান্ত আহরণ করা হইয়াছে।[১] জাতকগ্রন্থে দেখানো হইয়াছে নারীর ইন্দ্রিয় লালসা এতই প্রবল যে যে কোন বাধাকে লঙ্ঘন করিতে তাহারা পশ্চাৎপদ হয় না। মৃদুপাণি জাতকের মুখবন্ধে বলা হইয়াছে প্রাচীন যুগের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপন কন্যাদের যথেষ্ট সাবধানতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াও তাহাদের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন নাই। এই জাতকে যে কন্যা এই মুহূর্তেও পিতার হস্ত ধারণ করিয়া আছে পরমুহূর্তে পিতার চক্ষুতে ধূলি দিয়া সে তাহার মনোনীত পাত্রের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে।[২] পাহারা সে যত কঠিন ও সাবধানীই হউক না কেন নারী তাহা অনায়াসে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। অন্য একটি জাতকে কোন রমণীকে সিমবলী হ্রদের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এই সতর্ক প্রহরীবেষ্টিত রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে নাই।[৩] অন্য আর একটি জাতকে বালিকা আশৈশবে কেবল স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের মুখদর্শন করিবার সুযোগও পায় নাই, সপ্ততলবিশিষ্ট বাড়ীর নারী প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত একটি কক্ষে তাহাকে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সেই নারীও তাহার পরিচারিকার সাহায্যে অন্য পুরুষকে অট্টালিকায় প্রবেশ করাইয়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে নিজের চারিত্রিক নির্মলতা প্রমাণের জন্য সে নানা কৌশল ও বাগাড়ম্বর অবলম্বন করিতেও কুন্ঠিত হয় নাই।[৪] বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর বিদ্যাও ইহাদের পরিণামকে বরণ করিয়া লইয়াছে। বিদ্যা জাতকের এই রমণীদের যথার্থই উত্তরসাধিকা। বিদ্যার প্রগল্‌ভতা, বাক্‌চাতুর্য, নির্লজ্জ কামপরিতৃপ্তি এবং পরিশেষে নিজের দোষ ঢাকিবার প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁহার পূর্বসূরীদিগের চারিত্রিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। সারদামঙ্গলের রাজকন্যাগণও এই ঐতিহ্যধারাকে সাগ্রহে অনুসরণ করিয়াছে। রাজার প্রাসাদে এবং শ্রেষ্ঠীর অন্তঃপুরে নারী পরিচারিকাগণ কত কৌশলে পাপের পদার্পণে সাহায্য করিয়াছে তাহার প্রচুর নিদর্শন জাতকে

নারী ও বিদ্যাচরিত্রে প্রাচীন ধারার অনুবর্তন

১। R. Mehta, Pre-Buddhist India, Bombay, 1939, pp. 286—89।

২। Fausboll, Jātaka, Vol. II, p. 328.

৩। Ibid, Vol. III, p. 9.

৪। Ibid, Vol. I, p. 289-95.

পাওয়া যায়। 'অবদানকল্পলতা' গ্রন্থের 'ধর্মরুচি' অবদানেও পরিচারিকার সাহায্যে উজ্জয়িনীর বণিক চন্দনদত্তের পত্নী কামকলা তাহার পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে। বৌদ্ধসাহিত্যের এই পরিচারিকাগণ নাথসাহিত্যের যোগিনী, ধর্ম সাহিত্যের নয়ানী এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মালিনী চরিত্রের মাধ্যমে নিজেদের উত্তরাধিকার প্রবাহকে স্বতঃস্ফূর্ত রাখিয়াছে।

মধ্যযুগের বিকৃত ধর্মীয় আদর্শের আবহাওয়ায় তান্ত্রিক ডাকিনী এবং নারী সিদ্ধাদিগকেও অবৈধ প্রণয়লীলার পরিপুষ্টিসাধনে সাহায্যকারিণীরূপে দেখা যায়। বাংলাসাহিত্যের যোগিনী, নয়ানী ও মালিনী ইহারাও সেই প্রাচীনধারার অনুবর্তন করিয়াছে। গোর্খবিজয়ে কবি স্পষ্টভাষায় তাহাদের 'বাউলী' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। বাউলীরা বিবাহিত যোগীর কন্যা, নিজেরাও যোগিনী। গোর্খবিজয়ে নারীরাজ্য কদলীপত্তনে গোরক্ষ উপস্থিত হইলে এক যোগিনী তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া নিজের গৃহে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছে—

নাথের দেখিয়া রূপ জোগিনি এ পাএ শোক
চল চল পরদেসি জোগাই।
জথ কিছু কহি আম্মি মনে ভাবি চাহ তুম্মি
আম্মার বাড়ীতে চল জাই।[১]

মীনচেতনেও এই যোগিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—

দেখিয়া নাথের রূপ নারী গেল ভোলে।
হানিল মদনরূপ শরীরের দলে॥
চাহিতে চাহিতে নারী নিকটে আসিল।
আপনার যতগুণ কহিতে লাগিল॥
কটিদেশে হাত দিয়া বামা কহে ছলে
পয়োধরে বস্ত্র নাহি রত্নহার ধোলে॥[২]

ধর্মমঙ্গলকাব্যে নয়ানীও প্রায় অনুরূপ ভাষায় লাউসেনকে আহ্বান জানাইয়াছেন—

ভাল হল বেটা মল ভাতার মল শেষে।
হইব তোমার দাসী না রহিব দেশে॥

১। গোরক্ষবিজয়: ফয়জুল্লা, আবদুল করিম সম্পাদিত, ১৩২৪, পৃঃ ৬১—৬২।
২। মীনচেতন, নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত, ১৩২২, পৃঃ ১২।

চরণ করিব সেবা চাঁদ মুখ চেয়ে।
রস রসে রাত্রিদিন রাখিব ডুবায়ে ॥[১]

কবিশেখর বলরাম দাসের মালিনীও—

পুষ্প না বিকায় সেই একাকিনী আছে ॥
ধীরে ধীরে কুমার গেলেন বৃক্ষতলে ॥
কৌতুকে মালিনী মাল্য দিল তাঁর গলে ॥[২]

ভারতচন্দ্রের মালিনী চরিত্রে এই কু-চক্রান্ত ও ছলনা স্বাভাবিক পরিণতি পাইয়াছে। মালিনী এইখানে বয়োবৃদ্ধা—সুন্দরের মাসীস্থলে অভিষিক্তা। অবশ্য তাহার অতীত জীবনের যে চিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে তাহাকে নিঃসংশয়ে তান্ত্রিক ডাকিনী বা নারী সিদ্ধাদিগের উত্তরাধিকারিণীর স্থলে অভিষিক্ত করা যায়। ভারতচন্দ্র হীরার পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন তাহারও—

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।
ছিটা ফোটা তন্ত্রমন্ত্র আছে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ধূলি ॥[৩]

এই তন্ত্রেমন্ত্রে পারদর্শিনী নারী—যে বালখিল্যদের সঙ্গে শঠতা করিয়া উপার্জন করে তাহার চরিত্রে মধ্যযুগের নারীসিদ্ধাদের নৈতিক অবনতির অনুবর্তন ঘটিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।
রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট ॥
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধুম।
এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম ॥[৪]

১। শ্রীধর্মমঙ্গল : মানিক গাঙ্গুলী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃঃ ৯০।

২। কালিকামঙ্গল, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃঃ ৩৯।

৩। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৩৫৭, পৃঃ ১৯৯।

৪। ঐ, পৃঃ ২১৩।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে চোরের সৌন্দর্য দর্শনে নাগরিকাদিগের বিস্ময় এবং আপন আপন পতিনিন্দা অশ্বঘোষের সুন্দরানন্দ কাব্যের অষ্টম সর্গে বর্ণিত পুরমহিলাদিগের অব্যবস্থিতচিত্ততার বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের নায়ক 'চোর' রূপে খ্যাত হইয়াছে। চৌর্যবিদ্যা প্রাচীন ভারতের ৬৪ কলাবিদ্যার অন্তর্গত। বাংলাসাহিত্যে অনুরূপ কাহিনীর ধারা সংস্কৃত সাহিত্যকে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে পালি জাতক গ্রন্থের অন্তর্গত 'মহাউম্মগ্‌গজাতক'[১] হইতে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটি গৃহীত হইয়াছে।[২] রসিক কবি ভারতচন্দ্র বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় পরিপুষ্টির জন্য কালিকাদেবীর সহায়তায় বিদ্যার শয়ন-মন্দির পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ বর্ত্ম বা সুড়ঙ্গপথ খনন করিয়াছিলেন। এই গোপন পথেই বিদ্যার শয়নগৃহে সুন্দরের নিত্য যাতায়াত। মহাউম্মগ্‌গজাতকে ভূগর্ভস্থ বর্ত্ম বা সুড়ঙ্গ অর্থে 'উম্মগ্‌গ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।[৩] কিন্তু জাতকের সুড়ঙ্গ-পথ এবং বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সুড়ঙ্গপথ দুই-এর উপযোগিতা এক নয়।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনী ও মহাউম্মগ্‌গজাতক

মহাউম্মগ্‌গজাতকে মহোষধ কুমারের পত্নী নির্বাচন এবং কালিকামঙ্গল-কাব্যের সুন্দরের বিদ্যালাভার্থ প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। জাতকে রাজ সভাপণ্ডিত মহোষধ যোগ্য পত্নী লাভের জন্য দরজীর ছদ্মবেশে উত্তরযব-মধ্যক গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। সুন্দরও বিদ্যালাভার্থ বিদ্যার্থীর ছদ্মবেশে বর্ধমানে প্রবেশ করিয়াছে। জাতকে গ্রাম্যপথে অমরা নাম্নী এক পরমাসুন্দরী ও মনোহারিণী বালিকার সহিত মহোষধের পরিচয় হইয়াছে। মহোষধ প্রথম দর্শনেই অমরার রূপগুণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাহাকে পত্নীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। ইহার পর মহোষধ অমরাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই প্রশ্নসমূহের উত্তরদান প্রসঙ্গে সে যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কলাকৌশল এবং বুদ্ধির প্রাখর্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে অমরাকে বিদ্যার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আসনে অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। দুই একটি উদাহরণ প্রদান করিতেছি।[৪]

১। Fausboll, Jātaka, Vol. VI, No, 546.

২। S. C. Mitra, The Long-lost Sanskrit Vidyasundar, proceeding of the Oriental Conference. Second session, 1928, p. 220:

৩। Pāli to English Dictionary, P. T. S., p. 154.

৪। Fausboll, Jātaka, Vol. VI, pp. 363-65,

—'তোমার নাম কি ভদ্রে' ?

—'যাহা পূর্বে হয় নাই, পরে হইবে না, এখনও নাই, আমার সেই নাম'। মহৌষধ বুঝিলেন—কন্যার নাম অমরা।

—'তোমার পিতা কি করেন' ?

—'তিনি এককে দুই করেন'। দ্বিধাকরণকেই কর্ষণ বলে। মহৌষধ বুঝিলেন অমরার পিতা কৃষিজীবী।

—'তিনি কোথায় চাষ করিতেছেন' ?

—'যেখানে একবার গমন করিলে আর কেহ প্রত্যাগমন করে না।' মহৌষধ বুঝিলেন অমরা শ্মশান ক্ষেত্রকে নির্দেশ করিতেছে এবং অমরার পিতা শ্মশানের নিকটবর্তী জমিতে কৃষিকর্মে রত আছেন।

মহৌষধ আবার প্রশ্ন করিলেন—'তুমি আজকেই ফিরিবে তো' ? অমরা —'যদি আসে, তবে আসিব না, যদি না আসে তবে আসিব'। মহৌষধ বুঝিলেন—অমরার পিতা নদী-তীরে চাষ করিতেছে, যদি নদীতে বাণ আসে তবে সে ফিরিবে না, যদি বাণ না আসে তবে ফিরিয়া আসিবে।

অমরার সাংকেতিক ভাষার চমৎকারিত্বে এবং তাহার রূপে গুণে মহৌষধ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাও কলাবিৎ রাজদুহিতা। তাহার বাকচাতুর্য এবং পুষ্পচিত্রাঙ্কন পূর্বক কৌশলে প্রণয়লিপি প্রেরণ বিদ্যার পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। তাহার প্রণয়পত্র চিত্রকাব্যে পরিণত হইয়াছে—

বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি…[১]
তাহাতে—লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষরে গণ তিন বার ॥
তিন অর্থে তিনবার মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে ॥[২]

বিদ্যা ও সুন্দরের বিচারের[৩] মধ্যেও অনুরূপ বুদ্ধির প্রাখর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

১, ২। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৩৫৭, পৃঃ ২১৯।

৩। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩১। কালিকামঙ্গল : বলরাম, সম্পাদক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, পৃঃ ৮৬।

কঙ্ক রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানে চম্পানগরে অশোকতরুর ছায়ায় 'চাম্পারাজ ইন্দ্রসেনের কন্যা বিদ্যার সঙ্গে রাজা মাল্যবানের পালিতপুত্র সুন্দরের সাক্ষাৎ হইয়াছে। এই সাক্ষাৎকারের পরে বিদ্যা সুন্দরকে আপন উদ্যানে আসিবার গুপ্ত পথের সঙ্কেত দিয়াছে। মহাউম্মগ্‌গজাতকেও অমরা সাংকেতিক কৌশলে মহৌষধকে তাহার বাড়ীর পথ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছে—

যবমধ্যক গাঁয়ে যেতে গুপ্ত পথ এই।
ঘটে আছে বুদ্ধি যার জানতে পারে সেই ॥[১]

—(ঈশানচন্দ্র ঘোষকৃত অনুবাদ)

বিদ্যা ও অমরা দুইজনেই প্রখর বুদ্ধিশালিনী, বাক্‌নিপুণা নারী। প্রথম দৃষ্টিতেই নিজেদের প্রণয়াস্পদকে চিনিয়া লইতেও তাহারা ভুল করে নাই।

চোরের প্রতি প্রণয়ের কয়েকটি কাহিনীও বৌদ্ধ সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। রাজগৃহের শ্রেষ্ঠীকন্যা ভদ্রা কুণ্ডলকেশী একদিন প্রাসাদশিখর হইতে দেখিতে পাইলেন পুরোহিত-পুত্র সথ্‌ক বন্দী প্রবস্থায় বধ্যভূমিতে নীত হইতেছে। সথ্‌ক চৌর্যের অপরাধে রাজার নগররক্ষক দ্বারা ধৃত হইয়াছে। কুণ্ডলকেশী প্রথম দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলেন। অবশেষে তাঁহার নিরুপায় মাতাপিতা নগররক্ষককে প্রচুর অর্থ উৎকোচস্বরূপ প্রদান করিয়া সথ্‌ককে মুক্ত করেন এবং কুণ্ডলকেশীর সঙ্গে তাহার পরিণয় সংগঠিত হয়। তস্করের সঙ্গে এই বিবাহের ফলে, কুণ্ডলকেশীর মাতাপিতাকে বংশমর্যাদা ও পদগৌরব বিসর্জন দিতে হইয়াছিল।[২]

বৌদ্ধসাহিত্যের ভদ্রা এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যা দুইজনেই তস্করের প্রণয়-প্রার্থিনী তবে সুন্দর বিদ্যার প্রণয়ের জন্য তস্কর আর সথ্‌ক অর্থ ও রত্নালঙ্কারের প্রতি লোভী তস্কর। বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের সংসর্গের পরিণতিস্বরূপ তাহার মাতাপিতাকে লোকলজ্জায় পতিত হইতে হইয়াছে আর সথ্‌কের প্রতি ভদ্রার আকর্ষণের জন্য শ্রেষ্ঠী দম্পতিকে কুলশীল ও পদমর্যাদা বিসর্জন দিতে হইয়াছে। বারাণসীর বারবণিতা সামাও তস্কররূপে ধৃত এক যুবকের সুন্দর উজ্জ্বলকান্তি দেখিয়া তাহার প্রেমে পড়িয়াছিল।[৩] কুণ্ডলকেশী ও সামার জীবনে তাহাদের প্রণয় ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে বিদ্যা সফলকাম প্রণয়িনী। কালীর কৃপায় সুন্দরকে লাভ করিয়া তাহার প্রেম সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়াছে।

১। জাতকমঞ্জরী, পৃঃ ২৫৮। ২। ধম্মপদ অট্‌ঠকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭।

৩। Fausboll, Jātaka, Vol. III, Kaṇavera Jātaka.

৬। **শীতলামঙ্গল**

শীতলাদেবীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি সর্বভারতীয়। তাঁহার পূজাবিধি কেবল বাঙলাদেশের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, সমগ্র ভারতব্যাপী বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।[১] শীতলা বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি এই রোগের এবং উগ্রতাপের প্রশমনকারিণী দেবীও।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বর্গত ব্যোমকেশ মুস্তাফি এবং দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শীতলাদেবীকে বৌদ্ধ হারীতীর সহিত অভিন্নরূপে কল্পনা করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন বৌদ্ধ হারীতী পরবর্তীযুগে হিন্দুদিগের পূজিতা শীতলাদেবীতে পরিবর্তিতা হইয়াছেন।—It is difficult to ascertain whether Hindus have taken Sitala from the Buddhistic Hariti or the Buddhists from the Hindu Sitala, I am inclined to think that the Hindus are the borrowers.'[২]

হারীতীদেবী ও শীতলা

বৌদ্ধ হারীতী নেপালে বসন্তরোগের উপশমকারিণী দেবীরূপে পূজিতা হইতেছেন।[৩] সুতরাং হারীতী যে বসন্তরোগের উপশম ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেবল তাহাই নহে, সন্তান হরণ ও রক্ষণ এই দুই ঐতিহ্যও যুগপৎ সমসূত্রে তাঁহার মধ্যে বিধৃত হইয়াছে। ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের আলোচনায় তাহা বিবৃত হইয়াছে। তিনি সন্তান অপহরণকারিণী দেবী হইলেও তাঁহার পরিকল্পনায় কল্যাণী শুভঙ্করীরূপের পরিচয়ও পাওয়া যায়। ভাস্কর্যে কখনও কখনও তিনি শিশুপরিবৃতা, প্রসন্নবদনা, সন্তানকে স্তনদানরতা মাতৃমূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তাঁহার জীবনের দুইটি পৃথক্ পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি মাতৃরূপা, কিন্তু প্রথম পর্যায়ে শিশু বিনষ্টির কলঙ্ক-কালিমা তাঁহাকে অনিষ্টকারিণী ভয়ঙ্করী অপদেবতায় পরিণত করিয়াছে। বাংলা শীতলামঙ্গল কাহিনী অংশেও দেখা যায় ক্রুদ্ধা শীতলাদেবীর প্রথম বলি চন্দ্রকেতুর রাজধানীর শিশুবৃন্দ—'ছাওয়ালে দেখিয়া দয়া জন্মিল অন্তরে।' এই 'দয়া' বাৎসল্যরস নহে। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যের ব্যর্থ মাতৃত্ব যক্ষিণীর[৪] হৃদয়ের ঈর্ষা

১। Dr. Bhattacharyya, 'The cult of the goddess of small pox in West Bengal'. —Quarterly Journal of the Mythic Society XLIII, 1952, pp. 55—69.

২। Sastri, Discovery of Living Buddhism in Bengal, p. 20.

৩। Getty, Gods of Northern Buddhism, 1914, p. 75.

৪। ধম্মপদ অট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, কালিযক্খিনী বত্থু, পৃঃ ৪৫—৫৩।

ও প্রতিশোধ কামনা যেন শীতলার অন্তরেও স্থান পাইয়াছে। নগরের বসন্তের চিনবিহীন নিষ্কলঙ্ক শিশুমুখ দেখিয়া শীতলার অন্তর আলোড়িত হইয়াছে। শিশু বিনষ্টির মধ্য দিয়া শীতলা তাঁহার আলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। শিশুর প্রতিই যেন তাঁহার অধিকতর মনঃসংযোগ —রাজাকে তাঁহার একশত পুত্র সম্বন্ধে তিনি সাবধান করিয়াছেন, পুত্রের কল্যাণের জন্য শীতলা পূজা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শীতলা পূজায় অনিচ্ছুক রাজার উনসত্তরটি পুত্র শীতলার কোপে বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শীতলাদেবীর উৎপত্তি কাহিনী বর্ণনায় কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—নহুষ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞের নির্বাপিত কুণ্ড হইতে শীতলার জন্ম। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বৌদ্ধ হারীতী দেবীর ন্যায় শীতলাদেবীও মানব শিশুর সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্টতার সূত্রে জড়িত। দুই দেবীই বসন্তরোগদাত্রী। ডোম পুরোহিত বৌদ্ধ হারীতীদেবীর পূজারী ছিল, হিন্দু শীতলাদেবীর পূজারীও ডোম পুরোহিত। ইহা দ্বারা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শীতলা পূজার ঘনিষ্ঠতা সূচিত হইতেছে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধদেবী হারীতীর সঙ্গে শীতলাদেবীর সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বসন্তরোগ প্রদায়িনী শীতলার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের লৌকিক দেবী শীতলম্মার নৈকট্যকে স্বীকৃতি দিয়াছেন।[১] নেপালে হারীতী বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিত হইলেও বৌদ্ধতন্ত্র সাহিত্যে হারীতী যক্ষপতি কুবেরের পত্নী। মূর্তিশিল্পে তিনি কখনও ধনদেবতা কুবেরের পার্শ্ব-শোভিনী, ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বসুধরার প্রতীক, কখনও সন্তানক্রোড়া, প্রসন্নাননা মাতৃমূর্তি। এই প্রতিমার সঙ্গে শীতলা প্রতিমার কোন সামঞ্জস্য নাই। শীতলা কখনও খর্বাকৃতি, সিন্দুরলিপ্তা ও ব্রণচিহ্নাঙ্কিতা দেবীরূপে মন্দিরে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিতা আবার কখনও চতুর্ভুজা, সম্মার্জনীহস্তা এবং গর্দভারূঢ়ারূপে বারোয়ারী মণ্ডপে অর্চিতা। শীতলা ও হারীতীর এই প্রতিমাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য নিঃসন্দেহে। হারীতী মাতৃত্বের দ্যোতক, শীতলা বসন্তরোগজ্বালা প্রশমিনী।

হারীতী অপেক্ষা পর্ণশবরী দেবীর সঙ্গে শীতলার নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা অধিকতর বলিয়া মনে হয়। প্লেগ, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর আক্রমণ

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২৭।

হইতে ত্রাণ লাভ করিবার জন্য পর্ণশবরীর পূজা ও হোম অনুষ্ঠান বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তিনি পীতবর্ণা, পর্ণভূষণা, পর্ণবসন পরিহিতা এবং প্রত্যালীঢ় পদে মারীরূপ বিঘ্নকে দলিত করিতেছেন। শীতলাও শ্বেতাঙ্গী, দিগম্বরী, বিস্ফোটক, গলগণ্ড এবং জ্বরপ্রদাহ-দায়িনী। বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস পর্ণশবরীর অর্চনাদ্বারা মারের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। মহামারী-পর্যুদস্ত ভয়বিহ্বল ও শঙ্কাহতদের তিনি অভয়দান করেন। 'স্তবকবচমালা' গ্রন্থে শীতলাদেবী সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—

পর্ণশবরী ও শীতলা

যস্তামুদকমধ্যে তু কৃত্বা সংপূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকং ভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥[১]

পর্ণশবরীর একটি সাধনায় তিনি প্রসন্নাননা, শান্তমূর্তি, অন্যটিতেও তিনি হাস্যময়ী। কিন্তু সেই হাস্যও ভয়ঙ্কর। দুইটি মূর্তিই বাঙলাদেশের পূর্বাঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। শীতলাদেবীরও দ্বিবিধ প্রতিমার একটি সৌন্দর্যদ্যোতক, সুদর্শনা শান্তমূর্তি, অন্যটি কুৎসিতদর্শনা ভয়ঙ্করী প্রতিমা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ধ্যানমন্ত্রে শীতলাদেবীর নির্দিষ্টগঠন উন্নত শিল্পজ্ঞানের নিদর্শন যে মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক প্রভাবের পরিণতি।[২] 'পিচ্ছিলা' তন্ত্রোক্ত দেবীর ধ্যানমন্ত্র হইতে জানা যায়—শীতলা বিস্ফোটক, উগ্রতাপ প্রভৃতি মহামারীর প্রবল আক্রমণ প্রশমনকারিণী।[৩] বৌদ্ধতন্ত্রের পর্ণশবরী দেবীও বিঘ্নবাহিনী ও বিঘ্নের প্রতি ভয়প্রদর্শনকারিণী এবং সর্বমারী প্রশমিনী।

দেবী শীতলার পরিচয় প্রদান করিতে হইলে আরো একটি সম্ভাবনার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। শীতলা চণ্ডীদাসের উপাস্যা বাসুলীর ন্যায় বিশেষ শক্তিসম্পন্না 'শীতলা' নাম্নী ডাকিনী বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী হওয়াও অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ এই রমণী বসন্ত চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। বসন্ত রোগ সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতার গভীরতাই ঐন্দ্রজালিক ও অলৌকিক ক্ষমতারূপে সাধারণের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। 'মৃতসঞ্চারিণী

তান্ত্রিক ডাকিনী ও শীতলা

১। ঐ, পৃঃ ৭২৪ হইতে উদ্ধৃত।
২। ঐ, পৃঃ ৭২৮।
৩। Dr. B. Bhattacharyya, Sādhanamālā, Parṇaśabarī-Sādhanam, pp. 306-307

মন্ত্রের' পরিকল্পনাও এই চিন্তাধারা হইতে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। হয়ত বিশেষ শক্তিসম্পন্না মানবী শীতলা প্রথমে তাঁহার ভক্তগণকর্তৃক এবং পরে নিম্নশ্রেণীর জনগণকর্তৃক অর্চিতা হইয়াছেন। এইভাবে মানবী-শীতলা দেবী-শীতলায় উন্নীতা হইবার ঐতিহাসিক পথ নির্দেশ করা যাইতে পারে। তবে তাহা একান্তই অনুমানসাপেক্ষ। এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে শীতলা অভিজাত সমাজের দেবী নহেন, অনার্যসমাজ হইতে এই দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহার পূজারিগণও নিম্ন সমাজের বাসিন্দা। এই জন্যই শীতলামঙ্গল কাহিনীতে দেখা যায় শিবভক্ত রাজা চন্দ্রকেতু শীতলাপূজায় তাঁহার একান্ত অস্বীকৃতি ঘোষণা করিয়া শৈবধর্মের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশেষ পরিবেশে শীতলা পূজা উদ্ভূত হইয়াছে। এই কাব্যের মধ্যে উচ্চাঙ্গের আদর্শ, রূপগত সংহতি ও সুগ্রথিত কাহিনীবিন্যাসের অভাব এবং পৌরাণিক কাহিনীর পরিবর্তে অবিমিশ্র লৌকিক কাহিনীর প্রাধান্য শীতলাদেবীর এক বিশেষ শ্রেণিগত পরিচয় বহন করিতেছে।

শীতলামঙ্গলের কবি শ্রীবল্লভের কাব্যে অনাসক্তি ও সংসার বৈরাগ্যের দূর প্রতিধ্বনিও লক্ষিতব্য—

কেবা কার পুত্রবধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই, শুন এই কথা ॥[১]

শোক প্রকাশের চরম মুহূর্তে কঠিন বৈরাগ্যের অনুধাবনদ্বারা চিত্তবৃত্তিকে সংযত করার এই প্রচেষ্টা বৌদ্ধ চিন্তাধারার মধ্যেই সর্বাধিক মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

৭। ষষ্ঠীমঙ্গল

ষষ্ঠীদেবী বেদবহির্ভূতা। প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ বা ধর্মসাহিত্যে তাঁহার স্থান হয় নাই। অর্বাচীন পুরাণাদিতে এই অনভিজাত দেবী উপস্থাপিতা হইয়াছেন। মনসা, চণ্ডী ও শীতলার ন্যায় ষষ্ঠীও আভিজাত্যহীন সমাজের মৃত্তিকায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়া পরবর্তীকালে দুর্গার প্রকারভেদরূপে অভিজাত সমাজে গৃহীতা হইয়াছেন।[২] এইজন্য ষষ্ঠীদেবীর পূজাপদ্ধতি, মূর্তি পরিকল্পনা অভিজাত দেবকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন।

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩৬ হইতে উদ্ধৃত।

২। Dr. A. Bhattacharyya, 'The Cult of Sasthi in Bengal', Man in India, XXVIII, 1948, pp. 152-62.

ষষ্ঠীদেবী কালো বিড়ালবাহনা, শিশুর রক্ষয়িত্রীরূপিণী শক্তি। কল্যাণী মাতৃমূর্তিরূপেই দেবায়তনে তাঁহার উপস্থাপনা। ষষ্ঠীমঙ্গল কাহিনীতে ছোটরাণী ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় তাঁহার পুত্রদের ফিরিয়া পাইয়াছেন। কবি শঙ্করের কাব্যে সপ্তশিশুবেষ্টিতা ছোট রাণীর অপূর্ব মাতৃ প্রতিমা চিত্রিত হইয়াছে। এই বাৎসল্য চিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন—

ষষ্ঠী ও বৌদ্ধ হারীতী দেবী

ডালেতে বসিয়া যেন পক্ষী করে রা।
সেই মত শব্দ করে পাইয়া নিজ মা॥[১]

কবির এই বর্ণনায় বাৎসল্যের পরম সৌন্দর্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ছোটরাণী চিরন্তনকালের অনুপম মাতৃপ্রতিমা। সপ্তশিশুর পেলব স্পর্শে ও কলকাকলীতে তাঁহাকে যে মাতৃত্বের পরিপূর্ণতা প্রদান করিয়াছে বৌদ্ধ ভাস্কর্যে শিশু-পরিবৃতা হারীতীদেবীর রূপাবয়বে তাহা কেবল বিধৃতই হয় নাই, বাস্তবতার ঐতিহ্যে জীবন্ত ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাস্কর্যে মাতৃরূপিণী হারীতীদেবীর অঙ্কে একটি শিশু নিবিড় ভাবে মাতৃস্তন্য আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহার দুই স্কন্ধে দুইটি শিশু, পদনিম্নেও দুইটি শিশু ক্রীড়ারত। শিশুদের মুখে মাতৃসাহচর্যের আনন্দ-রেখা। হারীতীদেবীর মুখাবয়বেও বাৎসল্যের গূঢ় সৌন্দর্য উদ্ভাসিত। তাঁহার পরিধেয় এবং আভরণের মধ্যেও একটা সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে[২]। এই হারীতী যেন কবি শঙ্করের চিত্রিত ছোটরাণীর প্রস্তরীভূত প্রতিমা।

ই-ৎসিং-এর বিবরণ অনুযায়ী হারীতী উত্তরভারতে সন্তানদাত্রী দেবীরূপে বন্দিতা হইতেন। ভারতবর্ষ হইতে হারীতী যখন চীনদেশে গমন করেন, সেইখানেও তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যকে বহন করিয়া Giver of Sons[৩] (Sung-tse)-রূপে রূপায়িতা হইয়াছেন। চীনে ও জাপানে যুগপৎ হারীতীর সন্তানদাত্রী কল্যাণী প্রতিমা এবং সন্তান অপহণকারিণী যক্ষিণী প্রতিমা দুই-ই পাওয়া যায়। বৌদ্ধকাহিনী মতে হারীতী পঞ্চশত সন্তানের জননী ছিলেন, চারিশত নিরানব্বইটি শিশুকে তিনি নিজেই হত্যা করেন। কনিষ্ঠ সন্তান

১। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪৭ হইতে উদ্ধৃত।

২। V. Smith, A History of Fine Art in India and Ceylon, 1911, pp. 114—15.

৩। Gods of Northern Buddhism, op. cit. Pl. XXIX. A.C.

পিঙ্গোলকে ভগবান বুদ্ধ তাঁহার নিকট হইতে অপহরণ করিয়া আপন ভিক্ষাপাত্রে লুকাইয়া রাখেন। এইভাবে শিশু পিঙ্গোলের জীবন রক্ষা পাইল। হারীতীও তাঁহার অন্যায় আচরণের জন্য লজ্জিতা হইয়া বুদ্ধদেবের শরণ গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি বুদ্ধ ভিক্ষুণীর জীবন বরণ করেন।[১] সম্ভবতঃ হারীতী প্রথমে সন্তান অপহরণকারিণী যক্ষিণীরূপে[২] এবং পরে সন্তানদাত্রী দেবীরূপে বৌদ্ধসাহিত্যে এবং শিল্পে রূপাবয়ব গ্রহণ করিয়াছেন। হারীতীর এই সংশোধিত পরিমার্জিত নবজীবন তাঁহাকে শিশুহত্যার বিভীষিকাময় কালপরিবেশ হইতে মাতৃত্বের ঐতিহ্যে সম্মানিতা কল্যাণী প্রতিমারূপে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে। জননীরূপা হারীতী এবং ষষ্ঠী প্রতিমার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দুইজনেই কল্যাণী, সন্তানদাত্রী, আবার দুইদেবীই সন্তান পরিবৃতা।

ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্যের কবি শঙ্করের কাব্যে বন্ধ্যা ছোটরাণীকে দেবী 'সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন' পুত্রবর দান করিয়াছেন। অপুত্রককে পুত্রদান, বন্ধ্যানারীকে সন্তানবর প্রদান করিয়া সৃজনহীন উষরতাকে পূর্ণতায় দীপ্ত করিয়া তুলিবার মধ্যেই ষষ্ঠী-দেবীর অনন্যাসাধারণ মহিমা সূচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ হারীতীদেবীও উত্তর ভারতে বন্ধ্যা নারী এবং অপুত্রক পুরুষ কর্তৃক সন্তানদাত্রীরূপে বন্দিতা হইয়াছেন। গান্ধার শিল্পেও তাঁহার বহু শিশুর প্রাণোত্তাপে উজ্জ্বল, স্নেহশীলা মাতৃমূর্তি রূপায়িত হইয়াছে। তাঁহার হস্তে একটি সুকুমার শিশুবিধৃত, আরো কয়েকটি শিশুও তাঁহার স্নেহসুধা আস্বাদনের জন্য লালায়িত।[৩] শিশুদের মধ্যে একটা সজীব প্রাণবত্তার ছাপ সুস্পষ্ট। হারীতীর বাৎসল্য রসোজ্জ্বল মুখাবয়বে মাতৃত্বের ছাপ স্পষ্ট চিহ্নিত। সম্ভবতঃ ভগবান বুদ্ধের নিকট নবজীবনমন্ত্র লাভ করিয়া যক্ষিণী হারীতী সন্তানহীন মাতাপিতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিস্বরূপা হইয়া উদার মাতৃত্বে পূর্ণদীপ্তা হইয়াছেন। যক্ষিণীর এই পরিশ্রুত ঐতিহ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠী এবং বৌদ্ধ হারীতী একাত্ম হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আরো একটি মনোরম কাহিনী পাওয়া যায়। এই কাহিনীটিতে বুদ্ধের কৃপাধন্যা যক্ষিণী শিশুখাদিকা হইতে শিশুর রক্ষয়িত্রীতে

১। Gods of Northern Buddhism, op. cit. p. 75.

২। বৌদ্ধকাহিনী মতে হারীতী রাজগৃহের সমস্ত শিশুকে হরণ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্তান হরণ করিবার এই ক্ষমতার জন্যই তাঁহার 'হারীতী' নামকরণ হইয়াছিল।

৩। Gods of Northern Buddhism, op. cit. p. 75

উত্তীর্ণা হইয়াছেন। কাহিনীটি[১] এই—কোন বন্ধ্যা রমণী প্রবল ঔষধিবলে তাহার গর্ভবতী স্বপত্নীর জীবনপাত করিয়াছিল। মৃত্যু সময়ে সন্তানহারা জননী কামনা করিল—তুমি আমার তিনটি সন্তানের জীবন নষ্ট করিয়াছ। আর জন্মে আমিও যক্ষিণী হইয়া তোমার সন্তানের জীবন সংহার করিব। প্রবল বাসনাবলে সেই রমণীও তাহার সপত্নী আরো দুই বার নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব জন্মকৃত অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। তৃতীয়বারে একজন যক্ষিণীরূপে অন্যজন শ্রাবস্তী নগরে মানবীরূপে জন্ম গ্রহণ করিল। বিবাহের পর রমণীটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। যক্ষিণী গৃহবধূর বন্ধুর ছদ্মবেশে গৃহে প্রবেশ করিয়া নবজাত শিশুটিকে হত্যা করিয়া পলাইয়া যায়। দ্বিতীয়বারেও যক্ষিণীর হাতে অনুরূপভাবে তাহার আর একটি শিশুর জীবনদীপ নির্বাপিত হইল। তৃতীয়বারে গৃহবধূ পিতৃগৃহে গমন করিয়া নবজাত সন্তানের জীবন রক্ষা করিল। কিন্তু নামকরণ দিবসে যখন জননী শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিল তখন হঠাৎ যক্ষিণী আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীতা জননী সন্তানটিকে বক্ষে চাপিয়া দ্রুতপদে নিকটবর্তী আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং ভগবান বুদ্ধের চরণপ্রান্তে শিশুটিকে রাখিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিল। তথাগত শিশুখাদিকা যক্ষিণীকে আহ্বান করিয়া তাহাকে ধর্মদেশনা প্রদান করেন।[২] তাঁহার দেশনা শ্রবণ করিয়া যক্ষিণী হত্যাকার্যে প্রতিনিবৃত হইল। সেইদিন হইতে সে শিশুর পালনের ও সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিল। এই কাহিনীটিও শিশুখাদিকা যক্ষিণীকে শাশ্বত মাতৃত্বের আসনে অভিষিক্তা করিয়াছে। অরণ্যষষ্ঠীর[৩] মাহাত্ম্যসূচক যে কাহিনীটি বাংলাসাহিত্যে প্রচলিত আছে তাহার সঙ্গে উল্লেখিত বৌদ্ধকাহিনীর যেন দূর সংযোগ রহিয়াছে। এই কাহিনীতে আছে গর্ভবতী ছোটবধূ লোভবশত ষষ্ঠীদেবীর পূজার নৈবেদ্য নিজে খাইয়া ফেলিয়াছে। পরে শাশুড়ীকে বলিয়াছে—'এক কালো বিড়াল সব খাইয়া গিয়াছে।' কালো বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন। সে ইহা শুনিতে পাইয়া ছোট বধূর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

ষষ্ঠী ও বৌদ্ধ যক্ষিণী

১। ধম্মপদ অট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, কালিযক্খিণী। পৃঃ ৪৫-৫৩,

২। ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥
—ধম্মপদ, যমকবগ্গো, শ্লোকসংখ্যা ৫।

৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪২—৭৪৩।

হইল। তাহার মনে ছোটবধূর উপর প্রতিশোধ লইবার প্রবল বাসনা জাগ্রত হইল। যথাসময়ে ছোটবধূ একটি সন্তানের জন্মদান করিলে কালো বিড়াল জননীর অজ্ঞাতে সূতিকাগৃহ হইতে নবজাত শিশুটিকে মুখে করিয়া পলাইয়া গেল। এইভাবে কালো বিড়ালের প্রতিশোধ স্পৃহার অনলে ছোটবধূর একে একে ছয়টি নবজাত শিশুপুত্রের জীবনাহুতি প্রদত্ত হইল। সপ্তমবারে নবজাত শিশুটিকে কোলে লইয়া জননী সারারাত সতর্ক পাহারায় বসিয়া রহিল। কিন্তু এবারেও রাত্রিশেষের কোন এক অসতর্ক ক্ষণে কালো বিড়াল মাতৃঅঙ্ক হইতে শিশুটিকে লইয়া পলাইয়া গেল। সহসা জাগিয়া উঠিয়া ছোট বধূও পলায়নপর কালো বিড়ালের পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। কালো বিড়াল শিশুটিকে ষষ্ঠীদেবীর নিকট উপস্থিত করিল। ষষ্ঠীদেবী কালো বিড়ালের এই নিষ্ঠুর ও দুঃসহ অপকীর্তির জন্য তাহাকে অনুযোগ করিলেন। ছোট বধূকেও তাহার অপরাধের বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় জননী তাহার সাতটি সন্তানকে আবার ফিরিয়া পাইল। কাহিনীদ্বয়ের একদিকে কালো বিড়াল ও ছোটবধূ অন্যদিকে যক্ষিণী ও শ্রাবস্তীর গৃহস্থবধূ দুই জোড়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। মৃত্যু বিভীষিকাময় অন্ধকার পরিবেশে তাহারা যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া তাহারা পরস্পরের মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার কাহিনীর শেষাংশে একদিকে বুদ্ধ, অন্যদিকে ষষ্ঠীর আবির্ভাবে শিশু বিনষ্টির সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। নবজীবনমন্ত্র পাইয়া যক্ষিণী নূতন মত ও পথকে বরণ করিয়া লইয়াছে, ছোটবধূও সাতটি মৃত শিশুকে আবার ফিরিয়া পাইয়াছে। বুদ্ধদেবের ক্ষমামন্ত্র যক্ষিণীকে দেবীত্বে উন্নীতা করিয়াছে, ষষ্ঠীদেবীর ক্ষমা ছোটবধূকে মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে।

বৌদ্ধসাহিত্যে জলজপ্রাণী, মনুষ্যখাদক কুম্ভীর ইত্যাদি 'সুসু' নামে পরিচিত হইয়াছে।[১] কুম্ভীর স্থানীয় শিশুদিগকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিত বলিয়াই তাহার এই নামকরণ হইয়াছিল। কুম্ভীর জলজ-প্রাণী, আবার জলের প্রতি শিশুরও চিরন্তন আকর্ষণ। বৌদ্ধ সুসু বা শিশুমার পরবর্তীকালে বাঙালী মায়েদের নিকট জলের ফাঁড়ায় পরিণত হইয়া তাহার কবল হইতে রক্ষার জন্য 'জলষষ্ঠীর'

জাতাপহারিণী ও শিশুমার

১। 'কুম্ভীলা মকসা সুসু'—Fausboll, Jātaka, Vol, VI, p. 587.

পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল কিনা কে বলিবে? বাঙলাদেশের লৌকিক দেবী 'জাতাপহারিণী'—যে দেবী নবজাত শিশুকে হরণ করে তাহার সঙ্গে শিশুমার এবং হারীতীর পূর্ব স্বরূপ যক্ষিণী চরিত্রের মিল পাওয়া যায়। ইহারা শিশুর অনিষ্টকারী শক্তি এবং শিশুমৃত্যুর কারণস্বরূপ।

৮। রায়মঙ্গল

বাঙলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল অরণ্যাকীর্ণ ও ব্যাঘ্রের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। বাঙালী তাহার অমিত বাহুবল ও দুর্জয় সাহস দ্বারা এই সমুদ্রমেখলা নিবিড় জলাকীর্ণ বনপ্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ব্যাঘ্র, সর্প ও কুম্ভীর তাহার চিরন্তন শত্রু। এই শত্রুকে সে বাহুবলে জয় করিয়াছে, আবার শুধু জয় করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, ইহাদের উপাস্য বা অধিষ্ঠাতৃ দেবতার কল্পনা করিয়া সেই দেবতার উদ্দেশ্যে পূজার অর্ঘ্যও নিবেদন করিয়াছে। রায়মঙ্গল কাব্য বাংলার দক্ষিণাঞ্চল সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের কাহিনী।

হিংস্র পশুকুলের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়াই মানুষের অন্তরে পশুকুলের দেবতার কল্পনা জাগ্রত হইয়াছে এবং সেই দেবতার আরাধনা করিয়া ভয়ঙ্কর ও নরখাদক পশুকুলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইয়াছে।[১] এই ভাবেই আদিম মানবসমাজে পশুপূজাবিধি প্রবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং পশুপূজা উন্নত আর্যদেবকল্পনার বিরোধী।

কেবল দক্ষিণবঙ্গের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ই নহেন, উত্তরবঙ্গের সোনারায়, পূর্ববঙ্গের বাঘাই এবং কালু রায় বাঙলার স্থানে স্থানে পরিচিত। ইহারা সম্ভবতঃ নরদেবতা, প্রকৃত দেবতা নহেন। সম্ভবতঃ কোন নির্ভীক অরণ্যবাসী পুরুষ আপন বাহুবলে অরণ্যের ব্যাঘ্রকুল নির্মূল করিয়া অরণ্যবাসীদিগকে নির্ভয় ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন। পরবর্তীযুগে তাঁহার নর জীবনের উপর দৈবী মহিমা আরোপ করিয়া তাঁহাকে দেবত্বে উন্নীত করা হইয়াছিল। বাঙলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ব্যাঘ্রদেবতা 'দক্ষিণরায়' ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আসীন, হস্তে ধনুঃশর, উন্নত শিল্পসৌন্দর্যের প্রতীক উজ্জ্বল ও সুগঠিত দেহকান্তিবিশিষ্ট। ইনি পুরুষ দেবতা। বজ্রযান দেবায়তনে কয়েকটি পশু নারীদেবতারূপে পূজিতা হইয়াছেন। 'নিষ্পন্নযোগাবলী' গ্রন্থে তাঁহাদের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহাদের একজন ঘোটকমুখী, তিনি পূর্বদ্বারের প্রহরী, অন্যজন

১। Dr. A. Bhattacharyya, 'The Tiger-Cult and its Literature in Lower Bengal.' Man in India, XXVII, 1947, pp. 44—56.

শূকরমুখী, তিনি দক্ষিণদ্বারের দেবী। আর একজন কুকুরমুখী, তিনি পশ্চিমদ্বারে অবস্থান করেন। চতুর্থজন সিংহমুখী, এই দেবী উত্তরদ্বারে অবস্থিতা।

তিব্বতের 'পঞ্চ মহারাজ' এবং বাঙলার ব্যাঘ্রদেবতা শিল্পী ও কবিমনের একই চিন্তাধারাকে সমুচ্ছ্বাসিত করিয়াছে। তিব্বতীয়দের বিশ্বাস 'পঞ্চ মহারাজ' মানুষকে সমস্ত অনিষ্টকারী শক্তির আক্রমণ ও প্রতিঘাত হইতে রক্ষা করে এবং মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে। পণ্ডিত Waddell ইঁহাদের spirit of demonified Heroes বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইঁহারা উত্তর মঙ্গোলিয়াবাসী পঞ্চভ্রাতা ছিলেন।[১] ইঁহাদের একজন রক্তবর্ণ ব্যাঘ্রারোহী, তিনি বৌদ্ধ মঠের রক্ষক। দ্বিতীয়জন পীতবর্ণ সিংহারোহী, তৃতীয়জন পীতবর্ণ অশ্বারোহী, অন্যজন নীলবর্ণ কূর্মারোহী, তিনি নাগদেবতা। পঞ্চম জন পীতবর্ণ মৃগারোহী। আবার কোন কোন মতে পঞ্চ মহারাজের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম তিনি ষড়্‌ভুজ, শ্বেতবর্ণ এবং শ্বেতসিংহারোহী। তিনি তরবারি, কর্তৃ, তীর এবং ধনুক ধারণ করেন।[২] সম্ভবতঃ ইঁহারা সকলেই বাঙলার ব্যাঘ্রদেবতার ন্যায় যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং বিশেষ বিশেষ পশুর সংস্রব হেতুই তাঁহাদের অনুরূপ স্বভাববৈশিষ্ট্য ও রূপগত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছে। ইঁহারা বাংলার ব্যাঘ্রদেবতার ন্যায় স্বকীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্যের জন্য পরবর্তীযুগে মানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে আরোহণ করিয়াছিলেন। বাঙলার ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় সম্বন্ধেও প্রচলিত অনুমান—তিনি বাঙলার সুন্দরবন অঞ্চলের একজন বিখ্যাত মৃগয়াজীবী ছিলেন। তাঁহার অব্যর্থ শরাঘাতে সিংহব্যাঘ্রাদি বহু বন্যপশু এবং কুম্ভীরাদি জলজপ্রাণীর জীবনান্ত ঘটিয়াছিল।

তিব্বতী পঞ্চমহারাজ ও বাঙলার ব্যাঘ্র দেবতা

উত্তরবঙ্গের ব্যাঘ্রদেবতা সোনারায়ের কাহিনী ছড়ায় নিবদ্ধ হইয়াছে। এই ছড়ায় ধর্মঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সোনারায় ও কালুরায়ের কাহিনী সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে নাই।

৯। সারদামঙ্গল

আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া প্রথম সরস্বতী নদীতীরে বসতি স্থাপন করেন। এই নদীতীরে বসিয়া তাঁহারা বহু বেদমন্ত্র রচনা করেন।

১। Buddhism in Tibet, op. cit, p. 477

২। Gods of Northern Buddhism, op. cit, pp. 150—51.

পরবর্তীযুগে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তাঁহারা সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনের দেবী সরস্বতী বৌদ্ধগণ কর্তৃকও সমানভাবে অর্চিতা হইয়াছেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ তাঁহার বহুরূপ কল্পনা করিয়াছেন। বৌদ্ধদের নিকট বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাগীশ্বরী প্রজ্ঞাপারমিতা, সরস্বতী এবং মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি দেবদেবী নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৌদ্ধদের সরস্বতীরও মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রশারদা, আর্যসরস্বতী, বজ্রসরস্বতী প্রভৃতি বহুমূর্তি কল্পিত হইয়াছে।[১] বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রী এবং প্রজ্ঞাপারমিতা জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির অধিদেবতা। এইভাবে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী হিন্দুবৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের উপাস্যা হইয়াছেন।

সারদামঙ্গল কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা এবং বৈদিক সরস্বতী এক নহেন। একজন জ্ঞানদাত্রী, বিদ্যা ও কারুশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী, অন্যজন লৌকিক দেবী। তবে মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেবী-চরিত্রের সঙ্গে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী মর্ত্যধামে আপন পূজা বিস্তারের জন্য লালায়িত, কিন্তু, সারদামঙ্গলকাব্যে লক্ষধরের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শনের পূর্বেও তাঁহার পূজা মর্ত্যধামে প্রচলিত ছিল। অতএব নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, নিতান্তই দয়াপরবশ হইয়া তিনি লক্ষধরকে বধ্যভূমি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সারদামঙ্গলকাব্যের সারদা দয়া ও ক্ষমার প্রতিমূর্তি। কিন্তু বিদ্যা যাহাদের জীবিকার উপায় সেই জ্ঞানগুরু ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার কৃপাবিন্দু বর্ষিত হয় নাই। বর্ণজ্ঞানহীন মূর্খকেই তিনি অজস্রধারায় কৃপাবর্ষণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গৌরীদাস ও জনার্দনের প্রতি তাঁহার এতটুকু সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের প্রতি কবিমনের প্রতিক্রিয়ার পরিণাম হওয়াই সম্ভব।

১০। **সূর্যমঙ্গল**

বাংলা সৌরকাহিনীসমূহের মধ্যে অনুরাগ, স্নেহ ও প্রীতির মধুর মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়াছে। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন এই কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"এখানে বৌদ্ধ যুগাবসানে সাংসারিক বিতৃষ্ণা ও বিরাগ ঘুচিয়া সুকোমল ভাবরাশি বাঙ্গালীর হৃদয়ে কিভাবে উপ্ত হইয়াছিল তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম।[২] প্রকৃতপক্ষে যে অনুরাগ ও

১। Indian Buddhist Iconography, pp. 849—52.

২। বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, ১৩৪১, পৃঃ ৫৭৭।

আত্মসমর্পণ সৌরকাহিনীর বৈশিষ্ট্য মহাযান বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই তাহা প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পরবর্তীযুগে তান্ত্রিক বজ্রযান ধর্মে তাহা দ্বৈত প্রেমতত্ত্বে পর্যবসিত হইয়া নূতন জীবনচেতনা ও মূল্যবোধের বাহনরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। শৈব, সৌর ও বৈষ্ণবধর্মের মধ্যেও সেই অনুরাগ নবরূপে পুনর্জীবিত হইয়াছে।

কবি রামজীবন তাঁহার আদিত্যচরিত বা সূর্যের পাঁচালী কাব্যে হাড়ি জাতি নিগ্রহের বর্ণনা দিয়াছেন। পণ্ডিতগণের বিশ্বাস কবি সৌর উপাসককর্তৃক বৌদ্ধ নির্যাতনের কাহিনীকে উপলক্ষ করিয়া ইহা রচনা করিয়াছেন।

১১। তীর্থমঙ্গল

তীর্থমঙ্গল কাব্যে কবি বিজয়রাম সেন বুদ্ধগয়ার বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

সেই স্থানে কত দেব প্রস্তরনির্মাণ।
তাঁহে প্রণমিয়া গোসাঞি
কাশীরাজার ইষ্ট হন অঙ্গে শোভে ছাই ॥[১]

বুদ্ধগয়া ভারতের অন্যতম বৌদ্ধতীর্থ। গয়া মাহাত্ম্যে বোধিতরুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু-শিবাত্মক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[২] এইজন্য মহাবোধিতরুকে বন্দনা করিয়া গয়াধামের অন্যতম বিষ্ণুদেবতা বুদ্ধকে বন্দনা করিবার নির্দেশ রহিয়াছে। কারণ অশ্বত্থরূপী বোধিবৃক্ষ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক।[৩]

বুদ্ধরূপে বিষ্ণুর আবির্ভাব কল্পনা ভারতীয় আর্যধর্মের বিরাটত্ব এবং সর্বধর্মে সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। হিন্দুবৌদ্ধ ধর্ম-সমন্বয়ের অগ্রদূত কবি জয়দেব সর্বপ্রথম বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। ধর্মসমন্বয়ের এই মহত্তম আদর্শ পরবর্তী যুগের কবিদেরও প্রেরণা দিয়াছে। তীর্থমঙ্গল কাব্যের কবি বিজয়রাম সেনও বৌদ্ধ স্মৃতিপূত তীর্থক্ষেত্র বুদ্ধগয়াকে সশ্রদ্ধায় স্মরণ করিয়াছেন।

১। তীর্থমঙ্গল : বিজয়রাম সেন বিশারদ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ১৩১২, পৃঃ ৯০-৯১

২। ধর্মং ধর্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধিতরুং নমেৎ ;
নমস্তেঽশ্বত্থরাজায় ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মনে ॥
—তীর্থমঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১। পাদটীকা নং ১২০।

৩। অশ্বত্থরূপিণং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষং বৃক্ষরূপধরং হরিম্ ॥
—তীর্থমঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২, পাদটীকা নং ১২০।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব সাহিত্য

অর্বাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যে পাওয়া যায় আদিবুদ্ধ সৃষ্টির আদিতে শূন্যলোকে অবস্থান করিতেছিলেন। সৃষ্টিমানসে তিনি 'দ্বিতীয়' একজনকে কামনা করিলেন। ইচ্ছামাত্র তিনি দ্বিধাবিভক্ত হইলেন। একজন 'আদিবুদ্ধ'—তিনি শূন্য বা উপায়। তিনিই শূন্যপ্রভু নিরঞ্জন। অন্যজন আদিপ্রজ্ঞা, তিনিই আদি জননী, নারীরূপা। ইহারা চরম সত্যের দুইরূপ—উপায় ও প্রজ্ঞা, পুরুষ ও প্রকৃতি। মিলনে যাহা 'এক', আত্মতৃপ্তি ও সৃষ্টিবাসনায় তাহাই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া 'দুই'। এক অখণ্ড সত্যেরই যেন দ্বিবিধ প্রকাশ। উপায় ও প্রজ্ঞা আদিতে গভীর আলিঙ্গনে একদেহে একীভূত অবস্থায় ছিলেন—ইহাই 'এক' অনন্ত ও শাশ্বত সত্য। আবার ইচ্ছামাত্র দ্বিধাবিভক্ত হইয়া উপায় ও প্রজ্ঞারূপে—পুরুষ ও নারীরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। ইহাই চরম সত্যের দ্বিবিধ রূপ। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় উপায় ও প্রজ্ঞা শূন্যতা ও করুণার প্রতীক। দুই-এর মিলিত রূপই যুগনদ্ধ। ইহাই সামরস। এই মিলনেই মহাসুখের অভ্যুদয় ঘটে। শ্রীহেবজ্রতন্ত্রে বলা হইয়াছে, মহাসুখই চরম সত্য—ইহাই ধর্মকায়—ইহাই ভগবান বুদ্ধ। মহাসুখ কালো, ইহা হরীত, ইহা রক্তবর্ণ, ইহা শ্বেতবর্ণ, ইহা সবুজ, ইহা নীল—ইহাই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। মহাসুখই প্রজ্ঞা, মহাসুখই উপায়। 'মহাসুখ' নিজেই পরিপূর্ণ মিলন। ইহা সদর্থক, আবার ইহা নঞর্থকও—ইহাই 'বজ্রসত্ত্ব'।[১] প্রজ্ঞা ও উপায়ের মহামিলনে দ্বৈততত্ত্বের অস্তিত্ব নাই—ইহা অদ্বৈত। দ্বিত্ব এইখানে একত্বে পরিণত হইয়াছে। ইহাই তান্ত্রিক বৌদ্ধদের যুগনদ্ধের বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধতন্ত্রের পরম দেবতা 'বজ্রসত্ত্ব' হইতেই স্থাবর-জঙ্গম উদ্ভূত হইয়াছে। তিনি সকল গুণের নিধিস্বরূপ।[২] তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত, অনাদি, মহান, সর্বাত্মা এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। তিনিই মহাসুখ—

প্রজ্ঞোপায়বাদ ও রাধাকৃষ্ণবাদ

অনাদি নিধনং সত্ত্বো বজ্রসত্ত্বঃ পরং সুখম্।[৩]

১। Hevajra-Tantra, Ms. p. 85 (B)—S. B. Dasgupta, Obscure Religious Cult, 1962, p 84.

২। ধ্যায়েৎ শ্রীবজ্রসত্ত্বং সকল গুণনিধিং—

৩। জ্ঞানসিদ্ধি : ইন্দ্রভূতি, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ,—S. B. Dasgupta, Introduction to Tantric Buddhism, p 89.

তিনিই অনন্ত জ্ঞানের আধার এবং করুণাঘন দেবতা আদিবুদ্ধ। বৌদ্ধতন্ত্রে তাঁহার শক্তিও কল্পনা করা হইয়াছে। তিনি বজ্রধাত্বীশ্বরী বা বজ্রবারাহী। বজ্রসত্ত্ব উপায় এবং বজ্রবারাহী বা বজ্রধাত্বীশ্বরী প্রজ্ঞা। উপায় চিরস্থির অপরিবর্তনীয়, জ্ঞানাত্মক। প্রজ্ঞা চঞ্চলা, গতিশীলা, ক্রিয়াত্মক। প্রজ্ঞা ও উপায়ের ঘনীভূত মিলন—যে মিলনে

উভয়োর্মেলনং যশ্চ সলিলক্ষীরয়োরিব।
অদ্বয়াকারযোগেন প্রজ্ঞোপায়ঃ স উচ্যতে ॥[১]

এই মধুর যুগল লীলার নিদর্শন কেবল মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধসাহিত্যেই নহে বৌদ্ধশিল্পেও পাওয়া যায়। বৌদ্ধদেবদেবীসমূহের গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগল মূর্তিসমূহের মধ্যে নাহার সংগ্রহের হেবজ্র প্রতিমা[২] তুলনারহিত। এই প্রতিমায় একাধারে নৈর্ব্যক্তিক পূর্ণতা এবং চিরন্তন আনন্দময়তা পরম মহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। এই মূর্তিটি যেন মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের 'মহাসুখবাদ' তত্ত্বের প্রস্তরীভূত প্রতিমা।

বাঙালাদেশে পালরাজত্ব যেমন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রসারের 'সুবর্ণযুগ' ছিল, তেমনি সেনরাজত্বে রাধাকৃষ্ণকে উপজীব্য করিয়া বৈষ্ণব সাধনা প্রসারিত হইতে আরম্ভ করে। বৌদ্ধদিগের 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়' বৈষ্ণবদিগের 'রাধা ও 'কৃষ্ণ'। বৌদ্ধদিগের যুগনদ্ধ রূপ বৈষ্ণবের যুগল-লীলায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে বৈষ্ণবীয় যুগল-লীলা বৌদ্ধসাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, বরং তাহারই উত্তরসাধক। বৌদ্ধসাধনায় যাহা ছিল কুঁড়িমাত্র, বৈষ্ণবের সাধনায় তাহা ধীরে ধীরে দলে দলে বিকশিত হইয়া সহস্রদলপদ্মে আপনাকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে, এবং সৌন্দর্যে ও সৌগন্ধ্যে, রসে ও পূর্ণতায় ভুবন বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছে। বৌদ্ধ সহজযানীদের একটি সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণ লীলাকে নরনারীর মিথুনাত্মক ধর্মতত্ত্বের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট রাধাকৃষ্ণ দেবতা নয়, তত্ত্ব বা দিব্যসত্ত্বা বিশেষ। প্রজ্ঞা ও উপায়ের অদ্বৈত মিলন ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা রাধাকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাধা প্রজ্ঞার প্রতীক, কৃষ্ণ উপায়ের প্রতীক। একজন প্রকৃতিরূপা, অন্যজন পুরুষরূপী। দুই-এর যুগল মিলনেই মহাভাব বা

১। প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫ জি. ও. এস, Vol. No. XLIV.

২ History of Bengal, Vol. I. op. cit, গ্রন্থে সংযোজিত ৫৪ নং চিত্র।

মহাসুখ। পরবর্তীকালে যুগলের প্রেমসাধনা আরো বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সুস্পষ্ট ও রসসমৃদ্ধ এবং অলৌকিক তত্ত্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণের যুগললীলা ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে নূতনত্বের দাবী করিতে পারে না। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন লীলা সুপ্রাচীন শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাযান বৌদ্ধসাহিত্য ও শিল্পের যুগনদ্ধ তত্ত্ব এবং শৈবধর্মের অর্ধ-নারীশ্বর তত্ত্বের মধ্য দিয়া বৈষ্ণবীয় যুগললীলায় চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। এইভাবে বৈষ্ণবীয় যুগললীলা প্রেমসাধনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছে।

শ্রুতির ভাষায় ভগবান রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ। তিনিই রস। শ্রীভগবানই সকল রসের আদিরস। এই রসই আনন্দ। আনন্দই রস। সুতরাং তিনি আনন্দস্বরূপ, আনন্দঘনবিগ্রহ। এই বিশ্বের মূলীভূত কারণও আনন্দ। ইহার আরম্ভে, স্থিতিতে এবং অন্তেও আনন্দ। উপনিষদের ভাষায়—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমাণি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩।৬

এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আনন্দ হইতেই জাত হইয়াছিল, আনন্দেই বিধৃত আছে, আবার আনন্দেই তাহা লয়প্রাপ্ত হইবে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবানের বহু হইবার বাসনা হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি। বৈষ্ণবের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি—আনন্দদায়িনী বৃত্তিই শ্রীরাধা। শ্রীরাধা অফুরন্ত আনন্দের প্রস্রবণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাশক্তি। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ও একাত্মক।[১] প্রেমের পরম প্রকাশ মহাভাব। শ্রীরাধা সেই মহাভাবস্বরূপিণী। বৈষ্ণবদের মতে প্রেমরস নির্যাস আস্বাদনের জন্য এবং প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। বৈষ্ণব কবিগণ

১। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ, —যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
-শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত: কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, ১।৪, পৃঃ ৩১৪—১৬।

এই শুদ্ধ মাধুর্য রসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[১] রাধাকৃষ্ণের এই একাত্মতা এবং যুগললীলার ঐতিহ্য স্বরূপ দামোদরের কড়চায় আরো সুস্পষ্ট হইয়াছে।—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

অগ্নি হইতে তাহার দাহিকা শক্তিকে, মৃগমদ হইতে তাহার সৌগন্ধ্যকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি রাধাকৃষ্ণও পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে যুগললীলায় রত, তাঁহারা দুই হইয়াও এক। এইজন্য যুগললীলায় দুই খণ্ড ধারার একীভূত পূর্ণত্বপ্রাপ্তি—দুই-এ এক, একে দুই। বৈষ্ণবকবি দ্বৈতকে অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন—

না সো রমণ না হাম রমণী
দুহুঁ মন মনোভাব পেশল জানি।

এবং—

বঁধু সে আমার এক কলেবর
দুহুঁ সে একই প্রাণ।

কৃষ্ণ মূল পরমতত্ত্ব, রাধা তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি—শক্তি ও শক্তিমানরূপে, অগ্নি ও দাহনগুণরূপে তাঁহারা পরস্পর অচ্ছেদ্য।

বৌদ্ধদিগের প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন-জনিত অসীম আনন্দানুভূতি 'মহাসুখ' আখ্যা পাইয়াছে। বৈষ্ণবগণ তাহাকেই 'মহাভাব' বলিয়াছেন। সুতরাং প্রজ্ঞোপায়ের অদ্বয় মিলনরূপ মহাসুখানুভূতি রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের সুখৈকানুভূতির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। উভয় আনন্দানুভূতিতে কোন অবসাদ নাই, কোন নির্বেদ নাই। কিন্তু বৌদ্ধপ্রজ্ঞা পরমশক্তিরূপিণী, সৃষ্টির মূলীভূত কারণ—আদি জননী। আর বৈষ্ণবের রাধা কেবল প্রেমরূপিণী। হেবজ্র প্রতিমা জ্ঞান ও পূর্ণতায়, অনুরাগ ও নিস্পৃহ ঔদাসিন্যে দ্বন্দ্ব জটিল। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনে কেবল আনন্দ ও রস। বৌদ্ধদের চরম লক্ষ্য

১। গোলক বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে।
তুয়া সঙ্গ অঙ্গ পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে॥
—দীন চণ্ডীদাস পদাবলী, ১ম খণ্ড, মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, ১৪১ সং পদ।

আপনদেহে উভয় তত্ত্বের—প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন-জনিত সামরস্য বা মহাসুখ উপলব্ধি করা। সাধক শূন্যরূপিণী নৈরাত্মাদেবীকে আলিঙ্গন করিয়া মহাসুখ অনুভব করেন। নৈরাত্মাদেবী প্রজ্ঞা, তিনি নারীরূপিণী এবং সাধক পুরুষের প্রতীক। সুতরাং বৌদ্ধদের নিকট যাহা ছিল যোগসাধনা মাত্র বৈষ্ণবদের নিকট তাহাই প্রেমসাধনায় পরিণত হইয়া মধ্যযুগীয় বঙ্গসংস্কৃতিকে নূতন ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। এই নূতন সম্পদের অধিকারী হওয়ায় বৈষ্ণব সাধনা ও চিন্তাধারা প্রবীণধারার উত্তরসাধক হইয়াও নবীন, চির পুরাতন হইয়াও নূতন কল্পচেতনার উদ্বোধক।

বৈষ্ণবধর্মের ক্ষীণ অস্পষ্ট আভাস বৌদ্ধসাহিত্য ও শিল্পের মধ্যেও পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি অনুমান করিয়াছেন ঘট জাতকে[১] বৈষ্ণবধর্মের বীজ নিহিত রহিয়াছে।[২] তিব্বতী ঐতিহ্য 'কেঙ্গুরে' বিষ্ণুর উল্লেখ রহিয়াছে। বলিদ্বীপের 'কমহায়ানিকন্' নামক বিখ্যাত মহাযান গ্রন্থে বিষ্ণুবুদ্ধ স্থান পাইয়াছেন। কেবল সাহিত্যেই নয় বৌদ্ধশিল্পেও বিষ্ণু ও বৈষ্ণবধর্মের আভাস পাওয়া যায়। বলিদ্বীপের অধিবাসীদের নিকট বিষ্ণু ও বুদ্ধ প্রতিমা সমান শ্রদ্ধা পাইয়াছে। সিংহলেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কার্তিকেয় এবং মহাশ্রমণ সম্মানের বেদীপীঠে আরূঢ়। এইখানের বৌদ্ধমন্দিরেও বিষ্ণুর বিশেষ স্থান রহিয়াছে। কারণ সিংহলী বৌদ্ধদের বিশ্বাস বুদ্ধদেব বিষ্ণুকে বিশেষ সম্মান করেন।[৩] তিব্বতীয়দের নিকট হয়গ্রীব ও বিষ্ণু এক ও অভিন্ন।[৪] পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন গয়াধামে বিষ্ণু-পদচিহ্নরূপে পরিচিত প্রস্তরটি পূর্বে বুদ্ধপদ ছিল। গয়াধামে পিণ্ডদানের পূর্বে বোধিবৃক্ষকে প্রণাম করিবার বিধিও প্রচলিত আছে। অনেকের মতে পুরীর ত্রিমূর্তি—কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা পূর্বে বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ ত্রিরত্নের বিজ্ঞাপক ছিল।

বৌদ্ধ সাহিত্যে ও শিল্পে শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবধর্ম

বৌদ্ধ দেবায়তনের অন্যতম বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরকে পদ্মপাণি বিষ্ণুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি ত্রিগুণাত্মক। 'কারণ্ডব্যূহ' গ্রন্থে বলা হইয়াছে আদিবুদ্ধের নির্দেশক্রমে তিনি দেবমনুষ্যের স্রষ্টা

১। Fausboll, Jātaka, Vol. IV, no. 454.
২। H. C. Roy Choudhury, Early History of Vaisnava Sect. pp. 71-73,
৩। Antiquities of Ceylon, 1916, July.
৪। Journal of the Buddhist Text Society, 1904. Vol. II, part 11, Appendix 11, p. 6,

ব্রহ্মাকে, সংরক্ষক বিষ্ণুকে এবং সংহারদেবতা মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেন। এই গ্রন্থে আরো বলা হইয়াছে তাঁহার দুই বাহু হইতে ব্রহ্মা, দুই চক্ষু হইতে চন্দ্রসূর্য, মুখ হইতে বায়ু, দন্ত হইতে সরস্বতী, উদর হইতে বরুণ, জানু হইতে লক্ষ্মীদেবী, পদ হইতে পৃথিবী, নাভিদেশ হইতে জল এবং কেশমূল হইতে ইন্দ্র ও দেবতাগণের সৃষ্টি।[১] এইভাবে পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর ব্রাহ্মণ্য নারায়ণের সমস্ত গুণাবলী ও ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরের প্রধান স্মারকচিহ্ন পদ্মফুল, ব্রাহ্মণ্য বিষ্ণুও পদ্মপাণি। প্রতিমা শিল্পেও দুই দেবতার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন নবম শতাব্দীর একটি বিষ্ণুমূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মূর্তিটির 'বৃষস্কন্ধ, কপাটবক্ষ সৌম্য অবয়ব এবং অচঞ্চল স্থির মুখভঙ্গী বুদ্ধমূর্তিরই মত'।[২] 'লোকেশ্বর বিষ্ণু' নামে অভিহিত একটি প্রতিমায় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের সমন্বয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৩] বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির গুণাবলীদ্বারা অলঙ্কৃত আরো একটি 'লোকেশ্বর বিষ্ণু' মূর্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।[৪] সাহিত্য ও ভাস্কর্যের এই সমস্ত নিদর্শন হইতে অনুমান করা যায় বৌদ্ধধর্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম যুগে যুগে পরস্পর পরস্পরকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব কবি

মহাকবি জয়দেবের কাব্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচার আচরণের সঙ্গে বিলাসকলা কৌতূহলের চাঞ্চল্যদীপ্ত রসোল্লাস বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের ভাগবত অলৌকিক লীলারসকে তিনি আদিরসাত্মক সাহিত্যের সামগ্রীরূপে প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া লোকায়ত জীবনতৃষ্ণাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে জয়দেবের উপর বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব বর্তমান ছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের নরনারীর দৈহিক মিলন এবং জীবনবাসনার পরিতৃপ্তির মাধ্যমে চরম ও পরম সুখলাভের বাণী জীবনরসিক কবি জয়দেবকে প্রভাবিত করা অসম্ভব নয়। সহজিয়া বৌদ্ধদের নিকট যাহা ছিল নরনারীর

১। Getty, The Gods of Northern Buddhism, p. 61.

২। বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯।

৩। R. D, Banerjee, Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture, p. 125, pl XXXVIII(c)

৪। M. Ganguly, Hand Book to the Sculptures in the Vangiya Sahitya Parisad, p 789, pl. XXXVI,

জৈবিক মিলন, কবি জয়দেবের জীবনে তাহাই রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মিলনের বাহন হইয়াছে। কবি জয়দেব ও কবি-পত্নী পদ্মাবতীর কাহিনীও কবির উপর তাঁহার সমসাময়িক বৌদ্ধপ্রভাবিত লোকজীবনের প্রভাব স্মরণ করাইয়া দেয়। 'ভক্তমাল' গ্রন্থে আছে কবি কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতেন আর তাঁহার সঙ্গে পদ্মাবতী নাচ করিয়া বেড়াইতেন।

উভৌ তো দম্পতী তত্র একপ্রাণৌ বভূবতুঃ।
নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্চনতৎপরৌ।[১]

নারীপুরুষের অনুরূপ সম্মিলিত নৃত্যগীতের বর্ণনা চর্যাপদেও পাওয়া গিয়াছে।[২]

তাঁহার কাব্যে ভগবান বুদ্ধ শান্তরসের অধিষ্ঠাতা—তিনি পরম করুণার নির্ঝর। যজ্ঞে পশুবধ দর্শনে একান্ত করুণাপরবশ হইয়াই তিনি যজ্ঞবিধির প্রবর্তক শ্রুতিসমূহের নিন্দা করিয়াছিলেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ॥
কেশব, ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥[৩]

খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তন্ত্রের প্রভাবে শক্তিপূজা বিশেষ প্রাধান্য পাইয়াছে। এই সময়ে হিন্দু-বৌদ্ধ দেবদেবীরা পরস্পর পরিপূরক অনুপূরকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ উপায় ও প্রজ্ঞা—বজ্রসত্ত্ব ও বজ্রধাত্বীশ্বরী, হিন্দুদের শিবদুর্গা, বিষ্ণুলক্ষ্মী এবং রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তিতে প্রেমের সপ্তবর্ণী আলোকচ্ছটায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছেন। এই সামাজিক পরিবেশে রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক প্রণয়গাথার চারণকবি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের আবির্ভাব।

শাশ্বত প্রেমের পূজারী মহাকবি চণ্ডীদাস বাঙলার 'সহজিয়া' নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা একটি জীবন্ত সত্যরূপে তাঁহার কাব্যে রসঘন এবং ভাবনিবিড় হইয়া উঠিলেও তাঁহার সাধনপন্থা বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবে গূঢ় এবং রহস্যঘন হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাসের সাধন-সঙ্গিনী 'রামী' নাম্নী রজক কন্যা।

১। কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৩য় সংস্করণ, ভূমিকা, পৃঃ ৩১।

২। নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।—চর্যাপদ সং ১৭।

৩। কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২, শ্লোক সংখ্যা, ১৩।

জানা যায় সমাজপতিদের দ্বারা রজকিনী-সংসর্গের অপবাদে তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন এবং দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির হইতেও বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সমাজচ্যুত চণ্ডীদাস গ্রামের প্রান্তভাগে রজকিনীর কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সহজিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'রামী'ই চণ্ডীদাসের সহজ সাধনার উত্তরসাধিকা। সহজিয়া সাধনার পথে রামীর 'চরণ চারণ চক্রবর্তী' চণ্ডীদাস 'পরকিয়া' সাধকরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন।

কবির কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাশুলী বা বিশালাক্ষী। ইনি বৌদ্ধ দেবী 'নিত্যার' ষোড়শ সহচরীর অন্যতমা। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভূমিকা পাঠে জানা যায় চণ্ডীদাসের সময়ে সালতোড়া গ্রামে নিত্যা নামে এক দেবী ছিলেন। তিনি তান্ত্রিক মহাযান বৌদ্ধদেবী। 'নিষ্পন্নযোগ-বলী' মতে নিত্যা দেবী লাস্যা দেবীবৃন্দের চতুর্থা ও সর্বশেষ দেবী।

নিত্যাদেবীর সেবিকা বা ডাকিনীদের মধ্যে বাশুলী শ্রেষ্ঠা। তিনি দ্বিজকন্যা ছিলেন। সুতরাং বাশুলী মানবী হওয়াই সম্ভব। অনুমান করা যায় তিনি বৌদ্ধদেবী নিত্যার মন্দিরের সেবাদাসী ছিলেন। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মে সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি এই ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে শিষ্যদের ভক্তির প্রাবল্য তাঁহাকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিল। বাশুলীর প্রেরণায় বা প্রচেষ্টায় কবি সহজিয়া ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কবির একটি পদে আছে—

শালতোড়া গ্রাম অতি পীঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাশুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা॥
চণ্ডীদাস কহে সে এক বাশুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারি চাপড়ে নিদ ভাঙ্গিল
পিরীতি হইল সুরু॥[১]

এই পদে বাশুলীর যে পরিচয় আভাসিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে দৈবী শক্তিরূপে নয়, অলৌকিক শক্তিসম্পন্না নারী শ্রেষ্ঠারূপেই প্রতীয়মান হইতেছে। আরো একটি প্রাচীন পদে বাশুলীর মানবী পরিচয় পাওয়া যায়—

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, ১৩২৩, পৃঃ ১৯ (সম্পাদকীয় মন্তব্য)

নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
... ...
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।[১]

নিত্যা-সহচরী বাশুলীর অন্য পরিচয় তিনি ডাকিনী ছিলেন। 'ডাকিনী' জ্ঞানবৃদ্ধা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধিকা। স্বর্গত বসন্তরঞ্জন রায় লিখিয়াছেন—"ডাকিনী অর্থে সিদ্ধা। ইনি রক্তমাংসে গঠিতা মানবী, কোন উপদেবতা অথবা নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী প্রস্তরময়ী বাসুলীও নহেন'।[২] যাহা হউক সহজধর্ম প্রচারে নিযুক্তা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না বাশুলীর উপর পরবর্তীকলে দেবীত্ব আরোপিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে। বৌদ্ধ সহজযানীদের দোহায় বাশুলীর অনুরূপ সিদ্ধা বা যোগিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। সরহপাদের যোগিনী—

ঘরবই খজ্জই সহজেঁ রজ্জই কিজ্জই রাঅ বিরাঅ।
ণিঅপাস বইটঠী চিত্তে ভটঠী জোইণি মহু পড়িহাঅ॥[৩]

এই যোগিনী গৃহস্বামীকে খাইয়া সহজে বিরাজ করে, রাগ-বিরাগ করে। নিজ পার্শ্বে বসিয়া চিত্তভ্রষ্টা যোগিনী আমার কাছে উপস্থিত হইয়াছে। হয়ত চণ্ডীদাসের বাশুলীও সরহপাদের যোগিনীর ন্যায় সহজধর্ম গ্রহণ করিয়া আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করেন এবং সহজধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সরহের যোগিনী রাগবিরাগে অর্থাৎ প্রণয়কলায় পারদর্শিনী, চণ্ডীদাসের বাশুলীও প্রেমপ্রচারের গুরু। সম্ভবতঃ কবি সরহও চণ্ডীদাসের ন্যায় এই যোগিনীর প্রচেষ্টায় সহজযানী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

কবি চণ্ডীদাস বাশুলী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সহজমার্গের পথে নরনারীর যৌনসম্পর্কের পটভূমিকায় কাব্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে বৌদ্ধ সহজযানীদের উত্তরসাধকরূপে গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। তাঁহার সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত—'যখন তিনি বাশুলীর সেবক, তখন তিনি খাঁটি বৌদ্ধ, যখন

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, ১৩২৩, পৃঃ ১৬—১৭ (সম্পাদকীয় মন্তব্য)
২। ঐ, পৃঃ ১৯, সম্পাদকীয় মন্তব্য।
৩। Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, C. U. p. 20, no. 85.

রামী রজকিনীর সেবক, তখন খাঁটি সহজিয়া ; আবার রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির সেবা করিয়া তিনি বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গেলেন।'[1] মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ও চণ্ডীদাস প্রথম জীবনে বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বাশুলীই চণ্ডীদাসকে পরকীয়া সাধনার পথে রজককন্যা রামীর সহিত সম্মিলিত হইবার আদেশ দিয়াছিলেন।

রতি পরকীয়া যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার
ভজন তোমারি রজক ঝিয়ারি
রামিনী নাম যাহার ॥[2]

বাশুলী-প্রদর্শিত এই পথে ভজন-পূজন, জপ-তপের আবশ্যকতা নাই। সহজ সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা—

সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥
ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি তাহা শুন তুমি
শুনহ চৌষট্টি সনে ॥[3]

বৌদ্ধ সহজযানীদের মতেও 'সহজ'ই হইল নির্বিকল্প আনন্দ—ইহাই মহাসুখ। সহজই সমস্ত জগতের মূলস্বরূপ—

তস্মাৎ সহজং জগৎ সর্বং সহজং স্বরূপমুচ্যতে ॥

এই সহজস্বরূপকে লাভ করিবার জন্য ভজন-পূজন-জপতপের কোন আবশ্যকতা নাই। এইজন্য সহজাচার্যগণ উপদেশ দিয়াছেন সহজ পন্থাই শ্রেষ্ঠ। তাহাই 'ঋজুবাট'। এই সহজপথ ছাড়িয়া বাঁকাপথ অবলম্বন করিও না। সহজ পথেই বোধিলাভ করা যাইবে। তাহার জন্য জপতপস্যাদি অন্য সাধনার প্রয়োজন নাই।[4]

সম্ভবতঃ একদা এই সহজ সাধনার দ্বারা বাঙলার মহাকবির অন্তরও প্রভাবিত হইয়াছিল। হয়ত হিন্দুসমাজের কলঙ্কের ভয়, অপবাদ, সামাজিক

১। বৈষ্ণব মহাজনপদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী, ১৩৪০, জীবনী ও প্রতিভাবিশ্লেষণী, পৃঃ ৩৩।
২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।
৩। ঐ, পৃঃ ১৭।
৪। দ্রঃ—চর্যাপদ সং ৩২।

আচার-ভ্রষ্টতাই তাঁহাকে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

কেবল চণ্ডীদাসেরই নয়, বাশুলী রামীরও সহজ ভজনের পথপ্রদর্শিকা। তিনি রামীকেও চণ্ডীদাসের সঙ্গে সহজভজনে পরকীয়া রতিতে রত হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

পুন আরবার আসি তরাতর
বাশুলী জগতমাতা
ধরিয়া রামিনী কহিছেন বাণী
শুনহ আমার কথা ॥
যাহা কহি বাণী শুনহ রামিণী
একথা ভুবনপার।
পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজনসার ॥
চণ্ডীদাস নামে আছে একজন
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে নিত্যধামে যাবে
আমার বচন ধর ॥[১]

রামী বাশুলীর মন্দিরে দেয়াসিনী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাশুলীর সঙ্গে সম্ভবতঃ নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধজনগণের সংযোগ ছিল। এইজন্যই রামীর পক্ষে বাশুলীর মন্দিরে সেবাদাসীর পদ লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল। চণ্ডীদাসের বাশুলী যদি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের দেবী হইতেন তাহা হইলে রজকিনী রামীর পক্ষে দেবীর মন্দির মার্জনের অধিকার লাভ করা সম্ভব হইত না। বাশুলীর নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধসংসর্গের আরো একটি নিদর্শন—চৈতন্যভাগবতে বাশুলী পূজার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি হিন্দু-বৌদ্ধ আদর্শে সমন্বিত দেবদেবীর ন্যায় বাশুলীও শিক্ষিত সমাজের সমাদর লাভ করিতে পারে নাই।

চণ্ডীদাসের যাদুকর সুবল সাঙ্গাতি বৃষভানুরাজকে কেবল শ্রীরামলীলা নৃসিংহ অবতার, হলধর তনু, এবং বরাহকায়া প্রভৃতিই প্রদর্শন করেন নাই। সেই সঙ্গে—

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

পুন তা ত্যজিয়া বৌদ্ধ অবতার
হইল মূরতি তিন।
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর
সুভদ্রা তাহাতে চিহ্ন ॥[১]

এই বৌদ্ধ ঐতিহ্যযুক্ত ত্রিমূর্তিও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের রাধা প্রেমের মদিরসুষমা আকণ্ঠ পান করিয়া বেদনাহত—

যেমন বাউল হরিণী তরাস
খাইলে ব্যাধের বাণ।
তেমন করিল অবলার প্রাণ
ইহাতে নাহিক আন ॥[২]

অন্যত্র—

কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥[৩]

চর্যাপদে ব্যাধের চাতুরীজালে আবদ্ধ হরিণ-হরিণীর উপমা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[৪] চর্যাপদের হরিণী আপন মাংসের জন্য নিজেই নিজের বৈরী, চণ্ডীদাসের শ্রীরাধাও আপনার নয়নমনবিমোহী রূপের জন্য 'কালরূপ শিকারী' কৃষ্ণের প্রেমের বুভুক্ষার নিকট অসহায় বলি।

চণ্ডীদাস শাশ্বত প্রেমের মহত্তম উদ্গাতাদের মধ্যে অন্যতম। এই প্রেম বা আকর্ষণ ইন্দ্রিয়জ কামনা বাসনাজাত নহে, দেহ-সম্পর্কের অতীত, নৈর্ব্যক্তিক এই প্রেমের সার্বিক পরিচয় রামী বন্দনায়—

তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃপিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারই ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি গো গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পর্বত
তুমি গো নয়নের তারা ॥[৫]

১। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী পৃঃ ১৭।

২। দীন চণ্ডীদাস পদাবলী, ২য় খণ্ড, মণীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাদিত, পৃঃ ৫৮৫।

৩। পাঁচশত বৎসরের বৈষ্ণবপদাবলী, বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, পৃঃ ২৪।

৪। চর্যাপদ, সং ৬।

৫। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী, জীবনী ও প্রতিভা বিশ্লেষণী, পৃঃ ৪।

এই অপার্থিব প্রেমের পাদপীঠতলে চণ্ডীদাসের সহজ সাধনার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধসাধনার নরনারীর দেহসম্পৃক্ততা এইভাবে চণ্ডীদাসের কাব্যে ব্যক্তিসম্পর্ক-বিচ্যুত মহত্তম প্রেমানুভূতির উন্নত নভোমণ্ডলে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

বৌদ্ধ সহজযান ও বৈষ্ণব সহজিয়া

বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা কোন কোন বিষয়ে মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম অপেক্ষা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্য বজায় রাখিয়াছে। বৈরাগ্যনিষ্ঠা, সদাচার এবং সন্ন্যাসজীবনের প্রতি কঠোরতায় শ্রীচৈতন্য বজ্রাদপি কঠোর ছিলেন। সন্ন্যাসীদের নারী সম্ভাষণের তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। শিখি মাহিতীর ভগিনী বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদেবীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করায় মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন।[১] নারী সম্পর্কে এই কঠিন সতর্কতা বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় অনুমোদন পায় নাই। তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে পাপপুণ্য অবান্তর, মানুষ চিরমুক্ত। পঞ্চমকার উপভোগের পথেই বোধিলাভ করা যায়। তাঁহারা মহাসুখ, আনন্দ ও সম্ভোগকে প্রাধান্য দিয়াছেন। মহাসুখ লাভ করার উপায় শ্রীহেবজ্রতন্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে—

একারাকৃতি যদ্দিব্যং মধ্যে বংকারভূষিতম্।
আলয় সর্বসৌখ্যানং বুদ্ধ রত্নকরণ্ডকম্॥[২]

'এ'-কার এবং 'ব'-কারের মিলনেই মহাসুখ। 'এ'-কার নারীচিহ্ন এবং 'ব'-কার পুরুষচিহ্নের প্রতীক। শ্রীচৈতন্য ভগবানের প্রেমঘন মাধুর্যময় রূপের পূজারী ছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়াগণ কাম ও প্রেমকে সমন্বয় করিতে গিয়া নিষ্কাম ভক্তিধর্মের সাত্ত্বিকতা নষ্ট করিয়াছেন। চৈতন্যধর্মের মননশীল দার্শনিকতা রসের ও আবেগের এবং বিলাস ও সম্ভোগের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বৈরাগ্যের সহিত রহস্যের এই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। পরিণামে রসের ক্ষেত্রে নারীর সহযোগিতা অপরিহার্য হইয়া উঠে। অবশেষে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাধনসঙ্গিনী, যিনি ছিলেন—তান্ত্রিক যোগিনী, অস্পৃশ্যা ডোম্বিনী, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না শবরী, বৈষ্ণবধর্মের ভাববৃন্দাবনের

১। চৈতন্যচরিতামৃত: কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, অন্ত্য, ২য়, পৃঃ ৮৭—৯৯।

২। নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ১ম ভাগ, পৃ ৮০ হইতে উদ্ধৃত।

কুঞ্জবনে তিনি প্রেমিকারূপে দেখা দিয়াছেন। এইভাবে বৌদ্ধতান্ত্রিক কায়সম্পৃক্ততা এবং দেহসাধনা সহজিয়া বৈষ্ণবসাধনাকে প্রভাবিত করিয়াছে। তান্ত্রিকবৌদ্ধদের ন্যায় তাঁহারাও নিজের সাধনপদ্ধতিকে গুহ্য এবং অত্যন্ত কঠিন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যেমন—

গোপন পিরীতি গোপন রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে তো রসিকরাজ॥[১]

তান্ত্রিক দেহাচার-আশ্রয়ী বৌদ্ধাচার্যগণই যে বৈষ্ণব সহজিয়াদের পূর্বসূরী তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় নিম্নে উদ্ধৃত পদে—

লোক শাস্ত্র করে যারে অনেক বারণ,
তাহাতে পরমা রতি মন্মথের হয়।
মহামুনি নিজশাস্ত্রে এই মত কয়[২]

বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বৌদ্ধদিগের দেহতত্ত্ব-প্রধান ধর্মমতকে যে কতখানি স্বীকৃতি দিয়াছিলেন তাহা এই পদের দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

তান্ত্রিক বৌদ্ধদের দেহসম্পৃক্ততা এবং যথেচ্ছ ভোগের প্রতি গভীর অনুরক্তি উড়িষ্যারাজ ইন্দ্রভূতির কন্যা লক্ষ্মীঙ্করার 'অদ্বয়সিদ্ধি' নামক গ্রন্থে অকপট স্বীকৃতি পাইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের সারোদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—'দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান করিবে। দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে। সে আনন্দের মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ সেই আনন্দ সর্বোৎকৃষ্ট, সেই আসল আনন্দ। যোষিৎ সম্বন্ধে জাতিবিচারের প্রয়োজন নাই। এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবারও প্রয়োজন নাই।[৩] তান্ত্রিক বৌদ্ধদের এই দেহবাদী ধর্মের প্রভাব পরবর্তী যুগে তাহাদের উত্তরসাধক বৈষ্ণব সহজিয়াদের ধর্মে ও আচরণে আনুপূর্বিক প্রতিফলিত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়

১। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী, পৃঃ ১৫৭।

২। চট্টগ্রামে বুদ্ধদেবকে 'মহামুনি' নামে অভিহিত করা হয়। এই অঞ্চলে বৌদ্ধদের একটি মেলা মহামুনি মেলা নামে পরিচিত। পালি 'অভিধানপ্পদীপিকা' গ্রন্থেও বুদ্ধের এক নাম 'মহামুনি'। —অভিধানপ্পদীপিকা বা পালি শব্দকোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

৩। নারায়ণী. ভাদ্র, ১৩২২, পৃঃ ১৭৬—৭৮।

লিখিয়াছেন—'তখন সহজিয়ারা আপনারাই সহজভাবে মত্ত থাকিতেন, এখন সহজিয়ারা দেবতাদের সহজভাবে ভোর হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা নিজেই যুগনদ্ধ ক্রীড়া করিতেন, এখন তাঁহারা দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া দেখিয়াই আনন্দ উপভোগ করেন।'[১] বৈষ্ণবদের 'সখীভাব' এবং দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া দেখিয়াই আনন্দ উপভোগ একই বস্তু। সখীরা রাধাকৃষ্ণের মিলন দেখিয়া অন্তরে আনন্দ উপভোগ করিতেন—

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥[২]

বৌদ্ধ সহজযানিগণ নিজেরাই যুগনদ্ধক্রীড়া করিতেন, বৈষ্ণবগণ দেবতার বা রাধাকৃষ্ণের যুগনদ্ধক্রীড়া দেখিয়াই তৃপ্তি উপভোগ করিতেন। সুতরাং বৌদ্ধ সহজযানী দেহাত্মবাদ বৈষ্ণবধর্মে আনন্দ ও রসের অলৌকিক জগতে উত্তীর্ণ হইয়া উন্নততর পরিণতি লাভ করিয়াছে। এইভাবে বৌদ্ধ দেহাভিচারকে বৈষ্ণবগণ অলৌকিক আনন্দানুভূতির রাজ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। এইজন্যই রাধাকৃষ্ণের লীলারস চারণগণের কবিতা লৌকিক জীবনের রতি-সুখ বর্ণনায় পর্যবসিত না হইয়া লোকোত্তর প্রেমসঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে।

বৌদ্ধ সহজযানীদের নিকট মানুষই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়াছে। বৈষ্ণব সহজিয়াধর্মের মূল নীতিও প্রেম এবং ত্যাগ। প্রেম ও স্বার্থত্যাগের সাধনাদ্বারা সহজিয়া ধর্ম আত্মাকে অনন্ত অসীমের বুকে বিলীন করিয়া দিয়াছে।
বৈষ্ণবদের নিকটও মানুষই শ্রেষ্ঠ—

শোনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য—
তাহার উপরে নাই।[৩]

সামাজিক আচার, অনুষ্ঠান, বাধানিষেধ কোন কিছুই তাহাদের আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। মানুষকে ভালবাসিয়া, মানুষের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া

১। বৌদ্ধধর্ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১১৫৫, পৃঃ ৭৭।
২। চৈতন্যচরিতামৃত, প্রাগুক্ত, মধ্য, ১ম খণ্ড, পৃ, ৩৬৬।
৩। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড প্রাগুক্ত, পৃ ১৪।

নিজেকে তাহারা দেউলে করিয়া দিয়াছে। এমন কি দেবতা অপেক্ষাও 'মানুষ' তাহাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছে। এইখানে দেবীর কণ্ঠে মানবীর প্রাধান্য স্বীকৃতি পাইয়াছে। চণ্ডীদাসের বাশুলী বলিয়াছেন—"রজকিনী তোমাকে এমন বস্তু দিবে যাহা কোন দেবতা—ইন্দ্র ব্রহ্মাও দিতে পারে না।" এইজন্য প্রেম-সৌন্দর্যের আধার রমণীই সহজিয়া কবির সার্থক পথিকৃৎ—

এক নিবেদন কবি পুনঃ পুনঃ
শুন রজকিনী রামী
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনীরূপ কিশোরীস্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥[১]

রজকিনী রামী চণ্ডীদাসের রাধাতত্ত্বের পূর্ণ প্রতিবিম্ব।

সহজযানী বৌদ্ধদের সাধনসঙ্গিনী ছিলেন অস্পৃশ্যা চণ্ডালী, ডোম্বী, শবরী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর রমণী। তাঁহারা সাধন-সঙ্গিনী নির্বাচনে কোন প্রকার জাতিকুলের বিচার করেন নাই। কবি জয়দেব দেবদাসী 'পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী', চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর রূপমুগ্ধ, প্রেমতন্ময় কবি। বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতে পৃথিবীর প্রতি নারী রাধাস্বরূপা এবং পুরুষ কৃষ্ণস্বরূপ। সহজযানী বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা ও উপায়-এর অদ্বয়তত্ত্ব বৈষ্ণব সহজিয়াদের রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়াছে। বৌদ্ধ সহজযানীরা যুগনদ্ধের রহস্যময়তায় সহজের উপলব্ধি করিয়াছেন। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ যুগলমিলনের সৌন্দর্য-সম্ভোগের মধ্যে মহাভাবরূপ পরশমণির সন্ধান পাইয়াছেন। একটা 'মহাসুখ', অন্যটা 'মহাভাব'। একটিতে নারী প্রজ্ঞারূপিণী, অন্যটিতে নারী প্রেমরূপিণী, বৌদ্ধদিগের 'সহজসাধনা' বৈষ্ণবের 'যুগল' এবং শাক্ত ও তান্ত্রিকদের 'পঞ্চতত্ত্বে যোগিনী'-সাধনা প্রায় একই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

দেহতত্ত্ব তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সহজযানী বৌদ্ধগণ বাহিরের বুদ্ধকে স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই।

১। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫—৬

বহিরঙ্গকে বর্জন করিয়া দেহভাণ্ডের অভ্যন্তরে যে সহজ স্বরূপ 'বুদ্ধ' অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকেই তাঁহারা অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পণ্ডিতগণ সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু সেই বুদ্ধকেই জানেন না যিনি দেহের অভ্যন্তরে বাস করেন।[১] তাঁহাদের নিকট দেহই তীর্থস্থান, দেহই গঙ্গাযমুনা নদী, দেহই চন্দ্র দিবাকর, ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ।[২] শরীরের অভ্যন্তরের অশরীরীকে উপলব্ধি করিয়া তিল্লোপাদ ঘোষণা করিয়াছেন—

ইঁউ জগু ইঁউ বুদ্ধ ইঁউ নিরঞ্জন।[৩]

আমিই জগৎ, আমিই বুদ্ধ, আমিই নিরঞ্জন। সহজিয়া বৈষ্ণবগণও দেহের মধ্যেই বৃন্দাবনের কল্পনা করিয়াছেন। আত্মোপলব্ধির প্রয়াসী সহজ সাধক লিখিয়াছেন—

আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে।
বাহ্যের ক্রিয়া বাহ্যে থাকুক মনের ক্রিয়া মনে॥[৪]

আত্মার স্বরূপ, শরীর তত্ত্ব, শরীরের মধ্যে বিবিধ চক্র ও সরোবর কল্পনা সহজিয়া বৈষ্ণবগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন। বৌদ্ধ বজ্রযান ও সহজযানীদের মনপবন, ইড়াপিঙ্গলা, সুষমা-নাড়ী, দশমী-দুয়ার প্রভৃতিও পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়া গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

সহজযানী বৌদ্ধ ও সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় উভয়েই তন্ত্রমন্ত্রের প্রতি উদাসীন—

নিয়ম রীত ছাড়াইয়া গেলে
মরম রসের দরশ মেলে—

এই সত্যের প্রতি উভয়েই নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। সিদ্ধাচার্যগণ বাস্তব জীবনের দুঃখতাপের নিগূঢ় দাহন উপলব্ধি করিয়া ইঙ্গিতে ইশারায় এক অপ্রত্যক্ষ গূঢ় তত্ত্বের নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনা দেহাশ্রিত

১। পণ্ডিত সঅল সত্থ বক্খাণই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই॥ —Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, C. U. p 18

২। ঐ, পৃঃ ১৫।

৩। ঐ, পৃঃ ২।

৪। সহজিয়া সাহিত্য, মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, ১৯৩২, পৃঃ ১৫৮।

হইয়াও দেহধর্মী নহে। দেহসম্পর্কের উর্ধ্বে তাহা স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও তাঁহাদের কণ্ঠে দৃঢ় প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ এই পথে আরো একধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের মিলনরসের মদির সুষমায় বৈষ্ণব সহজিয়াগণ 'অনমুভবনীয়'কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছেন। বৌদ্ধদের বেদবিরোধিতার ধারাবাহিকতাও তাঁহারা বজায় রাখিয়াছেন।

কেবল বৈদিক অনুশাসন, পূজা, ব্রতকেই অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন নাই বৈধীভক্তিকেও চরম অবহেলা করিয়াছেন—

নগর ভিতরে আছে রসের মন্দির।
বৈধী ভক্তি আচরণ গড়ের প্রাচীর॥
জ্ঞানযোগ কর্মকাণ্ড গড়ন রিভিতে
তাহা না লঙ্ঘিলে পুরী নারে প্রবেশিতে।[১]

অন্যত্র :—

জ্ঞানকাণ্ড, কর্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥[২]

প্রেমের পরমতীর্থে উপনীত হইবার জন্য তাঁহারা ত্রিসন্ধ্যা যাজন ও গায়ত্রীমন্ত্র জপের প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করিয়া নরনারীর যুগল প্রেমের একতারায় সুরঝঙ্কার তুলিয়াছেন। বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে নারীপ্রেমের এই স্বীকৃতি সর্বসংস্কারমুক্ত অনুভূতির নিবিড়তায় উদ্ভাসিত হইয়াছে—

ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।

বৌদ্ধতন্ত্র গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। গুরু বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়াছেন। তাঁহার মহিমা অসীম, তিনি দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। 'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয় সিদ্ধি' এবং 'জ্ঞানসিদ্ধি' গ্রন্থে গুরুর মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। চর্যাপদেও গুরুর অবশ্য প্রয়োজনীয়তা এবং মাহাত্ম্য সগৌরবে ঘোষিত হইয়াছে।[৩] গুরু মাহাত্ম্যের এই স্বীকৃতি বিধান সহজিয়া কবিদেরও প্রভাবিত করিয়াছে।[৪]

১, ২। সহজিয়া সাহিত্য, প্রাগুক্ত।
৩। চর্যাপদ সং ৫, ৮, ১৪, ২১, ২৮ প্রভৃতি।
৪। সহজিয়া সাহিত্য, মণীন্দ্রমোহন বসু, ১ হইতে ৯ সংখ্যক পদ।

কেবল ধর্মে ও তত্ত্বেই নয়, আচরণে এবং অভিব্যক্তিতেও বৌদ্ধ সহজিয়াগণ বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রভাবিত করিয়াছেন। সহজযানী বৌদ্ধদের 'চর্যাপদ' ও 'দোঁহা'—বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদের 'পদ', বৌদ্ধদের সিদ্ধাচার্য—বৈষ্ণবদের আখাড়াধারী গোস্বামী, বৌদ্ধদের বোধিচিত্ত ও নৈরাত্মদেবীর অদ্বৈত মিলন—বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণের যুগললীলা একই ঐতিহ্যধারার আনুপূর্বিক অনুসরণের ইঙ্গিত বহন করে। চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেও সমাজে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের প্রভাব ছিল। পরবর্তীযুগে মহাপ্রভুর লোকোত্তর চরিত্রের আলোকে সহজিয়া সাধনা প্রভাবিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব শান্তি ও করুণার একটি জীবন্ত সত্যমূর্তি। ধ্যান সমাধিতে তিনি আত্মলীন, নিজেই নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ—যেন ধীর, স্থির, প্রশান্তির রাজ্যে একটি পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদল, আপন ঔজ্জ্বল্যে ও সৌগন্ধ্যে নিজেই নিজের মধ্যে ভাস্বর। বৈষ্ণবের কৃষ্ণ রাধার সম্মিলনই পূর্ণ, একা কৃষ্ণ পূর্ণ সত্যের অর্ধাংশমাত্র। রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রতিমাই পরিপূর্ণতার ছবি। বুদ্ধদেব ধ্যানসমাধির রাজ্যে আত্মস্থ—অনাসক্তি ও উপেক্ষার জীবন্ত বিগ্রহ। আবার কখনও কখনও বিশ্বের প্রতি করুণার মহিমায় উজ্জ্বল। তাঁহার করুণ আঁখির আলো সন্ধ্যাতারার ন্যায় প্রশান্ত। জগতের সঙ্গে, বিশ্বের প্রাণি-জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক কারুণ্যের। প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃতি পায় নাই। বৈষ্ণবধর্ম রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রতিমাকে দাস্য, ভক্তি, স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসা এই পঞ্চরসের অমৃতধারায় অভিষিক্ত করিয়া নূতন মর্যাদায় উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। আদর্শের সঙ্গে, অনন্ত অসীমের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম কোন ব্যবধান রাখে নাই। এইখানে আদর্শের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কারুণ্যের সম্পর্ক নয়, মানুষ বৈষ্ণবধর্মে কখনও দাস, কখনও মাতাপিতা, কখনও সখা, কখনও ভগবানের প্রেয়সী। এইভাবে বৈষ্ণবধর্ম অসীমের সঙ্গে সসীমের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের এক গভীর ও নিকটতম সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়া পূজ্যকে পূজারীর প্রাণের আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছে। কেবল পূজার্হ দেবতার করুণার আঁখিপাতে ধন্য হইতে পারে নাই।

বুদ্ধ ও কৃষ্ণ

বুদ্ধ বাসনাজয়ী, সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী,—অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি। তাঁহার গলায় বনমালা, পরিধানে পীতধরা, বক্ষ কৌস্তভশোভিত, চরণে নূপুর—প্রেমের নয়নমন বিমোহী বর্ণচ্ছটায় প্রোজ্জ্বল এই ছবিতে 'অননুভবনীয়' বৈষ্ণব সাধকের কাছে ধরা দিয়াছেন শাশ্বত প্রেমের প্রতীকরূপে।

এই রূপের আলোকে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের প্রেমের তন্ময়ত্ব ঘটিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ সমাধির উত্তুঙ্গ শিখরে ভক্ত-ভগবানের এই গভীর আত্মানুভূতি জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়। বৌদ্ধধর্মের বাণী ত্যাগ ও তিতিক্ষার, মৈত্রী ও সংযমের। বৈষ্ণবধর্ম কেবল প্রেমের বার্তাই বহন করিয়া আনিয়াছে। বৌদ্ধদের নিকট জগৎ দুঃখময়—'সব্বং দুক্‌খং'। তাঁহাদের নিকট জন্ম, জরা, রোগ, মরণ, প্রিয়বিয়োগ এবং অপ্রিয়-সংযোগ—কামনার বিঘাত, সুতরাং দুঃখজনক। আবার এই দুঃখও স্বল্পমাত্র নহে—অপরিমেয়, অপর্যাপ্ত। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—'এই সংসার-অরণ্যে দুঃখের দাবাগ্নি নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে, আনন্দের অবসর কোথায়? সুখের ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ পলকের মধ্যেও তিনি দুঃখের আভাস পাইয়াছেন।[১] 'যং অনিচ্চং তং দুক্‌খং'—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধদেব পদবিৎ হইয়াছেন অর্থাৎ অনাবিষ্কৃত পথের আবিষ্কারক হইয়াছেন। তাঁহার দেশনা—

পিয়তো জায়তে সোকো পিয়তো জায়তে ভয়ং,
পিয়তো বিপ্‌পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতোভয়ং।
পেমতো জায়তে সোকো পেমতো জায়তে ভয়ং।
পেমতো বিপ্‌পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতোভয়ং॥[২]

কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম এই পথ গ্রহণ করে নাই। বৈষ্ণব সাধকের নিকট বিশ্বের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মর্মোচ্ছলিত রস রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহে আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। বৈষ্ণবদর্শনে প্রেম ও আনন্দই অমৃত, দুঃখই মৃত্যু। আনন্দই জ্ঞান, আনন্দই সত্য, আনন্দই মানুষের চির আকাঙ্ক্ষিত। বৈষ্ণবকবি গাহিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ না চিনয়ে তারে।
প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে,
সেই যে বুঝিতে পারে॥[৩]

প্রেমের সায়রে ভাসিতে ভাসিতে পরম প্রেমময়ের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের মহান যাত্রা। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের এই তুলনা ব্যঞ্জনাময় ভাষায় লিখিত হইয়াছে—

১। কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি। —ধম্মপদং, শ্লোক সং: ১৪৬।

২। ধম্মপদং, শ্লোক সং ২১২-১৩। ৩। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম, পৃ ১৫৭

"শূন্যবাদের রিক্ত সিংহাসনে বসলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। শালগ্রাম শিলা নয়, একেবারে রূপেরসে ভরপুর সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। শালগ্রাম অনেকটা শূন্যের প্রতীক। তার স্থলে আসলেন অখিল রসামৃতমূর্তি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। বৌদ্ধদের দুরূহ অষ্টমার্গিক সাধনের স্থলে এলো আপামর সাধারণের জন্য নাম-সংকীর্তন। শুষ্ক কঠোর বিধিনিষেধের স্থলে এলো প্রেম, অহিংসার স্থলে করুণা। অহিংসা অভাবাত্মক ধর্ম—হিংসার অভাব মাত্র। কিন্তু করুণা হৃদয়ের একটি সহজাত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি।"[১]

বুদ্ধদেব ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর বা ভগবানকে তিনি স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই। পরবর্তীযুগে এই অস্বীকৃতির পথ ধরিয়া তিনিই ভক্তজনের হৃদয়ে ভগবানের শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বুদ্ধ শান্তরসের এবং কৃষ্ণ আদি বা মধুর রসের অধিষ্ঠাতৃ। বুদ্ধ নিস্তরঙ্গ জ্ঞান-সমুদ্র, কৃষ্ণ প্রেমের সর্বাত্মক প্রতীক। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন বুদ্ধ ও বাসুদেবের তুলনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—'বুদ্ধ নিশ্চেষ্ট, তাঁহার নেত্র ধ্যানরাজ্যে, ওষ্ঠাধর প্রশান্ত, দেহ নির্বিকার, মুখচোখ অবয়ব কামনারাজ্যের উর্ধ্বে। বাসুদেবের অঙ্গ কামনা মাখা—কিন্তু সে কামনা রক্তমাংসের নহে, তাহা আধ্যাত্মিক, দেহ চিন্ময় সুষমাময়, চক্ষু, ওষ্ঠ, চাউনি ও হাসি দ্বারা মন হরণ করে। এই দুই মূর্তি নদীর এপার ও ওপার। একদিকে জ্ঞান, অপরদিকে প্রেম।'[২]

একদা বৌদ্ধধর্ম কেবল ভারতবর্ষেই নয়, বহির্ভারতেও আপন আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে তন্ত্রের অভ্যুদয় এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নরনারীর দেহসম্পৃক্ত সাধনপদ্ধতির প্রতি আসক্তি বৌদ্ধধর্মের অবনতিকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল। অবশেষে মুসলমান আক্রমণ সেই অবনতিকে আরো ত্বরান্বিত করিয়াছে। সর্বশেষে বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশ হইতে প্রায় উন্মুলিত হইয়াছে। বিলীয়মান বৌদ্ধগণ উদীয়মান বৈষ্ণবধর্মের ছত্রছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সামাজিক নিন্দা ও অবহেলার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। একদিকে—বৌদ্ধধর্মের জীবনসন্ধ্যা, অন্যদিকে বৈষ্ণবধর্মের জীবনপ্রভাতের সূচনা। বৌদ্ধধর্মের এই বিপর্যয়লগ্নেও ভগবান বুদ্ধকে দশাবতারের মধ্যে প্রথম বৈষ্ণবেরাই স্থান দিয়াছেন। বাঙালী

১। বৈষ্ণব রস-সাহিত্য, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ১৩৫৩, পৃঃ ২৭৪।
২। বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, ৪৩৮-৩৯।

কবিই সেইদিন এই ভাবসাম্য রক্ষা করিয়া উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষায় সিদ্ধাচার্যগণের সাধন সঙ্গীত চর্যাসমূহ রচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বৃহত্তম ঘটনা, আবার মধ্যযুগের পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলীও এক মহত্তম সৃষ্টি। দীর্ঘকালের ব্যবধানে রচিত হইয়াও বৈষ্ণব পদাবলী চর্যাপদের মহৎ ঐতিহ্যকে বরণ করিয়া লইয়াছে। কারণ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের এই চর্যাপদই বাংলা সাহিত্যের 'আদিগঙ্গা হরিদ্বার'। বাংলা সাহিত্য জন্মলগ্নেই তাহার মহৎ ঐতিহ্য ভাবগভীরতা এবং ললিত মধুরিমাকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছিল। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নূতন মর্যাদায় উদ্ভাসিত হইয়াছে।

চর্যাপদ ও পদাবলী

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার চিরন্তন মন্দাকিনী প্রবাহ। এই মন্দাকিনীর মানস সরোবর সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাপদসমূহ। বৈষ্ণবের ভগবান প্রেমময়, প্রেমেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তিনি প্রেমের বা রসের অজস্র প্রস্রবণ। ভগবানের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া বৈষ্ণব সাধকের জয়যাত্রা। এই যাত্রায় পথ ধর্মের, ধ্যানের বা জ্ঞানের নয়, ইহা প্রেমের পথ। প্রেম ও ভক্তিকে সমন্বয় করিয়া তাহার অভিযান। সিদ্ধাচার্যগণও প্রিয়মিলনপ্রার্থী বিরহকাতর সাধককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

কুঁলে কুলে মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট-সংসারা
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা।[১]

—কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়াইও না। বালকের ন্যায় ভুলপথে চলিও না। একপথে স্থির লক্ষ্য রাখিও। তোমার পরম আকাঙ্ক্ষিত তোমার হৃদয়ে একদিন প্রকাশিত হইবেই।

চর্যাপদের নায়িকা অস্পৃশ্যা শবরদুহিতা। কখনও সে প্রিয় মিলনকামনায় বিরহবিধুরা যোগিনী, আবার কখনও প্রিয়বক্ষলগ্না নববধূ, আবার কখনও নির্ঘৃণ কাপালিকের পরম প্রেয়সী ডোম্বী। তাহার আসঙ্গ কামনার ব্যাকুলতা এবং যোগিনীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য মিলন কামনার আর্তি—চিরন্তন প্রেমের মহত্ত্বে উদ্ভাসিত হইয়াছে—

১। চর্যাপদ সং: ১৫।

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘাণ্টি করহু বিআলী॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি॥[১]

এই পদের মধ্যে নরনারীর চিরন্তন প্রেমের এবং পরম প্রিয়তমের জন্য আকুল কামনার যে ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহাই রূপে রসে এবং বিচিত্র বর্ণাঢ্যতায় বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে। পদাবলী সাহিত্যে নায়িকা প্রেমস্বরূপিনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। তিনি কখনও রাঙাবাসপরা যৌবনে যোগিনী, কখনও লাসবেশদীপ্তা প্রেমচঞ্চলা নাগরী, কখনও প্রিয়মিলন কামনায় ব্যাকুলা অভিসারিকা। শ্রীরাধারাণীর প্রেমিকপুরুষও সেই চিরন্তন ভাষায় আপন অন্তরব্যথা এবং প্রেয়সীর জন্য চরম কামনা প্রকাশ করিয়াছেন—

হাত দিয়া দেখ বড়াই মোর কলেবর।
ধান দিলে খই হয় বিরহ অনল যায়॥
জিভা খণ্ড খণ্ড হইল রাধা রাধা বলি।
তাহার বিচ্ছেদে মোর বুক হইল কালি॥[২]

উভয় কবির কণ্ঠে সেই একই চিরন্তন শাশ্বত বিরহ-বেদনা ভাষা পাইয়াছে। 'জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।' এবং 'তাহার বিচ্ছেদে মোর বুক হইল কালি।' উভয় ক্ষেত্রেই প্রেমানুভূতির তন্ময়তা এবং ভাবের গভীরতা একটি জীবন্ত সত্যরূপে চিরন্তন কালের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে।

চর্যাকারের শবরী একটি লীলাচঞ্চলা বালিকা। তাহার সর্বাঙ্গে আরণ্যক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য। তাহার কবরীতে শিখীপুচ্ছ, বুকে গুঞ্জার মালা, কর্ণে কুণ্ডল। নির্জন পার্বত্য অরণ্যানীর বুকে এই একাকিনী বালিকাটিকে বনদেবী বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার চারি পাশে অগণিত তরুলতার মুকুলিত কুঞ্জ। বৃক্ষের ডালে ডালে আকাশ ছাইয়া দিয়াছে। ইহা যেন শান্ত সুশীতল ছায়া সমাকীর্ণ রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-বিতান। এই কুঞ্জবিতানে শবরী প্রতীক্ষারতা—

১। চর্যাপদ সং: ৪।
২। বৈষ্ণবমহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী, পৃঃ ১৬৩।

উচা উচা পাবত তাহঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
… … …
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥[১]

এই আলেখ্য কুঞ্জবিতানে শ্যাম-উৎকণ্ঠিতা রাধিকার কথা মনে করাইয়া দেয়। বৈষ্ণবপদাবলীতে শ্রীরাধার রূপচিত্র—

জব গোধূলি সময় বেলি, ধনি মন্দির বাহর ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা দন্দ পসারি গেলি॥
ধনী অলপবয়সী বালা, জনু গাঁথনি পহুপ মালা।
থোরি দরসনে আস ন পূরল, বাঢ়ল মদন জ্বালা॥[২]

দুই নায়িকাই পরিবেশের পারিপাট্যে ও রূপবৈচিত্র্যের বর্ণসুষমায় প্রেমের রাজ্যে সাম্রাজ্ঞীর আসন অধিকার করিয়াছে। শবরী বালিকার প্রেমের আগুনে 'শবর ভুজঙ্গ' আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ভাবনিবিড় আলিঙ্গনে প্রেমিকা শবরীকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমোন্মত্ত শবর রাত্রি ভোর করিয়াছে—

তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই॥[৩]

ইহা মদির রসোজ্জ্বল লাসবেশদীপ্ত একটি মিলনমধুর রজনী। নবকিশলয়ের কুঞ্জবিতানে ত্রিধাতুর খাটে শেজ পাতিয়া বাসর সাজানো হইয়াছে। ভোগোন্মত্ত নায়কের মুখে কর্পূর সুবাসিত তাম্বুল, হৃদয় প্রেমে বিহ্বল, আত্মহারা। প্রেয়সীকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার মিলন রজনী অতিবাহিত হইয়াছে। অনুরূপ প্রস্তুতির বর্ণনা বৈষ্ণব পদসাহিত্যেও পাওয়া যায়—

১। চর্যাপদ সং: ২৮।
২। বৈষ্ণব পদাবলী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৭৮, সং: চার।
৩। চর্যাপদ সং: ২৮।

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইলুঁ
গাঁথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা॥[১]

বৈষ্ণবপদাবলীতেও নায়কনায়িকা মিলন রজনীতে প্রেমানুভূতির তন্ময়তায় তেমনি মুগ্ধ, আবিষ্ট। বৈষ্ণব কবির লেখনিতে প্রেমে অভিভূত প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্র চিরন্তন কালের বক্ষে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে—

রতন পালঙ্ক পর বৈঠল দুহুঁ জন
দুঁহু মুখ হেরই দুঁহু আনন্দে।
হরষ সলিল ভরে হেরই না পারই
অনিমিখে রহল ধন্দে॥[২]

চর্যাপদে শবর শবরীকে বক্ষে ধারণ করিয়া মিলন-রজনী অতিবাহিত করিয়াছে—'মহাসুহে রাতি পোহাই।' বৈষ্ণব কবির নায়ক নায়িকাও

এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥[৩]

প্রেমানুভূতির এত গভীরতার মধ্যে আপন প্রেয়সীকে চিনিতে শবর ভুল করিয়াছে। বাসর কক্ষ সাজাইয়া নায়িকা প্রতীক্ষারতা, কিন্তু নায়কের ভ্রান্তি তো অপনোদন হইতেছে না। অবশেষে চরম আকুতি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার কণ্ঠে।

উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী।[৪]

হে উন্মত্ত পাগল শবর, তোমাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি ভুল করিও না, আমিই তোমার গৃহিণী, সহজসুন্দরী—তোমার নারী। এই আবেদনের মধ্যেও কেবল বিনয়ই ফুটিয়া উঠে নাই। ইহার বাহিরে করুণ আকুতি, ভিতরে অশ্রু। সেই অশ্রুই বৈষ্ণব পদাবলীতে দরবিগলিত ধারায় শ্রীরাধার দুই নয়ন ও বক্ষোদেশ ভাসাইয়া দিয়াছে—

১। বৈষ্ণব পদাবলী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৫০।
২। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী, পৃঃ ১৪২।
৩। বৈষ্ণব পদাবলী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৫৩।
৪। চর্যাপদ সং : ২৮।

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥

* * * *

তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায়॥[১]

চর্যার এষণা মহাসুখের পথে। সহজযানীদের সাধনতত্ত্বে বোধিচিত্তের স্বস্থান মহাসুখচক্র। বোধিচিত্ত মহাসুখচক্রের পথে উর্ধ্বগযাত্রা শুরু করে—সর্বজীবের কল্যাণের নিমিত্ত। এইখানেই সাধকের উর্ধ্ব-স্তরে যাত্রা আরম্ভ হয়। উর্ধ্ব যাত্রার পথে বোধিচিত্ত দশভূমি অতিক্রম করিয়া 'ধর্মমেঘ' নামীয় দশভূমিতে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি লাভ করে। এই স্তরে শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতাপ্রাপ্তি ঘটে। ইহা নির্বাণ বা মহাসুখ। সুতরাং মহাসুখের অন্বেষণে সাধকের চিত্তের যে উর্ধ্বগতি তাহাকে Spiritual Quest বলা যাইতে পারে। চর্যায় যাহা এষণা, রাধাকৃষ্ণ লীলায় তাহাই অভিসার। চর্যার এষণা মহাসুখের পথে—শূন্যতা ও করুণার অদ্বয়মিলনে তাহার পরিসমাপ্তি। পরিণতি 'মহাসুখ' লাভ। শ্রীরাধার অভিসার 'হরি অন্বেষণে', এইখানেও পথ দীর্ঘ, কর্দমময়, কণ্টকাকীর্ণ—

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার॥[২]

এই বিঘ্নসঙ্কুল পথের শেষে রাধাকৃষ্ণের 'যুগল মিলন'। এইখানে কৃষ্ণ ও রাধা দ্বৈতসত্তা নহেন—দুই এ মিলিয়া এক অদ্বৈত স্বরূপ। ইহা মহামিলন। শূন্যতা ও করুণা—প্রজ্ঞা ও উপায় যেমন মিলনে একীভূত অদ্বয়রূপ প্রাপ্ত হয় এই মহামিলনে রাধাকৃষ্ণও তেমনি আনন্দ-সায়রে অবগাহন করিয়া একদেহ হইয়া গিয়াছেন—

রাই শ্যাম একই পরাণ।
এক অঙ্গ দুহুঁ নহে ভিন।[৩]

১। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী, পৃঃ ১৪৪।
২। বিদ্যাপতি, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, ১৩৫৯, পৃঃ ৭৭, সং ১০৪।
৩। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী, পৃঃ ২০২।

—কেবল তাহাই নহে। সহজিয়া সাধকগণ যেমন মহাসুখ বা সহজানন্দ লাভ করিয়া জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞেয়ত্ব বা গ্রাহকত্ব-গ্রাহ্যত্ব বর্জন করিয়া থাকেন, মিলনানন্দে রাধাকৃষ্ণও তেমনি কান্তা-কান্তের ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়াছেন—

না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥[১]

চর্যায় বোধিচিত্ত অর্ধরাত্রিতে মহাসুখকমলে প্রবেশ করিয়াছে। এইখানে বোধিচিত্তের সঙ্গে নৈরাত্মাদেবীর মিলন ঘটিবে—

অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।[২]

শ্রীরাধাও রাত্রিতেই অভিসার যাত্রা করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের মিলনও রাত্রিতেই সংগঠিত হইয়াছে। সহস্রারে শূন্যতা ও করুণা যখন অভেদে সম্মিলিত হয় তখন সেই মিলন দর্শন করিয়া—

বতিস জোইনী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ।[৩]

সাধকের উষ্ণিষকমলে বোধিচিত্তের সঙ্গে নৈরাত্মদেবীর মিলন সংগঠিত হইলে সেই মিলন দর্শন করিয়া বত্রিশ যোগিনী আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। বৈষ্ণব দর্শনেও সখিগণ রাধাকৃষ্ণের 'যুগল লীলা' দর্শন করিয়া, সেই প্রেমের বর্ণচ্ছটায় চাঞ্চল্যদীপ্ত ও উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন।

সকল গোপিনী মোহিত হইল
দেখিয়া দোঁহার রূপ।
ক্ষেণে ক্ষেণে সুখ আনন্দ বাড়িছে
প্রেমের রসের কূপ ॥[৪]

দুই নম্বর চর্যায় বাড়ীর আঙ্গিনায় শ্বশুর নিদ্রিত, বধূ ঘরে একলা জাগিয়া আছে—তাহার কর্ণের আভরণ চুরি গিয়াছে। দিবসে যে বধূ কাকরকে ভীতা, রাত্রিতে সে প্রিয় অন্বেষণে অভিসারিকা নায়িকা।

দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥[৫]

১। চৈতন্যচরিতামৃত, প্রাগুক্ত, মধ্য ৮ম, পৃঃ ৩৪৮।
২, ৩। চর্যাপদ সং ২৭।
৪। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী, পৃঃ ১৯৮।
৫। চর্যাপদ সং: ২।

দিনে যে নারী কাকভয়ে ভীতা, রাত্রিতে সে কামে পীড়িতা হইয়া গৃহত্যাগিণী। এই অসতী কুলবধুর আলেখ্যে পরবর্তী বৈষ্ণবকবিদের শ্রীরাধা ও গোপরমণীদের পরকীয়া সাধনার উৎস পাওয়া যায়। চার্যকারের গৃহবধুর কর্ণভূষণ অপহৃত হইয়াছে এইজন্য তাহার চোখে ঘুম নাই। আর শ্রীরাধার হৃদয়টিই চুরি গিয়াছে। তাহারও প্রাণে শান্তি নাই, চোখে নিদ্রা নাই। হৃদয় অপহারক শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে সে কেবল লোকলজ্জাই সমর্পণ করিয়া দেয় নাই, আপন সতীধর্মকেও বিসর্জন দিয়া দিয়াছে—

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥[১]

চর্যাপদ এবং পদাবলীতে সর্বত্রই প্রেমের কল্যাণময় গার্হস্থ্যরূপ অপেক্ষা অসামাজিক রূপ বেশী প্রাধান্য পাইয়াছে। কাহ্নপাদ ডোম্বীকে বিবাহ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া তাহার জাতকুল গেল বটে, কিন্তু লাভ হইল অনুত্তর ধাম। নবীনা লীলাময়ী ডোম্বীর সাহচর্যে ও সুখ-সম্ভোগে তাহার মিলন-রজনী অতিবাহিত হইয়াছে।[২]

এই মিলনে কোনপ্রকার সামাজিক বা নৈতিক বিধি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কাহ্নপাদ ডোম্বীর প্রতি প্রেমানুভূতির গভীর তন্ময়তায় জাতিধর্ম, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতাবোধ সমস্তই বিসর্জন দিয়াছেন। ডোম্বীপাদও নিঃসংশয়চিত্তে মাতঙ্গকন্যা ডোম্বীর উপর একান্ত নির্ভর করিয়া অনায়াসে তাহার তরণীতে আরোহণ করিয়াছেন। কোন সাধন-ভজন নহে, জপতপ নহে, পূজা-অর্চনা যাগ-যজ্ঞও নহে, এই অস্পৃশ্যা ডোমকন্যাই তাহাকে তীরে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে। সে কড়িও লইবে না, বুড়িও লইবে না, স্বেচ্ছায় পার করিবে।[৩] বৈষ্ণবকবির শ্রীরাধাও প্রেমের মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া অভিভূত কণ্ঠে বলিয়াছে—

১। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী, পৃঃ ১৪৫।

২। চর্যাপদ সং: ১৯।

৩। চর্যাপদ সং: ১৪।

কুলশীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি
কালি দিয়া দুই কুলে।
এ নব যৌবন পরশ রতন
সঁপেছি চরণতলে ॥[১]

শ্রীরাধাকে এইখানে চর্যাপদের শবরীর উত্তরসাধিকা বলিতে বিশেষ বাধা নাই। এই প্রসঙ্গে 'নীচ প্রেমে উন্মাদ' চণ্ডীদাসের রজকিনী প্রীতির দৃষ্টান্তও আহরণ করা যায়। চণ্ডীদাসও চর্যাকার কাহ্নপাদের ন্যায় রামীকে গ্রহণ করিয়া জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়াছিলেন এবং তাহাকেই সাধ্য শিরোমণি করিয়াছিলেন। ডোম্বীকে লাভ করিবার জন্য কাহ্নপাদ কেবল জাতিধর্মই বিসর্জন দিয়াছেন তাহাই নহে, তিনি নটের পেটিকা ছাড়িয়াছেন। যোগিনীর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যোগীর ভূষণ—কুণ্ডল-কণ্ঠিকা-হাড়মাল্য গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবকবির শ্রীকৃষ্ণও রাধার সাহচর্য কামনায় নটবর রূপ ছাড়িয়া কখনও 'মহাদানী' সাজিয়াছেন, কখনও নাপিতিনী, কখনও মালিনী, কখনও বা দেয়াশিনী রূপ ধারণ করিয়াছেন।

যোগী গুণ্ডরীপাদের কণ্ঠে দয়িতার সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা এবং তাহাকে না পাওয়ার বেদনা তাঁহার শূন্যহৃদয়কে মথিত করিয়া উদ্গীত হইয়াছে—

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি ॥[২]

কবির এই আকুতি সর্বযুগের আদিরসাত্মক সাহিত্যের সামগ্রী হইবার যোগ্যতা বহন করিতেছে। এই প্রেমের নিবিড়তা ও সুষমা রসানুভূতির চরম পর্যায়ে উঠিয়া যুগের দাবীকে লঙ্ঘন করিয়াছে। শ্রীরাধার আকুলতা এবং প্রিয় মিলনাকাঙ্ক্ষার উন্মত্ততা চর্যাপদের এই মহত্তম প্রেমের উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে। পঞ্চাশ নং চর্যায় প্রেমের মদোমত্ত উল্লাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেমিক শবর-বালিকা শবরীকে বক্ষে দৃঢ়নিবদ্ধ করিয়া মিলনরজনী অতিবাহিত করিতেছে। মিলন-রসোন্মত্ত শবর শবরীর প্রেমে মুগ্ধ, তন্ময়—কোন দিকে তাহার খেয়াল নাই—

কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥

১। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী, পৃঃ ১৪৪।

২। চর্যাপদ সং ঃ ৪।

এই জন্ত—অহুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাস্থহেঁ ভোলা।[১]

সিদ্ধাচার্যের নায়ক-নায়িকা—সেই কোন্ অতীতের শবর-শবরী যেন বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহে নবকলেবর ধারণ করিয়াছে। তাহারাও—

এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥[২]

চর্যাপদের কবিগণ নরনারীর মিলনরসের প্রতীকদ্যোতনার সাহায্যে যে শাশ্বত আনন্দলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন—বৈষ্ণবগণের শ্রীরাধার 'মহাভাব' তাহার ক্রমবিকশিত পরিপূর্ণ পরিণতি। চর্যাকার নৈরাত্মাদেবীর আসঙ্গলাভ করিয়া সেই উপলব্ধিকে 'মরুমরীচী, গন্ধর্বনগরী, দাপণ পড়িবিম্বু, বালু তেল, সসরসিংগ, আকাশফুলিলা'র সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবকবিও সহজসাধনাকে গুহ্য এবং দুর্বোধ্য জানিয়া বলিয়াছেন—

গোপন পিরীতি গোপন রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবেত রসিকরাজ
যে জন চতুর সুমেরু শিখর
সুতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে ॥[৩]

চর্যাকারের উপলব্ধি বাক্‌পথাতীত, গুহ্য এবং রহস্যাবৃত। বৈষ্ণব সহজিয়া কবির সাধনপন্থাও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছে।

বৈষ্ণবপদ ও চর্যাপদ দুই-ই ধর্মমূলক। চর্যাকারের ধর্ম প্রহেলিকা সমাচ্ছন্ন ও গূঢ়ার্থক। বৈষ্ণবকবির ধর্ম প্রেমধর্ম—উপলব্ধির তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিয়া মরজগতে তাঁহারা অমরলোকের অমৃতধারা বর্ষণ করিয়াছেন। চর্যাপদ সিদ্ধাচার্যের আত্মলীন উপলব্ধির বার্তাবাহী সাধনসঙ্গীত। বিশুদ্ধ তত্ত্বকে তাঁহারা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উত্তাপে প্রাণরসে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। আর বৈষ্ণব পদাবলী কবির প্রাণকথা—যুগলপ্রেমের শাশ্বতবাণী। চর্যাকারের

১। চর্যাপদ সং: ৫০।

২। বৈষ্ণব পদাবলী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৫৩।

৩। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, বসুমতী পৃঃ ১৫৭—১৫৮।

শবর-শবরী যোগী-যোগিণী—ইহারা সহজপন্থী সাধক-সাধিকা, কিন্তু বৈষ্ণব-কবির রাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রাণের দেবতা—যুগলপ্রেমের চিরন্তন প্রতীক।

একদা চর্যাপদসমূহ রাগরাগিণী যুক্ত হইয়া এককভাবে গ্রামে গ্রামে গীত হইত। চর্যাগীতি হইতে উৎপন্ন না হইলেও সংকীর্তনও সেই গীতধারার ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়াছে। চর্যাপদ ও বৈষ্ণবপদ দুই-ই খণ্ড কবিতা—একটি প্রহেলিকাসমাচ্ছন্ন, অন্যটি অনুভূতিঘন।

একদা জগজ্জ্যোতি বুদ্ধের জীবনাচরণের প্রেরণাকে উপজীব্য করিয়া পালি ও সংস্কৃত ভাষায় এক বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল। মহাবগ্‌গ, জাতক,

চৈতন্যচরিত সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ

ললিতবিস্তর, মহাবস্তু এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে আমরা সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের অনন্যতুল্য ব্যক্তিত্ব এবং সেই নরশ্রেষ্ঠকে উপলক্ষ্য করিয়া উদ্বুদ্ধ যুগ-পূজার আয়োজন প্রত্যক্ষ করি। এই গ্রন্থসমূহে আমরা কেবল গৌতম বুদ্ধকেই পাই না, যুগভক্তির আবেগে তাঁহার জীবনের ঘটনার সঙ্গে বহু লোকোত্তর ইতিবৃত্ত, বহু অলৌকিক কাহিনীও লাভ করি। সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তি মানুষকে দেবতা করা। বুদ্ধ—সে যুগের একক ও অনন্যতুল্য ব্যক্তিত্ব। যুগ-পূজার মহিমায় তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ মানব পরিচয় আচ্ছন্ন হইয়া ভক্তির অশ্রুনীরে চরিতার্থ দৈব পরিচয় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যেও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন-মাহাত্ম্যকে উপজীব্য করিয়া চরিত সাহিত্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে এবং বহু অলৌকিক ঘটনার আবর্তে তাঁহার জীবনী নরদেবতার দৈব লীলায় পর্যবসিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ। চৈতন্যলীলাকে উপজীব্য করিয়া কেবল বাংলা চরিত সাহিত্যই সৃষ্টি হয় নাই, চৈতন্যদেব ছিলেন মধ্যযুগের নবোদ্ভূত জাতীয় চেতনা ও জীবনবোধের ভাবমূর্তি। বুদ্ধদেব মানবচিত্তে এক নূতন সম্বোধির উদ্বোধকরূপে বৌদ্ধসাহিত্যের অধিদেবতা। শ্রীচৈতন্যও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্ররূপে সাহিত্য ঐতিহাসিকের চিরনমস্য।

ইসলামের অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা যখন বাংলার মাটিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে সেই সময়ে এই প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব। তাঁহার চরিত্রে একাধারে ত্যাগ ও তপস্যা, দুঃখবরণ ও সহিষ্ণুতা, সংযম ও শুচিতা, ধীশক্তি ও পাণ্ডিত্যের সমাবেশ হইয়াছিল। চৈতন্যচরিতের রূপকারগণ তাঁহাদের কাব্যে এই প্রেমসৌন্দর্যে সদাসমুজ্জ্বল চিত্রটি অতি নিপুণভাবে অঙ্কন

করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনেও তাঁহারা কম দক্ষতা প্রদর্শন করেন নাই। এই দিক হইতে শ্রীচৈতন্যচরিত সাহিত্যকে মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মের পরিণতি ও পরিণামের ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের উপাদান-রূপেও ব্যবহার করা যায়।

বাংলা চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের প্রথম শিল্পী বৃন্দাবন দাস। প্রভু নিত্যানন্দের বাল্যলীলা ও তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসিয়াছে বৌদ্ধগণ।
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে।
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥[১]

শ্রীচৈতন্যজীবনের শ্রেষ্ঠতম রূপকার কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরো বিস্তৃতভাবে তাঁহার গ্রন্থে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। ভক্তিমার্গ বিমুখ পাষণ্ডীদিগের পাণ্ডিত্যাশ্রয়ী আত্মশ্লাঘা যেখানে তাঁহার পথ যাত্রার বাধা সৃষ্টি করিয়াছে সেখানে তিনি খরবহ্নির মশাল জ্বালিয়া শঙ্কাবিহীন অভিযাত্রার প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়াছেন। এই যাত্রাপথে তার্কিক মীমাংসক, মায়াবাদীদিগকে পরাস্ত করিয়া তিনি বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে দীক্ষা দিয়াছিলেন। অবশেষে দক্ষিণদেশীয় এক মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্য সশিষ্য উপস্থিত হইলেন। নববিধ প্রস্থানে তিনি পারঙ্গম ছিলেন। তাঁহার উদ্ধত আহ্বানে—

যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব খণ্ডাইতে॥[২]

তর্ক দ্বারাই মহাপ্রভু নবপ্রস্থান খণ্ডন করিলেন। দার্শনিক পণ্ডিত বৌদ্ধগণ পরাজিত হইলেন। তাঁহাদের পরাজয়ে—

লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধের হৈল লজ্জা ভয়।[৩]

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত: মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, ষষ্ঠ সংস্করণ, আদি—৮ম অধ্যায়, পৃঃ ৫৪।

২। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত: কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, মধ্যলীলা, ১ম খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪০৩।

৩। ঐ, পৃঃ ৪০৪।

তর্কে পরাস্ত বৌদ্ধগণ কুমন্ত্রণা করিয়া শ্রীচৈতন্যকে বিষ্ণুপ্রসাদের নামে অপবিত্র অন্ন পরিবেশন করিলেন। এই সময় এক মহাকায় পক্ষী ঐ থালা তুলিয়া লইয়া বৌদ্ধাচার্যের মাথায় তেরছাভাবে ফেলিয়া দিল, মাথা ফাটিয়া আচার্য মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভীত সন্ত্রস্ত শিষ্যগণ মহাপ্রভুর শরণ লইলেন—

তুমিই ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু—করহ প্রসাদ।[১]

প্রভু বলিলেন—

গুরু কর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি।[২]

বৌদ্ধকণ্ঠে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম গীত হইল, বৌদ্ধাচার্যও—উঠে 'হরি' বলি। অতঃপর বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধাচার্যও—

কৃষ্ণ বলি আচার্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময়॥[৩]

গোবিন্দদাসের কড়চা পাঠেও জানা যায় দক্ষিণাত্যে ত্রিমন্দ নগরে বহু বৌদ্ধের বাস ছিল। সত্যপ্রচারের অভিযাত্রী শ্রীচৈতন্য এইখানে বৌদ্ধদিগের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নগরের রাজা বিচারে মধ্যস্থতা করেন। বিচারে বৌদ্ধগণ পরাজিত হইয়াছিলেন—

বহু বৌদ্ধ বাস করে ত্রিমন্দ নগরে।
আসিয়া মিলিল সবে গোরাঙ্গ সুন্দরে॥
বৌদ্ধগণ সহ প্রভু বিচার করিলা।
ত্রিমন্দের রাজা আসি মধ্যস্থ হইল॥
বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিল।
পণ্ডিত দর্শক সবে হাসিতে লাগিল।[৪]

স্থিতধী কবি কৃষ্ণদাসের মতে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে মাদ্রাজের উত্তর-পশ্চিমে ত্রিপতির পর্বতে এবং বেঙ্কটগিরিতে বৌদ্ধদের দেখিয়াছিলেন। কবি বৌদ্ধদিগকে পাষণ্ডী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শবর জাতির সঙ্গে একাসনে স্থান দিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে তুলনা করিয়া বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৌদ্ধদিগের

১, ২, ৩। ঐ, পৃঃ ৪০৫।
৪। গোবিন্দ দাসের করচা, দীনেশচন্দ্র সেন ও বনোয়ারী লাল গোস্বামী সম্পাদিত, ১৯২৬, পৃ ২৩

উল্লেখ করিলেও কবির রচনার মধ্য দিয়া সে যুগের অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। চূড়ামণি দাস, গোবিন্দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব চরিতাখ্যায়িকা রচয়িতাগণও বৌদ্ধদিগের প্রতি কটূক্তি করিয়াছেন। কবি কর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক এই ব্যাপারে পথ প্রদর্শক। এই গ্রন্থের ৭ম অঙ্কে বৌদ্ধদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে দক্ষিণাত্যে—

প্রচুরতমাঃ পাষণ্ডিণঃ।[১]

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় চূড়ামণিদাসের 'চৈতন্যচরিত' নামক গ্রন্থে নবদ্বীপধামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটিলে বৌদ্ধদিগেরও আনন্দিত হইবার বিষয় বিবৃত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২] গোবিন্দদাসের কড়চায় পাওয়া যায় তীর্থভ্রমণরত শ্রীচৈতন্যের অভিযাত্রার পথে তার্কিক মীমাংসক বৌদ্ধ প্রভৃতি তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধরাজ রামগিরি এবং তার্কিক চুণ্ডীরাম তীর্থ শ্রীচৈতন্যের অমায়িক চরিত্রমহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিত সাহিত্যে বেদবাহ্য অর্থে 'পাষণ্ডী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পাষণ্ডী কাহারা? বেদবাহ্য বৌদ্ধ, জৈন এবং তার্কিক ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে পাষণ্ডী বলিয়া চরিতসাহিত্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং চৈতন্য-চরিতকারগণ পাষণ্ডী বলিয়া যাহাদের অভিহিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন কোন স্থলে বৌদ্ধগণও রহিয়াছেন। বৌদ্ধদিগকে 'পাষণ্ডী' নামে অভিহিত করা ঠিক কোন সময় হইতে শুরু হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইলেও অনুমান করা যায় পালোত্তর যুগেই ব্যাপকভাবে সাহিত্যে বৌদ্ধদিগকে পাষণ্ডী অভিধায় চিহ্নিত করা হইয়াছে। কবি বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য একাধারে কোমলে ও কঠোরে, পৌরুষে ও নমনীয়তায় ভাস্বর। তিনি পতিতপাবন, পাষণ্ডী উদ্ধারকারী। নবদ্বীপবাসী পাষণ্ডীরা শ্রীচৈতন্যের নৃত্য, কৃষ্ণনাম সংকীর্তন ইত্যাদির বিরূপ ব্যাখ্যা প্রচার করিত। এই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের উপর পাষণ্ডীদের উৎপাত ও অত্যাচার বাড়িয়া গিয়াছিল। একদিকে স্মার্ত সংস্কার, নব্য ন্যায় ও জ্ঞানানুশীলন অন্যদিকে গোপন তন্ত্রের

১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১৪৯৪ শকে রচিত। এই গ্রন্থের ২য় অঙ্কে বুদ্ধ-বরাহাদির অবতারলীলা এবং ৭ম অঙ্কে বৌদ্ধদের অনাচার বর্ণিত হইয়াছে।

২। J, A, S. B, , 1895, p 57

অনুষ্ঠানে ভক্তিধর্মের উৎস শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভাববিহ্বল পরিকরদের সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস—

রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে।
ভক্ষ্য ভোজ্যগন্ধ মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥[১]

কাহারো মতে—

আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন॥[২]

এই অভিযোগসমূহের মধ্যে গুহ্য ও দেহসম্পৃক্ত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম এবং সহজিয়া আচার্যদের কায়নির্ভর সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেকালের কোন কোন তান্ত্রিক সাধক মদিরা পান করিয়া সাধনা করিতেন।

নিত্যানন্দ বিরোধী ও তাঁহার নিন্দুকদের মধ্যে পাষণ্ডীরা সংখ্যাধিক ছিল। আজানুলম্বিত বাহু লাবণ্যসুন্দর দেহ শ্রীচৈতন্যকেও 'পাষণ্ডী দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান।' দক্ষিণ দেশেও পাষণ্ডীদিগের সংখ্যাধিক্য ছিল। কবি কর্ণপুরের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের ৭ম অঙ্কে আছে—

'যথোত্তরমেব দক্ষিণস্যাং দিশি কিয়ন্তঃ কর্মনিষ্ঠাঃ, কতিচিদেক জ্ঞাননিষ্ঠা, বিরলা এব সাত্বতাঃ, প্রচুরতরাঃ পাশুপতাঃ, প্রচুরতমা পাষণ্ডিণঃ।"

মহাপ্রভু যখন নীলাচলে আগমন করেন তখন উৎকলসমাজে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য বিরোধ এবং রেষারেষি প্রবলতর ছিল। রাজা প্রতাপরুদ্রের এক রাণী বৌদ্ধদিগের অনুরাগিণী ছিলেন। রাজাও প্রথমতঃ বৌদ্ধদিগের পক্ষ গ্রহণ করিলেও পরে বৌদ্ধদিগকে রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহও রাজাদেশে দগ্ধ করা হয়। একদিকে ব্রাহ্মণ্য, অন্যদিকে বৌদ্ধ এই দুই ধর্মদ্বন্দ্বের যুগ-সন্ধিক্ষণে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে পদার্পণ করেন। ত্রিমন্দ নগরে, দাক্ষিণাত্যের পথে মহাপ্রভু কয়েকবার বৌদ্ধদিগের সহিত ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় রত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত: বৃন্দাবনদাস, মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, ষষ্ঠ সং, মধ্য, ৮ম পরি, পৃঃ ১৭৬।

২। ঐ, মধ্য—৮ম, পৃঃ ১৭৭।

দুঃখের বিষয় চৈতন্যচরিতকারগণ কেবল এই ঘটনাটির উল্লেখমাত্রই করিয়াছেন। মহাপ্রভু এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের মধ্যে যে বিতর্ক হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ তাঁহারা প্রদান করেন নাই। বৌদ্ধগণ তর্কে পরাজিত হইয়াছেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাদের স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্মের কোন যানের ধারক, তাঁহাদের জীবনচর্যা ও আচারব্যবহার এবং ধর্মতত্ত্ব কি ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। মহাপ্রভু কোন্ বিষয়ে তাঁহাদের সঙ্গে তর্কে রত হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনাও পাওয়া যায় না। কেবল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন বৌদ্ধাচার্য কর্তৃক উত্থাপিত 'নবপ্রস্থান'[১] বা নয়টি মত মহাপ্রভু দৃঢ়যুক্তিবলে খণ্ডন করিয়াছিলেন।

সেন পরবর্তীযুগে রচিত হইলেও চৈতন্যচরিত-সাহিত্য পাঠে জানা যায় লোকশ্রুতিতে তখনও পালনৃপতিগণের পুণ্যস্মৃতি বিরাজিত ছিল।[২] বাঙলা দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়—দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা বিগ্রহপাল পার্বত্তীয় কম্বোজজাতির আক্রমণে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার বীরপুত্র মহীপাল গৌড় রাজ্য আবার অধিকার করেন। তিনি পশ্চিমে বুদ্ধগয়া এবং দক্ষিণে উৎকল পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। মহীপাল প্রৌঢ় বয়সে বৌদ্ধধর্মের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সারনাথ বিহারের সংস্কার করেন। জলাশয় প্রতিষ্ঠা, মঠ ও বিদ্যামন্দির স্থাপন, নালন্দা মঠ ও ছাত্রাবাস পুনর্নির্মাণ তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। ইহার ফলে তাঁহার বিজয়গাথা জনগণের মুখে মুখে রচিত হইতে শুরু করিয়াছিল।

পালনরপতিগণের সম্প্রদায়বোধ নিরপেক্ষ হৃদয়ানুকূল্য তাঁহাদের জীবন-কাহিনীকে জনগণের কল্পনার সঙ্গে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছিল। ফলে সেন রাজত্বের দীর্ঘকালের ব্যবধানেও তাহাদের জীবনকাহিনী লোকজীবনাশ্রিত হইয়া বাঁচিয়া ছিল। আজ অবধি সেই ধারা চলিয়া আসিতেছে—'ধানভানতে মহীপালের গীত' প্রবাদ সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারকবাহী।

১। নব প্রস্থান বা নয়টি সিদ্ধান্ত হইতেছে—১। বিশ্ব অনাদি সুতরাং ঈশ্বরবিহীন, ২। জগৎ মিথ্যা, ৩। অহংতত্ত্ব, ৪। জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, ৫। বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায়, ৬। নির্বাণই পরমতত্ত্ব, ৭। বৌদ্ধদর্শনই দর্শন, ৮। বেদ মানব রচিত, ৯। দয়াদি সদাচরণই বৌদ্ধ জীবন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, পৃঃ ২২০, পাদটীকা ৩। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ১ম খণ্ড, হরিদাস দাস, পৃঃ ৩৬৬।

২। যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত। —শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ১৩৪২, অন্ত্য-৪, পৃ ৩৮২।

শ্রীচৈতন্যজীবনী সাহিত্য পাঠে জানা যায় তিনি ১৩।১৪টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। কৈশোরে গদাধর পণ্ডিতের টোলে শ্রীচৈতন্য সংস্কৃত ছাড়াও পালি, প্রাকৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া গৌড়পদ তরঙ্গিণীতে উল্লেখিত হইয়াছে।[১] দক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তিনি যে ভাবে বৌদ্ধপণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছেন তাহাতেও মনে হয় মহাপ্রভু স্বয়ং বৌদ্ধসাহিত্য ও দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যানন্দকে অবধূত[২] বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ যোগমার্গ অবলম্বনকারী সাধক। মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও জানা যায় অদ্বৈত 'তরজাতে সমর্থ' অর্থাৎ হেয়ালী ধাঁধা রচনায় পারদর্শী। ইহা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচনাকৌশল অনুসরণের পরিণতি বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্যচরিত সাহিত্য পাঠে জানা যায় বাঙলায়, উড়িষ্যায় ও দক্ষিণাত্যে তখনও অল্পসংখ্যক খাঁটি বৌদ্ধ বাস করিতেন। মহাপ্রভু বৌদ্ধনির্বাণ শূন্যবাদ, ক্ষণিকবাদ, ও নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছিলেন। আচার্য শঙ্কর বৌদ্ধ শূন্যবাদ খণ্ডন করিয়া মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ভক্তি ও প্রেমধর্ম প্রচার করেন। এইভাবে ভারতীয় চিন্তা ও দর্শনের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন চেতনার নবজাগরণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। অবশ্য বিশুদ্ধভক্তি শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বেও মহাযান সাধনায় পাওয়া যায়। শরণাগতির বিষয় বৌদ্ধধর্মেই প্রথম গৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের 'ত্রিশরণ' মন্ত্রেই ভারতীয় ধর্মে প্রথম আত্মসমর্পণের বাণী ঘোষণা করা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের পূর্বে ভারতবর্ষের আর কোন চিন্তা-নায়কের কণ্ঠে শরণাগতির অনুরূপ পথ প্রদর্শিত হয় নাই। বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী হইয়াও কালক্রমে ভক্তদের মনোমন্দিরে ঈশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' গ্রন্থে বুদ্ধদেবই স্বয়ম্ভু, স্রষ্টা, অনন্ত শক্তিমান্ ঈশ্বর। কালক্রমে

১। বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ৭২৮।

২। অবধূত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের নিকট যোগসাধনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। —History of Bengal, Vol. I, op. cit, p. 423-25
বৌদ্ধশাস্ত্রেও অবধূতি নাড়ীর উল্লেখ আছে। সিদ্ধাচার্য অদ্বয়বজ্র অবধূতি নাড়ী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অবধূতিপাদ বলা হইত। অবধূত সন্ন্যাসিগণ প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ৪ নিস্সয় যথা—ভিক্ষান্ন ভোজন, বৃক্ষতলে শয়ন, ছিন্নকন্থা পরিধান, পূতিমূত্র ভৈষজ্য গ্রহণ প্রভৃতি সুকঠিন নিয়মাবলী অনুশীলন করিতেন।

বৌদ্ধধর্মে 'মহাসুখবাদ' অর্থাৎ বুদ্ধই আনন্দস্বরূপ এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মেই প্রথম ভক্তিধর্মের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। পরবর্তীযুগে বৈষ্ণবধর্মের অনুকূল পরিবেশে তাহা পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবধর্ম বৌদ্ধদিগের জাতিভেদ বিরোধিতাকেও সাঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের ন্যায় বৈষ্ণবধর্মেও সকল জাতি ও ধর্মের লোকের প্রবেশাধিকার ছিল। ভগবান বুদ্ধ নাপিত উপালি, কর্মকারপুত্র চুন্দ এবং সুনীত প্রভৃতি অন্ত্যজতম লোককেও জীবনসাধনার মাঙ্গলিক পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও অনুরূপ সর্বাত্মক জীবনবোধের মহিমময় প্রকাশ ঘটিয়াছিল। চৈতন্যভক্ত হরিদাস মুসলমান ছিলেন, রূপসনাতন জাতিচ্যুত ছিলেন। জাতিভেদের কালিমা ও গ্লানি বিদূরিত করিয়া মহাপ্রভু নবজীবনমন্ত্রে জাতিকে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহী কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥[১]

কৃষ্ণ ভজনে সর্বজাতির সর্বমানবের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া শ্রীচৈতন্য জাতীয় প্রাণবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। জাতির কর্ণে তিনি নবজীবনমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

কেবল নবমন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাঁহার পরিকরদের মধ্যে কোন অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ জাতির কুণ্ঠাকে তিনি বরদাস্ত করেন নাই। যবন হরিদাসকেও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মৃত্যু ঘটিলে হরিদাসের পবিত্র পাদোদক শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণও পান করিয়াছিলেন। অকুণ্ঠ কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—'মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি'।[২] সেইযুগের ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত স্মার্ত পৌরাণিক সমাজের দুর্বল জড়তার মর্মমূলে কঠিন কুঠারাঘাত করিয়া শ্রীচৈতন্যকেও বুদ্ধদেবের ন্যায় বহু সমালোচনা ও বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

পরবর্তীযুগে কীর্তনীয়ার কণ্ঠেও সুর উঠিয়াছে—

'সব অবিধি নদের বিধি।'

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, প্রাগুক্ত, মধ্য—৮ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩০৪।

২। চৈতন্যভাগবত : সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, অন্ত্যখণ্ড—১১ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৫১।

ব্রাহ্মণ্যসমাজে যাহা অনাচার তাহাই মহাপ্রভুর আচারনিষ্ঠায় পরিণত হইয়াছিল। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত গতানুগতিক জীবনে ভগবান বুদ্ধ বৈপ্লবিক দাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন। এই অগ্নিদাহে সেইদিনও সমাজে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদাভেদ তিরোহিত হইয়াছিল। যুগসঞ্চিত কুসংস্কার হইতে মুক্তি পাইয়া সজীব প্রাণবত্তায় সিদ্ধকাম ভারতবর্ষ নবজন্ম লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণাবয়ব পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

বুদ্ধ ও চৈতন্য

বুদ্ধদেবের জীবপ্রেম, করুণা ও মৈত্রীর নির্বিশেষ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ তাঁহার পরবর্তী যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষদের হৃদয়েও যে আবেদন জাগাইবে তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। পরের কল্যাণে প্রাণদানে, দানপারমিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদানের জন্য জীবনাহুতিতে এবং আপন একমাত্র সন্তানের প্রতি মায়ের যে স্নেহ সেই স্নেহকে সর্ব জীবের প্রতি প্রসারিত[১] করিবার প্রেরণায় মনুষ্যত্বের যে সমুজ্জ্বল ও পরিপূর্ণ প্রকাশ তাহাকে অবহেলা করিয়া কোন জাতির সাধনা কি পূর্ণতা লাভ করিতে পারে? শ্রীচৈতন্যও তাঁহার পূর্বসূরীদিগের সাধনা ও লোকোত্তর প্রাপ্তিকে অঙ্গীকার করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ প্রেম-মৈত্রী-করুণায় অবারিত ধারায় স্নাত শতদল—ভাবুক বাঙালীর 'প্রেমের ঠাকুর'। বৈষ্ণবধর্মের মর্মবাণী একটি মাত্র পংক্তিতে বিধৃত হইয়াছে—

'মেরেছিস মেরেছিস কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না'।

ভগবান বুদ্ধদেবেরও দেশনা—

মেত্তঞ্চ সব্ব লোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং[২]

সর্বলোকের প্রতি অপরিমিত মানস মৈত্রী প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সর্বাত্মক মিলনবাণীর

১। মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তমনুরক্‌খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। —মেত্তসুত্ত, সুত্তনিপাত,
১ম খণ্ড, পি. টি. এস., পৃ ২৬।

২। মেত্তসুত্ত, পৃ ২৭।

উদ্‌গাতা ছিলেন। তাঁহার আচরণে এবং অনুষ্ঠানে সার্বজনীন প্রেম মিলনাত্মক আদর্শ সূচিত হইয়াছে।[১]

বুদ্ধদেব ইন্দ্রিয় দমনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, চৈতন্যদেব ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আত্মার শ্রেষ্ঠ বাহকরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মানুভূতিকে ভাগবত অনুভূতিতে পর্যবসিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বৈষ্ণবদর্শনে ইন্দ্রিয়সমূহ বিশেষ উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার অপব্যবহার নহে, যথার্থ ব্যবহারই মানুষকে ব্যক্তিগত আসক্তির ঊর্ধ্বে শাশ্বত ও ভাগবত অনুভূতিলোকে লইয়া যাইতে পারে।

ভারতীয় দর্শনে ভগবান ত্রেধাত্মা—Trinity in unity. তিনি একাধারে প্রেমঘন, প্রজ্ঞাঘন এবং প্রতাপঘন—পীরোত্তম, ধীরোত্তম এবং বীরোত্তম।[২] বুদ্ধদেব প্রজ্ঞালোকিত পথের অভিযাত্রী। তাঁহার সাধনায় প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছে। শ্রীচৈতন্য প্রেমের পূজারী—শ্রীভগবানের প্রেমঘন স্বরূপকে তিনি প্রেমসাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের বিজ্ঞান—প্রজ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল আর ভগবদ্‌-প্রেমের পূজারী শ্রীচৈতন্যের আত্মানুভূতি ভাগবত ভাব-তন্ময়তায় ধন্য হইয়াছিল।[৩]

ঐতিহাসিক বুদ্ধ যে পথে মহাযান তথা তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনায় পরম তত্ত্বে পর্যবসিত হইয়াছেন সেই পথেই শ্রীচৈতন্যদেবও নরদেহধারী দিব্যসত্তারূপে পরিগণিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যপরিকর এবং জীবনীকারদের অলৌকিক বিশ্বাসপ্রবণতায় এবং ভক্তির প্রাবল্যে শ্রীচৈতন্যের মানব পরিচয় মুছিয়া গিয়াছে, তিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত—এক দেহে রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার।[৪] এই জন্যই তাঁহার অন্তর কৃষ্ণময়, কিন্তু দেহকান্তি শ্রীরাধার। সম্ভবতঃ এইভাবে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনার অদ্বয় মূর্তি কল্পনার চরম ও পরম প্রকাশ ঘটিয়াছে।

১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে "বৈষ্ণব আন্দোলন বৌদ্ধ ও জৈনদের আপত্তির নিরাকরণ জন্য অহিংসাবাদ গ্রহণ করে এবং তজ্জন্য পশুহত্যা দ্বারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও মাংস ভোজন নিষিদ্ধ করে।" —ভারতীয় সমাজপদ্ধতি, পৃঃ ৩১৯।

২। প্রেমধর্ম, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রিধারা) পৃঃ ২২

৩। Chaitanya and His Age গ্রন্থে (৩২৫—৩৩ পৃঃ) ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীচৈতন্যকে কোন কোন বিষয়ে বুদ্ধদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন।

৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, প্রাগুক্ত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধদেবকে শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুর অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। চৈতন্য জীবনীকার লিখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য বুদ্ধাবতার মূর্তিও পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যথা—

রঘু সিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দনন্দন
এই যত যত অবতার সে সকল।[১]

সুতরাং অবনমিত বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়ার যুগে আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করিলেও শ্রীচৈতন্য বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধকে রামচন্দ্র, নৃসিংহ, শ্রীকৃষ্ণ এবং কল্কি প্রভৃতি বিষ্ণু অবতারের সঙ্গে একাসনে স্থান দিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্মের পরিণতি —নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়

মধ্যযুগের বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অঙ্গে অঙ্গে যে দুর্নৈতিকতা এবং অধঃপতন দেখা দিয়াছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের আনুকূল্যে সেই সামাজিক বিপর্যয় দূরীভূত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কালে রামকেলী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদিগের প্রাধান্য ছিল। প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র তাহাদিগকে বৈষ্ণবধর্মে গ্রহণ করিয়া স্বদলে আনয়ন করেন। পণ্ডিতগণের মতে 'নেড়ানেড়ী' সম্প্রদায়' প্রাচীন বৌদ্ধসঙ্ঘের ক্রমিক পরিণতি। এই সম্প্রদায়ের দুর্নৈতিকতার কারণ বিশ্লেষণ করিতে হইলে বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাস হইতে জানা যায় ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আনন্দের প্রচেষ্টায় তাঁহাকে অবশেষে শাক্যরমণীদের আবেদনে স্বীকৃতি দিতে হয়। ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করিয়াই শাস্তা ভবিষ্যৎ-বাণী করেন—'এই সঙ্ঘ যাহার হাজার বৎসর পরমায়ু ছিল, ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ফলে তাহা মাত্র পাঁচশত বৎসর স্থায়ী হইবে।'[২] তথাগতের এই ভবিষ্যৎ-বাণীর সত্যতা কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া গিয়াছে। অবশ্যই কঠিন নিয়মের বেড়াদ্বারা ভবিষ্যদ্রষ্টা বুদ্ধদেব সঙ্ঘের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া পরমায়ু দীর্ঘস্থায়ী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরকালমধ্যেই সঙ্ঘে বিলাস, ব্যভিচার এবং দুর্নীতিপরায়ণতা প্রবেশ করিয়া ইহার নৈতিক বলিষ্ঠতা

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, মধ্য, ২৫শ অধ্যায়, পৃঃ ৩০৫।
২। Vinaya Piṭakam, Vol. II, ed. Oldenberg, 1880, Ch X, pp 258-56

ও সুসংযত পদ্ধতি-নিবদ্ধ আচরণের অভাব সূচনা করে। একদল ভিক্ষু অধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানরূপে নারীসংসর্গকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে রচিত কথাবথ্থু গ্রন্থে পাওয়া যায় ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যে এক প্রকার নৈশমিলন সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ভিক্ষুগণ একাভিপ্পায়ী[১] বা সমভাবাপন্ন বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধসঙ্ঘের কোন রন্ধ্রপথে ইহারা সঙ্ঘের কৃচ্ছ্রতা, সংযম ও নৈতিক বলিষ্ঠতার স্থলে যৌন অনুরাগ ও স্ত্রীপুরুষের আদর্শের একত্বকে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন। এই ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ শুধু এই জন্মেই নয় জন্মজন্মান্তরেও পরস্পর মিলিত হইবার কামনা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্ধ্র, বৈতালিক এবং উত্তর পাঠকগণ এই মতের অন্যতম পরিপোষক ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন নারীপুরুষের একত্র সম্মিলিত সাধনাই পূর্ণতা আনয়ন করে। এই উদ্দেশ্যে নৈশসভায়ও তাহারা মিলিত হইতেন। এই সভায় ধর্মতত্ত্বের গভীর বিষয়ের সঙ্গে যৌন বিষয়ও আলোচিত হইত। সভায় সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। যদিও বিরাট বৌদ্ধসঙ্ঘের তুলনায় এই 'একাভিপ্পায়ী' দল অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল এবং তাঁহাদের মতবাদ এবং কার্যকলাপ সাধারণ্যে সমর্থন লাভ করে নাই তথাপি তাঁহাদের এই আদর্শভ্রষ্টতার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধসঙ্ঘের এই নৈতিক দৌর্বল্য, ভারতের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরিয়া পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। তিব্বতরাজ চ্যাংচুং তাঁহার রাজ্যে নীল আলখাল্লাধারী ভিক্ষুদের ব্যভিচারে এবং দুরপনেয় চারিত্রিক কলঙ্কের ক্রমবর্ধমান অভিশাপে অতিষ্ট হইয়া বাংলার দীপঙ্করকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিব্বতের এই ভিক্ষুগণ একাভিপ্পায়ীদের উত্তরসাধক। বাংলার ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে দেহসম্ভোগবাদী বজ্রযান, কালচক্রযান এবং সহজযান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব বিশ্লেষণ করিলেও 'একাভিপ্পায়ীদের' ভাবাদর্শকে তাহাদের ধাত্রীরূপা বলিতে কোন বাধা নাই। বাংলার তান্ত্রিক 'ভৈরবীচক্র'[২] এবং একাভিপ্পায়ীদের 'নৈশমিলন' সমিতি একই ঐতিহ্যবাহী।

বৌদ্ধ সহজযানীরা নেড়ানেড়ী এবং ভৈরব-ভৈরবী দুইদলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে একদল বৈষ্ণব অন্যদল শাক্ত হইয়া গিয়াছে।

১। বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ৩২১।

২। ভৈরবীচক্রের তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ ও নারীরা কেহ কেহ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া চক্রে বসিতেন এবং যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়ভোগ ও কামাচারে রত থাকিতেন। কোনপ্রকার সামাজিক শৃংখলা ও নীতিধর্মকে তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না।

উভয় সম্প্রদায়ই যুগলরূপের উপাসক।[১] নেড়ানেড়ীগণ মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুভিক্ষুণী। দৃষ্টিভঙ্গীর ও জীবনচর্যার পরিবর্তনের ফলে বৌদ্ধ ভিক্ষুভিক্ষুণীসঙ্ঘ নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ে বিবর্তিত হইয়া যায়। বজ্রযানীদের নৈরাত্মা ও বোধিসত্ত্বের অদ্বয়তত্ত্বকে তাহারা নরনারীর জৈব মিলনরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এইভাবে বৌদ্ধ নির্বাণ যাহা কঠিন ত্যাগ ও সংযমের পথে লভ্য ছিল তাহা পঞ্চকামোপভোগের পথে অতি সহজতর হইয়া পড়ে।

কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের ৩য় অঙ্কে মধ্যযুগের ব্যভিচারাশ্রয়ী বৌদ্ধদিগের সামাজিক পরিস্থিতির আভাস পাওয়া যায়। এক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তখন প্রচুর ধনসম্পত্তির এবং জায়গা-জমির মালিক। তাঁহারা কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন বটে কিন্তু সেই বস্ত্রও রেশম নির্মিত। তাঁহাদের গ্রন্থের পাটায় সোনালী কাজ, ফুলতোলা রেশমী-বস্ত্রে তাঁহারা গ্রন্থ বাঁধিয়া রাখেন। তাঁহাদের চারিদিকে ভোগের ও বিলাসের প্রাচুর্য। এই প্রাচুর্যের মধ্যে যে জীবনচর্যা তাঁহারা গ্রহণ করিতেন তাহা একাধারে ভোগমূলক ও ব্যভিচারী। এই পথভ্রষ্ট বৌদ্ধগণ ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী প্রভৃতির পূজা করিতেন। ক্রমশ বৌদ্ধদেবদেবীগণের গুহ্য পূজা প্রচলিত হয়। লোকসমাজের বাহিরে 'শম্বর' নামক দেবতাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে গোপনে পূজা করা হইত। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন এই 'শম্বর' নামীয় দেবমূর্তি অত্যন্ত অশ্লীল ছিল এবং অশ্লীল প্রকারেই তাহার পূজা করা হইত।[২]

কেবল অশ্লীল মূর্তি পূজাতেই শেষ নহে। আরো চরম অধঃপতন সূচিত হইয়াছে পঞ্চ কামোপভোগের পথে চরমসিদ্ধি লাভের উপায় নির্দেশে—

দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ।
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ ॥[৩]

তাহাদের বিশ্বাস ছিল নিয়ম সংযমের পথে নহে, ব্যভিচার ও যৌনকামনার পরিতৃপ্তির পথেই সিদ্ধিলাভ—

দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈঃ সেব্যমানো ন সিদ্ধতি।
সর্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিদ্ধতি ॥[৪]

১। হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম সম্ভার, পৃঃ ২৮৫।
২। বৌদ্ধ ধর্ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৩৫৫, পৃঃ ৮১-৮২।
৩, ৪। ঐ গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।

ইন্দ্রিয়সংযম ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতার উপর বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা। 'দশ শীল'[১]ই বুদ্ধদেবের ধর্মের প্রাণবিন্দু। কিন্তু এই যুগের বৌদ্ধধর্মে সেই আদর্শের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণ লক্ষিত হয় না বরং বিপরীতধারায় পথ চলার আভাস সূচিত হইয়াছে।

এইভাবে জীবনের সমস্তদিকে কদর্যতা ও যৌনকামনার বিষ সঞ্চারিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার ক্রমবর্ধমান প্রবাহে সমাজজীবন হঠাৎ সম্পূর্ণ বিলুপ্তির মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই জরাজীর্ণ মৃত্যুবিভীষিকাময় পরিবেশে তুর্কী আক্রমণের ঝঞ্ঝা প্রবাহ বাঙালীর প্রাণসত্তাকে মূর্ছাতুর করিয়া তুলে। অবশেষে তুর্কী আক্রমণোত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশ হইতে বৌদ্ধ চিন্তানায়ক ও ভিক্ষুগণ নেপাল তিব্বত ও উড়িষ্যায় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। ফলে কাণ্ডারীবিহীন বৌদ্ধ নাগরিকগণ কখনও বিজেতার ধর্ম বরণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টিত হইয়াছে, কখনও গ্রামের একান্তে সমাজের চরম ঘৃণা ও অবমাননা বরণ করিয়া অভ্যাসের অন্ধতায় নরনারীর দেহাচার-নির্ভর ধর্মীয় কুসংস্কারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইহারাই পরবর্তীযুগে সমাজে 'নেড়ানেড়ী' নামে পরিচিত হইয়াছে। সমাজদেহে বিষাক্ত ক্ষতের ন্যায় তাহাদের অবস্থানও ছিল দুঃসহ এবং কলঙ্কজনক। যে পথ দিয়া তাহারা চলিত সেই পথ ভদ্র গৃহস্থের পরিত্যাজ্য ছিল। কোন গৃহস্থ বাড়ীতে তাহাদের আগমনকে গৃহস্বামী কখনও সুনজরে দেখিতেন না। তাহাদের ব্যভিচারের ফলে যে বাংলাদেশ একদিন বৌদ্ধদেবদেবীদের পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল—বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি বৌদ্ধদেবতা যে দেশে হিন্দুদেবতার সমান পর্যায়ে আসন পাইয়াছিলেন সে দেশে বৌদ্ধ দেবদেবীর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা বন্ধ হইল। এমন কি স্বয়ং বুদ্ধদেবকে ভুলিতেও সময় বেশী লাগিল না। কেবল বিস্মৃতিই নয়, আত্মকরণ করিয়া ঋণ স্বীকার করিতেও কেহ সাহসী হইলেন না। এই জন্য এই সময়ে বৌদ্ধভাবধারাকে

১। দশশীল :— ১। পাণাতিপাতা বেরমণী, ২। অদিন্নাদানা বেরমণী, ৩। অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী, ৪। মুসাবাদা বেরমণী, ৫। সুরা-মেরেয়মজ্জপমাদট্‌ঠানা বেরমণী, ৬। বিকালভোজনা বেরমণী, ৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্‌সনা বেরমণী, ৮। মালাগন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসনট্‌ঠানা বেরমণী, ৯। উচ্চসয়নমহাসযনা বেরমণী, ১০। জাতরূপ-রজত পাটিগ্‌গহণা বেরমণী। —খুদ্দকপাঠো, দসসিক্‌খাপদং, পি. টি. এস. (ed. Smith, 1959 pp. 1-2)

উপজীব্য করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াও স্বীকার করা কেহ প্রয়োজন বোধ করেন নাই।[১] বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এই নিশ্চিত মৃত্যুর বিভীষিকাময় কালপরিবেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।

শ্রীচৈতন্যের সময়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিক্ষুণীসঙ্ঘ 'নেড়ানেড়ী' সম্প্রদায়ে বিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।[২] এই সময়ে রামকেলী এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধভিক্ষু দলপতি কর্তৃক ভিক্ষুণীদিগকে সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বাজারে বিক্রয় করা হইত। সাধারণ মূল্য ছিল পাঁচ সিকা।[৩] বৌদ্ধসঙ্ঘে ভিক্ষুভিক্ষুণীদের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। সুতরাং ব্যভিচারের স্রোত বহিয়া চলিল। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ভেকধারী সন্ন্যাসীদের বিবরণ আছে। বলা হইয়াছে, যে সন্ন্যাসী চক্ষু মুদিত করিয়া গভীর ধ্যানে উপবিষ্ট নারীহস্তের মৃদু কঙ্কণ শব্দে সেই সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইয়া যায় এবং সে চক্ষে ফুটিয়া উঠে কামনার জ্বালা। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও শৈব কাপালিক সন্ন্যাসীদের প্রতিই এই কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই সন্ন্যাসীরা অন্য দেবতায় বিশ্বাস করিত না, নিজেদেরই তাহারা দেবতা বলিয়া মনে করিত।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় বাংলাদেশে প্রায় একশত মহাযান মতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। 'দিব্যোন্মাদ তরঙ্গিণী'-র কবি এক বৌদ্ধনেতার মুখে সমস্ত নৈতিক রীতিনীতির অবসান ঘটাইয়াছেন। তাহারা মানুষের আত্মায় বিশ্বাস করিত না, বিবাহের সামাজিক বন্ধন এবং নৈতিক বিধিনিষেধের উপরও তাহাদের আস্থা ছিল না। বর্তমান ক্ষণের বাইরে কোন বস্তুর অস্তিত্বেও তাহাদের বিশ্বাস নাই। ইন্দ্রিয়চর্চার অবাধ স্বাধীনতাই এই তন্ত্রোপাসকদের বৈশিষ্ট্য ছিল। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস লেখক এই যুগের নিন্দনীয় যৌনকামনা ও ধর্মীয় আচরণের একত্র সমন্বয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'ধর্মভাব বাঙালীর মজ্জাগত, কামকলার উত্তেজনাও দেশের প্রকৃতির নিমিত্ত এখানে অধিকতর, সুতরাং উভয়ে মিলিত হইতে অধিক সময় লাগে না। তাই অর্বাচীন বৌদ্ধের সহজসাধনা, বৈষ্ণবের যুগল এবং শাক্ত তান্ত্রিকের পঞ্চতত্ত্বে

১। বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৪।

২। Dinesh Chandra Sen, The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal, 1917, p 285.

৩। উনবিংশ শতাব্দীতে কবিওয়ালা দাশরথি রায় এই প্রথাকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন—'গোসাঞীকে পাঁচ সিকে দিয়ে। ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে। জাত্যাংশে কুলীন বড় নেড়া।'

যোগিনী-সাধনা ইত্যাদি ব্যাপার বাংলার নরম মাটিতে সত্বর পুষ্পে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে তান্ত্রিক সাধনার অপব্যবহারে চতুর্দশ শতাব্দী হইতে বাঙালী শক্তিসাধক যখন ইন্দ্রিয় সেবাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছিল, মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, বাসলী প্রভৃতির পূজায় ও তামসিক উৎসবে সাধারণ লোকের সহজ ধর্মকর্ম যখন বিকৃত হইতেছিল, তখন তাহারই প্রতিক্রিয়া-রূপে চৈতন্যের ভাগবত বৈষ্ণব মতের নব আবির্ভাব সহজ হইল'।[১]

মধ্যযুগের বাংলার ধর্মীয় জীবনের মৃত্তিকাতলে যে দৌর্বল্য ও জীর্ণ জড়তার দাহ যন্ত্রণা সঞ্চারিত হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে কেবল সেই দাহ মুক্তিই ঘটে নাই, অবহেলিত ধর্মসম্প্রদায়সমূহকে বৈষ্ণবধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় দান করিয়া তিনি জাতীয় লজ্জাও অপনোদন করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদিগকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দান করিয়া তাহাদিগকে যুগসঞ্চিত ঘৃণা ও অবমাননার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্মের অঙ্গীভূত হইবার পর পূর্বোল্লেখিত পণপ্রথা বিদূরিত হয়। বীরভদ্র তাহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলন করিয়া তাহাদের সামাজিক স্বীকৃতিও প্রদান করেন।[২] বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় তাহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর পদগৌরবে সমাজে স্থান লাভ করে। এইভাবে বৌদ্ধদিগের ব্যভিচারের স্রোত বন্ধ হইল। মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচারের ফলে এই অধঃপতিত ধর্মের ভিত্তিমূলে ভূমিকম্প দেখা দিয়াছিল। ইহাকে শুধু ধর্মান্তরী-করণ বলিলে সম্পূর্ণ বলা হয় না—ইহাই পতিত উদ্ধার। শ্রীপাদ প্রভু নিত্যানন্দের জীবনী হইতে জানা যায় তিনি ষাট হাজার বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীকে বা ভিক্ষুভিক্ষুণীকে দীক্ষাদান করিয়া বৈষ্ণবসমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়াসম্পন্ন হইয়াছিল শ্রীপাট খড়দহে। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র রামকেলীতে ১২০০ শত নেড়াকে দীক্ষা দিয়া স্বদলে আনয়ন করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে বীরভদ্র যখনই যেখানে প্রচার উদ্দেশ্যে গিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে এই নেড়াবৃন্দও গিয়াছে, তাহারা তাঁহার সকল কার্যে সাহায্যকারী ছিল।[৩] এই নেড়ানেড়ীসহ বীরভদ্র একবার ঢাকা জেলায়

১। মধ্যযুগে বাঙ্গালা: কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩০, পৃঃ ৪৭১,
২। The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal, op. cit, p. 286.
৩। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর—নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার, নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পৃ ২৩।

গিয়াছিলেন। তাহাদের অত্যাচারে সেখানের জনগণ প্রায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বীরভদ্রকর্তৃক নেড়ী সৃষ্টির এক কাল্পনিক কাহিনীও 'বংশবিস্তার' গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 'বংশমালা গ্রন্থে' আছে একদা নেড়াগণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্যাভাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহাদের ক্রোধের বহ্নিতে গৃহদ্বার পুড়িতে শুরু করে। অবশেষে বীরভদ্র তাহাদের তেজ ধ্বংস করিবার জন্য তেরশত ষোড়শী ও নবযৌবনা নেড়ী সৃষ্টি করিলেন এবং নেড়াদের অর্পণ করিলেন।[১]

প্রশ্ন আসে নিত্যানন্দ-বীরভদ্রের করুণাধারায় সিঞ্চিত হইয়া বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদের বৈষ্ণবধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লাভ করিবার পরিণতি কি হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এই ধর্মান্তরীকরণের ফলে বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাসে আর একটি যুগের সূচনা হইল। নরনারীর দেহাচার-নির্ভর বৌদ্ধসম্প্রদায়কে গ্রহণ করায় পরিণামে বৈষ্ণবধর্ম আর একটি নূতনপথে যাত্রা শুরু করে।

যখন কোন নবধর্ম তাহার সমস্ত ঔজ্জ্বল্য ও নবীন সঞ্জীবন মন্ত্র লইয়া সজীব প্রাণবত্তায় মানুষের কাছে উপস্থিত হয় তখন প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু ধর্মমত সেই নবাগত ধর্মের নিকট আত্মনিবেদন করিয়া দেয়। এইভাবে নবধর্মের বিজয়-যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি কি নবধর্মের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্ম-বিলীন করিয়া দেয়? দেখা যায় নবধর্মের নামের আড়ালে প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কার গোপনে গোপনে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া যায়। যেভাবে মহাযান ধর্মের আড়ালে পার্বত্য ও মরুবাসী জনগণের বিশ্বাস, সংস্কার ও প্রথা রক্ষা পাইয়া আসিয়াছিল, সেইভাবেই চৈতন্যসংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের আড়ালে বৌদ্ধধর্মের জীর্ণ ভগ্নাংশও আত্মরক্ষা করিয়াছিল। বৌদ্ধগণ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ 'শূন্যবাদ' প্রচারে মনোযোগ দিয়াছিল। তাহারা চৈতন্যকেও 'শূন্যমূর্তি'রূপে গ্রহণ করিয়াছিল।[২] কেবল উচ্চস্তরে চৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম সংকীর্তন করিয়াই তাহারা বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ও কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছিল। তাহারা প্রচুর গ্রন্থও রচনা করিয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থে নিজেদের তত্ত্বসমূহ তাহারা কৃষ্ণদাস, রূপ, জীব, সনাতন, মীরাবাঈ প্রভৃতি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বৈষ্ণব মহাজনদের নামে চালাইয়া দিয়াছে। নিজেদের মনোমত গল্প ও কাহিনী সৃষ্টি করিয়া বৈষ্ণব মহাজনকেই তাহাদের তত্ত্বের স্রষ্টা করিয়া

১। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর—নিত্যানন্দ প্রভুর বংশমালা, বিপিনবিহারী গোস্বামী, পৃঃ ৩৫।
২। বৃহৎ বঙ্গ, দীনেশচন্দ্র সেন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৭।

তুলিয়াছে। এইখানেই তাহারা থামিয়া যায় নাই, স্বয়ং মহাপ্রভুকেও যৌন-প্রেমের বশবর্তী করিয়াছে।[১]

বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদিগের সম্মিলিত সাধনা ও যৌন ভোগাসক্তি এবং রুচির অমসৃণতা বৈষ্ণবসাধকদের ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। এই ব্যাপারে বৈষ্ণবদের মধ্যেও মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছিল।[২] ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় সেইযুগের অনেক বৈষ্ণবসাধক নরনারীর এই সম্মিলিত সাধনার বিরুদ্ধে ছিলেন।

বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণবধর্মে গ্রহণ করার অন্যতম পরিণতিরূপে তান্ত্রিক বৌদ্ধ-চিন্তাধারা চৈতন্য-নিত্যানন্দের নামের আড়ালে ও তাঁহাদের ধুয়ায় বৈষ্ণবধর্মে প্রবেশ লাভ করে। ইহারাই বৈষ্ণব সহজিয়া নামে পরিচিত হইয়াছিল।

১। বৃহৎ বঙ্গ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮—২৯।

২। প্রেমদাস মিত্র—বংশীশিক্ষা, ভাগবতকুমার দেব গোস্বামী, পৃ ২১৬—১৭।

পঞ্চম অধ্যায়

অনুবাদ সাহিত্য

খৃঃ দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের এক অন্ধকারময় অধ্যায়। এই সময় নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বাংলার মাটিতে যথেচ্ছ অত্যাচার, যুদ্ধ, নারকীয় হত্যাকাণ্ড এবং ধর্মান্তরীকরণের প্লাবন চলিয়াছে। ইহা বৌদ্ধসংস্কৃতি তথা বাঙালী সংস্কৃতির এক বিপর্যয়ের যুগ। সেন রাজত্বকালে বাংলাদেশের অনুন্নত জনগণ প্রতিপত্তিশালী অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক নির্যাতিত ও নিপীড়িত হইত। সমাজের এই দুর্বল অংশে ইসলামের বিজয়বার্তা সহজেই স্বীকৃতি পায়। বাংলার বৌদ্ধ অধিবাসীরা পাঠান আক্রমণকে ভগবানের আশীর্বাদরূপে স্বাগত জানাইয়াছে। শূন্যপুরাণে পাওয়া যায় নিরঞ্জন স্বয়ং কালো টুপি পরিয়া কামান হাতে যুদ্ধে নামিয়াছেন, দেবতাগণও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। তাঁহারাই যেন মন্দির ভাঙ্গিতেছেন, অত্যাচারের স্রোত বহাইয়া হিন্দু ধ্বংস করিতেছেন।[১] সেন রাজত্বকালে বৌদ্ধগণ 'পাষণ্ডী' ও নাস্তিকরূপে হিন্দু-সমাজে অপাংক্তেয় ও অবহেলিত জীবন যাপন করিত। অবশেষে সম্ভবতঃ এক নির্মম প্রতিশোধস্পৃহায় তাহারা বিদেশী রাষ্ট্রশক্তিকে সাদরে অভিনন্দন জানাইয়াছিল।[২]

তুর্কী আক্রমণ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিপর্যয়

তুর্কী আক্রমণের তীব্রতা ও বিভীষিকা সর্বাপেক্ষা দুঃসহরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মগধের ওদন্তপুরী বিহার এবং বিক্রমশীলা বিহার ধ্বংসকার্যে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই সর্বাত্মক বিধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। নালন্দার রত্নসাগর, রত্নবোধী ও রত্নরঞ্জক নামক কলা ও স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শনস্বরূপ মন্দিরত্রয়—যাহা হিউয়েন সাঙ প্রভৃতি ভ্রমণকারিগণের নিকট উচ্চ প্রশংসা আদায় করিয়াছিল ইসলামের আক্রমণে তাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।[৩] বিহারের অভ্যন্তরস্থ বিশাল বুদ্ধ প্রতিমা ও যুগোত্তীর্ণ শিল্প-

১। শূন্যপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ২৩২।

২। বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ৫২৮।

৩। S. Datta. Buddhist Monks and Monasteries of India, 1962, p. 348.

সম্পদ্ বিজয়ীর কুঠারাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। ওদন্তীপুর ধ্বংসকার্যে এই তীব্রতা আরো চরমে উঠে। রণোন্মত্ত মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলজি জানিতে পারিলেন পাটনার অন্তর্গত একটি বিরাট দুর্গমধ্যে প্রচুর সৈন্য-সামন্ত মজুদ রহিয়াছে। বক্তিয়ার খিলজির বিজয়বাহিনী রণোন্মাদনায় পাটনার পথে যাত্রা করিল। পথের দুই পার্শ্বে ধ্বংসস্তূপ জমিতে লাগিল। এমন কোন গ্রাম রহিল না যেখানে কোন দেবমন্দির অভগ্ন ও অক্ষত রহিল। নির্বিচারে হিন্দু ও বৌদ্ধ জনগণ প্রাণ হারাইতে লাগিল। তুর্কী বাহিনী বিহারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে বিহারটিকেই তাহারা সৈন্যনিবাস বা দুর্গ মনে করিয়া বসিল। বিহারের বহুতল অট্টালিকায় তখন বৌদ্ধপণ্ডিত ও আচার্যগণ এবং তাঁহাদের শতসহস্র শিষ্যগণ অধ্যয়নরত ছিলেন। বক্তিয়ার মনে করিল এই কাষায়বস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুগণ নিশ্চয় পর্তুগীজ সেনাপতি। অবশেষে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের মুখে একের পর এক ভিক্ষুগণ প্রাণ দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র বিহার জনশূন্য হইল। এইবার বিজয়ী বাহিনী বিহারের বহুযুগ-সঞ্চিত সম্পত্তি এবং ভিক্ষুদের ধন লুণ্ঠন করিয়া লইল। বক্তিয়ার আনন্দাতিশয্যের মধ্যে উপলব্ধি করিল মগধের সৈন্য-সুরক্ষিত দুর্গ হইতে সে রাজভাণ্ডার দখল করিয়া লইয়াছে। অবশেষে বিজয়োন্মত্ত বক্তিয়ারের দৃষ্টি পড়িল এক বিরাট অট্টালিকাপরিপূর্ণ হাজার হাজার গ্রন্থাবলীর দিকে। বক্তিয়ার জানিতে চাহিল এইগুলি কি? কিন্তু সমগ্র বিহারের মধ্যে তখন একজনও অধ্যাপক, একজনও বিদ্যার্থী এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আর জীবিত নাই। আশেপাশেও কোন হিন্দুবৌদ্ধ প্রজা অবশিষ্ট ছিল না। বক্তিয়ারের মনে তখন বিজয়ীর উন্মাদনা। তাহার আদেশে বিহারের অট্টালিকায় অগ্নি প্রদান করা হইল। মুহূর্তে নিরন্ধ্র বিনষ্টির কবলে সমগ্র বিহার শূন্য হইয়া গেল।[১] সেদিন ভবিষ্যৎ মানবগোষ্ঠী তাহার পূর্বপুরুষের কত সাধনার ফল হইতে বঞ্চিত হইল তাহা কে নির্ণয় করিবে? ইসলামগণ যখন জানিল ধ্বংসীভূত এই দুর্গ এক বিহার বা মাদ্রাসা তখন তাহারা সমস্ত দেশকে 'বিহার' or Land of Buddhist monasteries নামে অভিহিত করে। ১১৯৯ খৃঃ তুর্কী অধিকৃত এই বিহারটি ওদন্দ বিহার (Audand Bihar) বা 'ওদন্তপুর বিহার' নামে পরিচিত ছিল।[২] মিনহাজ-উস-সিরাজের বর্ণনা হইতে জানা যায় গৌড়-মগধ-বিজেতা

১। S. Datta, Buddhist Monks and Monasteries of India, 1962, pp 357-58.

২। J. N. Sarker, History of Bengal, Vol. II, ch. 1, p. 3.

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার বিপুল সেনাবাহিনীসহ মগধের গ্রাম ও সহরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লুণ্ঠন করিতেন। তাঁহার বিজয় বাহিনী বিহার নগর পর্যন্ত ধ্বংস করিয়াছিল।

মগধ-বিজয়ী এই ইসলাম বাহিনী রণডঙ্কা বাজাইয়া অবশেষে বাংলা দেশে উপস্থিত হইল।[১] বাংলার সিংহাসনে তখন নরপতি লক্ষণসেন অধিষ্ঠিত। লক্ষ্মণসেন পরাজিত হইলেন এবং বাংলায়ও সেই বিধ্বংসী লীলা অনুষ্ঠিত হইতে শুরু হইল। উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ যেখানে বৌদ্ধ নাগরিকের সংখ্যা বেশী ইসলামের বিজয় পতাকা সেখানে অতি উচ্চে প্রোথিত হইল। উগ্র ধর্মান্তরীকরণ এবং চণ্ডনীতি দ্বারা হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধ্বংস দুই-ই সমান গতিতে চলিতে লাগিল। আবার কখনও মন্দির ও মঠের ভগ্নাবশেষ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ চলিতেছিল। সিকন্দর শাহ্ এই কার্যে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেয়। এই সময়ে ইসলামগণ কখনও বৌদ্ধমঠকে মসজিদে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছে আবার কখনও হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দিরের পার্শ্বে পীরের দরগা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বহু বৌদ্ধকাহিনীকে 'মকদুম সাহেবের গল্প'-রূপে চালাইয়া দিতেও তাহারা ইতস্ততঃ করে নাই। এইভাবে চট্টগ্রাম প্রভৃতি বৌদ্ধ-প্রধান অঞ্চলে বৌদ্ধ-মঠের পার্শ্বেই ফকিরের কাল্পনিক সমাধিস্থল গড়িয়া উঠিয়াছে এবং দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে তাহা মুসলমান তীর্থক্ষেত্ররূপেই স্বীকৃতি আদায় করিয়াছে। এই নির্যাতন ও ধ্বংসলীলার প্রবল আঘাতে হিন্দু-বৌদ্ধ মঠমন্দিরের চূড়া খসিয়া পড়ে, প্রতিমাসমূহ ধাতুখণ্ডে পরিণত হইয়া মাটির বুকে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর বহু শাস্ত্রপুঁথি অগ্নির লেলিহান শিখার খোরাক হয়। এইভাবে অত্যাচারীর রক্তরঞ্জিত তরবারির আঘাতে বৌদ্ধ শিল্প-লক্ষ্মী সৃজনহীন উষরতাকে বরণ করিয়া লইলেন।

বাংলাদেশে লক্ষ্মণসেন এবং তাঁহার পুত্রগণ গৌড়ের স্বাধীনতা রক্ষায় ইসলামের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন। লক্ষ্মণসেন, 'পরম সৌর' ছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল সৌগত সংস্রব এবং বৌদ্ধপ্রজা ও ভিক্ষুদিগের প্রভাবে এই বংশের 'মধুসেন' নামক নৃপতি পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরম সৌগত মধুসেন রূপে সম্মানিত হইয়াছেন।[২]

১। History of Bengal, Vol. II ; p. 4.

২। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, নগেন্দ্রনাথ বসু, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯।

মালদহ অঞ্চলে বৌদ্ধনাগরিকগণের বিরোধিতা এবং আক্রমণকারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের জন্য সেন নৃপতিকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহার পর সেন নরপতিগণ বৌদ্ধনাগরিকদিগের সঙ্গে সদ্‌ভাব বজায় রাখিয়া তাহাদের আনুকূল্যে মুসলমানদের বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। বৌদ্ধ জনগণও ব্যর্থ আশায় আক্রমণকারীদের স্বাগত জানাইয়া যখন অত্যাচারে জর্জরিত হইল তখন সেন নরপতিদের পক্ষাবলম্বন করিয়া আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল। এই সময় মধুসেনের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম পুনপ্রতিষ্ঠা অর্জনের পথে অগ্রসর হইতেছিল। রাঢ় ও বরেন্দ্রের বৌদ্ধজনগণও মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে।

তুর্কী আক্রমণের আঘাত আত্মস্থ করিয়া বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম স্বল্পকাল আত্মগোপন করিয়াছিল। প্রথমতঃ নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতির ধ্বংস বৌদ্ধজগতের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হানিয়াছিল। ক্রমে সাধারণ লোকের উপরও অত্যাচার প্রচণ্ডাকারে দেখা দেয়। এইবার পলায়নের পালা আরম্ভ হইল। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শাস্ত্রসমূহ পরম যত্নে সংরক্ষিত করিয়া দিকে দিকে পলায়ন শুরু করিলেন। তিব্বতের গিরিগুহায়, নেপালের উপত্যকায়, এবং সুদূর মিথিলা, কলিঙ্গ, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহারা আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। সাধারণ বৌদ্ধ জনগণের আশ্রয়স্থল আর কেহ রহিল না, অবশেষে অত্যাচারীর ধর্ম বরণ করিয়া বাংলার বৌদ্ধজনগণ আত্মরক্ষার পথ গ্রহণ করিল। কিন্তু পলায়ন অথবা আত্মসমর্পণ করিয়া কোন জাতি বা ধর্ম টিকিয়া থাকিতে পারে না। বাঙালীর জাতীয় জীবনে তখন এমন এক বিপর্যয় যে তাহাকে হয়ত সংগ্রাম করিয়া, বিপক্ষের প্রমত্ত আঘাতকে প্রতিহত করিয়া প্রতিরোধের মধ্য দিয়া বাঁচিতে হইবে অথবা চির অবলুপ্তিকে স্বীকৃতি দিতে হইবে। বাংলার বৌদ্ধ জনগণ নৈতিক বলিষ্ঠতা এবং সজীব প্রাণবত্তার অভাবে অবলুপ্তিকে আহ্বান জানাইল। এইভাবে অগ্নিস্নাত বাংলার ক্রান্তি পরিক্রমা কালে বৌদ্ধপণ্ডিতগণ পলাইয়া বাঁচিলেন এবং নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধগণ আক্রমণকারীর ধর্ম গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। ইহার পরিণতি বাংলাদেশ—যেখানে একদিন বৌদ্ধধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল, সেই বাংলাদেশের মাটিতে বৌদ্ধ-ধর্ম চির উষরতায় বিলয়প্রাপ্ত হইল। তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলায় দাহমুক্তির অবসানে সাহিত্য ও শিল্প-সাধনায় আর বৌদ্ধ-পণ্ডিতদিগকে হিন্দুদের সঙ্গে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতে দেখা গেল না। তুর্কী আক্রমণের

আঘাতের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি নবজাগ্রত, সুবিন্যস্ত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সিদ্ধকাম পূত নবীন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। আর তুর্কী আক্রমণের আঘাত মাধ্যমে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিলুপ্তির শীতল-নীরক্ত পাণ্ডুরতা স্পষ্ট-চিহ্নিত হইয়া উঠিল। বাঙালীর বাণীমন্দিরেও বৌদ্ধ-কবিদিগের কণ্ঠ নির্জীবতায় আহত হইয়া সঙ্গীতহারা হইল। তুর্কী শাসনের সুসংস্থানকালে বাংলায় রাষ্ট্রীক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজচ্ছত্রের ছায়াতলে বৈপ্লবিক সাধনায় সিদ্ধকাম বাঙালীর সাহিত্যচর্চার বৈচিত্র্যব্যাপ্তিময় সম্ভাবনা আবার দেখা দিল। এই সময়ে অভিজাত ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাংলাদেশের চির অবহেলিত অনভিজাত সমাজের সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া যুগচাহিদার প্রতি যে উদার সুবিচার প্রদর্শন করিয়াছে তাহার ফলে কেবল বাংলার সংহতি ও শক্তিই বৃদ্ধি পায় নাই, এক সার্বিক জীবনাদর্শের পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যও পূর্ণায়তির পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়াছে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্য তাহার সার্থক পরিচয়বাহী। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ঐতিহ্য এবং লোকজীবনের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি স্বচ্ছন্দ-সুন্দর গতিতে এখানে এক সূত্রে বিধৃত হইয়াছে।

মুসলিম রাজশক্তি বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর এদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি লাভের জন্য তৎপর হইয়া উঠে। চতুর্দশ শতাব্দীতে সামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৩৯—১৩৫৮ খৃঃ) বাংলায় সুলতানী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাষ্ট্র বিপর্যয়ের ঝড়ঝঞ্ঝা শান্ত হইলে বাংলায় আবার সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা শুরু হইল। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির চরম বিপর্যয়ের অন্তে বাংলাদেশে তখন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিই মুখ্য স্থান পাইয়াছে। ১৪শ শতাব্দীতে দেবীবর ঘটক তাঁহার 'মেলবন্ধন' গ্রন্থে কৌলিন্য প্রথার সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়া সঙ্কীর্ণাচার-প্রধান হিন্দুসমাজে উদার সমাজজীবনের পথ প্রশস্ত করিলেন। ১৬শ শতাব্দীতে স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁহার 'অষ্টবিংশতি তত্ত্ব' রচনা করিয়া হিন্দুসমাজের পুনর্গঠনে অগ্রসর হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও আপামর জনগণের মধ্যে 'কৃষ্ণনামামৃত বিতরণ করিয়া সামাজিক সাম্য আনয়ন করিলেন। অবশেষে ইসলাম-রাজ-শক্তির উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার উদার পটভূমিকায় বাঙালীর মনীষা নবরূপে জন্মলাভ করিল। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ দ্বারা বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি শুরু হইল। দীর্ঘকাল নিদ্রিত বাঙালীর সৃজনী প্রতিভা সংস্কৃত

অনুবাদ সাহিত্য ও সংস্কার যুগ

সাহিত্যের অতুলনীয় ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইয়া অনাগত যুগ-সম্ভাবনায় পথে জয়যাত্রা শুরু করিল। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ দেবভাষায় রচিত গ্রন্থকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রথমতঃ বিরোধিতা করিলেও[১] পরে তাঁহারাও বুঝিলেন অনুবাদের মাধ্যমে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রচলনই বৌদ্ধধর্মের মূলোচ্ছেদের সহায়ক হইবে। বৌদ্ধযুগের অবসান ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলা অনুবাদ সাহিত্য রচিত হইয়াছে। এইজন্য বাংলা রামায়ণে, মহাভারতে ও ভাগবতে কেবল সংস্কৃতের আদর্শই অনুসৃত হয় নাই, বৌদ্ধ, জৈন ও লৌকিক সাহিত্যের ঐতিহ্যের প্রতিও সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। তান্ত্রিকতার প্রভাবও অনুবাদ সাহিত্যে একেবারে উন্মূলিত হইয়া যায় নাই।

রামায়ণ :

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের প্রধানতঃ তিন শাখা—রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত। রামায়ণ আদি মহাকাব্য। বৌদ্ধযুগের গৈরিক নির্বেদ এবং জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার আদর্শকে অতিক্রম করিয়া রামায়ণ গৃহধর্মের শান্ত-রসোজ্জ্বল পুণ্য পারিবারিক সম্পর্কের চিরকালীন বাণীকে অমরতা দিয়াছে। বৌদ্ধধর্মে অনাগারিক প্রব্রজিত জীবনাদর্শ সর্বাধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে, আর রামায়ণে আগারিক জীবনের স্নেহ-প্রীতিস্নিগ্ধ শান্ত মধুর গার্হস্থ্য জীবনের চিরন্তন আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ একান্তভাবে বাল্মীকি রামায়ণের ধারাকে অনুসরণ করে নাই। দাক্ষিণাত্যে রামায়ণের অন্য একটি ধারাও প্রচলিত আছে। এই ধারায় উত্তরকাণ্ড প্রথমে সংস্থাপিত হইয়া বৌদ্ধ ও জৈন দ্বিবিধরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ এবং শ্যামদেশে প্রচলিত রামায়ণেও বাল্মীকি রামায়ণের আদর্শ অবিমিশ্রভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে নাই। বৌদ্ধ জাতক ও রামায়ণের কাহিনী রচনায়, চরিত্রসৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি ভাবাদর্শের উপস্থাপনায় আনুপূর্বিক সাম্য বজায় থাকে নাই। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র লঙ্কাবতার সূত্রে রাক্ষসরাজ রাবণ বুদ্ধদেবের একান্ত অনুগত শিষ্য। এই গ্রন্থে তিনি বুদ্ধদেবের সঙ্গে ধর্মের গভীর তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত আছেন। এইভাবে রামায়ণ কাহিনী যুগে যুগে দেশে দেশে বিচিত্র ও বহুমুখিন পরিণতি লাভ

১। অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
—বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭৭ হইতে উদ্ধৃত।

করিয়াছে। বাঙালী কবিগণের গ্রহিষ্ণু ও সমন্বয়বাদী মননশীলতা তাঁহাদের কেবল বাল্মীকি রামায়ণের সীমানায় আবদ্ধ থাকিতে দেয় নাই। আদি কবির প্রতি তাঁহাদের মহত্তম অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে সত্যই, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের বৌদ্ধ কি জৈন রামায়ণের প্রতি তাঁহাদের সপ্রশংস দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। বৌদ্ধ জাতকে বর্ণিত আখ্যানের প্রতিও তাঁহারা অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। খৃষ্টের জন্মের বহুপূর্ব হইতেই দক্ষিণ ভারতের রামায়ণ কাহিনীতে রাম অপেক্ষা রাবণের মহত্ত্ব অধিকতর স্বীকৃতি পাইয়াছে। তাঁহারা রাবণকে অত্যাচারী অনাচারী রাক্ষসরাজরূপে গ্রহণ করেন নাই। রাবণ তাঁহাদের জাতীয় বীর। তাঁহার তপঃপূত চরিত্র, ধর্মনিষ্ঠা ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানের নিকট রামও ম্লান হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্যতম ভাষ্যকার ধর্মকীর্তি ব্রাহ্মণকবির কাব্যে বৌদ্ধ নৃপতি রাবণের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুমান করিয়াছেন—'সমগ্র রামায়ণকাহিনীর পশ্চাতে জাতিগত বিরোধ এবং ধর্মগত (ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ও অব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ) দ্বন্দ্বের আভাস আছে—অন্ততঃ দক্ষিণভারতের অধিবাসীরা যে তাহাদের জাতীয় বীর রাবণকে অধিকতর গৌরব দিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।'[১]

দশরথ জাতক ও রামায়ণ

মহাকবির লেখনি রামায়ণকাহিনীকে সর্বাঙ্গীণ ও সামগ্রিক রূপদানের পূর্বে এই কাহিনী বিশাল ভারতবর্ষের জনপদে জনপদে বিভিন্ন লোকমুখে বহু বিচিত্র উপগল্পের আকারে ছড়াইয়া ছিল। দশরথ জাতক রামায়ণের পূর্বরূপ অথবা বিকৃতরূপ তাহা পরে আলোচনা করা হইবে, তবে কোন কোন সমালোচক এই জাতকটিকে 'একখানি ছোটখাট রামায়ণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[২] রামায়ণের সঙ্গে তাহার তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য এই জাতকটি[৩] সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

প্রাচীনকালে বারাণসীধামে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার ষোড়শ সহস্র মহিষীর মধ্যে প্রথমা অগ্রমহিষীর গর্ভে রামপণ্ডিত, লক্ষ্মণকুমার

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, ১৯৬৩, পৃঃ ৪৬২-৬৩

২। জাতকমঞ্জরী, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১৯৩৪, উপক্রমণিকা পৃঃ ৮,

৩। Fausboll, Jātaka, Vol. IV. no. 461

এবং সীতা দেবী ও দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভে ভরতকুমার জন্মগ্রহণ করেন। একদা রাজা সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া দ্বিতীয়া মহিষীকে বলিলেন—'প্রিয়ে, তোমার মনোমত বর প্রার্থনা করিয়া লও।' মহিষী বলিলেন—'মহারাজ আপনার অনুগ্রহ আমার শিরোধার্য। আমি যথাসময়ে আমার অভিলষিত বর প্রার্থনা করিব, এখন নহে।' যথাসময়ে ভরতকুমার সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিল এবং তাহার জননী রাজার নিকট আপন মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করিলেন—'আমার পুত্রকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করুন।' রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'আমার প্রবল পরাক্রমশালী দুই জ্যেষ্ঠপুত্র বর্তমান থাকিতে তাহা কখনই সম্ভব নহে।' কিন্তু রাণী তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। পুত্রদ্বয়ের ভবিষ্যৎ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনায় একদা পিতা তাঁহাদের বলিলেন—'বৎসগণ, এইখানে অবস্থান করিলে তোমাদের বিপদ সম্ভাবনা রহিয়াছে। তোমরা কোন সামন্তরাজ্য অথবা বনে প্রস্থান কর। দ্বাদশ বৎসরান্তে আমার মৃত্যু সংবাদ অবগত হইলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিও।' রামপণ্ডিত ও লক্ষ্মণকুমার পিতৃ আদেশ শিরোধার্য করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গমনের আয়োজন করিলেন। সীতাদেবীও ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগমন করিলেন। রামলক্ষ্মণ সীতার গমনপথে বারাণসীর সহস্র সহস্র নরনারীও চলিতে লাগিল। রামপণ্ডিত তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং স্বচ্ছ বারিযুক্ত ফলপুষ্প সুশোভিত এক মনোরম অরণ্যপ্রদেশে কুটিব নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রামের বনগমনের নবমবর্ষে রাজা দশরথ পুত্রশোকে কাতরচিত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। এইবার ভরতের রাজচ্ছত্র গ্রহণের পালা। কিন্তু ভরতকুমার বলিলেন—'আমি অগ্রজ রামকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিব।' বনে উপনীত হইয়া ভরতকুমার পিতার কালপ্রাপ্তির সংবাদ জ্যেষ্ঠভ্রাতার গোচরীভূত করিলেন এবং তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীও পিতৃশোকে অভিভূত হইলেন। কেবল রামপণ্ডিত স্থির, প্রশান্ত ও বিগতশোক। ভরতের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অনিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। ভরতকুমার আবেদন জানাইলেন—'আপনার প্রতীক্ষায় রাজসিংহাসন শূন্য রহিয়াছে, এখন বারাণসীধামে প্রত্যাগমন করুন।' কিন্তু রামপণ্ডিত পিতৃআজ্ঞায় দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প। অবশেষে রামের তৃণনির্মিত পাদুকা বহন করিয়া ভরত লক্ষ্মণ ও সীতাসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দ্বাদশ বৎসরান্তে

রামপণ্ডিত বারাণসীধামে আগমন করিলেন। সীতাদেবীকে অগ্রমহিষীর পদে অধিষ্ঠিত করিয়া রামের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সুদীর্ঘ ষোড়শ সহস্র বৎসর যথারীতি রাজধর্ম পালন করিয়া তিনি স্বরলোকে প্রস্থান করিলেন।

'দশরথ জাতক' কাহিনী ও রামায়ণের আখ্যান দুই বিপরীত ধারায় প্রবহমান। রামায়ণে দশরথ অযোধ্যার নৃপতি, জাতকে তিনি বারাণসীর রাজা। রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন চারিভ্রাতা, দশরথ জাতকে তাঁহারা তিন ভ্রাতা রাম, লক্ষ্মণ এবং ভরত ও এক ভগিনী। জাতকে সীতা বসুমতী-সমুত্থিতা জনক-কন্যা নহেন, তিনি দশরথসুতা অর্থাৎ রামের ভগিনী। অনেকে মনে করেন জাতককার জনকনন্দিনী শব্দের অর্থ জনকের অর্থাৎ পিতার কন্যারূপে গ্রহণ করিয়া সীতাকে রামের ভগিনীরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রামের ভগিনী বিবাহ বৌদ্ধ আচারের নজিররূপে গ্রহণ করা যায়। উদয়জাতকে[১] এবং দীঘনিকায়ে শাক্যবংশের উৎপত্তি বর্ণনায়[২] ভগিনী বিবাহের উল্লেখ আছে। চীন রামায়ণের কাহিনীতেও সীতা রামের ভগিনী ও মহিষী দুই-ই। জাতকে রাম বনবাস উদ্‌যাপন করেন হিমাচলের অরণ্য প্রদেশে আর রামায়ণে দক্ষিণ-ভারতের দণ্ডকারণ্যে। রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ যাহা রামায়ণের অন্যতম ঘটনা জাতকে তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। এইখানে দ্বাদশ বৎসরান্তে রাম বারাণসীধামে ফিরিয়া আসিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং সীতাদেবীকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিয়াছেন। আরো কয়েকটি জাতক কাহিনীতে রামসীতার বনবাস জীবনের উল্লেখ আছে এবং রাময়ণকাহিনীর সঙ্গে এই জাতকসমূহের তথ্যের কোন অসামঞ্জস্য বা বিরোধিতা নাই।[৩] রামভক্ত হনুমান সুগ্রীবাদিও জাতকে স্থান পায় নাই। জাতকে রাম পরম পণ্ডিত, স্থির প্রশান্ত, শোকেদুঃখে বিগতস্পৃহ। রাজপুত্র হইয়াও মহাসত্ত্ব, সংসারের অনিত্যতত্ত্ব তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। রামায়ণে রাম চরিত্রে দেবতা আপন মহিমা খর্ব করিয়া মানবরূপে ধরা দিয়াছেন, তিনি কখনও পিতৃশোকে ক্রন্দন-পরায়ণ, কখনও পত্নীর বিরহব্যথায় চঞ্চল, কখনও ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান। সংসারের রূপরস ও স্নেহপ্রীতি বৈরাগ্যের পাণ্ডুরস্পর্শে তাঁহার চক্ষে ম্লান হইয়া

১। **Fausboll, Jātaka, Vol, IV, no. 458.**
২। দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, অম্বট্ঠ সুত্ত, পি. টি. এস.
৩। **Jayaddisa Jātaka—Fausboll, Jātaka Vol. V ;**
Vessantara Jātaka ,, ,, Vol VI

যায় নাই। গভীরতম মানবিক অনুভূতির সত্যতম প্রকাশে রামচন্দ্র আদর্শ গৃহী আর রামপণ্ডিত বিচক্ষণ জ্ঞানবান্ পুরুষ। রামায়ণ নরচন্দ্রমার আখ্যান, দশরথ জাতক রামপণ্ডিতের কাহিনীমাত্র, রামায়ণে রাম মানুষ হইয়াও দেবতা, জাতকে রামপণ্ডিত পাণ্ডিত্যের সীমা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। উভয় কাহিনীতে বিমাতার চক্রান্তে রাম বনগমন করেন। ভরতকর্তৃক রামের পাদুকাগ্রহণ ও রাজ্য পরিচালনা উভয় গ্রন্থেই এক। মধ্যমা মহিষীর বরপ্রার্থনা এবং পুত্রশোকে রাজা দশরথের পরলোকগমনও দুই গ্রন্থেই স্থান পাইয়াছে।

এখন প্রশ্ন আসে 'দশরথ জাতক' ও 'রামায়ণ' কোন্‌টা পূর্ববর্তী, কে কাহার নিকট ঋণী? এই সমস্যার সমাধান করিতে বসিয়া পণ্ডিতগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়াছেন।[১] একদলের মতে রামায়ণ ও মহাভারত বুদ্ধদেবের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। জাতককারগণ মহাকাব্যের কাহিনীসমূহ গ্রহণ করিয়া তাহার বিকৃতি ঘটাইয়াছেন এবং বৌদ্ধ মতবাদ প্রচারের উপযোগী করিয়া বৌদ্ধ-সাহিত্যে স্থান দিয়াছেন। অন্যদলের মতে মহাকাব্যদ্বয় গৌতম বুদ্ধের পূর্বে বর্তমান আকার লাভ করে নাই। গৌতম বুদ্ধের জন্মের বহুপূর্বে জাতকের অনেক আখ্যান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সুতরাং যে সমস্ত জাতকের আখ্যান মহাকাব্যদ্বয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখিয়াছে তাহা জাতক হইতেই রামায়ণ-মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

প্রকৃতই একদা রামের কাহিনী বিচিত্রধারায় সমগ্র ভারতব্যাপী প্রবাহিত হইয়াছিল। বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন পরিবেশে তাহার বিচিত্র প্রকাশ। সমগ্র দেশের যুগ যুগ সঞ্চিত বাণী, তাহার দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তাহার সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা ও হৃদয়াবেগ মহাকাব্যে বিধৃত হইয়া চিরন্তন কালের সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। কবির ভাষায় রামায়ণ মহাভারত— 'কোন ব্যক্তি বিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে।'[২] যুগযুগান্তরের বহু শত শত কবির রচিত আখ্যায়িকা ও কাহিনীর পলিমৃত্তিকা আহরণ করিয়া ব্যাস ও বাল্মীকি তাঁহাদের কাব্যপ্রতিমার কায়া গঠন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে অনেকে সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্য বাল্মীকির রচনা বলিয়া স্বীকারও করেন নাই। বহু

১। জাতকমঞ্জরী, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১৯৩৪, উপক্রমণিকা, পৃঃ ৶

২। প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৬ পৃঃ ৫।

প্রক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা মহাকাব্যের বিপুল ঐতিহ্যের মধ্যে আত্মলীন অবস্থায় রহিয়াছে। এই আখ্যায়িকাসমূহ মহাকাব্যের ও জাতকের সাধারণ সম্পত্তি। জাতকে যাহা কাব্যোৎকর্ষ-বর্জিত অসংস্কৃত ও অমার্জিত, মহাকাব্যে মহাকবির প্রতিভার যাদুস্পর্শে তাহাই সর্বাত্মক জাতীয় জীবনচেতনার বাণীরূপ। জাতকে যাহা অঙ্কুরমাত্র মহাকাব্যে তাহাই পত্রপুষ্পে সুশোভিত মনোরম নন্দন কানন সৃষ্টি করিয়াছে। জাতকের প্রাচীনত্বের পক্ষে আরো একটি যুক্তি আহরণ করা যাইতে পারে, জাতক আখ্যানসমূহ যদি রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তীকালে রচিত হইত তবে মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনার অপকর্ষ ও বিকৃতি সাধন করিতে জাতককারগণ সাহসী হইতেন না। রামায়ণ মহাভারত রচিত হইবার পরে রাম-সীতাকে ভ্রাতা-ভগিনীরূপে, শকুন্তলাকে কাষ্ঠহারিণীরূপে[১] ও দ্রৌপদীকে কুব্জের প্রতি আসক্তারূপে[২] পরিচিত করিয়া অমার্জিত রুচিবিকারের নিদর্শন সৃষ্টি করিতে কেহই অগ্রসর হইবেন না আশা করা যায়।

জাতক হইতে মহাকাব্য এবং তৎপরে বাংলা রামায়ণ মহাভারত পর্যন্ত সাধারণ আখ্যানসমূহের একটি স্তর পরম্পরা পাওয়া যায়। অনেক জাতকের রচয়িতা ছিলেন সমাজের নাম না-জানা কবি—অখ্যাত, অজ্ঞাত কথাকার। মহাকবি তাঁহাদের সঞ্চয়-সমবায়কে পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। জাতকের কাষ্ঠহারিণী প্রকৃতিদুহিতা শকুন্তলায় পরিণত হইয়াছেন। রামপণ্ডিত বাল্মীকির প্রাণে চিরায়তির আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বের নরনারীর হৃদয়রাজ্যে নবচন্দ্রমারূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। শিবির কাহিনী জাতক হইতে সংগৃহীত হইয়া মহাভারতে স্থান পাইয়াছে। দানবীর শিবির অন্তরে জাগ্রত আকাঙ্ক্ষাসমূহের মধ্যেই মহাভারতের কাহিনীর সম্ভাবনা রহিয়াছে। কবি কৃত্তিবাস ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী বর্ণনায় বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষাও জাতকের অধিকতর অনুসরণ করিয়াছেন। অলম্বুষা জাতকে[৩] এবং নলিনিকা জাতকে[৪] ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। অলম্বুষা জাতকে ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীর গর্ভজাত বোধিসত্ত্বের সন্তান। মৃগের ন্যায় শৃঙ্গ ছিল বলিয়া হয়ত তাঁহার এই নামকরণ হয়। ঋষ্যশৃঙ্গের কঠিন সাধনায় ও শীলতেজে শক্র ভীত

১। Fousboll, Jātaka Vol. I, No 7
২। ঐ, Vol. V, No, 536
৩। ঐ, Vol. V, No. 523
৪। ঐ, Vol. V, No. 526

হইয়া অপ্সরা অলম্বুষাকে তাপসের শীলভঙ্গ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। নলিনিকা জাতকেও বোধিসত্বের বীর্য পান করিয়া এক হরিণী ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম দেয়। ঋষিকুমারের কঠিন তপস্যায় ও শীলতেজে বর্ষণ বন্ধ হয় এবং বারাণসীধামে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। রাজ্যরক্ষার অভিপ্রায়ে রাজা রাজকন্যা নলিনিকাকে তপস্বীর শীলভঙ্গ করিবার জন্য বনে প্রেরণ করেন। বোধিসত্ত্ব পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আশ্রমে রাখিয়া বনে প্রবেশ করিলে নলিনিকা ঋষিকুমারের ছদ্মবেশে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। নলিনিকা দেখিল ঋষিকুমার আজন্ম বনবাসী ও নারীসঙ্গবর্জিত। এইজন্য নারী বলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঋষ্যশৃঙ্গ আখ্যায়িকা স্থান পাইয়াছে। মূল রামায়ণে তিনি বিভাণ্ডকের পুত্র। একদা অঙ্গরাজ লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। রাজা বারবণিতার সহায়তায় ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনায়ন করিলে সুবৃষ্টির আশিস্ ধারায় রাজ্য সিক্ত হইল। রাজা নিজের পালিত কন্যা শান্তাকে ঋষির হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহাকবির কাব্যে হরিণীগর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মকাহিনী স্থান পায় নাই। কৃত্তিবাস এইখানে বাল্মীকি অপেক্ষা জাতককারের প্রতি অধিক আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—নর্মদা নদীতীরে তপস্যারত বিভাণ্ডক মুনি আকাশমণ্ডলস্থিতা উর্বশীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইলেন। উর্বশীও দৈবশাপে হরিণীরূপিণী হইলেন। হরিণীরূপিণী উর্বশীর গর্ভে মুনির কুমার জন্মগ্রহণ করে। কুমারের দেহ মানবের কিন্তু কপালে হরিণের শৃঙ্গ। এইজন্য কুমারের নামকরণ হয় ঋষ্যশৃঙ্গ। ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী সামান্য রূপান্তরের মধ্য দিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে আসিলেও জাতকের মত কৃত্তিবাসের ঋষ্যশৃঙ্গও—

স্ত্রীপুরুষে ভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
স্বর্গের অমরাগণ মুনি মনে মানে ॥[১]

দুই আখ্যানেই ঋষ্যশৃঙ্গ নারীসংসর্গ বর্জিত, সরল, অনভিজ্ঞ ঋষিকুমার। নলিনিকা তাহাকে একটি ফলদ্বারা প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কৃত্তিবাসের নাগরিকগণও—

ফল বলে হাতে দিল গঙ্গাজলে নাড়ু।
জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু গাড়ু ॥[২]

উভয়ক্ষেত্রে বনচারী আশ্রম শিশু বাস্তবজীবনের তটরেখায় দাঁড়াইয়া জীবন-

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১৯১৬, পৃঃ ৫৫।
২। ঐ, পৃঃ ৫৬।

রসের প্রথম আস্বাদন অভিজ্ঞতা অতি সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে। তাহাদের বাস্তব জীবনরসের প্রথম আস্বাদন অভিজ্ঞতাও প্রায় একরূপ। নলিনিকা চলিয়া গেলে বোধিসত্ত্ব জাতকের ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রশ্ন করিয়াছে—

অভিন্নকট্‌ঠো সি অনাভতোদকো
অহাপিতগ্‌গী সি অসিদ্ধভোজনো
ন মে তুবং আলপেসী মম অজ্জ,
নট্‌ঠন নু কিং চেতসিকঞ্চি দুকখন তি।[১]

অর্থাৎ আজ ইন্ধন ছেদন হয় নাই, জল আনয়ন কর নাই, রন্ধনের জন্য অগ্নিও প্রজলিত নাই। আমার সঙ্গে বাক্যালাপও করিতেছ না। কিছু কি নষ্ট হইয়াছে? কেন আজ তুমি এত বিষণ্ন?

কৃত্তিবাসের ঋষ্যশৃঙ্গেরও প্রায় অনুরূপ অবস্থা—

পুত্রেরে দেখিয়া মুনি বিচলিত মন।
জিজ্ঞাসিল কেন বাপু করিছ ক্রন্দন॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে আগে খাও ফলজল।
আজিকার বিবরণ কহিব সকল॥[২]

নলিনিকা এবং লোমপাদ রাজ্যের বারবণিতাদের রূপবর্ণনায়ও কৃত্তিবাস জাতককারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন—

জাতকে—ইধাগমা জটিলো ব্রহ্মচারী
সুদস্‌সনেয্যো সুতনূ বিনেতি
ন এবাতিদীঘো ন পুনাতিরস্‌সো[৩]

অর্থাৎ জটাধারী, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, সুগঠিতকায় একজন ব্রহ্মচারী আসিয়াছিল।

কৃত্তিবাসে—

তুমি যেই গেলে পিতঃ তপস্যার তরে।
স্বর্গ হৈতে ঋষিগণ আইল মম ঘরে॥[৪]

জাতকে—

অমস্‌সু জাতো অপুরাণবন্নী,
আধাররূপঞ্চ পন অস্‌স কণ্ঠে,[৫]

সেই অজাতশ্মশ্রু ব্রহ্মচারীর কণ্ঠে বৃত্তাকার মহাআভরণ।

১। Fausboll, Jātaka, Vol. V, no. 526, gatha No 27
২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১৯১৬, পৃঃ ৫৭।
৩। Fausboll, Jātaka, op. cit. gāthā no, 28
৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।
৫। Fausboll, Jātaka, op. cit. gāthā no. 29

নলিনিকার কণ্ঠের মুক্তাহারেরও আজন্ম ব্রহ্মচারী ঋষিকুমার এইভাবে বর্ণনা দিয়াছে। কৃত্তিবাসের ঋষ্যশৃঙ্গও অনুরূপ ভাষায় বলিয়াছে—

কিজাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায়।
কিজাতি বৃক্ষের লতা সবাকার হাতে।
কতেক মাণিক গাঁথা আছে ত তাহাতে
পরম ব্রাহ্মণ কারো লোম নাই মুখে।
মন বিমোহিত মম সেই মুখ দেখে॥[১]

পুত্রের অবস্থা বিপর্যয় বুঝিতে পারিয়া বোধিসত্ত্ব বিমোহিনী যক্ষীর প্রলোভন হইতে পুত্রকে আত্মরক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, আর কৃত্তিবাসের বিভাণ্ডক এই বিমোহিনী নারীদের রাক্ষসী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বুদ্ধ অবতার রামানন্দ ঘোষ

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যখন প্রায় উন্মূলিত হইয়া আসিয়াছে বিলুপ্তির সেই কাল পরিবেশে 'রামলীলা' কাব্যের কবি রামানন্দ ঘোষ নিজেকে 'বুদ্ধ অবতার' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।[২] কোন্ বিশ্বাসের ভিত্তির উপর কবি নিজেকে বুদ্ধের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকরূপে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে মনে হয় কবি অদ্বৈতপন্থী জ্ঞানবাদী ছিলেন। সম্ভবতঃ এই জন্যই কবি বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী বলিয়া নিজের পরিচিতি দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধগণের আত্মপরিচয় জ্ঞাপনের অনুরূপ ভাষায় কবি আপন পরিচয় বিবৃত করিয়াছিলেন। সমগ্র বিশ্বচরাচরব্যাপী তিনি আপন অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন—

ঈশ্বরের গুণ দেখি আপন শরীরে। —রামলীলা, আদিকাণ্ড।

অন্যত্র—

আমি বুদ্ধ আমা অন্তে কল্কি অবতার।
জগৎব্যাপী আমি স্থির করিলাম মনে।
মোর অংশ ছাড়া নাই কীট পক্ষী তৃণে॥ —রামলীলা, আদিকাণ্ড।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

২। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানপ্রাপ্ত। রামানন্দও অদ্বয় জ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানী হইয়াছিলেন এবং নিজেকে 'বুদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ অনিত্যতত্ত্ব কবির ধর্মমতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মানবজীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

ভোজবিদ্যা প্রায় এই শরীর ধারণ।
নিমেষেতে জন্ম হয় নিমেষেতে পতন॥
সর্বপ্রাণী জানে এই নশ্বর শরীর।
দেখি শুনি ইহা কেবা হইয়াছি স্থির॥
... ...
এই যে শরীর দেখ জলবিম্ব প্রায়।
জলেতে উপজি বিম্ব জলেতে মিশায়॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ শরীর জড়িত।
ভব ভয়ে ত্রাণ হবে ভজ লক্ষাজিত॥ —রামলীলা, আদিকাণ্ড।

অন্যত্র—

ফাঁপরে পড়িয়া জীব দেখে অন্ধকার।
মাতাপিতা ভাই বন্ধু মনের বিকার॥ —রামলীলা, অরণ্যকাণ্ড।

কবি বুদ্ধ অবতাররূপে কালীমাতার কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন, আবার দারুব্রহ্মের সেবা করিয়াছেন, পঞ্চশক্তিরও উপাসনা করিয়াছেন। ইসলাম ও বৈষ্ণবদিগের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন। পুরীর জগন্নাথ বা দারুব্রহ্মকে যবন স্পর্শের অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করিবার সঙ্কল্পও কবি পোষণ করিতেন। কেবল মুসলমান বিরোধিতাই নহে, জগন্নাথ বিগ্রহের উপর বৈষ্ণবদিগের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠারও তিনি বিপক্ষে ছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে রামানন্দ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। মহাকালীর প্রতি তাঁহার একান্ত আনুগত্য তান্ত্রিকতার প্রভাবজাতও হইতে পারে। ১৬শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার কবিগণ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন—বুদ্ধ আবার অবতার গ্রহণ করিবেন। এই যুগচাহিদাদ্বারা রামানন্দ প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নহে। উড়িষ্যার ইতিহাস পাঠে জানা যায় রাজা প্রতাপরুদ্রের সভায় বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধদিগের প্রতিপত্তি খর্ব করিয়া নিজেদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন।[১] পরবর্তীকালে বুদ্ধ-অবতার কবি রামানন্দ দারুব্রহ্মের উপর বৈষ্ণব আধিপত্যকে সুনজরে দেখেন নাই। কিন্তু বুদ্ধ-অবতার কবি কেন শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনীকে উপজীব্য

১। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৯৫১, পৃঃ ২৯৭

করিয়া কাব্য রচনা করিলেন সেই প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। কবি জয়দেব 'কেশবধৃত বুদ্ধ শরীরং' বলিয়া বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে অনুধ্যানের পথ প্রদর্শন করেন। শ্রীরামচন্দ্রও বিষ্ণুর অন্যতম অবতার। সুতরাং বুদ্ধ-অবতার কবির পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনীকে উপজীব্য করিয়া কাব্য রচনায় বাধা কোথায়?

মহাভারত

মহাভারতের কাহিনী এবং কয়েকটি জাতককাহিনীকে পরস্পরের পরিপূরক-অনুপূরকরূপে আলোচনা করা যাইতে পারে। উভয়ক্ষেত্রে রূপ ও ভাবগত প্রভেদ মৌলিক ও দূরপ্রসারী হইলেও কাহিনীগত সাদৃশ্য একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

জাতকের অনুসারী যে কয়েকটি কাহিনী মহাভারতে স্থান পাইয়াছে মাণ্ডব্যমুনির কাহিনী তাহার মধ্যে অন্যতম। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত মাণ্ডব্যমুনির শূলারোহণ কাহিনীর সঙ্গে 'কণহ দীপায়ন'[১] জাতকের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। মাণ্ডব্যমুনি শৈশবে শিশুসুলভ চপলমতির বশবর্তী হইয়া কোবিদার বা আবলুশ শূলে একটি মক্ষিকাকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পূর্ব-জন্মকৃত পাপ। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে রাজপুরুষগণ নগরে চুরির অপরাধে ভুলক্রমে মাণ্ডব্যমুনিকে ধরিয়া শূলে চড়াইয়া দেয়। ইহা তাঁহার পূর্ব-জন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। মহাভারতে ও জাতকে বর্ণিত মাণ্ডব্যের এই শাস্তিভোগের কাহিনী প্রায় একরূপ। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তপস্বী দ্বৈপায়নের 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন' নামকরণের কারণ স্বতন্ত্র। শূলদণ্ডে দণ্ডিত মাণ্ডব্য তাঁহার দণ্ডদানকারীর প্রতি বিনা বিদ্বেষে প্রীতিসহগত চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার একান্ত বন্ধু তপস্বী দ্বৈপায়ন সেই পুণ্যাত্মার পবিত্র ছায়ায় উপবিষ্ট হইলে মাণ্ডব্যের দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত মোক্ষণ হইয়া দ্বৈপায়নের হৈমবর্ণ দেহে শুকাইয়া কালদাগে পরিণত হইতেছিল। এই কারণে দ্বৈপায়ন 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন' নামে জাতকে অভিহিত হইয়াছেন। মহাভারতে মাণ্ডব্য পূর্বজন্মের শৈশবের চঞ্চলমতির জন্য গুরুদণ্ড ভোগ করিয়া ধর্মকে অভিশাপ প্রদান করেন। ইহার ফলে ধর্ম শূদ্র যোনিপ্রাপ্ত হইয়া বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মাণ্ডব্য

১। Fausboll, Jātaka, Vol. IV, No. 444

এই বিধানও দিয়াছিলেন যে ১৪ বৎসরের অনধিক বয়সে কৃতকর্ম পাপপুণ্যের বিচারাধীন হইবে না। জাতককাহিনীতে দেহাভ্যন্তরে শলাকার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বিদ্ধ হওয়ার দরুন মাণ্ডব্য 'অনি মাণ্ডব্য' নামে এবং মহাভারতে 'মুনি মাণ্ডব্য,[১] নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন।

দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাহিনী বর্ণনায় কবি কাশীরাম দাস ব্যাসদেব অপেক্ষা জাতককারের অধিকতর অনুসরণ করিয়াছেন। 'কাষ্ঠহারিণী' জাতকে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত একদা উদ্যানবিহারে বহির্গত হইয়া এক কাষ্ঠ সংগ্রহ-কারিণী অনিন্দ্যসুন্দরী অরণ্যবাসিনীর দর্শন পাইয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই রাজা তাঁহার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন এবং গন্ধর্ববিধানে তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন সময় উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার স্বনামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয় নিদর্শনস্বরূপ প্রদান করেন। যথাসময়ে রমণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। পুত্রটি বড় হইলে জননী তাহার হস্তে রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি প্রদান করিয়া পুত্রসহ রাজসমীপে উপনীতা হইলেন এবং তাঁহার গর্ভজাত পুত্রকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা মাতাপুত্রকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু না চিনিবার ভান করিয়া তাহাদের প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবমানিতা রমণীটি সত্যক্রিয়াপূর্বক, পুত্রকে আকাশে নিক্ষেপ করিলেন। পুত্র বোধিসত্ত্ব আকাশমার্গে অবস্থান করিয়া রাজাকে পিতৃ সম্বোধনে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। রাজা ধর্মপত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। জাতকে, ব্যাসদেবের মহাভারতে এবং বাংলা মহাভারতে রাজা বনবাসিনী রমণীর রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে গন্ধর্ববিধানে বিবাহ করেন। মহাভারতের দুষ্মন্ত এবং জাতকের ব্রহ্মদত্ত উভয়েই স্মারক-চিহ্নস্বরূপ এক অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কাশীদাসী মহাভারতে অঙ্গুরীয়ক প্রদান বৃত্তান্ত স্থান পায় নাই।[২] সংস্কৃত মহাভারতে রাজাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অরণ্যপ্রদেশে শকুন্তলা ভরতের জন্মদান করেন। কিন্তু জাতকে ও বাংলা মহাভারতে পুত্র জন্মগ্রহণের পর মাতাপুত্র রাজসন্দর্শনে আগমন করিয়াছেন এবং আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছেন। সংস্কৃত মহাভারতে দুষ্মন্ত দুর্বাসার অভিশাপে শকুন্তলাকে চিনিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করেন। কাষ্ঠহারিণী

১। কাশীদাসী মহাভারত, আদিপর্ব, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১৯৫২, পৃঃ ৮৪

২। দ্রঃ কাশীদাসী মহাভারত, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

জাতকে ব্রহ্মদত্ত নিজের অজ্ঞাতসারে লোকলজ্জার ভয়ে ধর্মপত্নী ও আপন পুত্রকে অস্বীকার করেন। বাংলা মহাভারতেও দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, আবার লোকলজ্জার ভয়ে গ্রহণ করিতেও সাহস করেন নাই। আকাশমার্গে দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

আমি হ জানি যে ইহা নহি বিস্মরণ।

... ...

হইত আমার নিন্দা সহসা গ্রহণে ॥[১]

জাতকে আকাশমার্গস্থিত বোধিসত্ত্বের কণ্ঠে সত্যবাণী নিঃসৃত হইয়াছে। বাংলা-মহাভারতেও আকাশবাণী শ্রুত হইয়াছে।

শিবি রাজার অমরকাহিনী ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় ঐতিহ্য সাঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। মহাভারতের বনপর্বে এবং অনুশাসন পর্বে শিবিরাজার আত্মমাংস দানের আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। জাতকে দানপারমিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য মহারাজা শিবি তাঁহার চক্ষু দুইটিও দান করিয়াছেন। শিবি দশবিধ রাজধর্ম প্রতিপালন করিয়া রাজ্যের মধ্যে ছয়টি দানশালা নির্মাণ করেন এবং সর্বমানবের জন্য মহাদান অনুষ্ঠান করেন। এইভাবে শিবিরাজ লোকসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এমন কোন বাহ্যবস্তু নাই যাহা শিবির দানশালা হইতে বিতরিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার দানের পরিধি এইখানেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহে নাই। জাতককার শিবিকে আধ্যাত্মিক দান-চিন্তায় নিমগ্ন করিয়াছেন। এই আধ্যাত্মিক দানচিন্তার মধ্যে মহাভারতের কাহিনীর বীজ পাওয়া যায়। জাতকে শিবি চিন্তা করিতেছেন—যদি কেহ হৃদয়-মাংস-প্রার্থী হয় তাহাকে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া হৃৎপিণ্ড দান করিব, যদি কেহ দেহমাংস চাহে তাহাকে নিজ শরীরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া দান করিব, যদি কেহ চক্ষুপ্রার্থী হয় তাহাকে চক্ষু উৎপাটন করিয়া দিব। ইহার পর অন্ধ ব্রাহ্মণরূপী শক্রকে শিবিরাজা নিজের চক্ষুদ্বয় দান করিলেন। বৌদ্ধ কাহিনীর ব্রাহ্মণবেশীকে চক্ষুদান মহাভারতে শ্যেনরূপী ইন্দ্রকে আত্মমাংসদানে পর্যবসিত হইয়াছে। একটি দানপারমিতার পরাকাষ্ঠা অন্যটি আশ্রিতের প্রতি চরম অনুকম্পার নিদর্শন।

১। কাশীদাসী মহাভারত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

'সুধাভোজন' জাতকে[১] আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হ্রী, নাম্নী শক্রের চারি কন্যা আপন আপন শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রার্থিনী হইয়া কৌশিককে মধ্যস্থতা মানিয়াছে। মহাভারতেও শ্রীবৎস রাজার নিকট শনি ও লক্ষ্মী নিজেদের স্বীকৃতি আদায় করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীবৎস রাজার নিকট প্রাধান্য-বঞ্চিত শনি রাজার চিরশত্রুতে পরিণত হইয়া তাঁহাকে নানা দুঃখ ও বিপদের মধ্যে ফেলিয়াছেন, কিন্তু কৌশিককে অনুরূপ দুর্যোগের সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

'কুনাল জাতকে'[২] কৃষ্ণার অধ্যায়িকা স্থান পাইয়াছে। এইখানে পঞ্চভর্তৃকা কৃষ্ণা ষষ্ঠপুরুষে আসক্তারূপে বর্ণিতা হইয়াছেন। স্বয়ংবর সভায় পাণ্ডুপুত্রগণকে তিনি পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণা এই পুত্রগণের সঙ্গে সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠব্যক্তি এক কুব্জ পরিচারকের প্রতিও তিনি আসক্তা হইয়াছিলেন। অর্জুন কৃষ্ণার এই কামাতিশয়ের পরিচয় পাইয়া কৃষ্ণার উপর বীতরাগ হইয়াছিলেন। মহাভারতে পঞ্চভর্তৃকা কৃষ্ণা কর্ণের প্রতি আপন আসক্তি বিবৃত করিয়াছে।—

এই জন হৈত যদি কুন্তীর নন্দন।
ইহার সহিত পতি হৈত ছয় জন॥[৩]

জাতকের কুব্জ মহাভারতে ষষ্ঠপুরুষ কর্ণে পরিণত হইয়াছেন। একই নারীচরিত্রকে জাতককার এবং মহাভারতকার বিভিন্নরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। জাতককারের কৃষ্ণাচরিত্রে কেবল অপরিহার্য রুচিবিকারের নিদর্শনই ফুটিয়া উঠে নাই মহত্তম আদর্শের বিনষ্টি এবং নিষ্ঠাহীনতাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাতকে কৃষ্ণার কামোন্মাদনা বর্ণনায় জাতককারের ভাবের দীনতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাভারতে এই কৃষ্ণাচরিত্রই সুকঠিন পাতিব্রত্যের ঔজ্জ্বল্যে, প্রখর ব্যক্তিত্বে এবং সেবাস্নিগ্ধ দাম্পত্যপ্রীতিতে তাঁহাকে 'নারী চন্দ্রমা'রূপে সকল প্রকার নৈতিক দুর্বলতা ও মালিন্যের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। বাংলা মহাভারতেও তিনি সর্বত্র দৃঢ় আত্মসম্মানবোধে অনমনীয়া, শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণা, স্বপ্রকাশমানতার মহিমায় ভাস্বর অসীম বীর্যবতী রমণী—

১। Fausboll, Jātaka, Vol. V, No 585.

২। Jātaka, No. 586

৩। কাশীদাসী মহাভারত, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃঃ ৫০৯।

সার্থক মহাকাব্যিক নায়িকা। প্রতিহিংসায় এবং ঔদার্যে তিনি অতুলনীয়া। জাতকে প্রায় সর্বত্রই নারী মুক্তিলাভের অন্তরায়, নির্বাণের প্রতিবন্ধক, সাধারণ ভোগ্যা, অকৃতজ্ঞ এবং কামপ্রবণারূপে আখ্যাত হইয়াছে। মহাভারতেও নারীচরিত্রের এই অপকর্ষের দিক আলোচিত হইয়াছে। মহাকবি ব্যাসদেব অকৃতদার ভীষ্মকে দিয়া নারীচরিত্রের এই দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। জাতকের কোন কোন গাথার সঙ্গে মহাভারতের এই অধ্যায়ের শ্লোক বিশেষের প্রায় আক্ষরিক মিল পাওয়া যায়।

কবি কাশীরাম দাসের পুত্র দ্বৈপায়ন দাসের আশ্চর্যপর্বে মাতৃগর্ভে অবস্থানকারী শিশু পিতাকে বলিয়াছে—

না বুঝিয়া বাক্য তুমি বলহ অজ্ঞানে।
কেবা কার পিতাপুত্র কে কার সন্তান॥
মায়াতে মোহিত হয়্যা আপনা না জানে।
মোর মাতা মোর পিতা বলয়ে অজ্ঞানে॥[১]

এই উক্তির মধ্য দিয়া বৌদ্ধদর্শনের অনিত্যতত্ত্ব উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে।

ভাগবত

বাংলা ভাগবত সংস্কৃত পুরাণাদি অবলম্বনে রচিত। বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই সংস্কৃত পুরাণসমূহের আবির্ভাব। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে হিন্দুধর্ম, বর্ণাশ্রম ও সংস্কার বিচূর্ণ হইয়া গেলেও বৌদ্ধধর্মের বিশুদ্ধিও বজায় রহিল না, ভগবান তথাগতের ধর্ম অতিক্রুত অবনতির পিচ্ছিল পথ বাহিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল। সেই সময়ে নির্জিত হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ে পুনরুজ্জীবিত হইবার চেষ্টা করে। প্রধানতঃ হিন্দুর চিরাচরিত সমাজব্যবস্থা ও বর্ণাশ্রম সংস্কারকে পূর্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ধর্ম, নীতি ও ইতিহাসের সহিত কিংবদন্তীর খাদ মিশাইয়া এক প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি হয়, যাহা প্রধানতঃ ধর্মীয় ও সামাজিক পুনর্গঠনেই নিয়োজিত হইয়াছিল।'[২] সুতরাং পুরাণের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ী হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। বাংলা ভাগবত অনুবাদের মধ্যেও সেই ভাবধারা উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে।

১। বাংলা সাহিত্য, মণীন্দ্রমোহন বসু, ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায় পৃঃ ৯৯—১০০ হইতে উদ্ধৃত।
২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৩, পৃঃ ৫১৫—১৬।

জাতক গ্রন্থের অন্তর্গত 'ঘটজাতক'[১] এবং ভাগবতের কাহিনী একই আখ্যানধারাকে অনুবর্তন করিয়াছে। স্বর্গত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মন্তব্য করিয়াছেন—'ঘটজাতকও এক হিসাবে সংক্ষিপ্ত ভাগবত।'[২] ঘটজাতকে যাহা বীজাকারে সুপ্ত ভাগবতের কবির বিরাট ভাবাদর্শে ও রচনানৈপুণ্যে তাহা সর্বাত্মক রূপাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। যাহা জাতকে অপরিণত অসম্পূর্ণ ও অসংহত, ভাগবতের দৈব পটভূমিতে আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যে এবং রূপগত সংহতিতে তাহাই সামগ্রিক রূপ লাভ করিয়াছে।

জাতকের কাহিনীটি নিম্নরূপ—

ঘটজাতকের কাহিনী ও ভাগবত

"অতীতে উত্তরাপথে কংসভোগরাজ্যে মহাকংস নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কংস ও উপকংস নামে দুই পুত্র এবং দেবগর্ভা নামে এক কন্যা ছিল। দেবগর্ভার জন্মদিবসে দৈবজ্ঞগণ ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন—এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র কংসবংশ ধ্বংস করিবে। মহাকংসের মৃত্যুর পর কংস রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন এবং উপকংস উপরাজ হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় ভগিনীস্নেহের বশবর্তী হইয়া স্থির করিলেন—দেবগর্ভাকে হত্যা করিলে তাহা লোকলজ্জার কারণ হইবে, তাহাকে চিরকুমারী রাখিবেন। অতপর দেবগর্ভা একস্তম্ভযুক্ত এক প্রাসাদে বন্দিনীজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। নন্দগোপা ছিল তাহার পরিচারিকা এবং নন্দগোপার স্বামী অন্ধকবিষ্ণু ছিল সেই প্রাসাদের প্রহরী। কিন্তু নিয়তির বিধান অলঙ্ঘ্য। একদা উপকংসের সুহৃদ উপসাগর ও দেবগর্ভা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় উপসাগরের সঙ্গে দেবগর্ভার বিবাহ দিলেন এবং স্থির করিলেন যদি দেবগর্ভার পুত্র সন্তান জন্মে তবে তাহাকে অবশ্যই হত্যা করিতে হইবে। দেবগর্ভা প্রথমে দশটি কন্যা এবং পরে দশটি পুত্রের জন্মদান করেন। পুত্রগণের জন্মদিবসে তাঁহার দাসী নন্দগোপাও এক একটি কন্যা প্রসব করে। দেবগর্ভা ভ্রাতাদিগের ভয়ে নিজের পুত্রদিগকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে নন্দগোপার গৃহে প্রেরণ করিতেন এবং নন্দগোপার নবজাত কন্যারূপে পরিচয় প্রদান করিতেন। কংস ও উপকংস ভগিনীর কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করার সংবাদে নিশ্চিন্ত রহিলেন। এইভাবে দেবগর্ভার পুত্রগণ নন্দগোপার নিকট এবং নন্দগোপার কন্যাগণ দেবগর্ভার নিকট

১। Fausboll, Jātaka, Vol. IV, No. 554.
২। জাতক মঞ্জরী, প্রাগুক্ত, উপক্রমণিকা, পৃঃ ৮.

পালিত হইতে লাগিল। দেবগর্ভার দশপুত্র বাসুদেব, বলদেব, চন্দ্রদেব, সূর্যদেব, অগ্নিদেব, বরুণদেব, অর্জুন, প্রদ্যুম্ন, ঘটপণ্ডিত এবং অঙ্কুর। এই দশভ্রাতা অন্ধক-বিষ্ণুর পুত্ররূপে পরিচিত হইয়া ক্রমশ বীর্যবান্, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিলেন। রাজা কংস তাহাদেরই দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন এই দশভ্রাতা দেবগর্ভারই সন্তান, অন্ধকবিষ্ণুর নহে। এইবার তাঁহারা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া উঠিলেন এবং বালকদিগকে হত্যা করিবার জন্য মল্লযুদ্ধের আয়োজন করিলেন। কিন্তু বলদেবের বীরত্বে ও সাহসে রাজ্যের বিখ্যাত মল্লবিদ্ চাণূর ও মুষ্টিক নিহত হইল। বলদেব চক্রনিক্ষেপ করিয়া কংস ও উপকংসকেও হত্যা করিলেন। সমবেত জনগণ বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করিল।

বাসুদেব প্রভৃতি দশভ্রাতা নানাদেশ জয় করিয়া দ্বারাবতী জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। দ্বারাবতীর একদিকে সমুদ্র, একদিকে পর্বত, এক যক্ষ তাহার রক্ষক। দশভ্রাতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কৃপায় যক্ষকে বশীভূত করিয়া দ্বারাবতী জয় করিলেন। দ্বারাবতী তাঁহাদের রাজধানীতে পরিণত হইল। এইভাবে সমগ্র জম্বুদ্বীপ তাঁহাদের আয়ত্তে আসিল।

ক্রমশঃ দশভ্রাতার বংশবৃদ্ধি হইয়া চলিল। একদা তাঁহাদের উন্মার্গগামী-পুত্রগণ ভাবিলেন—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিব্যচক্ষুসম্পন্ন কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তাঁহারা একজন রাজকুমারকে গর্ভবতী নারীর ন্যায় সজ্জিত করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে প্রশ্ন করিলেন—'তপস্বী বলুন তো এই নারী পুত্র অথবা কন্যা প্রসব করিবে'? তপস্বী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বালখিল্য রাজকুমারদিগের বাচালতায় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন—'অদ্য হইতে সপ্তাহ দিবস অন্তে এই নারী একটি মুষল প্রসব করিবে, তাহা হইতে বাসুদেব বংশ নির্মূলিত হইবে।' রাজকুমারগণ তখন পরিহাস করিয়া বলিলেন—'ওহে ভণ্ড তপস্বী এ পুরুষ, নারী নহে।' তাঁহারা তপস্বীর অভিশাপে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়নের গলায় ফাঁস পরাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন। বাসুদেব কুমারদিগের এই অপকর্মের বিষয় জানিতে পারিয়া বুঝিলেন বাসুদেববংশ ধ্বংসের সময় আগতপ্রায়। তিনি নারীবেশধারী এই বালকটিকে পাহারা দিয়া রাখিলেন। সপ্তমদিবসে তাহার কুক্ষিদেশ হইতে একখণ্ড খদিরকাষ্ঠ বহির্গত হইল। রাজা তাহা দগ্ধ করিয়া ভস্মরাশি নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন। কালক্রমে সেই ভস্ম হইতে নদীতটে গুচ্ছ গুচ্ছ এরক তৃণের উৎপত্তি হইল।

অবশেষে চরম ক্ষণ আগত হইল। রাজকুমারগণ বিলাসভোগে প্রমত্ত হইয়া জলক্রীড়ার অভিপ্রায়ে নদীতীরে সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া পানভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। পানভোজনে উন্মত্ত কুমারগণ সহসা মহাকোলাহল করিতে করিতে দুইদলে বিভক্ত হইয়া কলহ এবং পরে মারামারি শুরু করিলেন। একজন রাজকুমার হঠাৎ নদীতীর হইতে একটি এরক তৃণ আহরণ করিয়া অন্যদের মারিতে লাগিলেন। এরক রাজপুত্রের হস্তে মুষলে পরিণত হইল। তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য রাজকুমারগণও পরস্পর মারামারি করিয়া আত্মকুল ধ্বংসে রত হইলেন। এইভাবে বাসুদেব বংশ পরম শোচনীয় পরিণতি লাভ করিল। মল্লবীর মুষ্টিক পরজন্মে যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে। বলদেব তাহার হাতে প্রাণ হারাইলেন। এইবার বাসুদেবের পালা। একদা বাসুদেব এক গুল্মের অন্তরালে শায়িত ছিলেন। জরা নামে এক ব্যাধ গুল্মের অন্তরালে বন্যপশু নড়িতেছে মনে করিয়া তীর নিক্ষেপ করে। তীর বাসুদেবের পদে বিদ্ধ হইল। ব্যাধ জরাকর্তৃক তীরবিদ্ধ হইলেই তাঁহার মৃত্যু অবধারিত ছিল। বাসুদেব অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরিবংশ ও মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, মল্লযুদ্ধ, কংসবধ এবং যদুবংশ ধ্বংসের যে সমস্ত কাহিনী সুগ্রথিত হইয়াছে ঘটজাতক তাহার নীহারিকামাত্র। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে কৃষ্ণের চরিত্র এবং কর্মকৃতির যে ব্যাপক ও বিস্তৃত বর্ণনা উপস্থাপিত হইয়াছে জাতককার অতি সংক্ষেপে তাহার দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বাসুদেব এবং বলদেব দুই জননীর সন্তান, জাতকে তাঁহারা সহোদর। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বলদেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বাসুদেব কনিষ্ঠ। জাতকে বাসুদেবই জ্যেষ্ঠ, বলদেব কনিষ্ঠ। ভাগবতে নন্দগোপ এবং তাঁহার স্ত্রী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতামাতা, জাতকে নন্দগোপা এবং স্বামী অন্ধকবিষ্ণু বাসুদেব প্রভৃতি দশভ্রাতার প্রতিপালক। ভাগবতে দৈবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তানই কংসনিধনকারী শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব। জাতকে কংসনিধনকারী দেবগর্ভার দ্বিতীয় গর্ভের সন্তান। ভাগবতে কৃষ্ণ নরনারায়ণ-শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণুর পূর্ণ অবতার। জাতকে বাসুদেবের উপর দেবত্ব আরোপিত হয় নাই। তবে তাঁহার জননী—দেবগর্ভা অর্থাৎ দেবতার জন্মদাত্রী। কৃষ্ণচরিত গ্রন্থসমূহে কংস অত্যন্ত দুরাচারী, জাতকে তাঁহার চরিত্রের সেই দিক প্রদর্শিত হয় নাই। এইখানে তিনি ন্যায়পরায়ণ রাজা, স্নেহশীল ভ্রাতা।

ঘটজাতকের বাসুদেব এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরিবংশ ও মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। জাতকের বাসুদেবই ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের কৃষ্ণ, তিনিই কেশব। কংস-কারাগারেই দুই মহান্ নায়কের জন্ম। কৃষ্ণচরিত গ্রন্থে কৃষ্ণ কংসের নিয়োজিত দুই মল্লবীরের—চানূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া তাহাদের নিধনকারী 'চানূরসূদন'-রূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়কাব্যেও ইহার স্বীকৃতি আছে।[১]

জাতকে চানূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিবার পূর্বে দশভ্রাতা রজকপল্লী লুণ্ঠন করিয়া রঞ্জিত বস্ত্রে এবং গন্ধবণিক ও মালাকারদিগের দোকান লুণ্ঠন করিয়া মাল্যগন্ধানুলিপ্ত ও সুশোভিত হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়কাব্যেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়—

মথুরা প্রেবেসে হরি রজক মারিল।
মালাকারে বর দিয়া কুব্জ সর্জ্জ কৈল॥[২]

জাতকের আকাশনগরী দ্বারাবতী এবং মহাভারতের শাম্বনামক দৈত্যের রাজধানী সৌভ নগর[৩] প্রায় অনুরূপ। বাসুদেব দ্বারাবতীর রাজাকে নিহত করিয়া এই রাজ্য হস্তগত করেন। শ্রীকৃষ্ণ শাম্বকে হত্যা করিয়া আকাশচর সৌভ নগর দখল করেন। যদুবংশ ধ্বংস কাহিনী এবং বাসুদেব বংশ ধ্বংস কাহিনীও প্রায় একরূপ। তবে জাতকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন ব্রাহ্মণ্য আখ্যায়িকায় বিশ্বামিত্র, ভৃগু, দুর্বাসা প্রভৃতি কালরূপী ঋষিগণ সেই ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ব্রহ্মশাপে জাম্ববতী-সুত শাম্ব লৌহ মুষল প্রসব করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে সাগরতীরে সেই মুষল ঘর্ষণ করিয়া জলে মিশ্রিত করা হইলে প্রভাস তীরে এরকা তৃণের উৎপত্তি হইয়াছে। অবশেষে প্রভাসের কূলে আত্মক্ষয়কারী যুদ্ধে যদুবংশ নির্মূল হইয়াছে। জাতকে বাসুদেবের মৃত্যু হইয়াছে ব্যাধ জরার শরাঘাতে। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও জরা ব্যাধের বাণাঘাতে শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসান ঘটিয়াছে।

লোহিত চরণযুগ মৃগজ্ঞানতায়।
বাণে বিদ্ধ করি ব্যাধ ধাইল ত্বরায়॥[৪]

১। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মালাধর বসু, পৃঃ ১৪।
২। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।
৩। শ্রীমদ্‌ভাগবত, সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দশম স্কন্ধ, দ্বিসপ্ততি ও ত্রিসপ্ততি অধ্যায়, পৃঃ ৮৩৭—৪২।
৪। ঐ, একাদশ স্কন্ধ, নবম অধ্যায়, পৃঃ ৯১২।

এইভাবে বাংলা ভাগবতের অনুবাদ শাখা জাতক কাহিনীর সঙ্গে বৈপরীত্য অপেক্ষা সামঞ্জস্যই অধিকতর বজায় রাখিয়াছে।

দশাবতার বন্দনায় মহাকবি জয়দেব ভগবান বুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন—

—'কেশবধৃত বুদ্ধ শরীরং'

ভাগবতে বাইশজন অবতারের বিষয় স্থান পাইয়াছে। এই বাইশজন অবতারের মধ্যে বুদ্ধও একজন—

একবিংসে বৈদ্ধরূপে জগতে মোহন।[১]

শ্রীমদ্ভাগবতে—

কলিযুগ সমাগত হইবে যখন।
পুনঃ অবতীর্ণ হবে হরি সনাতন॥
সুপবিত্র গয়াধাম পুণ্যময় স্থান।
বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হবে ভগবান॥[২]

বুদ্ধ অবতার কল্কীর পূর্ববর্তী। ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম অবতাররূপে বুদ্ধদেবের স্বীকৃতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের সজীব প্রাণবত্তা এবং সর্বাত্মক সমন্বয়বোধের পরিচায়ক।

উড়িষ্যাবাসী কবি অচ্যুতদাস নিজেকে বুদ্ধদেবের পঞ্চশক্তির অন্যতমরূপে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি 'শূন্যসংহিতা' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে কবি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন শত্রু দমনের জন্য ভগবান বুদ্ধ জন্মান্তর পরিগ্রহ করিবেন। সম্ভবতঃ কবি অচ্যুতদাস বৌদ্ধ ছিলেন অথবা উড়িষ্যার প্রবাস জীবনে বৌদ্ধ ধর্মদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যখন বেদবিদ্রোহী বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতাররূপে সর্বজনস্বীকৃতি অর্জন করিয়াছেন তখন বৌদ্ধ কবির পক্ষে বিষ্ণু অবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী রচনা করাও অসম্ভব ব্যাপার নহে।

বিবিধ অনুবাদ গ্রন্থ

কবি জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশীখণ্ড' গ্রন্থে 'লামা সন্ন্যাসীর' উল্লেখ রহিয়াছে—

১। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মালাধর বসু, পৃঃ ১১।
২। শ্রীমদ্ভাগবত, প্রাগুক্ত, প্রথম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৮।

লামা সন্ন্যাসীর কত শত মঠ।
বাহে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃস্পট।[1]

এই বর্ণনার মধ্য দিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমাজ-জীবনের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারত সর্বাত্মক বাঙালী জীবনের নির্বিশেষ প্রতীক। এইজন্য এই গ্রন্থদ্বয়ের আবেদন শ্রেণী-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সীমাকে অতিক্রম করিয়া সর্বাভিমুখী হইয়াছে। হিন্দু কবিগণ যেমন এই গ্রন্থ রচনায় রত হইয়াছেন, মুসলমান শাসকও তেমনি তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। আবার বৌদ্ধ জনগণও ইহাদের মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

১। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৯৫১, পৃঃ ৩৬৯ হইতে উদ্ধৃত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শাক্ত গীতি ও লোকসঙ্গীত

সপ্তদশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের চরম অবক্ষয়ের যুগ। বৌদ্ধ তথ্য ও তত্ত্বের ঐতিহ্যহীনতা এই যুগের সৃষ্টিতে অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের নিয়তি

বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের ধারা আদিযুগে বৌদ্ধ প্রসঙ্গকে বরণ করিয়া জয়যাত্রা শুরু করিয়াছিল, মধ্যযুগে হিন্দু-বৌদ্ধ মিলিত ভাবাদর্শের নবায়নে ব্যস্ত ছিল আর এই সময়ে বাংলা সাহিত্য ভবিষ্যতের স্বভাবচিহ্নকে অঙ্গীকার করিয়া একাধারে অতীতের রোমন্থন এবং অনাগত পথযাত্রার প্রস্তুতি সূচনা করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলামের ভাবাদর্শের ত্রিবেণী সংযোগ পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছে। এই যুগের সাহিত্যে বৌদ্ধ আদর্শ ক্রমশ অবক্ষয়ের পথ গ্রহণ করিয়াছে এবং হিন্দু ও ইসলাম চিন্তাধারার সম্মিলিত মহৎ বলিষ্ঠ আদর্শের সম্ভাবনাকে প্রস্ফুট করিয়াছে। একদিকে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বিনষ্টি অন্যদিকে ইসলাম প্রভাবের ক্রম-সম্প্রসারণ কোনটাই আকস্মিক ঘটনা নহে। তুর্কী আক্রমণ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিপর্যয় প্রসঙ্গে এই চরম নিয়তির সূচনা করা হইয়াছে। এই বিপর্যয়ের পথে ইসলাম সংস্কৃতি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছে, বাঙালী কবি ও লেখকদের প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালীর সৃষ্টিকর্ম অগ্রসর হইয়াছে, অবশেষে হিন্দুশিক্ষা-সংস্কৃতিকে অঙ্গীকার করিয়া এক সমন্বিত ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে বৌদ্ধ ঐতিহ্য যেমন নিঃশেষিত হইয়াছে তেমনই বাংলা সাহিত্য ইতিহাসও নবায়িত ইসলামী ঐতিহ্যকে গ্রহণ করিয়া যুগান্তরের পথে পদার্পণ করিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে বাংলাদেশে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সময়ে বাংলা সাহিত্য বাদশাহী রুচি ও চারিত্রিক আদর্শই কেবল বরণ করিয়া লয় নাই, প্রাচীন ঐতিহ্যকে একেবারে অবহেলা করিয়া কাঞ্চন কৌলিন্য এবং 'যাবনী মিশাল' সংস্কৃতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বাংলা সাহিত্য বিষয় ও শব্দসম্ভারের জন্য একদিন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষার উপর নির্ভর ছিল এইবার আরবী ফারসীর প্রভাবও দেখা দিল। বাংলা সাহিত্যের দৃঢ়পিনদ্ধ সর্বাবয়ব সম্পূর্ণতার স্থলে রাজসভার বিলাসব্যসন ও সৌন্দর্য চাকচিক্য প্রাধান্য পাইল। মধ্যযুগের দেববাদ নির্ভর মানবিকতা দেববাদ বিনির্মুক্ত মানবিকতায় পর্যবসিত হইল। ইহাই এই যুগসন্ধিক্ষণের ফলশ্রুতি।

চট্টগ্রাম ও রোসাঙ রাজসভা—মোগল অধিকারে বৃহত্তর বাংলার জনজীবন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে চট্টগ্রাম রোসাঙের সংযোগ ছিল না। এই অঞ্চল তখন আরাকান রাজের অধীনে ছিল। চট্টগ্রাম রোসাঙের সঙ্গে আরাকানের ভাষা-সাহিত্য আচার-আচরণের পারস্পরিক মিল ছিল। আরাকানের রোসাঙ রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন।[১] তাঁহাদের আনুকূল্যে ও সহযোগিতায় রোসাঙ রাজসভায় বর্মী ও বাঙালী সংস্কৃতির সুসম সমন্বয় ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধরাজগণ ধর্মসূত্রে পালিপ্রাকৃত ভাষা ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন আবার অন্য দিকে তাঁহাদের প্রজাসাধারণ ও সভাসদগণ মুসলমান ছিলেন। ফলে প্রজাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য রাজাগণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া একটি মুসলমানী নাম গ্রহণ করিতেন।[২] এই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজাগণ বাংলা সাহিত্যের ও ভাষার একান্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম সংস্কৃতির সমন্বয়ে রোসাঙ রাজসভায় এক নূতন চেতনার ধারা অবারিত হইয়াছিল। রাজসভার আনুকূল্যে রচিত বাঙালীর সাহিত্য কর্মে সেই চেতনার পরিচয় রহিয়াছে। আরাকানের বৌদ্ধ মগ রাজা আসরফ শা এই প্রচেষ্টার প্রথম পথিকৃত। তিনিই দৌলৎ কাজিকে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করিতে নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দী—
রোসাঙ রাজসভা

ঠেঠা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে
না বুঝে গোহারি ভাষা কোনো কোনো জনে॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে॥[৩]

এই নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে সে দিন বৌদ্ধ রাজা যে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিলেন তাহার ফলে বাংলা সাহিত্য রোসাঙ রাজসভাকে আশ্রয় করিয়া আর এক পদক্ষেপ অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য দৌলৎ কাজী ও আলাউলের মত যুগোত্তীর্ণ কবিকে লাভ করিয়া সজীব প্রাণবত্তার পরিচয় দিয়াছে। তবে তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে হিন্দু-বৌদ্ধ প্রাচীন ঐতিহ্যের

১। সাহিত্য প্রকাশিকা, ১ম খণ্ড, প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃঃ ৪—৬।
২। J. A. S. B., XIII, 1844, p. 28—52
৩। সাহিত্য প্রকাশিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

এমন কি চৈতন্যচেতনারও প্রত্যক্ষ প্রভাব সাযুজ্যের নিদর্শন নাই। ইহার প্রেরণার মূলে বৌদ্ধ রাজগণ হইলেও মুসলমানী সাহিত্যের দেববাদ বিনির্মুক্ত বিশুদ্ধ মানবতার জয়গানে তাহা মুখরিত।

বিবিধ সাহিত্য

বৌদ্ধরঞ্জিকা

'বৌদ্ধরঞ্জিকা' বাংলাভাষায় রচিত গৌতমবুদ্ধের প্রথম জীবনীগ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় রচিত থাড়ুথাঙ গ্রন্থের অনুবাদ। থাড়ুথাঙ গ্রন্থে শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধের অভিসন্ধি, অভিনিষ্ক্রমণ, বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি, ধর্মপ্রচার এবং পরিশেষে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তি পর্যন্ত সমগ্র জীবন-আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থটির সঠিক রচনাকাল নির্ণয় হয় নাই। নীলকমল দাস নামক কবি গ্রন্থটির অনুবাদক। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ধর্মবক্সের প্রধানা মহিষী কালিন্দীর প্রেরণায় কবি এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।[১]

বৃহৎ সারাবলী

'বৃহৎ সারাবলী' গ্রন্থের প্রণেতা রাধামাধব ঘোষ। গ্রন্থটি পাঁচখণ্ডে বিভক্ত। কৃষ্ণ, রাম, জগন্নাথ, চৈতন্য ও বুদ্ধ—ইঁহাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া এই বিপুল সারাবলী গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থটির প্রথম তিন খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে, শেষ দুইখণ্ড—চৈতন্যলীলা ও বুদ্ধলীলা মুদ্রিত হয় নাই।[২]

শাক্ত পদাবলী

বৌদ্ধধর্মে শক্তিবাদ

অর্বাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে ও ধর্মে শক্তিসাধনার বিশেষ স্থান ছিল। সুদূর অতীতে মহাপজাপতী গোতমী এবং আনন্দের প্রচেষ্টায় ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহার পরিণতিতে বৌদ্ধ সঙ্ঘেও নারীর প্রভাব সম্প্রসারিত হইয়াছিল। পরবর্তীযুগে বৌদ্ধ তন্ত্রের বহুল প্রচারের ফলে বিবিধ নারী-দেবতার পূজা প্রচলিত হয়। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের শক্তিরূপে তারা, লোচনা, মামকি, পাণ্ডারা, এবং আর্যতারা প্রাধান্য অর্জন করেন। এছাড়া, একজটা, পর্ণশবরী, বসুধারা প্রভৃতি বহু নারীদেবতাও বৌদ্ধ দেবায়তনে প্রবেশ লাভ

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন, ১৩৫৬, পৃ. ৩৮৫।
২। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পঃ ৫৭৭।

করেন। সাধনমালা, নিষ্পন্নযোগাবলী প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থে তাঁহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সহজযানী বৌদ্ধগণ দেবদেবীপূজা অপেক্ষা দার্শনিক তত্ত্ব এবং যোগ সাধনার উপর অধিকতর প্রাধান্য দান করিলেও তাঁহাদের রচনায় শক্তিসাধনার মহিমা স্বীকৃতি পাইয়াছে। সহজযানীদের শূন্যতা ও করুণার পুরুষ ও প্রকৃতির অদ্বয়মিলন ও মহাসুখানুভূতি এবং দেহাভ্যন্তরে নাড়ী ও চক্রের পরিকল্পনা বাংলা দেশের শাক্তকবিদের প্রভাবিত করিয়াছে। সহজযানী কবিদের ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী শাক্তকবিদের কুণ্ডলিনী শক্তির অনুরূপা। আবার বৌদ্ধদের সহজানন্দ বা মহাসুখানুভূতি এবং শাক্ত সাধকের পরমানন্দ প্রায় সমপর্যায়ের।

বাঙালী সাধকের ধ্যানধারণা ও আত্মলীন অনুভূতির ব্যঞ্জনা কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বৌদ্ধ সাধকদের সাধন-সঙ্গীত চর্যাপদেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যাহা সাধকের একান্ত অনুধ্যানের এবং প্রাণের অন্তর্নিহিত ভাবের দ্যোতক বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ তাহাকে বাণীমূর্তি দিয়াছেন। আপন সাধনলব্ধ তত্ত্বকে অপরের আনন্দ বিধানের জন্য সংরক্ষণ, যাহা অবাঙ্‌মনসোগোচর তাহাকে ভাষায় বাণীমূর্তি দান বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদে তাহার সূচনা এবং বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী তথা বাউলের একতারার সুরঝঙ্কারে সেই ধারার ক্রমবিস্তার। সুতরাং শাক্তপদাবলী চর্যাপদেরই এক উন্নততর স্রোতধারা যাহাকে বলা চলে সাধকগীতিধারা। চর্যাপদ বিশুদ্ধ সাধনসঙ্গীত কিন্তু শাক্ত পদাবলী বিশুদ্ধ সাধনসঙ্গীত ও লীলাসঙ্গীত দুই-ই। চর্যাপদের সঙ্গে শাক্ত পদাবলীর অন্যান্য সাধর্ম্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। চর্যাকারগণ অনির্বাচ্যকে বাণীরূপ প্রদান করিতে গিয়া সমসাময়িক সমাজজীবন হইতে নানা চিত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন, শাক্ত কবিগণও পরিচিত জীবনের প্রচ্ছদপট হইতে বিচিত্র চিত্র—পাশাখেলা, সতরঞ্চ খেলা, নৌকাবাওয়া, কলুর ঘানি, রজকের বস্ত্র ধৌতকরণ, ঘুড়ি উড়ানো প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। চর্যাপদের সান্ধ্যভাষা, রূপকপ্রিয়তা এবং প্রতীক দ্যোতনা শাক্ত পদাবলীর কবিদিগকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। চর্যাকারগণ অবাঙ্‌মনসোগোচরকে গোচরীভূত করিতে গিয়া যে পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইতেছে—

চর্যাপদ ও শাক্তপদাবলী

কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা।

এই বিশিষ্ট বাগভঙ্গী উত্তরাধিকারসূত্রে শাক্ত পদাবলীর কবিও লাভ করিয়াছেন—

চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি
বুঝে লও সব ঠারে ঠোরে।

যিনি অনির্বচনীয় তাঁহাকে কালা যেমন বুঝায় বোবাকে সেইভাবে ঠারে ঠোরে ব্যাখ্যা করার প্রথা বাঙালী সাধকের সূক্ষ্ম উপলব্ধির পরিচয়বাহী। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত শাক্তসাধন সঙ্গীতের উপর চর্যাপদে ব্যবহৃত রূপক-সমূহের এই প্রভাব ও ভাবসাযুজ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।[১]

চর্যাপদে ব্যবহৃত দাবাখেলার রূপক রামপ্রসাদের পদেও স্থান পাইয়াছে। সূর্যচন্দ্র ও বীণাযন্ত্রের রূপক শাক্তপদেও পাওয়া যায়। চর্যাপদের শুঁড়ীর ভাটি রামপ্রসাদের গানে জ্ঞান শুঁড়ীর ভাটি। নৌকা বাহিবার উপমাও উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল রূপগত সাদৃশ্যই নহে, বৌদ্ধ দোহা ও চর্যাপদের সঙ্গে শাক্তপদের ভাবগত সাধর্ম্যও বজায় রহিয়াছে। তীর্থবিরূপতা, পূজামন্ত্র অর্চনার প্রতি অনাসক্তি যাহা সিদ্ধাচার্যদের দোহা ও গানে পরম সত্যের উপলব্ধিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেই একই ভাব শাক্ত কবির কণ্ঠে নূতন যুগের ভাষায় গীত হইয়াছে। দেহকেই পরমতীর্থরূপে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া সিদ্ধাচার্যগণ অধ্যাত্মরাজ্যে দেহাত্মবাদকে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস—

অসরির কোই সরীরহি লুক্কো।
জো তহি জাণই সো তহি মুক্কো॥[২]

শাক্তকবির কণ্ঠে এই তত্ত্বই বাণীমূর্তি পাইয়াছে—

আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে।
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
... ...
তীর্থ-গমন, দুঃখ-ভ্রমণ, মন, উচাটন হয়ো না রে।
তুমি আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে।[৩]

সুতরাং শাক্ত পদাবলীকে চর্যাপদের ধারার ক্রমিক পরিণতি বলা যায়। কেবল চর্যাকারগণ ছিলেন সাধক আর শাক্তপদাবলী রচয়িতাগণ অনাসক্ত গৃহী,

১। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ২৩১-২৩২।
২। Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, C.U. p. 21, No. 89
৩। শাক্তপদাবলী, অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, ১৯৫৭, পৃঃ ১৭৭, সং ২৬৫।

মাতৃভক্ত উপাসক। চর্যাপদে শক্তিদেবীগণ যোগিনী, ডোম্বী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী নামে অভিহিতা হইয়াছেন। কোথাও কোথাও বজ্রধর ডোম্বীকে বিবাহ করিতে যাত্রা করিয়াছেন, কোথাও সুরত প্রসঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়াছেন, কোথাও যোগিনী 'মুহ চুম্বী' কমলরস পান করিয়াছেন প্রভৃতি লাস্যভাবের পদ রহিয়াছে। শাক্ত কবির রূপচিত্রণে শক্তিদেবতা এই প্রণয়িনী মূর্তি পরিহার করিয়া অনন্তময়ী আনন্দরূপিণী মাতৃমূর্তিতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। শাক্ত কবির কামনা আসঙ্গলিপ্সা নহে, জননীর চরণকমল ধ্যান, পরকীয়া সাধনা নহে, মাতৃপূজা।

শাক্তকবিদের উপাস্যা উমা এবং কালী বা তারা। বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে বৌদ্ধ তারাদেবী হিন্দুর কালিকার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিয়াছেন। মহাযান বৌদ্ধদের তারাদেবী এবং ব্রাহ্মণ্য কালিকা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবী প্রত্যেকেই শক্তিরূপিণী ও উগ্রা দেবী। তন্ত্র সাধকের দৃষ্টিতে ইঁহারা এক ও অভিন্না।[১] ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যও মনে করিয়াছেন কালী, ছিন্নমস্তা, এবং চামুণ্ডা প্রভৃতি দেবী বৌদ্ধ দেবায়তন হইতে হিন্দু দেবায়তনে প্রবেশ করিয়াছেন।[২]

আনুষ্ঠানিক ধর্মবিরোধিতা, বেদ, শাস্ত্রাচার, তীর্থ মাহাত্ম্যের প্রতি অনাসক্তি শাক্তকবিগণ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্ম, আচার-বিচার ও রীতিনিয়মের প্রতি অনাসক্তি বজ্রযানী ও সহজযানী সাধকদের কণ্ঠেও বারে বারে ধ্বনিত হইয়াছে। পরবর্তী যুগে এই আদর্শ নাথপন্থীদের ধর্মে, বৈষ্ণবধর্মে এবং বাউল গানে গভীর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শাক্ত সঙ্গীতেও সেই পরিচয় গাঢ় ও নিবিড়ভাবে অভিব্যক্ত। সিদ্ধাচার্যগণ বলিয়াছেন—যাহারা গায়ে ভস্ম মাখে, মাথায় জটাভার বহন করে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের কোণে বসিয়া ঘণ্টা বাজায় তাহারা কানে খুসখুস করিয়া মানুষকে ঠকায় মাত্র।[৩] এই ভাবই শাক্ত কবির কণ্ঠে নূতন যুগের ভাষায় বাণীরূপ পাইয়াছে—

চিরাচরিত প্রথার প্রতি বিরাগ

১। অধ্যাপক জাহ্নবী চক্রবর্তী তাঁহার হিন্দু ঐতিহ্য সপ্রমাণিত করিয়া বৌদ্ধ প্রভাবকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে শাক্ত পদাবলীর তারা বৌদ্ধ দেবী নহেন, হিন্দুতন্ত্র হইতে গৃহীতা প্রাচীনা দেবী। তিনি দশমহাবিদ্যার সঙ্গে বৌদ্ধ দেবদেবীর ভাবগত ও রূপগত সাদৃশ্যও অস্বীকার করিয়াছেন। —শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা, পৃঃ ১৪৯—১৫৩।

২। বৌদ্ধদের দেবদেবী, পৃঃ ৬৮, ৮০।

৩। বৌদ্ধগান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃঃ ৮০—৮১।

তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে ॥
আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে ?
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে ॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোসনায়ে ।[১]

বেদপুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি বিতৃষ্ণা ও সিদ্ধাচার্যদের দোহায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

আগম-বেঅ পুরাণে পণ্ডিআ মাণ বহন্তি ।
পক সিরিফলে অলিঅ জিম বাহেরিত ভমন্তি ॥[২]

শাক্ত কবিও গাহিয়াছেন—

আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ-তালাসি ।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী ।[৩]

শাক্তকবিগণ কেবল সিদ্ধাচার্যদের মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিতই নহেন তাঁহাদের উত্তর-সাধকও। তীর্থ ভ্রমণ ও তীর্থ মাহাত্ম্যের প্রতি অনাস্থাও তাঁহারা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছেন। শাক্ত কবির কণ্ঠে সেই একই আদর্শ বাণীমূর্তি পাইয়াছে—

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে ।
শ্যামার চরণ বিনে রে মন, কোন্ তীর্থ কোথায় আছে ?[৪]

অন্যত্র—

তীর্থে কি হইবে ফল, ভোলা মন তোর ভ্রান্তি কেনে ।
কোটিকল্প তীর্থের ফল শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে ॥[৫]

পূজা, অর্চনা, তীর্থ, তপোবন কোনটাই সিদ্ধাচার্যদের নিকট স্বীকৃতি পায় নাই। তাঁহারা প্রশ্ন করিয়াছেন—

১। শাক্তপদাবলী, প্রাগুক্ত, সং ২৪১, পৃঃ ১৬২।
২। Journal of the Department of letters Vol. XXVIII, C. U. p. 121, no. 2.
৩। শাক্ত পদাবলী, প্রাগুক্ত, সং ২৬২, পৃঃ ১৭৫।
৪। ঐ, সং ৩৩১, পৃঃ ২২১।
৫। ঐ, সং ৩৩৩, পৃঃ ২২২।

কিন্ত হ দীবেঁ কিন্ত হ ণিবেজ্জঁ ।
কিন্ত হ কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ ॥
কিন্ত হ তিত্থ তপোবণ জাই।
মোক্‌খ কি লভই পাণী হ্লাই ॥[১]

পূর্বসূরীদের এই তত্বই শাক্তকবির কণ্ঠে ভাষা পাইয়াছে—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায় ॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি, আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ—ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় ॥[২]

বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতি বেদ উপনিষদ অপেক্ষা তন্ত্রের সঙ্গে অধিকতর সাযুজ্য বজায় রাখিয়াছে। তন্ত্রের দ্বিধারা—হিন্দু ও বৌদ্ধ পরস্পর সম্পর্কবিহীন ও বিপরীতমুখিন নহে, বরং পরস্পর সংযুক্ত ও পরিপূরক।

তন্ত্রসাধনায় রামপ্রসাদের ভূমিকা

হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ভোগ-মোক্ষ অর্থাৎ ভোগের মধ্য দিয়া মোক্ষলাভ। তন্ত্রসাধকগণ পঞ্চমকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পথে ইন্দ্রিয় নিয়মনে সচেষ্ট হইয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের সাধনপথ অতি দুঃসাধ্য ও দুর্গম বলিয়া তাহা খড়্গাধারের উপর গমন, ব্যাঘ্রের কণ্ঠালিঙ্গন ও হস্তে সর্প ধারণের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্লাবনের পাঁচ শত বৎসর—খৃঃ অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী বাঙালী একনিষ্ঠ চিত্তে প্রকৃতি মিলনাত্মক সাধনা বা ভোগমোক্ষের সাধনা করিয়াছে। দীর্ঘকাল প্রকৃতি মিলনাত্মক সাধনায় রত থাকিয়া সিদ্ধকাম বাঙালী সাধক অবশেষে সাধনায় প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র নারীকে প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয় সাধনের পথে জাতিকে দুর্বল ও কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। রামপ্রসাদ নারীকে মাতৃরূপে গ্রহণ করিয়া নূতনতর পথের সন্ধান দিয়াছেন এবং দুর্বল জাতির জীর্ণ প্রাণে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও প্রাণশক্তির জোয়ার আনিয়াছেন।

১। Journal of the Department of Letters, op. cit. p. 11.
২। শাক্তপদাবলী, প্রাগুক্ত, সং ৩২৭, পৃঃ ২১৮—১৯।

প্রকৃতি সাধনা পঞ্চমকারের পথে ভোগকে প্ররোচিত করে, এইখানে সাধকের পতন সহজ। কিন্তু মাতৃসাধনায় সেই ভয় থাকে না। অবশেষে বাঙালী তন্ত্র সাধক প্রকৃতি সাধনাকে মাতৃসাধনায় পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে। রামপ্রসাদ সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম উদ্‌গাতা। রামপ্রসাদ মধ্যযুগের হিন্দু-বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার গতানুগতিক ও চিরাচরিত ভাবাদর্শের গতিবেগ পরিবর্তন করিয়া মাতৃবন্দনার নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন।

হিন্দু-বৌদ্ধ তন্ত্রের আচার ও ক্রিয়াকাণ্ড প্রাধান্য, শুষ্ক কর্মানুষ্ঠান ও ভাববিমুখতা এবং সর্বোপরি গোপনীয়তা ও গুহ্য সাংকেতিকতা (কুলপুস্তকানি চ গোপয়েৎ) প্রভৃতি কারণে তান্ত্রিক ধর্মকে উপজীব্য করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর ছিল না। রামপ্রসাদের আত্মলীন কবি প্রকৃতি তন্ত্রের এই উষর বন্ধ্যাত্বকে জয় করিয়া কবির জীবন-বাসনাকে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে। যদিও রামপ্রসাদের মাতৃবন্দনায় বাংলা দেশের তন্ত্র সাধনার স্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে তথাপি এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বিশুদ্ধ তন্ত্রাশ্রিত শাস্ত্রাচার তাঁহার সঙ্গীতকে যতটা প্রভাবিত করিতে পারে নাই, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাবিত করিয়াছে নিছক কবির ব্যক্তিহৃদয়ের মন্ময় ভাবানুরক্তি ও উপলব্ধির নিবিড়তা।

রামপ্রসাদের আবির্ভাব কাল বাঙালীর জীবনে সর্বাত্মক অবক্ষয়ের অপবাদে চিহ্নিত। সমসাময়িক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই যুগ রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও সামাজিক পরিবর্তনের যুগ। বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতকের তৃতীয়পাদে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে অন্ধকার ঘনায়মান—অন্তর্বিদ্রোহ, অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন চলিতেছে। নিম্নশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর আঘাতের পর আঘাত আসিতেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে—বন্যায় প্লাবিত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ দিশাহারা। দস্যু, চোর, ডাকাত, বর্গী, ঠগী প্রভৃতির উৎপীড়নে মানুষের সমাজজীবন বিপর্যস্ত। ধর্মীয় জীবনে তন্ত্রসাধনার বলিদান, বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ উপাসনা, বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার বীভৎস বামাচার ও ভৈরবীচক্রের তাড়নায় ধর্মের শাশ্বত স্বরূপ ও সর্বমানবিক কল্যাণরূপ প্রায় উন্মূলিত হইয়া আসিয়াছে। বাঙালীর প্রাণরসের সমস্ত উৎস যখন বিশুষ্ক, চারিদিকে যখন কেবল রাজভয়, লোকভয় ও মৃত্যুভয় সেই চরম দুর্দিনে চতুর্দিকের নিরন্ধ্র অন্ধকারের মহাশ্মশানে দুর্যোগের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া রামপ্রসাদ মাতৃসাধনায় রত হইয়াছেন। বলিদান ও আড়ম্বরপূর্ণ সাধনার বিরুদ্ধে তিনি প্রেম ও অহিংসার বাণী এবং বামাচার সাধনের পরিবর্তে

ত্যাগ, বৈরাগ্য, মহত্ব ও ইন্দ্রিয়জয়ের বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। এইজন্যই রামপ্রসাদ কালজয়ী পুরুষ। মাতৃচরণে তাঁহার ব্যক্তিচেতনা ও ব্যক্তি-সংস্কার একেবারে উন্মূলিত হওয়ায় তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ঐকান্তিকতা লাভ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে সকল দ্বন্দ্ব, দ্বিধা ও সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে।

সিদ্ধার্থ একদা এই সংসারকে পরম দুঃখের আকর মনে করিয়া দুঃখমুক্তির সাধনায় রত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাণী ছিল—

দুঃখবাদ, বৈরাগ্য ও অনিত্যতা

সব্বং অনিচ্চং
সব্বং দুক্খং
সব্বং অনত্তং

যাহা কিছু সমস্তই অনিত্য, সমস্তই দুঃখ, সমস্তই অনাত্ম। এই বিরাট, অনন্ত বিশ্ব তাহাও পরিণামী, ধ্বংসশীল। মহাপ্রলয়ে এই বিশ্বেরও একদিন বিনাশ ঘটিবে। অতি সুন্দরভাবে অনিত্যবাদ ও দুঃখবাদের এই ছায়া বিশ্বের সর্বত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। এই দুঃখবাদ পৃথিবী ভুলিতে পারে নাই। যুগে যুগে জাগতিক অভাব অভিযোগে, রোগে শোকে, মৃত্যুর ভয়াবহতায় এবং শাসক ও অত্যাচারিতের কঠিন আঘাতে সংসারের মানুষ ব্যাকুল হৃদয়ে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা এবং দুঃখবাদের প্রাবল্যের বিষয় চিন্তা করিয়াছে। ভগবান বুদ্ধের বাণী তাহাদের অন্তরে বারে বারে প্রশ্ন জাগাইয়াছে—

কোনু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি।[1]

সংসার অরণ্যে দাবাগ্নি জ্বলিতেছে, এইখানে আনন্দের আহ্লাদের অবসর কোথায়? যুগে যুগে এই বাণী ভারতীয় সাধকদের প্রাণে অনিত্যতা ও বৈরাগ্যের স্পর্শ দিয়াছে, সংসারের মানুষ সংসারকে শ্মশানঘাট বলিয়া ধারণা করিয়াছে। দারাবন্ধু পরিবারের প্রতি নির্বেদ ঔদাস্যে তাকাইয়াছে, নশ্বর মানবদেহকে পিঞ্জর, জীর্ণতরী, ভাঙা ঘর বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে কবি রামপ্রসাদের জীবনেও সেই দুঃখ অশ্রুজলের স্ফটিক আবরণে হিরণ্য-জ্যোতি লাভ করিয়াছে। তিনিও জাগতিক বাসনার প্রতি চরম বীতস্পৃহ। তাঁহার কণ্ঠেও গীত হইয়াছে—

বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে, ক্ষার হবে তায় পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, মনের ময়লা যাবে কাটি।[2]

১। ধম্মপদ, জরাবগ্গো, শ্লোক নং, ১৪৬

২। শাক্তপদাবলী, প্রাগুক্ত, নং ২৪৩, পৃঃ ১৬৩।

বুদ্ধদেবের মতে নির্বাণই পরম সুখ, তাহাতেই দুঃখের অবসান। সতত 'ত্রিতাপের তাপে' দগ্ধ হইয়া প্রসাদও শান্তি পারাবারের দিকে ছুটিয়া গিয়াছেন। দুঃখের দাবদাহে জীবনসন্ধ্যায় শাক্তকবি মাতৃচরণে আশ্রয় চাহিয়াছেন—

সন্ধ্যা হলো এবার কোলের ছেলে মা কোলে নিয়ে চল।

এইভাবে তাঁহার দুঃখাশ্রু বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হইয়া অনন্তময়ীর উদ্দেশ্যে বহিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মার বিষয় উপস্থাপিত করিয়া সংসারত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রেরণা দান করিয়াছে। শাক্তপদাবলীতে দুঃখ আছে, কিন্তু নৈরাশ্য নাই, বৈরাগ্য আছে, কিন্তু সংসার ত্যাগের আবেদন নাই। সংসারের দুঃখ দৈন্যের মধ্যে থাকিয়া, দুঃখের আঘাতে জর্জরিত হইয়াই শাক্তকবিগণ দুঃখজয়ের সাধনা করিয়াছেন।

ভগবান বুদ্ধ একদা নিজেকে কৃষক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। কাশী-ভরদ্বাজকে তিনি বলিয়াছিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, আমি কর্ষণ ও বপন করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করি। সত্যই আমার নিড়ানী, শ্রদ্ধা আমার বীজ, তপ আমার বৃষ্টি, প্রজ্ঞা আমার যুগ ও লাঙল, বিনয় আমার ঈষ'।[১] শাস্তা গৌতমের কর্ষণ ক্ষেত্র অবশ্যই মানব-জমিন। এই জমির উৎকর্ষ সাধন এবং তাহাতে সত্যের বীজ বপন করাকেই তিনি তাঁহার জীবিকা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মানব-জমিন কর্ষণ এবং তাহাতে ফসল উৎপাদন করার এই উপমা রামপ্রসাদও গ্রহণ করিয়াছেন—

মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥[২]

গৌতমের অমৃতফল প্রসবকারী কৃষি রামপ্রসাদের কাব্যে সোনার ফসলে পরিণত হইয়াছে।

শাক্ত কবিদের 'আদরিণী শ্যামা মা' শুধু ব্রহ্মময়ীই নহেন, তিনি কেবল কৃষ্ণ, শিব, রামই নহেন, ভক্ত কবির গভীরতম অনুধ্যানে তাঁহার মধ্যে সর্বধর্মের সমন্বিত মাতৃমূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। শাক্তকবি সেই অসাম্প্রদায়িক মাতৃপ্রতিমার দ্রষ্টা ও পূজারী।

১। সুত্তনিপাত, উরগবগ্গ, কাসীভরদ্বাজ সুত্ত, পি. টি. এস. পৃঃ ১২—১৫

২। শাক্তপদাবলী, প্রাগুক্ত, সং ২৫০ পৃঃ ১৬৮।

মগে বলে ফরাতারা[১], গড বলে ফিরিঙ্গী যারা মা,
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে সূর্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি ॥২

শাক্তকবির শ্যামা মা, একাধারে বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, খৃষ্টানদের গড, ইসলামের খোদা, শাক্তদের শক্তি, শৈবের শিব, সৌরদের সূর্য এবং বৈষ্ণবের রাধাঠাকুরাণী। এই উক্তির মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক ও সর্বমানবিক ধর্মাদর্শের পরিচিতি রহিয়াছে তাহা মানুষের হৃদয়কে অনায়াসে স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল।

বাউল গান

বাউল ধর্মের উদ্ভবকাল

চৈতন্যোত্তর বাংলাসাহিত্যের দ্বিধারা—একদিকে স্মার্ত পৌরাণিক অভিজাত সাহিতসৃষ্টি, অন্যদিকে লোক সাধারণের রচিত দেহাচার-নির্ভর সহজিয়া ধর্মাশ্রিত কড়চা ও বাউলসঙ্গীত। এই সৃষ্টিকর্মে অভিজাত সাহিত্য যেমন সংস্কৃত পুরাণ ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল তেমনি লোকসাধারণের সৃষ্টিতে বৌদ্ধ সহজিয়া আদর্শের ঐতহ্যানুসরণের প্রচেষ্টা সূচিত হইয়াছে। বাউল ধর্মের ঐতিহাসিক উদ্ভবকাল চৈতন্যপরবর্তী যুগে। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউল ধর্মের উদ্ভবকাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর, গোস্বামিগণের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মত প্রচার এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশের পর আনুমানিক ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ তক আমরা বাউল নামে ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্‌ভবকাল কল্পনা করিতে পারি"।[৩] অবশ্য পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বাউলধর্মের আদি খুঁজিতে গিয়া নিজের লেখনীতে বাউল-বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

১। ফরাতারা :—বার্মিজ ভাষায় বুদ্ধের প্রতিশব্দ 'ফরা'। 'তারা' সম্ভবতঃ তারাদেবী। মহাযানী প্রভাবে তিনি বুদ্ধদেবের সঙ্গে সংযুক্তা হইয়াছেন। বৌদ্ধ ত্রিরত্ন 'বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ' মগেরা 'ফরাতারা-সাঙথা'-রূপে উচ্চারণ করে। সুতরাং 'তারা' ধর্মের স্থান গ্রহণ করিয়াছে বলা যায়। বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পেও দেখা যায় ধর্ম নারীমূর্তিতে বুদ্ধদেবের পার্শ্ববর্তিনী হইয়াছেন।

(দ্রষ্টব্য : B. Bhattacharyya, Indian Buddhist Iconography, p. 40, Fig. 9, 10, 11)

সাঙথা 'সঙ্ঘ' শব্দের বিকৃত উচ্চারণ।

২। শাক্ত পদাবলী, প্রাগুক্ত, পদসংখ্যা, ৩০৯।

৩। বাংলার বাউল ও বাউলগান, পৃঃ ১২৯।

"আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল সহজ নিত্য মানবসত্যের উপরে। কাজেই যতকাল মানব, ততকাল এই সহজ বাউলিয়ামত। বেদপথ তো সে দিনের। তাহাই তো কৃত্রিম। ঋষিরা সেইদিন তাহা রচনা করিয়াছেন। বাউলিয়া সহজ মতই অনাদিকালের। বেদের আদি আছে।'[১]

অন্যত্র—

'বাউলেরা বলেন, সব কৃত্রিম ধর্মেরই আদি আছে, সহজ মুক্ত ধর্ম চিরকালের।......অথর্বের ব্রাত্যরাও তখনকার দিনের বাউল।'[২]

বাউলধর্মের আদি যখন হইতেই হউক, ইহার শেষ বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বাউলধর্মের উৎপত্তি স্থানগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। একদা বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি বেদবিরোধী ধর্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল আর্যসভ্যতা প্রসারিত বৈদিক আর্যভূমির সীমানার বাহিরে ভারতবর্ষের পূর্ব-উত্তর সীমান্তে। শাস্ত্রাচার বিরোধী বাউলধর্মও পূর্ব-উত্তর ভারতেই উদ্ভূত হইয়াছিল।

বাউলগণ হিন্দু নহেন, বৌদ্ধও নহেন, আবার ইসলামও নহেন। বাউলের ধর্ম 'জাতিধর্ম-সংস্কার নির্বিশেষে একটা নির্দিষ্ট সাধনমার্গের ধর্ম।' দীর্ঘকাল বাংলাসাহিত্যে কেবল হিন্দু বৌদ্ধ চিন্তন ও আচরণকে উপজীব্য করিয়া তাহা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। বাউল-গানে এই দ্বিধারার সঙ্গে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে নূতন মহিমায় প্রোজ্জ্বল ইসলামের জীবনাদর্শ। সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা যায় বাউলধর্মে হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলাম ধর্মের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়াছে। আর এই ত্রিবেণীর মধ্যমণি বৌদ্ধধর্ম। কারণ বাউলধর্মের উৎসমূলে যে ধর্মাদর্শের ও সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে তাহা বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউলধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের এই বিশেষ প্রভাবকে স্বীকৃতি দান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

বাউলগান হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলামের ধর্মীয় আদর্শের সর্বাত্মক বাণীমূর্তি

'বাউলধর্ম একটি সমন্বয়মূলক ধর্ম। ইহার মূল সাধন-পদ্ধতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার উপর শিবশক্তিবাদ, রাধাকৃষ্ণবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়া-তত্ত্ব, সুফী-দর্শন ও তত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-তত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব

১। বাংলার বাউল, পৃঃ ৩।
২। ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, পৃঃ ৪৮

পড়িয়াছে এবং ইহার সঙ্গে কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ইহা একটি বিশেষ ধর্মরূপে গঠিত হইয়াছে।'[১]

ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতেও বাংলার বাউল সম্প্রদায় বৌদ্ধাচার্যদের মননধারা ও সাধনধারার উত্তরাধিকারকে বজায় রাখিয়াছে। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাউল সাধনায় বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রভাবকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়া লিখিয়াছেন—

'নিত্যানন্দ' পুত্র বীরচন্দ্র সহজিয়া বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন, বোধ হয় বৈষ্ণব রাগানুগাভক্তি এবং বৌদ্ধ সহজিয়াদের পুঁথি-বহির্ভূত সহজধর্মের প্রভাবে ১৮শ শতাব্দীতে জাতি কৌলীন্যহীন শাস্ত্রাচারবর্জিত ও আনন্দবাদী একটি উপসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ইহার পশ্চাদ্‌পটে সুফী ভক্তিবাদও বিশেষ ক্রিয়াশীল হইয়াছিল।'[২] ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তিতে বৌদ্ধদিগের প্রভাব এবং ইহার কাল নির্ণয়ে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। প্রকৃতই ইঁহারা বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ, শৈবদের শিবশক্তি অপেক্ষা বৌদ্ধ সহজাচার্যদের আদর্শের সঙ্গে অধিকতর সাযুজ্য বজায় রাখিয়াছেন।

এই সর্বাত্মক মিলন-সমন্বয়ের ছত্রছায়াতলে বসিয়া বাংলার বাউলগণ যে বাণী সাধনা করিয়াছিলেন তাহার বৈশিষ্ট্য কি ?

সাধারণ লোকধর্মের পথে জাগতিক ভালবাসা বিতরণ করিয়া বাউল কাহাকে শত্রু, কাহাকেও বন্ধু, কাহাকে আপন, কাহাকেও পররূপে চিহ্নিত করিয়া লয় নাই। জাগতিক রঙ্গমঞ্চে বাউল শুধু অভিনেতামাত্র। নানাবিধ সাজে সে অভিনয় করিতেছে, সাজ খুলিলেই আসলরূপ। বাউল বিশ্বের মুক্ত যাত্রাপথের চিরন্তন পথিক। সীমার মধ্যে বাউল আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। বাহিরের জন্য তাগিদ ও আকুলতা তাহাকে আপন-ভোলা করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্য জাতির বন্ধনকে অগ্রাহ্য করিয়া গৃহমুখী আত্মাকে বাহিরের বিচরণ পথে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। এই পথ ইন্দ্রিয় দমনের পথ নয়, ইন্দ্রিয় নিয়মনের ও অধ্যাত্ম তৃষ্ণার উচ্ছ্বাসময় সার্বিক পথ। বাউল এই সনাতন পথের চিরপথিক। তাঁহার পরিধানে ধূলি মলিন ছিন্নকন্থা, মস্তকে

১। বাংলার বাউল ও বাউলগান, পৃঃ ১২৬।

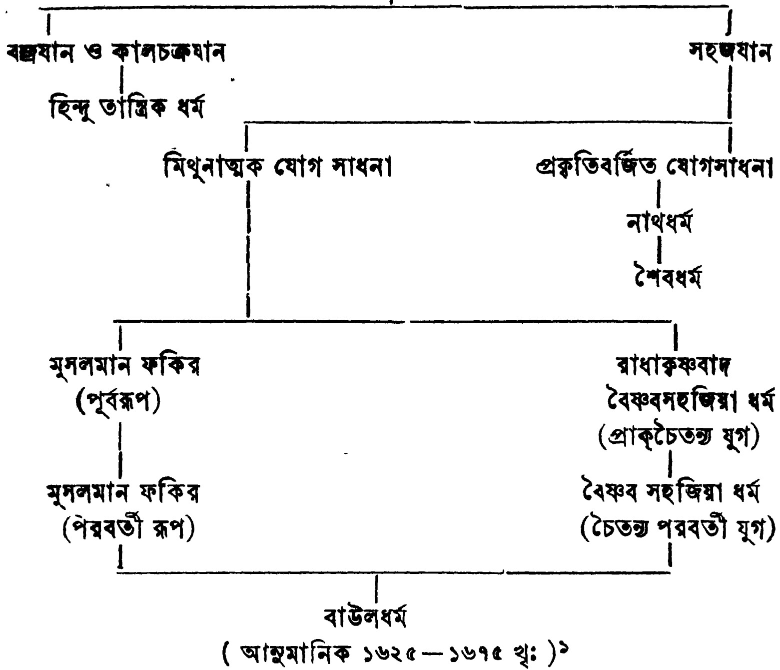
২। প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ১১৬২, পৃঃ ১০৬

জটাভার, কিন্তু আননে প্রশান্তি এবং হৃদয় অতীন্দ্রিয় রহস্যের গভীর ভাবলোকে সমাধিস্থ। বাউলের এই বৈচিত্র্যসমুজ্জ্বল রূপ চিত্রে এবং তাঁহার একতারার সুরঝঙ্কারে বৌদ্ধ সাধকের জীবন-বাণীর প্রেরণা কতখানি তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

বাংলার বাউলের কণ্ঠে ও একতারায় যে বাণী ও সুর তরঙ্গে তরঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে কান পাতিয়া শুনিলে তাহার মধ্যে বহু কণ্ঠের সম্মিলিত সুরধ্বনি পাওয়া যায়। কোন কণ্ঠ শৈব তত্ত্বজ্ঞানী সাধকের, কোন কণ্ঠ সহজিয়া বৈষ্ণবের, কোন কণ্ঠ মধ্যযুগের মরমিয়া সাধকের, কোন কণ্ঠ সুফী মতাবলম্বীর। কিন্তু সকল সুরের উর্ধ্বে যে সুর বাউলের প্রাণের ভাষায় ও একতারার ঝঙ্কারে মূর্ছনা তুলিয়াছে তাহা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের কণ্ঠনিঃসৃত। বাউলধর্মের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় এই ধর্ম বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বাউলধর্মে সুফী মতবাদ অপেক্ষাও বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের অধিকতর প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। বাউল গানে ও সাধনায় সহজিয়া বৌদ্ধদের মূল্যায়নের জন্য তাঁহার এই সুচিন্তিত অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে—In the Bāul's of Bengal, therefore, we find the continuity of the Sahajiyā movement, the first systematised form of which is found in the school of the Buddhist Sahajiyās. When we shall analyse the tenets of the Bāuls, as embodied in their songs that are available to us, we shall find that the doctrines of the earlier Sahajiyās from the real background of their religion—although Sūfī-ism of Islam have introduced a new spirit in it. A study of the Bāul songs will, therefore, naturally lead us first to a study of their Sahajiyā background and then to the line and colour that have been given to it by Sūfī-ism.[১]

সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বাউল সাধনার সাযুজ্য কতখানি তাহা আলোচনা করিতে হইলে পাল যুগ হইতে বাংলার বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমপরিণতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করিতে হয়। বাউলধর্মের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধ তথা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক নিরূপণের জন্য নিম্নলিখিত চার্ট প্রদত্ত হইল।

১। Obscure Religious Cults, op. Cit. p. 165.



(আনুমানিক ১৬২৫—১৬৭৫ খৃঃ)[১]

এই রেখাচিত্রে পাল যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন ধর্ম, তাহার সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের সংযোগ এবং এই সমস্ত তন্ত্রাশ্রিত ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রদর্শিত হইয়াছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী ধরিয়া বাংলার অধ্যাত্ম জীবনকে ও চিন্তাধারাকে অপরিহার্যভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। দীর্ঘকাল প্রবাহে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ভাবাদর্শকে অনুসরণ করিয়া যে তত্ত্ব ও আচার আচরণ উল্লেখিত ধর্মগোষ্ঠীসমূহে উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে তাহাই বর্তমান বাউলধর্মে নূতন মর্যাদায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। বাউলধর্মের উপর তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের অপরিহার্য প্রভাবকে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সকলেই নিঃসংশয় স্বীকৃতি দিয়াছেন। বর্তমানে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের কোন কোন তত্ত্ব ও আচার-আচরণ বাউলধর্মের কালপরিবেশে নূতন প্রাণ লাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা আলোচনা করা হইতেছে।

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০

বাউলসাধনায় দুঃখবাদ ও বৈরাগ্যসম্বন্ধীয় যে তত্ত্বাচ্য রহিয়াছে তাহা প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যকেই সমুচ্ছ্বাসিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজীবনে দুঃখবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন বুদ্ধদেব। জাগতিক সর্বব্যাপারে তিনি দুঃখকে প্রদর্শন করিয়াছেন—'সব্বং দুক্‌খং' সমস্তই দুঃখময়। জগতে সুখের ও আনন্দের কিছুই নাই, সংসার-অরণ্যে যেখানে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে সেখানে আনন্দের অবসর কোথায়? বাউলের কণ্ঠেও এক পরিমিতিবিহীন, অকূল অপার দুঃখবারিধি উথলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বাহিরে ভোগের খোলস কিন্তু অন্তরে ত্যাগ ও তিতিক্ষা। বৈরাগ্যদীপের নিষ্কলঙ্ক শিখা জ্বালাইয়া বাউল বিশ্বের পথে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার গানের সুরে সুরে সেই চিরন্তন দুঃখবাদের বাণী অনুরণিত হইয়াছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাউল সঙ্গীতের সেই মর্মবাণী উপলব্ধি করিয়াই লিখিয়াছেন—

বৈরাগ্য ও দুঃখবাদের প্রাবল্য

'বাউলের গানে নিছক বৌদ্ধভাব। বাউল শুধুই মড়ার কান্না গাহিয়া বিরাগ শিখায়।…বাউল মানুষকে জীবনের প্রতিপদে শত দুঃখ দেখাইয়া শ্মশানের নির্বাণটাকে শেষ আশ্রয়স্বরূপ মনে করিয়াছে।[১]

বৌদ্ধদের জাগতিক দুঃখ ও হাহাকার, সুগভীর শূন্যতাবোধ ও বিষাদের সঙ্গে বাউলের প্রাণে আরো একটি বস্তু ঠাঁই পাইয়াছে, তাহা হইতেছে 'না পাওয়ার বেদনা।' বাউলগণ জাগতিক দুঃখে দিশাহারা হইয়া সর্বদুঃখ-হর এক পরম অনমুভবনীয়কে ধরিতে চাহিয়াছেন এবং পাগলের মত পথ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। দুঃখ নিবৃত্তির সাধনায় প্রাচীন বৌদ্ধগণ খুঁজিয়াছেন নির্বাণের পথ। সে পথ আনন্দের ও শান্তির এবং অমৃতত্বের ও দুঃখনিবৃত্তির।

জাগতিক দুঃখবোধের প্রাবল্য এবং না পাওয়ার বেদনা বাউলের বক্ষপঞ্জরকে মর্মরিত করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে পরিণত হইয়াছে—

আমার মন পাগল পারা, আমার হয় না নিহারা,
আমি বনে বনে কেঁদে ফিরি, আমি পাই না অধরা,
যেমন কলমীলতা জলে ভাসে রে
তেমনি ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে ॥

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ৩৫০।

দুঃখ কই যারে তারে এই ভব সংসারে।
তোঁ বিনে ভরসা নাই, গুরু, চরণ দেও মোরে।
অধীন পাঞ্জ বলে, মুরশিদ বিনে
কেঁদে ফিরিতেছি ঘরে ঘরে ॥[১]

বাউলের এই দুঃখ উপশমের পথ প্রেম ও মৈত্রীর সহজ পথ। ইহা প্রাচীন বৌদ্ধদের ইন্দ্রিয় দমনের কঠিন পথ নহে, ইন্দ্রিয় নিয়মনের সরল পথ। এই পথে বৌদ্ধ সহজিয়াদের সঙ্গেই তাঁহাদের নৈকট্য রহিয়াছে। সহজিয়া যোগীদের নিকট ঘর ও বন দুইই সমান। সমস্তই নিরন্তর বুদ্ধ—কোথায় সংসার, কোথায় নির্বাণ?

ঘরহি ম থক্কু ম জাহি বণে জহি তহি মণ পরিআণ।
সঅলু নিরন্তর বোহি—ঠিউ কহিঁ ভব কহিঁ নিব্বাণ॥

বাউল সাধকও সেই বিশ্বব্যাপী অধরাকে ধরিবার জন্য নিরন্তর পথিক—ঘরে ও পথে, সংসারে ও নির্বাণে তাঁহার সমদৃষ্টি।

জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা ও সংসারের অনিত্যতা বাউলের চিত্তকে কেবল ক্ষণকালের জন্য বিমোহিত ও আবিষ্ট করিয়া দিয়াছে জাগতিক দুঃখের প্রাবল্য উপলব্ধি করিয়াও প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম সামাজিক বিধিবিধানের পরিবর্তন সাধনে চেষ্টিত হইয়াছে এবং পার্থিব অস্তিত্বের প্রতি সচেতনতা প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের অনলে দগ্ধ হইয়া বাউলের হৃদয় একেবারে নিঃসাড় হইয়া গিয়াছে। এই জাগতিক অনিত্যতার বাণী শুনাইয়াও তাঁহারা কোন সামাজিক পরিবর্তন আনিতে পারেন নাই। কেবল তাহাই নহে, সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের পরিবর্তে সমাজকেই তাঁহারা অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বাউলের ভাষায় এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন—'আমরা পাগল, আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও। পাগলের তো কোন দায়িত্ব নাই।...মনে করিও যেন আমরা সামাজিক হিসাবে মরিয়াই গেছি।'[২]

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বেদ উপনিষদ ও সন্ত কবিদের চিন্তনের সঙ্গে বাউলের ভাবাদর্শের সাধর্ম্য লক্ষ্য করিয়াছেন।[৩] বেদ উপনিষদ ও সন্ত কবিদের যে সমস্ত আদর্শ সর্বকালীন, যাহা মানবধর্মরূপে যুগোত্তীর্ণ হইয়া

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, প্রাগুক্ত, পদসংখ্যা পৃঃ ২২৫।
২। বাংলার বাউল, পৃঃ ৩।
৩। বাংলার বাউল, পৃঃ ৪-৪৫।

সর্বমানবের সম্পদে পরিণত হইয়াছে সেই সব আদর্শের ক্ষেত্রেই বাউল সাধকের বাণীর সঙ্গে তাঁহাদের নৈকট্য। ইহা বাউলদের উপর বেদ উপনিষদ বা সন্ত কবিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব নহে, কারণ বাউলগণ ছিলেন নিরক্ষর এবং শাস্ত্রভারমুক্ত শাশ্বত মানবধর্মের সাধক। বাউল-বাণীকে প্রত্যক্ষ প্রভাবিত করিয়াছে বেদবিরোধী সহজিয়া বৌদ্ধদের চিন্তন ও জীবনায়নের রীতিনীতি।

শাস্ত্র ও তন্ত্রমন্ত্রের বিরোধিতা

বাউল কেবল দেবমন্দির, প্রতিমা ও ব্রাহ্মণের বিরোধিতা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, শাস্ত্র-গ্রন্থ, ব্রত-তীর্থ, আচার, বাহ্যনিয়ম, ও মন্ত্রতন্ত্রকেও অস্বীকার করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মের বন্ধনমুক্ত শাস্ত্রাচার-বহির্ভূত চিরন্তন ধর্মকেই তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন। শাস্ত্রীয় গতানুগতিকতা ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের আবেদন যুগযুগান্তপূর্বে উত্থিত হইয়াছিল। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে সেই প্রতিবাদের তীব্র কণ্ঠ শুনা যায়। পরবর্তীযুগে আর্যদেবের 'চিত্তবিশুদ্ধি-প্রকরণ' গ্রন্থে তীর্থস্নান প্রভৃতির বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে। বজ্রযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের কণ্ঠেও সেই প্রতিবাদের ধারাবাহিকতা রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন—সত্যই চরম আকাঙ্ক্ষণীয়, তাহা কৃচ্ছ্রতার দ্বারা প্রাপ্য নহে, শাস্ত্র পঠন, স্নান, দর্শনেও সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু সিদ্ধাচার্যের বাণীর সঙ্গে বাউল কবির বাণী প্রায় একই সুরে মিলিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রবাণীর ব্যর্থতা সম্বন্ধে কাহ্ন বলিয়াছেন—

আগম বেঅ-পুরাণেঁ পণ্ডিআ মাণ বহন্তি
পক্ক সিরিফলে অলিঅ জিম বাহেরিত ভমন্তি।[১]

চর্যাকার কাহ্নও সমসুরে বলিয়াছেন—

আগম পোথী ইষ্টামালা।
ভন কইসেঁ সহজ বোল বা জাঅ।[২]

ইহাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বাউল সাধকও গাহিয়াছেন—

পণ্ডিত যে জনা, আজন্ম কানা,
শাস্ত্র ঘেঁটে মরে, শাস্ত্রের মর্ম জানে না,
আপন জন্ম-যোগের নাই ঠিকানা,
পরের বিধান দিতে পারে ॥[৩]

১। Journal of the Department of Letters, op. cit p, 121.
২। চর্যাপদ সং ৪০। ৩। বাংলার বাউল ও বাউলগান, পদ সং ৪২৭।

কোন শাস্ত্রগ্রন্থ নহে, বাউলের প্রাণপুস্তক ভগবানে প্রেম। মানুষের রচিত ধর্মের অচলায়তনকে তাঁহারা মানেন নাই। জীবন্ত ধর্মশাস্ত্রেই তাঁহাদের বিশ্বাস। ধর্মশাস্ত্র ও পাণ্ডিত্যের পথ এবং তন্ত্রমন্ত্র ও আচার-পদ্ধতির পথকে সহজাচার্যগণ বাঁকা পথরূপে অভিহিত করিয়াছেন। বাউলগণ অধ্যাত্ম পথে মন্দির, মসজিদ, পুরাণ, কোরানের বাধায় গভীর দুঃখ বোধ করিয়াছেন—

(মোর) যাইতে চায় না রে মন মক্কা মদিনা।
(এই যে) বন্ধু আমার আছে, আমি রইয়ে তারি কাছে
... ...
(আমার) নাই মন্দির নাই মসজিদ
নাই পূজা কি বকরেদ
তিলে তিলে মোর মক্কা কাশী
পলে পলে সুদিনা।[১]

পাণ্ডিত্যের অলিগুঞ্জনের মধ্যে সহজাচার্যগণ সহজানন্দের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই, পারিয়াছেন নিরক্ষর হইয়া—

অকখরবাঢ়া সঅল জগু ণাহি ণিরক্খর কোই।
তাব যে অকখর ঘোলিআ জাব ণিরকখর হোই॥[২]

শিক্ষিত লোক সর্বত্র, অশিক্ষিত কোথাও নাই। এইজন্যই শিক্ষা ভুলিয়া নিরক্ষর হইতে হইবে। বাউলগণও ছিলেন সেই নিরক্ষর সাধক—যাঁহাদের কোন প্রকার শাস্ত্র জ্ঞানের অভিমান নাই।

কেবল শাস্ত্রাচারের প্রতি নহে, দেববিগ্রহের প্রতিও বিদ্রূপ ঘোষিত হইয়াছে—

মাটির ঢিপি, কাঠের ছবি,
ভূত ভাবে সব দেবাদেবী,
ভোলে না সে এসব রূপি
ও যে মানুষ-রতন চেনে॥[৩]

১। প্রবাসী, ১৩৩৭ চৈত্র, 'বাংলার প্রাণবস্তু'—ক্ষিতিমোহন সেন।
২। Journal of the Department of Letters, op. cit., p. 21
৩। বাংলার বাউল ও বাউলগান, পদসংখ্যা ৪৬।

এই জন্যই বাউল যিনি, তিনি—

বিনা অনুরাগের ধর্ম
জানে না সে কোন কর্ম
বেদবিধি, বিষয়, কর্ম
সব ছাড়্যাছে।[১]

জাতিভেদের কঠোরতা চিরকাল ভারতবর্ষের অন্তরাত্মাকে ক্ষুণ্ণ ও নিষ্পেষিত করিয়াছে। যুগে যুগে ভারতীয় মনীষীদের কণ্ঠে জাতিভেদের বিরুদ্ধে নিঃসংশয় ঘোষণাও শুনা গিয়াছে। এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী বুদ্ধদেব। পরবর্তীযুগে বৌদ্ধধর্মের সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই বিদ্রোহের বাণী স্বীকৃতি পাইয়াছে। এই সর্বাত্মক বাণীর মহৎ পোষ্টারূপে বাউলসাধকগণও সেই প্রাচীন আদর্শকেই নবরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। বাংলার বাউল লালন সেই একই আদর্শকে নূতনকাল পরিবেশে উপস্থাপিত করিয়াছেন. তাঁহার কণ্ঠেও সেই একই বিদ্রূপ অনুরণিত হইয়াছে—

জাতিভেদ

সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয় জেতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে ॥
... ...
জগৎ বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করে যথাতথা,
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাত বাজারে ॥[২]

মানুষে মানুষে জাতের ভেদ বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ বৌদ্ধ সহজিয়াদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়াছে। চর্যাগীতি ও বাউলগান দুই সঙ্গীতেই অসাম্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার আবেদন আছে। কিন্তু যে বলিষ্ঠ প্রাণবত্তায় প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম সর্বপ্রকার অসাম্য ও ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে কষাঘাত করিয়া সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহারই অভাবে সহজিয়া সিদ্ধাচার্যের গান ও বাউলের গান কেবল রোদনে পর্যবসিত হইয়াছে।

১। বাংলার বাউল ও বাউলগান, পদসংখ্যা, ২৯০।

২। ঐ, ১২২, ১৬০ ও ২৬৬ সংখ্যক পদেও জাতিভেদের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধকগণ দেহ-মাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁহারা ঘোষণা করেন যাগযজ্ঞের প্রয়োজন নাই। ধর্ম সাধনার জন্য বাহিরের মুখাপেক্ষী হইবারও আবশ্যক নাই। দেহের মধ্যেই বুদ্ধের বাসস্থল—ভাণ্ডের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড। সুতরাং দেহমন্দিরে তাঁহার সন্ধান না করিয়া কোথায় খুঁজিতেছ আপন ঈশ্বরকে? তিনি অশরীরীরূপে এই শরীরেই বিরাজিত—

দেহতত্ত্ব

অসরির (কোই) সরীরহি লুক্কো
জো তহি জানই সো তহি মুক্কো ॥[১]

বাউলসাধনার মূলমন্ত্রও তাহাই। তাঁহারাও বলেন এই দেহভাণ্ডেই বিশ্বদেবতা বিরাজিত। সিদ্ধাচার্যের বুদ্ধ যেমন অশরীরী বাউলের ঈশ্বরও তেমনই অচিন-পুরুষ।

আমি আর অচিন একজন
থাকি আমরা এই দুইজন
(ওরে) ফাঁক রয়েছে লক্ষ যোজন
না পাই দেখিতে ॥[২]

তিনি অমৃত-জ্যোতিঃ—সকল জ্যোতির সেরা জ্যোতিঃ। কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে চাহেন কিন্তু মানবদেহ-ভুবনের মধ্যেই তাঁহার অধিষ্ঠান। সিদ্ধাচার্যগণ বলিয়াছেন—

পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্‌খাণই।
দেহঁহি বুদ্ধ বসন্ত ন জাণই ॥[৩]

বাউল সাধকগণও উপলব্ধি করিয়াছেন দেহের আধারেই আলোর আবির্ভাব ঘটে। শাস্ত্রপাঠের আড়ম্বরদ্বারা কেবল লক্ষণাই বৃদ্ধি পায়। কাছের মানুষকে তাহা আড়াল করিয়া দেয় মাত্র—

আমার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা ॥
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়,

১। Journal of the Department of Letters, op. cit.. p. 21.

২। বাংলার বাউল ও বাউলগান, পদসংখ্যা ১৩৭।

৩। Journal of the Department of Letters, op. cit p. 98

যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
দেখনা।
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি,
আমার কোলের ঘোর তো যায় না॥
আত্মরূপে কর্তা হরি,
মনে নিষ্ঠা হ'লে মিলবে তারি
ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা॥[১]

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য এবং বাউলসাধক উভয়ের মতে মানবদেহই দেবমন্দির—চির পবিত্র, পরমাত্মার পুণ্যনিকেতন। সিদ্ধাচার্য সহরপাদ এই অবিনশ্বর দেহকেই শুভতীর্থরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন—

এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে গঙ্গা-সাঅরু।
এথু সে পআগ বণারসি এথু সে চন্দ-দিবাঅরু॥
কৃথেত্তু পীঠ উপপীঠ এথু মই ভমই পরিঠ্ঠও।
দেহাসরিসঅ তিত্থ মই সুহ অণ্ণ ণ দীঠ্ঠও॥[২]

বাউলও এই একই তত্ত্বের মহত্তম উদ্গাতা।

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে,
দেখ না রে মন ভেয়ে।
দেশদেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে।[৩]

তীর্থ-পূজা-জপ-তপ-অর্চনা যাঁহার জন্য এই দেহেই তাঁহার পুণ্য পাদপীঠ। অনিত্যদেহে চিদানন্দময় বিশ্বেশ্বর ভগবানই নিত্য সত্য—

কারে বলব কে করবে প্রত্যয়
আছে এই মানুষে নিত্য সত্য চিদানন্দময়।

তাহার চৌদ্দ ভুবন সপ্ত স্বর্গ পাতালও এই দেহ অভ্যন্তরেই—

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদসংখ্যা, ৮২।
২। Journal of the Department of Letters, op. cit. p. 15
৩। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদসংখ্যা ৪৩।

দেহে সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল,—
চৌদ্দ ভুবন কর ভ্রমণ ॥[১]

দেহভাণ্ডের এই অপূর্ব নির্মাণকৌশল দেখিয়া বাউল আশ্চর্য হইয়া ভাবিয়াছে ইহার স্রষ্টার কৃতিত্বের বিষয়—

কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিগর,
... ...
সে ঘরের মাপ চৌদ্দ পোয়া
চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর ॥[২]

ঘরের স্বামী, আপন প্রভু যিনি ঘরেই রহিয়াছেন তাঁহার সংবাদ কি কেহ প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাহে? সিদ্ধাচার্য সরহপাদ প্রশ্ন করিয়াছেন—

ঘরেঁ অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই
পই দেক্‌খই পড়িবেসী পুচ্ছই ॥[৩]

বাউল লালনও প্রশ্ন করিয়াছেন—

আমার হলো কি ভ্রান্তি, মন,
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন,
সিরাজ সাঁই কয় ঘুরবি, লালন,
আত্মতত্ত্ব না বুঝে ॥[৪]

অন্যত্র—

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে ॥
আপন ঘরে বোঝাই সোনা,
পরে করে লেনা-দেনা,
আমি হ'লেম জন্ম-কানা—
না পাই দেখিতে ॥[৫]

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদসংখ্যা, ২১৩।
২। ঐ, ১৩৬।
৩। Journal of the Department of Letters, op cit., p. 17.
৪। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদসংখ্যা ৫০।
৫। ঐ, ৭৮।

দেহ নির্মিতির এই অপূর্ব কলাকৌশলের পরিচয় পাইয়া সিদ্ধাচার্য নিষেধ করিয়াছেন—

উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক
নিঅড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক ॥[১]

'ঋজু পথ' ছাড়িয়া বাঁকা পথ লইও না, নিকটে বোধি লঙ্কায় যাইও না। লালনের একটি পদেও এই উপদেশ প্রায় সমসুরে শ্রুত হইয়াছে—

সমঝে ভবে সাধন কর, নিকটে ধন পেতে পার
লালন কয় নিজ মোকাম ধোর, বহু দূরে নাই।[২]

সিদ্ধাচার্য ও বাউল উভয়ের নিকট দেহ means, ends নয়। দেহের মাধ্যমে তাঁহারা দেহাতীতকে উপলব্ধি করিয়াছেন। মানবদেহ অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির ক্ষুদ্রতম প্রতীক, সকল সত্যের আকর, এই জন্যই দেহের মাধ্যমে একজন অশরীরী বুদ্ধকে, অন্যজন অচিন মানুষকে ধরিতে চাহিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৌদ্ধ সহজিয়াদের গান ও বাউল গান দুই-ই অনন্যকীর্তি। চর্যায় ও দোহায় যাহার সূচনা বাউল গানে তাহার অবলুপ্ত মহিমার শেষ রশ্মিচ্ছটা।

'সই' বনাম 'মনের মানুষ'

বাউলগণ প্রেমমিলনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই প্রেমমিলন কাহার মধ্যে? রাধাকৃষ্ণ—যাহারা চিরন্তন নারী পুরুষের প্রতীক তাহাদের মধ্যে নহে, ইহা যুগল প্রেমের আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া থাকা নহে, কিশোরী ভজন বা পরকীয়া সাধনাও নহে। এই প্রেমমিলন ব্যক্তির সঙ্গে, জাগতিক মানুষের সঙ্গে অনন্ত প্রেমিক ভগবানের মিলন। তাঁহার দেহ অভ্যন্তরে এই মহত্তং পুরুষের অবস্থান। বাউলের ভগবান বিশ্বচরাচর ব্যাপী নহেন, আবার বিশ্বের বাহিরেও নহেন, তিনি একাধারে বিশ্বলীন ও বিশ্বোত্তীর্ণ দুই-ই। মন্দিরে, মসজিদে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, শাস্ত্রের বাণী দ্বারাও তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না, সমাজ-সংসার-শাস্ত্রের অতীত এই ভগবানই বাউলের 'মনের মানুষ'। তাঁহাদের অন্তরের গভীর তলশায়ী মনের মানুষকে বাউল 'সহজ মানুষ', 'অচিন মানুষ', 'সোনার মানুষ', 'ভাবের মানুষ', 'আলেখ মানুষ,' 'সাঁই' প্রভৃতি

১। চর্যাপদ, সং ৩২।
২। হারামণি, সম্পাদক মৌলবী মনসুর উদ্দীন, পদসংখ্যা ৩।

বহু নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই মনের মানুষের মধ্যে বাউল তাঁহার অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। বাঙালীর প্রেমসাধনার ইতিহাসে বাউলের প্রেম সকল সীমায়তিকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। বাউলের দেহ-মন্দিরেই পরম প্রেমময়ের অবস্থিতি, আর বাউল নিজে ভগবানের জন্য চির অপেক্ষমান প্রেমিক। বৈষ্ণবগণ ভগবানের দ্বৈত সত্তায় বিশ্বাসী। রাধাকৃষ্ণ দুই-এর মিলনেই এক, অখণ্ড সত্যের প্রকাশ। বাউল অদ্বৈত সত্তায় বিশ্বাসী। তাহার মনের মানুষ এক ও অদ্বিতীয়—নিজেই নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ। অনেকের মতে বাউলের 'মনের মানুষ' এবং মনের মানুষের প্রতি তাঁহার আত্মলীন প্রেম সুফীধর্মের প্রভাবজাত। সাধকের এই 'অন্তরতম সত্তার' ন্যূনতম পরিচিতি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মধ্যেও পাওয়া গিয়াছে। এই অন্তরতম সত্তাকে তাঁহারা কখনও 'সহজ', কখনও 'পই', কখনও 'বুদ্ধ', আবার কখনও 'অসরিরি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই গভীরতম অনুভূতি সর্বাধিক মুক্তি লাভ করিয়াছে সরহপাদের একটি পদে। প্রাণের অন্তর্নিহিত ভাবের গভীর অনুধ্যানে সাধকের অন্তরে চির-অননুভবনীয় তাঁহার প্রাণ-দেবতারূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই দেবতা কেবল বিশ্বেশ্বর নহেন, কেবল অনন্ত অসীম পরমেশ্বরও নহেন,—তিনি সাধকের প্রাণপুরুষ, তাঁহার প্রিয়তম 'পই' বা পতি—

ঘরেঁ অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেকখই পড়িবেসী পুচ্ছই ॥[১]

প্রিয়তম স্বামীর সহিত সাধকের প্রেম সম্পর্কের আভাস এই পদেও পাওয়া যাইতেছে। বাউল সাধনায় এই 'পই' বা প্রিয়তম 'পতি' সাধকের ব্যক্তিগত ভগবানে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ ভগবানের সঙ্গে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রথম পথপ্রদর্শক এবং আপন অন্তরতম সত্তার সঙ্গে প্রেম সম্পর্কের প্রথম পথিকৃৎও। অবশেষে বাউলের মানসে ও বাচনে সহজাচার্যদের 'পই' বা প্রিয়তম স্বামী 'মনের মানুষ'-রূপে অপূর্ব ও অভাবনীয় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। সহজিয়া আচার্যদের রচিত ভাবনিবিড় এই সমস্ত পদসমূহের[২] উল্লেখ করিয়া ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার সুচিন্তিত

১। Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, C. U., p. 17.

২। ঘরেঁ অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই···দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ন জানই···অসরীর কোই সরীরহি লুককো···ইত্যাদি।

অভিমত প্রদান করিয়াছেন—These and such other verses will supply us with a clue to the tendency of the Buddhist Sahajiyās of conceiving the Sahaja as a Being, who became gradually transformed into a personal God with whom it may be possible to have personal relations. This tendency of the earlier Sahajiyās paved the way for the evolution of the conception of the 'Men of the heart' under the strong say of Sūfī-ism.'[১]

বৌদ্ধধর্ম প্রথমত অনাত্মবাদী ও নিরীশ্বরপন্থীরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে যুগপ্রয়োজনে বৌদ্ধধর্ম আত্মবাদের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। অবশেষে 'বজ্রসত্ত্ব' বা 'শ্রীমহাসুখতত্ত্বে' বজ্রযান সাধনায় 'ঈশ্বরবাদ' স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সিদ্ধাচার্যগণও 'অসরীরি', 'বুদ্ধ', 'সহজ', 'পই' প্রভৃতি অভিধা দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং মানবদেহে তাঁহার অবস্থিতি মানিয়া লইয়াছেন। বাউলের ঈশ্বরও তাঁহার 'মনের মানুষ' তিনি একাধারে বিশ্বলীন ও বিশ্বোত্তীর্ণ। প্রধানতঃ বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবে বাউল মানব শরীরে এই পরমতত্ত্বের অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়াছেন। সিদ্ধাচার্যদের বুদ্ধ, বাউলের—কৃষ্ণ, রাম, হজরত ইঁহারা কেহই ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন, ইঁহারা ভগবানের প্রতীকও নহেন, তাঁহারা অপরূপ ও অপ্রতীম, সর্বব্যাপী ও দেহাতীত চরম ও পরম সত্য। যে পথে ঐতিহাসিক বুদ্ধ মহাযান বৌদ্ধধর্মে দিব্যসত্তায় পরিণত হইয়াছেন, ঠিক সেই পথেই রাম-কৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভৃতি যুগমানবগণও বাউলের গানে পরমতত্ত্বে পর্যবসিত হইয়াছেন।

সহজিয়া বৌদ্ধগণ চরম সত্যরূপে 'সহজ'-এর স্বীকৃতি দিয়াছেন। তাঁহাদের সাধ্য ছিল সহজ আবার সাধনও ছিল সহজ। তাঁহারা যে পথে সাধনা করিয়াছেন তাহাও বক্রপথ নহে—ঋজুপথ। শাস্ত্রপাঠ, ধ্যানধারণা, তন্ত্রমন্ত্রের বাঁকা পথ-পরিহার করিয়া তাঁহারা রূপের মধ্যে অরূপের, ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধান করিয়াছিলেন। এই অরূপ হইলেন 'সহজ', তিনিই অশরীরী বুদ্ধ—দিব্যসত্তারূপী পরমাত্মা। বৌদ্ধ সাধকের একান্ত আকাঙ্ক্ষা—

সহজ

নিঅ মণ মুণহু রে নিউণে জোই।
জিম জল জলহি মিলন্তে সোই ॥[২]

১। Obscure Religious Cults, op. cit, p. 167.
২। Journal of the Department of Letters, op. cit., p 18.

জল যেমন নিঃশেষে জলের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় তেমনি ভাবে 'সহজ'-এর মধ্যে বিলীন হইতে হইবে।

এই বিলীন হইয়া যাওয়ার মধ্যেই মহাসুখ তাহাই 'সহজানন্দ' বা নির্বিকল্প পরমানন্দ। সিদ্ধাচার্য কাহ্নুপাদ অতি সুন্দরভাবে 'সহজ'এর স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—

'ণিস্তরঙ্গ সম সহজ-রূঅ সঅল-কলুস-বিরহিএ।
পাপ-পুণ্ণ-রহিএ কুচ্ছ ণাহি কাণহু ফুড় কহিএ॥'[১]

'সহজ' নিস্তরঙ্গ সর্ব দোষমুক্ত, পাপপুণ্যের অতীত। সম্পূর্ণরূপে ইহা নঙর্থক। প্রাচীন বৌদ্ধদের নির্বাণের সঙ্গে সহজের এইখানে আর কোন তারতম্য নাই। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সহজ বৈষ্ণব সাধনায় আসিয়া এক গুরুতর পরিণতির ইঙ্গিত বহন করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ সহজ-এর উপলব্ধিতে আর এক পদক্ষেপ অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা সহজের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 'সহজ' ও 'প্রেমকে' একাকার করিয়া লইয়াছেন। বৈষ্ণবের সহজ চরম ও পরম প্রেম—যাহা রাধাকৃষ্ণের (বিশ্বের প্রতি নারী ও পুরুষের দেহে যাঁহারা অবস্থান করিতেছেন) যুগল মিলনে প্রতিভাত হইতেছে। বৈষ্ণবের 'সহজ' মানবিক প্রেমের উর্ধ্বগ গতি—মানুষকে দেবত্বে আরূঢ় করা। এই প্রেম ভগবানের জন্য মানুষের চিরজাগ্রত আত্মার ব্যাকুল আর্তি নহে। কিন্তু বাউলগণ সহজকে স্বীকৃতি দিয়াছেন এক শাশ্বত সনাতন, অমর প্রেমিক পুরুষরূপে। এই প্রেমিক পুরুষ তাঁহাদের 'মনের মানুষ'। তাঁহাদের মতে যাহা চরম সত্য তাহাই সহজ, যাহা সহজ তাহাই চরম সত্য। মানুষ আত্মা দ্বারাই সেই সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে। কারণ মানুষের আপন আত্মাতেই সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের গুরুবাদ বাউলধর্মে উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনায় গুরুই একমাত্র পথ প্রদর্শক, ধর্মসাধনার অদ্বিতীয় অবলম্বন। গুরুকে তাঁহারা 'ত্রিরত্ন', এমন কি 'বজ্রসত্ত্ব' রূপেও আখ্যাত করিয়াছেন। চর্যাকারগণও বলিয়াছেন যদি ভবনদী পার হইতে ইচ্ছা কর তবে 'অনুত্তর স্বামী'—সিদ্ধাচার্যের শরণ গ্রহণ কর।[২] 'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সাধনমার্গে গুরুর অপরিহার্যতা

গুরুবাদ

১। Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, C. U., p. 25
২। চর্যাপদ সং ৫।

একটি সুন্দর উপমা সাহায্যে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। যেমন সূর্যকান্তমণি সূর্যরশ্মির সহযোগে ভাস্বর হইয়া উঠে তেমনই শিষ্যের চিত্তরূপ মণিও গুরুর সংস্পর্শে সমুজ্জ্বলতা লাভ করে।[১] বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের ন্যায় বাউলগণও সাধনজীবনে গুরুকে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাউলদের কাছেও গুরুর সম্মান এবং প্রতিপত্তি অপরিসীম। বৌদ্ধ সহজিয়াধর্মে সিদ্ধাচার্যের যে স্থান বাউলধর্মে গুরুর বা মুরশিদের সেই একই মাহাত্ম্য। বাউলের নিকট গুরু কখনও ভগবানের প্রতিনিধি, আবার কখনও স্বয়ং ভগবানও। এছাড়া মাতাপিতা, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু এমন কি স্ত্রী-কন্যাও কখনও কখনও বাউলের হৃদয়ে আলোর দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে। ইহারা সকলেই বাউলের কাছে—সেই পরমগুরুর প্রতিনিধি। এইজন্যই বাউলের কণ্ঠে শুনা যায়—

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ;
তোর অতিথ গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন।
... ... কারে প্রণাম করবি মন ;[২]

বৌদ্ধ সহজিয়াদের ন্যায় বাউলেরাও গুরু নির্বাচনে জাত বিচার করেন নাই। শবরীপাদ, ডোম্বীপাদ যেমন সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করিয়াছিলেন, বাউলেরা তেমনি নীচ জাতীয় ও নিরক্ষর গুরুকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই।

প্রাচীন বৌদ্ধসাধনায় ইন্দ্রিয়সংযম ও ভোগবিরতির উপর জোর ছিল। কামনা ও ভোগতৃষ্ণাকে তাঁহারা সর্বপ্রকারে প্রত্যাহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তান্ত্রিক সাধকদের মতে ইহা প্রকৃতির বিরোধিতা। ইহার ফলে মানুষ স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত রোগীতে পরিণত হয়। অথচ সত্যের আলোকরশ্মি হইতেও তাহারা বঞ্চিত থাকে। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণও অযথা ইন্দ্রিয় নিগ্রহের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়সমূহকে সাধনার সহায়করূপে ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতির সহজ স্বাভাবিক অবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়া তাহার মধ্যে স্থির ও অচঞ্চল থাকিতে হইবে—ইহাই 'সহজ' সাধনা। সিদ্ধাচার্যেরা এই পথকেই বলিয়াছেন উজুবাট বা ঋজুবর্ত্ম। প্রকৃতির বা স্বভাবের বিরোধিতা না করিয়া, ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন না করিয়া তাহাদের

ইন্দ্রিয় নিয়মন—ইন্দ্রিয়সংযম নহে।

১। প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি, বরোদা সংস্করণ, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩০-৩১

২। বাংলার বাউল, ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, পৃঃ ৫৮।

নিয়মন করিতে হইবে—নির্বাণ লাভের ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ। সিদ্ধাচার্যগণ এইজন্যই নিষেধ করিয়াছেন—

উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।
নিঅড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক ॥[১]

বাউল সাধনায়ও যোগমার্গের দুষ্কর প্রক্রিয়ার স্থান আছে কিন্তু ইন্দ্রিয় নিরোধ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-নিয়মনের তাঁহারা অধিকতর পক্ষপাতী। ইন্দ্রিয়-নিয়মনের এই পথ যেমনি কঠিন, তেমনিই দুরূহ। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙালার বাউল ও বাউল গানে' এই সাধনপ্রক্রিয়ার পরিচয় প্রদান করিয়া এই পথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই সাধনায় কাম ও প্রেম, বিষ ও অমৃত, সাপ ও মণি একত্র বর্তমান এবং কৌশলে কামকে পরিত্যাগ করিয়া, বিষকে নাশ করিয়া, সাপকে মারিয়া প্রেমকে, অমৃতকে ও মণিকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং এইরূপে ইহা যে কঠিন সাধন, বহু গানে বহু ভঙ্গীতে তাহা বলা হইয়াছে।"[২]

সাধনপথে ইন্দ্রিয় নিয়মন না করিয়া কোন সাধক যদি ইন্দ্রিয় সম্ভোগে রত হয় তাহার প্রতি বাউলের কঠিন ও চরম পরোয়ানা জারি হইয়াছে—

ভাব না জেনে প্রেমে মজে, যেমন সাপে ছুঁচো ধরে।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—মরতে গিয়ে মরে ॥[৩]

কামের পথে ভোগের পথে যে পরমবস্তু পাওয়া যায় না তাহা বাউলের ভাষাতেই পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন উদ্ধৃত করিয়াছেন—"দেহের কাছে দেহ রাখিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁকে পাই নাই। মধ্যে কামনার বাধা ছিল কিনা। এমনভাবে ১২।১৩ বছর গেল, পাওয়া হইল না। তাহার পর তিনি আমাদের ছাড়িয়া পরলোকে গেলেন। ... ... একদিন হঠাৎ অর্ধ দণ্ডের জন্য তাঁহাকে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমার সব দীপ্ত হইয়া গেল। পরশমণিতে সব লোহা সোনা হইয়া গেল।"[৪]

এইভাবে ইন্দ্রিয়নিয়মনের দ্বারা বৈরাগ্যের নিষ্কলঙ্ক প্রদীপটিকে জ্বালাইয়া রাখিয়া—কামকে প্রেমে, ভোগকে তিতিক্ষায় পরিণত করা এই সাধনা যথার্থই অগ্নিসাধনা। যে সাধক এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে আলোকধারায় তাঁহার

১। চর্যাপদ সং ৩২।
২। দ্রঃ ৪৩৫ পৃঃ, ৩। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ সং, ৪২৮,
৪। বাংলার বাউল, পৃঃ ৫৮,

হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়, আর যে ব্যর্থ হয় অগ্নির লেলিহান শিখা তাহাকে পোড়াইয়া মারে। এইজন্যই এই কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় উপবিষ্ট সাধকের কণ্ঠে শুনা যায়—

যা ছুঁইলে প্রাণে মরি,
এ জগতে তাইতে তরি ;
বুঝে তা বুঝতে নারি,
কি করি তার নাই ঠিকানা।[১]

সাধনপথে নারীর বা প্রকৃতির আবশ্যকতা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনায় যে স্বীকৃতি পাইয়াছে বাউলের নিকট তাহা একেবারে অপরিহার্যরূপে দেখা দিয়াছে। সিদ্ধাচার্য সরহপাদ বলিয়াছেন, যোগিনীর নিবিড় আলিঙ্গনে 'বজ্রধর' উপসন্নতা লাভ করেন—জোইনি গাঢ়ালিঙ্গণহি বজ্‌জিল লহু উবসন্ন। সিদ্ধযোগী কাহ্নপাদও তরুণীর প্রেম ব্যতীত বোধিলাভ অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।[২] সাধনপথে নারীর এই প্রয়োনীয়তা বাউল সাধনায় অপরিহার্যতায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সাধক-সাধিকার যুগ্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বাউলের যোগ-সাধনা পূর্ণতা লাভ করে।

গানের সুরের মধ্য দিয়া অধ্যাত্মসাধনা—অবাঙ্‌মনসোগোচরকে ধরিবার প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে প্রথম চর্যাপদে শুরু হইয়া বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাধকদের গানের মধ্য দিয়া বাউল সাধনায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই দিক

ভাষাভঙ্গী

হইতে বিচার করিলে বাউল গান চর্যাকারদের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করিয়াছে। কেবল তাঁহাদের মানসেই নয়, বাচনভঙ্গীতেও বৌদ্ধ সহজাচার্যদের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণ লক্ষিত হয়। সিদ্ধাচার্যদের ন্যায় বাউলের সাধনতত্ত্ব, আদর্শ ও উদ্দেশ্য গানের সুরে সুরে আভাসিত হইয়াছে। বাউলের গান বাউলের জীবন-বাণী। কারণ সে পাখীর জাত—

আমরা পাখীর জাত
আমরা হেঁটে চলার ভাও জানি না
আমাদের উড়ে চলার ধাত।[৩]

বাংলা সাহিত্যে চর্যার যুগ হইতে সাধক-কবিদের একটা বিশেষ সংস্কার

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদ সং ১৪৬।
২। চর্যাপদ সংখ্যা—১০, ১৮, ১৯।
৩। ক্ষিতিমোহন সেনের বাংলার বাউল, ৬৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত

পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইতেছে নিজেদের ধর্মতত্ত্বকে এবং দুরূহ গুহ্য সাধন-প্রক্রিয়াকে বিশিষ্ট বাচনভঙ্গীর দ্বারা অভিব্যঞ্জিত ও রহস্যময় করিয়া উপস্থাপিত করা। বৌদ্ধ সহজযানী ও বজ্রযানী সাধকেরা এই বিশিষ্ট ভাষারীতিকে—"সন্ধ্যাভাষয়া বোদ্ধব্যম্" বলিয়া লিখিয়াছেন, স্বর্গত শাস্ত্রীমহাশয় সন্ধ্যাভাষাকে 'আলোআঁধারি' ভাষা বলিয়াছেন। ভাষার এই বিশিষ্ট ভঙ্গী চর্যাপদ হইতে শুরু করিয়া নাথ-সাহিত্যকে এবং কতকটা বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যকেও প্রভাবিত করিয়াছে। রূপক ও সাঙ্কেতিকতার মাধ্যমে সাধক কবিগণ তাঁহাদের ধর্মতত্ত্ব, জীবন-অভিজ্ঞতা এবং সাধন-পদ্ধতিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচিত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। রূপক ও সাঙ্কেতিকতার প্রতি এই একাগ্র নিষ্ঠা বাউলগানের রূপাবয়বেও বিধৃত হইয়াছে। বাউল সাধকের জীবন-অনুভূতি ও আত্মলীন উপলব্ধি এবং তাঁহার ধর্মতত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি রূপক ও সাঙ্কেতিকতার আড়ালে সমুচ্ছ্বাসিত হইয়াছে। তাঁহাদের ভাষা ভাবপ্রকাশের বাহন যতটা, ভাব গোপনের সহায়ক তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষায় আপন সাধনতত্ত্ব বিবৃত করিয়া বাউল নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

গোঁসাই পোদোয় কয় ভেবে এবার,
কথা শুনতে চমৎকার,
সাধক বিনে বুঝতে পারে
এমন সাধ্য কার।
কথা যে বুঝেছে, সেই মজেছে,
গিয়েছে সে বেদের পার ॥[১]

বাউলের উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাদের গুহ্যাতিগুহ্য সাধন-পদ্ধতি কেবল তাঁহারাই বুঝিবেন, অন্য কেহ যেন তাহা না বুঝিতে পারে। চর্যাকারের পন্থা ছিল—

কানেঁ বোব সংবোহিঅ জইলা ॥[২]

বাউলের পথও প্রতীক দ্যোতনার দ্বারা পরিমার্জিত ও গুহ্য ইঙ্গিতবহুল। চর্যার গুহ্যার্থ যেমন অধিকারী সংবেদ্য, বাউলের ভাবানুভূতির রহস্যময়তাও তেমনই সাধারণের অবধারণের জন্য নহে। চর্যাগানে যেমন সাধকের ধর্মীয় জীবনের সাধনগত গুহ্যার্থ অনির্বচনীয় রসানুভূতির বাহন হইয়া মননকাব্যে পরিণত হইয়াছে তেমনি বাউলগানেও সাধকের ব্যক্তিগত উপলব্ধি গীতি ঝংকারে বাঙ্‌ময় হইয়া উঠিয়াছে।

১। বাংলার বাউল ও বাউল গান, পদসংখ্যা ১৭২। ২। চর্যাপদ সং ,৪০।

পল্লীগীতিকা ও কথাসাহিত্য

সমাজের নিম্নস্তরের অশিক্ষিত কবির রচনা হইলেও এই পর্যায়ের রচনার মধ্য দিয়া পল্লীবাংলার অবিমিশ্র প্রাণের কথা সর্বাধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে। বল্লালসেন প্রতিষ্ঠিত গৌরীদান এবং গোঁড়া হিন্দুসমাজের আচার-বিচার নিষ্ঠা ও ছুৎমার্গ দোষ পল্লীগীতিকাসমূহকে স্পর্শ করে নাই। ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন সংরক্ষণের দিকেও পল্লীকবির বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা সূচিত হয় নাই। বেনে, সদগোপ, বৈশ্য, ডোম, মুসলমান ও ব্রাহ্মণকুমার এক সার্বজনীন জীবনচর্যার ক্ষেত্রে সমান স্বীকৃতি পাইয়াছে। কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও জাতি-বিচারের অচলায়তন এই পর্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টিকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। ইহার কারণ পর্যালোচনা করিতে হইলে পূর্ব মৈমনসিংহের ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে জানা দরকার। এই অঞ্চলে সেনরাজ প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও কৌলিন্যপ্রথা স্বীকৃতি পায় নাই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই অঞ্চলের ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"তন্ত্রাধিকারের পূর্বে কামরূপে যে হিন্দুধর্মের আদর্শ ছিল, পূর্ব মৈমনসিংহ তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। সেই হিন্দুধর্ম উদার, তাহাতে বৌদ্ধ কর্মবাদ ও হিন্দু নিষ্ঠার অপূর্ব মিশ্রণ ছিল।"[১]

কথাসমূহের রচনাকাল সম্বন্ধেও ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—'পৌরাণিক ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী এবং বৌদ্ধশক্তির পরিণতির সেই যুগে এই সমস্ত গ্রাম্য কথা রচিত হইয়াছিল।[২] এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাথাসমূহের নায়ক-নায়িকা চরিত্রে বৌদ্ধযুগের চারিত্রিক আদর্শ প্রতিফলিত হইবে নিঃসন্দেহে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'বৌদ্ধ-হিন্দুধর্মে নারীর যত রূপ আদর্শ ও গুণ বর্ণিত হইয়াছে মালঞ্চ সেই গুণরাশির সমন্বয়।'[৩] প্রকৃতই গীতিকা ও কথাসমূহে যে চারিত্রিক ঐতিহ্য এবং জাতিভেদের কঠোরতার প্রতি অনাসক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অথবা স্মার্ত অনুশাসন বা বল্লালী কৌলিন্যপ্রথা কোনটারই নিষ্ঠাপূর্ণ উত্তরাধিকার বজায় রাখে নাই। এই নিরক্ষর অজ্ঞাত অখ্যাত কবিগণ হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। সমাজের

১। মৈমনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভূমিকা পৃঃ।৵০
২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩৫৬, পৃঃ ৪৩।
৩। ঐ, পৃঃ ৪৮।

ঊর্ধ্বস্তরে স্বতঃ-বিনষ্টির প্রভাবে যাহা অপচয়িত হইয়াছে সর্বধর্ম-নিরপেক্ষ মানবিক জীবনবোধের মহত্তম্ উদ্‌গাতা পল্লীকবিদের কণ্ঠে তাহাই অমরতা অর্জন করিয়াছে।

ডাক ও খনার বচন

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করিয়াছেন এই পর্যায়ের রচনাসমূহ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের চর্যাপদ রচনার যুগে—খৃঃ অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছে। এইজন্য স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন এই রচনাসমূহকে, 'হিন্দু-বৌদ্ধ' চিহ্নিত সাহিত্যশ্রেণীতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তানুযায়ী বাংলা দেশে বৌদ্ধ প্রভাবের যুগে ইহা রচিত হইয়াছে। বাংলাদেশের প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী এই ছড়া ও প্রবচনসমূহ গুপ্তযুগে বিক্রমাদিত্যের সভায় রচিত। খনা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন জ্যোতির্বিদ বরাহের পুত্রবধূ এবং মিহিরকুলের পত্নী। এই অনুমান সত্য হইলে খনার বচন চর্যাপদেরও বহু পূর্বে রচিত। কিন্তু ইহার ভাষা এই অনুমানের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য বহন করে। পাল অথবা গুপ্ত যে যুগেই রচিত হউক বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এই ছড়া ও প্রবাদ বচনরূপ শুক্তি ডাক ও খনার নামের আড়ালে রচিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতাগণ কেবল আপন পরিচয়টুকু মুছিয়া দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই তাঁহাদের আধিভৌতিক শুভবুদ্ধি সমাজ জীবনে মাঙ্গলিক পথও নির্দেশ করিয়াছে। এই প্রবচন ও ছড়াসমূহে কোন দেবতার শরণ বা কৃপা প্রার্থনা করা হয় নাই। ধর্মবুদ্ধি দ্বারা নহে, কেবল মানুষের কল্যাণবুদ্ধি দ্বারা তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদের অনুশাসনের বাণী দেবদ্বিজে ভক্তি নহে, ব্রত-পূজা অর্চনা নহে, যাগযজ্ঞ উপাসনা নহে—মানুষের প্রয়োজনে পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষরোপণ, অন্নদান, মন্দির প্রতিষ্ঠা, স্বর্ণ ও ভূমিদানকে স্বর্গারোহণের প্রধান পাথেয়রূপে ঘোষিত হইয়াছে—

ধর্ম করিতে যবে জানি।
পোখারি দিয়া রাখিব পানী॥
গাছ রুইলে বড় কর্ম।
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম॥
যে দেয় ভাত শালা, পানী শালী
সে না যায় যমের বাড়ী

স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান
বলে ডাক স্বর্গে স্থান ॥[১]

এই উপদেশাবলী মহামতি সম্রাট অশোকের জনকল্যাণকর কাজের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়।

খনা ও ডাকের জীবনকাহিনী কিংবদন্তী ও ঘন কুহেলিকার যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত। খনা সিংহলী রাজকন্যা এবং উজ্জয়িনীবধূ হইয়াও কেন বাংলা ভাষায় ছড়া রচনা করিলেন তাহা বলা দুঃসাধ্য। 'ডাক', 'ডাকিনী' শব্দের পুংলিঙ্গ। ডাকিনীগণ বৌদ্ধতন্ত্রের সাধিকা, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না বর্ষিয়সী মহিলা। সুতরাং 'ডাক'ও তন্ত্রোপাসক এবং অপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী হওয়াই সম্ভব। ডাকার্ণব গ্রন্থেও 'ডাক'-এর উল্লেখ রহিয়াছে। 'বজ্রডাক' বজ্রযানপন্থী সাধনমার্গে সিদ্ধ আচার্য। এই পর্যায়ের রচনার স্রষ্টা 'ডাক' এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য 'ডাক' দুই অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বলা শক্ত। তবে পরবর্তী বৌদ্ধধর্মের ভোগাসক্তি এবং ইহজীবন ও আত্মসুখসর্বস্বতার রেশ ডাকের বচনেও পাওয়া যায়। যথা—

ভাল দ্রব্য যখন পাব।
কালিকারে তুলিয়া না থোব ॥
দধি দুগধ করিয়া ভোগ।
ঔষধ দিয়া খাণ্ডাব রোগ।
বলে ডাক এই সংসার।
আপনা মইলে কিসের আর ॥[২]

এই ইহকাল সর্বস্ব ভোগসুখের বর্ণনায় বৌদ্ধধর্মের অবনতির যুগের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে।

১। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ৫২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।
২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২ হইতে উদ্ধৃত।

দ্বিতীয় খণ্ড

আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগের প্রস্তাবনা

ঐতিহাসিক ফলশ্রুতির দিক হইতে বিচার করিলে আধুনিক যুগ বৌদ্ধধর্মের একটি স্পষ্ট পরিণাম-পরিচয়কে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতেছে বৌদ্ধ-ধর্মের অবলুপ্তি। এই অবলুপ্তির কারণ সম্বন্ধে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের সুচিন্তিত অভিমত—'On the philosophic side the disciples of the great Master dashed themselves against the eternal rocks of the Vedas, and could not crush them, and on the other side they took away from the nation that eternal God to which every one, man or woman, clings so fondly. And the result was that Buddhism had to die a natural death in India.'[১]

বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির কারণ যাহাই হউক, এই অবলুপ্তি বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি, বৌদ্ধদর্শনের নহে। যথার্থই বৌদ্ধধর্মের অবনতি—একটি পরিবর্তনের ধারা, অবক্ষয় নহে। যুগ চাহিদায় ও অন্যধর্মের চাপে বৌদ্ধধর্ম এই পরিবর্তনকে স্বীকৃতি জানাইয়াছে। ভারতীয় মননধারার প্রগতির পথে বৌদ্ধধর্ম আপন ভস্মশয্যায় নূতন নূতন মনন ও চিন্তাধারাকে স্বাগত জানাইয়া আত্ম অবলুপ্তি ঘোষণা করিয়াছে। এই আত্ম-অবলুপ্তিতে বা আত্মবিসর্জনে ভারতীয় মননধারা আরো গতিশীল ও সুসমৃদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এই অবক্ষয়কে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংস না বলিয়া বলা উচিত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন আপন অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দিয়াছে এবং অবশেষে বৌদ্ধচিন্তন ও ধর্মাদর্শ এই দেশ হইতে চিরবিদায় লইয়াছে। কিন্তু চিরবিদায় লইয়াও এই ভাবধারার সত্যসূর্য এই দেশের লোকহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। অন্তঃসলিলা ফল্গু-ধারার ন্যায় এদেশের শিরায় শিরায় তাহার আলোকরশ্মি এখনও প্রতিভাত হইতেছে। নবযুগের পটভূমিকায় সেই ঐতিহ্যকে চিনিয়া লইয়া আর পৃথক্ করিয়া প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। বাঙালীর ধর্মে, কর্মে, চিন্তায়, উপাসনায় তাহা অন্তর্লীন অবস্থায় রহিয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়,

১। Swami Vivekananda, Chicago addresses, Advaita Ashrama, 1961, p-40.

ইহার বিনাশ নহে—নবরূপান্তর মাত্র। বৌদ্ধধর্ম নবযুগের আলোকে পরিস্রুত হইয়া ভারতীয় সনাতন ধর্মের অক্ষয় বটবৃক্ষের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্মের অন্তঃস্রোত সনাতন ধর্মের প্রবল স্রোতধারায় সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একাত্ম হইয়াছে। ভারতীয় চিন্তাধারায় যাহা সত্য, যাহা নিত্যকালের সম্পদ্ মানুষ যুগে যুগে আপন বক্ষপুটে যাহাকে রক্ষা করিয়াছে তাহাই ভারতীয় সনাতন ধর্ম। যুগসত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া নিত্যকালের সম্পদ্‌কেই সনাতন ধর্ম আপন অঙ্গে বরণ করিয়া লইয়াছে। চিন্তাশীল সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

'ভারতবর্ষ যে মরে নাই, আজিও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। আজিও সেই ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির সজীবতা ও অমোঘতা, অসাধারণ কবিশক্তির বিকাশে, নবধর্ম প্রচারক অবতারকল্প পুরুষের আবির্ভাবে অথবা রাষ্ট্রীয় কর্মসাধনার এক নূতন মন্ত্রদৃষ্টিতে নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে। এ সকলের মধ্যে সেই এক ভারতীয় প্রতিভাই—সেই যাজ্ঞবল্ক্য, সেই কৃষ্ণ-বুদ্ধের বাণীই নূতন ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পুরাতনের এই নূতনরূপে আবির্ভাব—যুগের আঘাতে এমন করিয়া সাড়া দেওয়া—ইহারই নাম বাঁচিয়া থাকা। ইহাই সত্য, ইহাই সনাতন।'[১] এই সনাতন ধর্ম সত্যানুসারী, সর্বাশ্রয়ী ও সর্বকালীন। যুগযুগান্তরের আবর্তসঙ্কুল কালপ্রবাহে এই শাশ্বত সত্য চিরস্থির ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় বিরাজমান। ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার এই বিকাশের পথে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-কোন ধর্মের মহত্তম আদর্শই উপেক্ষিত হয় নাই। কালপ্রবাহে বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বরবাদ, অনিত্যতা ও দুঃখবাদ প্রভৃতি জীবনবিমুখী তত্ত্ব অপসৃত হইয়াছে কিন্তু যাহা সর্বমানবের কল্যাণকামনায় সদা উন্মুখ সেই বোধিসত্ত্ব মতবাদ, মৈত্রীকরুণা ও সার্বভৌম প্রেমের বাণী টিকিয়া গিয়াছে। কারণ এই আদর্শ কেবল যুগোত্তীর্ণই নয়, ভারতীয় ঋষিগণ সর্বকালের মানবজাতির জন্য যে তপশ্চারণ আরম্ভ করিয়াছিলেন ইহা তাহারই পরিপূর্ণ মহিমার প্রকাশ।

বৌদ্ধধর্মের যে মহত্তম নীতি এ যুগের সৃষ্টিকর্মকে প্রেরণা জোগাইয়াছে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইতেছে। বিশ্বমৈত্রীর গঙ্গোত্তরী ধারায় শাক্যসিংহ বুদ্ধের প্রাণপদ্ম পূর্ণবিকশিত হইয়াছিল। মৈত্রীকে সর্বপ্রসারিত করিয়া দিতে হইবে এই আকাঙ্ক্ষা ভারতবর্ষের চিরযুগের বাণী। জগজ্জ্যোতি বুদ্ধের দেশনা—

১। বাঙলার নবযুগ, পৃঃ ৩৫।

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।[১]

অর্থাৎ—মাতা যেমন নিজের আয়ুদ্বারা একটিমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীর প্রতি সেইরূপ অপরিমিত মানস রক্ষা করিবে। এমন মৈত্রীর পরিচয় বিশ্ববাসী পূর্বে কখনও পাইয়াছে কি? পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথ ও পাথেয়ের সন্ধানে যুগ যুগ ধরিয়া এই মহত্তম আদর্শ মানুষকে প্রেরণা জোগাইতেছে। সকল গণ্ডীর সীমানা উত্তীর্ণ হইয়া, সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানের লৌহযবনিকা উন্মোচন করিয়া বৌদ্ধধর্মের যে বাণী আজ চলমান কালের বক্ষে গাঁথা হইয়া আছে তাহা সেই বোধিসত্ত্বের কম্বুকণ্ঠ নির্গত—

আকাশস্য স্থিতির্যাবদ্ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ।
তাবন্মম স্থিতির্ভূয়াৎ জগতদুঃখানি নিঘ্নতঃ॥
যৎ কিঞ্চিৎ জগতোদুঃখং তৎসর্বং ময়ি পচ্যতাম্।
বোধিসত্ত্বশুভৈঃ সর্বং জগৎ সুখিতমস্তু॥

অর্থাৎ—যতদিন আকাশ বা জগৎ থাকিবে ততদিন আমিও বর্তমান থাকিয়া যেন জগতের দুঃখ দূরীভূত করিতে পারি। জগতের যত দুঃখ তাহা যেন আমাতেই বর্তায়। আর বোধিসত্ত্বের শুভ কাজের দ্বারা সমস্ত জগতের লোক সুখী হউক। 'কারণ্ডব্যূহ' গ্রন্থে পাওয়া যায়—অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব সুমেরু শৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া গভীর ধ্যান সমাধি দ্বারা নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি অনন্ত শূন্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এমন সময় চতুর্দিক বলয় কম্পিত করিয়া এক গভীর আর্তনাদ উঠিল। বোধিসত্ত্বের অন্তকরণে শোকের ছায়াপাত হইল। তিনি আবার ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং জানিলেন এই শোকবিলাপ সেই জাগতিক মানুষের যাহারা পরমকারুণিক অবলোকিতেশ্বরকে তাহাদের দুঃখের ত্রাণকর্তা-রূপে বরণ করিয়াছিল। আজ তাঁহার নির্বাণলাভে তাহারা নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। অবলোকিতেশ্বর সেই বেদনাহত শরণাগতদের দুঃখে গভীর ব্যথা অনুভব করিলেন। অবশেষে বহুজন্মের বহু সাধনায় করায়ত্ত পরমসিদ্ধিকেও উপেক্ষা করিয়া সর্বমানবের কল্যাণ কামনায় বোধিসত্ত্ব ব্রতই তিনি বরণ করিয়া লইলেন।[২] এইভাবে আপন আত্মোদ্ধারের পথ চিরতরে রুদ্ধ করিয়া ব্যথিত

১। মেত্তসুত্ত, সুত্তনিপাত, ed. Anderson and Smith, P. T. S, p. 26।
২। B, Bhattacharya, An Introduction to Buddhist Esoterism, 1932, p. 29,

হৃদয়ের ব্যাকুল আবেদনে তিনি সাড়া দিয়াছেন। এইখানেই মানবিকতার প্রথম উদ্ভব। পরন্তু মানুষের হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে অবলোকিতেশ্বর নামিয়া আসিলেন—অবনতনয়নে, দুর্গত মানবের দিকে তাঁহার পূতস্নিগ্ধ অভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। আত্মৈকমুক্তির পথ মানবিকতায় পরিণত হইল। অবলোকিতেশ্বর ঈশ্বর নহেন, বুদ্ধও নহেন, সুতরাং ইহা তাঁহার করুণার দান নহে—প্রেমের, মৈত্রীর, সেবার পথে ইহা তাঁহার দুঃসাধ্য যাত্রা। ইহাই মনুষ্যত্বের পূর্ণতম পরিণতি। বোধিসত্ত্বের এই মহত্তম জীবনবেদ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মানসকে শুধু মুগ্ধই করে নাই, প্রভাবিতও করিয়াছে।

সম্রাট অশোকের জীবনসাধনা কেবল এই যুগের বাংলাসাহিত্যের রূপাবয়বেই অমর স্বীকৃতি লাভ করে নাই, অনাগত যুগের সাহিত্যকে মাঙ্গলিক পথও নির্দেশ করিতেছে। অশোকের অনুশাসন লিপিতে প্রজা সেবাব্রতী সর্বজীবহিতানুকম্পী অশোকের যে চিত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে এই যুগের জীবনীকার, নাট্যকার, প্রবন্ধকারগণ তাহার পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়াছেন। পালনৃপতি ধর্মপাল, শিলাদিত্য, হর্ষবর্ধন এবং রাজা কনিষ্ক ইঁহারাও বাংলা সাহিত্যে অমর আসন লাভ করিয়াছেন। এইখানেই শেষ নহে, বৌদ্ধধর্মের চিরাচরিত আচার বিরোধিতা উনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ বাঙালী মানসে আপন উত্তরাধিকার বজায় রাখিয়াছে। ইংরেজ আক্রমণে পরাধীন হতমান জাতি শোকে দুঃখে ব্যথায়, অভাবে, অভিযোগে যখন ত্যাগ-বৈরাগ্যের দ্বারা অভিষিঞ্চিত হইয়াছে তখনও সে মাঝে মাঝে বুদ্ধদেবের পথে আত্মোদ্ধারের কথাই ভাবিয়াছে। বুদ্ধদেবের উদাত্তবাণী এইভাবে নূতন কালপরিবেশে নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অবশ্যই মহামন্বন্তরের ঘূর্ণ্যাবর্তের মধ্যে পড়িয়া বহু সম্পদ্ অপচয়িত হইয়াছে, বহু ধারা মরুভূমির কালগ্রাসে শুকাইয়া গিয়াছে, তথাপি যেটুকু রক্ষা পাইয়াছে তাহাই জাতির প্রাণে সত্যের দীপবর্তিকা প্রজ্বলিত রাখিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর সাধনায় ও চৈতন্যে যে নবজাগৃতি দেখা দিয়াছে তাহার উৎসমূলে ইংরেজী শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বেশী অথবা চিরন্তন ভারতীয় আদর্শের প্রভাব বেশী তাহাও বিচার করিতে হইবে। বাহিরের এক প্রবল আঘাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতি হঠাৎ আপনার আরাম শয্যা ছাড়িয়া আত্মশক্তিলাভের জন্য নিজের সঞ্চিত ভাণ্ডারের কাছে ভিখারী শিবের ন্যায় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। অতীত ভারত দেবী অন্নপূর্ণার ন্যায় অবারিত প্রদানে নবীন ভারতের দেহমনপ্রাণে নব-উদ্দীপনমন্ত্র সঞ্চার করিয়া

তাহার স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাধীন বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। রামমোহন, ভূদেব, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ভারতের সেই দানের অমৃত সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল। প্রাচীন ভারতের মহিমময় অন্নপূর্ণা মূর্তি তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে ভারতে যে মানবতাবাদের স্ফুরণ ঘটিয়াছে যদিও তাহা পাশ্চাত্ত্য জাতির কঠিন আঘাতে জাগ্রত তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই মানবতাবোধ ভারতের নিজস্ব, পরের কাছে ধার করা জিনিস নয়। বিদেশী আক্রমণে, শাসনে ও শোষণে জর্জরিত হতমান জাতি একদা আশার আলোর সন্ধানে ভারতের অতীত ইতিহাসের দ্বারে ভগীরথের ন্যায় কঠিন সাধনায় রত হইয়াছিল। এই সাধনার সিদ্ধিরূপেই বাংলার তথা ভারতের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়া আসিয়াছে। বাংলার এই নবযুগের সাধনায় যে বৌদ্ধ ঐতিহ্য বাঙালী মনীষাকে রসপ্রেরণা জোগাইয়াছে তাহা বৌদ্ধধর্মের আচার বা সংস্কার নহে, বৌদ্ধধর্মের বৈরাগ্য, দুঃখবাদ অনিত্যবাদের দানও নহে। বৌদ্ধ দর্শনের ত্যাগ ও প্রেম, সেবা ও আত্মদান করুণা ও মৈত্রীই সেই নবজাগরণের মহতী অনুপ্রেরণা। শতাব্দীর আলোক-স্তম্ভসমূহের কর্মকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে আধুনিক যুগের নূতন জীবনধারায় জাতির নিয়তি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহার মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবধারা বা পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ভাবধারা অধিকতর অথবা পূর্বযুগের মনীষীদিগের সাধনালব্ধ জীবনমন্ত্রের প্রভাব অধিকতর।

যে কয়েকটি গ্রন্থি বাঙালী সংস্কৃতিকে দৃঢ়পিনদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাহার অন্যতম। যে প্রাণশক্তির বলে বাঙালী ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে তাহার মূলে তাহার সজীব প্রাণবত্তা, চিন্তনশক্তি এবং বিশ্বজনীন মনোভাব যাহা পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার বা অতি আধুনিক চিন্তাধারার প্রভাবজাত নহে। ইহা বাঙালীর সেই গ্রহিষ্ণু মনোভাব যাহাদ্বারা সে তাহার প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবহেলা না করিয়া সেই সঞ্চিত পুণ্যকেই দীপ-বর্তিকা করিয়া লইয়াছে। কেবল বাঙালীর আচরণেই নয় মননে ও সৃষ্টিকর্মেও বুদ্ধদেব, বুদ্ধশিষ্য আনন্দ, বৌদ্ধরাজা অশোক, হর্ষ, ধর্মপাল প্রভৃতি বিরাট পুরুষকারগণ নাটকীয় চরিত্র বা পাত্রের স্থান অধিকার করিয়া কালের সীমানা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া কালের ঘূর্ণাবর্তে এবং ধর্ম-বিরোধ ও সংঘাতের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মহতী পরিণামের অভিমুখী হইয়াছেন তাহাতে প্রমাণিত হয় বাঙালীর চিন্তা ও মানসপ্রকৃতিকে

তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কতখানি পরিতৃপ্ত করিয়াছে। বাঙালীর জীবনে বহু আঘাত আসিয়াছে, তাহার সমাজে ও ধর্মে বহু আলোড়ন দেখা দিয়াছে, ভাবজীবনে ও চিন্তাধারায় বহু দ্বন্দ্ব বিরোধ ঘটিয়াছে কিন্তু সত্যের দীপ-বর্তিকাটিকে সে তাহার মানসদুর্গের সুদৃঢ় আশ্রয়ে চিরপ্রজ্বলিত রাখিয়াছে। এইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীতে সারা ভারতে যে নবজাগরণের যজ্ঞানল প্রজ্বলিত হইয়াছে বাঙালী তাহাতে পৌরোহিত্যের পদে অভিষিক্ত হইয়াছে।

বাংলার নবযুগের সাধনায় মানুষই শ্রেষ্ঠ—মানুষই মহনীয় ও বরণীয়। তাহার মধ্যেই ভগবানের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। সুতরাং ভগবানের জন্য কেবল দীর্ঘ তপশ্চরণ করিলে চলিবে না, মানুষের মহিমাই মানুষকে উপলব্ধি করিতে হইবে। মানুষকে বিশ্বাসই আত্মবিশ্বাস, তাহাতে মানুষের আত্মা জাগ্রত হইবে—ইহাই যুগমানব বিবেকানন্দের বাণী। মোহগ্রস্ত জাতির দেহে এই জিয়নকাঠির পরশ আবশ্যক হইয়াছিল। এই মহাপ্রাণের অতলে অবতরণ করিয়া সমগ্র জাতি তাহার আত্মার ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিয়া নিজেকে পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের জীবনে মহাপ্রেমের আকিঞ্চনে দিক দিক হইতে জনগণ আসিয়া শুভ ও সিদ্ধির পন্থাকেই দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া লইয়াছিল। ইঁহারা যেন সেই বোধিসত্ত্ব যাঁহারা দীর্ঘতপশ্চরণের পর আপন করতলগত সিদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া কোন মহতী প্রেরণায় সর্বমানবের মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা ভারতের সেই অনির্বাণ দীপশিখা, যাঁহারা তামসী রজনীর ভ্রূকুটিকে ভয় করেন নাই। বোধিসত্ত্বের জীবনবাণী তাঁহাদের অন্তরে প্রেরণা জাগাইয়াছে। তাঁহাদেরও জীবনবাণী—

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগোরে সকল দেশ॥

নবযুগের মহামানব মহাত্মা গান্ধীর আধ্যাত্মিক আদর্শ অহিংসার ও মৈত্রীর আদর্শ। ইহা জৈন অহিংসা ও বৌদ্ধ মৈত্রীর সমন্বয়। বৈরাগ্য, উপবাস ও তপশ্চরণকে জীবন-প্রদীপ করিয়া তিনি পথ চলিয়াছেন। গীতার অনাসক্ত কর্মবাদকে তিনি সংশোধন করিয়া অহিংসা মন্ত্রের বাহন করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী এবং শ্রীঅরবিন্দের সাধনমন্ত্রেও মানুষের সেই অমৃত-পিপাসা এবং মানবকল্যাণে আত্ম-বিনিয়োগ—এই দুই-এর যুগ্মবেণী রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধযুগের সেই অনির্বাণ দীপশিখার আলোকরশ্মি ইঁহাদের জীবনেও

প্রতিফলিত হইয়াছে। রামমোহন বাংলার নবযুগের অগ্রদূত। উনবিংশ শতাব্দীর মহত্তম আদর্শ মানবকল্যাণের বাণীর তিনিই প্রথম উদ্গাতা। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী তাঁহাকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছে, ভারতীয় চিন্তাধারার বিশ্বজনীন ভাব এবং সর্বপ্রসারিত মৈত্রীও তেমনি তাঁহাকে উদ্বোধিত করিয়াছে। আধুনিক সমালোচকগণ রামমোহনের উপর ফরাসী বিপ্লব ও বেন্থামের হিতবাদ এবং খৃষ্টধর্মের মানবিকতার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিতে অভ্যস্ত, কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারার বিশ্বতোমুখী ভাব ও তত্ত্বের প্রভাব ভাবিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি ভারতীয় ধর্মনীতিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির আলোকে বিচার করিয়াছেন। নরের মধ্যে নরোত্তমের প্রতিষ্ঠাই নবযুগের সাধনা। রামমোহন সেই সাধনপথের যাত্রী। এইজন্য আপন মুক্তির জন্য পর্বত গুহায় বা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিবার উগ্র তপস্যার পথ তাঁহাকে তৃপ্তি দেয় নাই। সমাজ ও দেশের কল্যাণে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তিনি বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়াছেন। তাঁহার উদার মানবিকতা, প্রচণ্ড সংস্কার-বিরোধিতা, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য খোলসের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং বিশ্বমৈত্রীর প্রতি গভীর আসক্তি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ভাবনার নিবিড় পরিচয়বাহী। মহামনীষী বিদ্যাসাগরের অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের ন্যায় বজ্রবৎ পৌরুষের মধ্যেও সেই চিরন্তন আচার-অনুষ্ঠান-বিরোধিতার ধারাবাহিকতা বজায় রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, পরকাল, দেবদেবী বন্দনা বিরোধিতায়[1] সেই নিদর্শন পাওয়া যায়। মানবতাবাদের একনিষ্ঠ পূজারী বিদ্যাসাগরের জীবনে ও কর্মে গভীরতম হৃদয় সংবেদনার পরিচয় রহিয়াছে। আবার যেখানেই কোনপ্রকার সামাজিক অন্যায় অবিচার ও কুপ্রথা দেখিয়াছেন সেখানেই তিনি কঠোরতম পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তত্ত্বদর্শী ভূদেব ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। তপশ্চারী সনাতন ভারতের মর্মবাণী তাঁহাকে যাহা শাশ্বত ও শুভ তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় প্রণোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহারথী বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্যের সাধনা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রতীচ্য যুক্তিবাদের প্রতি অনুরক্তি দুই সমভাবে পোষণ করিতেন। বিশ্বমৈত্রী, মানবপ্রেম ও পশুপ্রীতি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য

১। বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৪৮—৪৯, ৫১৩—১৪।

আনুপূর্বিক অনুসরণের ফলেই তিনি লাভ করিয়াছিলেন। মহামনীষী বঙ্কিম তাঁহার জীবনব্যাপী উপলব্ধিকে শুধু প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিচার, ইতিহাস ও দর্শনের সাক্ষ্য দ্বারা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি উদাসীন শাক্যসিংহের বৌদ্ধ-ভারত অপেক্ষা তান্ত্রিক ভারতের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। বঙ্কিমের সমাজ-সেবা মানবপ্রীতির কষ্টিপাথরে পরিমার্জিত। তাঁহার কাছে জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ ও জীবন সত্য, মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি তাঁহার 'অনুশীলন ধর্ম'। তিনি সন্ন্যাসধর্মের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ভাষায়—'খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন কৌপীনধারী নির্মম ধর্মবেত্তা"। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের অনিত্যতা, দুঃখবাদ ও শূন্যবাদ প্রভৃতি তত্ত্বের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, এইজন্য বৌদ্ধ-ধর্ম আলোচনায় তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মতে,—বৈদিক ধর্মে আনন্দ আছে, কিন্তু সতের ও চিতের—জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব রহিয়াছে। উপনিষদে জ্ঞানের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু আনন্দাংশের অভাব ঘটিয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্মেও আনন্দের অভাব আছে। এই জন্যই ইহারা স্থায়ী হয় নাই। তিনের—বেদ, উপনিষদ ও বৌদ্ধ ধর্মের সারাংশে গঠিত হিন্দুধর্মে সৎ, চিৎ ও আনন্দের ত্রিবেণী সঙ্গম হইয়াছে বলিয়া ইহাই জাতীয় ধর্মের গৌরব ও মহিমা অর্জন করিয়াছে। যুগনায়ক বঙ্কিম যুগ-প্রয়োজনে বুদ্ধদেব ও চৈতন্যের অহিংসা, করুণা ও ক্ষমার আদর্শ অপেক্ষা দুষ্ট দমনকারী, ধরিত্রী উদ্ধারকারী শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের শত্রু-মিত্রে সমদর্শন এবং সর্ব-প্রসারিত মৈত্রীকে আপন অন্তরে দর্শন করিয়াছিলেন। এই জন্যই সাধক বঙ্কিমের কণ্ঠে শুনা যায়—'যে আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য হইব কেন?'

অন্যত্র—'সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।' ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব বঙ্কিমের অন্তকরণে ভোগ ও ত্যাগ, শক্তি ও প্রেম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সংসার ও সন্ন্যাস সর্ব বৈষম্য ও বৈচিত্র্য পরিহার করিয়া সমন্বিত ও নির্দ্বন্দ্ব রূপ পাইয়াছে। এবং ইহা কেবল তাঁহার মনন ও আচরণেই নয়, তাঁহার সাহিত্যকর্মেও প্রতিফলিত হইয়াছে।

যুগ-প্রবৃত্তির অনুসরণে এ যুগের মহামনীষিগণ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া অনন্তকালের বক্ষ হইতে তাহাকে উদ্ধারের

দুষ্কর চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল বৌদ্ধধর্মের পচনশীল পুরাতন শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, বৌদ্ধধর্মের যে অমরনীতি ও আদর্শ নানা ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতের মধ্য দিয়া বাঙালীর তথা ভারতবাসীর শোণিতধারায় ক্ষণে ক্ষণে অন্তরঙ্গ দোলা লাগাইয়া যায় তাহারও যথার্থ মূল্যায়ন করিয়াছেন। এই কার্যে সার্থকব্রতী জ্ঞানভিক্ষু রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনিই বিদগ্ধ বাঙালীর দৃষ্টি বৌদ্ধযুগের গৌরবান্বিত অধ্যায়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার সুগভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার রচিত 'নেপালী বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য' প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থের প্রতি তাঁহার অসীম কৌতূহল এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন। তিনি 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থ এবং তাহার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় কেবল বৌদ্ধভারত অন্ধকারের আবর্ত হইতে আলোর স্পর্শই লাভ করে নাই, বাঙালী জাতিও সেই প্রাচীন মুকুরে আপন আত্ম-পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। রামদাস সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিগণও এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যদিও ইঁহারা কেহই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নহেন, তথাপি বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী, করুণা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি নীতি তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। নবযুগের মুক্ত অঙ্গনে দাঁড়াইয়া ইঁহারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বুদ্ধের প্রতি তাঁহাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গদ্যসাহিত্য

বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভবের যুগ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ও সংস্কৃতির বিপর্যয় এবং অবক্ষয়ের স্বাক্ষর বহন করে। উদ্ভবযুগের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই সেই বিলুপ্তির ছাপ প্রতীয়মান। চণ্ডীদাসের 'চৈত্যরূপ-প্রাপ্তি' এবং রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ বৌদ্ধপ্রভাবিত গ্রন্থ। শূন্যপুরাণের বাংলা প্রথম বাংলা গদ্যের গৌরবোজ্জ্বল আসন অধিকার করিয়াছে। শূন্যপুরাণের গদ্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে লিখিত।[১] 'বিশ্বকোষ' বাংলা প্রাচীন গদ্য গ্রন্থের যে তালিকা দিয়াছে তাহাতে বহু প্রাচীন রাগাত্মিকা দেহতান্ত্রিক সহজযানী বৌদ্ধগ্রন্থ স্থান পাইয়াছে। সুতরাং বাংলা গদ্যের 'অন্ধকারময় যুগ'ও ক্ষীণভাবে বৌদ্ধ ঐতিহ্য দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে।

বাংলা গদ্যের উদ্ভব

অক্ষয়কুমার দত্ত

ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানস্পৃহা জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমার দত্তকেই সর্বপ্রথম প্রণোদিত করিয়াছিল। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' তাঁহার গবেষণাকার্যের বিপুল কীর্তিস্তম্ভ। এই গ্রন্থে ১৮২টি উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ আছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও তাঁহার আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্ম এবং সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা গভীর পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তির পরিচয়বাহী।

তিনিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যে বৌদ্ধ ইতিহাস ও পুরাবৃত্তের পর্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন। লেখক 'বুদ্ধাবতার' প্রবন্ধে বুদ্ধের জীবনী ও কর্মকৃতি, বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ, তন্ত্রাশ্রিত বিকৃত বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য ও পরিণাম অতি প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মমতের তুলনা, অশোকের জীবনকাহিনী, শিলাদিত্যের দানোৎসব, বৌদ্ধসম্প্রদায় ইত্যাদি আলোচনায় গভীর অধ্যয়ন ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় মনীষী

১। শূন্যপুরাণের গদ্য— সচল অচল সৃষ্টি সৃজিলেন গোসাঞি ভকত-বৎসল। সুবর্ণের কোদাল রূপার বাঁট। মহাদেব কুদালেন স্বর্গমর্ত্ত পাতাল। জটার কূলে পেলেন নীর। সে নীর লইয়া দসমন্ড গতি বাখানি।—শূন্যপুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৪৮—১৪৯।

ও চিন্তানায়কদের বৌদ্ধপুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার আলোয় তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয়কে বহুল তথ্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য করিয়াছেন। বৌদ্ধদের বহু দেবদেবী পূজা, অস্থি কেশ দন্তাদি অর্চনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন—'বৌদ্ধরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারই করুন, আর অন্য অন্য নানা বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিপ্রাখর্যই প্রকাশ করুন, কিন্তু অনেকানেক নিকৃষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের ন্যায় পৌত্তলিক হইয়া রহিয়াছেন বলিতে হইবে।'[১] হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পারস্পরিক ঋণ তিনি অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন। খৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্মের বহু বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আলোচনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন 'যদি গুরুশিষ্য সম্বন্ধাধীন ঐরূপ সৌসাদৃশ্য সংঘটিত হইয়া থাকে তবে বৌদ্ধকে গুরু ও খৃষ্টধর্মকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।'[২] টিপ্পনী অংশের 'অশোকের নাম পিয়দসি', 'পৌত্তলিকতা পরিত্যাগী বৌদ্ধ', 'স্তূপ ও মানসিক স্তূপ', 'গয়া' প্রভৃতি আলোচনা যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর। সমগ্র আলোচনার মধ্য দিয়া লেখকের সত্যসন্ধানী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

যুক্তিবাদী চিন্তাশীল লেখক ভূদেবের মন হিন্দুধর্মের মহনীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। তাঁহার মতে বুদ্ধদেব সাম্যবাদী ছিলেন না, বৌদ্ধধর্মের ব্রাহ্মণ্য বিরোধিতার জন্যই বুদ্ধদেবকে সাম্যবাদী বলিয়া প্রচার করা হয়। তিনি লিখিয়াছেন—'বুদ্ধদেব খৃষ্ট বা মহম্মদের সম স্তরের সাম্যবাদী নহেন। কারণ—বুদ্ধদেব সামাজিক সাম্যের কোন কথাই বলেন নাই, প্রত্যুৎপূর্ব জন্মার্জিত কর্মফলে ক্রমোৎকর্ষ এবং ক্রমাবনতির নিয়ম স্বীকার করিয়া মানুষের মধ্যে সামাজিক উৎকর্ষাপকর্ষের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।'[৩] ভারতের ধর্মবিপ্লবের জন্য তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘকে দায়ী করিয়াছেন। তাঁহার মতে বুদ্ধদেব—'সংঘ বা আত্মসম্প্রদায়কে নিরতিশয় ভক্তি এবং প্রীতি করিতে শিক্ষা দেন……সেই একমাত্র ছিদ্রদ্বারেই ভারতবর্ষের যাবতীয় ধর্মবিপ্লবের স্রোত বহিয়া আসিয়াছে।'[৪] হিন্দু ও বৌদ্ধ এবং খৃষ্ট ও মহম্মদের ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত

১। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় সং, ১৩১৪, পৃঃ ২৮৬।
২। ঐ, পৃঃ ২৯১।
৩। সামাজিক প্রবন্ধ, ১৩২৮, পৃঃ ৮৭।
৪। ঐ, পৃঃ ১৮০।

করিয়াছেন।—'মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ যীশু ও মহম্মদের দৃষ্টির সীমানা, জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ বৌদ্ধদিগের সীমানা। সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্যধর্মের সর্বোচ্চ আসন—আর্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরে আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন।'[১]

ব্রাহ্মণ্যধর্মের তেজোদ্দীপ্ত মনীষা ও প্রতিভাদীপ্ত পাণ্ডিত্য দ্বারা তাঁহার গবেষণাকর্ম গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হইলেও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য বুদ্ধদেবের মহনীয় আদর্শ তাঁহাকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নানাচিন্তা' গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আলোচনা স্থান পাইয়াছে। তাঁহার আলোচনাসমূহ বৌদ্ধধর্মে তাঁহার গভীর অনুধ্যান ও শ্রদ্ধাবোধের পরিচায়ক। এই গ্রন্থের 'সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধে লেখক বুদ্ধদেবের নাস্তিক অপবাদ অপনোদন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বুদ্ধদেব তৎকালীন লৌকিক প্রথা, কুসংস্কার এবং যাগযজ্ঞাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনার আলোয় ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র জাতীয় বন্ধনের সীমানা পরিহার করিয়া এক সর্বলৌকিক ও সর্বকালিক ধর্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। অবশেষে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করার জন্য বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে চিরনির্বাসিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব এবং যীশুখৃষ্ট দুই জনের প্রবর্তিত ধর্ম সর্বলৌকিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুই প্রবর্তকের পরিণতিও প্রায় এক। বুদ্ধদেব বেদোক্ত ধর্মের বিরোধিতার বাণী প্রচার করিয়া চিরনির্বাসিত আর যীশুখৃষ্ট কৃত্রিম ধর্মীয় শাসনের শৃঙ্খল উন্মোচন করিতে গিয়া ক্রুসে নিহত। 'আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত' প্রবন্ধে লেখকের ক্ষুরধার মেধার ও যুক্তিধর্মী মননশীলতার সমন্বয় ঘটিয়াছে। লেখকের মতে বুদ্ধদেব ছিলেন পৃথিবীর সর্বোচ্চশ্রেণীর ধর্মবীরদের মধ্যে অন্যতম। মহাভারতের সময়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-প্রভাব, এবং যাগযজ্ঞের বাহুল্য দেখা দেয়। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়ার যুগে দেব-প্রসাদের পরিবর্তে আত্মপ্রভাবের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। তিনি সার্বজনীন ধর্মের প্রবর্তক। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়দমন, এবং দুঃখের মূলোচ্ছেদই শ্রেয়ঃ পথ। এই পথেই নির্বাণমুক্তি। ঈশ্বর বিষয়ক প্রশ্নে তাঁহার নীরবতার

১। সামাজিক প্রবন্ধ, পৃঃ ২৬৪, উপসংহার।

জন্যই পরবর্তী বৌদ্ধগণ নাস্তিকতা প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের জীবনব্যাপী সাধনা অহিংসা, দয়া, সত্যপরায়ণতা, অব্যভিচার, সদাচার এবং শুদ্ধাচারের প্রতি সর্বজাতির, সর্বসাধারণের হৃদয়কে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি মৌন রহিলেন এবং মানুষের পুরুষকার এবং অনাদি কর্মকে ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহারই পরিণতিস্বরূপ পরবর্তীকালে বৌদ্ধগণ একাধারে নিরীশ্বরবাদী, দেববিরোধী অথচ মনুষ্যপূজা ও মূর্তিপূজার আদি প্রবর্তকরূপে দেখা দেয়। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধগণ ঈশ্বরারাধনার ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য বুদ্ধকেই ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেন। কিন্তু এইখানেই সমস্যার শেষ হইল না। কারণ বুদ্ধদেব মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, জাগতিক দুঃখ ভোগ করিয়া ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন হইয়াছেন সুতরাং তাঁহার ঈশ্বরত্ব গ্রহণীয় নয়। অবশেষে অনিত্যতাদোষ খণ্ডনের জন্য মনুষ্যবুদ্ধের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক জগতে তিন শ্রেণীর দেবতাবুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিল। প্রথম শ্রেণীতে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ, তৃতীয় শ্রেণীতে বজ্রপাণি আদিবুদ্ধ। আদিবুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ তিনিই নিত্যবুদ্ধ—ক্লেশ ও বাসনার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত অনাসক্ত পুরুষ। বৌদ্ধদিগের বজ্রপাণি আদিবুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য মৃত্যুঞ্জয় শূলপাণি মহেশ্বর সমস্তরের। বৌদ্ধ চতুর্থস্তরে বা সর্বোচ্চস্তরে নির্বাণমুক্তি। এইখানেও বৌদ্ধগণ থামিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ্যধর্মে ঈশ্বর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তাঁহারাও বলিলেন, "চারিধ্যানী বুদ্ধ আসলে একই বুদ্ধ—কেবল উপাধি ভেদে বিভিন্ন। আদি-বুদ্ধ ঈশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 'বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর নাই—কিন্তু ঈশ্বর চাই'[১] —ইহাই বৌদ্ধদিগের আত্মার পিপাসা। এই পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধনে কিভাবে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম 'সেশ্বর' হইয়াছে লেখক মনননিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনার সাহায্যে তাহা উপস্থাপিত করিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের ভ্রষ্ট উপশাখারূপে তন্ত্রের আবির্ভাব, পঞ্চ কামোপভোগের দ্বারা সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টা ও তাহার চরম পরিণতি এবং শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবধর্মে বৌদ্ধপ্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্লেষণধর্মী মননের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ বুদ্ধকে এবং বৌদ্ধদর্শনকে আপন প্রাণসত্তায় নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 'নানাচিন্তা' গ্রন্থের বৌদ্ধবিষক আলোচনা সেই আত্মবীক্ষণ ও আত্মোপলব্ধির বাহন হইয়াছে।

১। নানাচিন্তা, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১২২।

রামদাস সেন

প্রাচীন ভারতীয় পুরাতত্ত্বের অনুশীলন রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথমে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়বস্তু ইংরাজীতে লিখিত ছিল। ডঃ রামদাস সেনের বহুদর্শন মনীষাও বাংলা ভাষায় ভারতীয় পুরাতত্ত্বের অনুশীলনে প্রয়াসী হইয়াছিল। ভারতের ও বাংলার পুনর্জাগরণের জন্য তাহার প্রাচীন ঐতিহ্যের গবেষণার আবশ্যকতা দেখা দেয়। তাঁহার গবেষণাকার্যের মধ্য দিয়া হতচেতন বৌদ্ধযুগ উজ্জ্বল ও মহামহিম হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনায়[১] লেখক বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের একটি তথ্যসমৃদ্ধ ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারত ইতিহাসের ইহা সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ—পাণ্ডবগণ অথবা আর কোন নৃপতির রাজত্বে ভারতবর্ষ উন্নতির এত উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারে নাই। বৌদ্ধযুগের বাণী তাঁহার শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আগামীযুগের নূতন সম্ভাবনার দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছে। সেই প্রদীপের দীপ্যমান শিখায় তিনি বৌদ্ধযুগকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। 'বৌদ্ধধর্ম'[২] প্রবন্ধে রামদাস বুদ্ধদেবের একটি তথ্যবহুল জীবনী রচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের নজিরে শ্রীবুদ্ধের নাম, ললিতবিস্তর এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনায় লেখকের অনুসন্ধিৎসা এবং গভীর অনুধ্যানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে নেপাল হইতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় বহু বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ উদ্ধার করা হইয়াছিল। লেখক হজসন সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত অষ্টসাহস্রিকা ইত্যাদি নবধর্মগ্রন্থ, দ্বাদশ গ্রন্থ—সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ ইত্যাদি এবং আরো কতকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের তালিকা দিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের ঐতিহ্য লেখকের হৃদয়ে গৈরিক দীপ্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। তিনি কৃষ্ণমিশ্র, মাধবাচার্য, প্রভৃতি বৌদ্ধ বিদ্বেষীর প্রচারিত ঘৃণিত ও বিকৃত বৌদ্ধধর্মের নিন্দা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আলোচনায় লেখকের বক্তব্যের স্পষ্টতা ও যুক্তির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে গভীর হৃদয়ানুরাগ, স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও সমবেদনা উদ্বেলিত হইয়াছে। 'বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচনা'[৩] প্রবন্ধেও বৌদ্ধদর্শন আলোচনা করিতে বসিয়া লেখক প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় যাহা তত্ত্ববিৎ কাণ্ট ও কোমৎকেও প্রভাবিত করিয়াছে এবং পৃথিবীর আদিমতম

১। রামদাস গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, ১৯০১, পৃঃ ১-১৩।
২। ঐ, পৃঃ ১৬৭।
৩। ঐ, পৃঃ ২২৩।

সুসভ্য জাতি গ্রীকদিগকেও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল সেই বিগত দিন তাঁহাকে শোকসন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। লেখকের সমন্বয়ধর্মী মনোভাবের পরিচয়ও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে বুদ্ধদেব বেদবিরোধী নহেন, বেদের নীতিবিশেষের ভ্রান্তত্বে বিশ্বাসী। তিনি হিংসাশূন্য যজ্ঞের অনুমোদন করিয়াছেন—শাক্যসিংহের জীবনী ললিতবিস্তর অবলম্বনে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। রামদাসের মতে বৌদ্ধ নির্বাণমুক্তি এবং বৈদিক ঋষির মুক্তি একই। ত্রিপিটকের ভাষা ও পিটকের অন্তর্গত গ্রন্থাবলীর যথাযথ বিভাগও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। 'পালি ভাষা ও তৎসমালোচনা'[১]-প্রবন্ধে সুপণ্ডিত রামদাস পালিভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন এবং কচ্চায়ণ, বালাবতার, মৌদ্‌গল্যায়ন ব্যাকরণ, বুত্তোদয়, ধাতুমঞ্জুষা এবং অভিধানপ্পদীপিকা প্রভৃতি পালি ব্যাকরণ, ছন্দ, ধাতুপাঠ এবং অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচিতি প্রদান করিয়াছেন। মহাবংশ, দীপবংশ প্রভৃতি সিংহলদেশীয় পালি ইতিবৃত্ত ডাটাবংশ জাতক, খুদ্দক পাঠ, এবং ধম্মপদ বিষয়ে তথ্যও প্রদান করিয়াছেন। 'বুদ্ধের দন্ত'[২] প্রবন্ধ মহাবংশ ও ডাটাবংশ প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী বুদ্ধদন্তের অলৌকিক কাহিনী ও ইতিবৃত্ত। বৌদ্ধ 'জাতক গ্রন্থ'[৩] প্রবন্ধে জাতকের পরিচিতি প্রদান এবং দশরথ জাতকের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়া রামদাসের গভীর যুক্তিনিষ্ঠা এবং সংস্কৃত, বৌদ্ধ-সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌদ্ধধর্মের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধাবোধের পরিচায়ক তাঁহার 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কেবল বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শনের প্রতি লেখকের গভীর অনুরাগই প্রতিফলিত হয় নাই, দীর্ঘ অনুশীলনের স্বাক্ষরও চিহ্নিত হইয়াছে। একটি গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের সম্যক্ পরিচয় প্রদানের প্রচেষ্টা বাংলা ভাষায় এই প্রথম। ঈশ্বর, আত্মা, জন্মান্তর ইত্যাদি সমস্যার আলোচনায় বুদ্ধদেবের নেতিবাচক উত্তর অথবা নীরবতা দ্বারা প্রমাণিত হয় বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদী। লেখকের মতে বুদ্ধের লোকপ্রিয়তার কারণ এই ধর্মের সার্বভৌম উদার সহজ প্রাঞ্জল গ্রাম্য ভাষায় প্রচার, সময়োপযোগী প্রসঙ্গ, সুযৌক্তিক, সুবোধ্য,

১। রামদাস গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, ১৯০২, পৃঃ ২৩৯।
২। রামদাস গ্রন্থাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৫।
৩। ঐ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৯।

প্রাণস্পর্শী মধুর ভাষণ এবং বুদ্ধদেবের মনোমুগ্ধকারী অপূর্ব মোহিনী শক্তি। এই গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ ললিতবিস্তর, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, পালি মহাবগ্‌গ, জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধসাহিত্যের উপাদান দ্বারা বুদ্ধদেবের তথ্যনির্ভর একটি চরিতাখ্যান রচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শন, নীতি, পরকাল ও নির্বাণ আলোচনা করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন—ধর্ম ও মানব-জীবনে, ঈশ্বরের আবশ্যকতা অস্বীকার এবং তাহার পরিণাম 'অঙ্গহীন' বৌদ্ধধর্মের নির্বাসন। 'বৌদ্ধধর্ম সাধনের ধর্ম, তাহাতে ভজনের কোন ব্যবস্থা নাই, এই হেতু বৌদ্ধধর্ম অঙ্গহীন। এই কারণে কালসহকারে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্মের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা জানাই আছে; তাহার জন্মভূমি এই ভারতভূমি হইতে তাহার বহিষ্কার হইবার কারণও এই।'[১] নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্মের আরো একটি ভয়াবহ পরিণতির উপর তিনি আলোকপাত করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধগণ বুদ্ধেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন। অদূর ভবিষ্যতে বৌদ্ধ বিহারে, মন্দিরে সর্বত্র অসংখ্য দেবদেবী প্রতিষ্ঠা পায়। দেবপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া আত্মসাধনের কঠিনতর পরিণাম বৌদ্ধধর্মকে কালিমালিপ্ত করিয়া দেয়। অবশেষে তন্ত্রের আবির্ভাবে বীভৎস ক্রিয়াকাণ্ড প্রাধান্য পায়। মহাযান বৌদ্ধধর্ম বাঁচিবার তাগিদে উপনিষদ এবং বেদান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া লয়। বৌদ্ধ চৌতলা মন্দিরের নির্বাণমুক্তি এবং বৈদান্তিক তুরীয় অবস্থা এক ও অভিন্ন। বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ, সঙ্ঘের নিয়মাবলী, দীক্ষাদানবিধি—ত্রিশরণ মন্ত্র, দশশীল, মস্তকমুণ্ডন, ত্রিচীবর ধারণ প্রভৃতি কোসাম্বীর ভিক্ষুগণের বিবাদ, সঙ্ঘে দলাদলি এবং তাহার পরিণাম, সঙ্ঘে প্রবেশ ও নির্গমন, ভিক্ষুদের আহার, বাসস্থান, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের উপাদানে তথ্যনিষ্ঠ হইয়াছে। বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রায়শ্চিত্ত বিধান প্রাতিমোক্ষ অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মে পূজাবিধি, বৌদ্ধ তীর্থসমূহ—কপিলাবস্তু, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর ইত্যাদি এবং অম্বপালী, বিশাখা, সুজাতা, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা প্রভৃতি মহীয়সী স্থবিরা রমণীগণও তাঁহার আলোচনায় বাদ পড়ে নাই। বৌদ্ধগৃহস্থ বা উপাসকদের কর্তব্য—দান, সৌজন্য, দয়া, দাক্ষিণ্য গুরুজনে ভক্তি পালি সিগালবাদ সুত্তের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে ও প্রবন্ধে বুদ্ধের উপদেশ সংগ্রহ, সিংহলী রাজা ভট্টগামণি ও পালি ত্রিপিটক প্রণয়ন, মিলিন্দপ্রশ্ন, মহাবংশ, দীপবংশ, ললিতবিস্তর,

১। বৌদ্ধধর্ম, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৩০, পৃঃ ৬৯।

পালিভাষা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় লেখকের পালি, বৌদ্ধ-সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ইতিহাসে গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর'-প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের ঘনিষ্ঠতা, বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে একীকরণ প্রচেষ্টা অবশেষে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব এবং শেষ পরিণতির সমস্যাসঙ্কুল বিষয়বস্তু অতি সহজভাবে আলোচিত হইয়াছে। অশোক, হর্ষবর্ধন, গ্রীকরাজ মিলিন্দ, রাজা কনিষ্ক এবং চিকিৎসক জীবক, অর্থকথার লেখক বুদ্ধঘোষের জীবন-কাহিনী প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোয় রচিত। সিংহল, তিব্বত, চীন এবং মার্কিন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারও তাঁহার আলোচ্য বস্তুর অন্তর্গত হইয়াছে। কেন বৌদ্ধধর্ম আপন মাতৃক্রোড়চ্যুত হইয়া বিদেশে প্রবাসী হইয়া পড়িল? সে কি শুধুই ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল অত্যাচারে? লেখক এই অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছেন। এই আলোচনায় তাঁহার কোনরূপ সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ পায় নাই, তীক্ষ্ণ বিচারনৈপুণ্যদ্বারা লেখক সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে—'বেদাচারবিরুদ্ধ সঙ্ঘের স্বতন্ত্র গঠন-প্রণালী হইতেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের সাংঘাতিক বিরোধের সূত্রপাত।'[১] এই বিরোধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতে-ছিল। তথাপি বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক বলপূর্বক ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবয়বে স্বীয় অস্তিত্ব বিলীন করিয়া ক্রম ক্ষীয়মান হইতে হইতে অবশেষে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের উৎপীড়ন বা অত্যাচার বৌদ্ধধর্মের মূলোৎপাটনের প্রকৃত কারণ নহে, ইহা স্থানীয় সাময়িক অত্যাচারমাত্র। বৌদ্ধধর্ম ভারতভূমি হইতে চির নির্বাসনের যে কারণসমূহ তিনি নির্দেশ করিয়াছেন তাহা যুক্তিবহ এবং প্রামাণিক। শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আদান প্রদান এবং পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার ফলে বৌদ্ধধর্ম বিকৃত, রূপান্তরিত অবশেষে ইহাদের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহাছাড়া বৌদ্ধধর্ম ছিল দুঃখবাদী এবং নিরীশ্বরবাদী সাধনপ্রধান ধর্ম—নির্বাণই তাহার চরম ও শেষ লক্ষ্য। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঈশ্বরবাদ, দেবপ্রসাদ এবং ভজন, পূজা-অর্চনা, স্বর্গ-নরক কল্পনা বৌদ্ধধর্মে স্থান পাইয়াছে। আবার বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি—প্রেম, মৈত্রী, অহিংসা, দয়া, বর্ণবিচার বর্জন প্রভৃতিকে

১। বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৯।

স্বীকৃতি প্রদান করিয়া বৈষ্ণবধর্ম আপন গৌরব বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছে, বৌদ্ধতীর্থক্ষেত্র—বুদ্ধগয়া, জগন্নাথধাম প্রভৃতিকে আপন করিয়া লইয়াছে এবং বুদ্ধদেবকে করুণার প্রতিমূর্তিরূপে বরণ করিয়া বিষ্ণুর দশাবতারের মহত্তম আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত হয় নাই—ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেহে বৌদ্ধধর্ম ক্রম বিলীন হইয়া গিয়াছে। লেখক বৌদ্ধধর্মের বিলোপের আরো বহু কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় তাহা উদ্ধৃত হইল—'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান, হিন্দু আচার্যদিগের বুদ্ধি ও যুক্তিবল প্রয়োগ, মুসলমান অত্যাচার, বৌদ্ধধর্মে ভজনপূজনের অনাদর, বেদাচারে অনাস্থা, অনাত্মবাদ, শূন্যবাদ, মন্ত্রতন্ত্র, ভূত-প্রেত-পিশাচ সিদ্ধি ইত্যাদি তান্ত্রিক কাণ্ডের প্রবেশ-জনিত আদিম ধর্মের অশেষ দুর্গতি, হিন্দু-সমাজে সঙ্ঘ-নিয়ম-প্রণালীর অনুপযোগিতা, উদ্বাহ বন্ধনের শৈথিল্য—এইত বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসের অনেকগুলি কারণ মনে হইতেছে।'[১] বেদান্ত ও উপনিষদের ব্রহ্ম এবং বৌদ্ধ-ব্রহ্মার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন 'আর্যধর্মে প্রকৃতিপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ মঞ্চে এক ব্রহ্মের উপাসনায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছে।'[২] কিন্তু বৌদ্ধধর্মে এই বৈদান্তিক ব্রহ্মোপাসনার ভাব গৃহীত হয় নাই। বৈদিক দেবদেবীগণ বৌদ্ধধর্মে—সাধু-পুরুষ, ভিক্ষু ও অর্হতের স্থানমাত্র পাইয়াছেন, ইঁহারা সকলেই মরণশীল, তবে সাধনবলে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন এবং কালক্রমে হয় ত বৌদ্ধ অর্হত্ব স্তর পর্যন্ত উপনীত হইতে পারেন মাত্র। বৈদান্তিক ব্রহ্মাও ইহার বেশী গৌরবের অধিকারী হইতে পারেন নাই। পালি গ্রন্থের ধনিয় সুত্ত এবং তেবিজ্জসুত্তের অনুবাদ এই গ্রন্থের গৌরব আরো বৃদ্ধি করিয়াছে।

বিবেকানন্দ

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক স্বামীজীর সমগ্র আলোচনার মধ্য দিয়া তাঁহার অনমনীয় ব্যক্তিত্বের নির্ভীক প্রকাশ ও সংশয়মুক্ত প্রাণের গভীর সত্যানুভূতির সন্ধান পাওয়া যায়। যুগ কল্যাণের আহ্বানে স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া সমদর্শী ঋষির ন্যায় হিন্দু-বৌদ্ধধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। স্বামীজী বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধচিন্তাধারার সমন্বয় প্রয়াসী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া স্বামীজীই

১। বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৭।
২। ঐ, পৃঃ ৩২৪।

সর্বপ্রথম হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতীয় ধর্ম-সমন্বয়ের অধিকতর সহায়ক হইবে উপলব্ধি করিয়া ঔপনিষদিক উদার দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা তিনি তাঁহার বিশিষ্ট চিন্তাধারা দ্বিধাহীন চিত্তে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। স্বামীজী বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম-নিরপেক্ষ, পৃথক্ একটি ধর্মরূপে মনে করেন নাই, সনাতন ধর্মেরই এক সম্প্রদায় বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বিপুল বিরাট্ কলেবরের একটি সমগ্র সত্তার খণ্ডিত অংশমাত্র। উপনিষদ বৌদ্ধধর্মের বীজ দীর্ঘকাল ধারণ ও পোষণ করিয়াছে, অবশেষে 'যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙিয়া সরল কথা চলিত ভাষায় খুব ছড়িয়েছিলেন।'[১] সিংহলে অনুষ্ঠিত 'পাব্লি প্রদর্শনীতে' স্বামীজী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন—ভারতবর্ষে প্রবর্তিত বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মমতের উদ্ভব বেদ হইতে। সকল ধর্মতত্ত্বের বীজ *বেদেই* নিহিত আছে। এই বীজই পরবর্তীকালে উন্মীলিত ও বিস্তৃত হইয়া বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষের মহান্ চিন্তানায়কগণের ন্যায় স্বামীজীও বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরাবতাররূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'শাক্যমুনি নূতন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। যীশুর মত তিনিও পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই।'......'তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত—ন্যায়সঙ্গত বিকাশ।'[২] তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত বুদ্ধদেব ভারতীয় চিন্তাধারার স্বাভাবিক পরিণতি। বেদের ও উপনিষদের অন্তর্নিহিত সত্যকে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি নূতন কোন ধর্ম প্রচার করেন নাই, নূতন কোন পথও প্রদর্শন করেন নাই। যীশুখৃষ্ট যেমন ইহুদী জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বুদ্ধদেবও তেমনি হিন্দুই ছিলেন। স্বামীজীর মতে বুদ্ধদেব উপনিষদেরই প্রবক্তা ছিলেন এবং সেই ভাবধারার উত্তরপুরুষ ছিলেন। বুদ্ধ-পূর্ব ভারতে চার্বাক দর্শনের জড়বাদের অত্যন্ত প্রসার ঘটিয়াছিল। বুদ্ধদেবের কণ্ঠে সেই প্রাচীন ভাষায় উপনিষদের বাণী পুনরুদ্গীত হইয়াছিল। সেই দৃপ্তকণ্ঠের বজ্ররবে ভারতবর্ষ হইতে জড়বাদ বিদূরিত হইয়াছিল। উপনিষদের প্রাণবস্তু ত্যাগ-বৈরাগ্য, বুদ্ধদেবের জীবন সেই ত্যাগ বৈরাগ্যের জীবন্ত বিগ্রহ। বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী বৈরাগ্য ও বিষয়বিতৃষ্ণা হিন্দুধর্ম

১। জন্মশতবর্ষ স্মরণে : বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১৪।
২। ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০-৩১।

সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। বুদ্ধদেবের পূর্বে যাহা কেবল তত্ত্বাকারে উপনিষদের সীমানায় গণ্ডীবদ্ধ ছিল, বুদ্ধের জীবনে সেই সত্যকে স্বামীজী বন্ধনমুক্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাচীন ঋষির উপলব্ধ সত্যকে যিনি প্রথম স্বীয় জীবনে প্রতিপালন করিয়া সর্বমানবের কল্যাণকর্মে নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন বুদ্ধদেব তাঁহাদের অগ্রণী পথপ্রদর্শক।

বুদ্ধদেবকে স্বামীজী হিন্দুধর্মের অন্যতম সংস্কারকরূপেও বরণ করিয়াছেন।[১] বৈদিক যজ্ঞে ও পূজানুষ্ঠানে আড়ম্বরপ্রিয়তা ও পশুবলি নিবারণ, বংশগত পৌরোহিত্য প্রথা ও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরোধিতা এবং ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্বে অনাস্থা আনয়ন করিয়া যুগসংস্কারক বুদ্ধদেব সর্ববন্ধনমুক্ত মানুষের স্বাধিকার ঘোষণা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সাধনায় গীতার নিষ্কাম কর্মসাধনাকেও তিনি পরিস্ফুট দেখিয়াছেন। বুদ্ধদেব যেন গীতার নিষ্কাম কর্মের অনবদ্য প্রতীক। কৃষ্ণ ও বুদ্ধ প্রাচীন ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষকার—দুইজনেই ক্ষত্রিয় ও কর্মযোগী। নিষ্কাম কর্মযোগের প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ যেন পরবর্তীযুগে শ্রীবুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রতিপাদিত তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়ণ করিয়াছেন। গীতায় উপদেশিত তত্ত্ব—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥[২]

এই মহান্ তত্ত্ব বুদ্ধদেবের জীবনে কিভাবে রূপায়িত হইয়াছে স্বামীজী তাহা অতি সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—বুদ্ধদেব নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। কোনপ্রকার অভিসন্ধির বশে অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তিনি কর্মানুষ্ঠান করেন নাই। কেবল সর্বজীবের কল্যাণবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই আদর্শকর্মযোগীর জীবনব্যাপী কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সাধক ও মনীষিগণ আত্মমুক্তি কামনায় ঈশ্বর অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব কেবল পরের মুক্তির জন্য কর্ম করিয়াছেন। গীতার নিষ্কাম কর্মযজ্ঞের এত বড় হোতা ভারতবর্ষে আরএকজনও জন্মায় নাই। গীতা তত্ত্ব, বুদ্ধ সেই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ। গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের শিক্ষা তাঁহার জীবনে চরম পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তিনি শ্রীবুদ্ধের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

১। জন্মশতবর্ষ স্মরণে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২২৩
২। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, ২য় অধ্যায়, সাংখ্যযোগ, শ্লোক সংখ্যা—৪৭।

স্বামীজী বৌদ্ধধর্মকে যেমন উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন তেমনি শঙ্করাচার্যের মতবাদকেও বৌদ্ধধর্মদ্বারা প্রভাবিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ'-রূপে মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মতে বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণীতে উপনিষদের নীতি এবং শঙ্করাচার্যের আদর্শে উপনিষদের জ্ঞান প্রাধান্য পাইয়াছে। বুদ্ধদেব এক মহৎ সার্বজনীন হৃদয়ের অধিকারী, তাঁহার সহিষ্ণুতা অনন্ত। বেদান্তের আদর্শকে তিনি সর্বজনকল্যাণে নিয়োগ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য নিস্পৃহ জ্ঞানতাপস—বেদান্তের বাণীকে 'অসাধারণ ধীশক্তি' এবং 'প্রখরযুক্তির আলোয়' তিনি ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিলেন। বুদ্ধ বেদান্ত নীতির বিশ্লেষক, শঙ্কর তাহার সংশ্লেষণ ও সমন্বয়কারক। ভবিষ্যৎ যুগের জন্য স্বামীজী চাহিয়াছেন বুদ্ধ ও শঙ্করের অপূর্ব সমন্বয়। তাঁহার মতে এই সমন্বয় যদি সাধিত হয় তবে তাহা 'মণিকাঞ্চন' সংযোগ হইবে। তিনি বিশ্বাস করেন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিবাদের ফলেই ভারতবর্ষের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতিতে, হৃদয়বত্তায় ও মৈত্রীপ্রতিষ্ঠায়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বৈশিষ্ট্য ধীশক্তিতে, মননে ও দর্শন শাস্ত্রে। এই দুই-এর সমন্বয়ে উন্নত ও মহান্ ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। যুগমানব বিবেকানন্দ উদাত্তকণ্ঠে ধর্ম-সমন্বয়ের উদার বিস্তৃতির নীচে বৌদ্ধ ও জৈনদের আহ্বান জানাইয়াছেন—'আমরা তাঁহাদের গ্রহণ করিতে অনায়াসে প্রস্তুত। কারণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে যে বৌদ্ধধর্মের সারভাগ ঐ সকল উপনিষদ হইতে গৃহীত। এমন কি বৌদ্ধধর্মের নীতি, তথাকথিত অদ্ভুত ও মহান্ নীতিতত্ত্ব কোন-না-কোন উপনিষদে অবিকল বর্তমান'।[১]

বিবেকানন্দের আলোচনায় সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন প্রতিপাদিত হইয়াছে তেমনি প্রাচীন বৌদ্ধ-ভারতের অভিনব গৌরবোদীপ্ত রূপও প্রতিভাত হইয়াছে। হিন্দুবৌদ্ধধর্মের অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক বিষয়ে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় ছিল না। হিন্দুধর্মকে জননী, বৌদ্ধধর্মকে কন্যাসদৃশা বলিয়া তিনি যে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এই স্থলে তাহা উদ্ধৃতি-যোগ্য—'তিনি মহীয়সী ও প্রেমময়ী জননী, তাই তিনি চিরকালের জন্য

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২১

তাঁহার অবতারগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা বীরহৃদয়—মহামহিম বুদ্ধাবতারকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন।'[১]

হিন্দুবৌদ্ধধর্মের এই সম্পর্ক নির্ণয় কেবল তত্ত্বগর্ভ দার্শনিক বিচার নহে। এই আলোচনায় যুক্তির সুতীক্ষ্নতা ও সূক্ষ্মবিচারের জটিলতা অপেক্ষা অন্তরঙ্গ-ভঙ্গী ও আবেগবাহুল্যের পরিচয় অধিকতর। যাঁহারা অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রতি রক্তপেশীর, প্রতি অস্থিমজ্জার হিসাব-নিকাশ মিলাইতে বসেন বিবেকানন্দ সেই স্তরের সমালোচক নহেন, এইজন্য হিন্দু-বৌদ্ধধর্মের বিচিত্র বহুমুখিন প্রকাশের মধ্যেও তিনি এক মিলন ও সমন্বয়ের সুরই ধ্বনিত শুনিয়াছেন।

স্বামীজী বৌদ্ধধর্মকে ভারতে মূর্তিপূজা প্রবর্তনের জন্য দায়ী করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 'বুদ্ধকর্তৃক সগুণ ঈশ্বরভাবকে ক্রমাগত আক্রমণের ফলেই ভারতে প্রতিমাপূজার সূত্রপাত হল। বৈদিক যুগে প্রতিমার অস্তিত্বই ছিল না। তখন লোকে সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করত। কিন্তু বুদ্ধের প্রচারের ফলে জগৎস্রষ্টা ও আমাদের সখা ঈশ্বরকে হারালাম, আর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রতিমাপূজার উৎপত্তি হল। লোকে বুদ্ধের মূর্তি গড়ে পূজা করতে আরম্ভ করল।'[২] মহাদেবের উপর যৌনকল্পনার প্রয়োগ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাবজাত। বেদের সংহার-দেবতা রুদ্র 'অচল অবস্থায় পতিত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে' যৌন সম্পৃক্ততা লাভ করিয়াছে। আবার বৈষ্ণবধর্মের জাতিবিচারহীন সার্বজনীন প্রেমও বৌদ্ধঐতিহ্যের স্মারকবাহী। স্বামীজী বিশ্বাস করেন বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মকে বিনাশ করিতে চাহেন নাই, তিনি প্রচলিত সমাজব্যবস্থাও ভাঙিবার প্রয়াসী ছিলেন না। কেবল বুদ্ধদেব একদল ত্যাগী সাধুকে একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে সুগঠিত করিয়াছিলেন। কতিপয় ব্রহ্মবাদিনী নারীকে সন্ন্যাসিনীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আর যজ্ঞবেদীর স্থলে সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রতিমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন।[৩] যজ্ঞে অগণিত প্রাণীবধ এবং গোহত্যা নিবারণ বুদ্ধদেবের অন্যতম কর্মকৃতি। তাঁহার প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে মদ্যপান ও প্রাণী-হত্যার বাহুল্য হ্রাস পাইয়াছিল।

১। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ভগিনী নিবেদিতা, অনু: স্বামী মাধবানন্দ, উদ্বোধন, পৃঃ ২৭৫।

২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৪।

৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯।

নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের কয়েকটি মৌলিক তফাত এবং বিরোধিতাও মনীষী বিবেকানন্দ অনুধাবন করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মে জগৎ দুঃখময়, সমস্ত সুখ ও আনন্দই ক্ষণভঙ্গুর—কেবল ভ্রম। হিন্দুধর্ম এই ক্ষণভঙ্গুর দুঃখময় মায়ার জগতের মধ্যেও সত্যের সন্ধান করিয়াছে। হিন্দুধর্মে সমস্ত ক্ষণভঙ্গুর জাগতিক সত্যই এক মহান্ শাশ্বত সত্যে উপনীত করাইয়া দেয়। এইজন্য অতি নগণ্য মাংসবিক্রেতা ব্যাধ যাহার সমগ্র জীবন কেবল পশুহত্যায় নিয়োজিত এবং গৃহস্থবধূ যিনি কেবল তুচ্ছ সাংসারিক কর্তব্যেই ব্যাপৃত তাঁহাদের আত্মাও সর্ববন্ধনমুক্ত, সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত, ইহারাও হিন্দুধর্মে প্রকৃত সত্যের উদ্‌গাতা। হিন্দুধর্মের অনুশাসন পালনের জন্য সন্ন্যাসের প্রয়োজন নাই, সত্যে উপনীত হইবার বহু পথ, সব পথেরই চরম লক্ষ্য সেই এক মহত্তম সত্য। বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন জীবনে প্রয়োগ করার জন্য প্রধানত প্রয়োজন সন্ন্যাস। হিন্দুধর্মেও সন্ন্যাসের স্থান আছে, কিন্তু তাহা বহু পথের একটি মাত্র। এইজন্য সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, জ্ঞানতাপস মহর্ষিও মাঝে মাঝে পূর্ণ জ্ঞানের প্রত্যাশায় কখনও রাজা, কখনও মাংসবিক্রেতা ব্যাধ, কখনও স্বামীসেবায় নিযুক্তা নারীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। হিন্দুধর্ম সন্ন্যাসী, গৃহী, ত্যাগী, ভোগী, রাজা, ভিখারী সকলকে স্ব স্ব পথে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধর্মাচরণের নির্দেশ দিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসকে, মুক্তি বা নির্বাণকে প্রাধান্য দিয়া জগতকে অস্বীকার করিয়াছে। সমাজে নরনারীর অধিকার-বৈষম্যের জন্যও স্বামীজী বৌদ্ধধর্মকে দায়ী করিয়াছেন। বৌদ্ধসঙ্ঘে ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষু অপেক্ষা নিম্নাধিকার পাইয়াছেন। জাতক ও অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থেও নারীর স্থান অত্যন্ত হেয়। সংসারবৈরাগ্য এবং সন্ন্যাসানুরাগ জাগ্রত করার জন্য মানুষের মনে নারীবিতৃষ্ণা স্ফুরণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বৈদিকধর্মে পুরুষ ও নারী সমান অধিকার ভোগ করিয়াছে।

বৈদিক ধর্ম প্রচারবিমুখী এবং বর্জনশীল। বৌদ্ধধর্ম অতি উৎসাহী প্রচারধর্মী। স্বামীজীর মতে বৈদিক, ইহুদী ও পারসিক ধর্ম যে জাতির মধ্যে উদ্ভূত এবং প্রচারিত হইয়াছিল আজ পর্যন্ত সে সকল জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্ম প্রচারধর্মী ও বিশ্ব বিজয়ের অভিলাষী। এই প্রচারপ্রিয়তার দুই দিক—একদিকে ইহা মানবপ্রকৃতিকে উন্নততর করিতে চেষ্টা করে, অন্যদিকে দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে পৌঁছিয়া বিচিত্র অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে গিয়া বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায়

বিভক্ত হইতে বাধ্য হয়। বৈদিকধর্ম প্রচারবিমুখ বলিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ, এবং আপন শুচিতা বজায় রাখিতে সমর্থ, কিন্তু প্রচারপ্রিয়তার জন্য প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের শুচিতা বজায় থাকে* নাই। বৌদ্ধধর্মের গ্রহিষ্ণুতা এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রতি আকাঙ্ক্ষার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম আপন বৈশিষ্ট্যচ্যুত হইয়া বৈদিকধর্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়াছে। বৈদিকধর্ম বৌদ্ধধর্মের নূতন মহিমা ত্যাগ, মৈত্রী, করুণা এবং সার্বভৌম সহানুভূতিকে বরণ করিয়া জ্ঞান ও প্রেমের অদ্বৈত সিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের এই যোগসাধনের ফলে বৈদিক ধর্ম নব বলে বলীয়ান্ হইয়া পতিত বৌদ্ধধর্মকেও আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছে।

বুদ্ধদেব বৈদিক দেবদেবী, আচার-অনুষ্ঠান এবং স্বয়ং ঈশ্বরকেও অস্বীকার করিয়াছিলেন। স্বামীজীর মতে তথাপি তাঁহার প্রচার-প্রচেষ্টা ভারতের কোথাও ব্যাহত হয় নাই। তিনি সুদীর্ঘ আশি বৎসরকাল নির্বিবাদে ভারতের সকল জনপদে জনপদে তাঁহার আদর্শের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন কেবল বুদ্ধই নহেন, তাঁহার সমসাময়িক যুগের আরো ছয়জন ধর্মবেত্তা বৈদিকধর্ম-বিরোধী তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই। কারণ উপনিষদের রচয়িতাগণ জানিতেন—'বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণ যাহা প্রচার করিতেন, তাহার মধ্যেও অনেক মহৎ সত্য আছে।'[১] এইজন্যই বুদ্ধদেব হিন্দুদেবতার নিন্দা ও পৌরোহিত্য কার্যের সমালোচনা করিয়াও হিন্দু-দেবতার মন্দিরে, হিন্দু-দেবতার পার্শ্বে ঈশ্বরাবতাররূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। দুই ধর্মের যে মৌলিক পার্থক্য তাহা সর্বসমক্ষে অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করিয়াও বিবেকানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে নিজেকে 'শ্রীবুদ্ধের দাসানুদাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার বা স্বয়ং ঈশ্বররূপে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিয়াছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন মৌলিক বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক্ নহে। বৈদিক ধর্মের অবনতির সংশোধনরূপে, কঠোর জাতিভেদ প্রথা এবং পৌরোহিত্যের তীব্র প্রতিবাদরূপে বৌদ্ধধর্ম 'একটা সংগ্রামপ্রচেষ্টা মাত্র।'

স্বামীজীর অভিমত বুদ্ধদেবের শিক্ষার মধ্যেই একটি বিপদের সংকেত ছিল। বুদ্ধদেব ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে প্রায় সময়েই মৌন থাকিতেন এবং বেদের আচারবিশেষের বিরোধিতা করিতেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধশিষ্যগণ অধিকতর

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

নাস্তিক্যবাদী ও বেদবিরোধী হইয়া উঠেন। বৌদ্ধধর্মের অপর ত্রুটি তাহার প্রচারধর্মিতা। ব্যাপক প্রচারের ফলে যে সকল অসভ্য ও অশিক্ষিত আদিম মানবজাতি বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করে তাহারা সর্প ভূত যক্ষ রক্ষ প্রভৃতি উপাসনা এবং নানাবিধ কুসংস্কারও বৌদ্ধধর্মের আড়ালে চালাইতে আরম্ভ করে। পরিণামে বৌদ্ধধর্মের প্রাসাদে ফাটল দেখা যায় এবং তন্ত্রোপাসনার প্রসারে সেই গগনচুম্বী প্রাসাদ একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর বৌদ্ধধর্মের যে ভগ্নাবশেষ রহিল তাহা যেমনই বীভৎস তেমনই কলঙ্কজনক। স্বামীজী লিখিয়াছেন—একদা বুদ্ধদেব বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ও আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কার করিয়া বৌদ্ধধর্মের পত্তন করিয়াছিলেন। আর বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতিতে তাহা তদপেক্ষা শতগুণ ভয়ানক কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ডে পূর্ণ হইয়া উঠে। বৌদ্ধগণ বিনাশের পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্মের সংস্কার ও সংগঠনে মনোনিবেশ করেন নাই। নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ ও মতানৈক্য বৌদ্ধধর্মের এক মস্তবড় ত্রুটি। শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য—ইঁহারা ছিলেন সংস্কারক। ইঁহাদের ধর্মমত ভারতবর্ষে সমাদর পাইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সেই লোকপ্রিয়তা পায় নাই। বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে স্বামীজীর এই অভিযোগসমূহ কোনপ্রকার বিদ্বেষ হইতে জাত নহে, ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক তথ্য ও তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া তিনি বৌদ্ধ-ধর্মের শ্রেয়াংশকেই গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

স্বামীজী বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্তকে তিনযুগে বিভক্ত করিয়াছেন—পাঁচশত বৎসর প্রথম যুগ, এই সময় বুদ্ধদেবের অলোকসামান্য চরিত্রদ্বারা প্রভাবিত হইয়া সমগ্র দেশ সন্ন্যাসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া জ্ঞানসর্বস্ব নীতির অনুসরণ করিয়াছে। পরবর্তী পাঁচশত বৎসর হিন্দুধর্মের সঙ্গে সমন্বয় এবং জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলনে মহাযান সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও প্রসার। শেষ যুগ বৌদ্ধতন্ত্রের যুগ। এই যুগে বৌদ্ধধর্মের ত্যাগ, জ্ঞান ও ভক্তি অপেক্ষা ভোগ ও ইন্দ্রিয় সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবকে বামাচারী এবং প্রজ্ঞাপারমিতার তত্ত্বকে বীভৎস ব্যাখ্যায় কদর্য করিয়া লইয়াছে। ধর্মের নামে তিব্বতে ও অন্যান্য দেশে ঘোর অনাচার দেখা দেয়। ভারতবর্ষও এই রূঢ় নিয়তির হাত হইতে রেহাই পায় নাই। বৌদ্ধধর্মের এই পরিণতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই সময়ে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। উত্তরে কুমারিল, দক্ষিণে আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের আবির্ভাবে এই বিকৃত বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইল।

যেটুকু অবশিষ্ট রহিল তাহা আরো বিষময় হইয়া সমাজ জীবনকে কালিমালিপ্ত করিতেছিল। অবশেষে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে সেই ক্ষীণ ভগ্নাংশ বিশুদ্ধিকৃত হইয়া বৈষ্ণবধর্মে গৃহীত হইয়াছিল।

স্বামীজীর মতে বৌদ্ধধর্মের পতনের জন্য বুদ্ধদেব দায়ী নহেন—বৌদ্ধগণই ইহার ধ্বংসের কারণ। বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শূন্যবাদ প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম নহে। আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধেও তিনি কখনও মৌন থাকিতেন, কখনও সেই প্রশ্ন এড়াইয়া যাইতেন। তথাগত শাক্যসিংহ সুযোগ্য চিকিৎসকের ন্যায় ভবরোগীর ঔষধ নির্ধারণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ও আত্মা লইয়া বাকবিতণ্ডায় রত থাকেন নাই। বুদ্ধের প্রতি প্রযুক্ত কয়েকটি বিশেষণ উদ্ধৃত করিয়া স্বামীজী লিখিয়াছেন—'তিনি একমাত্র ঐক্যের ভাবই প্রচার করিয়াছিলেন। এই ঐক্যভাবের অন্তর্নিহিত শক্তি বুদ্ধের শ্রমণসঙ্ঘ অনেকটা ধরিতে পারেন নাই।'[১] ভারতবর্ষ বুদ্ধদেবকে গ্রহণ করিয়াছে, বুদ্ধের মতকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কারণ বৌদ্ধধর্ম বেদের বিরুদ্ধতা করিয়াছিল, ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং কালক্রমে বিকৃত ও নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রাচীন অবিমিশ্র স্বরূপ হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

স্বামীজীর মতে বুদ্ধদেব সাম্যের প্রচারক—জন্মগত পৌরোহিত্যের বিরোধী। কোন সংস্কার বা আচার-অনুষ্ঠানের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেন নাই। প্রচলিত ভাষা সংস্কৃত যাহা ধর্মপ্রচারের বাহন ছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া তিনি সর্বজনবোধ্য প্রাকৃত ভাষায় নিজ মত প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বামীজীর ভাষায় সে যুগে 'মানুষ ভগবানকে ভালবেসেছিল, কিন্তু মনুষ্যভ্রাতার কথা ভুলেই গিয়েছিল।'[২] বুদ্ধদেবের সাধনার মধ্য দিয়া এই 'সর্বপ্রথম তারা ঈশ্বরের অপর মূর্তি মানুষের দিকে ফিরে তাকালো। মানুষকেই ভালোবাসতে হবে। সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রবাহ—সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই প্রথম তরঙ্গ, যা ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছে।'[৩] বুদ্ধদেবের চরিত্রের দুর্লভ ব্যক্তিত্ব অসীম ঔদার্য ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা,

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭।
২ ও ৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮।

একাগ্রতা ও সর্বোপরি বহুমুখিন মৈত্রী করুণা মানবপ্রেমমুগ্ধ বিবেকানন্দের হৃদয়ের গভীর মর্মমূলে নাড়া দিয়াছে। হৃদয়ের সেই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি তিনি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—বুদ্ধদেব অকপট ও সরল ধর্মবেত্তা পুরুষ যাঁহার কার্যে কোন প্রকার অভিসন্ধি ছিল না। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বা বার্তাবহ অথবা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। তিনি ছিলেন আত্মৈকবিশ্বাসী, তাঁহার দেশনা—'অত্ত দীপ বিহরথ'—নিজেই নিজের প্রদীপ হও। এই আদর্শ কর্মযোগী কেবল কর্মকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, কর্মদ্বারাই আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। তিনি জড়বাদী নহেন, আস্তিকও নহেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন কেবল ধর্মের আড়ম্বর বা ঈশ্বর বিশ্বাসের বুলি দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান দ্বারাই চরম সিদ্ধিলাভ করা যায়।

স্বামীজীর মতে, বুদ্ধদেব তাঁহার যুগসমস্যার সমাধান করিবার যথাযোগ্য শক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। সমসাময়িক কালের অবিরত দার্শনিক বিচার, জটিল ও আড়ম্বরপুর্ণ বৈদিক অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং কঠিন জাতিভেদ প্রথার বাধা তিনি আপন বুদ্ধির প্রাখর্যে বিদূরিত করিয়া মূর্তিমান বিজয়ী-রূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর অন্তরে বুদ্ধদেব যে রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন তাহা তাঁহার অকপট সরলতা, বিপুল শক্তি বা প্রখর বুদ্ধির জন্য নহে, তাহা শাক্যসিংহের অপূর্ব হৃদয়বত্তার জন্য। তিনি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন—'আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব হৃদয়বত্তার লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও অধিকারী হইতাম তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম।'[১] স্বামীজী বুদ্ধের বিশাল হৃদয়ের সঙ্গে উন্মুক্ত আকাশের তুলনা করিয়াছেন। শ্রীবুদ্ধের অন্যতম শিষ্যের ন্যায় অতি সহজ ও সরল ভাবে স্বামীজী লিখিয়াছেন—'বুদ্ধ অপর সকল মানুষের উপরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যাঁহার সম্বন্ধে কি মিত্র কি শত্রু কেহ কখনও বলিতে পারে না যে, তিনি সকলের হিতের জন্য ছাড়া একটিও নিঃশ্বাস লইয়াছেন, বা একটুকরা রুটি খাইয়াছেন।'[২]

বোধিসত্ত্ব গৌতমের চরিত্রের দৃঢ়তা বিবেকানন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বোধিবৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট গৌতমের অপ্রাপ্যবোধি লাভ করিবার

১। ঐ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৯। ২। ঐ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।

জন্য কঠিন প্রতিজ্ঞা স্বামীজীর অন্তরে কেবল শ্রদ্ধাই জাগ্রত করে নাই, তাঁহাকে জীবনপথে প্রেরণাও জোগাইয়াছে। এই অবস্থার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন—'ইহাই ধর্মের ভিত্তি। যখন মানুষ এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, তখনই সে সত্য লাভ করিবার পথে চলিয়াছে, সে ঈশ্বর লাভ করিবার পথে চলিয়াছে, বুঝিতে হইবে।'[১]

বুদ্ধ ও খৃষ্ট—পৃথিবীর দুই শ্রেষ্ঠ ধর্মবেত্তা। স্বামীজীর ভাষায়—'এঁরা সমগ্র মানবজাতির আলোকস্তম্ভ—'দুইটি ঈশ্বর'। স্বামীজী এই দুই মহান্ ধর্মাচার্যের মধ্যে বুদ্ধকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতম বিকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন শ্রীবুদ্ধের মধ্যে। এইজন্য তাঁহার মতে দেহধারী মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধ প্রথম ও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং খৃষ্ট দ্বিতীয়। কারণ 'খৃষ্ট সর্বদা নিজের প্রচারিত উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করেন নাই। সর্বোপরি স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমান অধিকার দেন নাই।' বুদ্ধদেব নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্টের কোন নারী-ধর্মপ্রচারিকা ছিল না। খৃষ্টের জীবনে প্রেমই একমাত্র সত্য, প্রেমের প্রেরণায় সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁহার আত্মদান। বুদ্ধদেবের প্রেম ও আত্মদান আরো মহত্তর, একটি ছাগশিশুর জন্যও তিনি আত্মবিসর্জনে উদ্যত হইয়াছিলেন। তথাপি কেবল প্রেমই বুদ্ধ-জীবনের শেষ কথা নহে, তাঁহার জীবনে প্রেম ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। যীশুখৃষ্ট প্রচলিত ইহুদীধর্মের প্রতিপক্ষতার জন্য ক্রুসে প্রাণ দিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব বৈদিক ধর্মের বিরোধিতা করিয়াও ভারতে ঈশ্বরাবতাররূপে পূজিত হইয়াছিলেন। খৃষ্ট ও বুদ্ধ দুইজনেই—'বিশাল শক্তি, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার, ধর্মাচার্য নহেন। যীশুর জন্ম, গৃহত্যাগ, নির্জনবাস, অন্তরঙ্গ শিষ্যসংখ্যা ও নৈতিক শিক্ষা বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্তের আলোয় দীপ্যমান। বৌদ্ধধর্মের কাছে খৃষ্টধর্মের ঋণ স্বামীজী অতি সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম যে খৃষ্টধর্মের পূর্বাভাস সূচনা করিয়াছিল তাহার নিদর্শনস্বরূপ তিনি অশোকের শিলালিপির উল্লেখ করেন। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের প্রচারবাহিনী যে সকল স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন পরবর্তীকালে সে সকল স্থানেই খৃষ্টধর্মের প্রসার ঘটে। ঈশ্বরের

১। ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫।

ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ ও ভারতীয় নীতিতত্ত্ব খৃষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্মের নিকট লাভ করিয়াছে। সার্বজনীন প্রেমের আদর্শও খৃষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্মের নিকট পাইয়াছে। স্বামীজী দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—'বৌদ্ধধর্ম খৃষ্টধর্মের ভিত্তি। ক্যাথলিক সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম হইতেই উদ্ভূত।"[১]

বুদ্ধদেবের প্রতি স্বামীজীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা এত গভীর ও অকৃত্রিম ছিল যে বৈদান্তিক বিবেকানন্দ বহুবার সগৌরবে নিজেকে শ্রীবুদ্ধের 'দাসানুদাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র তাঁহার কাছে বুদ্ধ সম্বন্ধীয় আলোচনার সময় যেন এক মাহেন্দ্রক্ষণ। স্বামীজী এত আবেগ ও আন্তরিকতা সহকারে শাক্যমুনি বুদ্ধের বিষয় আলোচনা করিতেন যে বিদেশে শ্রোতৃবর্গের কেহ কেহ তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া অনুমান করিতেন। স্বামীজীর কণ্ঠেও সেই আকাঙ্ক্ষাই যেন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—'বৌদ্ধ! আমি বুদ্ধের দাসানুদাসের দাস।' শুধু বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিক স্বীকৃতিই তাঁহাকে বুদ্ধের প্রতি এত আকৃষ্ট করে নাই। ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন—ভগবান বুদ্ধের জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তিনি ভগবান বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।[২] এইজন্যই একাধারে ঈশ্বর বিশ্বাস ও নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনে সার্থক সমন্বয় লাভ করিয়াছে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল—'মৃত্যুকালে আদি দৈবীসত্তায় মিশিয়া যাইতে চাই, ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইতে চাই। আমি তখন বুদ্ধত্ব লাভ করিব।'[৩]

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আলোচনার মধ্যে স্বামীজীর গভীর দার্শনিক মনীষা ও বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর, প্রজ্ঞাপারমিতা, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, এবং Light of Asia প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি তাঁহার যথার্থ অনুরাগ ছিল। খগ্‌গবিসান সুত্ত, ধনিয় সুত্ত, বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও যশোধরার কাহিনী, বুদ্ধত্ব লাভ ও পরিনির্বাণের উপাখ্যান এবং ক্ষৌরকার উপালির গল্প তাঁহার উদারকণ্ঠে সুগভীর শ্রদ্ধায় ও মর্যাদায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

১। ঐ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৭০।
২। 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৩।
৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১২

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পুরাতাত্ত্বিক গবেষক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল দরবারের পুঁথিশালা হইতে হাজার বছরের প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে 'বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন। এই কাজ দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যময় অতীত ও গৌরবময় আভিজাত্য যেমন স্বীকৃতি পাইয়াছে তেমনি বাংলা সাহিত্যের উষালগ্নে বাঙালীর সাহিত্য-মানসও যে বৌদ্ধচিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিল তাহাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম ও শিক্ষানীতি তাঁহার আলোচনায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে তাঁহার 'নেপালী বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্য প্রণয়নেও সাহায্য করিয়াছিলেন।'[১] হরপ্রসাদ বহুবার নেপাল ভ্রমণ করিয়া প্রচুর অজ্ঞাত ও সুপ্রাচীন সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সব্যসাচী হরপ্রসাদ সংগ্রহ ও গবেষণা দুই কার্যেই সমান সিদ্ধকাম পুরুষ। কেবল ৪৭টি চর্যাপদ, প্রচুর শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার এবং বহু গ্রন্থ সংগ্রহেই তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তি সীমায়িত ছিল না। বহুভাষাবিদ্, বহুশাস্ত্রদর্শী হরপ্রসাদের অনন্যসাধারণ মনীষা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির তমসাঘন রুদ্ধদ্বার উন্মোচনে নিযুক্ত ছিল। হরপ্রসাদ রচনাবলীর ১ম সম্ভারের অন্তর্গত 'ইতিহাস সংস্কৃতি ও ধর্ম' প্রবন্ধসমূহে দুইটি প্রবন্ধ ব্যতীত সমস্ত প্রবন্ধে বৌদ্ধবিষয় আলোচনার অন্তর্গত হইয়াছে।[২] পালিভাষায় সুপণ্ডিত হরপ্রসাদের এই আলোচনা কেবল তত্ত্বভূয়িষ্ঠই হয় নাই, হিন্দু-বৌদ্ধ-সমন্বয়বাদী এক সার্বভৌম দৃষ্টির বাহনরূপেও অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছে। হিন্দু রক্ষণশীলতা দ্বারা নহে, সত্যদর্শী ও সংস্কারমুক্ত মনে তিনি বৌদ্ধযুগকে বিচার করিয়াছেন। 'আমাদের গৌরবের দুই সময়' প্রবন্ধে বৌদ্ধযুগের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের দ্বার উন্মোচন করা হইয়াছে। বুদ্ধিবিপ্লবের ফলে ভারতবর্ষে যাগযজ্ঞের বিরল প্রচার দেখা দেয় এবং ক্রমশ আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি মুক্তিমার্গ দর্শনরূপে গৃহীত হয়। যজ্ঞে পশুবলির বিরোধীরূপে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, প্রচার, মগধ সাম্রাজ্যের

১। The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, 1882, ভূমিকা পৃ X।iii দ্রষ্টব্য।

২। হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম সম্ভার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত, ১৩৬৩, পৃঃ ৩৭৭—৪৩৪।

উৎপত্তি যুক্তিশৃংখলার মাধ্যমে উপস্থাপিত হইয়াছে। পরাক্রমশালী মগধ সাম্রাজ্যের প্রতাপে প্রায় পনের শত বৎসর ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল। তাঁহার মতে তাহার কারণ উল্লেখিত বুদ্ধিবিপ্লব, বৌদ্ধধর্ম ও মগধসাম্রাজ্য। এই সময়ে দক্ষিণাত্যেও আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

'ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ' আলোচনায় লেখকের মীমাংসামুখী মানসপ্রবণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মতে ধর্মপ্রচারে বৌদ্ধদের অবলম্বিত পন্থা, উৎসব, ভক্তিশাস্ত্র, ব্রাহ্মণদের পুরাণপ্রচার, বিদেশে কার্যক্ষম প্রচারকদল প্রেরণ, তৈর্থিক সম্প্রদায় এবং আভ্যন্তরীণ কলহ ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণদের নিকট বৌদ্ধগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্যের আর্বিভাব এই পরাজয়কে সুসম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

'কুশীনগর' প্রবন্ধে শাক্যসিংহের মহাপরিনির্বাণের স্মৃতি-বিজড়িত কুশীনগরের সন্ধান, আবিষ্কার এবং সংরক্ষণের তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। 'পাষাণের কথায়' প্রত্নতাত্ত্বিক হরপ্রসাদ বৌদ্ধস্তূপের পাথরের কথা উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। 'বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম'—বাংলায় বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, প্রসার ও পরিণতির পরিচয়বাহী প্রবন্ধ। বৌদ্ধ বাংলার অধিবাসী, নগর, দেবদেবী এবং বাংলার বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণাম—ধর্মঠাকুরের পূজা সহজবোধ্যভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। 'হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ'—হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্র, আচার-ব্যবহার এবং জীবনচর্যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বক্তব্যকে যুক্তিনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। বক্তব্যের স্পষ্টতা ও যুক্তির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে এক অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম দৃষ্টি লেখকের আলোচনাকে তথ্যনিষ্ঠ ও বিচারবিশ্লেষণধর্মী করিয়া তুলিয়াছে।

'ধর্মঠাকুরের পূজা বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি'— ইহা হরপ্রসাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচুর তথ্য আহরণ করিয়া লেখক ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধদেবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন' প্রবন্ধটি প্রাচীন ভারতীয় ভাষার প্রথম সার্থক গবেষণাপূর্ণ আলোচনা। ইহা লেখকের সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষার ইতিহাসে অসামান্য বৈদগ্ধের নিদর্শনও। এই প্রবন্ধসমূহ ছাড়া হরপ্রসাদ "বৌদ্ধধর্ম"[১] নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মৈষণার

১। বৌদ্ধধর্ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১ম সং, ১৩৫৫।

গূঢ় চেতনার সঙ্গে লেখকের প্রশান্ত গম্ভীর ব্যক্তিত্বের ছাপও পাওয়া যায়। মহাযান বৌদ্ধধর্মের পটভূমিকায় 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থ রচিত। মহাযানী নির্বাণের স্বরূপ ও প্রকৃতি বৌদ্ধ যজমানদের বা উপাসকদের নিকট সহজবোধ্য করিবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শূন্যতা ও করুণার 'মিলামিশা'-কেই নির্বাণ বলিয়া অভিহিত করেন। শূন্যতাকে আরো সহজবোধ্য করিবার জন্য 'নিরাত্মাদেবী'র আবির্ভাব ঘটে। লেখকের ভাষায় অতি সরলভাবে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। 'বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত', 'বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল' প্রবন্ধদ্বয়ে লেখক গভীর মনীষা ও অকাট্য যুক্তি বলে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির মূল অনুসন্ধান করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রচলিত মত এবং বুদ্ধের উপর ইউরোপীয় জাতির প্রভাব সম্বন্ধীয় মতকে তিনি শাণিত যুক্তির দ্বারা জয় করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'হীনযান ও মহাযান', 'মহাযান কোথা হইতে আসিল', 'সহজযান'—প্রবন্ধ সমূহে হীনযান-মহাযান, ও সহজযানের উৎপত্তি এবং ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনায় তাহাদের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অতি-সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত', বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল; 'এখনও একটু আছে উড়িষ্যার জঙ্গলে' প্রবন্ধসমূহে বৌদ্ধধর্মের ক্রমপরিণতি—ইন্দ্রিয়াসক্তি, দেবতা, যক্ষরক্ষ পূজা, ভূত-প্রেত উপাসনা, অশ্লীল ও যথেচ্ছাচার-প্রধান ক্রিয়াকর্ম, ইত্যাদির পরিণামরূপে অবশেষে বাংলাদেশ হইতে বৌদ্ধ-ধর্মের চিরনির্বাসন আলোচিত হইয়াছে। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ অবস্থিতি ও শেষ পরিণতিরূপে ধর্মঠাকুরের অস্তিত্বকে তিনি স্বীকৃতি দিয়াছেন। এই তত্ত্বভূয়িষ্ঠ গবেষণাপূর্ণ আলোচনাসমূহের অন্তরালে মাঝে মাঝে লেখকের কৌতুকোজ্জ্বল মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছে। 'নির্বাণ' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন 'বোধিসত্ত্ব যখন স্তূপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখন তাঁহারা চারিদিকে অনন্ত শূন্য দেখিতেন। এই শূন্যকে তাঁহারা বলিলেন, 'নিরাত্মা'। শুধু নিরাত্মা বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না। বলিলেন 'নিরাত্মা দেবী' অর্থাৎ নিরাত্মা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। বোধিসত্ত্ব নিরাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পুরুষ মেয়ের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে যাহা হয়, যজমানেরা সে কথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল, কেননা সেটা বুঝিতে ত কাহাকেও বিশেষ প্রয়াস করিতে হয় না।'[১] 'দলাদলি', 'মহাসাঙ্ঘিক মত' এবং 'থেরবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক'—প্রবন্ধসমূহে দশবস্তুকে উপজীব্য করিয়া বুদ্ধের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে বৌদ্ধসঙ্ঘে যে

১। বৌদ্ধধর্ম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

ভেদ দেখা দেয় তাহারই পরিণতিরূপে থেরবাদী এবং মহাসাঙ্ঘিক দলের উৎপত্তি, মহাসাঙ্ঘিক মত এবং মহাসাঙ্ঘিকদের নিকট থেরবাদের পরাজয় ও দেশত্যাগ আলোচিত হইয়াছে। 'মানুষ ও রাজা'—এই প্রবন্ধে মহাসাঙ্ঘিক মতে পৃথিবীর উৎপত্তি এবং মনুষ্যসৃষ্টি আলোচিত হইয়াছে।

বৌদ্ধযুগের সার্থক বাণী বাহক হরপ্রসাদের ধ্যানপূত জীবনে বৌদ্ধভারতের ও বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সূর্যালোক প্রতিভাত হইয়াছে। সেই দীপ্যমান্ আলোকশিখায় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। Buddhist Text and Research Society-র সম্পাদকরূপে ১৮৯৫ খৃঃ তিনি প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ঐতিহ্যের গবেষণায়ও সহায়তা করিয়াছেন।[১]

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐতিহাসিক স্থান মাহাত্ম্যসূচক প্রবন্ধসমূহে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনতমস্তক হইয়াছেন। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সেই প্রাচীন শিল্পকীর্তির মাধুর্য দর্শন করিয়া তিনি অভিভূত হইয়াছেন। 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র', 'খণ্ডগিরি', 'প্রাচীন উড়িষ্যা', বারাণসী', 'ধর্মজঙ্গল', 'শিবসুন্দর' প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহে বৌদ্ধবিষয়ক আলোচনা স্থান পাইয়াছে।[২] এই আলোচনায় লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও বিশ্লেষণবুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়সংবেদনার স্নিগ্ধ স্পর্শ ই অধিক পাওয়া যায়। 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' প্রবন্ধে খণ্ডগিরির বৌদ্ধগুম্ফাবলী ধাউলির পাহাড়, অশোকের অনুশাসন, বৌদ্ধধর্মের সর্বভূতে দয়া ও অহিংসার কাহিনী লেখকের স্মৃতিপথে উদ্ভাসিত হইয়াছে। তাঁহার মতে কখনও বৌদ্ধধর্মের ব্রাহ্মণ্যকরণ, কখনও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বৌদ্ধকরণ দুই-এর সমন্বয়ে উড়িষ্যার হিন্দুধর্ম, শিল্প ও ভাস্কর্যের নবরূপায়ণ ঘটিয়াছে। বুদ্ধধর্মসঙ্ঘের স্মৃতিবাহী জগন্নাথমূর্তি, চক্র, রথযাত্রা ও শ্রীক্ষেত্রের জাতিভেদ-বিচার-হীন আচার-ব্যবহারে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের স্মৃতি জড়িত আছে। 'খণ্ডগিরি' অঞ্চলে একদা হিন্দু-বৌদ্ধ জনগণ পরস্পর সৌহৃদ্য বজায় রাখিয়া অধিষ্ঠিত ছিল। রাণীগুম্ফা এখনও বৌদ্ধরাণীর কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। প্রাচীন উড়িষ্যার বহু কীর্তিকলাপের মধ্যে বৌদ্ধ ঐতিহ্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বারাণসী কেবল ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্র নহে,

১। সুশীল দে, নানানিবন্ধ, পৃঃ ৩০১।
২। বলেন্দ্র রচনাবলী, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৯।

বৌদ্ধধর্মেরও পীঠস্থান। বারাণসীর মৃগদাবকাননে বুদ্ধের প্রথম অনুশাসন প্রদত্ত হয়। অশোকের ধর্মপ্রচার ও স্মৃতিস্তম্ভ ইহাকে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে, বৌদ্ধ ঐতিহ্যের জন্য সমগ্র এশিয়ার তীর্থভূমিরূপেও বারাণসী বরণীয়। তুর্কী আক্রমণের এবং বৌদ্ধভিক্ষুর 'অগ্নি নির্বাণের' পুণ্য ঐতিহাসিক স্মৃতিও বারাণসীর সঙ্গে জড়িত। 'শিবসুন্দর' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—'ভারতীয় মানসে শিবসুন্দর, শুভশুচিতা এবং মঙ্গল ও সৌন্দর্যের আলোকজ্যোতি চিরদীপ্যমান'। তাঁহার মতে ভারতীয় মানসের এই মহনীয় প্রকৃতি—'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু.........ইত্যাদি পালিমন্ত্রে চিরবিধৃত হইয়া আছে। ডঃ রামদাস সেন রচিত 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থের ভূমিকারূপে বলেন্দ্রনাথ 'বুদ্ধদেব' প্রবন্ধে বুদ্ধের জীবনচরিতের আলোচনা করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র সেন

আহিতাগ্নিক ঋষি কেশবচন্দ্রের জীবনীকার তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে —যোগী কেশবচন্দ্রের যোগ-সাধনার ভিতর বৌদ্ধনির্বাণ মিলিত হইয়াছে, ১ম বাসনা নির্বাণ ও নির্বিকার হওয়া, ২য় যোগানন্দ উপলব্ধি ও সম্ভোগ—এই অবস্থায় সাধক কেশবের চিত্ত নিষ্ক্রিয় ও অচঞ্চল হইয়া অবস্থান করিত। তাঁহার মতে এইখানেই শাক্যসিংহের সঙ্গে তাঁহার মিলন।[১] ১৮৮০ খৃঃ কমল কুটিরে কেশবচন্দ্র সেন 'শাক্যসমাগম' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বুদ্ধদেবের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাক্যসমাগমের বিষয়বস্তু শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের মূল্যায়ন। তাঁহার মতে শাক্যদেব দুঃখনিবৃত্তির অবতার—মানুষের রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর নিবৃত্তির জন্য তিনি মহৌষধ প্রদান করিয়াছিলেন। 'বুদ্ধ বলিলেন—'আমি জীবের দুঃখ জুড়াইয়া দিব।' তিনি বলিলেন না,— 'আমি ধর্ম দিব, পুণ্য দিব'। কিন্তু তিনি বলিলেন—'তোরা কাঁদছিস্, তোদের অশ্রু মুছাইয়া দিব।[২] বুদ্ধদেবের ত্যাগ ও ভালবাসার বাণী কেশবচন্দ্রকে শুধু প্রভাবিত করে নাই, মুগ্ধও করিয়াছে। তাঁহার এই বক্তৃতা যেন ভক্ত হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস ও সারল্যের নিদর্শন। বৌদ্ধ পুরাতত্ত্বের নীরস তত্ত্বালোচনা ইহা নয়। এই বক্তৃতা বক্তার অন্তররাজ্যে বুদ্ধদেবের অপার মহিমার জ্যোতির্ময় উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। কেশবচন্দ্রই নবযুগে বাংলাদেশে বৈশাখীপূর্ণিমা উৎসবের প্রবর্তক। তিনি হিন্দু

১। কেশব চরিত, চিরঞ্জীব শর্মা, তৃতীয় সং, ১৯৩১, পৃঃ ৩৩৫।
২। কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৩৪৩, পৃঃ ১৪৬।

বৌদ্ধ খৃষ্ট ও ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম-সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্ত্ব পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং এক একজন ব্যক্তির উপর এক একটি ধর্ম পর্যালোচনা করিয়া তাহার মূলতত্ত্ব বাংলাভাষায় উপস্থাপিত করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র ও কেশবমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছিল।

সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত

সাধু অঘোরনাথের উপর আহিতাগ্নিক ঋষি কেশবচন্দ্র বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গ্রন্থ প্রণয়নের ভার দিয়াছিলেন। তাহারই ফলে 'শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব'[১] নামক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের জীবনী রচনায় লেখক প্রধানতঃ 'ললিতবিস্তর'কেই অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রন্থকার রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও পুরাণাদি আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যেহেতু এই সমস্ত গ্রন্থে বুদ্ধাবতারের উল্লেখ আছে, সুতরাং 'বৌদ্ধধর্ম মহাতপস্বী সিদ্ধার্থ শাক্যমুনির পূর্বেও অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকপ্রসিদ্ধ ছিল।'[২] শেষ বুদ্ধ শাক্যমুনি হইতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার আরম্ভ। বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাপিতা ও কুলনির্বাচন, শাক্যের জন্ম ও কৈশোর জীবন, অশোক-ভাণ্ড বিতরণ ও শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন, চারিনিমিত্ত দর্শন ও গৃহত্যাগ, তপশ্চরণ, ষড়বর্ষের দুশ্চর তপস্যা, মাতা মায়া দেবীর সঙ্গে কথোপকথন, বোধিলাভ এবং ধর্মপ্রচার ইত্যাদি ঘটনা বর্ণনা ললিতবিস্তরের কাহিনীর অনুসরণে পরিচালিত হইয়াছে। পালি নিদানকথা, কাশীভরদ্বাজসূত্র, থেরীগাথা, এবং মহাপরিনির্বাণসূত্র হইতেও তিনি কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগে রাজপ্রাসাদে এক মর্মন্তুদ হাহাকার পড়িয়া যায়। এই 'বিলাপ' লেখকের নিজস্ব রচনা। লেখকের মর্মবেদনাও এই বিলাপধ্বনির মধ্যে উৎসারিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ অনুশীলনের ফলে বুদ্ধদেবের মহান্ আদর্শ তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল। বুদ্ধদেব সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—'তিনি আমার জীবনের মূলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার সমাধি ও ধ্যান, বৈরাগ্য ও নির্বাণ, পবিত্রতা ও দয়া আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছে। সমাধিস্থ আত্মা তাঁহার সমাধিতে এক হইয়া গিয়াছে।

১। শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব, ১৮০৪ শক।
২। ঐ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৬

আমি যোগসাগরে ভাসমান হইয়া তাঁহার ধ্যানসুখের অমৃত পান করিয়া চিদাকাশে এখন উড্ডীয়মান হইতেছি'।[১] কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধদেবকে কোমৎ-এর দলভুক্ত করিয়াছেন। অঘোরনাথ লিখিয়াছেন—'কিন্তু কোমৎ যে তাঁহার পাদস্পর্শ করিবারও উপযুক্ত নহেন। তিনি যে গভীর সাধনা ও আধ্যাত্মিক সমাধির সাগরে নিমগ্ন হইয়া অপূর্ব নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়া সম্বুদ্ধ হইলেন, তাহা কি অবিশ্বাস নাস্তিকতার ফল'?[২] বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ অভিযোগ তিনি নাস্তিক ও নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। গ্রন্থকার এই অভিযোগেরও নিরসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস বুদ্ধদেব 'ঈশ্বর শব্দ বিবাদের স্থল এবং নিতান্ত জটিল বুঝিতে পারিয়া ঈশ্বরের স্বপক্ষে বা বিপক্ষেও কিছু বলেন নাই। তিনি মুক্তির অভিলাষী হইয়াছিলেন, আপনার ও সমুদয় জীবের দুঃখমোচনে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়াছিল। একারণে তিনি বিবাদের তত্ত্ব ছাড়িয়া প্রকৃত বিষয়ের সাধনে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন'।[৩] লেখকের মতে বুদ্ধদেবের ধর্ম বৈদিক ধর্মের বিরোধী কিছু নহে, তিনি নিজের মতের সঙ্গে বৈদিক মতের প্রয়োজনীয় সমন্বয়-সাধন করিয়া লইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'মহামুনি বুদ্ধ নির্বাণবিষয়ে বৈদিক পথেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন, তবে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আর্য ঋষিদের সহিত তাঁহার মতান্তর ছিল। যাহা হউক ধর্মরাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সর্বত্র কেমন এক সুন্দর একতা ও সামঞ্জস্য আছে'।[৪]

গ্রন্থের পরিশিষ্টে বুদ্ধদেবের উপদেশের সারসংগ্রহ প্রদান করিয়াছেন। ললিতবিস্তর, ধনিয়সুত্ত, সারিপুত্ত সুত্ত, ও তেবিজ্জসুত্ত প্রভৃতির বঙ্গানুবাদও করিয়াছেন। 'ফলতঃ শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' বুদ্ধের জীবনের আখ্যান ও তাঁহার উপদিষ্ট তত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয় গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। ইহাই বাংলাভাষায় প্রথম তথ্যসমৃদ্ধ ও তত্ত্বগভীর বুদ্ধজীবনী গ্রন্থ। বুদ্ধ জীবনের প্রামাণ্য তথ্য সমাবেশে গ্রন্থকারের একনিষ্ঠ উত্তম গ্রন্থের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

১। শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব, অবতরণিকা পৃঃ ১/
২। ঐ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪০।
৩। ঐ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪০—৪১।
৪। ঐ, পৃঃ ৪৯।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে পারদর্শী রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় বৈজ্ঞানিক মনীষার সঙ্গে দার্শনিক চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়াছে। 'আত্মার অবিনাশিতা' প্রবন্ধে আত্মা সম্পর্কে বৈদান্তিক এবং নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধের মতামত আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় লেখকের প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ দর্শনের জ্ঞান বিজ্ঞানশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'—বৌদ্ধদর্শনের এক দুরূহ তত্ত্ব। লেখক এই বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বটি অতিসহজভাবে সর্বজন-বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যায় লেখক হীনযানী, মহাযানী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত এবং অজন্তা গুহাস্থিত ভাস্কর্য শিল্পের মানুষের দ্বাদশদশার 'ভবচক্র' চিত্র ইত্যাদি উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই চিত্রের প্রথম ঘরে অন্ধ উষ্ট্ররূপী অবিদ্যান্ধ মানব, সর্বশেষ ঘরে জরামরণরূপী বাঁশের দোলায় শয়ান শব মূর্তি। তাঁহার মতে প্রতীত্যসমুৎপাদ দার্শনিক অভিব্যক্তিমাত্র, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের সৃষ্টিব্যাখ্যা নয়। মানুষের শ্রেষ্ঠ ব্যাধি দুঃখ—'প্রতীত্যসমুৎপাদ সেই ব্যাধির নিদানতত্ত্ব; এবং অষ্টাঙ্গিকমার্গ অবলম্বন জনসাধারণের পক্ষে সেই ব্যাধির মহৌষধ। তথাগত স্বয়ং সেই নিদানতত্ত্বের ও সেই মহৌষধির আবিষ্কর্তা বৈদ্যরাজ'।[১] ভবরোগের হেতু প্রতীত্যসমুৎপাদ আবার ভবরোগনিরোধগামিনী পটিপদাও প্রতীত্যসমুৎপাদ। কারণ ইহাই একমাত্র পন্থা। আর 'ভগবান জাতিবর্ণনির্বিশেষে মনুষ্যমাত্রকে সেই পন্থা দেখাইয়া দিয়া মানবজাতির তৃতীয়াংশের নিকট জ্ঞানসিন্ধু ও করুণাসিন্ধুরূপে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন'।[২] 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' রূপ জটিল তত্ত্ববিশ্লেষণে রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের প্রতি অনুরাগ অপেক্ষা দার্শনিক মননিষ্ঠার অধিকতর পরিচয় দিয়াছেন।

দীনেশচন্দ্র সেন

বৌদ্ধযুগের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রতি দীনেশচন্দ্রের গভীর আকর্ষণ ছিল। সে যুগের তাম্রশাসন, উৎকীর্ণ লিপি, প্রস্তরমূর্তি, গ্রন্থ এবং লোক-প্রচলিত কাহিনী তাঁহার আবেগপ্রবণ প্রাণে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস ও প্রেরণা জাগাইয়াছে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় ইহার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। বৌদ্ধবাংলার গৌরবোজ্জ্বল মূর্তি—শৌর্যে বীর্যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে,

১ও২। রামেন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত সম্পাদিত, পৃঃ ৩২৬।

সাহিত্যে, শিল্পে, চারিত্রিক ঔদার্যে তাহার মহিমময় রূপ তাঁহার মানসনেত্রে চির-অধিষ্ঠিত ছিল। স্বর্গত দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে পরম শ্রদ্ধা ও অনুকম্পার আলোয় বৌদ্ধযুগ প্রতিভাত হইয়াছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ'[১] চিহ্নাঙ্কন তাঁহার কীর্তি। শূন্যপুরাণ, নাথগীতিকা, কথাসাহিত্য, ডাক ও খনার বচন প্রভৃতিকে তিনি এই যুগের সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়াছেন। 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে লেখক বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম এবং অশোকের বিষয়ে এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে তাঁহার নিজের নিকটও তাহা প্রশ্নাকারে আসিয়াছে। সে প্রশ্নের উত্তর লেখক নিজেই দিয়া গিয়াছেন—'আমার সরল আন্তরিক বিশ্বাস এই যে এই পূর্বভারতের সভ্যতার—বিশেষ করিয়া মগধের শিক্ষাদীক্ষার—আমরা বাঙালীরাই উত্তরাধিকারী হইয়াছি…… মগধের দীপ নিবু নিবু হইলে তাহা গৌড়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এই দীপ—একই দেশলাই কাঠির। গৌড়ের দীপ যখন নির্বাণোন্মুখ, তখন তাহার পরবর্তী শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল নবদ্বীপে।"[২] বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেবদেবী প্রতিমাসমূহকে হিন্দুদেবতারূপে গ্রহণ, সদ্ধর্মী দলন এবং মুসলমান আক্রমণ ইত্যাদিকে লেখক বৃহৎ বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপের কারণরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। নবব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় লেখকের উদার ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাবংশ, দ্বীপবংশ প্রভৃতি পালি গ্রন্থ অবলম্বনে বঙ্গবীর বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়, অধিকার স্থাপন এবং বিজয় সিংহের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। 'ঐতিহাসিক যুগ—বুদ্ধদেব'—ভারত ইতিহাসের সূচনা এই মহামানবের শুভ জন্মলগ্নে। লেখক পালিসুত্ত, ললিতবিস্তর ইত্যাদি অবলম্বনে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন।[৩] বুদ্ধদেবের কামনাজয়, ইন্দ্রিয়-শাসন, জন্মান্তরবাদ, অহিংসা, দুঃখনিবৃত্তি, জীবে দয়া এমন কি বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত মধ্যপন্থা—কোনটাই ভারতীয় অধ্যাত্মরাজ্যে নূতন নহে। মহাভারতে এবং পূর্ববর্তী সাহিত্যে ও দর্শনে তাহার নিদর্শন ও ইঙ্গিত আছে। বুদ্ধদেবের নিজস্ব কর্মকৃতি বৌদ্ধসঙ্ঘ গঠন। বৌদ্ধসঙ্ঘ সুশৃংখল সুনিয়ন্ত্রিত সন্ন্যাসাশ্রম—ইহা চতুরাশ্রমের একটি মাত্র নহে। দ্বীপবংশ,

---

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩৫৬, পৃঃ ২৯-৬১।

২। বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, ১৩৪১, পৃঃ ১৭৪।

৩। লেখক শিশু বুদ্ধের শরীরে ২২টি মহাপুরুষ লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন—পৃঃ ৯৩। বুদ্ধদেব বত্রিশটি মহাপুরুষ-লক্ষণ ও ৮২ অনুব্যঞ্জন-সমন্বিত ছিলেন, বাইশটি নহে।

দ্র—মহাপুরুষলক্ষণ সুত্র

মহাবংশ, অশোকের অনুশাসন, অশোকাবদান, কুনালাবদান প্রভৃতির উপাদান দ্বারা, 'বিন্দুসার ও অশোক'-এর জীবনকাহিনী লিখিত হইয়াছে। 'শৈবধর্মের বিবর্তন,—'শিব বনাম বুদ্ধ' প্রবন্ধ বেদের সংহার-দেবতা রুদ্র এবং ধ্যান-স্তিমিতনেত্র সমাধিমগ্ন বুদ্ধ কিভাবে পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছেন তাহার অতি সুন্দর একটি আলোচনা। বুদ্ধ অনাসক্ত উদাসীন, ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি সাধনে 'বৌদ্ধধর্ম কঠোর চিকিৎসকের ন্যায় ভবরোগীর ঘরে হানা দিয়া তাহাকে সর্ববিষয়ে নিবৃত্ত করে।' আর শিব একাধারে ত্যাগী উদাসীন শ্মশানবাসী হইয়াও উমাপতি, শিব-সমাধি আনন্দ-লোকে ডুবিয়া যাওয়া। বৌদ্ধনির্বাণ এবং শিব-সমাধি লেখক অতি সহজ-ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'আনন্দ এই নিত্যচঞ্চল ধ্বংসশীল জগতের চিরস্থায়ী মেরুদণ্ড, চঞ্চলের সঙ্গে—অনিত্যের সঙ্গে নিত্যবস্তুর সেতুবন্ধন। বৌদ্ধধর্মে এই আনন্দ নাই, কান্না ও হাহাকার আছে—হয়ত নির্বাণ-বারিপ্রক্ষেপে তাহা থামান যায়; কিন্তু ক্ষুৎপিপাসার জন্য যেরূপ অন্নজলের দরকার—শুধু হরীতকী চিবাইয়া উহা নিবারণ করা যাইতে পারে—কিন্তু মানবমন যে পরমপরিতৃপ্তি চায়—চঞ্চল ছোট ছোট তৃপ্তি যে স্থায়ী মহাতৃপ্তিকে ইঙ্গিত করে, সেকথা বৌদ্ধধর্ম বলে না। নির্বাণ ও সমাধিতে এই প্রভেদ। যদি নির্বাণ শূন্যবাদ হয়, তবে পূর্বেই বলিয়াছি শিব-সমাধি-আনন্দ-সাগরে ডুব দেওয়া।'[১] ভারতীয় বুদ্ধমূর্তির বৈশিষ্ট্য আলোচনায় লেখকের ভাবমুগ্ধ শিল্পীমনের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় বুদ্ধমূর্তি এবং গ্রীক শিল্পীর বুদ্ধমূর্তির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—প্রাচ্যশিল্পীর বুদ্ধ যতটা মানুষ তাহার অধিক দেবতা. গ্রীক শিল্পীর বুদ্ধ দেবতা নহেন, শরীরী মানব—একটি সংসারের সামগ্রী অপরটি ধ্যানলোকের।' তাঁহার ভাষায়—'মগধের বুদ্ধ ধীর, স্থির. নির্বিকল্প, প্রশান্ত—নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায়। তাঁহার ওষ্ঠাধরে, অবনমিত অক্ষিপুটে, এমন কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা নিবিড় শান্তির ছায়া—নির্বাণতত্ত্বের জীবন্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ। অপরদিকে গ্রীক প্রভাবান্বিত বুদ্ধের করাঙ্গুলিতে কোন কোন চিত্রে ধ্যানের উপযোগী মুদ্রালক্ষণ বিরাজমান, কিন্তু তাহা একান্তই বাহ্য। তাঁহার সমস্ত শরীরে জীবনের স্পন্দন স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হইতেছে—তাঁহার মুখের ভাবে কোন কথা বুঝাইবার চেষ্টা ও বাক্‌চাতুরী যেন

১। বৃহৎ বঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১।

সাংসারিক ভাবের ব্যঞ্জনা করিতেছে।'[২] বঙ্গগৌরব দীপঙ্করের সুদীর্ঘ জীবন-বৃত্তান্তও অতিশয় সহৃদয়তার সঙ্গে লিখিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া পালসাম্রাজ্য, পাল রাজবংশ, নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধবিহার এবং শান্তরক্ষিত, পদ্মনাভ, কমলশীল, নাগসেন, চন্দ্রগোমিন, জ্ঞানশ্রী, রত্নাকর শান্তি প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যদের জীবনবৃত্তান্তও বৃহৎ বঙ্গের অঙ্গীভূত হইয়াছে। 'বৌদ্ধসঙ্ঘের অবশেষ' প্রবন্ধে বুদ্ধদেবের সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা, এবং বৌদ্ধসঙ্ঘে তাহার বিষময় পরিণতির একটি ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন। এই ক্রমপরিণতির আদিস্তরে ভিক্ষুণীসঙ্ঘ এবং শেষস্তরে বাউল ও নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়। এই প্রবন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধসঙ্ঘ কত নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মবিষয়ক আলোচনায় দীনেশচন্দ্র সেন কোথাও স্বধর্মাভিমান অথবা সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করেন নাই। বিবেচনা-হীন সংস্কারের বশে সত্যের মহিমা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তথ্য ও বিচার-বিশ্লেষণের মানদণ্ডে লেখক পক্ষপাতশূন্য স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত

রজনীকান্ত গুপ্তের 'ভারতকাহিনী' গ্রন্থের 'অশোক', 'ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়', 'ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের প্রাধান্য', 'হিউএনথ্ সঙ্গের ভারত-ভ্রমণ'—প্রবন্ধসমূহে বৌদ্ধবিষয়ক আলোচনা স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধভারতের গৌরবমহিমা লেখক পরম শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে উপস্থাপিত করিয়াছেন। সংস্কৃত অবদান এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের The Sanskrit Buddhist Literature of Napal গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে অশোকের জীবনী রচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া লেখক মন্তব্য করিয়াছেন—"বৈষম্য হিন্দুদিগের মূলমন্ত্র, সাম্য বৌদ্ধদিগের ধর্মবীজ। হিংসা হিন্দুদিগের পুণ্যকর্মের প্রধান সাধন, অহিংসা বৌদ্ধদিগের ধর্মমন্দিরের পবিত্র সোপান। মায়াময় সংসার-পাশ হইতে বিমুক্তি অথবা স্বর্গলাভ হিন্দুদিগের অন্তিম সিদ্ধি, আত্মার বিধ্বংস অথবা নির্বাণপ্রাপ্তি বৌদ্ধদিগের চরম উদ্দেশ্য।'[১] লেখকের মতে হিন্দুধর্মের

২। বৃহৎ বঙ্গ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৩।

১। ভারতকাহিনী, রজনীকান্ত গুপ্ত, ৫ম সং, ১৯২৩, পৃঃ ৭৫।

পুনরাবির্ভাব, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে অবিশ্বাস এবং পারস্পরিক বিবাদপ্রিয়তা বৌদ্ধধর্মের পতনের কারণ।'[১] বহু বিঘ্নবিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া, বৌদ্ধশাস্ত্রে বহুদর্শিতা লাভের জন্য রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধে হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবিচলিতহৃদয় পর্যটকের বিঘ্নসঙ্কুল যাত্রা, তাঁহার অপূর্ব জীবনী ও তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখক পরম সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। লেখকের গভীর মনস্বিতা ও আন্তরিকতায় চৈনিক পর্যটকের কাহিনীতে একনিষ্ঠ সাধকের লোকোত্তর জীবনমহিমার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়াছে।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

অবিকৃতভাবে বৌদ্ধ পুরাতত্ত্ব ও বৌদ্ধদর্শন আলোচনার উদ্দেশ্যে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁহার 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি কোনপ্রকার কাহিনী বা কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করেন নাই। প্রাচীন পালি সাহিত্য, বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্য ও গাথার উপাদান বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন তিনি ললিতবিস্তর সূত্র, বুদ্ধচরিতকাব্য, লঙ্কাবতার সূত্র, অবদানকল্পলতা, বোধিচর্যাবতার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ, মহাবংশ, মহাপরিনির্বাণসূত্র, মহাবর্গ, জাতক ইত্যাদি পালিগ্রন্থ, Fo-pan-hhing-tsi-cin প্রভৃতি চীনা গ্রন্থ, Shaka-jitsu-roku প্রভৃতি জাপানী গ্রন্থ, মললংগরবত্থু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থ, গ-ছের-রোল্-প (ক্যাঙগুরের সূত্রপিটকের খ অধ্যায়) নামক তিব্বতীয় গ্রন্থ ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া 'বুদ্ধদেব' রচনা করিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থটিতে বিপুল বৌদ্ধজগতে প্রচলিত শাক্য সিংহের জীবনী ও কর্মৈষণার সর্বাঙ্গসুন্দর পরিচয় বিধৃত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে বুদ্ধ বন্দনামূলক উদ্ধৃতি আহরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'হিন্দুগণ প্রার্থিত না হইয়াও স্বয়ং শাক্যসিংহকে 'অবতার' এই উপাধি প্রদান করেন।'[২] এই কাজের পরিণতি সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—'পুরাণকারগণ বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া বৌদ্ধধর্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করেন।'[৩] লেখক বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত মার বিজয়ের সঙ্গে কুমারসম্ভব ও শিবপুরাণে বর্ণিত কন্দর্প জয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন।[৪] বহির্বিশ্বে দেশে

১। ভারতকাহিনী, 'ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম-এর প্রাধান্ত' প্রবন্ধ, পৃঃ ১১০।
২। বুদ্ধদেব, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ১৯০৪, পৃঃ ভূমিকা ঋ, পাদটীকা।
৩। ঐ.
৪। ঐ, পৃঃ ১০৪-১০৫।

দেশে শ্রীবুদ্ধের জীবন-কাহিনী যে অপরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে বিদ্যাভূষণ 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে বাংলাভাষায় তাহা সর্বপ্রথম উপস্থাপিত করিয়াছেন। গ্রন্থে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি লেখকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিচয়ও পাওয়া যায়।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বহুভাষায় পারদর্শী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পালিভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার রচিত বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ—'ভারত মহিমা', 'চার্বাক্‌-দর্শন', 'প্রাচীন ভারতবর্ষ', 'কার্যকারণ সম্বন্ধ' ইত্যাদি 'নানা প্রবন্ধ'[1] গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই রচনাসমূহে লেখকের যুক্তিবাদী মনন ও চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতমহিমা প্রবন্ধে সত্যসন্ধ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অতীত ভারতের মহিমোজ্জ্বল অধ্যায়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের মহানুভবতা, ত্যাগ এবং বৌদ্ধধর্মের অপার সহিষ্ণুতা ও মগধপতি অশোকের লোককল্যাণ ব্রতের বিষয় বিবৃত করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'পাশ্চাত্য ভূভাগে ঈশা যে প্রেমজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, পূর্বভাগে বুদ্ধদেবের প্রদীপ্ত প্রেমালোক কোন ক্রমেই তদপেক্ষা হীনপ্রভ নহে।'[2] 'চার্বাকদর্শন' প্রবন্ধে বৌদ্ধদর্শনের উপর তিনি ঋষি কপিলের সাংখ্যদর্শন এবং বুদ্ধদেবের উপর লোকায়ত মত প্রবর্তক বৃহস্পতির প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধদর্শনের নিরীশ্বরবাদ, দুঃখবাদ, ক্ষণিকত্ববাদ প্রভৃতি কপিল ও বৃহস্পতির মতবাদের মূলদেশে প্রোথিত। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি সরল বিশ্বাস রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনাসমূহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে।

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন

তাঁহার 'বুদ্ধদেব চরিত' জন্ম হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত বুদ্ধদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী। আদি লীলায় রাজা শুদ্ধোদন দৈব বিড়ম্বনায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করায় মহিষী মহামায়া তাঁহাকে এক দীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। যুবক সিদ্ধার্থের পিতৃভক্তি ও ইন্দ্রিয়সংযমের পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। জরাগ্রস্ত পিতার জন্য অজয় বৃক্ষের পত্ররস আহরণ করিতে গেলে রূপসী রমণী তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছে।

১। নানাপ্রবন্ধ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, ১৯১৪।
২। ঐ, পৃঃ ৯।

কালীপ্রসন্ন সমন্বয়বাদী মানসপ্রকৃতির অধিকারী। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পরস্পরবিরোধী নহে। যাহা বৌদ্ধদের নির্বাণ, হিন্দু যোগ-শাস্ত্রে তাহা কৈবল্য এবং বেদান্তে তাহাই ব্রহ্মদর্শন। বৌদ্ধদের বোধিসত্ত্ব এবং হিন্দুদের জীবন্মুক্ত পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তিনি লিখিয়াছেন—'বুদ্ধদেব যে নিরাময় পন্থা আশ্রয় করিয়া বোধিদ্রুমতলে নির্বাণজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নূতন সৃষ্টি বা নূতন প্রথা নহে। আমাদিগের হিন্দু যোগশাস্ত্রে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। উহারই নাম নির্বীজ সমাধি।'[১] হিন্দু-বৌদ্ধ-সমন্বয়বাদী মনোভাব দ্বারা তিনি পরিচালিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণকুমার মিত্র

তিনি 'বুদ্ধদেব চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের জন্মকথা হইতে অন্তিমকাল পর্যন্ত জীবনকথা স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থটি ললিতবিস্তরের অনুসরণে বুদ্ধদেবের ধারাবাহিক সুবিন্যস্ত জীবনচরিত। লেখক পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই গ্রন্থে লেখক সুত্তনিপাত, মহাপরিনিব্বাণসুত্ত, ধম্মপদ, ক্ষুদক পাঠ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বৌদ্ধনীতি, বৌদ্ধসমাজ, বৌদ্ধগল্প এবং বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও অবনতি প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের আলোচনা ইতিহাসাশ্রয়ী, তথ্যনিষ্ঠ ও লেখকের শ্রদ্ধানত মনের পরিচয়বাহী। তাঁহার মতে জগতে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুর পৃথক্ সত্তাতে বুদ্ধদেব বিশ্বাস করিতেন না। এই ব্রহ্মকে তিনি নির্গুণ নির্বিকার ও জগতের বস্তুনিচয়কে মায়া বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতেন না। 'সোহং' মত তখন সর্বত্র প্রচলিত। বুদ্ধও এই মতাবলম্বী ছিলেন।[২] এই গ্রন্থে লেখকের সত্যসন্ধ যুক্তিবাদী মননের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ

প্রাচীন ভারতের গৌরবজ্যোতি যাঁহার জীবনে প্রতিভাত সেই মঙ্গলময় পুরুষের পাদচারণের একটি পথমাত্র দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার 'শাক্যসিংহ'[৩] নামক জীবনী গ্রন্থ প্রণীত। জন্ম ও সংসার হইতে বুদ্ধত্বলাভের পর কপিলবস্তুতে প্রত্যাবর্তন ও পরিনির্বাণ পর্যন্ত জীবন-আখ্যান এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

১। বুদ্ধদেব চরিত, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, ১৩৩৪, পৃঃ ১০৭।
২। বুদ্ধদেব চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ৪র্থ সং।
৩। শাক্যসিংহ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ১৩১৯।

লেখকের মতে বিবেকবৈরাগ্য শমদমাদি, ষট্‌নিষ্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব, জগতের মূলকারণ—নাম-রূপহীন ইত্যাদি ঔপনিষদিক তত্ত্ব বৌদ্ধধর্মে অবিকৃতভাবে রক্ষিত হইয়াছে। পতঞ্জলির যোগসম্বন্ধীয় মতও বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত আছে। এই গ্রন্থে—বুদ্ধদেবের পূত জীবনের প্রতি তাঁহার অটলশ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

কৃষ্ণবিহারী সেন

যে সময়ে ভারতবর্ষের কোন ধারাবাহিক সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচিত হয় নাই, বিশেষ করিয়া ভারতের বৌদ্ধযুগ যখন কেবল পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টিমাত্র আকর্ষণ করিয়াছে সেই যুগে তিনি সম্রাট্ অশোকের জীবন ও কার্যাবলীর তথ্যবহুল 'অশোকচরিত' রচনা করেন। এই গ্রন্থটিই বাংলা-সাহিত্যে প্রথম সম্রাট্ অশোকের জীবন চরিত। লেখক ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া এই বিশেষ সময়ের তথ্য বাহির করিয়াছেন। নেপাল, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের ধর্মসাহিত্য হইতেও তিনি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন।[১] লেখক বৌদ্ধসাম্রাজ্যস্থাপনকারী অশোকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরাজ্য সংস্থাপনের সহায়তাকারী যুধিষ্ঠিরের তুলনা করিয়াছেন।[২] যে নূতন বিধান স্থাপনের জন্য শাক্যসিংহের আবির্ভাব তাহাই মহারাজাধিরাজ অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। তাঁহার নীতি কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না—ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা-ধারাকে তিনি জম্বুদ্বীপ হইতে সুদূর ইউরোপেও প্রেরণ করিয়াছিলেন। রোমান ক্যাথলিক ধর্মের উপর সেই প্রভাব এখনও বর্তমান।[৩] 'অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি' লেখক দিব্যাবদানের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। তিনি এখানে উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী চণ্ডাশোক নহেন, ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিয়াও সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, আপন মহত্বের ও বুদ্ধিমত্তার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভিক্ষু পিঙ্গলের সিদ্ধান্তানুযায়ী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার মতে পৃথিবীতে অশোকই প্রথম পশু ও মানুষের জন্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'বার্ধক্য ও মৃত্যু' অধ্যায়ে অশোকের

১। অশোকচরিত, কৃষ্ণবিহারী সেন, ১৯১০, ভূমিকা, ৴৹
২। ঐ, পৃঃ ৩।
৩। ঐ, পৃঃ ১২-১৩। 'ধর্মপ্রচারের' উপায় প্রবন্ধ।

সঙ্ঘকে শতকোটি স্বর্ণদানের প্রতিজ্ঞা এবং সর্বস্ব দানের পর সর্বশেষে আমলকী খণ্ড প্রেরণের আখ্যান বৌদ্ধ সংস্কৃত-সাহিত্য অবলম্বনে রচিত।

'বুদ্ধচরিত'[১]-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহেও লেখকের গবেষণাধর্মী মননের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বুদ্ধচরিত' প্রবন্ধসমূহে ললিতবিস্তরের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধপুরাবৃত্তের বিশ্লেষণে তাঁহার মনীষা সমধিক স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। জননীর উদরের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া বুদ্ধের অনৈসর্গিক জন্ম—বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে এই কাহিনী অবিশ্বাস্য কিন্তু বৌদ্ধগণ তাহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন। তাহার কারণ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—"বস্তুর দিক হইতে বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের সৃষ্টি, ভাবের দিক হইতে কবিতা, ভক্তি এবং ধর্মের সৃষ্টি। বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিলেন, ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া সংসারধর্ম পালন করিতে লাগিলেন, তাহার পর গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন ইত্যাদি ব্যাপার বুদ্ধির দিক হইতে দেখি এবং সেই সকল ব্যাপার লইয়া বুদ্ধের ইতিহাস রচিত হয়। আবার বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিলে সমুদায় জগৎ উৎফুল্ল ভাব দেখাইয়াছিল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহার সিদ্ধি হইবার সময় পাপপুরুষেরা বিকটাকার রূপ ধরিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল ইত্যাদি ব্যাপার ভাবের দিক হইতে দেখিতে হইবে এবং এই সকল লইয়া বৌদ্ধভক্তিশাস্ত্র, বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধকবিতা।'[২] পিতা শুদ্ধোধন পুত্রের গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু মনের দ্বার রুদ্ধ করিতে পারেন নাই। একদা চিত্রা নাম্নী এক সুন্দরী বয়স্যার মুখে বিভিন্নদেশের কাহিনী শুনিয়া সিদ্ধার্থ জানিলেন তাঁহার রাজভবনের বাহিরেও একটা জগৎ আছে। এই জগৎ দেখিবার জন্যই তাঁহার নগর-ভ্রমণে বহির্গত হওয়া। ভারতীয় ঋষিগণ আধ্যাত্মিক জগতে যত কিছু গূঢ় রহস্য তাহা সিদ্ধার্থের পূর্বেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই সাধনপথে তাঁহার তৃষ্ণা নির্বাপিত হয় নাই। জ্ঞানী সাধকদের কঠিন তপশ্চর্যার পথ তিনি স্বীয় জীবনে অনুসরণ করিয়া পরিত্যাগ করেন। 'বুদ্ধদেবের মনের ইতিহাস' প্রবন্ধে লেখক আলোচনা করিয়াছেন কিভাবে ন্যায়সঙ্গত যুক্তিবলে সিদ্ধার্থ নানা

১। সাধনা, ২য় বর্ষ, ১ম ভাগ, ১২৯৯—১৩০০, ২য় বর্ষ, ২য় ভাগ, ১৩০০, ৩য় বর্ষ, ১ম ভাগ, ১৩০০—১৩০১।

২। সাধনা, ৩য় বর্ষ, ১ম ভাগ, ১৩০০—১৩০১।

শাস্ত্রানুমোদিত স্থানীয় স্বর্গ সম্বন্ধীয় মতকে খণ্ডন করিয়া অধ্যাত্মজগতে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন।

চারুচন্দ্র বসু

উদার জ্ঞানময় বৌদ্ধধর্মের প্রতি লেখক বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। এই বৌদ্ধধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সম্রাট্ অশোকের প্রতি তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে 'অশোক' গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। প্রাচীন পালি সাহিত্যের কাহিনী, সিংহলী ঐতিহ্য মহাবংশ, দীপবংশ, সংস্কৃত অবদান, তিব্বতীয় কাহিনী, ব্রহ্মদেশীয় কাহিনী, কাশ্মীর দেশে প্রচলিত কাহিনী ইত্যাদি অবলম্বনে এই অশোক-জীবনী গ্রন্থ রচিত। রাজর্ষি ভারত-সম্রাট অশোকের ধীশক্তি, শৌর্যবীর্য, শাসনপ্রণালী, অসাধারণ আত্মত্যাগ, লোকহিতব্রত, বৌদ্ধধর্মানুরাগ লেখক সশ্রদ্ধচিত্তে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে—'নরকুলশ্রেষ্ঠ অশোক প্রাচীন ভারতের গৌরব ও দীপ্ত সূর্যস্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন। এই অশোক জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভারতবাসীর পূজা চিরদিন গ্রহণ করিতেছে'।[১]

অশোক একাধারে নিষ্ঠুর শাসক, নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ উপাসক ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। লেখক অশোক-জীবনের বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে অশোক চরিত্রের সেই বহুমুখী পরিচয় এই গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। অশোকের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে সেইযুগে ভারতবর্ষে সভ্যতা কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, শিল্পবাণিজ্য কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল তাহাও আলোচিত হইয়াছে। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের জীবনের বহু বিচিত্র আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থটির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে অশোক-জীবনের এত তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ ইতিপূর্বে আর রচিত হয় নাই। অশোকের শিলালিপির সহজ বঙ্গানুবাদ গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। চারুচন্দ্র বসু সুত্তপিটকের খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত 'ধম্মপদ' গ্রন্থের গদ্যানুবাদও প্রণয়ন করেন। বৌদ্ধসাহিত্য ও ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে লেখকের সুগভীর পরিচয় সাধনের ফলে পালি ধম্মপদের শ্লোকসমূহ অতি সুন্দর অথচ সহজভাবে বাংলাভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতির যুগে বৌদ্ধধর্মানুরাগী রাজা ধনভূতি ও তাঁহার প্রজাপুঞ্জের অর্থে এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভিক্ষুদের আগ্রহে ভারতে এক বিরাট

১। অশোক বা প্রিয়দর্শী ১৩১৮, উপক্রমণিকা, পৃঃ ৩৫

স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কালের গতিতে সেই স্তূপ ধ্বংস হইয়াছে। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'পাষাণের কথা' গ্রন্থে তাহার একটি পাষাণের মুখে অতীত ভারতের ইতিহাস—বৌদ্ধযুগের অতীত গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী, হিন্দুবৌদ্ধ ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত, উত্থান পতন ও অধঃপতন এবং ভারতের বিভিন্ন রাজবংশের বিশেষতঃ উত্তরাপথের উত্থান পতন ও শৌর্যবীর্যের কাহিনী প্রদান করিয়াছেন। এই কাহিনী প্রতি পংক্তিতেই ইতিহাস নয়, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের বহু শতাব্দীর ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া রচিত।

'পাষাণের কথা' কেবল বৌদ্ধযুগের ইতিহাস নহে, বৌদ্ধ সভ্যতার ইতিহাসও। তাঁহার মতে পারসিক আগমনের পূর্বে ভারতে মন্দির বা স্তূপ নির্মাণ করা হইত না। ভারতীয়গণ উন্মুক্ত গগনতলে—পর্বতে, গগনে, নদীতীর্থে দেব-অর্চনা করিতেন। তাহাদের প্রচেষ্টায় এইদেশে সর্বপ্রথম দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যবনশিল্পিগণের সাহায্যে, নৃপতি, উপাসক-উপাসিকা, বিখ্যাত ধনী ও শ্রেষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে নরপতি ধনভূতির রাজ্যে একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। বোধিসত্বপাদ আর্যাবর্তের অন্যতম মহাস্থবিরের আদেশে ভিক্ষু সিংহদত্ত তক্ষশীলা হইতে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষ এখানে আনয়ন করেন। এবং গর্ভচৈত্যের পাষাণ নির্মিত আধারে তাহা স্বর্ণপাত্রে স্ফটিকনিধানে রক্ষা করেন। চারিটি তোরণসহ স্তূপ ও তাহার বেষ্টনীর বর্ণনা একখানি পূর্ণাঙ্গ উজ্জ্বলচিত্রের ন্যায় লেখক পাষাণের কণ্ঠে উপস্থাপিত করিয়াছেন। স্তম্ভ, তোরণ, আবেষ্টনী এবং তাহার অলঙ্করণের বর্ণনা করিয়া বৌদ্ধতীর্থে স্থাপিত লক্ষ লক্ষ কেতনবাহী ধ্বজের আলোচনাপ্রসঙ্গে আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছেন—'সদ্ধর্মের গৌরবের তুলনায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের গৌরবও ক্ষীণ। সমস্বরে সদ্ধর্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের নামোচ্চারণ করা উচিত নহে'।[১]

শকরাজ কণিষ্ক কেবল আর্যাবর্তে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, বৌদ্ধধর্মও গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পোষণেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আর্যাবর্তের অভ্যন্তরে বৌদ্ধতীর্থসমূহের সংস্কার কার্য শুরু হইলে স্তূপের সংস্কারও আরম্ভ হইল। সম্রাট্ কণিষ্ক দুই শতাব্দী পরে স্তূপের গর্ভগৃহের লুক্কায়িত দ্বার উন্মুক্ত করিলেন এবং বুদ্ধের দেহাবশেষ বন্দনা করিলেন। সম্রাটের আদেশে গর্ভগৃহের দ্বার আবার বন্ধ

১। পাষাণের কথা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩২১, পৃঃ ৫২।

করা হইল। তিনি দ্বারের সম্মুখে গান্ধার শিল্পের নিদর্শন কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলেন। কণিষ্কপুত্র হুবিষ্কের রাজত্বেও বৌদ্ধধর্মের উন্নতি হইয়াছিল। ইহার পর পাটলিপুত্রের গুপ্তরাজবংশের অভ্যুদয়ের যুগ। গুপ্তরাজগণ সদ্ধর্ম বিরোধী নহেন, কিন্তু অনুরাগীও নহেন। এই সময়ে বৌদ্ধভিক্ষুগণের মধ্যেও অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি—'ইহারা সকলেই নিরক্ষর, বুদ্ধ অপেক্ষা উদরের প্রতি অধিক ভক্তিপরায়ণ, নির্বাণ লাভ অপেক্ষা তরুণী লাভের জন্য অধিক লোলুপ। ইহারা অর্থের জন্য নিরীহ তীর্থযাত্রিগণকে উৎপীড়িত করিত'।[১] গুপ্ত সম্রাট্‌গণের শাসনাধীনে আর্যাবর্ত তুষারময় মরুপ্রান্তের অধিবাসী বর্বর হূন দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হয়। হূনগণ কোশলযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজা ধনভূতির প্রতিষ্ঠিত স্তূপে অগ্নিপ্রদান করে। যুবরাজ স্কন্দ মুষ্টিমেয় সৈন্যসাহায্যে স্তূপ রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেন। কিন্তু হূনগণ বেষ্টনীর চতুর্দিকে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত করায় পাষাণবেষ্টনী উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ক্রমশঃ স্তূপের দক্ষিণতোরণ, উত্তর তোরণ, বহুযত্ননির্মিত গর্ভগৃহ, বেষ্টনী ধ্বংস হয়। অর্ধ বর্তুলাকার স্তূপও সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া যায়। দীর্ঘকাল পরে ধ্বংসীভূত স্তূপসন্নিধানে এক বৌদ্ধভিক্ষুর আবির্ভাব ঘটে। তিনি 'বিমলাকীর্তি-ভট্টারিকানিষ্পাদিতা' মন্ত্রে বন্যপুষ্পদ্বারা স্তূপ অর্চনা করিতেন। একদা পুষ্প-চয়নকালে তিনি এক মৃত্যুপথগামী সৈনিকের পরিচর্যা করিয়া তাহাকে প্রাণদান করেন। সৈনিক দীর্ঘকাল বৌদ্ধভিক্ষুর সান্নিধ্যে বাস করিয়া এবং তাঁহার প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনিই যশোধর্মদেব। তিনি গান্ধার ও কীর হইতে সমতট ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। জীবনদাতা ভিক্ষুর প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তিনি অজস্র অর্থব্যয়ে ভগ্ন স্তূপের সংস্কার করেন। আবার কণিষ্কনির্মিত রাজপথের সংস্কার হইল। স্তূপের ভগ্নাবশেষ পরিষ্কার করা হইল। স্তূপের চারি তোরণে চারিটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া অভ্যন্তরে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ উদ্ধার হইল না। বৌদ্ধভিক্ষুগণ একটি স্বরচিত উদ্‌ভট কাহিনী প্রচার করিয়াছিলেন—'শক সম্রাট্ কণিষ্কের মৃত্যুর পর স্তূপগর্ভস্থ বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ দেবরাজ ইন্দ্র তুষিত স্বর্গে লইয়াছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহার ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন'।

১। পাষাণের কথা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।

ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম ও সঙ্ঘ ভারতবর্ষে চরম অধঃপতনকে স্বাগত জানাইয়াছে। লেখকের ভাষায় 'তখন ধর্মের নাম স্বার্থসাধন, সঙ্ঘের নাম কামাচার ও বুদ্ধের নাম বিশ্বাসঘাতকতা'।[১] যথেচ্ছাচার ও বিশৃংখলা এবং অদম্য কাম ও অসহ্য লালসা সদ্ধর্মে সত্যকে বিতাড়িত করিয়া অসত্যকেই প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। দেশে-বিদেশে—উত্তরমেরু প্রান্তে, মেরুবাসী মৎস্যভুক বামনরাজ্যে, উত্তরকুরুর সুদীর্ঘ মরুপ্রান্তে, সুবর্ণ ভূমিতে সর্বত্র বৌদ্ধধর্মে চরম অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে, আর্যাবর্তেও—'সদ্ধর্ম আছে, বুদ্ধ আছে, কিন্তু সারবস্তুর অভাব'।[২] এক 'বুদ্ধ' আর বৌদ্ধদের তৃপ্তি দিতে পারিতেছেন না—চতুর্বিংশ বুদ্ধ, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ, মানসী বুদ্ধ এবং অসংখ্য বোধিসত্ত্ব শক্তি-সমন্বিত হইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছেন, ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির জন্য সুরা-নারীও বাদ যায় নাই। ক্রমশ স্তূপের পার্শ্বে সুরাবিপণী প্রতিষ্ঠিত হইল। সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুগণ নিজেদের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। নিশীথ রজনীতে সঙ্ঘারামের অভ্যন্তরে নৃত্যগীতের আয়োজন হইত। শক্তির অধিকার লইয়া ভিক্ষু ও রাজসৈনিকের মধ্যে কখনও কখনও দ্বন্দ্বযুদ্ধও চলিত। ভিক্ষুগণ কাষায় বস্ত্রের পরিবর্তে রক্তাম্বর পরিধান করিতেন। তবে এই সময়েও দেশে যথার্থ বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন। মহারাজ যশোধর্মদেবের সঙ্গে যাঁহারা স্তূপদর্শনে আগমন করেন তাঁহারা কাষায় বস্ত্র পরিহিত ছিলেন, পর্ণকুটিরে বাস করিতেন এবং শক্তিসমন্বিত উচ্ছৃংখল বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বগণের সংস্পর্শে আসিতেন না। যাহারা শক্তিমণ্ডলী-সমন্বিত হইয়া বাস করিত লেখক তাহাদের চরিত্রভ্রষ্টতা, অর্থ-লালসা ও সংকীর্ণচিত্ততার প্রচুর উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। সম্রাট্ যশোধর্মদেবের মৃত্যুর পর এই সঙ্ঘারামে আবার দুঃসময় উপস্থিত হয়। দীর্ঘকাল পরে আটবিক প্রদেশের মৃৎস্তূপে পরিণত সঙ্ঘারাম শৈব সন্ন্যাসীদের বাসস্থানে পরিণত হয়। ভগ্নস্তূপের পাষাণখণ্ডদ্বারা তাঁহারা গৃহ নির্মাণ ও স্থাপন করিয়া লইয়াছিলেন। এই ছিন্ন গৈরিক পরিহিত, জটাজূটধারী জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসিগণ বর্বর আটবিক জাতিকে প্রাচীন আর্যসভ্যতার আলোয় সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। মঠাধীশ ছিলেন আটবিক প্রদেশের মুকুটবিহীন সম্রাট্। এইভাবে শতাধিক বর্ষ অতীত হইলে বৌদ্ধসম্রাট্ হর্ষবর্ধন তীর্থযাত্রার অজুহাতে আটবিক প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। হর্ষের স্তূপে

১। পাষাণের কথা, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৬।
২। ঐ, পৃঃ ১৩৮

আগমন ভক্তিপ্রণোদিত তীর্থযাত্রা নহে—প্রচ্ছন্ন দক্ষিণাপথ বিজয়যাত্রা। শৈবসন্ন্যাসিগণ ভগ্নপ্রাকারের একটুক্‌রা পাষাণখণ্ডকে মার্জনা করিয়া শিবলিঙ্গের আকার প্রদান করেন এবং দেবাদিদেব মহাদেবরূপে অর্চনা করেন। কালে বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষের উপর বিশাল শৈব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। যবন আক্রমণে এই শৈব মন্দির লুণ্ঠিত এবং গদা ও পরশুর আঘাতে শিবলিঙ্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। দীর্ঘকালের ব্যবধানে আবার সেই ভগ্ন পাষাণের স্তূপ অরণ্যবাসী আটবিক জাতির পূজার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। অবশেষে শ্বেতাঙ্গ প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহামের গবেষণার ফলে উপরের নবীন পাষাণস্তরের নিম্নে শৈব সন্ন্যাসীদের নির্মিত মন্দিরের তলদেশ হইতে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইল। সম্রাট্‌ যশোধর্মদেবের সংস্কার কার্যের নিদর্শন, ধনভূতির যুগের শিল্পনিদর্শন ভূগর্ভের অন্তরাল হইতে স্তরের পর স্তর আবিষ্কৃত হইল। ইহাই 'পাষাণের কথার' শত শতাব্দী প্রসারিত কাহিনী। ইতিহাস যেখানে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে লেখক সেখানে কল্পনার পাখায় ভর করিয়াছেন, আবার কল্পনা যেখানে অবাস্তর লেখক সেখানে ইতিহাসের নজির আনিয়াছেন। সুতরাং পাষাণের কথা কেবল ইতিহাস নয়, আবার শুধু কল্পনাও নয়—ইহা একাধারে ইতিহাস ও কল্পনার সমন্বয়।

ভারহুত স্তূপ—একদা যাহার প্রশান্ত সৌন্দর্য, সুষমা এবং অটল গাম্ভীর্যের পদতলে মানুষ শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছিল অত্যাচারীর করস্পর্শে তাহা শ্রীভ্রষ্ট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। পাষাণখণ্ডের ধ্যানদৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাসের বিশেষতঃ বৌদ্ধভারতের শত শত বৎসরের ইতিবৃত্ত অতি সহজভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। পাষাণের মূক কণ্ঠে লেখক যে ইতিহাস প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মননিষ্ঠ গবেষণা এবং গভীর নিদিধ্যাসনের সার্থক ফলশ্রুতি।

হীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হীরেন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ 'বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা'। এই গ্রন্থে লেখক অপূর্ব মনস্বিতা ও বৌদ্ধশাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা অপবাদের নিরসন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব তাঁহার সমসাময়িককালের চার্বাক, জাবালি ও অন্যান্য নাস্তিক মতসমূহ দৃঢ়কণ্ঠে যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন। লেখক প্রমাণিত করিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম নীতিপ্রবণ এবং বুদ্ধদেব প্রেয়ঃবাদী নহেন, শ্রেয়ঃবাদী। প্রবৃত্তিমার্গী সুখের বাসনাকে সংযত করিয়া শ্রেয়ঃপথে, অনুত্তর পরাশান্তির পথে যাত্রা করিতে হইবে ইহাই তাঁহার দেশনা।

ধম্মপদ ও দীঘনিকায় অবলম্বনে লেখক দেখাইয়াছেন বুদ্ধদেব পরলোক এবং স্বর্গনরকেও বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল—'ভোগ নয়, ত্যাগ সংযোজন নয়, বিসর্জন—অর্জন নয়, বর্জন—আদান নয়, প্রদান—কামের প্রচয় নয়, 'তণ্হা' (তৃষ্ণার) বিজয়—মমত্বের প্রসার নয়, অহংত্বের সংকোচ।'[১] এই গ্রন্থের 'জড় না চিৎ'[২] প্রবন্ধে লেখক বিজ্ঞানধাতু, বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞান, শূন্য ও ব্রহ্ম প্রভৃতি তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আরো প্রমাণিত করিয়াছেন যে বুদ্ধদেব জড়বাদী নাস্তিক নহেন—বিজ্ঞানবাদী আস্তিক। তিনি এক অজাত, অভূত, অকৃত, অসংখত নিত্য সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। বেদান্তের ব্রহ্ম ও বৌদ্ধ শূন্যকে তিনি এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন—'বেদান্তের যাহা ব্রহ্ম, বুদ্ধদেবের পরিভাষায় তাহার নাম শূন্য—কারণ সবিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে যিনি পূর্ণ—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং—নির্বিশেষ দৃষ্টিতে তিনিই শূন্য, মহাশূন্য—নেতি নেতি—অথাত আদেশো নেতি নেতি।'[৩] সুতরাং বুদ্ধদেব শূন্যবাদী কিন্তু নাস্তিক নহেন। তাঁহার বুদ্ধি বোধিতে পরিণত, অন্তর সমথ স্তরে উন্নীত। বুদ্ধদেব বেদনিন্দক এবং অহংপর—এই অপবাদসমূহও লেখক বৌদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রানুমোদিত পথে নিরসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যিনি বহুজনহিতায় ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহার চিত্ত কথনও অহংপরতাদ্বারা আবৃত হইতে পারে না। তাহা ছাড়া বুদ্ধদেব বেদের জীবঘাতী যজ্ঞবিধানের ও কর্মকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন, তিনি সেই পুরাণী প্রজ্ঞারই প্রচারক। বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদী, দুঃখবাদী ও অনাত্মবাদী প্রভৃতি অপবাদও তিনি নিরসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের 'নির্বাণ কি'?[৪] প্রবন্ধে লেখক দার্শনিক মনীষা ও বৌদ্ধশাস্ত্রে গভীর বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মতে নির্বাণ অস্তিত্ব নয়, ইহা অস্তিনাস্তির অতীত এবং যিনি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত তিনি গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুষ্প্রতিগ্রহ, যেমন মহাসমুদ্র। এ যেন বহমান সমুদ্রের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। এইজন্যই ইহা অকথ্য, অচিন্ত্য এবং অতর্ক্যও। নির্বাণ ভূমানন্দ, পরাশান্তি, নির্বাণী 'অস্তংগত', নির্বাণ অমৃত। বুদ্ধদেব নেতি নেতি পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

১। বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৪৩, পৃঃ ২০।
২। ঐ, পৃঃ ৩০।
৩। ঐ, পৃঃ ৩৭।
৪। ঐ, পৃঃ ১১৩।

লেখকের মতে বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদীও নহেন, তিনি অজাত, অভূত, অকৃত, অসংখত এক বিশ্বাতিগ সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়াছেন, যাহা অজ্ঞেয়, অমেয়, অবাধ্য এবং অনির্দেশ্য। ইহার উৎপত্তি, বিনাশ, স্থিতি, চ্যুতি. গতি কিছুই নাই। বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম এবং বুদ্ধদেবের শূন্য একাত্মক। দুই-ই উদয়ব্যয়ের অতীত, নিত্য, সত্য, শাশ্বত। লেখক বুদ্ধদেবের নাস্তিক্য অপবাদ নিরসনকল্পে গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের নজিরে বৌদ্ধধর্মের বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আলোচনার মধ্য দিয়া বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি লেখকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। পালি এবং সংস্কৃত উদ্ধৃতির বাহুল্য সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে লেখকের চিন্তার সৌষম্য এবং শাস্ত্রসম্মত যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে বুদ্ধদেব অবতার নহেন, উত্তার। তিনি লিখিয়াছেন, 'বুদ্ধদেবকে অবতার বলা অসংগত, আমরা দেখিয়াছি অবতার বলিলে পরব্যোম হইতে বৈষ্ণবী শক্তির প্রপঞ্চে অবতরণ বুঝায়। কিন্তু গৌতম বুদ্ধও এরূপ অবতার নহেন, তিনি 'উত্তার'—জন্মজন্মান্তর ধরিয়া উদগ্র সাধনাদ্বারা পারমিতার পর পারমিতা সংগ্রহ করিয়া, দীক্ষার পর দীক্ষা অতিক্রম করিয়া অবশেষে সিদ্ধার্থদেহে তিনি পরিনির্বাণের চরম চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন। সিদ্ধির ব্যাপার অবতরণ নহে,—উত্তরণ। অতএব তাঁহাকে অবতারমধ্যে গণ্য করা অসঙ্গত।'[১]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য-সাধক শিল্পী ও ভাবমুগ্ধ প্রবন্ধকার। বৌদ্ধশিল্পীর শান্ত সংযত মহৎ প্রচেষ্টা এবং বৌদ্ধশিল্পের সরল ও কল্যাণময় শুভ্রদীপ্তি তাঁহাকে প্রণোদিত করিয়াছে। বৌদ্ধশিল্পের সারল্যকে তিনি অপূর্ব উপমা সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় "বালির স্তূপ গড়লে ছেলেতে আর পাথরের স্তূপ গড়লে বৌদ্ধরাজা—সাজের বাহুল্য এবং রূপের সমাবেশ ইত্যাদি নিয়ে আরো অনেকখানি পরিপূর্ণ হল বৌদ্ধস্তূপ, কিন্তু রূপটা রইলো সেই ছেলের গড়া বালির স্তূপেরই।'[২] তাঁহার মতে বৌদ্ধশিল্প প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারার উত্তরাধিকারই বজায় রাখিয়াছে, ইহা নূতন উন্মেষ নহে। আর্য-পূর্ব ভারতের শিল্পচেষ্টা, রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যানবস্তু এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের নানা চিন্তা কিভাবে বৌদ্ধশিল্পে উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে তাহা তাঁহার কোমল

১। অবতার তত্ত্ব, ১৩৩৫, 'অন্যান্য অবতার' প্রবন্ধ, পৃঃ ১৫৮
২। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ২৮১।

প্রাণময় ভাষায় বিবৃত হইয়াছে—'সাহিত্যের জাতকের উপাখ্যানসমস্ত বলে চলেছে কোন আর্য-পূর্ব যুগের বনবাসী অবস্থার নানা জন্তু-জানোয়ার সমস্তর উপাখ্যান। এই বৌদ্ধযুগে আর্যেরা যেন আর একবার পুনরাবৃত্তি করে চলেছে সব দিক দিয়ে সেই পুরাতনী উষায় আলো অন্ধকারে ঘেরা অবস্থা, রাবণ রাজার অশোকবনের স্মৃতি অনেকখানি। মায়াদেবীর অশোকতলার মূর্তিখানিতে দেখা গেলো, বুদ্ধের কণ্ঠক ঘোড়া ইন্দ্রাদি দেবতা তাকে অনুসরণ করছেন, ধর্মচক্র সে একচক্র সূর্যের আকারে দীপ্তি পাচ্ছে স্তম্ভের উপরে, সাঁচিস্তূপের কল্পতরুর ছায়ায় বুদ্ধের চরণচিহ্ন মনে পড়াচ্ছে শ্রীরামের পাদুকা কিংবা তারও আগেকার বনস্পতির পূজাটি।'[১] বৌদ্ধচৈত্যে, মঠে ও বিহারের গাত্রে তিনি বৈদিক যুগের স্মৃতিচারণের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বৌদ্ধ-যুগের অলঙ্কারশিল্পে ইন্দ্রের বজ্র, এবং ধর্মচক্রে এবং গোলাকার পদ্মে প্রাচীন ঋভুগণের নির্মিত রথের চাকার নবরূপায়ণের আভাস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষের বৌদ্ধশিল্প—'তুরস্ক হইতে জাপান একদিকে চীন তাতারের উত্তর সীমা আর একদিকে দক্ষিণ মহাসাগর—এই বিরাট ভূখণ্ডে' শিল্পকে অনুপ্রাণিত করিয়া এক অখণ্ড এশিয়াটিক আর্টের জন্মদান করিয়াছিল। চীন, জাপান, তুরস্কের মরুপ্রান্তর এবং বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় শিল্পের মহিমার স্বাক্ষর এখনও বিরাজিত। বৌদ্ধশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—ইহা যে দেশে গিয়াছে সেই দেশীয় শিল্পকে গ্রাস করে নাই—সঞ্জীবিত, প্রণোদিত ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। তাঁহার মতে বিশ্বের কলালক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠতম দান—বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্তি—'যে স্তরে এই বুদ্ধমূর্তির আসন, গ্রীক মূর্তিশিল্প তাহার সমস্ত নৈপুণ্য, সমস্ত সৌন্দর্য লইয়া, শিল্পের সেই স্তরে আসিয়া পৌছে নাই'।[২] পার্থিব মূর্তি বা জীবন্ত সত্যমূর্তি অপেক্ষা ধ্যানমূর্তি অর্থাৎ শিল্পীর মানসলোকে অধিষ্ঠিত সত্যমূর্তির রূপদানেই ভারতশিল্পীর কৃতিত্ব সমধিক। বৌদ্ধশিল্পীরা 'শুধু যে নিপুণ কারিগর ছিলেন তাহা নয়, তাঁহারা সাধক ছিলেন, কবিও ছিলেন।' নেপালের বৌদ্ধভিক্ষুগণ একাধারে শিল্পী ও ধর্মগুরু। বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ যে স্পর্শমণি লাভ করিয়াছিলেন তাহার অধিকার ভারতীয় সাধকগণ দেশে দেশে বহন করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল বৌদ্ধধর্মের করুণা ও মমতা, প্রীতি ও জ্ঞানই বহন করিয়া

১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ২৭০।
২। ভারতশিল্প, পৃঃ ২৯।

লইয়া যান নাই, শিল্পসৌন্দর্যের সুষমা ও সুরভিও সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। এই জন্যই বৌদ্ধশিল্প ধর্মকল্প তরুকে আশ্রয় করিয়া সঞ্জীবিত হইয়াছে। তাঁহার মতে গ্রীকশিল্প মানবসৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের নিদর্শন, বৌদ্ধশিল্প অধ্যাত্মসৌন্দর্যের পরিচায়ক। এইজন্য গ্রীকশিল্পীর কীর্তিস্তম্ভশিখরে গ্রীকবীরের প্রতিমূর্তি কিন্তু অশোকস্তম্ভশিখরে রাজা অশোকের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয় নাই, স্থাপিত হইয়াছে ধর্মচক্র, অশ্ব, ষাঁড়, চারি সিংহমূর্তি ইত্যাদি যাহা বুদ্ধের জীবনকৃতির প্রতীকরূপে চিহ্নিত। ভারতীয় আর্যশিল্পকে তিনি তিন স্তরে ভাগ করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও মোগল। ব্রাহ্মণ্য দেবতা অদ্ভুত দর্শন নরসিংহ, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, চতুর্ভুজ বিষ্ণু, নবদূর্বাদল শ্যাম শ্রীরামচন্দ্র, নবঘনশ্যামকান্তি শ্রীকৃষ্ণ—ইহারা পার্থিব সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু মহামুক্তির আনন্দোচ্ছ্বাস ইহাদের অলোকসামান্য প্রকাশে সমুচ্ছ্বসিত। পৃথিবীর সঙ্গে, বাস্তবজীবনের মানুষের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। বৌদ্ধযুগের শিল্পও মানুষের কাছে ধরা দেয় নাই। কিন্তু কাছে আসিয়াছে। বৌদ্ধশিল্প নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের শরণ লইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বৌদ্ধশিল্প ভারতীয় শিল্পের চিরন্তন ধারাকে অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছে। কারণ 'ব্রাহ্মণ্যযুগে সে মেঘরাজ্যে বসিয়া ছিল, এখন ধরাতলে, কিন্তু দৃষ্টি সেই ঊর্ধ্বমুখেই আছে।'[১] বৌদ্ধশিল্পের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা কেবল সাহিত্যের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে নাই। 'বুদ্ধ ও সুজাতা' চিত্রও সৌন্দর্যসাধক শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম কীর্তি।

বৌদ্ধভিক্ষু নালকের জীবনী শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সৃষ্টি, অপূর্ব পরিমিতিবোধ এবং রসজ্ঞানের পরিচায়ক। ভিক্ষু নালকের জীবন কাহিনী প্রধানতঃ পালি 'নিদান কথা' এবং 'সুত্ত নিপাত' গ্রন্থে পাওয়া যায়।[২] পালি ঐতিহ্যে তাঁহার যে জীবন-আখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ—সে যুগের প্রখ্যাত ঋষি কালদেবল রাজা শুদ্ধোদনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পৃথিবীতে বুদ্ধের আবির্ভাব সময় আগতপ্রায় অনুভব করিয়া ঋষি তাঁহার ভগিনীর বাড়ী গমন করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—'তোমার পুত্র কোথায়?' —'প্রভু, সে গৃহাভ্যন্তরে আছে।' বালককে আহ্বান করা হইলে ঋষি ভাগিনেয়কে বলিলেন—'রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে একটি পুত্র জন্মিয়াছেন যিনি

১। ভারতশিল্প, পৃঃ ৫৩।

২। নিদান কথা, Fausboll, Jātaka, Vol. I, P. 55, সুত্তনিপাত, নালকসুত্ত সংযুক্ত নিকায়, শ্লোক সং, ৬৭৯-৭২৩।

আজ হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে বুদ্ধ হইবেন এবং তুমি তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে, আজই তুমি সংসার পরিত্যাগ কর।' বালক নালক রাজার নিকট হইতে কাষায় বস্ত্র মৃৎপাত্র খরিদ করিল, মস্তক মুণ্ডন করিল এবং ভবিষ্যৎ বুদ্ধের উদ্দেশ্যে যুক্তকরে বলিল—'আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবকে অনুসরণ করার জন্য সংসার ত্যাগ করিলাম।' নালক হিমালয়ে গমন করিয়া ভিক্ষু-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। নালক তাঁহার নিকট 'মোনেয় পাটিপদা' সম্পর্কীয় দেশনা লাভ করিলেন। সেই মোনেয় পাটিপদা অনুসরণ করিয়া হিমালয়ের সুবর্ণ পাহাড়ের নিকট তিনি চিরনির্বাণ লাভ করিলেন।

নালকসুত্তেও বলা হইয়াছে অসিত ঋষি তুষিত লোকের দেবগণের নিকট রত্নশ্রেষ্ঠ বোধিসত্ত্বের শাক্যগ্রামে জন্ম গ্রহণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বীয় ভাগিনেয়ের প্রতি কৃপাপরবশ হইলেন এবং ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে জিনের প্রতীক্ষায় বাস করিতে প্রণোদিত করিলেন। অসিত কর্তৃক অনুজ্ঞাত সংযতেন্দ্রিয় ও সঞ্চিতপুণ্য নালক ভগবান বুদ্ধের নিকট 'শ্রেষ্ঠ মৌন' সম্বন্ধে দেশনা লাভ করিয়াছিলেন।

এই কাহিনীদ্বয়ের সঙ্গে 'নালক' গ্রন্থের রূপগত সংহতি ও সাদৃশ্য স্পষ্ট সূচিত হইতেছে। দেবল ঋষি যোগবলে আকাশে সাতরঙের ধ্বজা দেখিয়া বুঝিয়াছেন বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিবেন। ঋষি কপিলবস্তু গমন করিয়া শিশু গৌতমের পদধূলি সর্বাঙ্গে মাখিয়া লইলেন। তারপর নালককে লইয়া বিশ্বপথে বাহির হইলেন। নালকের মামাকে বলিলেন—'দুঃখ কোরো না, আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে নালককে ফিরে পাবে। ভয় কোরো না, এস, তোমার নালককে বুদ্ধদেবের পায়ে সঁপে দাও।' বুদ্ধ পূজারীর পূজামন্ত্রে শিশু নালক একটি ফুলের ন্যায় ভাবীবুদ্ধের চরণে উৎসর্গিত হইয়াছে। এই ঘটনা পালি কাহিনীতে নালকের ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের সঙ্কেতে আভাসিত হইয়াছে। নিবিড় বনে নালকের ধ্যানজীবন এবং ধ্যানে ভাবীবুদ্ধের সমগ্র জীবনের আনুপূর্বিক ছবি দর্শন—বুদ্ধদেবের জন্য প্রতীক্ষারত নালকের তদ্‌গত প্রাণতার নিদর্শন। নালকের ধ্যানে রাজকুমার সিদ্ধার্থের যে জীবনছবি প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা কবিকল্পনায় সমুজ্জ্বল এবং আবেগদীপ্ত হইলেও বক্ষ্যমাণ বিষয়ে বুদ্ধদেবের জীবনের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। নালকের ধ্যানের শেষ ছবি—গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। পালি গ্রন্থে বুদ্ধদেব তাঁহার ঋষিপত্তনে

প্রথম দেশনা দানের সপ্তদিবস পরে নালককে 'মোনেয় পাটিপদা' সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। নালক গ্রন্থে দেবল ঋষি তাঁহাকে মাতার কাছে যাওয়ার জন্য ছুটি দিয়াছেন, আবার সে জানিতে পারিয়াছে সারনাথে ঋষিপত্তনের পথে বুদ্ধদেব আসিতেছেন। এমন দিনে নালক মাতাকে দেখিবার জন্য নিজের গ্রামের পথে যাত্রা করিয়াছে কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতে বুদ্ধ-শিষ্যের অনাগারিক জীবনব্রত গ্রহণের আকুতিও প্রকাশ করিয়াছে। সে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়াছে—'যেদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকাপড়া ফুলটির মত তাকে তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝগঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন।'[১]

প্রমথ চৌধুরী

মননধর্মী প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক রচনায় লেখক গভীর অনুধ্যান অপেক্ষা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বুদ্ধিনির্ভর আলোচনার পথ গ্রহণ করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষের ঐক্য' প্রবন্ধে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও বৈদিক ধর্মের তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—'বৈদিকধর্ম আর্যদের গৃহধর্ম, বড় জোর কুলধর্ম। সমগ্র দেশকে একাত্ম করিবার ক্ষমতা সে ধর্মের ছিল না।'[২] অন্যত্র—'বৌদ্ধ ধর্মও অবৈদিক ধর্ম এবং সার্বজনীন বলে তা সার্বভৌম ধর্ম।'[৩] তাঁহার মতে বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের সঙ্গে বৌদ্ধঐতিহ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম এতই ঘনিষ্ঠতর নৈকট্য বজায় রাখিয়াছে যে প্রচলিত হিন্দুধর্মকে লেখক মহাযানধর্মের রূপান্তররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু ঘটে নাই—মহাযানের রূপান্তরিত রূপ হিন্দুধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম আত্মরক্ষা করিয়াছে মাত্র। তিনি লিখিয়াছেন—'ও ধর্মমত উপনিষদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বর্তমান হিন্দুধর্মে পরিণত হয়েছে—জ্ঞানের ধর্ম কালক্রমে ভক্তির ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে।'[৪] তিনি বৌদ্ধ যুগের যথার্থ ইতিহাস রচনার উপাদানরূপে কেবল প্রত্নতত্ত্বের উপর নির্ভর না করিয়া বৌদ্ধপুরাতত্ত্বকেও সমান মর্যাদা দানের পক্ষপাতী। তাহা হইলেই বৌদ্ধ-যুগের মৃতকঙ্কালে প্রাণ সঞ্চার হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

পালিভাষায় কৃতবিদ্য মহেশচন্দ্র ঘোষ পালি ঐতিহ্য অবলম্বনে তাঁহার 'বুদ্ধপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ রচনা করেন। গৌতমবুদ্ধের আত্মচরিত রচনায় তিনি

১। নালক, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৮৭।
২, ৩। প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, প্রমথ চৌধুরী, পৃঃ ৬।
৪। মুখপত্র, বৌদ্ধধর্ম, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৬।

ত্রিপিটকের যে যে অংশে বুদ্ধদেব নিজে ভিক্ষুদের নিকট আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই উপজীব্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনা অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য হইয়াছে। তাঁহার মতে (১) গৌতম বুদ্ধ চারিদিনে চারি নিমিত্ত দর্শন করিয়া সংসার ত্যাগ করেন, (২) গৌতম রাত্রিতে নিদ্রিতা নারীদের অশোভন দেহভঙ্গী দর্শন করেন, এই সমস্ত শাক্যসিংহ গৌতমের জীবনের ঘটনা নহে। দীঘনিকায়ের অন্তর্গত 'মহাপদান' সুত্তন্তের বিপশ্বীবুদ্ধের এবং বিনয়-পিটকের মহাবগ্‌গ নামক গ্রন্থে বর্ণিত যশের কাহিনী বুদ্ধচরিতের লেখকগণ বুদ্ধদেবের উপর আরোপ করিয়াছেন।

তাঁহার রচনার প্রধান গুণ সমন্বয়মুখী মানসপ্রবণতা। উপনিষদের ব্রহ্ম ও বৌদ্ধ নির্বাণের স্বরূপধর্ম সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনায় এক উদার অপক্ষপাত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। নির্বাণ ও ব্রহ্মের তুলনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"নির্বাণ ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের মধ্যে অতি আশ্চর্য সাদৃশ্য। এ সাদৃশ্য যে কেবল অবর বিষয়ে তাহা নহে, মৌলিক তত্ত্বেও সাদৃশ্য এবং একত্ব। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই।[১] বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তন্মধ্যে বুদ্ধের ধর্ম (প্রবাসী ১৩১৬ কার্তিক) ক্ষেমা প্রসেনজিৎ সংবাদ (ঐ, ১৩১৭ বৈশাখ), পরম বিমোক্ষ (ঐ, জ্যৈষ্ঠ), নির্বাণ (ঐ, শ্রাবণ), বুদ্ধের ব্রহ্মবাদ, (ঐ, ১৩১৮, শ্রাবণ) বুদ্ধের ধর্মে ব্রহ্মের স্থান, (ঐ, ভাদ্র) দ্বিবিধ নির্বাণ (ঐ, আশ্বিন) বুদ্ধ ও পতঞ্জলি (ঐ, ১৩২৫, ভাদ্র), গৌতমের তপস্যা (ঐ, ১৩৩০, আশ্বিন) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আলোচনায় গভীর চিন্তাশীলতা ও যুক্তিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

তাঁহার প্রাতিমোক্ষ পালি 'পাতিমোক্‌খ'[২] গ্রন্থের অনুবাদ। ইতিপূর্বে সতীশ

১। বুদ্ধপ্রসঙ্গ, ১৩৬৩, পৃঃ ৫৭।

২। পালি পাতিমোক্‌খ দ্বিবিধ :—'ভিক্‌খু পাতিমোক্‌খ' ও 'ভিক্‌খুণী পাতিমোক্‌খ'। ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের নিয়মাবলী আট প্রকার, যথা ১। পারাজিকা—৪ ভিক্ষুর ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধে ভিক্ষু সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইবেন। ২। সঙ্ঘাদিশেষ—১৩। এই অপরাধমুক্তির জন্য আদিতে ও অন্তে সঙ্ঘের প্রয়োজন আছে বলিয়া ইহার এই নামকরণ। এই অপরাধে ভিক্ষু ছয় দিন পৃথক্‌ বাস করিতে বাধ্য থাকেন। ৩। অনিয়ত—২, ৪। নৈসর্গিক প্রায়শ্চিত্ত—৩০। এই অপরাধে ভিক্ষুকে সেই সেই বস্তু পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে হয়। ৫। প্রায়শ্চিত্তিক—৯২। এই অপরাধসমূহও প্রায়শ্চিত্তার্হ। ৬। প্রতিদেশণীয়—৪। ইহা কেবল স্বীকার করিলেই অপরাধমুক্তি ঘটে ৭। শৈক্ষ্য—৭৫। ইহা কেবল সদাচার বিষয়ক নিয়মাবলী। ৮। অধিকরণ সমথা বা বিবাদ শান্তিকর—৭। ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ হইলে তাহা কিভাবে মীমাংসা করিতে হইবে তাহার নাম।

চন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রাতিমোক্ষের অনুবাদ[1] রচনা করিলেও বর্তমান গ্রন্থটির 'প্রবেশক' অত্যন্ত 'মূল্যবান' এবং লেখকের মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয়বাহী। 'সুত্তবিভঙ্গ' এবং 'পরিবার' গ্রন্থানুযায়ী প্রাতিমোক্ষের শিক্ষাপদসমূহ বুদ্ধদেব কোথায়, কাহাকে, কি প্রসঙ্গে বিধান দিয়াছিলেন সেই উপাখ্যানসমূহও লেখক টীকায় স্থান দিয়াছেন। কেবল বাংলাভাষাতেই ইহা প্রথম গ্রন্থ নহে, ইংরেজী ভাষায়ও তাঁহার পূর্বে অনুরূপ সৃষ্টিকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায় না। গ্রন্থের প্রবেশকে লেখক তীক্ষ্ণ বিচারনৈপুণ্য এবং তথ্যনিষ্ঠার সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াস করিয়াছেন। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পূর্বে বৈদিক ধর্মে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই আশ্রমসমূহ নানাপ্রকার বিধিনিষেধ ও নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। স্বর্গত বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমাণিত করিয়াছেন বৈদিক ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই ত্রি-আশ্রমের নিয়মকানুন বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ভিক্ষুধর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, কখনও কখনও বেদপন্থীদের শাস্ত্রে যাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধদেব তাহা বিস্তৃত, স্পষ্ট এবং 'প্রয়োজনবোধে ফেনাইয়া' বলিয়াছেন।[2] ভিক্ষাচর্যা, উচ্চশয়ান, স্ত্রীসম্ভোগ, শস্যবীজ ধ্বংস না করা, চৌর্য, অসত্য, সুরাপান, সর্বমুণ্ডন, কাষায়বস্ত্র পরিধান, সন্ন্যাসীর অনিকেতন ও বৃক্ষমূলিক জীবন প্রভৃতি বিষয়ে লেখক বেদপন্থীদের শাস্ত্র এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের উদাহরণ আহরণ করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন—"বুদ্ধদেব যে ভিক্ষুব্রতের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বেদপন্থীদের এই তিন আশ্রমকেই প্রধানত আদর্শ করিয়া।"[3] স্থানে স্থানে অবশ্যই বৈদিক চতুরাশ্রমের কোন কোন নিয়মাবলীকে বুদ্ধদেব আপন ধর্মের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বর্জন ও পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। জৈন ও বৌদ্ধধর্মকে তিনি বৈদিকধর্ম হইতে পৃথক্ নূতন ধর্মরূপে গ্রহণ করেন নাই। ইহারা যেন শাশ্বত সনাতন ধর্মের দুইটি শাখামাত্র। "যেমন, পর্বতাবতীর্ণ স্রোতস্বতী যাইতে যাইতে ছুটিতে ছুটিতে নানাস্থানে স্খলিত হইতে হইতে বাধা পাইতে পাইতে ধারাভেদ প্রাপ্ত হইয়া যায়, এবং ইহাতে

........ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষের নিয়মাবলী ২০৭ প্রকার। পারাজিকা—৮, সঙ্ঘাদিশেষ ১৭। নৈসর্গিক প্রায়শ্চিত্তিক—৩০। প্রায়শ্চিত্তিক—১৬৬, প্রতিদেশনীয়—৮, শৈক্ষ্য—৭৫, বিবাদশান্তিকর বা অধিকরণসমথা—৭, মোট : ২০৭।

১। 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। প্রাতিমোক্ষ, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ—বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ১৩২৩, প্রবেশক, পৃঃ ১৯-৩০।

৩। ঐ, পৃঃ ১৯।

বিভিন্ন নদীর সৃষ্টি হয় ও নানা নগর-জনপদ-ক্ষেত্র-সংসর্গে মূল ও শাখানদীর প্রচুর ভেদ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা হইলেও মূলত তাহারা একই এবং এই ঐক্যেরও প্রচুর পরিচয় তাহাদের মধ্যে থাকে, সেই রূপ বেদপন্থীদের একই বৈদিক ধর্ম চলিতে চলিতে নানাকারণে ভেদপ্রাপ্ত হইয়া জৈন ও বৌদ্ধ নামে আরো দুইটি স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে।'[১] 'বৌদ্ধ ধর্মপ্রতিষ্ঠা' এবং 'জৈন ও বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল' প্রবন্ধদ্বয়েও লেখক তথ্যপূর্ণ আলোচনার সাহায্যে প্রমাণিত করিয়াছেন বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা বৌদ্ধধর্মের অবয়ব-পুষ্টি সংগঠিত হইয়াছে। বৈদিক ধর্মে যাহা আচার, বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহা 'বিনয়' নামে অভিহিত হইয়াছে। বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন সমস্ত ধর্মেই প্রাচীন আচারসমূহ লোকপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার মতে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সঙ্ঘ বুদ্ধদেবের একেবারে নূতন সৃষ্টি নহে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পূর্বেই বৈদিক ধর্মে নারীদের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ এবং দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া ধর্মালোচনায় যোগদান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। ঘোষা, রোমশা, লোপমুদ্রা, বিশ্ববারা এবং মৈত্রেয়ী ইঁহারা ব্রহ্মবাদিনী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি কিন্তু সকলেই সংসার-ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী নহেন। কিন্তু বাচক্নব্য গার্গী, তাপসী শবরী, মহাত্মা শাণ্ডিল্যের কন্যা, মহর্ষি গার্গ্যের কন্যা, এবং সুলভা—ইঁহারা আজন্ম ব্রহ্মচারিণী ও চিরকুমারী ছিলেন। বৌদ্ধ-পূর্ব যুগের পরিব্রাজিকা সন্ন্যাসিনীগণ বৌদ্ধ-ভিক্ষুণীদের ন্যায় সুসংগঠিত সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যাপন না করিলেও তাঁহাদের সঙ্ঘ ছিল বলিয়া তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন। লেখক বৌদ্ধভিক্ষুণী সঙ্ঘের উৎপত্তি এবং তাহার চরম পরিণতি চুল্লবগ্‌গ, ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ এবং সুত্তবিভঙ্গ অবলম্বনে আলোচনা করিয়াছেন।

প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

ডঃ বাগ্‌চী বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের এক জন নিষ্ঠাবান গবেষক। বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যদের রচিত দোহাসমূহের ইংরেজী অনুবাদ ও টীকা রচনা তাঁহার অন্যতম কর্মকৃতি।[২] তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানীর ন্যায় বিশ্লেষণপরায়ণ ছিলেন। সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। এই চিন্তাশীল মনীষী তাঁহার 'বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য' গ্রন্থে হীনযান, মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়াছেন।

১। ঐ, পৃঃ ১৯।

২। Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, C. U. pp. 1-180.

এই গ্রন্থে পালি, তিব্বতী, চীনা, নেপালী, মঙ্গোলীয় এবং মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ-সাহিত্যের একটি রূপরেখাও তিনি অঙ্কন করিয়াছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের আলোচনায় লেখকের বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়া বুদ্ধদেব চারি আর্যসত্য—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখনিরোধের উপায় লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র। এই মূলসূত্র সম্বন্ধে ডঃ বাগচীর অভিমত—'সত্য কথা বলিতে গেলে এই বিশ্লেষণ বুদ্ধের নিজের নয়। এ হচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্রের চিরন্তন প্রথা—যোগশাস্ত্রেও এই প্রণালী অবলম্বন করা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলসূত্র হচ্ছে রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য। চিকিৎসক রোগ দেখে প্রথমে তার হেতু নির্ধারণ করেন, আরোগ্যের আবশ্যকতা অনুভব করেন ও আরোগ্যের একমাত্র উপায় ভৈষজ্য প্রয়োগ করেন। যোগশাস্ত্রের মূলসূত্র হচ্ছে সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। জীব দুঃখবহুল সংসারে পতিত, তার কারণ হচ্ছে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ, সেই সংযোগের নিবৃত্তিতেই মোক্ষ, মোক্ষের উপায় হচ্ছে সম্যক্ অধ্যাত্ম দৃষ্টি লাভ করা। বুদ্ধও তাই দুঃখ, দুঃখহেতু, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধোপায় স্থির করাই তাঁর নূতন ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করলেন।'[১]

বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র সন্ধান করিতে গিয়া তিনি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কয়েকটি ভ্রান্ত মতকে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে—'প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ সোশ্যালিষ্ট বা পতিতপাবন কিছুই ছিলেন না। কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের সামাজিক অবস্থার উন্নতিবিধান তাঁর ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, মনুষ্যের ব্যক্তিগত মুক্তির পথ খুঁজে বের করবার জন্যই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দীর্ঘ সাধনায় সে পথের সন্ধান পেয়ে দশজনকে সেই পথে চালিত করবার চেষ্টাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়েছিল। এই মুক্তিমার্গ হচ্ছে গৃহত্যাগী ভিক্ষুর মার্গ, কোন বিশিষ্ট বর্ণের নিজস্ব নয়। বস্তুতঃ এই মার্গ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বানপ্রস্থ ও যতিরই রূপান্তর। এই বানপ্রস্থকেই বুদ্ধ সার্বজনীন করতে চেষ্টা করেছিলেন। বানপ্রস্থ ধর্মে জাতি বা বর্ণবিচার নেই, বুদ্ধের ধর্মেও তা নেই।'[২] 'সোহহং'

১। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, ১৩৫৯, পৃঃ ১৫-১৭।
২। ঐ, পৃঃ ১২।

জ্ঞান এবং বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের সহজজ্ঞানকে তিনি এক স্তরে স্থান দিয়াছেন। এইভাবে তাঁহার আলোচনায় স্থানে স্থানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমন্বয়চেষ্টা সূচিত হইয়াছে।

'ভারত ও মধ্য এশিয়া', 'ভারত ও ইন্দোচীন', 'ভারত ও চীন' প্রভৃতি গ্রন্থে সুদূর অতীতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাচ্যদেশগুলিকে যে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল তাহা লেখক সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধসভ্যতা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ও গবেষণা লেখকের বহু শ্রমসিদ্ধ অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। গ্রন্থসমূহে তিনি যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থাপিত করিয়াছেন।

অসিত হালদার

বৌদ্ধভাস্কর্য ও চিত্রকলার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি অতীত ভারতের নির্বাপিত-প্রায় প্রদীপশিখাকে 'যে শিখা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রশান্ত এবং যাহার আলোক বিদ্যুতের মত তীব্রও নয় নয়নের পীড়াও দেয় না' উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। ভারতীয় চিত্রশিল্পের আদর্শকে তিনি প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—বৌদ্ধ ও মোগল। বৌদ্ধশিল্প ভাবকল্পনার জন্য এবং মোগল-শিল্প সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য শ্রেষ্ঠ। মোগলশিল্প বিলাসপ্রবণ, বৌদ্ধশিল্প আবেশ ও শান্তির দ্যোতক। মোগলশিল্পী যাহা অতি চেষ্টা ও যত্নে সূক্ষ্ম কারুকার্য দ্বারা সফল করিয়া তোলেন, বৌদ্ধশিল্পী দুই একটা সরুমোটা রেখার টানে অতি অনায়াসে তাহা ফুটাইয়া তোলেন। রং-এর দীর্ঘ স্থায়িত্ব, শিল্পীর অসীম ধৈর্য বৌদ্ধচিত্রকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আলঙ্কারিক চিত্রে বৌদ্ধ ও মোগল শিল্পীরা প্রায় সমকক্ষ। মোগল আলঙ্কারিক চিত্র সূক্ষ্মতায় শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্র অর্থপূর্ণ। এক গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টি লইয়া পূজারীর ন্যায় তিনি অজন্তার চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—'সেই নির্জন ইন্দ্রপুরীতুল্য গিরিগুহায় নির্ঝরিণীর পাশে, স্তব্ধ স্নিগ্ধভাবে বিভোর হয়ে পুণ্যাত্মা শিল্পীরা যা কিছু এঁকে গেছেন তারই ভিতর থেকে যেন আমরা এক অমৃতময় শান্তি ও আনন্দের বিকাশ দেখতে পাই।'[১] তিনি যথার্থই 'সমানধর্মা' পুরুষ বলিয়া বৌদ্ধ শিল্পীদের অন্তরের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। বুদ্ধদেবের গৃহ-ত্যাগের চিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—'ছবিখানিতে চিত্রশিল্পীরা

১। অজন্তা, ১৩২০, পৃঃ ২৭।

বাস্তবিকই তাঁদের মহৎ ও উদার অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়ে গেছেন; কেননা তাঁদের মন সেরূপ উচ্চ না হলে ছবিতে তেমন বিশ্বপ্রেমবিহ্বল ও আত্মহারা ভাব কখনই তাঁরা দেখাতে পারতেন না।'[১] বুদ্ধদেবের প্রলোভন—কামাদি রিপুদ্বারা আক্রান্ত বুদ্ধদেবের অটলধ্যানগম্ভীর মূর্তিটি যেন 'শত সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থেকেও তাদের চেয়ে ঢের তফাতে যেন কোন এক শান্তির আলোকময় রাজ্যে ভাসচেন। আর তাঁর জড় তনুখানি সেখানে প্রাণশূন্য হয়ে পুতুলের মত বসে আছে।'[২] ভিখারী-বেশী বুদ্ধদেবের বিরাট মূর্তির সামনে মাতৃমূর্তি—মাতা গোপা ও পুত্র রাহুল—'ছবিখানিতে জননীর স্নেহ, ভক্তের প্রেম, বুদ্ধদেবের করুণা এবং পুত্রের আনুগত্যের ভাব সুন্দর ফুটেছে।'[৩] এছাড়াও সিংহল বিজয়ের ধারাবাহিক চিত্র, বুদ্ধদেবের জীবন—বাল্যের ঘটনা হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত, জাতকের নানাকাহিনী, কোন রাজার বৈরাগ্য ও পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ প্রভৃতি চিত্রের মাহাত্ম্য ও কল্যাণকর আদর্শ তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাস্কর্যের আলোচনা প্রসঙ্গে চৈত্যগুহা ও বিহারগুহার আলোচনা করিয়াছেন। সমস্ত বিহার গুহার মধ্যে অবস্থিত 'ধ্যানস্তিমিতনেত্র, শান্তস্তব্ধ বিশালাক্ষ বিশাল আকার রাজাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি তাঁহার দৃষ্টি-রশ্মিতে অলোকসামান্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বুদ্ধমূর্তির দেবোপম ধনৈশ্বর্য ও শান্তসংযত শ্রী এবং বৌদ্ধস্তূপের বিশালতা লেখকের হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। পিতার পার্শ্বে উপবিষ্ট জননীর কোলে সুকোমল লাবণ্যপুঞ্জ শিশুবুদ্ধ ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের পরিচায়ক। যৌবন সময়ে সুন্দর, স্বরূপ শাক্যসিংহ, বুদ্ধদেবের সামনে ভিক্ষাপাত্র হস্তে মাতাপুত্র, মহানির্বাণে শায়িত বিরাট বুদ্ধমূর্তি—এই সমস্ত মূর্তির শুভ্রসমুজ্জ্বল দীপ্তিও লেখককে মুগ্ধ করিয়াছে। মহাপরিনির্বাণের মূর্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—'বুদ্ধের আবেশমাধুরীমণ্ডিত ধ্যানস্তিমিত লোচন আনন্দবিভায় উদ্ভাসিত। পার্থিব মৃত্যুকে যেন তিনি সত্যই জয় করেছেন। পৃথিবীর দুঃখ সুখে আর তিনি বিচলিত নন।'[৪] লেখক শুচিস্নাত উদারচিত্তে অজন্তার চিত্রশালা দর্শন করিয়া এই গ্রন্থে তাঁহার আবেগমথিত হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

১। অজন্তা, ১৩২০ পৃঃ ৩৭।
২। ঐ, পৃঃ ৩৮।
৩। ঐ, পৃঃ ৩৯।
৪। ঐ, পৃঃ ৬৫।

তাঁহার 'বাগগুহা ও রামগড়'[১] গ্রন্থের আলোচনাও বৌদ্ধশিল্পের অভিনবত্বের গৌরবে উজ্জ্বল। বাগগুহার বৈশিষ্ট্য এখানে চৈত্যগুহা নাই। দুইটি বাসগৃহ ও একটি পাঠশালাসহ নয়টি বিহারশ্রেণী লইয়া বাগগুহা। গুহার গর্ভগৃহেও ধ্যানীবুদ্ধের প্রতিমূর্তি খোদিত হয় নাই, আছে বিরাট স্তূপ। লেখক এই গ্রন্থে শ্রমণদের গৃহ গুহা, গোঁসাই গুহা, রঙমহল প্রভৃতি ৯টি গুহার বর্ণনা ও পরিচিতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে মহাবংশ ও জাতকে বর্ণিত লতা, গাছ ও জীবজন্তুর সঙ্গে এখানে অঙ্কিত চিত্রের সাদৃশ আছে। পারস্য, আফগানিস্তান, ইটালী, চীন ও জাপানের চিত্রে ভারতীয় বৌদ্ধশিল্পের প্রভাবকে তিনি স্বীকৃতি দিয়াছেন। তাঁহার মতে 'ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে চীন ও তুর্কিস্তানের সংমিশ্রণটা কতটা তেলে-জলে মেশানোর মত হয়ে পড়েছে।' বাগের ভিত্তিচিত্রের জমি তৈয়ারীর প্রণালী, ভিত্তিচিত্রের রঙ, চিত্রের মূর্তি বিন্যাস বা ঠাট এবং আলোছায়ার সমাবেশ ও বিরুদ্ধ বর্ণবিন্যাস নিপুণতার বিষয় লেখক অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। বাগের ছবির বর্ণনা প্রসঙ্গে—জ্যোতির্মণ্ডল ও ছত্রযুক্ত, পদ্মাসনে দাঁড়ান বুদ্ধ, ধ্যানীবুদ্ধ, চামর ব্যজনরতা নারী, সন্ন্যাসী, রাজমুকুটধারী দেবধারী, কিন্নরী, নরনারী ও মিছিলের ছবির পরিচয় দিয়াছেন। এই ছবিসমূহ জাতকের কাহিনী বর্ণনা নহে, কোন ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে এই চিত্রাবলী অঙ্কিত। মহাবংশের বর্ণনার সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য আছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্বে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গমন করিয়াছিলেন, 'দ্বীপময় ভারত' সেই ভ্রমণের স্মারক-চিহ্ন। লেখক এই গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে মালয়, সিঙ্গাপুর, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং তথায় বৌদ্ধধর্মের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়াছেন। ত্যাগব্রতী বৌদ্ধভিক্ষুগণ একদা চীন এবং অন্যান্য দ্বীপের সঙ্গে ভারতের সংযোগ সাধন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাহাদের সঙ্গে ভারতের একটা সমমর্মিতাবোধ সৃষ্টি হইয়াছিল। নূতন সভ্যতার আলোকে যাহারা এতদিন অন্ধকারের রাজ্যের অবজ্ঞাত অধিবাসী ছিল তাহারা নূতন শক্তিতে ও প্রাণাবেগে জাগ্রত হইয়া উঠিল। এইভাবে একদা দ্বীপময় ভারত গড়িয়া উঠে। খৃষ্ট জন্মের দুই তিন শত বৎসর পূর্বেই ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেশিয়ার

১। বাগগুহা ও রামগড়, ১৩২৮।

সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে ভারতের সংযোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। শৈলেন্দ্র বংশীয় বৌদ্ধরাজাদের সময়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রার রাজধানী শ্রীবিজয়ের সংযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার 'বর-বুদুর' অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র নরপতি কর্তৃক যবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়। লেখকের মতে বর-বুদুরের বৌদ্ধচিত্রাবলী এবং প্রাম্বানামের রামায়ণের চিত্রাবলী বহির্ভারতে ভারতীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠতম দুই নিদর্শন[১]। প্রাচীন ভারতের স্মৃতি-পূত বলিদ্বীপে লেখক প্রচুর বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি অবলোকন করিয়াছেন যাহার শিল্পসৌন্দর্য অতি মহনীয়। 'পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য কীর্তি' বরবুদুরের স্তূপের ভাস্কর্য এবং প্রশান্ত গাম্ভীর্য কবিকে এবং লেখককে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। বোর্ণিও দ্বীপের 'কোটাবাঙ্গন' নামকস্থানে প্রাপ্ত একটি তামার বুদ্ধমূর্তিকে লেখক দ্বীপময় ভারতের শিল্প নিদর্শনের মধ্যে রত্নস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

'ভারত সংস্কৃতি' গ্রন্থের 'এশিয়া খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব' প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মের বাহনরূপে সংস্কৃত ভাষার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। 'ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধবিহার' প্রবন্ধে এখানের গগনচুম্বী ঘণ্টাকার সোনার পাতে মোড়া চৈত্য-চূড়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—'নীল সবুজ আর সোনার এই সংবাদী বা ঐকতান সঙ্গীতে—ইহাই যেন ব্রহ্মদেশের বিশিষ্ট স্মৃতিস্বরূপ চিত্তপটে উদিত হয়।[২] তিনি মনে করেন বর্মার বিহারের 'ভিক্ষুদের মধ্যে এখনও বর্মী জাতির চিত্তের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি সুরক্ষিত রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংরক্ষক এই সকল ভিক্ষুর সহিত আলাপ-পরিচয়ে আমাদের চিত্তে অতি উচ্চ শ্রেণীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক পুষ্টি লাভ করিতে আমরা সমর্থ হইব এবং বর্মার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভারতবর্ষকে অর্থাৎ নিজেদেরও জানিতে শিখিব।'[৩] বর্মী চরিত্রের উপর বৌদ্ধ ক্যাঙ বা বিহারের প্রভাব সম্বন্ধেও তাঁহার আলোচনা সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ।

১। দ্বীপময় ভারত, পৃঃ ১৮০।

২। ভারত সংস্কৃতি, ১৩৬৪, পৃঃ ৭৭

৩। ঐ, পৃঃ ৯০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাব্য ও কবিতা

ভগবান বুদ্ধের জীবন, তাঁহার অপার মহিমা, বৌদ্ধভারতের অবিস্মরণীয় কীর্তি এবং বৌদ্ধযুগের সম্রাট্ ও মহনীয় ব্যক্তিদের জীবনআখ্যান অবলম্বনে আধুনিক যুগের বাংলাসাহিত্যে প্রচুর কাব্য ও কবিতা রচিত হইয়াছে। নিম্নে তাহা আলোচিত হইল।

নবীনচন্দ্র সেন

কবি নবীন সেন ১৮৮০ খৃঃ হইতে ১৮৮২ খৃঃ পর্যন্ত বিহারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টারের কাজ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বিহারের বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন স্মৃতিপূত স্থানসমূহ দর্শন করিয়া কবি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। বহু বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থাদিও তিনি এই সময়ে পাঠ করেন। কবি তাঁহার 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'বেহারেই বৌদ্ধধর্মের বহুগ্রন্থ পড়িয়াছিলাম। তাহার পরেও অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু প্রায় সর্বত্র এমন কি—এডুইন আর্ণল্ডের 'লাইট অফ এশিয়া'র পর্যন্ত বুদ্ধ-চরিত্র অতিরঞ্জিত, অতিমানুষিকভাবে চিত্রিত। তাহাতে ঠিক রক্ত-মাংসের বুদ্ধকে দেখিতে পাই না।······অতএব আমরা যে ভাবে বুদ্ধদেবকে চক্ষের উপর দেখিতে পাই, তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি, সেভাবে চিত্র করাই আমার উদ্দেশ্য।[১] 'অমিতাভ' কাব্যে কবি বুদ্ধদেবকে নরশ্রেষ্ঠরূপে মানবীয় মহিমায় ভাস্বর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি বৌদ্ধসাহিত্য এবং ইংরেজী Light of Asia হইতে বুদ্ধ-জীবনের উপাদান সংগ্রহ করিয়া কবি 'অমিতাভ' কাব্যে সিদ্ধার্থের জীবনকোরককে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় পূর্ণ বিকশিত করিয়াছেন। 'অমিতাভ' বাংলাভাষায় প্রথম বুদ্ধদেবের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ধারাবাহিক জীবনী-কাব্য। এই কাব্যে কবি সিদ্ধার্থের জন্ম হইতে বোধিলাভ এবং বুদ্ধদেবের প্রচার কার্য হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত ঘটনাবলী আনুপূর্বিক ধীর সংযতচিত্তে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ঘটনা বিবৃতিতে প্রাচীন পালি ও বৌদ্ধসাহিত্যের দান কতখানি তাহা নির্ধারণের চেষ্টা হইতেছে।

বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণের পূর্বে মায়াদেবী এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করেন। পালি 'নিদানকথা'র 'মহামায়ায়' সুপিনং-এর অনুসরণে অমিতাভ কাব্যে সেই

১। নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃঃ ২৪২।

শুভজন্মের সূচনা করা হইয়াছে। পালি সাহিত্যে—'বোধিসত্তো সেতবরবারণো হুত্বা……সেতপদুমং গহেত্বা……মাতুসয়নং তিক্খত্তুং পদক্খিণং কত্বা দক্খিণপস্সং তালেত্বা কুচ্ছিং পবিট্ঠসদিসো অহোসি।[১] কবি ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন :—

মাতঙ্গ তুষার শ্বেত
শুণ্ডে শ্বেত পদ্ম মনোহর
প্রণমিয়া তিনবার বিদারি দক্ষিণ পার্শ্ব
প্রবেশিল গর্ভে করিবর।[২]

স্বপ্নবেত্তা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলিলেন এই পুত্র—'অগারং অজ্ঝাবসিস্সতি রাজা ভবিস্সতি চক্কবত্তী, সচে অগারা নিক্খম্ম পব্বজিস্সতি বুদ্ধো ভবিস্সতি লোকে বিবত্তচ্ছদ্দোতি।[৩]

অমিতাভ কাব্যে কবি লিখিয়াছেন—

থাকে গৃহাশ্রমে পুত্র হবে রাজচক্রবর্তী
একচ্ছত্র করিবে ভুবন,
যায় যদি ধর্মাশ্রমে দুঃখপূর্ণ জগতের
পাপভার করিবে মোচন।[৪]

শিশু বুদ্ধের জন্মের পর রাজবাড়ীতে, শাক্যরাজ্যে আনন্দের হিল্লোল। কিন্তু সেই পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে—

সপ্তম দিবসে হায় মায়াদেবী মুদিলা নয়ন।

কারণ—'বোধিসত্তমাতা সত্তাহজাতে বোধিসত্তে কালং কত্বা তুসিতপুরে নিব্বত্ততি।'[৫] কবিও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। অসিত ঋষির আখ্যান পালি নিদানকথা, নালক সুত্ত এবং ললিতবিস্তর গ্রন্থের অনুসরণে রচিত। শুদ্ধোদন দৈবজ্ঞদের প্রশ্ন করিয়াছেন—কিং দিস্বা ময়হং পুত্তো পব্বজিস্সতীতি ?

—'চত্তারি পুব্বনিমিত্তানীতি।'
—'কতরং কতরঞ্চা'
—'জরাজিণ্ণং ব্যাধিতং মতং পব্বজিতঞ্চ' তি।[৬]

১। Fausboll, Jātaka, Vol, I, p. 50.
২। অমিতাভ, ১৩৬৩, পৃঃ ৩।
৩। Fausboll, Jātaka, Vol, I, p 51.
৪। অমিতাভ, পৃঃ ৪।
৫। Fausboll, Jātaka, Vol. I, p 52
৬। Fausboll, Jātaka, Vol. I, p 57

অমিতাভ কাব্যে কৌণ্ডিন্য রাজাকে জানাইয়াছেন—

জরাজীর্ণ, রুগ্ন, মৃত, ভিক্ষু যেই দিন
নিরখিবে শিশু, গৃহ ছাড়িয়া সে দিন
নিশ্চয় হইবে বুদ্ধ।[১]

কিশোর সিদ্ধার্থ একদা 'মনোহর পুষ্পোদ্যানে চিন্তামগ্ন, আকাশে শত শত বলাকা শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় ধীর পক্ষবিস্তারে উড়িয়া যাইতেছে, হঠাৎ একটি তীরবিদ্ধ হইয়া কুমারের অঙ্কে পতিত হইল। তখন—

উদ্ধার করিতে শর লাগিল কোমল করে
কুমার বেদনা এই বুঝিলা প্রথম।
অধীর হইল প্রাণ. বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।[২]

অনাগত জীবনে বিশ্বব্যাপী মহাকরুণার পুণ্য প্রস্রবণকে যিনি বক্ষে ধারণ করিবেন তাহারই প্রথম উন্মেষ। কুমারের আঁখি তারকায় শুভ্রসমুজ্জ্বল একটি অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। এমন সময়—

'আসি দেবদত্ত কহে—কুমার এ হংস মম।
মম শরে হত হয়ে পড়েছে ভূতলে।'[৩]

Light of Asia গ্রন্থে কবি Arnold সিদ্ধার্থের কণ্ঠে তাহার জবাব দিয়াছেন—

"Say no, the bird is mine
The first of myriad things which shall be mine
By right of mercy and love's lordliness.[৪]

অমিতাভ কাব্যে কুমার আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছেন—

হতজীব হত্যাকারী
পায় যদি ভাই! কোন্ ধর্মশাস্ত্র বলে
যে দেয় জীবন তারে সে কি তারে পাইবে না?[৫]

১। অমিতাভ, পৃঃ ১১।
২। অমিতাভ, পৃঃ ১৩।
৩। অমিতাভ, পৃঃ ১৪।
৪। Arnold, Light of Asia, 1921, p 11,
৫। অমিতাভ, পৃঃ ১৪।

যে অপ্রমেয় মৈত্রীবলে একদিন তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং অযুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।[১]

সেই বিশ্বব্যাপী মহান মৈত্রীর প্রথম প্রস্ফুটন এই কাহিনীতে। একটি আহত হংসের প্রাণের বিনিময়ে তিনি আজ শাক্যরাজ্যও দেবদত্তকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া—

শাক্যপুত্র দেবদত্ত স্তম্ভিত বিস্মিত চিত্ত
দেখিল, কুমার নহে—মূর্তি করুণার।[২]

হলোৎসবে, জম্বুবৃক্ষতলে গভীর ধ্যান ও পিতাকে কৃষি পরিহার করিবার উপদেশ দান ললিতবিস্তর কাহিনীর অনুসরণে রচিত।

ললিতবিস্তরে সিদ্ধার্থ তাঁহার ভাবী পত্নীর বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করিয়াছেন—

'কন্যামভিরূপাং প্রাসাদিকাং দর্শনীয়াং পরময়া শুভবর্ণপুষ্করতয়া সমন্বাগতাং নাতিদীর্ঘাং নাতিহ্রস্বাং নাতিস্থূলাং নাতিকৃশাং নাতিগৌরাং নাতিকৃষ্ণাং প্রথমযৌবনাবস্থাং স্ত্রীরত্নমিব খ্যায়মানাম।'[৩]

অমিতাভ কাব্যে সিদ্ধার্থের অভিপ্রেত নারীর বৈশিষ্ট্য—

রূপকুল জন্ম গোত্র বিশুদ্ধ যাহার
রূপসী বিদুষী নম্রা ঈর্ষা নাহি যার
মুখে প্রফুল্লতা বুকে করুণা আলয়
হস্তে পরসেবা, বাক্য মধুরতাময়।...ইত্যাদি[৪]

রাজা শুদ্ধোদন কন্যা নির্বাচনের জন্য অশোকোৎসবের আয়োজন করিলেন। সপ্তমদিবসে রাজকুমার শাক্যকুমারীদের মণিকাঞ্চনপূর্ণ অশোক-ভাণ্ড বিতরণ করিলেন। সমস্ত ভাণ্ড নিঃশেষ হইল। সর্বশেষে দণ্ডপাণিশাক্যের দুহিতা গোপা অশোক-মন্দিরে ধীর প্রশান্তভাবে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

'কুমার কিং তেময়াপনীতং যসত্বং মাং বিমানয়সি?[৫]

কবি লিখিয়াছেন—যুবরাজ, করিয়াছি কোন্ অপরাধ?
করিলে বঞ্চিত নাহি দিলে উপহার।[৬]

১। মেত্তসুত্ত, সুত্তনিপাত ২। অমিতাভ, পৃঃ ১৪।
৩। ললিতবিস্তর, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ৯৮।
৪। অমিতাভ, পৃঃ ২৪।
৫। ললিতবিস্তর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০। ৬। অমিতাভ, পৃঃ ২৬।

সিদ্ধার্থ বলিলেন—'নাহং ত্বাং বিমানয়ামি, অপি তু খলু পুনসত্বমভি—পশ্চাদাগচ্ছেতি।'[১] তিনি তাঁহার 'চানেকশতসহস্রমূল্যমঙ্গুলীয়কং নির্মুচ্য প্রাদাৎ।'[২]

অমিতাভকাব্যে লজ্জিত কুমারও—একই ভাবে শাক্যকুমারীর—প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন—

'নিঃশেষ অশোক ভাণ্ড, কিবা উপহার
দিব ভাবিতেছি মনে। করিয়া মোচন
অঙ্গুলী গোপার করে করিলা অর্পণ।'[৩]

গোপাও স্বীয় অঙ্গুরী প্রদান করিয়া বলিলেন—

'এ অঙ্গুরী করুন গ্রহণ
রত্ন বিনিময়ে এই তৃণ অকিঞ্চন।'[৪]

এই সুরই ললিতবিস্তরে ধ্বনিত হইয়াছিল—'ইমানি মদীয়ান্যাভরণানি গৃহ্যতাম্।'[৫]

গাথাশ্রবণ ও বৈরাগ্য উদয় এবং চারিনিমিত্ত দর্শন প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনে কবি পালি নিদানকথা ও ললিতবিস্তরে বর্ণিত প্রাচীন আখ্যানের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসরণ করিয়াছেন। সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের সেই মহানিশার বর্ণনা কবির ব্যক্তিহৃদয়ের গভীর আবেগ ও অনুভূতির চাঞ্চল্যে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণপ্রতিম একমাত্র পুত্র অভিনিষ্ক্রমণের পূর্বাহ্নে পিতার অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থী হইয়াছেন। হৃদয়গ্রন্থি শতছিন্ন করিয়া শুদ্ধোদন বলিলেন—

হিতকর, মোক্ষ জগতের
ইচ্ছা তব, হও তুমি পূর্ণ মানারথ।[৬]

এই বৈরাগ্য যত বড় মহান্, এই বিয়োগ, আর আত্মবলিদানও তত বড়ই মহান্। মহাভিনিষ্ক্রমণকালে সিদ্ধার্থের অন্তরের পরিচয়ও কবি তুলিয়া ধরিয়াছেন। সুষুপ্তা পত্নী ও নবজাত শিশুপুত্রকে দেখিয়া—

কেবল দুইটি বিন্দু অশ্রু দুনয়নে
আসিল, ভাসিল, ধীরে—মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার।[৭]

১, ২, ৫। ললিতবিস্তর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০
৩, ৪। অমিতাভ, পৃঃ ২৬।
৬। অমিতাভ, পৃঃ ৫৭। ৭। ঐ, পৃঃ ৬৪।

নবীন সন্ন্যাসী অনোমা নদীতীরে সারথী ছন্দক এবং প্রিয় অশ্ব কণ্ঠককে বিদায় দিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ কাটিয়া ব্যাধের সঙ্গে কৌষিক বসন বিনিময় করিয়া লইলেন। বিদায়ের এই মুহূর্ত কত গভীর শোকাবহ! সিদ্ধার্থ অদৃশ্য হইলেন, কিন্তু—

কণ্টক ত্যজিল প্রভু বিরহে জীবন।

পতি বিরহে সাধ্বী গোপা যৌবনে যোগিনী সাজিলেন।

রত্নময় বেদী 'পরে
পতির প্রেরিত বসন মুকুট
স্থাপিলা ভকতি ভরে।
খুলি আপনার বসন ভূষণ,
কাটিয়া অলক-দাম
যৌবনে যোগিনী সাজিয়া করিলা
বেদি-পদমূলে দান।[১]

সিদ্ধার্থ শাকী, পদ্মা, রৈবত ও আরাড়কালাম-এর আশ্রয় ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পথে রাজগৃহে নৃপতি বিম্বিসারের সঙ্গেও তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে। ষড় বৎসরের কঠিন যোগসাধনা এবং দিব্যরূপা নারীমূর্তিতে সিদ্ধার্থের নিকট জননী মায়াদেবীর আবির্ভাব ললিতবিস্তরের কাহিনীর অনুসরণে লিখিত। দীর্ঘকালের কঠিন সাধনায় তিনি উপলব্ধি করিলেন—

'অয়ং দুক্করকারিকা নাম বোধায় মগ্‌গো ন হোতীতি।'[২]

জীর্ণ শুষ্ক দেহ সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত তিনি খাদ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়—

আসিলা 'সুজাতা' ধীরে পায়সায় শিরে
স্বর্ণপাত্রে, বনদেবে দিতে উপহার।[৩]

পালি সাহিত্যে—'উরুবেলায়ং সেনানিনিগামে সেনানিকুটিম্বিকস্‌সগেহে নিব্বতা সুজাতা নামা দারিকা।'[৪] কাব্যে সুজাতা নান্দিকপাতির কন্যা। ললিতবিস্তরেও সুজাতার পিতার নাম নান্দিক। ললিতবিস্তরে সিদ্ধার্থের বীর-প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হইয়াছে—

১। অমিতাভ, পৃঃ ৭৮।
২। নিদানকথা, Fausboll, Jātaka, Vol. I. p 67
৩। অমিতাভ, পৃঃ ১০৬। ৪। নিদানকথা, Fausboll, Jātaka Vol. I, p 68

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥[১]

এই বীর প্রতিজ্ঞার আভাস অমিতাভ কাব্যে সিদ্ধার্থের মহান্ সঙ্কল্পে আভাসিত হইয়াছে—

শরীর হউক শুষ্ক, অস্থি মাংস লয়,
যাবৎ নির্বাণ জ্ঞান না হয় উদয়,
এ শরীর এ আসনে রহিবে নিশ্চয়।[২]

এই দৃঢ় সঙ্কল্পের নিকট মার ও মারবাহিনী পরাজিত হইল। ক্রমে তিনি চারিধ্যানস্তর[৩] উত্তীর্ণ হইয়া না-সুখ, না-দুঃখ, উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্ত লাভ করিলেন। রাত্রির প্রথম প্রহরে অতীত জীবনের সুগতি দুর্গতি দর্শন করিলেন, ২য় প্রহরে তাঁহার উপলব্ধি হইল—

'তাঁর নাহি জন্মভূমি
নাহি নাম, নাহি গোত্র, নাহি বর্ণ, জাতি,
পূর্ব জ্ঞানীদের বংশে জনম তাঁহার।[৪]

পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যুর আবর্তনের কারণও তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। এইভাবে দুর্লভ জ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধার্থ 'বুদ্ধ' হইলেন। এখন হৃদয় তাঁহার—

নিবাত নিষ্কম্প মহাশান্তিপারাবার।
নাহি কর্মফল রেখা পুনর্জন্ম বীজ,
তাঁহার জীবন পথে, দুঃখের দাহন।[৫]

এক মহাশান্তি পারাবারে সপ্তদিবা সপ্তনিশি তিনি নিমজ্জিত রহিলেন। মুচলিন্দ রাজায়তনে তিনি তপুস্‌স ও ভল্লিকের প্রদত্ত মধুভাণ্ড গ্রহণ করিলেন।

১। ললিতবিস্তর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০। ২। অমিতাভ, পৃঃ ১০৮।

৩। চারিধ্যান: ১ম ধ্যান স্তর সবিতর্ক, সবিচার, প্রীতিসুখমণ্ডিত। সাধক চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দৌর্বল্যের কারণ পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া, কামমুক্ত হইয়া এই ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া থাকেন। ২য় ধ্যান—বিতর্কবিচার উপশমে অধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত। এই অবস্থায় সাধকের দেহের কোন অংশ বিবেকজ প্রীতিসুখে অস্ফুরিত থাকে না। ৩য় ধ্যান:—সাধক প্রীতিতেও বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করিয়া স্মৃতিমান ও সপ্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে প্রীতি নিরপেক্ষ সুখ অনুভব করিয়া এই ধ্যানস্তরে আরোহণ করে। ধ্যানী উপেক্ষা-সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া প্রীতিনিরপেক্ষ সুখে বিচরণ করেন বলিয়া ইহা ৩য় ধ্যান। ৪র্থ ধ্যান:—সর্ব দৈহিক সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বেই সৌমনস্য, দৌর্মনস্য, মনের হর্ষবিষাদ অস্তমিত করিয়া, না সুখ, না দুঃখ, উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে সাধক এই ৪র্থ ধ্যানস্তরে উন্নীত হইয়া থাকেন।

৪। অমিতাভ, পৃঃ ১০৯। ৫। ঐ, পৃঃ ১১২।

তিনি চিন্তা করিলেন—'আমি গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুরানুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয় ধর্ম আয়ত্ত করিয়াছি।' তিনি স্থির করিলেন নির্জনে বাস করিয়া নির্বাণ উপভোগ করিবেন। মহাবগ্‌গে সহম্পতি ব্রহ্মার অনুরোধে এবং অমিতাভ কাব্যে মানবজাতির দুর্গতিদর্শনে তিনি স্বয়ং জীবদুঃখ দূর করিবার জন্য নির্বাণ প্রচারের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। মহাবগ্‌গের অনুসরণে রামপুত্র, আরাড়কালাম এবং আজীবক উপকের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

মৃগদাবের পথে ভাগীরথী তীরে বুদ্ধদেব নদী পার হইবেন। নাবিক বলিল—'প্রযচ্ছ গৌতম তরপণ্যম্।'[১] কাব্যে তথাগত ঊর্ধ্ব আকাশে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,—

বলাকার মালা
ওই দেখ যাইতেছে নদী অতিক্রমি।
দিয়াছে কি পণ্য তারা?

ললিতবিস্তরে আছে বুদ্ধদেব যোগবলে আকাশমার্গে নদীপথ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব বারাণসীতে পঞ্চশিষ্যের[২] নিকটে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলেন। ক্রমে সঙ্ঘের পত্তন করিলেন। পণ্ডিত কাশ্যপ, মগধসম্রাট্ বিম্বিসার, ব্রাহ্মণকুমার সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। এইবার সিদ্ধকাম পুত্র মার-বিজয়ী 'বুদ্ধ' হইয়া শাক্যরাজ্যে আসিলেন। রাজা শুদ্ধোদন আকুল অশ্রুধারায় ভাসিয়া নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথায় নবীন সন্ন্যাসী ধীর পদক্ষেপে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিতেছেন। আবেগজড়িত কণ্ঠে পিতা প্রশ্ন করিলেন—কিং ভন্তে অম্হে লজ্জাপেথ, কিমত্থং পিণ্ডায় চরথ, কিং এত্তকানং ভিক্খূণং ন সক্কা ভত্তং লদ্ধুন্তি সঞ্ঞং করিত্থা।[৩] একই সুরে, একই প্রশ্ন কবি নবীন সেনের শুদ্ধোদনের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়াছে—

সিদ্ধার্থ! সন্ন্যাসী! প্রভু! কেন ভিক্ষা পথে পথে?
এই কটি সন্ন্যাসীর যোগাতে আহার
অক্ষম কি শুদ্ধোদন?[৪]

১। ললিতবিস্তর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৭।
২। পঞ্চশিষ্য: অঞ্ঞাকোণ্ডঞ্ঞ, ভদ্দিয়, বপ্প, অসসজি, মহানাম।
৩। Fausboll, Jātaka, Vol. I, pp 89-90. ৪। অমিতাভ, পৃঃ ১২৯।

পুত্রের উত্তর—নিদানকথায়—'চারিত্তং এতং মহারাজ অম্হাকং।'[১]

অমিতাভে—'মহারাজ! বংশের আমার
এই ভিক্ষাবৃত্তি ধর্ম।[২]

নিদানকথায় শুদ্ধোদনের খেদোক্তি—'নয়ভন্তে অম্হাকং মহাসম্মতখত্তিয়বংসো নাম বংসো তত্থ চ একখত্তিয়ো পি ভিক্খাচারো নাম ন অত্থীতি।[৩]

অমিতাভেও রাজার শোকোক্তি ধ্বনিত হইয়াছে—

আমাদের গৌরব জনম
রাজবংশে—সূর্যবংশে, কেহ কখন আর
করে নাই এই বংশে ভিক্ষা আচরণ।[৪]

কিন্তু বুদ্ধদেব যে নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন! শুদ্ধোদনকে তিনি বলিলেন—'অয়ং মহারাজ রাজবংসো নাম তব বংসো, অম্হাকং পন দীপংকরো কোণ্ডঞ্ঞো-পে-কস্সপো তি অয়ং বুদ্ধবংসো নাম, এতে চ অঞ্ঞে চ অনেকসহস্সসংখা বুদ্ধা ভিক্খাচারা ভিক্খাচারেন এব জীবিকং কপ্পেস্নতি।[৫]

কবি নবীন সেনের বুদ্ধদেবের কণ্ঠে এই উত্তর আরো সংক্ষিপ্ত হইয়াছে—

মহারাজ! রাজবংশে জন্ম আপনার।
দীন ভিক্ষাব্যবসায়ী পূর্ব বুদ্ধদের বংশে
যোগবলে জন্ম আমি লভেছি আবার।[৬]

অমিতাভ কাব্যে মহাপ্রজাবতী গৌতমীর শোক-উচ্ছ্বাস বড় করুণ ও মর্মান্তিক রূপ পাইয়াছে। কিন্তু আরো মর্মন্তুদ রাহুলের প্রব্রজ্যা গ্রহণের মহত্তম দৃশ্য। নিদানকথায় আছে—"রাহুলমাতা কুমারং অলংকরিত্বা ভগবতো সন্তিকং পেসেসি।'[৭] ভিক্ষুপরিবৃত শ্রমণ গৌতমের দিকে নির্দেশ করিয়া গোপা বলিলেন—'পস্স তাত এতং বীসতিসহস্সসমণপরিবুতং সুবণ্ণবণ্ণং ব্রহ্ম-রূপিবণ্ণং সমণং অয়ং তে পিতা, এতস্স মহন্তা নিধিয়ো অহেসুং ত্য-আস্স নিক্খমনতো পট্ঠায় ন পস্সাম, গচ্ছ নং দায়জ্জং যাচ।'[৮] অমিতাভ কাব্যেও গোপা রাহুলকে গৈরিক উত্তরীয় পরাইয়া শিশু সন্ন্যাসীরূপে সাজাইয়াছেন। আনন্দ-বিয়োগের উচ্ছ্বসিত আবেগে শিশু-সন্ন্যাসীকে তাহার পিতার পরিচয় দিয়া তিনি বলিলেন—

১ ও ৩। Fausboll, Jātaka, Vol. I, p.90. ২, ৪। অমিতাভ, পৃঃ ১২৯।
৫। Fausboll, Jātaka, Vol. I. p. 90.
৬। অমিতাভ, ১২৯।
৭, ৮। Fausboll, Jātaka, Vol. I, pp 91—92

অনন্ত অমৃত ধন আছে বৎস, তাঁর কাছে
দিতেছেন অকাতরে নরে দয়াধার,
তোমাকে আমাকে তাহা অবশ্য দিবেন তিনি,
মাগ গিয়া পিতৃধন চরণে পিতার।[১]

নিদান কথায় বুদ্ধদেব সারিপুত্তকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'রাহুলকুমারং পব্বাজেহীতি।[২] কাব্যেও কুমার রাহুল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পিতৃধর্ম বরণ করিয়াছেন।

একদা ভগবান মগধের দক্ষিণগিরির একনলা গ্রামে বাস করিতেছেন। প্রত্যুষে ভিক্ষাপাত্র হস্তে তিনি ব্রাহ্মণ কাশীভরদ্বাজের[৩] দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে শ্রমণ, আমি কৃষিজীবী—কর্ষণ ও বপন করিয়া আমি আমার জীবিকা অর্জন করি।

বুদ্ধ উত্তর করিলেন—আমিও কর্ষণ করি, আমিও বহুশ্রমে বীজ বপন করিয়া শস্য উৎপন্ন করি এবং আহার করি। ভরদ্বাজ জানিতে চাহিলেন—তুমি যদি কৃষিজীবী কোথায় তোমার বলদ, কোথায় বীজ আর হল? বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন—

সদ্ধা বীজং তপো বুট্‌ঠি,
পঞ্ঞা মে যুগনঙ্গলং,
হিরী ঈসা, মনো যোত্তং
সতি মে ফালপাচনং।[৪]

অর্থাৎ—শ্রদ্ধা আমার বীজ, তপ আমার কৃষ্টি, প্রজ্ঞা আমার যুগ ও লাঙ্গল, বিনয় আমার ঈষ, মন আমায় যুগবন্ধন, স্মৃতি আমার ফাল ও পাচন।

অমিতাভে—

'বিশ্বাস আমার বীজ',—বুদ্ধ উত্তরিলা
'আমার শস্যের ক্ষেত্র মানব-হৃদয়।
ধর্ম মম হল, জ্ঞান বলদ আমার,
নির্বাণ আমার শস্য অমর অক্ষয়।'[৫]

১। অমিতাভ, পৃঃ ১৩৩
২। Fausboll, Jātaka, Vol. I, p 92
৩। সুত্তনিপাত, ১ম খণ্ড, উরগ বগ্‌গ, কাসীভরদ্বাজ সুত্ত, পি. টি. এস. পৃঃ ১২-১৩।
৪। কাসীভরদ্বাজসুত্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩, শ্লোক নং ২।
৫। অমিতাভ, পৃঃ ১৩৯।

কিম্বা গোতমীর আখ্যান ধর্মপালের থেরীগাথার টীকাগ্রন্থ 'পরমত্থদিপনীর' কাহিনীকে অনুসরণ করিয়াছে। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদের তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী পরিচালিত করিয়াছেন। সূক্ষ্মদৃষ্টি স্বর্ণকারকে সুচারু বসন, সুরুচি আহার প্রদান করিয়া প্রস্ফুটিত শতদলের পরিণাম চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আবার নির্বোধ চুল্লপন্থককে শুভ্র বস্ত্রখণ্ড প্রদান করিয়া বারংবার ঘর্ষণের ফলে তাহার মলিনত্ব প্রাপ্তি ও সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে চিন্তা করিতে বলিয়াছেন।

চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষ তথাগত বুদ্ধ তাঁহার নবধর্মপ্রচার করিলেন। এইবার তিনি মহাপরিনির্বাণে জীবনদীপ নিঃশেষ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন 'মহাপরিনিব্বানসুত্তন্ত'-এর বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া 'অমিতাভ' কাব্যের 'মহানির্বাণ' রচনা করিয়াছেন। কুশীনগরের পথে তিনি কর্মকারপুত্র চুন্দের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন—

পথে চণ্ড চণ্ডালের হইলে অতিথি
দিল সে মাংসান্ন ভিক্ষা।[১]

মহাপরিনিব্বানসুত্তন্তে আছে বুদ্ধদেব চুন্দের পরিবেশিত 'সুকর মদ্দব' আহার করিয়া পীড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ চুন্দকে দোষারোপ করে তাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। এইজন্য মহাপরিনিব্বানসুত্তন্তে বুদ্ধদেব সুজাতা ও চুন্দ দুইজনের প্রদত্ত পিণ্ডপাতকে সমান শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। তিনি আনন্দকে বলিয়াছেন—

যঞ্চ পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিত্বা তথাগতো অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝতি, যঞ্চ পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিত্বা তথাগতো অনুপাদিসেসায় নিব্বান ধাতুয়া পরিনিব্বায়তি। ইমে দ্বে পিণ্ডপাতা সমসম-ফলা সমসম-বিপাকা অতিবিয় অঞ্ঞেহি পিণ্ডপাতেহি মহাপ্‌ফলতরা চ মহানিসংসতরা চ।[২]

এই বাণীর তাৎপর্য অমিতাভ কাব্যেও রক্ষিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিতেছেন—

সুজাতার অন্নে বুদ্ধ হইলাম আমি,
লভিলাম নিরবাণ অন্নেতে তাহার

১। অমিতাভ, পৃঃ ১৫০।
২। দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পি. টি. এস. পৃঃ ১৩৬।

বড় পুণ্যবান চণ্ড। এই দুই জন
সিদ্ধার্থের হিতকারী সুহৃদ পরম।[১]

কবি মহাপরিনির্বাণে শায়িত বুদ্ধদেবের কণ্ঠে শিষ্যদের উদ্দেশ্যে দুঃখ, অনিত্য, অনাত্মা, চারি আর্য সত্য, মজ্ঝিমপটিপদা, দশশীল, চারি ধ্যানস্তর ইত্যাদি বিষয়ে সর্বশেষ দেশনা প্রদান করিয়াছেন। তারপর—

ফুরাইল শেষ কথা, ধীরে বুদ্ধদেব
হইলা নীরব—ধীরে মুদিলা নয়ন।
ভিক্ষুগণ এক কণ্ঠে ভক্তি উচ্ছ্বসিত
গাইল, সে মহাবন করিয়া ধ্বনিত—
বুদ্ধং মে শরণম্
ধর্মং মে শরণম্
সঙ্ঘং মে শরণম্
মহাকথা, মহাকণ্ঠ শান্ত সুগভীর
নৈশ নীরবতা সহ মিশাইল ধীরে,
মিশাইল ধীরে পুণ্য জ্যোৎস্নার সহ
নির্মল উজ্জ্বলতর পূর্ণ জ্ঞানালোক—
সমাধিস্থ বুদ্ধদেব লভিলা নির্বাণ।[২]

'Light of Asia' প্রভৃতি বুদ্ধদেবের জীবনীকাব্য কবিকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। কারণ ইহাদের মধ্যে তিনি 'ঠিক রক্তমাংসের বুদ্ধ'কে দেখিতে পান নাই। কিন্তু অমিতাভ কাব্যে কবি মর্ত্যলোকবাসী নরোত্তমের কাহিনী রচনা করিলেও তাঁহার দৃষ্টি নভলোকেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁহার নিকট বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্য দশাবতারের অন্যতম অবতার। 'আমার জীবন' গ্রন্থে কবি লিখিয়াছেন—'বুদ্ধ নিজে হিন্দু ছিলেন, হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং হিন্দু যোগশাস্ত্রমতে যোগসাধনা করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ সম্প্রসারিত হইয়া বৌদ্ধধর্মে পরিণত হইয়াছে।'[৩] তাঁহার মতে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে এই অভিমতও যথার্থ নহে—'ভারতের বৈষ্ণবধর্ম রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম মাত্র।'[৪] কবি তাঁহার এই বিশ্বাসের স্বাক্ষর অমিতাভ কাব্যের পাতায় পাতায় রাখিয়াছেন। তাঁহার

১। অমিতাভ, পৃঃ ১৫৩। ২। অমিতাভ, পৃঃ ১৬৫।
৩, ৪। নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃঃ ২৪৫।

বুদ্ধ—ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী নহেন, নিরীশ্বরবাদীও নহেন। তিনি দশাবতারেরই একজন। তাঁহার জননী মহামায়া ও ধাত্রী প্রজাবতী 'শঙ্করের অঙ্কে যেন—পার্বতী ও ভাগীরথী।' একজন দৈবকীরূপে জন্ম দিয়াছেন, অন্যজন যশোদারূপে পালন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী গোপাও—'কিশোরের প্রেমে উন্মাদিনী'—কিশোরী গোপিনী, আর তিনি স্বয়ং নারায়ণের নবম অবতার—জ্ঞানরূপী, প্রেমরূপী ভগবান শাক্যমুনি।

অমিতাভ এক মহামানবের সত্তা। বুদ্ধদেবের মূল্যায়ন বাংলা সাহিত্যে বহুজনে বহুবার করিয়াছেন। কিন্তু এই কাব্যে সমগ্র বিশ্বলোকের নিকট বুদ্ধদেব তাঁহার বাণীর গ্রন্থি কি ভাবে ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত করিয়াছিলেন তাহার স্বার্থক রূপায়ণ ঘটিয়াছে। বুদ্ধদেবের প্রতি লেখকের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ ছিল। এই মমত্ববোধ কাব্যে সমধর্মত্বে পর্যবসিত হইয়াছে। কবির স্বদেশের বৌদ্ধসমাজও তাঁহাকে আপনজন রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধসমাজও মহাপুরুষের এই অতুলনীয় জীবনীকাব্যকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বাগত জানাইয়াছেন। সুদূর সিংহল ও শ্যামদেশের বৌদ্ধ স্থবির তাঁহাকে গ্রন্থ রচনার জন্য প্রশংসাপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সর্বোপরি এই কাব্যে কবির বৌদ্ধ-সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে প্রগাঢ় মননশীলতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম তাঁহার নিকট কেবল গবেষণার বস্তুতেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। তিনি ইহাকে হৃদয় মন ও আত্মা সমস্ত দিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন। 'অমিতাভ' সেই উপলব্ধির সুসংযত ও সুস্পষ্ট প্রকাশ।

ডঃ রামদাস সেন

পুরাতাত্ত্বিক ডঃ রামদাস সেন 'শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়'[১] নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতার 'শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়' চিরাচরিত পথে নহে, পৃথিবীকে রক্তস্নাত করিয়া, বিপক্ষের দর্প বাহুবলে চূর্ণ করিয়া বীরর্ষভ হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নহে। এইজন্যই ত্যাগব্রতী 'গৌতম'—বিশ্ববিজয়ী 'বুদ্ধ'। সমগ্র বিশ্ব আজ তাঁহার চরণে শরণাগতি প্রার্থনায় সমবেত হইয়াছে। স্বল্প পরিসর এই কবিতায় লেখক বুদ্ধের মহিমা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

১। রামদাস গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, ১৩০৯, পৃঃ ১৯০।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

অক্ষয়চন্দ্র 'বুদ্ধদেবের স্বপ্নভঙ্গ'[১] নামে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতায় স্বপ্নে সিদ্ধার্থ চারিটি নিমিত্ত দর্শন করিয়াছেন—(১) অশীতি বয়সী বৃদ্ধ, (২) মরুভূমি মধ্যে বিকারগ্রস্ত স্বজন-পরিত্যক্ত যুবাপুরুষ, (৩) জাহ্নবীপুলিনে ষোড়শী, সুন্দরী, মৃত রমণী, (৪) হিমাদ্রি শিখরে প্রশান্ত মূর্তি তাপস। এই চারিটি দৃশ্য দর্শন করিয়া সিদ্ধার্থের অন্তর বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তিনি সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন—

চাহি না হইতে রাজ অধিরাজ—
ঝড়ে মহীরুহ আগেই পড়ে।
বিভব বাসনা নাহি রাখে চিতে
—মণির কারণে ফণিনী মরে—[২]

'বুদ্ধদেবের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার বিষয়বস্তু সংগ্রহে কবি নিজের কল্পনার উপর যতটা নির্ভর করিয়াছেন ততটা পালি বা বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যের উপর করেন নাই। কবিতাটি লেখকের কল্পনা-প্রসূত হইলেও ত্যাগব্রতী সিদ্ধার্থের চরিত্রের বৈরাগ্য প্রদর্শনই ইহার মুখ্য বস্তু।

শ্যামাচরণ শ্রীমানী

মহাবংশের সংক্ষিপ্ত মূল কাহিনীর সঙ্গে কবির স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার মিশ্রণে তাঁহার 'সিংহল বিজয়' কাব্য প্রণীত হইয়াছে। এই কাব্যে বিজয়সিংহের লঙ্কাজয় দেবগণের শুভ ইচ্ছার ফল। দুরাচার যক্ষগণ তথায় কদাচারে রত। এইজন্য—'নারে মহী সে ভার বহিতে।' আবার শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্রও বুদ্ধদেবের তপঃপ্রভাবে পরিতুষ্ট—

আরো তুষ্ট আমি সাক্যের তপঃপ্রভাবে—
চীন লঙ্কা ব্রহ্ম আদি দেশে সে কারণ
শোভিবে বৌদ্ধ পতাকা, আমার ইচ্ছায়।[৩]

দেবী সরস্বতী সৌদামিনী নাম্নী সুন্দরী বারাঙ্গনাকে বিজয়ের পদস্খলনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। সৌদামিনী উপাখ্যান কবি কল্পিত, ইহা মহাবংশে নাই। সৌদামিনীর ষড়যন্ত্রে রাত্রিবেলা মোহান্ধ বিজয় বণিক ভার্গবের প্রাসাদে

১। ভারতী, ৩য় বর্ষ, ফাল্গুন, ১২৮৬, পৃঃ ৫৩২।
২। ঐ, পৃঃ ৫৩৪।
৩। সিংহলবিজয়, শ্যামাচরণ শ্রীমানী, ১৮৭৫, ১ম সর্গ, পৃঃ ৯।

ধৃত হইলেন। সৌদামিনীলাভে ব্যর্থ হইয়া রাজপুত্র বন্ধুগণসহ মন্ত্রণা করিলেন —রাত্রে ভার্গবগৃহ হইতে চুরি করিয়া সৌদামিনীকে লইয়া আসা হইবে। সংবাদ পূর্বাহ্নে সিংহবাহুর কর্ণগোচর হইল। তিনি মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন বিজয়সিংহ এবং তাহার বন্ধুবান্ধবগণ—

সূর্যাস্ত হইলে কল্য, নাহি যেন
রহে কেহ, এই নগরীতে, পত্নীপুত্র
সহ—অন্যথা মরণ। নির্বাসন কর
সবে দ্বীপ দ্বীপান্তরে। আজি হতে মম
পবিত্র-কুল-কলঙ্কে করিনু বর্জন।[১]

মহাবংশেও প্রায় একই বিবরণ পাওয়া যায়। বিজয়সিংহ পিতার শাসন অমান্য করিয়া নানাবিধ অন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। পিতা দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিজয় ও তাহার সঙ্গীরা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। অবশেষে রাজসভায় প্রজাগণ দাবী জানাইল—'পুত্তং ঘাতেহি তে।[২] রাজা বিজয় ও তাঁহার অনুচরদের অর্ধমস্তক মুণ্ডন করিয়া স্ত্রীপুত্রসহ জাহাজে উঠাইয়া নিরুদ্দেশের পথে নির্বাসিত করিলেন।

রাজাথ বিজয়ং তং চ পরিবার চ তস্স তং
সত্ত সতানি পুরিসে কারেত্বা অড্ঢমুণ্ডকে
নাবায় পক্খিপাপেত্বা বিস্সজ্জাপেসি সাগরে।[৩]

মহাবংশে লোকনাথ বুদ্ধদেব বিজয় ও তাহার সঙ্গীদের রক্ষা করার নিমিত্ত উৎপলবর্ণ দেবতা অর্থাৎ বিষ্ণুকে নিয়োগ করিয়াছেন। বিষ্ণু লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া নবাগতদের নিকট লঙ্কাদ্বীপের পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার পাত্র হইতে মন্ত্রপূত জল তাহাদের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন এবং বাহুতে রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া দিলেন।[৪] সিংহল বিজয় কাব্যেও শ্রীবিষ্ণুদেবই তাঁহাদের সহায়—

শাক্যের প্রার্থনা মতে, রক্ষিতে সবারে
(নবধর্ম প্রচার কারণ) আমি তথা
আপনি শ্রীবিষ্ণুদেব, মহোচ্চ বিশাল
শাল তরুবর, যথা অদ্রি সন্নিকটে
বসিলা মুনির বেশে।[৫]

১। ঐ, ১ম সর্গ, পৃঃ ৩৫।
২। মহাবংস, গাইগার, পি. টি. এস. ছট্‌ঠো পরিচ্ছেদো. পৃঃ ৬০।
৩। ঐ।
৪। মহাবংস, প্রাগুক্ত, সত্তমো পরিচ্ছেদো. পৃঃ ৬২-৬৩।
৫। সিংহলবিজয়, ৩য় সর্গ, ৬৪।

বিজয় এবং তাঁহার অনুচরদের তিনি বলিলেন—

কত শত শত যক্ষ দুরাচার
বিচরে এদেশে এবে, ভীষণ আকার
দেবের ইচ্ছায়, রাবণ যেমতি যক্ষ—
রাজ কালসেন, তব বাহুবলে হবে।
নিপাতিত, ধরিবে সিংহল নাম এই
লঙ্কাধাম, তোমা হতে বিজয় সিংহল।[১]

মহাবংশের অনুযায়ী এখানেও তিনি—

লয়ে শান্তিজল কমণ্ডলু
হতে ছিটাইয়া সবার মস্তকে, পরে
প্রত্যেকের বাহু মাঝে বাঁধিলা কবচ
অতীব যতনে।[২]

মহাবংশের 'কুবণ্ণা' কাব্যে 'কুবিনী' নামে অভিহিতা হইয়াছে। মহাবংশে আছে—কুবণ্ণা যক্ষিণীর কোন পরিচারিকা সোণিরূপে বিজয়ের অনুচরদের নিকট উপস্থিত হইল। অনুচরগণ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া একটি পল্লীর কুটীরের নিকট উপনীত হইলেন। সেই কুটীরের দ্বারে বৃক্ষ ছায়ায় যক্ষিণী কুবণ্ণা তপস্বিনী বেশে উপবিষ্টা ছিল। কুটীরের পার্শ্বেই ছিল একটি পুষ্করিণী। অনুচরগণ তাহার জলে অবতরণ করিয়া অবগাহন করিলেন এবং পদ্মের মৃণাল ভক্ষণ করিলেন। তাঁহারা পুষ্করিণীর তীরে উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র যক্ষিণী বলিল—

'ভক্‌খো সি মম তিট্‌ঠা।[৩]

পবিত্র রক্ষাসূত্রের জন্য সে তাহাদের বধ করিতে পারিল না, কিন্তু বন্দী করিয়া রাখিল।

কাব্যে কাহিনী মূল উৎসধারাকেই অনুসরণ করিয়াছে। কুবেনীর দাসী কালী যক্ষিণী কুক্কুরী বেশে উপনীতা হইলে তাহার কুহকে বিজয়ের অনুচরগণ তাহার পশ্চাৎগামী হইয়াছেন। কিছুদূর গমনের পর তাহারা দেখিলেন—

রম্যস্থানে আসি উপনীতা সারমেয়ী
লইয়া যুবারে। কিবা মনোহর সেই

১। ঐ, ৩য় সর্গ, পৃঃ ৬৫।
২। ঐ।
৩। মহাবংস, প্রাগুক্ত, সত্তমো পরিচ্ছেদো, পৃঃ ৬৩।

স্থল। বিস্তীর্ণ সরসী, অমৃত উদক-
রাশি লইয়া গর্ভেতে··· ··· ··· ··
অদূরে নিভৃত স্থানে তপস্বিনীরূপে
বসিয়া কুবেনী সতী শ্রেষ্ঠ যক্ষবালা
সহর্ষ নয়নে হেরিতেছে যুবা নরে
পাইয়া শিকার।[১]

ক্লান্ত যুবকদ্বয় সরসীনীরে অবতরণ করিয়া অবগাহন করিলেন। নানাবিধ ফলে উদর পূর্ণ করিলেন। পরে যখন তীরে উঠিয়া আসিলেন, কুবেনী তাহাদের ভূগর্ভস্থিত গুপ্ত কারাগারে নিক্ষেপ করিল। এইভাবে একের পর এক বিজয়ের সমস্ত অনুচর কুবেনীর বন্দী হইল। সর্বশেষে উপনীত হইলেন বিজয়। তিনি কুবেনীর যথার্থ পরিচয় অনুধাবন করিতে পারিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। মহাবংশে আছে—

ভচ্চে মে দেহি দাসি, তং
মারেমী তি ভয়ট্টা সা জীবিতং যাচি যক্খিনী
জীবিতং দেহি মে সামি, রজ্জং দস্সামি তে অহং
করিস্সাম ইত্থিকিচ্চং চ কিচ্চং চ'ঞ্ঞঞ্ঞং যথিচ্ছিতং।'[২]

কাব্যেও—

করযোড় করি অতি
করুণ বিনয় স্বরে কহিলা কুবেনী—
ক্ষম অপরাধ প্রভো, স্ত্রীহত্যা পাতকে
কলঙ্কিত কর না পবিত্র কর তব
করিনু ধন যৌবন সব সমর্পণ
নাথ, তবে পদে—দেহ ভিক্ষা মম প্রাণ।[৩]

কুবেনী তাঁহার অনুচরদের ফিরাইয়া দিল। বৃক্ষতলে তাঁহাদের আহারের ব্যবস্থা হইল। আহারান্তে সে ষোড়শবর্ষীয়া রমণীরূপে ভুবনমোহিনী বেশে সজ্জিত হইল, তাহার প্রভাবে তরুতলে দুগ্ধফেননিভ রত্নময় শয্যা প্রস্তুত হইল, বস্ত্রাবাস আবৃত হইল। রাজপুত্র বিজয় যক্ষিণীর হাত ধরিয়া সেই

১। সিংহলবিজয়, ৩য় সর্গ, পৃঃ ৬৭। ২। মহাবংস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪
৩। ঐ, পৃঃ ৭২।

বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন এবং অনুচরগণ পার্শ্বরক্ষায় নিযুক্ত রহিল।[১] কাব্যেও এই চিত্র প্রায় একই রূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর গত হইল। যুবরাজ সুমিষ্ট সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জাগ্রত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—

কহ প্রিয়া কিসের সঙ্গীত ঐ কেন বা
এ ঘোর যামিনী যোগে জাগিতেছে মাতি
সুধারসে কত শত লোক।[২]

মহাবংশে কুবণ্ণা জানাইয়াছেন—যক্ষনগরী সিরীসাবত্থুতে আজ বিবাহোৎসব। লঙ্কারাজকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিবার পক্ষে ইহাই সুসময়—পরে আর তাহা সম্ভব হইবে না। তাহার প্ররোচনায় ও সহায়তায় বিজয় উৎসবোন্মত্ত লঙ্কারাজ কালসেনকে আক্রমণ করিলেন। যক্ষগণের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়সিংহ জয়ী হইলেন। রাজপ্রাসাদে বঙ্গ-পতাকা উড্ডীন হইল এবং তাহা দর্শন করিয়া—

আশীষি তাহার সুন্দর সুবর্ণ
কর, হাসি প্রদানিলা দেব, রাজচিহ্ন
বলি। সুমেরু সমান সুমন কুটের
পরে, দাঁড়াইয়া বৌদ্ধদেব হেরিলেন
বিজয় নিশান। মহোল্লাসে—কিছু দিনে
প্রচারিবে প্রিয়ধর্ম মহীন্দ্র আসিয়া
এই হেতু। অদ্যাপি সে পদচিহ্ন ধরে
শিরঃ পরে শৃঙ্গবর।[৩] —এইভাবে মূল উৎসের সঙ্গে কবি

কল্পনার মিশ্রণে সিংহল বিজয়কাব্য সমাপ্ত হইয়াছে। মহাবংশের পাতা হইতে বঙ্গগৌরব বিজয়সিংহের ঐতিহ্যকে উদ্ধার করিয়া কবি তাঁহার কাব্যে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বুদ্ধের জীবন এবং বৌদ্ধযুগের কয়েকটি আখ্যান অবলম্বন করিয়া তিনি কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। অভিধর্মকোষ ব্যাখ্যাকার বসুবন্ধুর জীবনের একটি কাল্পনিক কাহিনী তাঁহার 'সুনন্দা'[৪] কবিতার বিষয়বস্তু।

১। মহাবংস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।
২। সিংহলবিজয়, ৩য় সর্গ, পৃঃ ৭৬।
৩। ঐ, ৪র্থ সর্গ. পৃঃ ১১১।
৪। কথানিবন্ধ, ১৩১২, পৃঃ ১২১।

যুবক শ্রমণ বসুমিত্র মিথিলার রাজপথে বুদ্ধগুণগান গাহিয়া যাইতেছেন—

কৃপাময় বুদ্ধ অবতার
লভ তার করুণার কণা
দূরে ফেল ছার ভবভার
রহিবে না জনম যাতনা।

বালিকা সুনন্দা এই পরমবাণী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধা হইলেন। দ্বিপ্রহরে নির্বাণ-চিন্তায় বিভোর বসুমিত্রের নিকট সুনন্দা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের বাসনা ব্যক্ত করিল। শ্রমণ বলিলেন—'আজ অনূপগ্রাম স্বামিনীর নিকট অবস্থান কর, কাল ভিক্ষুণীমঠে গমন করিও'। বালিকা গোপনে পুরুষবেশে শ্রমণ সঙ্ঘে যোগদান করিল এবং ব্যাকুল শুশ্রূষায় ব্যাধিগ্রস্ত বসুমিত্রকে আরোগ্য করিয়া তুলিল। বর্ষাবাস সময়েও সুনন্দা পুরুষবেশে সুব্রত নামে বসুমিত্রের সঙ্গে এক বিহারে বাস করিল। ধ্যানসমাধিমগ্ন বসুমিত্র সুব্রতকে পরম নির্বাণতত্ত্ব বলিতেন আর সুনন্দা আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া ভাবিত—'এবার সত্য পরিচয় দিতে হইবে।' সেদিন শ্রাবণের বর্ষণমুখরিত রাত্রে সুনন্দা বসুমিত্রকে নিজের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিল। নারী পরিচয়ে বৌদ্ধ বিহারে আর সুনন্দার স্থান হইতে পারে না। সেই রাত্রেই বৌদ্ধবিহার ত্যাগ করিয়া সে অনূপ গ্রাম-স্বামিনীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুনন্দার সেবায়-যত্নে, স্নেহে-ভক্তিতে শ্রমণ বসুমিত্রের অন্তর অভিভূত হইল। থানেশ্বর যাত্রার পূর্বাহ্ণে তিনি সুনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—

পূর্ব পরিচয় কথা—
গোপন রাখিও তুমি। সুযোগ লভিয়া
জিজ্ঞাসি কুশল তব আসিব যাইব।

কিন্তু সুনন্দা আজ নিজের অন্তরকে বাঁধিয়াছে। অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে সুনন্দা বলিল—

সম্মানিত হবে তুমি হর্ষবর্ধনের
স্বদেশ বিদেশাহুত পণ্ডিত সমাজে।
চীনের ভ্রমণকারী শিষ্য তব শুনি।
তুমি হবে সংঘপতি;—সুনন্দার তরে
করো না উজ্জ্বল যশ সন্দেহে মলিন।

বিরাগী শ্রমণ-বক্ষ এক অজানিত ব্যথায় কাঁপিয়া উঠিল। সুনন্দা আবার বলিল—

একাকিনী নারী
রহিও না পার্শ্বে তার ; যাও নিজ পথে।'

কালে বসুমিত্র সঙ্ঘপতি হইলেন। দিকে দিকে তাঁহার যশোগাথা ছড়াইয়া পড়িল। তিনি অনূপগ্রামে ভিক্ষুণী বিহার ও সুব্রত-সরোবর প্রতিষ্ঠা করিলেন। সুনন্দাও ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়া এই বিহারে বাস করিতে লাগিল। একদিন গ্রামস্বামিনী সুনন্দাকে প্রশ্ন করিলেন—

ছদ্মবেশ ধরি
সংঘপতি সহ তুমি ছিলে কি সুন্দরী ?
ছিল কি সুব্রত নাম ? যে নামেতে হেথা
প্রতিষ্ঠিত সরোবর ? ... ... প্রমাণ লইয়া
গোপনে শ্রমণগণ হেথায় আসিয়া
জিজ্ঞাসি তোমারে কথা করিবে বিচার।

সুনন্দা বুঝিল চরম বিচারের দিন আগত। কিন্তু বসুমিত্রের যশোগৌরব অম্লান রাখিতেই হইবে। প্রভাতে শ্রমণ-শ্রমণীগণ সুব্রতসরোবরে স্নান সমাপন করিতেছেন। এমন সময় গ্রামস্বামিনী তাহাদের সজলকণ্ঠে বলিলেন—

সুনন্দা ঐ সলিল মাঝারে নিদ্রিতা।

বসুমিত্রের যশোগৌরব অম্লান রাখার জন্য সুনন্দা আত্মদান করিয়াছে। 'সুনন্দার' জীবনমন্ত্র প্রেম, সন্ন্যাস নয়। একদিকে প্রেমের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, অন্যদিকে সঙ্ঘজীবনের কঠিন অনুশাসন দুই-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুনন্দার জীবনে প্রেমের জয় ঘোষিত হইয়াছে। এই কবিতার বিষয়বস্তু কবির কল্পনাপ্রসূত, ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

'সুজাতা'[১] উরুবেলার সেনানীগ্রামের ধনীদুহিতা। 'সুজাতা'—যাঁহার পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া সিদ্ধার্থের ছয় বৎসরের কঠিন কৃচ্ছ্রতায় অবসন্ন দেহে নূতন প্রাণশক্তি দেখা দিয়াছিল সেই মহনীয়া রমণীর কীর্তিগাথা। সুজাতা জানিয়াছেন—নিরঞ্জনা নদীতীরে প্রাচীন অশ্বত্থমূলে এক 'পসন্না', 'অচ্ছরিয়ং', সুবন্নবন্নং দেবতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। পায়সান্ন-হস্তে সুজাতা সেই দেবতাকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

কে তুমি হেথা বিজনে বসি ?
নর, কি ঋষি, দেবতা ?

১। যজ্ঞভস্ম কাব্য, ১৩১১, পৃঃ ২০।

অঙ্গ ছাপি পুণ্যপ্রভা চমকে।
দীপ্তি তব বদন নব,
তপ্ত যেন সবিতা
নিরখি নর নয়ন সদা ঝলকে।

নিদানকথায় আছে—শ্রদ্ধাবিগলিতচিত্তে 'সুজাতাসহ এব পাতিয়া পায়াসং মহাপুরিসস্‌স হত্থে ঠপেসি।[১] এবং বলিল—

'অয্য ময়া তুম্‌হাকং পরিচ্চত্তং গণ্‌হিত্বা যথারুচিং গচ্ছথা।'[২] কবি বিজয়চন্দ্রের সুজাতাও মিনতিভরা কণ্ঠে তাঁহার দেবতার নিকট আবেদন জানাইয়াছেন—

বিশ্বপিতা, অন্নদাতা।
পূজিব তবে কি দিয়া
লবে কি এহি অন্ন কৃপা করিয়া?

'খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি'[৩] কবিতায় কবি অতীত খণ্ডগিরির শিল্পশোভা, প্রিয়দর্শী অশোকের অশীতিসহস্রস্তূপ, অশোকের রাজ্যের অপরান্ত সীমা মহিষামণ্ডল, রাজধানী পাটলিপুত্র প্রভৃতি কালের করাল ও দুর্বার গ্রাসে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুতাপ করিয়াছেন।

'পঙ্কমালা'[৪] কাব্যগ্রন্থের 'সুগতপঙ্কক' তথাগত গৌতম বুদ্ধের জীবনী। 'মায়াদেবীর দেবপূজা'—তাঁহার পটিসন্ধি গ্রহণ, 'দেবশিশু'—মহাপ্রজাপতী গৌতমীকর্তৃক শিশু সিদ্ধার্থের ভবিষ্যৎ জীবনে বুদ্ধত্বলাভের সম্ভাবনা চিন্তা। 'জাগরণ'—তাঁহার অভিনিষ্ক্রমণের পুণ্যকাহিনী। 'নির্বাণ'—বোধিলাভের পর তথাগত গৌতমের কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদে আগমন, বুদ্ধের প্রতি শুদ্ধোদন, জননী গৌতমী এবং গোপার শ্রদ্ধানিবেদন। 'সুসমাচার'—তাঁহার লোকোত্তর দেশনার প্রশস্তি।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের কয়েকটি সর্গও তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।[৫] ধনিয় সুত্তের বঙ্গানুবাদও এই গ্রন্থের অন্তর্গত হইয়াছে।[৬] এছাড়া তিনি 'থেরীগাথা' ও 'উদান' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

১। Fausboll, Jātaka Vol, I, p 69.
২। ঐ,
৩। যজ্ঞভস্ম কাব্য, পৃঃ ৩৩। ৪। পঙ্কমালা, ১৯১০, পৃঃ ৩।
৫। হেঁয়ালী, ১৩২২, পৃঃ ১৫৯। ৬। হেঁয়ালী, পৃঃ ১৮১।

'পান্থের প্রতি'[১] কবিতা জ্ঞানতনু তথাগত বুদ্ধের করুণাধন্য সাধকের উপদেশ। ধাঁধায় ভ্রান্ত অন্ধ পান্থের প্রতি এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সংসারের শত ভ্রান্তির জালে আবদ্ধ, লোভ ও ক্ষোভের জ্বালায় জর্জরিত, ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-ভয়ে ভীত পান্থের প্রতি তাঁহার আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে—

আয়রে শ্রান্ত, শান্তি পাবি ;
সবার হেথায় সমান দাবী ;
উচু নীচুর বিচার কিংবা বাধার কথায় ডরিস্‌নে।
কেটে যাবে খটকা ধাঁধার
ঘুচবে বোঝা, টুটবে আঁধার
নির্বাণে প্রাণ হবে তাজা, মারের সাজায় মরিস্‌নে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তথাগত বুদ্ধের চারিত্রিক মহিমা ও করুণার বাণী এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের আখ্যান সত্যেন্দ্রনাথের কবি-মানসের উপর এক অদ্ভুত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। Cowell-সম্পাদিত বৌদ্ধ জাতকসমূহ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।[২] তাঁহার বহু কবিতার উপাদান অতীত যুগের বৌদ্ধ সাহিত্যের কাহিনী হইতে সংগৃহীত। বুদ্ধদেবের মৈত্রী-করুণা, তাঁহার অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগ এবং মহিমাভাস্বর অনুপম বরতনুর বর্ণনা সত্যেন্দ্রনাথের অজস্র কবিতায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে, বৌদ্ধ ভারতের ও বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের ছবিও কবির অন্তরে বহুবার উদ্ভাসিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব, বৌদ্ধভারত ও বৌদ্ধ কাহিনীর প্রতি কবিচিত্তের এই অনন্যসাধারণ প্রবণতা ও স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তাঁহার কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায় আভাসিত। 'বুদ্ধ পূর্ণিমা' কবিতায় শক্তিমানের অবিচারে ব্যভিচারে আর্তের করুণ কান্না ও হাহাকারের মধ্যে মৈত্রীকরুণার মন্ত্রদাতা বুদ্ধদেবকে তিনি আবাহন করিয়াছেন। যিনি মন্ময়—বণীরূপে অমর দেশনার মধ্যে যাঁহার চিরন্তন স্থিতি কবি সেই মহান আত্মাকে স্বাগত জানাইয়াছেন—

তবুও দেহ ধরি, এসহে অবতরি
হিংসা-নাগিনীরে কর হে হতমান।[৩]

১। ঐ, পৃঃ ৬০।
২। হরপ্রসাদ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ, পৃঃ ৯৪।
৩। বেলাশেষের গান, ১৩৬৮ পৃঃ ৭৮।

হে শ্রেয়, হে মহত্তম, হিংসা-নাগিনীকে বশীভূত কর, ক্রূরতা মূঢ়তাকে অপসারিত কর। আজ আবার বুদ্ধদেবের সেই পরম বাণী—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেনালিকবাদিনং।[১]

স্মরণ করার দিন আসিয়াছে। বিশ্ব সায়রের মহত্তম শতদল তিনি। সে দেহের দিব্য সৌন্দর্যও অনুপম—কমল আঁখি প্রশান্ত স্নিগ্ধ, চাঁদের সুষমা তনু দেহের বর্ণে। বিশ্বমরুভূমিতে করুণার বিগ্রহ বুদ্ধ যেন শান্তির সুশীতল ছায়া। করুণাসমাপত্তি ধ্যানে বিশ্বের নিগৃহীত পাপী তাপীর জন্য তাঁহার প্রশান্ত কমল আঁখি মৈত্রী করুণায় বিগলিত। এই 'করুণাসিন্ধু', 'ভুবন ইন্দু' জগজ্জয়ী ভিখারীর পায়ে কবির শ্রেষ্ঠ প্রণতি নিবেদিত হইয়াছে।

কলিকাতায় শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ স্থাপন উপলক্ষে কবি তাঁহার 'বুদ্ধবরণ' কবিতা রচনা করেন। কবি লিখিয়াছেন—কাহার বিভূতি আজ নগরদ্বারে সমাগত ?

'সম্বোধি যার পরশ-পাথর—কাঁচকে করে সোনা,
যাঁর আঁখি ছায় নিখিল হিয়ার নিত্য আনাগোনা,
মৈত্রী-মধুর করুণা যার জুড়ায় হাহাকারে,
জগৎ ঘুরে সেই এসেছে এই নগরের দ্বারে।[২]

তাঁহার আবির্ভাবে লুম্বিনী উদ্যান আজ বিশ্বে 'স্বতন্তরা'—অনন্যা, অতুলনীয়া। লুম্বিনী উদ্যান আজ জেরুজালেম, বেথলেহেমের অগ্র সহোদরা। যিনি রাজমুকুট ফেলিয়া কাষায় ধারণ করিয়া সন্ন্যাসব্রত বরণ করিয়াছিলেন, যাঁহার বাণী বাহ্লীকে, গান্ধারে, লঙ্কায় ও শ্যাম, চীন, জাপানে এবং তাতার ও ইরান দেশে প্রচারিত রাজা কনিষ্ক ও অশোক যাঁহার করুণাধন্য—তাঁহারই পূত দেহাবশেষ আজ কালের সাগর পাড়ি দিয়া বাংলাদেশের দুয়ারে সমাগত।

কবি বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখিত বুদ্ধদেবের পুণ্ড্রবধনে আগমনের প্রাচীন কাহিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

ছিল যে তার আসার কথা অনেক বছর থেকে
শ্রীমান সার্থপতির বধূ রেখেছে তায় ডেকে।
ভক্ত অনাথপিণ্ডদেরি কন্যা যে সেই নারী,
বঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনে যে পতির গেহ তারি।[৩]

১। ধম্মপদং, কোধবগ্গো, শ্লোক সং ৩।
২। বেলা শেষের গান, পৃঃ ১০৫। ৩। ঐ, পৃঃ ১০৭।

বৌদ্ধ সাহিত্য দিব্যাবদান ও অশোকাবদান গ্রন্থে পাওয়া যায় শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী বুদ্ধশিষ্য সুদত্ত-অনাথপিণ্ডদ তাঁহার কন্যা সুমাগধাকে[১] পুণ্ড্রবর্ধনের এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সময়ে পুণ্ড্রবর্ধনে কোন বৌদ্ধ ছিল না। সুমাগধা ধ্যানে বুদ্ধদেবকে পুণ্ড্রবর্ধনে স্বাগত জানাইলেন। বুদ্ধদেব আকাশপথে তাঁহার পঞ্চশত শিষ্যসহ পুণ্ড্রবর্ধনে উপস্থিত হইয়া সুমাগধার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। সেদিনও পুণ্ড্রবধনের অধিবাসিগণ বুদ্ধদেবের আগমনে আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু আজ সেই বালিকা উপাসিকা নাই। এইজন্য এই যুগের কবি—'তারি হয়ে
বরণ করি বুদ্ধ-বিভা চিত্ত-প্রদীপ লয়ে।[২]

'মহানামন্' কবিতায় কবি বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখিত শাক্যরাজ মহানাম চরিত্রের পরিসংস্কার করিয়াছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে বিড়ূড়ভ জননী বাসবখত্তিয়া মহানামের দাসীগর্ভজাত কন্যা। মহানামের চরিত্রে কপটতা ও তুচ্ছ জাত্যভিমান প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। মিথ্যা চাতুরীর আশ্রয় লইয়া তিনি দাসীকন্যা বাসবখত্তিয়াকে শাক্যকুমারীরূপে মহারাজ প্রসেনজিতের নিকট পাঠাইয়াছিলেন আবার বিড়ূড়ভ মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলে তাহাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু 'মহানামন্' কবিতায় শাক্য জ্যেষ্ঠ মহানামের আত্মত্যাগ, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি এবং আদর্শনিষ্ঠা অতুলনীয়। তিনি যথার্থ ই—

শাক্যকুলের দ্বিতীয় সিংহ
বুদ্ধ সে গৃহবাসী—[৩]

বৌদ্ধ সাহিত্যে বিড়ূড়ভের শাক্যরাজ্য আক্রমণের কারণ তাঁহার পিতার প্রতি প্রতারণা এবং দাসীপুত্র বলিয়া তাঁহাকে অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ। স্বয়ং বুদ্ধদেবও শাক্যদের পূর্বকৃত কর্ম বিচার করিয়া তাঁহাদের বিনষ্টিকাল সমাগত বুঝিয়াছেন।[৪] কিন্তু 'মহানামন্' কবিতায় বিরুধকের শাক্যরাজ্য আক্রমণের কারণ বিরুধক—

খবর পেয়েছে—হিংসাবৃত্তি
ছেড়েছে শাক্যকুল—
তাই সে এসেছে নিরস্ত্র জনে
করিবারে নির্মূল[৫]

১। দিব্যাবদানম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ২৫৮ ২। বেলা শেষের গান, পৃঃ ১০৮।
৩। বিদায় আরতি পৃঃ ১১১। ৪। Fausboll, Jātaka, Vol. IV, no. 465 p. 152
৫। বিদায় আরতি, পৃঃ ৯২।

পালিগ্রন্থে বিড়ূড়ভ কৌশলে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। একদা রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার রাজচিহ্নসমূহ সেনাপতি কারায়ণের হস্তে প্রদান করিয়া একাকী গন্ধকুটীরে শাস্তার নিকট গমন করেন। ইতিমধ্যে কারায়ণ রাজচিহ্নসমূহ বিড়ূড়ভকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করেন। ইহার পর প্রসেনজিৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কবিতায়ও কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে।

কোশল ভূপতি প্রসেনজিতের
তনয় পিতৃঘাতী—
বৃদ্ধ পিতার রাজ্য হরিয়া
দেমাকে উঠেছে মাতি।[১]

ধম্মপদ অট্‌ঠকথায় আছে বিড়ূড়ভ শাক্যরাজ্যের যুবক ও নারীশিশু নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করেন। মহানামন্ কবিতায়ও বিরুধকের আদেশ—'শাক্যের কুল কর নির্মূল কি পুরুষ কিবা নারী।' পালি সাহিত্যের বিড়ূড়ভ চরিত্রে নৃশংসতার মধ্যেও পৌরুষ আছে। কিন্তু কবিতায় শাক্যপুরীর ধনৈশ্বর্যের মোহে অহিংসাব্রতী শাক্যদের উপর বিরুধকের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। কবিতায় বিরুধক নৃশংস অত্যাচারী, পররাজ্যলোভী ও কপটাচারী শয়তান। ধম্মপদ অট্‌ঠকথায় মহানাম বিড়ূড়ভের স্পর্শজাত খাদ্য গ্রহণ অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয় করিয়া হ্রদের জলে জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। Rockhill তাঁহার Life of the Buddha গ্রন্থে লিখিয়াছেন বিরুধকের অত্যাচারে যন্ত্রণাকাতর শাক্যদের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া উদ্বিগ্ন মহানামন বিরুধককে বলিয়াছিলেন—Let as many of my people escape as may which I can remain in the water without sinking.[২] কবিতায়ও মহানামন চরিত্রে এই উদার আত্মবিসর্জন এবং হিংসাবিরত মহিমার নিদর্শন পাওয়া যায়। পাটলি হ্রদের জলে আত্মবিসর্জন করিয়া তিনি শাক্যকুলের জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

'ঘুম গুম্ফায়[৩]' কবিতা তিব্বতীয় বৌদ্ধমন্দিরের একটি নিখুঁত ও অকৃত্রিম ছবি। দুর্গম পর্বতশ্রেণীর কোলে বৌদ্ধ ঘুমগুম্ফায় ত্রিরত্ন প্রতিষ্ঠিত। ত্রিপিটক

১। বিদায় আরতি পৃঃ ৯১।
২। p. 119.
৩। বেলা শেষের গান, পৃঃ ৭৬।

সেথানে পূজা পায়। অবতার-দেবতাদের মূর্তি তথায় আঁকা আছে। গুম্ফায় শান্তি ও নির্বাণের প্রতীক প্রশান্ত গম্ভীর বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। সেই প্রতিমাও অনুপম—

সেকি দৃষ্টির চন্দন বৃষ্টি, মরি,
নিতে সৃষ্টির সন্তাপ রিষ্টি হরি,
সে কি কাঞ্চন-চম্পক লাঞ্ছন রূপ—
সে কি সৌরভ তন্ময় পুণ্যের ধূপ।

গুম্ফার অভ্যন্তরে অহরহ লামাদের জপমন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুং' উচ্চারিত হইতেছে। মহাপুরুষের মহিমায় এ গুম্ফা মহামহীয়ান্। এইস্থল শান্তি ও ধ্যানের রাজ্য। বিশ্বের অমৃতসন্ধানীকে ইহা শাশ্বত সত্যের আভাস দান করিয়া থাকে।

'সুরার কাহিনী'[১] কবিতার উৎস 'কুম্ভ জাতক'।[২] জাতকে আছে কাশীরাজ্যবাসী সুর নামক এক বনচর বিক্রয়ের উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহের জন্য হিমবন্ত প্রদেশে গমন করে। তথায় কোন বিশাল বৃক্ষের গর্তে বৃষ্টির জলে, হরীতকী-আমলকী ফল এবং পক্ষী মুখচ্যুত শালি ধান্য পচিয়া জল রক্তবর্ণ হইত। অরণ্যের পক্ষীকুল তাহা পান করিত আর ক্ষণকাল বৃক্ষতলে অর্ধচেতনবৎ পড়িয়া থাকিত, আবার দূর অরণ্যে কলরব করিতে করিতে উড়িয়া যাইত। বনচর ভাবিল 'সচে ইদং বিসং ভবেয্য ইমে মরেয্যুং, ইমে পন থোকং নিদ্দায়িত্বা যথাসুখং গচ্ছন্তি'। সুতরাং 'ন ইদং বিসন্তি।' অবশেষে সে নিজেও তাহা পান করিল এবং—মত্তো হুত্বা মংসং খাদিতুকামো অহোসি, ততো অগ্গিং কত্বা রুক্খমূলে পাতিতে তিত্তিরকুক্কুটাদয়ো মারেত্বা মংসং অঙ্গারেসু পচিত্বা একেন হত্থেন নচ্চন্তো একেন মংসং খাদন্তো একাহদ্বীহং তত্থ এব অহোসি।' কবিতায়ও দেখিতে পাই পাখীর অনুসরণে কৌতূহলী বনচর সুর ডগের হাঁড়লের তীব্র মধুর পানীয় পান করিয়া নেশাগ্রস্ত হইয়াছে। এবং—

চকমকি জ্বেলে পুড়িয়ে সে খেল
মাতাল তিতির পাখী।

১। বেলা শেষের গান, পৃঃ ১৫।

২। **Fausboll, Jātaka, Vol, V, no. 512, p 11.**

জাতকে আছে—সুর প্রথম দেখিয়াছিল তাই সে বস্তুর নাম সুরা—ইতি সুরেন দিট্‌ঠা তস্‌স পানস্‌স সুরা।' কবিতায় তাহার প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে—

সুর সে প্রথম পান যা করিল
তার নাম হল সুরা।

এর পর সুর নূতন ব্যবসা পত্তন করিয়াছে। বাঁশের চোঙায় সুরাপূর্ণ করিয়া সে সীমান্ত গ্রাম, বারাণসী ও অযোধ্যাবাসীদের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল। সুরার নেশায় দেখিতে দেখিতে রাজ্য ছারখার হইল, ধর্মকর্ম বিসর্জিত হইল, অন্যায়, চৌর্য, শঠতায় দেশ রসাতলে গেল আর প্রচুর অর্থে সুরের প্রসার বাড়িয়া চলিল। এইবার সুর শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিল। জাতকে এই সময়—'তদা সাবত্থিয়ং সব্বমিত্তো নাম রাজা অহোসি।' সুর রাজার অনুমতি লইয়া এইখানেও সুরা প্রস্তুত আরম্ভ করিল। পাঁচ শত পাত্রে সুরা পচিতে লাগিল এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রতি পাত্রের সঙ্গে একটি বিড়াল বাঁধিয়া রাখা হইল। বিড়ালেরা সুরার পাত্র চাটিয়া পানমত্ত হইলে—'মুসিকা আগন্ত্বা তেসং কণ্ণনাসিকদাঠিকনং গুট্‌ঠে খাদিত্বা অগমংসু।' কবিতায়ও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে—

—ইঁদুরে খেয়েছে বিড়ালগুলার
নাক কান কুরে কুরে।

এই বিচিত্র সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইলে রাজা বলিলেন—'বিসকারকা তে ভবিস্‌সন্তি।' তিনি—'সুরকে দিলেন শূলে।' কিন্তু এই দিকে ততক্ষণে

—অপগত-নেশা পাঁচশ বিড়াল তখন বসেছে উঠে।

রাজা ভাবিলেন—বিসং অস্‌স এতে মরেয়ুং মধুরেন এব ভবিতব্যং পিবিস্‌সামি।' ইহার পর জাতকে রাজা সুরাপানে উদ্যত হইলে দেবরাজ শক্রের প্রচেষ্টায় তিনি সুরার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিলেন এবং সুরাপানে বিরত হইলেন। কিন্তু কবিতায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। শ্রাবস্তীরাজ নিজেই উপলব্ধি করিয়াছেন—

ভালো সামগ্রী পচিয়ে সড়িয়ে
সৃষ্টি হয়েছে যার
সকল ভালো সে পচিয়ে সড়িয়ে
সব দেবে ছারেখার।

'বেলাশেষের গান' কাব্যের অন্তর্গত 'সুশ্বেতা' কবিতাটি দিব্যাবদানের একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত।[১] অবদানের কাহিনীটি নিম্নরূপ—

অতীতে উত্তরাপথে উৎপলাবতী নামে এক প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। এক সময়ে এই নগরীর রাজধানীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মানুষ দলে দলে দুর্ভিক্ষের কবলগত হইতে লাগিল। রাজ্যে ভিক্ষা লাভও ক্রমশ দুর্লভ হইয়া উঠে। এই সময়ে উৎপলাবতীতে রূপাবতী নামে এক অভিরূপা দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা, শুভ্রবর্ণা পুষ্কলনয়না রমণী ছিল। একদা সেই রমণী দেখিল এক দুর্ভিক্ষপীড়িতা নারী একটি সুন্দর শিশু প্রসব করিয়াছে এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আপন পুত্রের মাংসে উদর পূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। রূপাবতী তাহা দেখিয়া বলিলেন 'কিমিদং ভগিনি কর্তুকামাসি ?'[২]

নারী উত্তর করিল—জিবত্‌সিতাস্মি ভগিনি। ইচ্ছামি স্বকানি পুত্রমাংসানি ভক্ষয়িতুম্‌।[৩]

রূপাবতী মনে মনে ভাবিতে লাগিল কিভাবে আমি এই শিশুর জীবন রক্ষা করিব ? যদি আমি গৃহ হইতে খাদ্য আনয়ন করিতে গমন করি তবে সেই অবসরে এই নারী শিশুটিকে খাইয়া ফেলিবে। রূপাবতী আবার প্রশ্ন করিল—

'অস্তি তে ভগিনি নিবেশনে শস্ত্রম্‌' ?[৪]

নারী গৃহাভ্যন্তরে কোথায় অস্ত্র রহিয়াছে ইঙ্গিতে তাহা দেখাইয়া দিল। রূপাবতী সেই তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা স্বীয় স্তনযুগল ছেদন করিল এবং মাংসরুধির সমেত তাহা ক্ষুধার্ত নারীটিকে প্রদান করিল। নারীর ক্ষুৎপিপাসা পরিতৃপ্ত হইলে রূপাবতী তাহাকে বলিল—'অয়ং দারকো ময়া স্বকেন মাংসরুধিরেণ ক্রীতঃ।'[৫] অবশেষে আপন গৃহে ফিরিয়া রূপাবতী এই পুণ্য কর্মের সত্যক্রিয়ার দ্বারা পূর্বানুরূপ স্তনযুগল লাভ করিল।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সুশ্বেতা[৬] কবিতায় উৎপলাবতী নগরী মহাপদ্মের নগরে পরিণত হইয়াছে। রূপাবতী এই কবিতায় বন্ধ্যারমণী। শোন-গঙ্গার সঙ্গমে

১। দিব্যাবদানাম্‌, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, রূপাবত্যবদানম্‌, পৃঃ ৩০৭

২। দিব্যাবদানম্‌, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৭।

৩, ৪, ৫। ঐ, পৃঃ ৩০৭—৮।

৬। বেলাশেষের গান, ১৩৬৮, পৃঃ ৯-১৪।

স্নান সমাপন করিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল। এই সময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত মহাপদ্মের নগরের পথে পথে ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার উঠিয়াছে। হঠাৎ সে দেখিল—

কঙ্কাল সার শবরীর কোলে চাঁদ সে পড়েছে খসি।
সদ্য শিশুরে দংশিছে! আরে! প্রসূতি না রাক্ষসী!

অবদানে রূপাবতীর প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুধার্তা রমণী তাহার তীব্র ক্ষুধার বর্ণনা দিয়াছে—'কুক্ষির্মে লুপ্যতি, পৃথিবী মে স্ফুটতি, হৃদয়ং মে ধুমায়তি, দিশো মে ন প্রতিভাস্তি'।[১] সুশ্বেতা কবিতায় প্রায় একই সুরে শবরী জানাইয়াছে—

মরি,...মরে যাই...ক্ষিধের জ্বালায়...বুকে পিঠে খিল ধরে।
একে অনাহার তাহে লহু ক্ষয়, দেহ ঝিম ঝিম করে।

অবশেষে এই অসহ্য ক্ষুধার তাড়নায় শবরী তাহার সদ্যোজাত শিশুটিকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বন্ধ্যা রমণী ক্ষিপ্রহস্তে শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। উন্মাদিনী চিৎকার দিয়া উঠিল—

কেউ দিলে নাকো...বিধাতা দিয়েছে... এ মোর মুখের গ্রাস—
কোথা হতে এলি তুই চণ্ডালী...কেড়ে নিয়ে কোথা যাস্?

দৃঢ়হস্তে ক্ষুধার্তা উন্মাদিনী শবরীকে রুখিয়া নারী উত্তর করিল—

—ওরে ওরে। দিব নাক তোরে খেতে এ দুধের বাছা,
মাংসপিণ্ড চাস যদি নে রে এ মোর মাংস কাঁচা;
বৃথা মাংস এ বন্ধ্যার স্তন, আয় ক্ষুধাতুরা আয়,
এতে ক্ষুধা যদি মেটে তোর কেটে নে রে তুই খাপ্‌রায়।

অবশেষে মমতাময়ী নারীর মাতৃত্বে, তাহার চরম আত্মনিগ্রহে অঘটন সংঘঠিত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধের কৃপায় বন্ধ্যারমণীর স্তন বাহিয়া ধারা স্রোত ছুটিয়াছে। সে ধারা রক্তের ধারা নয়,—সে ধারা পীযূষ ধারা। বন্ধ্যারমণী জানে না বুদ্ধের বরে কখন তাহার ক্ষতবিক্ষত স্তনের রক্তধারা ক্ষীরধারায় পরিণত হইয়াছে। অতঃপর—

ক্ষতক্ষীণ স্তনে পান করে মাতা, ক্ষতহীন স্তনে ছেলে।

১। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৮।

অবদানে রূপাবতীর রুধির-মাংসে পরিতৃপ্তা রমণীকে সে জানাইয়াছে—'অয়ং দারকো ময়া স্বকেন মাংসরুধিরেণ ক্রীতঃ'।[১] 'সুশ্বেতা' কবিতায় শবরী বলিয়াছে—

ও ছেলে তোমার, কিনেছও তুমি নিজের মাংস দিয়ে।

অবদানে সত্যক্রিয়ার ফলে রূপাবতী আবার তাহার অক্ষত স্তনযুগল ফিরিয়া পাইয়াছে। 'সুশ্বেতা' কবিতায় সন্তানহীনা বন্ধ্যার স্তনের 'বৃথা মাংসের' বিনিময়ে সে বুকভরা সম্পদ্ লাভ করিয়াছে। সে তাহার স্বামীকে জানাইয়াছে—

ভিখ দেছে দুর্ভিক্ষ আমারে, নিধি দেছে আলোকরা,
বুকের মাংস বিনিময়ে, ছাখো, পেয়েছি কী!—বুক ভরা!

'পরিব্রাজক'[২]—কবিতায় উপসম্পদা গ্রহণের পূর্বে চৈনিক শ্রমণ সংঘবোধিস্বামীর নিকট তাঁহার জীবনের পাপ-স্বীকৃতি প্রদান করিতেছেন। একদা চীন দেশ হইতে দুই শ্রমণ জলপথে নৌকায় বুদ্ধদেবের জন্মভূমির দিকে যাত্রা করেন। নৌকা বঙ্গোপসাগরে উপনীত হইলে প্রবল ঝঞ্ঝাঘাতে মাঝিরা পথের নিশানা হারাইয়া ফেলেন। বিপথে পাহাড়ে আঘাত লাগিয়া নৌকার তল টুটিয়া গেল। জীবনভয়ে যাত্রীর দলে হাহাকার উঠিল। এমন সময় আর একটি সাহায্যকারী নৌকা উপস্থিত হইল। মাঝিরা বৌদ্ধ শ্রমণদের সেই নৌকায় আহ্বান জানাইলে বৌদ্ধশ্রমণ বোধিরক্ষিত

কহিল মাঝিরে 'আমি যেতে নারি
একটি প্রাণীরে ফেলি
সব যাত্রীর ঠাঁই হয় যদি
আমি যাব সব শেষে।

মাঝিরা আবার মিনতি জানাইল—প্রায় সব যাত্রীরই যে জায়গা সঙ্কুলান হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধশিষ্য অটল সঙ্কল্প, বলিলেন—

দেখা যাবে শেষে
সব শেষে মোর স্থান।'

১। দিব্যাবদানম্ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৮।
২। তুলির লিখন, পৃঃ ৪৬।

কারণ—তিনি যে করুণাবতার বুদ্ধশিষ্য। বোধিরক্ষিত তাঁহার সঙ্গী শ্রমণের হাতে উপাসকদের পূজাসামগ্রী প্রদান করিয়া কহিলেন এই পূজাসামগ্রী বোধিমণ্ডপে অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু—

আমি ক্ষীণ ; পথে মারা যেতে পারি
বুদ্ধের অনুরাগী।
যাও তুমি।'

অনিবার্য মৃত্যুর মুখে সঙ্গী পড়িয়া রহিল আর সেই শ্রমণ পূজাসামগ্রী লইয়া নৌকায় উঠিয়া আসিলেন। এইবার ধীরে ধীরে নৌকা ডুবিতে লাগিল। সেই ভগ্ন নৌকায় বসিয়া

তবু অবিচল বুদ্ধভকত
অমিতাভ দেবে স্মরি।

বোধিরক্ষিত তরঙ্গসংঘাতে সমুদ্রবক্ষে চিরনির্বাণ লাভ করিলেন আর তাঁহার সঙ্গী শ্রমণ বাঁচিবার লোভ, আর পুণ্যের লোভের কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলেন। উদ্বেলিত সিন্ধুবক্ষে জীবনমৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার দোসরকে মৃত্যুর হাতে বিসর্জন দিয়াছেন আর নিজের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম পাপ। একদা বন্ধুর ঈর্ষায়, প্রণয়িনীর প্রতারণায় অভিশপ্ত হৃদয়ে তিনি সংঘের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাণের ব্যথা হৃদয়ের ক্লেশ জুড়াইবার জন্য নিজেকে বহুর মধ্যে কেন্দ্রবিহীন প্রেমে প্রসারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু এইখানেও তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার এই পাপ স্বীকৃতি—

ওগো প্রভু! মহাসঙ্ঘরাজন্!
সঙ্ঘ বোধিস্বামী।
বন্ধুঘাতী এ বিদেশী পাতকী
পাতকে বিদ্ধ হিয়া,
উপসম্পদা কেমনে লইবে
বোধিতরুমূলে গিয়া,

'সিংহল'[১] কবিতায় মহাবংশে উল্লেখিত বিজয়সিংহের লঙ্কা জয়ের ক্ষীণ আভাসমাত্র পাওয়া যায়। মহাবংশে বিজয়সিংহ ষোড়শ বর্ষীয়া তরুণীর ন্যায়

১। সিংহল, কুহু ও কেকা, পৃঃ ১১৬।

সুন্দরী কুবণ্ণা যক্ষিণীকে শয্যাসঙ্গিনী করিয়াছিলেন।[১] সিংহল কবিতায় কবি সেই প্রাচীন কাহিনীর স্বীকৃতি দিয়াছেন—

ওগো বঙ্গের বীর সিংহলরাজ কন্যার হয় বর।

মহাবংশে আছে—সম্রাট অশোকপুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধর্মের অমৃতবাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কবিকণ্ঠে তাহারও স্বীকৃতি সগৌরবে ধ্বনিত হইয়াছে—

আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ্ নির্বাণ।

বঙ্গবীর বিজয়সিংহের প্রতি কবির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অন্যান্য কবিতায়ও নিবেদিত হইয়াছে। 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'[২] কবিতায় বিজয়সিংহ দ্বিতীয় রামচন্দ্র। আবার—

রাম যা স্বয়ং পারেন নি গো, তাও যে দেখি করল সে
লঙ্কাপুরীর নাম ভুলিয়ে ছত্রদণ্ড ধরল সে।

'আমরা' কবিতায়ও বিজয়সিংহের শৌর্যবলে লঙ্কাজয়ের স্বীকৃতি আছে। এছাড়াও কবি তাঁহার কাব্যকৃতির পাতায় পাতায় বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধ-ভারত ও বাংলার প্রতি মুগ্ধ, অভিভূতচিত্তে তাঁহার শ্রেষ্ঠ পূজার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। ভাব নিবিড়তার অভাব সত্ত্বেও 'সিংহল' কবিতা কবিহৃদয়ের অনুভূতির প্রাণস্পর্শে চিরসঞ্জীবিত।

'আমরা' কবিতায় অতীশ দীপঙ্করের তিব্বতে ধর্মপ্রচার, এবং 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' কবিতায় নেপাল, ভূটান, তিব্বত, চীন ও জাপানের চৌরাশীসিদ্ধার সিদ্ধির বাণী বিতরণের ঐতিহাসিক কাহিনী কবিকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। বরবোদুরের মন্দিরের স্থাপত্যশিল্পে, অজন্তার ছবিতে কবি বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী বাংলার অক্ষয় কৃতিত্বের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

'শোন নদের প্রতি'[৩] কবিতায় ধর্মাশোক এবং 'বারাণসী'[৪] কবিতায় জাতকের কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত ও নৃপতি অশোকের স্মৃতিচারণা করিয়াছেন। সুদূর অতীতের ব্যবধান এড়াইয়া অশোকের কীর্তি কবির চোখে প্রত্যক্ষবৎ

১। মহাবংস, গাইগার সম্পাদিত, সপ্তম পরিচ্ছেদ, শ্লোক সং ২৬—২৯। পৃঃ ৬৫।
২। কাব্যসঞ্চয়ন, পৃঃ ৭৮।
৩। কুহু ও কেকা, পৃঃ ৯২।
৪। ঐ, পৃঃ ৯৩।

প্রতীয়মান হইয়াছে। 'ভারতের আরতি'[১] কবিতায় যে ভারত বুদ্ধের জননী, যে ভারতে তাঁহার কল্যাণ ও মৈত্রীর বাণী প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, যেখানে অক্রোধ, অক্ষোভ মন্ত্রে দর্পীকে, ধৃষ্টকে তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, অর্হৎ শ্রমণ তীর্থঙ্কর যাঁহার গৌরব কীর্তন করে সেই বুদ্ধজননী ভারতবর্ষের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা শ্রীবুদ্ধের মহান্ আবির্ভাবের দ্বারা ধন্য। 'বৈশাখ' কবিতায় কবি সেই মহত্তম আবির্ভাবকে স্মরণ করিয়াছেন—

ভারতে করিলে তুমি প্রবুদ্ধ
বুদ্ধেরে দিলে আনি
এশিয়ার আলো চুমিল প্রথম
তোমার ললাটখানি।[২]

শাক্যমুনি বুদ্ধ ভারতের বক্ষ হইতে জাতিভেদের লৌহকপাট উন্মোচন করিয়াছেন। 'জাতির পাঁতি'[৩] কবিতায় সগর্বে লিখিয়াছেন—

গোত্র-দেবতা গর্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি
আর দুই মহাদেশের মানুষে
কোন্ মহাজন মিলাল শুনি।

'যৌবন সীমান্তে'[৪] কবিতা থেরীগাথার অন্তর্গত অম্বপালী[৫] গাথার অনবদ্য অনুবাদ। অম্বপালী বৈশালীর প্রসিদ্ধ বারবণিতা। তিনি অনিন্দ্যরূপবতী ও প্রভূত ক্ষমতাশালিনী ছিলেন। বুদ্ধদেবের কৃপায় তাঁহার জীবনে পরিবর্তন

১। বেলাশেষের গান, পৃঃ ২৭।

২। অভ্র-আবীর, পৃঃ ৬০।

৩। কাব্যসঞ্চয়ন, পৃঃ ৭১।

৪। মণিমঞ্জুষা, পৃঃ ১৮৬।

৫। অম্বপালীর জীবনকাহিনী ধম্মপালের 'পরমত্থদীপনী', 'অপদান', 'মালালঙ্কার বত্থু', 'মহাবগ্গ' ও মহাপরিনিব্বানসুত্তে পাওয়া যায়। অম্বপালী বুদ্ধদেবকে তাঁহার আম্রকাননে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। এই সময়ে লিচ্ছবী বংশীয় রাজা বহু পারিষদসহ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবানকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধদেব বলিলেন তিনি অম্বপালীর আমন্ত্রণ পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা ভাবিলেন অম্বপালী যদি তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে তবে ভগবান রাজ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু অম্বপালী সহস্র সুবর্ণমুদ্রার বিনিময়েও নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলেন না। পরদিন বুদ্ধদেব সশিষ্য অম্বপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। অম্বপালী সেইদিনই আম্রকাননসহ তাঁহার বিপুল সম্পত্তি বৌদ্ধসঙ্ঘে দান করিলেন।

আসে। পরে তিনি থেরী হইয়াছিলেন। এই গাথা তিনি বৃদ্ধ বয়সে রচনা করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে রূপ যৌবনের অনিত্যতা বিষয়ে দেশনা দান করেন। যৌবন-সীমান্তে উপনীতা থেরী রূপযৌবনের চরম পরিণতি উপলব্ধি করিয়াছেন কারণ—'সচ্চবাদিবচনং অনঞ্ঞ থা'—'সত্যবাক্যের কথা কি মিথ্যা হয়?' অম্বপালী সে যুগের অনন্যা সুন্দরী—কিন্তু সে রূপের প্রদীপ্ত শিখা যে কতখানি উজ্জ্বল ও মনোরম তাহা তাঁহার গাথা পাঠে কল্পনা করা যায়। বহু উপমার সাহায্যে জ্ঞানবৃদ্ধা থেরী তাঁহার বিগত রূপযৌবন এবং তাহার বর্তমান পরিণতি বর্ণনা করিয়াছেন। কবির অনুবাদও মূলের ন্যায় চিত্তভাবব্যঞ্জক, রসমধুর ও সাবলীল হইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের বৌদ্ধ বিষয়ক কবিতায় কবি-হৃদয়ের উপলব্ধির সত্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বর্ণাঢ্যতার প্রকাশ অধিকতর। শাক্যমুনি বুদ্ধের মহান্ জীবন ও ধর্ম বুদ্ধশিষ্যদের হৃদয়বত্তা ও দুঃসাধ্যসাধনব্রত এবং জাতকের কয়েকটি কাহিনী কবির চিত্তে বিচিত্র সুরঝঙ্কার তুলিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধদেবের অনন্যসাধারণ মহিমার সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক সংযোগ ঘটে নাই। ইহার নিদর্শন কবির 'ঋষি টলস্টয়'[১] কবিতা। এই কবিতায় কবি ঋষি টলস্টয় ও শাক্যমুনি বুদ্ধের অসমতুলনা উপস্থাপিত করিয়াছেন—

হে মনীষি, জাগে আজি মনে
সিদ্ধার্থের সুপ্ত স্মৃতি—তোমার শুনিয়া কণ্ঠরব,
সেই সুর, সেই কথা ; তারি মত—তারি মত সব!
সেই ত্যাগ। সেই তপ। সেই মহামৈত্রীর বাখান।
বুদ্ধকল্প বিশ্বপ্রেমে বর্তমানে তুমি মহাপ্রাণ।

এই কবিতাসমূহে পাণ্ডিত্য আছে, বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু ভাবগভীরতা নাই। এইজন্য ইহা পাঠকের মনকে মুগ্ধ, আবিষ্ট করে, কিন্তু সমাহিত করে না।

সতীশচন্দ্র রায়

শান্তিনিকেতনে বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম নিদর্শন সতীশচন্দ্র রায়ের 'চণ্ডালী' নামক কবিতা।[২] কবিতাটির উৎস দিব্যাবদানের অন্তর্গত

১। কুহু ও কেকা, পৃঃ ১৩৯।

২। বঙ্গদর্শন, ১৩১০ সাল, পৃঃ ৪৪৯-৪৫৪।

শার্দূলকর্ণাবদান।[১] অবদানের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। আর কবিতায় বিধবা চণ্ডালী তাহার একমাত্র কন্যা অম্বিকাসহ বৈশালীর প্রান্তগ্রামে বাস করে। একদা অম্বিকা জল তুলিতেছে, এমন সময়—

—সহসা তৃষ্ণায় হাহা করি
এক ভিক্ষু মহাজন এসে পল উঠিনু শিহরি।
একি রূপ মরি মরি। একি রূপ আগুনসমান—
তৃষ্ণায় শরীরখানি মৃদুমন্দ তাহে কম্পমান—
ঠিক যেন বহ্নিশিখা। মাগো, আমি তৃষ্ণা তাঁর ভুলি
রহিলাম চাহি শুধু দুনয়ন প্রাণপণ খুলি—
আহা! চমকিয়া শেষে অঞ্জলিতে ঢেলে দিনু জল—
হাসি, আশীর্বাদ করি চলি গেলা হইয়া শীতল।

জল পান করিয়া আনন্দ চলিয়া গেলেন। এখন অম্বিকার অবস্থা দিব্যাবদানের প্রকৃতির সঙ্গে তুলনীয়। অবদানে প্রকৃতি আনন্দের দৈহিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া জননীর নিকট আনন্দকে স্বামীরূপে লাভ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছে এবং জননীর যাদুবিদ্যার সহায়তা চাহিয়াছে। জননী জানে শ্রমণ গৌতম বীতরাগ, যাঁহারা বীতরাগ তাঁহাদের উপর বশীকরণ মন্ত্রের শক্তি কাজ করে না। কিন্তু প্রকৃতি দৃঢ় সঙ্কল্প। শ্রমণ গৌতম বীতরাগ সুতরাং যদি তাঁহার শিষ্য আনন্দকে লাভ করা না যায় তবে সে জীবন বিসর্জন দিবে। কবিতায় জননীর নিকট অম্বিকা করুণ আবেদন জানাইয়াছে—

—মা, তোর সেই মন্ত্র মোরে দেগো শিখাইয়া দে।
সারারাত্রি জাগি জাগি মন্ত্রে তারে আনাবই বেঁধে।

ভিক্ষুর উপর মন্ত্রপ্রয়োগে অম্বিকাজননী অনিচ্ছুক। কন্যাকে সে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহে—

ভিক্ষুর ভাঙিবি ব্রত; হবি ঘোর নরকগামিনী:

কন্যা বলিল—'অযুত নরকে যাব।'

মূলে সম্মোহন যজ্ঞের হোতা প্রকৃতির জননী, কবিতায়—মাতা নহে, অম্বিকাই যজ্ঞের হোতা। তবে যজ্ঞানুষ্ঠানে মূলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় আছে।

১। দিব্যাবদানম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ৩১৪।

মুণ্ডে গোময় লিপ্ত অঙ্গনে প্রজ্বলিত বেদীতে অষ্টশত অর্কপুষ্পদ্বারা যজ্ঞ সমাপন হইয়াছে। কবিতায় অম্বিকা—

পরি এক বাঘছাল রক্তসূত্র জড়াইয়া শিরে
জানু পাতি বসিয়াছে, পড়িতেছে মন্ত্র ভয়ঙ্কর—
সম্মুখে কেহই নাই। মা গেছে সরিয়া দূরপর।
একাকিনী অম্বিকা সে পত্ররাশি বহ্নিমাঝে ছাড়ি
দুহাতে চাপিছে বক্ষ যেন হিয়া দেবে বা উপাড়ি—

বৈশালীর বেণুবনে প্রশান্তমূর্তি বুদ্ধদেব সমাসীন। তাঁহার আননে মৈত্রী-করুণার জ্যোতি, চারিপাশে সমবেত শান্তিব্রত ভিক্ষু-সঙ্ঘ। কবির বর্ণনায় তাহার একটি অপূর্ব চিত্র ধরা দিয়াছে—

'ধরার ব্যথার ব্যথী ওই হের বসি আছে সব—
বৈশালীর বেণুবনে বুদ্ধে ঘিরি স্তিমিত নীরব।
বৃহৎ হৃদয়গুলি অধীর বৃহৎ বেদনায়—'

বাহিরে কী প্রবল ঝড়, ঝঞ্চা, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন—

'—তবু তার মাঝে সবে বুদ্ধে ঘিরি বসি আছে স্থির—
তেমনি ওদের হিয়া অকম্পিত ঝড়ে পৃথিবীর,
ক্রূর হানাহানি দ্বেষ, যজ্ঞভূমে পশুঘাতমত
লোকনিপীড়নমাঝে—উহারাই শুধু শান্তিব্রত।
—সে শান্তি জগতজনে দীনতমে দিবে বিলাইয়া
কি বৃহৎ করুণায় পরিপ্লুত ওই শত হিয়া।
—অনাথপিণ্ড হেথা, হোথায় আনন্দ মহাপ্রাণ—
চৌদিকে কতই ধ্যান, স্তিমিতনয়ন—
বৈশালীর বেনুবন বিহারে বোধিসত্ত্বেরে ঘিরে
বসে আছে স্তব্ধ হয়ে—গরজিছে ঝটিকা বাহিরে।'

ক্রমশঃ অশুভ মন্ত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। অম্বিকার মন্ত্রের প্রভাবে আনন্দের মনে বিকার জাগিল। বিকারের ঘোরে তিনি সঙ্ঘসভা ত্যাগ করিলেন।

—শেষে সংঘসভা ছাড়ি
কোথায় আনন্দ চলে সেই অন্ধ ঝটিকাবিদারি।
হাহা করি চারিদিকে লোটায়ে পড়িছে বেণুবন—

বিশ্ব দাবাইয়া নভ বার বার করে গরজন—
আপনার সঙ্গে যুঝি তেমনি ঝটিকা বুকে ধরি
আনন্দ, প্রান্তর পথ চলিছেন অতিক্রম করি।

মূলে বশীকরণমন্ত্রের প্রভাবে আনন্দ আসিয়াছেন—তিনি ব্যসনপ্রাপ্ত, তাঁহার সর্বাঙ্গে পরাজয়ের গ্লানি, নয়নে বিষাদ অশ্রু।[১] তাঁহার পরাভবের মুহূর্তে আছে চরম লজ্জা ও দুর্বলতা। কিন্তু কবিতায় তপোভঙ্গে আনন্দ রুদ্র-মূর্তিতে দেখা দিয়াছেন—

—অকস্মাৎ মুক্তদ্বারে দীর্ঘমূর্তি দাঁড়াইল আসি—
ভ্রূকুটি ভীষণ মুখে 'কি করিলি'; গর্জিলা সন্ন্যাসী।

তাঁহার ভয়ঙ্করমূর্তিতে আবির্ভাবে, এবং বজ্রকণ্ঠের হুঙ্কারে বাসনাবহ্নি এক মুহূর্তে নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। অম্বিকার এই ভোগের সাধনার ব্যর্থতা সে উপলব্ধি করিয়াছে। গভীর অনুশোচনায় বলিয়া উঠিয়াছে—

হায়, আমি কি করিনু, কি করিনু এযে বহ্নিশিখা।
এরে আমি মোর হীন অন্তরের কালিমাখা মেঘে
ঢাকিয়া ফেলেছি কিরে ;···
হায়! হায়! কি করিনু। কি করিনু। জগতের মণি
কোন্ মহাব্রতজনে পথচ্যুত করিলাম আমি।'

অম্বিকার এই গভীর অনুশোচনার মর্মদাহী জ্বালা প্রকৃতির অন্তরে জাগ্রত হয় নাই। অবদানে সম্বুদ্ধ-মন্ত্রের প্রভাবে আনন্দ চণ্ডালী-মন্ত্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া বিহারে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি তাঁহাকে ছাড়ে নাই। আনন্দ পিণ্ডার্থে যে যে বাড়ীতে গমন করিয়াছেন প্রকৃতিও তাঁহার পিছন পিছন সেই সেই বাড়ীতে গমন করিয়াছে। অতঃপর আনন্দকে অনুসরণ করিয়া সে-ও শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডারামে প্রবেশ করিয়াছে এবং বুদ্ধের নিকট তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে—'স্বামিনং ভদন্ত আনন্দমিচ্ছামি।' অবশেষে বুদ্ধদেব কৌশলে তাহাকে ভিক্ষুণীর গৈরিক বস্ত্র পরাইয়া দিয়াছেন। 'চণ্ডালী' কবিতায় অনুরূপ কোন বুদ্ধিকৌশল বা চাতুর্যের প্রয়োজন হয় নাই। অনুশোচনার মর্মদাহী জ্বালায় আত্মপ্রস্তুতির সাধনায় সিদ্ধিলাভ

১। দ্রষ্টব্য: একান্তস্থিতঃ স পুনরায়ুষ্মানানন্দঃ প্রারোদীৎ। অশ্রুণি প্রবর্তয়মান এবমহ—ব্যসনপ্রাপ্তোহহমস্মি। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৫।

করিয়া অম্বিকা নিজেই হয় ত একদিন ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগদান করিবে। তাহার উক্তিতে সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অশ্রুসজল কণ্ঠে সে জানাইয়াছে—

'আজ ফিরে যাও যতি যাব আমি তব পদতল।
ফুল ফুটাইব আমি এ হৃদয়ে বিজন সাধনে—
এ হৃদয়-পুষ্প লয়ে সেইদিন যাব আরাধনে।'

বৌদ্ধধর্মের প্রতি ও ভগবান বুদ্ধের প্রতি চণ্ডালী কবিতার লেখক সতীশচন্দ্র রায়ের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দির দেখিয়া তিনি কতখানি মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহার সুন্দর বর্ণনা আছে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁহার একটি পত্রে।[১] তিনি লিখিয়াছেন—'এই ভারতবর্ষের একটি ছায়াঢাকা গ্রামের মধ্যে একটি করুণার উৎস আছে—কক্ষে কলস লইয়া সমস্ত এশিয়া-সুন্দরী সেখানে তৃষ্ণা মিটাইতে আসিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে সোনার পাতে ঢাকা বুদ্ধমূর্তি দেখিয়া হৃদয় এমন ভাবে নড়িয়া উঠিল যে, তেমন হৃৎকম্প আমি পূর্বে কখনো অনুভব করি নাই।' এই মন্দির দেখিয়া বৌদ্ধধর্মের করুণার আলোড়ন তিনি প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। অপরিণত বয়সে কালগ্রাসে পতিত না হইলে নিঃসন্দেহে তাঁহার নিকট বুদ্ধ ও বৌদ্ধ বিষয়ক আরো বহু রচনা আমরা লাভ করিতাম।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেবের মহান্ ঐতিহ্য কবি করুণানিধানের ভক্তিপ্লুতচিত্তে এক গভীর প্রেরণা ও ভাবব্যঞ্জনা জাগ্রত করিয়াছে। সহজ সুললিত ভাষায় শান্ত সংযতচিত্তে তিনি তাঁহার অন্তকরণের সেই নির্মল বিশুদ্ধ ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সম্রাট্ অশোক, অশোকপুত্র কুনাল, এবং কুনালের বিমাতা তিস্যরক্ষিতা ও পত্নী কাঞ্চনমালিকা তাঁহার 'কুনালকাঞ্চন'[২] কবিতায় স্থান পাইয়াছেন। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার 'কুনালাবদানম্' (৩য় খণ্ড) এবং দিব্যাবদানের 'কুনালাবদানম্'-এর কাহিনী হইতে কবিতার বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হইয়াছে। অশোকপত্নী বিমাতা তিস্যরক্ষিতা কুণালের কুণালপক্ষীর ন্যায় অপরূপ আঁখির সৌন্দর্যে বিমুগ্ধা। কিন্তু ধর্মবিবর্ধন কুণাল তাহাকে প্রত্যাখ্যান

১। বঙ্গদর্শন, ১৩১০, পৃঃ ৫৯৫, 'পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়' প্রবন্ধ।
২। শতনরী, ১৩৩৭ পৃঃ ১৪৮।

করিয়াছে, ব্যর্থ প্রণয়িনী হিংসার বিষনাগিনীতে রূপান্তরিতা হইয়াছে। তাহার প্রতিজ্ঞা—

অভিকামামভিগতাং যত্ত্বং নেচ্ছসি মামিহ।
নচিরাদেব দুর্বুদ্ধে সর্বথা ন ভবিষ্যসি।[১]

কবির লেখনীতে এই লাবণ্যমুগ্ধার প্রতিজ্ঞা আরো সুস্পষ্ট ও কঠিন-কঠোর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে—

'উপাড়ি' তুলিব বজ্রনখরে কুনালের আঁখিতারা

... ...

পাগল করেছে যে পরশমণি
হরিব গো তার আলোর অবনী—
উথলে চক্ষে, কপোলে, বক্ষে, উন্মাদ চপলতা ;'

বৎসরান্তে দৃষ্টিহারা পুত্র পিতার প্রাসাদ তোরণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে. সঙ্গে অন্ধের পথের সাথী পত্নী কাঞ্চনমালিকা। দিব্যাবদানে শোকসন্তপ্ত পিতা সাধুবেশী পুত্রকে বলিলেন—

কথয় কথয় সাধু পুত্র তাবদ্বদনমিদং তব চারুনেত্রম্।
গগনমিব বিপন্নচন্দ্র তারংব্যপগতশোভমনীক্ষকং কৃতং তে ॥[২]

এই একই সুর কবির লেখনীতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—

ওরে প্রভাতের খসা তারা মোর কথা কও আঁখি তুলি,
মণি নির্মল সোনার অঙ্গে কেন গৈরিক ধূলি ;
পুত্র কহিল—পিতার আদেশে
নয়ন হারায়ে ফিরিয়াছি দেশে
দাও পদধূলি।'

দিব্যাবদানে সহসা আত্মগ্লানিদগ্ধা তিস্যরক্ষিতা আবির্ভূতা হইয়া আপন পাপের স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। তুষানলে রাজা তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। কিন্তু কুণালের আঁখিতে দৃষ্টি ফিরিবে কিসে? দিব্যাবদানে কুণাল তাহার বিমাতার প্রতি বিদ্বেষরহিত প্রসন্নভাব রক্ষা করিয়া সত্যক্রিয়াবলে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। আর কবিতায় একদা এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

১। দিব্যাবদানাম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬২।
২। ঐ, পৃঃ ২৬৯।

বলিলেন—মহারাজ, করুণাভিক্ষার জন্য এক মহাসভার আয়োজন করা হউক। সেই সভায় তথাগতের গৌরব গীত গান করা হইবে। আর—

সেই তথাগত গৌরব গীতে
গলিবে নয়ন ভক্তি-সরিতে
অন্তর তলে কর নির্মাণ প্রেমের বুদ্ধগয়া।
সঞ্চিত কর কাঞ্চন-ঘটে সাধুর অশ্রুকণা
ঝরিবে যখন দিব্য জীবনে তন্ময় উপাসনা—
ঢালি দিও সেই পুণ্য সলিল
পুত্রের আঁখি হবে অনাবিল।
নিরঞ্জনের ধ্যান অঞ্জনে হও গো ধন্য-মনা।

সেই ভক্তি মহোৎসবে, করুণার অশ্রুধারায় ধৌতচক্ষু কুণাল আবার চক্ষু-তারকা ফিরিয়া পাইলেন।

করুণানিধানের আর একটি পরম সৃষ্টি তাঁহার 'জীবনভিক্ষা'[১] কবিতা। থেরীগাথার টীকাকার ধম্মপালের 'পরমত্থদীপনীতে'[২] কিসা গোতমীর এই কাহিনী পাওয়া যায়। শ্রাবস্তীর কোন দরিদ্র শ্রেষ্ঠীকুলে কিসা গোতমীর জন্ম। এক ধনী পরিবারে সে বধূ হইয়া আসে কিন্তু সে পরিবারে তাহার যথাযোগ্য সম্মান ছিল না। অবশেষে তাহার এক পুত্রসন্তান জন্মে এবং সংসারে তাহার সম্মানও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বালকটি হাঁটিতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু তাহাকে মায়ের কোল হইতে কাড়িয়া লইল। শোকে মুহ্যমানা জননী পুত্রটিকে বক্ষে চাপিয়া ঔষধের জন্য পথে বাহির হইয়া পড়িল। পথে কত লোক তাহাকে কত উপহাস করিল, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। এক পণ্ডিতপুরুষ তাহার এই চিত্তবিক্ষেপ দেখিয়া তাহাকে বলিলেন—

—পুত্তস্স মে ভেসজ্জং দেথ ভগবা।

১। শতদলী, ১৩৩৭, পৃঃ ১৮২।

২। Muller, Paramatthadīpani, P. T. S., 1898, pp 174—75

কিসা গোতমীর 'লুখচীবধরাণং'-এর জন্য তিনি নারীশিষ্যাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। থেরী গাথায় তাঁহার রচিত গাথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই গাথায় তিনি নিজের জীবনের দুঃখকে বাণীরূপ প্রদান করেন নাই, দিয়াছেন পটাচারার কাহিনীকে। অপদানে, ধম্মপদ অট্ঠকথায় ও সংযুক্ত নিকায়-এর টীকা 'সারত্থপ্পকাসিনী'তে কিসা গোতমীর কাহিনী পাওয়া যায়।

জীবনভিক্ষা কবিতায়ও বুদ্ধের চরণে অবলুণ্ঠিতা কিসা গোতমীর কণ্ঠে মাতৃ-হৃদয়ের আকুতি ধ্বনিত হইয়াছে—

কুমারে আমার কর প্রাণদান—

ব্যথাহত মায়ের প্রাণের আবেদনে বুদ্ধদেবের ধ্যানবিজড়িত প্রশান্ত আঁখির সৌম্যসুন্দর বরাভয় দৃষ্টি মৃতশিশুর উপর পতিত হইল—

কহেন বুদ্ধ কুমার তোমার
নীরব সমাধিমগ্ন
বরণ করেছে চিরসুন্দর
মরণের মহালগ্ন।

কিন্তু শোকাতুরা উন্মাদিনী জননী কি মৃত্যুর চিরন্তন রীতি আজ উপলব্ধি করিতে পারিবেন? লোকগুরু বলিলেন—

'গচ্ছ নগরং পবিসিত্বা যস্মিং গেহে কোচি মতপুব্বো নত্থি ততো সিদ্ধাত্থকং আহরা।'

কবি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন—

থাকে যদি কোথা অশোক আলয়
ভিখ্ মাগি আন সর্ষপ-চয়
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে
পরাণ-মৃণাল ভগ্ন।

একটি মাত্র সর্ষপ এমন আর কি বস্তু। কিসা গোতমী পথে বাহির হইলেন। কিন্তু তেমন গৃহ একটিও মিলিল না মৃত্যু যেখানে প্রবেশ করে নাই। এবার সে উপলব্ধি করিল—

ন গামধম্মো ন নিগমস্স ধম্মো ন চাপি অয়ং এককুলস্সধম্মো।
সব্বলোকস্স সদেবকস্স এস এব ধম্মো যদ ইদং অনিচ্চতা তি॥'

এই পরম উপলব্ধি লাভ করিয়া সে ফিরিয়া আসিল—

নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে
—শিখাইলে শেষ শিক্ষা
জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার,
ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার—
হর জগতের বিরহ আঁধার
দাও গো অমৃতদীক্ষা।'

'অমিতাভ,'[১] কবির বুদ্ধ-প্রশস্তিমূলক কবিতা। বুদ্ধদেব যজ্ঞে পশুবলি নিরোধ করিয়াছিলেন। এক সামান্যতম ছাগশিশুর প্রাণের জন্য তিনি নিজ প্রাণ বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মাতাপিতার স্নেহ, প্রেয়সীর বাহুডোর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। তাঁহার সাধনা—সে-ও এক দুঃসাধ্য সাধনব্রত। পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়[২] ছয় বৎসরের কঠিন কৃচ্ছ্রতায় তাঁহার দেহ কঙ্কালসার, চলৎশক্তিহীন এবং দেহের বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল মৃত্যু বুঝি সন্নিকট। এই সময় তিনি উপলব্ধি করিলেন—

অয়ং দুক্কর-কারিকা নামা বোধায় মগ্‌গো ন হোতী তি।[৩]

এবার তিনি যে পথ গ্রহণ করিলেন তাহা একদিকে কঠিন কৃচ্ছ্রতা অপর দিকে চরম ভোগ দুই-এর মধ্যবর্তী—'মজ্ঝিমপটিপদা'। তিনি সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করিলেন।

জীবনের মরুরৌদ্র জুড়ালে ত্রিতাপ-হরা সে চন্দ্রিকায়
বিশ্ববোধনী আনন্দ বাণী মুক্ত অশোক পূর্ণিমায়।

এইবার তপস্যায় বসিয়া শাক্যসিংহ সিদ্ধার্থ 'বুদ্ধ' হইলেন। নির্বাণকে লাভ করিয়া তিনি 'বিধাতৃজিৎ' হইলেন। নির্বাণতন্ত্রের এই মহাঋষির নিকট কবিকণ্ঠের প্রার্থনা উদ্গীত হইয়াছে—

দুঃখ কখন অ-দুঃখ হয়, দ্বিধা চঞ্চল কাঁপে না প্রাণ,
নিবাত-প্রদীপসম যেন হই, কর ভিক্ষুরে বর প্রদান।
বাসনার বীজে জ্রূণরূপে আর কে চাহে হইতে পুনর্জাত
কোথা জ্বালামুখী শিখা নির্বাণ? দাও জয়ধ্বজা হে মহাতাত।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি কবির নম্র-শ্রদ্ধা প্রাণের আবেগ সংরাগে অনুরঞ্জিত হইয়া তাঁহার বৌদ্ধ বিষয়ক কবিতাসমূহকে একটি স্বতন্ত্র মহিমা দান করিয়াছে। তাঁহার 'জীবনভিক্ষা' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে করুণ আত্ম-নিবেদনের মহিমায় উজ্জ্বল এক অভিনব অবিস্মরণীয় সংযোজন।

১। শতনরী, ১৩৩৭, পৃঃ ২১৩।
২। **Fausboll, Jātaka, Vol. I, p 67.**
৩। ঐ, পৃঃ ৬৭।

মোহিতলাল মজুমদার

মোহিতলাল নির্বাণকামী সাধক নহেন, তিনি আশানিরাশা, পুলকবেদনা, আনন্দবিস্ময়মুখরিত পৃথিবীর মানব-প্রেমিক কবি ও সমালোচক দুই-ই। 'বুদ্ধ'[১] কবিতা তাঁহার সেই কবি-সমালোচক মনের পরিচয় বহন করিতেছে। কামনা বাসনারূপ ভবরোগের নিদান দান করিয়া বুদ্ধদেব বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভিষক।[২] জরাব্যাধিমৃত্যুর হাত হইতে চিরপরিত্রাণের ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তিনি বিশ্বের ব্যথাহত মহাদুঃখপীড়িত মানুষকে পরমনির্বাণের পথ দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধ শিল্পীর মহৎ সাধনায় বুদ্ধের যে শিলা ধাতুময় মূর্তি রূপ পাইয়াছে তাহাতে ধ্যানী বুদ্ধের চিত্তের সেই মার জয়ের আনন্দশিখা তাঁহার অন্তর ছাড়াইয়া মুখমণ্ডলেও প্রতিভাত হইয়াছে। শিল্পীর বুদ্ধ প্রতিমার অর্ধ নিমীলিত নয়নের দৃষ্টি অবনত আঁখি পল্লবে নিবদ্ধ। দেহ ঋজু, স্কন্ধ, গ্রীবা, আসনভঙ্গী—অনিন্দ্যসুন্দর অলৌকিক কিন্তু বোধিবৃক্ষমূলে 'ধ্যানী বুদ্ধ' বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি এক কঠিন বিদ্রোহ—জগতের সুখদুঃখ, হাসিঅশ্রু, আনন্দবেদনা যেন থামিয়া গিয়াছে। চিরচঞ্চল প্রকৃতির গতি রুদ্ধ, মহাকাশ স্তব্ধ। অবশেষে অটল-সঙ্কল্প পুরুষ সিদ্ধকাম, জরামৃত্যুঞ্জয়ী হইলেন। ইহাই পরমনির্বাণ। এই নির্বাণমন্ত্র প্রথম উচ্চারিত হইল সারনাথে—

তারপর আর্ত নরনারী—
সকল আশার শেষ, মমতার সুচির নির্বাণ
তৃষ্ণা, রতি, অরতির পন্থা অনুত্তম
লভিতে আসিল ধেয়ে—।

পাঁচশত বৎসর নির্বাণধর্মের প্রচার যুগ চলিল। সেদিন বিশ্বের মহাভিক্ষুর চরণতলে ত্রৈলোক্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পদের অধিকারীরাও অর্ঘ্যের ডালি সাজাইয়া আনিলেন—শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের জেতবনে, নৃপতি বিম্বিসারের বেণুবনে এবং নর্তকীশ্রেষ্ঠা অম্বপালীর আম্রকুঞ্জে সঙ্ঘারামের সৌধমালা নির্মিত হইল। আরো পরে সম্রাট অশোক বুদ্ধ শরণে অশীতিসহস্র স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অরণ্যে,

১। স্মরগরল, ১৩৪৩, পৃঃ ৭১।

২। পালি সাহিত্যে আছে গৌতম এক জন্মে হস্তে ঔষধপাত্র লইয়া আবির্ভূত হইলেন। জননী প্রশ্ন করিলেন 'তাত, কিং গহেত্বা আগতোসীতি।' শিশু উত্তর করিল—'ওসধং অম্মা।' শিশুর নামকরণ হইল—'ওসধদারকো'। (দ্রষ্টব্য—Fausboll, Jātaka, Vol. I, p. 58)

পর্বতগুহায়, স্তম্ভে মানবহিতের বাণী উৎকীর্ণ হইল, তাঁহার প্রচেষ্টায় ভারতের গৌতম হইলেন—বিশ্বের গৌতম। তার পরের সহস্র বৎসর বৌদ্ধধর্মের চরম অবক্ষয়ের যুগ। বৌদ্ধধর্ম ইন্দ্রিয় অবদমনের পথে ভিক্ষুধর্মকেই বরণীয় করিয়া লইয়াছিল। জগৎকে বিশ্বপ্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়াছিল। অবশেষে পাঁচশত বৎসরের বুভুক্ষিত রুদ্ধ প্রকৃতি হাজার বৎসরের স্বেচ্ছাতন্ত্রে তাহার চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে। ইন্দ্রিয়সেবা ও যৌনভোগাসক্তির সে কি সর্ব-গ্রাসী রাক্ষসীরূপ—

মানুষ দেবতা হয়ে আরম্ভিল পিশাচের ব্রত।
মন্দিরে, মঠের ভিতে, তোরণের স্তম্ভ-পীটিকায়
উন্মাদ মিথুন-মূর্তি—যতী পূজে রতির চরণ।

ইহার সর্বশেষ চরম পরিণতি—

'কামযজ্ঞে দেহ সঁপি হল তার হবিঃশেষ পান।'

এই পরম অবক্ষয়ের নিরন্ধ্র অন্ধকার রাজ্য হইতে বৌদ্ধধর্ম চিরবিদায় লইল—

তারপর ভারত শ্মশান।

একদা প্রাসাদচূড়া হইতে রাজকুমারের অনিন্দ্যরূপ দর্শন করিয়া ক্ষত্রিয়কন্যা কিসা গোতমীর কণ্ঠে প্রশংসাগীতি উচ্চারিত হইয়াছিল—

নিব্বুতা নূন সা মাতা
নিব্বুত নূন সো পিতা
নিব্বুতা নূন সা নারি
যস্সায়ং ঈদিসো পতীতি।[১]

কবির লেখনিমুখে কিসা গোতমীর সেই প্রাণের আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে—

হেন পুত্র যার ঘরে, কি বা তার সুখ নাহি জানি
কত সুখী তার প্রিয়া।'

কিসা গোতমীর 'নিব্বুত' বাণী সিদ্ধার্থের মনে এক চরম প্রশ্নরূপে দেখা দিল—'কস্মিং নু খো নিব্বুতে হৃদয়ং নিব্বুতং নাম হোতীতি' এই মহাজিজ্ঞাসার উত্তরও পাইলেন—যিনি রাগরহিত, দ্বেষরহিত, মোহ রহিত তাঁহারই হৃদয় জুড়াইয়া গিয়াছে—'সেই সুখী যে জন উদাস'। রাজকুমার সিদ্ধান্ত করিলেন—

১। **Fausboll, Jātaka, Vol, I, p. 60.**

'অহং হি নিব্বাণং গবেসন্তো চরামি।' নিজকণ্ঠের মুক্তামালা তিনি কিসা গোতমীকে গুরুদক্ষিণা প্রেরণ করিলেন। রমণী ভাবিল—'সিদ্ধাত্থকুমারো মম্মি পটিবদ্ধচিত্তো হুত্বা পণ্ণাকারং পেসেসীতি'। উচ্ছ্বসিত আনন্দে—

নারী তায় পরি গলে, সারারাত আধেক স্বপনে
জাগিল বাসর একা—রাজপুত্র বাসিয়াছে ভালো।

কিন্তু রাজপুত্র সেইদিনই নির্বাণ কামনায় সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন। পিছনে পড়িয়া রহিল পতিগতপ্রাণা পত্নী গোপা, শিশুপুত্র রাহুল আর একান্ত স্নেহপরায়ণ মাতাপিতা। সিদ্ধার্থের কঠোর কঠিন পণ—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎকায়মতশ্চলিষ্যতে ॥[১]

অবশেষে নির্বাণ সাধনায় সিদ্ধকাম বুদ্ধ—

কর্মবন্ধ, ভব-ভয় ভেদ করি প্রাণান্ত প্রয়াসে
দাঁড়াইলে বোধিমূলে, দূরে ফেলি কামনা নির্মোক।

এখন তিনি জরাব্যাধিমৃত্যুর নিদানদাতা ভিষকশ্রেষ্ঠ। এই ভিষকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের নিকট আধুনিক যুগের কবি প্রশ্ন করিয়াছেন—

'মার' কি মেনেছে বশ ? ঘুচিয়াছে ধরিত্রীর ব্যথা
তোমার সে আত্মজয়ে ফুরায়াছে মৃত্যুর সম্বল
ফোটে না কি রাধাপদ্ম কৃষ্ণ অশ্রুসায়রের মাঝ

কবির প্রশ্ন—আজ বৌদ্ধধর্ম কোন চরম পরিণতিকে স্বীকৃতি জানাইয়াছে ? ঋষিপতনের সেই ধর্মচক্র আবর্তন রহিত, নির্বাণ ধর্ম অবলুপ্ত, শত শত স্তূপ চৈত্য বিহার যুগান্তের করাল গ্রাসে বিনষ্ট। আছে কেবল জগজ্জনের হৃদয়লোকে জগজ্জ্যোতি বুদ্ধের অলোকসামান্য অমিতাভ রূপ, আর আছে মৈত্রী-অহিংসা-নীতির ক্ষীণ মর্ম। বোধিদ্রুমতলে বিশ্বের সর্বলোকের হাতে তিনি মৃত্যুজয়ের মহৌষধি তুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু—

রুদ্ধ করি আঁখিজল, ম্লান করি অধরের হাসি।
প্রাণ হত্যা করিবারে কেবা তোমা দিল অধিকার ?

এ যে জীবনবিরোধী আত্মহত্যার মন্ত্র !

তার চেয়ে ক্রূর সে কি—তৈমুরের লক্ষ জাবনাশ ?

১। ললিতবিস্তর, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ২১০।

কালের চক্র কিন্তু চির আবর্তনশীল। সে আবর্তন পথে বুদ্ধের জন্মমৃত্যু নিরোধের নীতি কালগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির জন্মমৃত্যু লীলা চির অব্যাহত আছে। জগতে মৃত্যু আছে, দুঃখ আছে, তবুও জীবনের জয়গাথা এখনও ব্যঞ্জনাময়। সংসারের আদি অন্তে দুঃখকষ্ট, বাধাবিঘ্ন আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আছে মাধুর্য, আছে দুঃখ বিস্মরণী সঞ্জীবনী সুধা। কবির নিকট প্রেমই সেই অমৃতবল্লরী, বিষঘ্ন ঔষধি। বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যানীবুদ্ধ নির্বাণের প্রতীক, কিন্তু পায়সান্ন হস্তে সুজাতা যে প্রেমের প্রতীক। কবির আকাঙ্ক্ষা—

বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ ধ্যানে বসি রবে না সদাই
সুজাতা আনিবে অন্ন, পূর্ণা-তিথি উঠিবে উজলি—
'মার' দিবে হাসিমুখে হাতে তুলি বাঁশীখানি তাঁর।

কবির নির্মাল্য অর্পিত হইয়াছে শ্রীবুদ্ধের চরণে কিন্তু প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে কল্যাণী ধরাবধূর উদ্দেশে। একটি কবিতার ক্ষুদ্র কলেবরে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেবের মহত্ত্ব, তাঁহার গৃহত্যাগ, নির্বাণের বৈশিষ্ট্য, বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও চরম অবনতির বর্ণনা করিয়াছেন এবং জীবনবিরোধী বৌদ্ধ নির্বাণের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ভাবাবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মকে তিনি বিচার করেন নাই, বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাটক

বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ সাধকদের সাধনসঙ্গীত চর্যাপদে প্রথম তৎকালীন বাঙালীর নাট্যাভিনয়ের সঙ্কেত পাওয়া গিয়াছে। চর্যাকার বীণাপাদ বলিতেছেন—বুদ্ধ নাটক অভিনীত হইতেছে। বজ্রগুরু ও দেবী দুইজনে মিলিত হইয়া বুদ্ধদেবের জীবন নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে অভিনয় করিতেছেন। সিদ্ধাচার্য সূর্যকে লাউ করিয়াছেন, চন্দ্রকে তন্ত্রী করিয়াছেন। লাউ ও তন্ত্রীর সমন্বয়ে একটি সুন্দর বীণাযন্ত্র রূপায়িত হইয়াছে। এই বীণাযন্ত্র বাজাইয়া বজ্রগুরু নাচিতেছেন, এবং দেবী গাহিতেছেন।[১] সে যুগের সিদ্ধাচার্যদের সাধনসঙ্গিনী ডোম রমণীগণ সমাজে অস্পৃশ্যা হইলেও নৃত্য ও সঙ্গীতকলায় পটিয়সী ছিলেন। চর্যাপদে আছে অস্পৃশ্যা ডোম রমণী একটি চৌষটি দলযুক্ত পদ্মের উপর অতি লঘু পদক্ষেপে নৃত্য করিতেছেন।[২] আবার ডোম্বীর আসঙ্গ লিপ্সায় বিভোর হইয়া নটশিরোমণি সিদ্ধাচার্য কখনও কখনও তাহার নটপেটিকা ছাড়িয়াও গিয়াছেন।[৩] এই নটপেটিকায় নটনটীদের নাট্যাভিনয়ের পোশাক পরিচ্ছদ ও সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি রাখা হইত। প্রাচীন বাঙলায় সুসজ্জিত রথে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, তারা প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধ দেবদেবীদের স্থাপিত করিয়া রাজপথে শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়া হইত। হিন্দু-বৌদ্ধ-নির্বিশেষে অগণিত নরনারী এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিত। নৃত্যগীত এবং দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক যাত্রা, অভিনয় ও ক্রীড়াকৌতুকাদিও অনুষ্ঠিত হইত।[৪] পণ্ডিতগণের মতে এই বৌদ্ধ রথযাত্রাই পরবর্তীযুগে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধ দেবদেবীর সম্মুখে যাত্রা ও

নাট্যাভিনয়ের প্রাচীনতম পটভূমি

১। নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥ —চর্যাপদ সং ১৭।

২। এক সো পাদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥ —চর্যাপদ সং ১০।

৩। তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া। ঐ

৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বেনের মেয়ে উপন্যাসে খৃঃ দশম শতাব্দীর প্রতিবেশে লুই সিদ্ধার নেতৃত্বে অনুরূপ একটি শোভাযাত্রার বর্ণনা দিয়াছেন।

নাট্যাভিনয় প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সিদ্ধাচার্য ও তাঁহাদের সাধন-সঙ্গিনীগণকেও নটনটীরূপে গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই।

বর্তমান পরিচ্ছেদে বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশে এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের আখ্যান অবলম্বনে যে সমস্ত নাটক বাংলা সাহিত্যে লিখিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা হইল।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গোপালচন্দ্রের প্রণীত 'যৌবনে যোগিনী' ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য। এই নাটকে শঙ্করাচার্য নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য অবনমিত বৌদ্ধধর্মের বিপথগামী আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। শঠতা, চাতুরী, দেশদ্রোহিতা ও ভিক্ষুজীবনের আদর্শবিরোধী বহু কাজের জন্য নাটকে সে নিন্দনীয় হইয়াছে। পৃথ্বীরাজের প্রতি শত্রুতা করিবার ইচ্ছায় সে যবনসম্রাট্ মহম্মদ ঘোরীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। শঠতার সাহায্য লইয়া গুজরাটকন্যা মায়াবতীকে হরণ করিয়া যবন সম্রাটের নিকট অর্পণ করিয়াছে। ভিক্ষু হইয়াও শঙ্করাচার্য দিল্লীর রাজসিংহাসনের প্রার্থী হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য ভারতের জাতীয় বিচ্ছেদে সাহায্য করিয়া ভগবান বুদ্ধের 'পরম ধর্ম' সমগ্র ভারতে পুনঃ প্রচার করা। সে বলিয়াছে—'আমি বৌদ্ধ। পরের অনিষ্ট করা আমার ইচ্ছা নয়, এবং আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধ'।[১] কিন্তু তাহারই প্রতারণায় বিভ্রান্ত পৃথ্বীরাজ মায়াবতীকে ভ্রষ্টাচারিণী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। সে পৃথ্বীরাজের পরম শত্রু, কিন্তু তাহার চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য একসময় রাজগিরির রাজা ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারের জন্য প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার ও উপদ্রব করায় পৃথ্বীরাজের মাতুল জীবনসিংহ তাহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। 'এখন সে বৌদ্ধ আচার্য—ব্যাভার আচার্যের মত, ইচ্ছা রাজার মত।'[২] অবশেষে মায়াবতীর বুদ্ধি কৌশলে মহম্মদ ঘোরীর অসির আঘাতে তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের যুগে ভিক্ষুদের মধ্যে যে আদর্শভ্রষ্টতা দেখা গিয়াছিল নাট্যকার শঙ্করাচার্যের চরিত্রে তাহাই আরোপ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের কল্যাণকর ও মহত্তম কোন আদর্শ তাহার চরিত্রে প্রস্ফুটিত হয় নাই।

১। যৌবনে যোগিনী, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১২৯০, পৃঃ ৬৮।

২। ঐ, পৃঃ ৭৫।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

Arnold-এর 'Light of Asia' নামক কাব্যগ্রন্থ অনুসরণে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটক রচনা করিয়াছেন বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। Arnold-এর 'Light of Asia' বিশ্বের বহু প্রশংসিত কাব্য। ভগবান বুদ্ধদেবের চরিত্র, জীবন ও ধর্মনীতির রূপদান করিয়া এই গ্রন্থ বিশ্বের পাঠক-চিত্ত জয় করিয়াছে। এই গ্রন্থের ভাব ও কাহিনীর ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়া গিরিশ ঘোষের 'বুদ্ধদেব চরিত'ও বাংলা সাহিত্যে এক অনন্যতুল্য জীবন-নাট্যের স্থান অধিকার করিয়াছে।

কাব্যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—Thus came he to be born again for men.[১] নাটকের সূচনায় গোলকধামে বিষ্ণু ও দয়ার কথোপ-কথনে জানা যায় মানুষের উপর মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও জীবহিংসা অপনোদনের জন্য বসুমতী বক্ষে দয়ারূপী বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিবে। বিষ্ণুর কণ্ঠে বুদ্ধ অবতারের উদ্দেশ্যও ঘোষিত হইয়াছে—

বিদ্যাদর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ,
অস্ত্রবলে না হবে শাসন,
সে দর্প দমিব বিদ্যাবলে।......
'অহিংসা পরম ধর্ম' করিব ঘোষণা।
যুক্তিবলে বিমুখী সকলে
জ্ঞান জ্যোতি করিব বিকাশ
অজ্ঞানতা তম হবে নাশ,
যাগযজ্ঞ হবে নিবারণ,
দেবার্চনে প্রাণীর হনন,
নাহি হবে ধরা মাঝে
আত্মোন্নতি করিবে সাধন
নরগণ করিবে যতন
কর্মে কর্মনাশ আসে।
নির্বাণ প্রয়াসে
রিপুগণে করিয়ে দমন
সদাচারী হইবে মানব।[২]

১। Light of Asia, 1921, p. 1।

২। গিরিশ গ্রন্থাবলী, বসুমতী, বুদ্ধদেব চরিত, ১৩১২, পৃঃ ১২২।

ব্রাহ্মণ্য দর্প বিদূরণ, দয়াধর্ম প্রচার এবং নির্বাণ শিক্ষা দিবার জন্য বুদ্ধদেব চরিত নাটকে নরের মধ্যে নরোত্তমের আবির্ভাব।

কাব্যে ভগবান বুদ্ধের পটিসন্ধি গ্রহণের বর্ণনায় পাওয়া যায়, মায়াদেবী—

Dreamed a strange dream ; dreamed that a star from
heaven—
Splendid, six-rayed, in colour rosy-pearl,
Whereof the token was an Elephant
Six-tusked, and white as milk of Kamadhuk—
Shot through the void ; and shining into her,
Entered her womb upon the right.[১]

নাট্যকার মহামায়ার স্বপ্নবর্ণনায় লিখিয়াছেন—

হেনকালে নভস্থলে খসিল তারকা
বিমল কিরণে আমোদিত ত্রিভুবন।
হস্তীর আকার, ষড়দন্ত শোভিত সুন্দর
তারা মনোহর
পশিলা মহিষীগর্ভে
দশনে দক্ষিণ পাশ ভেদি।[২]

কাব্যে শুক্লকেশ ঋষি অসিত বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পর আনন্দের সংসারে একটি দুঃখের বার্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন—

Sweet Queen !
Dear to all gods and men for this great birth,
Henceforth art grown too sacred for more woe ;
And life is woe, therefore in seven days,
Painless thou shalt attain the close of pain.[৩]

নাটকে মহাভাগ কালদেবল ঋষির কণ্ঠে সেই নিয়তিলিপি ঘোষিত হইয়াছে—

বুদ্ধদেবে জঠরে যে ধরে
সপ্তসর্গ পরে আবাস নির্মাণ তার
নিয়োজিত দক্ষ দেবগণ সেবা হেতু,
হেন ভাগ্যবতী ধরায় না রহে মহারাজ।[৪]

১, ৩। Light of Asia, pp. 2 and 6।
২। বুদ্ধদেব চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩।
৪। বুদ্ধদেব চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭।

নাটকে নবজাত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই—

সপ্তপদ হল অগ্রসর,
কহিল গভীর স্বরে
হের দেব নাগ নরে
আমি বুদ্ধ—প্রণম্য সবার।[১]

জন্মগ্রহণের পর শিশুবুদ্ধের সপ্তপদ অগ্রসর হইবার ঘটনা Arnold-এ পাওয়া যায় না। এই ঘটনা বিস্তৃতভাবে ললিতবিস্তরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ললিত-বিস্তরে আছে—"অথ বোধিসত্ত্বো জাতমাত্রঃ পৃথিব্যামবতরতি স্ম।"[২] তিনি উত্তরদক্ষিণে, পূর্বপশ্চিমে, ঊর্ধ্ব অধেঃ সর্বদিকে সপ্তপদ অগ্রসর হইলেন। এবং সিংহনিনাদে ঘোষণা করিলেন—

'অহং লোকে জ্যেষ্ঠোহং লোকে শ্রেষ্ঠঃ।'[৩]

কাব্যে দেবতাদের সঙ্গীত এবং নাটকে দেববালার সঙ্গীত রাজকুমার সিদ্ধার্থের মোহ অপনোদন করিয়াছে। নাটকে পঞ্চানন জরা রুগ্ন মৃত ও ভিক্ষুর ছদ্মবেশে সিদ্ধার্থের নিকট প্রকৃত সত্যের আবরণ উন্মোচন করেন—ইহা নাট্যকারের নিজস্ব সংযোজন। পিতা শুদ্ধোদনের ব্যাকুল প্রচেষ্টা—অতুপ্রিয় প্রাসাদে আয়োজিত সহস্র বাসনার তরঙ্গ নাটকে অতি নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একদা মহাসত্যের সন্ধানে এই সুবর্ণ পিঞ্জরের সহস্র বন্ধনকে অগ্রাহ্য করিয়া সিদ্ধার্থ বাহির হইয়া আসিয়াছেন—

তাই যেতে চাই জীবের কারণে
সত্য-অন্বেষণে
যে সত্য মাহাত্ম্যে হবে পাপ বিমোচন।
ধরা হবে পুলক ভবন
অবিচ্ছিন্ন আনন্দ মগন রবে নর।
করিয়াছি পণ,
লভিব সে অমূল্য রতন..... [৪]

সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণের পূর্বাহ্নে মহারাজ শুদ্ধোদনের স্বপ্নদর্শন,—স্বপ্নে মহারাতে বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রের পতাকা, দশদিক হস্তী, রথোপরি আসীন গৌতম,

১। বুদ্ধদেব চরিত, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮।
২, ৩। ললিতবিস্তর, পি. এল বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ৬১-৬২, জন্ম পরিবর্তঃ।
৪। বুদ্ধদেব চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯।

ঘূর্ণ্যমান চক্র, গগনচুম্বী অট্টালিকা-চূড়ায় রত্ন বিতরণ রত রাজকুমার সিদ্ধার্থ এবং ক্রুদ্ধ বিষণ্ণ ছয়জন পুরুষকে তিনি দর্শন করেন। নাটকের এই স্বপ্নদর্শনের বর্ণনা 'Light of Asia'-কে অনুসরণ করিয়াছে।[১] কাব্যের nautch girl-এর সঙ্গীত (পৃঃ ৯৪) এবং নাটকের দেববালাগণের সঙ্গীতের (পৃঃ ১৪৫) কেবল বিষয়বস্তুই নয় ভাব ও ভাষাও প্রায় এক।

নিরঞ্জনা নদীতীরে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে সিদ্ধার্থ ছয় বৎসর ব্যর্থ সাধনা করিয়া সত্যের পথ নির্ণয়ে দ্বিধাহীন হইয়াছেন। নাটকেও সেই উপলব্ধি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে—

ভোগতৃষ্ণা বিষময় যথা,
সেইমত শরীর নিগ্রহ
উভয়ে না হয় সত্য লাভ
মধ্যপথ করিব গ্রহণ—
সেই ধর্ম সনাতন।[২]

কাব্যে সত্যার্থী গৌতম নৃপতি বিম্বিসারকে যজ্ঞে পশুবলি প্রদানের অযৌক্তিকতা বুঝাইয়াছেন।[৩] নাটকেও সিদ্ধার্থের হৃদয়ের সেই অপ্রমেয় করুণা আপন আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে—

প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
কাতর প্রাণের তরে মানব যেমতি।
মানবের প্রায়,
অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে কায়—
বেদনা জানাতে নারে।···
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান।[৪]

১। শুদ্ধোদনের স্বপ্নদর্শন, 'Light of Asia', pp. 41-42, বুদ্ধদেব চরিত নাটক পৃঃ ১৩৯-৪০।

২। বুদ্ধদেব চরিত, পৃঃ ১৪৫। ৩। 'Light of Asia,' pp. 85-87।

৪। বুদ্ধদেব চরিত, পৃঃ ১৪৮।

ললিতবিস্তরের অপ্রাপ্য পরমবোধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় সিদ্ধার্থের কঠোর-কঠিন প্রতিজ্ঞার[১] ক্ষীণ আভাস নাটকেও অভিব্যক্ত হইয়াছে—

কৱিব সমাধি, আর না জাগিব
যত দিন জ্ঞান নাহি হয় লাভ।[২]

মার ও মারবাহিনী জয় করিয়া দৃঢ়ব্রত সিদ্ধার্থ দেবদুর্লভ জরামৃত্যুর অতীত মহাসত্য লাভ করেন, ইহাই সম্বোধি। Light of Asia কাব্যে এবং বুদ্ধদেব চরিতে সিদ্ধার্থের হৃদ্‌পদ্মে সেই পরিপূর্ণ শতদলরূপী নির্বাণের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ পরম নিষ্ঠাসহকারে বর্ণিত হইয়াছে। নির্বাণের আলোকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন—

'পূর্বতন বোধিসত্ত্ব বংশোদ্ভব আমি,
নাহি মম নাম, নাহি জন্মভূমি,
গোত্র, জাতি, বর্ণ বা জীবন।
জ্ঞানালোক জ্ঞানালোক,
তিমির নাহিক আর।[৩]

এই মহান্ উপলব্ধির ক্ষেত্রেও নাট্যকার প্রাচীন বৌদ্ধভাবধারাকে অনুসরণ করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের সঙ্গে পিতা শুদ্ধোদনের আলাপ এবং সন্ন্যাসিনী গোপার সঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রথম সাক্ষাৎকার পালি নিদানকথার ঘটনার সঙ্গে কবিকল্পনার সংমিশ্রণে বিবৃত হইয়াছে।

গোপা পুত্র রাহুলকে বলিয়াছেন—'পস্স তাত এতং বীসতিসহস্সসমণ পরিবুতং সুবণ্ণবণ্ণং ব্রহ্মরূপিবণ্ণং সমণং, অয়ং তে পিতা, এতস্স মহন্তা নিধিয়ো অহেসুং, ত্য-আস্স নিক্‌খমনতো পট্‌ঠায় ন পস্সাম, গচ্ছ নং দায়জ্জং যাচ।'[৪]

'Light of Asia'-তে গোপা বুদ্ধদেবের নিকট রাহুলের পিতৃধন যাঞ্চা করিয়াছেন—

Give to Rahula—thou Blessed One!
The Treasure of the Kingdom of thy Word.
For his inheritance.[৫]

১। ললিতবিস্তর, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ২১০।
২। বুদ্ধদেব চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০।
৩। ঐ, পৃঃ ৫২
৪। Fausboll, Jātaka, Vol, I, p 91. ৫। Arnold, Light of Asia, p 156

'বুদ্ধদেব চরিতে'ও গোপা রাহুলকে তাহার পিতৃধন সংগ্রহে উদ্বোধিত করিয়াছেন—

ত্যজি মণিকাঞ্চন ভূষণ
পিতৃধন করহ গ্রহণ
এ রতন নাহি পায়
রাজ্য বিনিময়ে।[১]

কাব্য ও নাটকের কাহিনী বুদ্ধদেবের কপিলাবস্তু আগমনের পর সমাপ্ত হইয়াছে।

'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে নাট্যকার বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

জীবহিংসা করিতে বারণ
নিরঞ্জন করেছেন শরীর ধারণ।[২]

তিনিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জননীর স্তনপানে বঞ্চিত এবং ধাত্রীমাতার স্নেহধারায় বর্ধিত—

দেবী অংশে গৌতমী নামেতে রাণী
অতি ভাগ্যবতী
স্তনপান করাইল দুর্লভ নন্দনে,
বৃন্দাবনে যশোমতী যথা।[৩]

আবার সিদ্ধার্থের যিনি পত্নী হইয়াছিলেন তিনিও—

গোপা নামে লক্ষ্মী অংশে নারী।[৪]

বুদ্ধরূপী নারায়ণের প্রাণে সংসার বিরাগ আনয়নের জন্য স্বর্গের দেবতা পঞ্চাননের প্রয়োজন হইয়াছে—

পঞ্চানন আসিবেন আপনি ধরায়
ধরিবারে জরারুগ্ন মৃতভিক্ষু বেশ।[৫]

১। বুদ্ধদেব চরিত প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮।
২। ঐ, পৃঃ ১২৯।
৩। ঐ, পৃঃ ১২৯।
৪। ঐ, পৃঃ ৩০।
৫। ঐ, পৃঃ ১৩৫।

সুতরাং নাটকে বিষ্ণুরূপী বুদ্ধদেবের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত বিশেষ ঘটে নাই। ব্রাহ্মণগণ অতি সহজেই দয়ার অবতার শ্রীবুদ্ধের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নরপতি অশোকের জীবনকাহিনী অবলম্বনে যতগুলি নাটক বাংলা সাহিত্যে রচিত হইয়াছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'অশোক' নিঃসন্দেহে তাহার মধ্যে তুলনারহিত। পালি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে অশোক-জীবনের যে বৈচিত্র্যময় সমুজ্জ্বলতা অভিব্যক্ত হইয়াছে এই নাটকে লেখক তাহা এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। পালি-সংস্কৃত ইত্যাদি গ্রন্থে প্রাপ্ত অশোক-জীবনের প্রায় সমস্ত তথ্যকে নাট্যকার এই নাটকে প্রমূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অশোক ভ্রাতৃশোকে উন্মাদ, পাপের প্ররোচনায় শয়তানের সহচর, আবার প্রেমে ও সেবায়, ত্যাগে ও ঔদার্যে বিশ্ববন্দিত।

অশোক নাটকের 'প্রস্তাবনায়' বলা হইয়াছে পরিনির্বাণের দুইশত বৎসর পরে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর অশোকের আবির্ভাব ঘটিবে।[১] বিনয়পিটকের ভাষ্যগ্রন্থ সামন্তপ্‌পসাদিকায় ঐ ভবিষ্যৎবাণীই উদ্‌গীত হইয়াছে—

'ইতো বস্‌স সতস্‌স উপরি অট্‌ঠারস মে বস্‌সে পাটলিপুত্তেধম্মাসোকো নামা রাজা উপ্‌পজ্জিত্বা সকল-জম্বুদীপে রজ্জং কারেস্‌সতীতি। সো বুদ্ধসাসনে পসীদিত্বা মহন্তং লাভসক্কারং পবত্তয়িস্‌সতি।'[২]

নাটকে অশোকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুসীম এবং সহোদর ভ্রাতা বীতশোকের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। সিংহলদেশীয় কাহিনী মহাবংশ হইতে জানা যায় মগধরাজ বিম্বিসারের ষোড়শ রাণীর গর্ভে একশত একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের নাম সুসীম, এছাড়াও পট্টমহারাণী সুভদ্রাঙ্গীর অশোক ও বীতশোক নামে দুইপুত্র ছিল। অশোক অবদানে বর্ণিত হইয়াছে মহারাজ বিম্বিসারের মৃত্যু সময়ে অশোক পাটলিপুত্রে ছিলেন এবং সুসীম তক্ষশীলা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন জানিতে পারিয়া অশোক তাঁহার সহকারীদের সাহায্যে সুসীমকে বধ করেন। সুসীমকে গোপনচক্রান্ত দ্বারা নৃশংসভাবে হত্যা

১। গিরিশ গ্রন্থাবলী, ১০ম ভাগ, বসুমতী, ১৩২১, অশোক, পৃঃ ৩।

২। Takakusu and Nagai, Sāmantappasādikā, Vol. I. P. T. S. 1924.

চীন পরিব্রাজকের ভ্রমণ কাহিনীতে পাওয়া যায়—"more than a hundred year after his nirvana, when there will arise a king named Asoka, who will rule over the whole of Jambudvipa.' —Takakusus I-tsing, p. 14.

কয়ার সুরঞ্জিত কাহিনী নাটকেও স্থান পাইয়াছে।[১] অশোক-জননী সুভদ্রাঙ্গীর সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য নাটকে পরিবেশিত হইয়াছে তাহার উৎসও ভারতীয় কাহিনী। সুভদ্রাঙ্গী চম্পানগরের জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যা। ব্রাহ্মণ-কন্যাকে রাজমহিষী পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাজঅন্তঃপুরে প্রেরণ করেন। রাজমহিষীগণ তাহার অপূর্ব শ্রী দর্শন করিয়া তাহাকে ক্ষৌরকর্মে নিযুক্ত করিলেন। একদা সম্রাট সুভদ্রাঙ্গীর অলোকসামান্য রূপরাশি দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং জানিলেন তিনি ব্রাহ্মণকন্যা। সম্রাট তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং প্রধানা মহিষীর পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। অশোক ও বীতশোক বা বিগতশোক তাঁহার পুত্র। একদা দৈবজ্ঞ কুমারগণের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া দেখিলেন অশোকই পাটলিপুত্রের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। কিন্তু মহারাজের ভয়ে তিনি এই গণনার ফল গোপনে সুভদ্রাঙ্গীকে জানাইলেন —কুমার অশোক পরিণামে সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হইবেন। অশোক নাটকে সুভদ্রাঙ্গীর কণ্ঠে এই কাহিনীর স্বীকৃতি পাওয়া যায়—

ব্রাহ্মণকুমারী আমি রাজভোগ হেতু
আসি রাজপুরে বরেছি রাজারে
ক্ষৌরকার্যে ভুলাইয়ে নৃপতির মন
প্রতিষ্ঠিত মহিষীর পদে
সাধুর কথায় রাজ্যেশ্বর পুত্র কামনায়
আসিয়াছি রাজপুরে প্রত্যয় না করে।[২]

অশোকের ভ্রাতা বীতশোক বা বিগতশোকের কাহিনী 'বিতশোকাবদানে'[৩] স্থান পাইয়াছে। কাহিনীটি এই—রাজকুমার বীতশোক জৈনতীর্থঙ্করদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং বৌদ্ধদের উপহাস করিতেন। সম্রাট ভ্রাতাকে বৌদ্ধধর্মানুগামী করিবার জন্য এক পন্থা গ্রহণ করিলেন। তিনি অমাত্যদের আদেশ করিলেন—যদা অহং রাজা অলঙ্কারং মৌলিং পট্টং চাপনয়িত্বা স্নানশালাং

১। মহাবংশ মতে অশোক তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিস্‌স ব্যতীত অন্য সব ভ্রাতাদের হত্যা করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কাহিনীর পিছনে কতটা সত্য আছে বলা কঠিন। কারণ অশোকের শিলালিপি যখন খোদিত হয় তখনও পাটলিপুত্রে ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার অনেক ভ্রাতাভগ্নি ও আত্মীয়স্বজন জীবিত ছিল।

২। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

৩। দিব্যাবদানম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ২৭২।

প্রবিষ্টো ভবামি, তদা যুয়ং বীতশোক স্তোপায়েন মৌলিং পট্টং চ বদ্ধা সিংহাসনে নিষাদয়িষ্যথ।'[১] মন্ত্রিগণ কৌশলে বিতশোককে রাজচিহ্ন পরিধান করাইলেন এবং সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এই সময় সম্রাট প্রবেশ করিলেন এবং কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'সপ্তাহকাল তুমি রাজত্ব কর, রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ কর, সাতদিন পরে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে।' সপ্তাহ পরে সম্রাট বীতশোককে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন করিলেন—শত তূর্যধ্বনি, জয় অভিনন্দন, এবং শত নারী ও ভোগসামগ্রী তোমার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। তুমি ভোগ করিয়াছ তো? বীতশোক বলিলেন—

ন মে দৃষ্টং নৃত্যং ন চ নৃপ শ্রুতো গীতনিনদো
ন মে গন্ধা ঘ্রাতা ন খলু রসা মেহজ্ঞ, বিদিতাঃ
ন মে স্পৃষ্টঃ স্পর্শঃ কনকমণিহারাঙ্গজনিতঃ
সমূহো নারীণাং মরণপবিবদ্ধেন মনসা।[২]

অবশেষে রাজভোগে বীতশ্রদ্ধ বীতশোক সম্রাটের নিকট ভিক্ষুব্রত প্রার্থনা করিলেন। সম্রাটের সস্নেহ আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া তিনি কুক্কুটারামে গমন করিলেন। বঙ্গদেশের পৌণ্ড্রবর্ধন নগরে কোন নির্গ্রন্থ উপাসক নির্গ্রন্থের পদতলে বুদ্ধপ্রতিমা চিত্রণ করে।[৩] সম্রাট তাহা জানিতে পারিয়া আদেশ করিলেন—

পুণ্ড্রবর্ধনে সর্বে আজীবিকাঃ প্রঘাতয়িতব্যাঃ[৪]।

রাজাজ্ঞা বাহির হইল—

যো মে নির্গ্রন্থস্য শিরো দাস্যতি
তস্য দীনারং দাস্যমীতি।[৫]

রাত্রে বীতশোক এক আভীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আভীর রাজ-পুরস্কারের লোভে বীতশোককে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্নশির রাজসম্মুখে আনয়ন করে। এই সংবাদ শুনিয়া 'রাজা মূৰ্ছিতো ভূমৌ পতিতঃ'।[৬]

১। দিব্যাবদানম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ২৭২।
২। ঐ, পৃঃ ২৭৩।
৩। ঐ, পৃঃ ২৭৭।
৪। ঐ, পৃঃ ২৭৭।
৫। ঐ, পৃঃ ২৭৭।
৬। ঐ, পৃঃ ২৭৮।

'অশোক' নাটকে এই কাহিনী সুস্পষ্টভাবে বিস্তৃতাকারে স্থান পাইয়াছে। নাটকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরাগী ভ্রাতা বীতশোককে শায়েস্তা করিবার জন্য অশোক আকালের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। আকালের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বীতশোক রাজসভায় অশোকের পরিত্যক্ত রাজ-আভরণ ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছে। অশোক ভ্রাতার এই আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিয়াছেন—

'রাজভোগ তোমার লালসা; সাতদিন সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে যদিচ্ছা ভোগ করো।······সপ্তাহ ভোগান্তে তোমার শিরচ্ছেদ হবে।' নৃত্যগীত ও শত সুন্দরী নারীর ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সাত দিন অহর্নিশ বীতশোকের মনে এক চিন্তা। তিনি ভাবেন—

এই চক্ষু সুন্দর এ ধরা না হেরিবে।
শ্রবণ না শুনিবে পাখীর গান,
পুষ্পঘ্রাণ নাসিকায় না স্পর্শিবে,
রসাস্বাদ বর্জিত হইবে জিহ্বা,
কমনীয় কান্তি পরশনে—
আর কায়া প্রফুল্ল না হবে,
ফুরাইবে, ফুরাবে সকলি।[১]

সাতদিন অন্তে রাজা প্রশ্ন করিলেন :—'বীতশোক সাতদিন রাজ্যভোগ কিরূপ করিলে ?' বীতশোক রাজাকে জানাইলেন—

'মহারাজ মৃত্যু যার সম্মুখে, তার তৃষ্ণা কোথায় ?'

বীতশোক জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিলেন। নাটকেও মন্ত্রী কহ্লাটক নিবেদন করিয়াছে—'গর্বিত নাস্তিক জৈন তাহাদের উপাস্য মহাবীরের মূর্তির পদতলে······বুদ্ধদেবের মূর্তি অঙ্কিত করেছে'।[২] সঙ্গে সঙ্গে কঠিন রাজাজ্ঞা ঘোষিত হইয়াছে—'প্রতি জৈনের মস্তকের মূল্য দশ স্বর্ণ মুদ্রা।'[৩] তাহারই পরিণামে—

অষ্টাদশ সহস্র জৈনের শিরচ্ছেদ
হইয়াছে একদিনে।[৪]

১। অশোক, পৃঃ ৬২।
২। অশোক, পৃঃ ৬২।
৩। অশোক, পৃঃ ৬১।
৪। অশোক, পৃঃ ৬৯।

বীতশোকাবদানেও পাওয়া যায়—

'যাবদেকদিবসেঽষ্টাদশসহস্রণ্যজীবিকানাং প্রঘাতিতানি।'[১]

বৌদ্ধভিক্ষু বীতশোক এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিবারিত করার জন্য এক আভীরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আভীর বীতশোকের কর্তিত মস্তক লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইল। অবশেষে এই মহাপুরুষের আত্মোৎসর্গে রাজ্যে হত্যাকাণ্ড নিবারিত হয়।[২]

ভারতীয় কাহিনীসমূহে পাওয়া যায় অশোক সুদর্শন ছিলেন না। তাঁহার কুৎসিত আকারের জন্য মহারাজ বিন্দুসার তাঁহাকে রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন। রাজকুমারদের ক্রীড়াস্থলে, উৎসবসভায় অশোককে দেখিলে সম্রাট বিরক্তবোধ করিতেন। নাটকেও উল্লেখিত হইয়াছে সম্রাট অশোকের দেহে—'রাজচক্রবর্তীব্যঞ্জক জটুল চিহ্নকে কুষ্ঠরোগ জ্ঞানে ঘৃণা করেন।'[৩] বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশীলা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সম্রাট কুমার অশোককে বিদ্রোহ দমনের জন্য তক্ষশীলায় প্রেরণ করেন। মহারাজের ইচ্ছা ছিল অশোক বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া তক্ষশীলায় নিহত হউক। নাটকের ১ম অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে মহারাজ বিন্দুসার অশোককে একাকী তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু অশোকের শৌর্যে বীর্যে ও কৌশলে তক্ষশীলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। বিন্দুসারের মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যদের আহ্বানে অশোক পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলেন কিন্তু রাজকুমার সুসীম তখন তক্ষশীলায় ছিলেন। সম্রাট বিন্দুসার প্রাণত্যাগ করিলে অশোক পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং

১। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৭।

২। 'তিস্‌স্' নামে অশোকের এক ভ্রাতার নাম মহাবংশে পাওয়া যায়। বীতশোক এবং তিস্‌সের জীবনকাহিনীও প্রায় এক। সম্রাট বীতশোককে যে উপায়ে বৌদ্ধধর্মানুরাগী করেন তিস্‌সকেও সেই একই উপায়ে বৌদ্ধধর্মানুরাগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহাধর্মরক্ষিত নামক অর্হতের নিকট তিনি ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন। দিব্যাবদানের বীতশোক এবং মহাবংশের তিস্‌স এক ও অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কোন চৈনিকগ্রন্থে অশোকের এই ভ্রাতার নাম সুদত্ত বা সুগাত্র। হিউয়েন সাঙ মহেন্দ্রকেও অশোকের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহেন্দ্র অমিতব্যয়ী ও অত্যাচারী ছিলেন। অশোক এই অত্যাচারকাহিনী শ্রবণ করিয়া মহেন্দ্রকে সাতদিনের জন্য অন্ধকার কারাগৃহে অবরুদ্ধ করেন। অনুতাপদগ্ধ মহেন্দ্র কারাগৃহে অর্হত্ত্বপদ লাভ করেন।

৩। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

সুসীমের পথ রোধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বৌদ্ধকাহিনীতে উল্লেখিত হইয়াছে সশস্ত্র সৈন্যদল রাজধানীর তোরণ বেষ্টন করিয়া সুসীমের পথ রোধ করে এবং পরিখা খনন করিয়া তাহা জলন্ত কাষ্ঠে পূর্ণ করিয়া রাখে। সুসীম দৈবক্রমে সেই পরিখার মধ্যে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। 'অশোক' নাটকে পাওয়া যায় সুসীমকে প্ররোচিত করিয়া হত্যা করার জন্য পাটলিপুত্র নগরের পূব তোরণে জলন্ত অঙ্গার ও খদিরপূর্ণ পরিখা খনন করা হইয়াছে এবং সুসীম অশোকের সহচর আকালদ্বারা প্রতারিত হইয়া তাহার অভ্যন্তরে পতিত হইয়াছেন। অশোকের প্রতি পিতার বিরূপ মনোভাব এবং অশোকের সুসীমসহ তাঁহার শত ভ্রাতা নিধন করার কাহিনী হইতে জানা যায় রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া অশোক পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহলী কাহিনীতে অশোকের নৃশংস 'চণ্ডাশোক'-রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। অশোক নাটকেও পিতার প্রতারণা, ভ্রাতার অপমান সংসার-পরিত্যক্ত অশোককে 'দানব' করিয়া তুলিয়াছে।—'আমি দানব আমার দেহে অস্থি নাই, মাংস নাই, রক্ত নাই, কেবল আপাদ-মস্তক নিষ্ঠুরতাপূর্ণ······আমি সংসার-পরিত্যক্ত, সংসারকে প্রতিশোধ দেব—এই নিমিত্ত জীবিত।'[১]

অন্যত্র— স্তম্ভিত করিব ধরা নিষ্ঠুর আচারে।
দেখিব দেখিব—
প্রবল শোণিত-স্রোতে তিতি বসুমতী—
হয় বা না হয় তার আচার বর্তন।[২]

সিংহলদেশীয় কাহিনী মহাবংশে অশোকের ক্রূর নিষ্ঠুরতার বহু দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইয়াছে। অশোকের ভ্রাতা সুসীমের পত্নী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া গভীর অরণ্যে এক চণ্ডাল নায়কের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনতিকাল পরে যুবরাজ-পত্নী একটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করেন। এই শিশুটির নাম নিগ্রোধ। নিগ্রোধ ৭ বৎসর বয়সে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। একদা মহারাজ অশোক বাতায়নপথে নিগ্রোধের কাষায় পরিহিত সৌম্যশান্ত অনুপম মূর্তি দেখিতে

১। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।
২। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

পাইয়া তাহাকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া আনিলেন। বালকের কণ্ঠে বৌদ্ধধর্মের অমৃতকল্প তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া সম্রাট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন। দিব্যাবদানের অন্তর্গত পাংশুকুলাবদানে পাওয়া যায় ক্রোধোন্মত্ত অশোক রাজ্যমধ্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিবার জন্য নরকনামে একটি বহু কারুশিল্পশোভিত সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রজাগণ তাহার মনোরম শিল্প সৌন্দর্য দেখিয়া অভিভূত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে নরক-রক্ষক চণ্ডগিরিক তাহার শিরশ্ছেদ করিত। একদা বালপণ্ডিতসমুদ্র নামে এক ভিক্ষু অশোক নির্মিত নরকের শিল্প সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া সেই বধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। চণ্ডগিরিক তাঁহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর স্থাপিত তপ্ত কটাহে নিক্ষেপ করিল। কিছুক্ষণ পরে বিস্মিত ঘাতক দেখিল তপ্ত কটাহে একটি বিকশিত পদ্ম এবং তাহার উপর ভিক্ষু সমাসীন।[১] ভীত সন্ত্রস্ত চণ্ডগিরিক এই সংবাদ রাজসমীপে প্রদান করিলে রাজা স্বয়ং সেই বধাগারে উপনীত হইলেন এবং নৃশংসতার জন্য ভিক্ষু বালপণ্ডিতসমুদ্রের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। সম্রাট সেই দিনই নরক ধ্বংস করিয়া বুদ্ধধর্মসঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মহাবংশের নিগ্রোধ শ্রমণ কাহিনী এবং দিব্যাবদানের অন্তর্গত পাংশুকুলাবদান-এর বালপণ্ডিতসমুদ্রের কাহিনী অশোক নাটকে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। অশোক নাটকে সুসীমের পত্নী চন্দ্রকলা বনপথে নিগ্রোধকে জন্ম দান করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। নিগ্রোধ চণ্ডাল সর্দারের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছে এবং গুরু উপগুপ্তের আদেশে শৈশবে অশোকের অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর পাপকার্য প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। হ্রদমধ্যস্থ মায়াপুরীতে নিগ্রোধ প্রবেশ করিলে ঘাতকগণ তাহাকে দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথিয়া ফেলিতে এবং বর্শা ও খড়্গাঘাতে নিহত করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবশেষে তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি হইয়াছে। চণ্ডগিরিক অশোককে নিবেদন করিয়াছে—'মহারাজ আশ্চর্য, আশ্চর্য!—তপ্ত তেলে পদ্ম ফুটলো—সেই পদ্মফুলে বসলো, ক্রমে শূন্যে উঠলো, এক অঙ্গ দিয়ে জল পড়ছে আর এক অঙ্গ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।'[২] অবশেষে নাটকেও ভ্রাতৃহন্তা নরহন্তা চণ্ডাশোক নিগ্রোধের উপদেশ লাভ করিয়াছে—

১। পশ্যতি তং ভিক্ষুং পদ্মস্যোপরি পর্যঙ্কেনোপবিষ্টম্। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৮।
২। অশোক পৃঃ ৪৬।

ভোগতৃষ্ণা স্বার্থ বলিদান
দেহ মতিমান,
জনগণ মঙ্গলকামনা
একমাত্র স্বার্থ রাখ হৃদে
জনসেবা মহাব্রতে অভিমান যাবে,
জ্ঞানরত্ন করগত হবে,
জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ করি সংস্কার,
পাপের বন্ধন হতে লভহ উদ্ধার।[১]

এইভাবে নাট্যকার মহাবংশের কাহিনীও দিব্যাবদানের কাহিনীর সমন্বয়সাধন করিয়াছেন।

নাটকে অশোকের তিন জন পত্নীর[২]—পদ্মাবতী, দেবী এবং তিষ্যরক্ষিতার কাহিনী স্থান পাইয়াছে। দিব্যাবদানের অন্তর্গত কুনালাবদানে[৩] ধর্মবিবর্ধন বা কুনালমাতা পদ্মাবতীর নাম পাওয়া যায়। নাটকেও তিনিই কুনালের জননী এবং অশোকের প্রধানা মহিষীর আসনে অধিষ্ঠিতা। অশোক-পত্নী দেবীর নাম মহাবোধিবংশে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তাঁহাকে 'বেদিসা মহাদেবী' (পৃঃ ১১৬) এবং সাক্যানী বা সাক্যকুমারী (পৃঃ ৯৮) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা দেবীর গর্ভজাত সন্তান। অশোক নাটকেও দেবীর বংশপরিচয় দেওয়া হইয়াছে—

উজ্জয়িনীবাসী কোন ধনাঢ্য বণিক।
একমাত্র কন্যা তার পরমা রূপসী।
উচ্চ আশা বণিক-হৃদয়ে—
চাহে কোন উচ্চ বংশে অর্পিতে নন্দিনী।[৪]

১। অশোক পৃঃ ৫০।

২। পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে এবং অনুশাসনে অশোকের মোট পাঁচ জন পত্নীর নাম পাওয়া যায়—

(ক) অগ্রমহিষী অসন্ধমিত্তা, (খ) দ্বিতীয়া দেবী তীবরমাতা কারুবাকী, (গ) বেদিসা মহাদেবী সাক্যকুমারী দেবী, (ঘ) পদ্মাবতী, (ঙ) তিষ্যরক্ষিতা। কারুবাকীর নাম কেবল অশোকের অনুশাসনে স্থান পাইয়াছে।

৩। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬০।

৪। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪—১৫।

মহাবংশে উল্লেখিত হইয়াছে দেবী রাজকণ্ঠে মাল্যদান করিয়াও সম্রাটের সঙ্গে আগমন করেন নাই কারণ অসন্ধমিত্তাই তখন অগ্রমহিষীর পদে অধিষ্ঠিত। অশোক নাটকেও দেবী পাটলিপুত্রের সিংহাসন, রাজপ্রাসাদের সুখসম্পদ্ তুচ্ছ করিয়া মহারাজের অজ্ঞাত কোন স্থানে কুটিরবাসিনী ছিলেন। পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকেও তিনি চরম আত্মত্যাগে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। দেবী বেদিসাগিরিতে এক বিখ্যাত বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। অশোক নাটকেও দেবী সারীপুত্ত প্রভৃতি বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যদের উদ্দেশ্যে স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।[১]

মহাবংশ, দিব্যাবদান ও অবদানকল্পলতা মতে তিস্সরক্ষিতা অশোকের সর্বশেষ মহিষী। তিস্সরক্ষিতা অসংযত চরিত্রা এবং চতুরা রমণী ছিলেন। তিনি অসন্ধমিত্তা বা পদ্মাবতীর পুত্র কুনালের প্রতি আকৃষ্টা ছিলেন। ধার্মিক পুত্র কুনাল বিমাতার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিস্সরক্ষিতার গোপন ষড়যন্ত্রে যুবরাজ কুনাল তক্ষশীলায় প্রেরিত হইলেন। এই সময় মহারাজ অশোক গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তিস্সরক্ষিতা গোপনে রাজার সমরোগাক্রান্ত একটি আভীরকে বধ করিয়া তাহার পাকস্থলীস্থ কীটে পলাণ্ডুরস প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন কীটগুলি বিনষ্ট হইয়া গেল। এইভাবে ব্যাধির ঔষধ নির্ণয় করিয়া তিস্সরক্ষিতা তাহা রাজার জন্যও ব্যবস্থা করিলেন। রাজার রোগ নিরাময় হইল। তৎপর কৃতজ্ঞ রাজা তিস্সরক্ষিতাকে সাতদিনের জন্য রাজ্যভার প্রদান করিলেন। রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া তিস্সরক্ষিতা কুনালের চক্ষুরুৎপাটনের জন্য রাজকীয় আদেশ প্রদান করেন। পিতৃভক্ত কুনাল ঘাতকদ্বারা নিজের চক্ষু উৎপাটন করাইয়া পত্নী কাঞ্চনমালার হাত ধরিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 'অশোক' নাটকেও তিস্সরক্ষিতা প্রতারণা দ্বারা অশোকের মন জয় করিয়া অগ্রমহিষীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজকে পলাণ্ডুরস সেবন করাইয়া তাঁহার গ্রহণীরোগ নিরাময় করিয়াছে এবং পুরস্কারস্বরূপ সাতদিনের জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছে।[২] অবশেষে তিস্সরক্ষিতার আদেশে কুনালের চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে। কুনাল দূতের হস্তে তাহার চক্ষু প্রদান করিয়া পত্নী কাঞ্চনমালার সঙ্গে তক্ষশীলা পরিত্যাগ করিয়াছে। দিব্যাবদানে আছে বোধিদ্রুমের প্রতি

১। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।
২। অশোক, প্রাগুক্ত, পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় ও চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অশোকের অসামান্য শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দর্শন করিয়া ঈর্ষান্বিতা তিস্‌সরক্ষিতা বোধিদ্রুম নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু দৈববলে তাহার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অশোক নাটকে মার কন্যা তৃষ্ণার প্ররোচনায় সে শুষ্ক বোধিবৃক্ষে প্রাণসঞ্চার করিয়াছে এবং রাজাকে বিষ প্রদান করিয়া হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। কিন্তু আকালের প্রচেষ্টায় তাহার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে ও রাজার জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

মহাবংশ মতে অশোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র[১] এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। মহাবংশের ত্রয়োদশ, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ অধ্যায়ে লঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং বোধিবৃক্ষের শাখা আনয়ন ও প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। প্রিয়তমা কন্যা সঙ্ঘমিত্রা লঙ্কাদ্বীপে বোধিবৃক্ষের শাখা বহন করিয়া লইয়া যাইবার বাসনা জ্ঞাপন করিলে রাজা শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। সঙ্ঘমিত্রা পিতাকে তাহার দৃঢ় সঙ্কল্পের বিষয় জানাইয়াছে—

আহ সা—মে মহারাজ ভাতুনো বচনং গুরু।
পব্বাজনীয়া চ বহূ, গন্তব্বং তত্থ তেন মে ॥[২]

নাটকেও মহেন্দ্র এবং সঙ্ঘমিত্রা সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। পরে মহেন্দ্র সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। মহেন্দ্রের আদেশে সঙ্ঘমিত্রাও বোধিবৃক্ষের শাখাসহ সিংহল যাত্রা করিয়াছে। কারণ—

রাজরাণী উন্মাদের প্রায়
সুনির্মল বৌদ্ধধর্ম দীক্ষা পিপাসায়।

কিন্তু—

সে দীক্ষা প্রদানে অসম্মত ভ্রাতা মম
নারীসঙ্গ ভিক্ষুর নিষেধ।
সে কারণে ভিক্ষুণী প্রেরণে
করেছেন পত্রে ব্যক্ত নিজ অভিলাষ।
পত্রপাঠ উৎসাহিত হৃদয় আমার......।
উপনীত হব লঙ্কাধামে।[৩]

১। ফা-হিয়ান ও হুয়েন সাঙ মহেন্দ্রকে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অশোকাবদানেও মহেন্দ্র অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এ ছাড়া কারুবাকীপুত্র তীবরের ও কাশ্মীর উপাখ্যানে জালুকের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারাও অশোকের পুত্ররূপে পরিচিত হইয়াছেন।

২। মহাবংস, পি. টি. এস., পৃঃ ১৪২। ৩। অশোক, প্রাগুক্ত, ৬৪।

নাটকের মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার কাহিনী মহাবংশের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে।

মহাবংশে সিংহলরাজ তিস্‌স,অশোক, নিগ্রোধ এবং অশোকপত্নী অসন্ধমিত্তার পূর্বজন্মের একটি সুন্দর উপাখ্যান পাওয়া যায়।[১] একদা কোন এক প্রত্যেকবুদ্ধ মধুর প্রত্যাশায় পাত্রহস্তে নগরে প্রবেশ করেন। পথে কলসকক্ষে নদীপথে জল আনয়নকারিণী কোন রমণীকে তিনি মধুবিক্রেতার দোকানের পথ জিজ্ঞাসা করিলে রমণী বলিল—এসো মধ্বাপণোভন্তে, তথ গচ্ছাতি তং ব্রবি।[২] প্রত্যেকবুদ্ধ দোকানে উপনীত হইলে শ্রদ্ধানতচিত্তে মধুবিক্রেতা প্রত্যেক-বুদ্ধের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া মধু প্রদান করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন—

জম্বুদ্বীপে একরজ্জং দানেনানেন হোতু মে,
আকাসে যোজনে আণা ভূমিয়ং যোজনে তি চ।[৩]

এই সময়ে মধুবিক্রেতার দুই ভ্রাতা আসিল। তাহারা মধুবিক্রেতার নিকট সমস্ত জানিতে পারিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—

চণ্ডালো নূন সো সিয়া,
নিবাসেন্তি হি চণ্ডালা কাসায়ানি সদা ইতি।[৪]

মধ্যম ভ্রাতা বলিল—

'পচ্চেকবুদ্ধং তং খিপ পাররবে'।[৫]

এই জন্মে তাহারাই—

'অসোকো মধুদো, অসংধিমিত্তা দেবী তু চেটিকা,
চণ্ডালবাদী নিগ্রোধো, তিস্‌সো সো পারবাদিকো।[৬]

এই উপাখ্যানটি অবিকৃতভাবে 'অশোক' নাটকে স্থান পাইয়াছে। পদ্মাবতী ও ন্যগ্রোধ ভিক্ষু উপগুপ্তের প্রভাবে আকাশমণ্ডলে তাঁহাদের অতীত জন্মের এই কাহিনী উদ্‌ভাসিত দেখিয়াছেন। অতীত জন্মের সঙ্গে সংযোগ সাধন করিয়া উপগুপ্ত বলিয়াছেন—

মধুদাতা—রাজ্যেশ্বর অশোক নামেতে
তুমি ওই মধুময়ী দেবকার্যে অশোক-গৃহিণী
ফেলিতে সাগরে তাঁরে যাহার কল্পনা,

১। মহাবংস, পঞ্চম অধ্যায়, পি. টি. এস.,
২, ৩, ৪, ৫। ঐ, পৃঃ ৩৪। ৬। ঐ, পৃঃ ৩৫।

পুণ্যভূমি ভারত ত্যজিয়ে সাগর মাঝারে—
লঙ্কাধামে সিংহাসনে বসে সেই জন।
করি তিরস্কার—
চণ্ডাল আবাসে স্থান হয়েছে তোমার।[১]

মহাবংশের কাহিনীকে এইখানে প্রায় অবিকৃতভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে।

কলিঙ্গবিজয় সম্রাট্ অশোকের জীবনের একটি পরম ক্ষণ। অশোকের অনুশাসন হইতে জানা যায় তাঁহার রাজত্বের অষ্টমবর্ষে তিনি কলিঙ্গ বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। কলিঙ্গ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু কলিঙ্গের রণক্ষেত্রে তিনি কি দেখিলেন—

'দিয়ঢমাতে পানষতষহশে যে তফা অপবুঢে, শতষহষমাতে ততহতে, বহু তাবতকে বা মটে।'[২]

স্তম্ভে, পর্বতগাত্রে, প্রস্তরফলকে বিজয়ী বীর সেই মর্মন্তুদ কাহিনী হৃদয়ের গভীর অনুতাপের সঙ্গে যুগযুগান্তরের মানুষের জন্য খোদিত করিয়া রাখিলেন। অশোক নাটকেও নরশোণিতে প্লাবিত ও শবদেহাচ্ছাদিত কলিঙ্গ নগরের ভীষণ দৃশ্যাবলী অঙ্কিত হইয়াছে—

হের স্থলে স্থলে স্তূপাকার শব
মাংসাহারী দ্বন্দ্ব দেহ লয়ে,
শৃগালের আনন্দের রোল দিবানিশি
লক লকে অগ্নি জিহ্বা গগনমণ্ডলে।
শুন চারিদিকে রোদনের ধ্বনি
নরস্রোত ধায় বনপথে,
কেহ অনাহারে পথে পড়ে মরে—
জীবিত আহত দেহ টানিছে শৃগালে,
তথাপিও নহে শান্ত শাণিত আয়ুধ,
বধে বৃদ্ধবালক বনিতা।
টলটল আরক্ত মেদিনী রক্তধারে।[৩]

১। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।
২। শিলানুশাসন, কালসী-১৩।
৩। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

পরাজিতের এই মর্মন্তুদ যাতনা বিজয়ী বীরের অন্তরকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। কলিঙ্গের রণভূমিতে অনুতাপদগ্ধ সম্রাট্ প্রেম ও করুণার প্রতীক বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্তের প্রথম দর্শনলাভ করেন। অশোক নাটকে উপগুপ্ত[১] সম্রাট্ অশোকের উপদেষ্টা এবং গুরুরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

অশোক অনুশাসনের প্রভাবও নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া সম্রাট্ অশোক প্রজাসেবায় ব্রতী হইয়াছেন। অশোক লিখিয়াছেন—দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাজ্ঞো দ্বে চিকীছা কতা, মনুসচিকীছা চ পসুচিকীছা চ। ওসুঢানি চ যানি মনুসোপ গানি চ পসোপগানি চ যত যত নাস্তি সর্বত্রা হারাপিতানি চ রোপিতানি চ। মূলানি চ ফলানি যত যত্র নাস্তি সর্বত হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ। পংথেসু কূপা চ খানাপিতা, ব্রছা চ রোপাপিতা পরিভোগায় পসুমনুসানং'।[২] অন্যত্র—'মগেসু পি মে নিগোহানি লোপাপিতানি ছায়োপগানি হোসংতি পসুমুনিসানং, অংবাবডিক্যা লোপাপিতা, অঢকোসিক্যানি পি মে উদুপানানি খানাপাপিতানি নিসিদিয়া চ কালাপিতা আপানানি মে বহুকানি তত তত কালপিতানি পটীভোগায়ে পসুমুনিসানং'।[৩]

নাটকে মিশরদূত অশোকের সাম্রাজ্যে তাঁহার সেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। রাজ্যের সর্বত্র বিস্তৃত রাজপথ সমস্ত রাজ্যকে এক বন্ধনে আনয়ন করিয়াছে, শত শত কূপ, সুশীতল বারি দান করিতেছে, পথে পথে ছায়াঘন বৃক্ষশ্রেণী। পশুচিকিৎসালয় ও মনুষ্যচিকিৎসালয় সবত্র মুক্তদ্বার, চিকিৎসকগণও সুশিক্ষিত, দুষ্প্রাপ্য ঔষধিবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রাজ্যে জীবহিংসা রহিত হইয়াছে। নিজ রাজ্যের সর্বত্র এবং পররাজ্যের প্রতিও তিনি ভ্রাতৃভাব পোষণ করিতেছেন—কারণ—'প্রাণানং অনারংভো সাধু'।[৪] এবং 'কতবিয়মতে হিমে সর্বলোকহিতং…নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতৎপা'।[৫]

১। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্য, হুয়েন-সাংএর ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং ব্রহ্মদেশে প্রচলিত অশোক সম্বন্ধীয় কাহিনীতেও অশোকের গুরুর পদে উপগুপ্তকে অধিষ্ঠিত পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে অশোকের গুরু উপগুপ্ত নহেন—মৌদগলিপুত্র তিষ্য। কাহারো কাহারো বিশ্বাস পালি সাহিত্যের মৌদগলিপুত্র এবং মহাযান সাহিত্যের উপগুপ্ত এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
২। শিলানুশাসন, গিরনার, ২। ৩। স্তম্ভানুশাসন ৭। ৪। শিলানুশাসন, গিরনার—১১।
৫। শিলানুশাসন গিরনার—৬।

অশোক তাঁহার অনুশাসনে সর্বধর্মের প্রতি অপক্ষপাত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন—'সারবঢী অস সর্বপাসণ্ডানং'।[১] তাঁহার ধর্মমহামাত্রগণ সর্ব ধর্ম সম্প্রদায়ের হিতার্থে নিযুক্ত থাকিতেন—'সংঘঠসি পিমে কটে ইমে বিয়াপটা হোহংতি তি, হেমেব বভনেসু আজীবিকেসু পি মে কটে ইমে বিয়াপটা হোহংতি তি। নিগং ঠেসু পি মে কটে ইমে বিয়াপটা হোহংতি। নানাপাসং ডেসু পি মে কটে ইমে বিয়াপটা হোহংতি তি। নানাপাসং ডেসু পি মে কটে ইমে বিয়াপটা হোহংতি পটিবিসিঠং পটিবিসিঠং তেসু তে তে মহামাতা।[২] নাটকে অশোকও ঘোষণা করিয়াছেন—

'হিন্দু হোক, জৈন হোক, যে ধর্ম উপাসক হোক, যিনি এ রাজ্যে বাস করেন, যিনি নিষ্ঠাচার, স্বধর্মের প্রতি যার অনুরাগ তিনি বৌদ্ধভিক্ষুর ন্যায় আমার সম্মান-ভাজন, বৌদ্ধের ন্যায় তাঁরাও রাজসাহায্য প্রাপ্ত হবেন'।[৩]

'কুনালাবদানে'[৪] পাওয়া যায় অশোক মহাস্থবির উপগুপ্তের সঙ্গে বৌদ্ধতীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। অশোক বুদ্ধদেবের জন্মস্থান হইতে তাহার নির্বাণ পর্যন্ত সমস্ত পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থভূমি এবং বুদ্ধদেবের শিষ্যদের স্মৃতিপূতস্থান-সমূহ দর্শন করেন। সর্বত্র অশোক তাঁহার ভক্তিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[৫] পুণ্য স্মৃতি অক্ষয় করিবার জন্য তিনি সমগ্র ভারতে চুরাশিসহস্র স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন।[৬] নাটকেও এই তথ্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়—

তীর্থস্থান যথা যথা করেছ ভ্রমণ
যথা প্রভুর জনম,
যেই যেই স্থানে পর্যটন
তপস্যা যথায়
বোধিসত্ত্ব লাভ যে আসনে,—
সে সকল পুণ্যস্থলে
স্তম্ভ স্তূপ বিহার নির্মাণ
নিরন্তর বাসনা তোমার
চৌরাশিসহস্র স্তূপ নির্মাণ কল্পনা।
নিরন্তর জাগিছে অন্তরে[৭]।

১। শিলানুশাসন—১২। ২। স্তম্ভানুশাসন—৭। ৩। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫। ৪। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪২। ৫। দ্রষ্টব্য, শিলানুশাসন, গিরনার—৮, লুম্বিনী স্তম্ভলেখ, নিগালীসাগর স্তম্ভলেখ ইত্যাদি। ৬। তুলনীয়—দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০, পাংশুপ্রদানাবদানম্। ৭। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

অশোকাবদানে[১] সম্রাট অশোক বৌদ্ধসঙ্ঘকে দশ কোটি সুবর্ণমুদ্রা দান করিবার বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজকোষ হইতে সম্রাট প্রত্যহ প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে প্রেরণ করিতেন। অবশেষে মন্ত্রিবর্গের প্রচেষ্টায় রাজকোষের অর্থ প্রেরণ বন্ধ হইল। সম্রাট অশোক যে সুবর্ণপাত্রে আহার করিতেন তাহা বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর রৌপ্যপাত্রের ব্যবস্থা হইল সম্রাট তাহাও বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রেরণ করিলেন। অবশেষে রাজার জন্য মৃন্ময় পাত্রের ব্যবস্থা হইল। সম্রাট একদিন আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে মন্ত্রিবর্গকে প্রশ্ন করিলেন—

'কঃ সাংপ্রতং পৃথিবীমীশ্বরঃ।[২]

উক্ত হইল—দেবঃ পৃথিব্যামীশ্বরঃ।

সম্রাট অবরুদ্ধ কণ্ঠে জানাইলেন—আমি সম্রাট, কিন্তু আমার সাম্রাজ্য-গৌরব নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং—

'ইদং মমার্ধমলকং গ্রহায় কুর্কুটারামং গত্বা সঙ্ঘে নির্যাতয়।"[৩]

মন্ত্রিগণ ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবার নিমিত্ত আমলকীখণ্ড প্রদান করিয়া জানাইলেন—

'জম্বুদ্বীপৈশ্বর্যস্য রাজ্ঞ এষ সাংপ্রতংবিভব ইতি।'[৪]

নাটকের শেষাংশে মার অহঙ্কাররূপে অশোকের হৃদয়ে স্থান করিয়া লইয়াছে—

'অহঙ্কার—রাজ্য-অহঙ্কার তার মনে—
······করে যদি সসাগরা ধরণী প্রদান,
শতগুণে অহঙ্কার হবে বলবান,
পাবে তায় কিরূপে নিস্তার।'[৫]

দান-অহঙ্কারে উন্মত্ত সম্রাট সঙ্ঘে শতকোটী স্বর্ণমুদ্রা দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। সে গৌরব বজায় রাখিতে গিয়া রাজকোষ অর্থশূন্য, সম্রাট নিজের সুবর্ণ ভোজনপাত্র—তাহা বন্ধ হইলে রৌপ্যপাত্র, তাহাও বন্ধ হইলে লৌহপাত্র সঙ্ঘকে প্রেরণ করিয়াছেন। অবশেষে মৃত্তিকাপাত্রে ভোজন করিতেছেন। সর্বশেষে আকালের হস্তে অর্ধ আমলকী প্রদান করিয়া বলিয়াছেন—'সঙ্ঘের যেন সকলে এর এক এক অংশ গ্রহণ করে, আমার আর

১। দিব্যাবদানম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ২৭৯।

২, ৩, ৪। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮০-৮১। ৫। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮-৮৯।

কিছুই নাই।'[১] যথাসর্বস্ব দান করিয়া মন্ত্রী রাধগুপ্তকে প্রশ্ন করিয়াছেন—
'রাধগুপ্ত, এখন তোমাদের মহারাজ কে ?
রাধগুপ্ত—মহারাজ বিদ্যমান রয়েছেন।
অশোক—তবে আমি তোমার সম্মুখে বৌদ্ধ সঙ্ঘকে সসাগরা পৃথিবী দান করলেম।[২]

সম্রাটের প্রতিজ্ঞা তখনও পূর্ণ হয় নাই। শতকোটি স্বর্ণমুদ্রার মাত্র ছিয়ানব্বই কোটী প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু রাজভাণ্ডার শূন্য। মহাস্থবির উপগুপ্ত প্রশ্ন করিলেন—মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দিবার আজ্ঞা মন্ত্রীর প্রতি প্রদান করলেন না ?

অশোক—প্রভু, আপনার কৃপায় আমার দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত। আমি বুঝেছি—রাজ্য, ধন, কীর্তিকলাপ কিছুই আমার নয়, সকলই বুদ্ধদেবের—আমি নিমিত্ত মাত্র ছিলেম।[৩]

এইবার বৌদ্ধ নৃপতি অশোকের হৃদয় মারের আধিপত্যমুক্ত হইল। ত্রিবিধ পাপ—কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারের আবরণে মার তাঁহার অন্তঃকরণে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তিষ্যরক্ষিতার প্রতি আসক্তি কামের প্রভাব, নির্গ্রন্থ নিধন—ক্রোধরিপুর প্রকাশ, বৌদ্ধসঙ্ঘে রাজ্যদান-গৌরব অহঙ্কারের পরিচায়ক। মারের সর্বপ্রভাব উন্মূলিত, নবমন্ত্রে উদ্বোধিত-হৃদয় এই নরশ্রেষ্ঠের মহত্তম পরিচয়—তিনি রাজভিক্ষু অশোক।

কৃষ্ণবিহারী সেন

তিনি 'অশোকচরিত' নামে একটি ক্ষুদ্র নাটক রচনা করেন। এই গ্রন্থে নাট্যকার দিব্যাবদান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 'অশোকচরিত'-এ সম্রাট অশোকের পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত স্থান পায় নাই। এইখানে অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্বজীবন বিবৃত হয় নাই। অশোকের উপদেষ্টা ও গুরু স্থবির উপগুপ্ত অথবা মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের বদলে বৌদ্ধ ভিক্ষু যশোমুনির[৪] বিষয় লিখিত হইয়াছে। কুনালাবদানে আছে অশোকপত্নী পদ্মাবতী এক সন্তান

১। অশোক, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৯।
২। ঐ, পৃঃ ৯০।
৩। ঐ, পৃঃ ৯০।
৪। সঙ্ঘস্থবির যশোমুনির নাম পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত দিব্যাবদানের অন্তর্গত কুনালাবদানেও পাওয়া যায়, পৃঃ ২৪৪।

প্রসব করেন। সেই পুত্রের—'নয়নানি চাস্য পরমশোভনানি।'[১] এই পরম-শোভন নয়নের জন্য নবজাত কুমারের 'কুনাল' নামকরণ হয়। কারণ—'কুমারস্য কুনালসদৃশানি নয়নানি। ভবতু কুমারস্য কুনাল ইতি নাম।'[২] নবজাত শিশু কুনালপক্ষীর ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট এইজন্য রাজকুমারের নাম কুনাল রাখা হয়। দিব্যাবদানে আছে—

হিমেন্দ্ররাজে গিরিশৌলশৃঙ্গে
প্রবালপুষ্প প্রসবে জলাঢ্যে
কুনালনাম্নেতি নিবাসপক্ষী
নেত্রাণি তেনাস্য সমান্যমূনি।[৩]

নাটকেও কুনালের কণ্ঠে শুনা যায়—'হে চক্ষু, তুমি কুনালপক্ষীর চক্ষুর মত সুন্দর বলিয়া আমার নাম কুণাল হইয়াছিল।'[৪] কুনালাবদানে সঙ্ঘস্থবির যশোমুনি দেখিলেন—অচিরে কুনালের চক্ষু বিনষ্ট হইবে। তিনি কুনালকে বলিলেন—'চক্ষুঃ কুণাল অনিত্যমিতি কুরু।'[৫] 'অশোকচরিত' নাটকেও যশোমুনি কুনালের অনুপম চক্ষুর পরিণতি বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন এবং অনিত্য ও ভৌতিক চক্ষুর পরিবর্তে জ্ঞানচক্ষুর জন্য প্রার্থনামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। অবশেষে কুনাল তাঁহার নিরূপম সৌন্দর্যের জন্য বিমাতা তিস্‌সরক্ষিতার দুরভিসন্ধির পাত্র হইয়াছেন। তিস্‌সরক্ষিতার আদেশে তক্ষশীলায় অবস্থিত যুবরাজ কুনালের দুই চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে। দিব্যাবদানে অন্ধ কুনাল পত্নী কাঞ্চনমালার সঙ্গে তক্ষশীলা পরিত্যাগ করিয়া অশোকের যানশালায় অবস্থান করিয়াছেন এবং প্রত্যুষ সময়ে বীণা বাদন করিয়া গান আরম্ভ করিয়াছেন। রাজা সেই গান শুনিয়া কুনালকে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—

'ত্বং কুণাল ইতি?'

'কুণালঃ প্রাহ—এবং দেব, কুণালোঽস্মীতি। শ্রুত্বা মূর্ছিতো ভূমৌ পতিতঃ।'[৬] রাজা জানিতে পারিলেন মহিষী তিস্‌সরক্ষিতার আদেশে কুণালের চক্ষুরুৎপাটিত হইয়াছে। অশোক তিস্‌সরক্ষিতাকে অগ্নিদগ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিলে কুনাল বিমাতার প্রাণভিক্ষা করিলেন। নাটকেও সঙ্গীতরত কুনালকে অশোক প্রশ্ন করিয়াছেন—'তুমি কেগা, (অনেকক্ষণ দেখিয়া) তুমি কি কুনাল?'

১। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬০। ২, ৩। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬১।
৪। অশোকচরিত, কৃষ্ণবিহারী সেন, ১৯১০, পৃঃ ২০-২১।
৫। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬১। ৬। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৮।

অশোক—মহারাজ, আমি কুনাল।

অশোক—কি! (অচৈতন্যের ন্যায় পতন) বৎস, তোমার এমন দুর্দশা কে করিল?[১] রাজা জানিলেন তিস্‌সরক্ষিতাই অপরাধিনী। নাটকে রাজা তিস্‌সরক্ষিতাকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করিলে কুনাল বিমাতার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেন।

'অশোকচরিত' নাটকের বীতশোকের কাহিনীর উৎস বীতশোকাবদান।[২] এই অবদানে উল্লেখিত হইয়াছে একদা অশোক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীতশোকের সঙ্গে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন। তথায় বীতশোক একজন ঋষির পদবন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভগবন্, কিয়চ্চিরং তে ইহারণ্যে প্রতিবসতঃ? স উবাচ—দ্বাদশ বর্ষানীতি। বীতশোকঃ কথয়তি—কস্তবাহারঃ? স ঋষিরুবাচ—ফলমূলানি। —কিং প্রাবরণম্ —দর্ভচীবরাণি। —কা শয্যা, তৃণসংস্তরণম্। বীতশোক উবাচ—ভগবন্, কিং দুঃখং বাধতে?'[৩] ঋষি জানাইলেন তিনি এখনও ক্রোধজয়ী হইতে পারেন নাই। 'অশোকচরিত' নাটকে নাট্যকারের বিষয়বস্তু ও ভাষা দুই-ই মূল উৎসের অনুগামী হইয়াছে। নাটকে অশোক ও বীতশোক অরণ্যে এক ঋষির আশ্রমে উপনীত হইয়াছেন। বীতশোক ঋষিকে প্রশ্ন করিয়াছেন—'ভগবান, আপনি কতকাল এই অরণ্যে বাস করিতেছেন।'

ঋষি—দ্বাদশ বর্ষ।

বীতশোক—আপনার আহার কি?

ঋষি—এই অরণ্যের ফলমূলাদি।

বীতশোক—পানীয়?

ঋষি—ঝরণার নির্মল জল।

বীতশোক—শয়ন কিসে হয়?

ঋষি—পরিষ্কার প্রকৃতির ঘাসের শয্যায়।

বীতশোক—আচ্ছা, এত কঠোর তপস্যার মধ্যে আপনার মনে কখন কুচিন্তা আসে?[৪] ঋষি জানাইলেন এত কঠিন তপস্যায়ও মন কুচিন্তা মুক্ত হয় নাই। দিব্যাবদানে ঋষির উক্তি শুনিয়া বীতশোক ভ্রাতাকে বলিলেন—'অস্য কষ্টেন তপসা রাগোঽস্যাপি ন বাধ্যতে, প্রাগেব শ্রমণাঃ শাক্যপুত্রীয়াঃ স্বস্তীর্ণাসন

১। অশোকচরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

২। দিব্যাবদানম্ পৃঃ ২৭২।

৩। দিব্যাবদানম্, পৃঃ ২৭১।

৪। অশোক চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫

শয়নোপসেবিনঃ।'[১] অবশেষে ভ্রাতাকে শিক্ষাদানের জন্য রাজা এক অভিসন্ধি বাহির করিলেন। তাঁহার নির্দেশে অমাত্যগণ বীতশোককে রাজাভরণে ভূষিত করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইলেন। যথাসময়ে অশোক রাজসভায় প্রবেশ করিলেন এবং বীতশোককে রাজালঙ্কারে ভূষিত মৌলিপট্টে অধিষ্ঠিত দেখিয়া বলিলেন—'অদ্যাপ্যহং জীবামি। ত্বং রাজা সংবৃত্তঃ। ততো রাজ্ঞা অভিহিতম্—কোঽত্র? ঘাতকগণ প্রবেশ করিলে রাজা বলিলেন—বীতশোকো ময়া পরিত্যক্ত ইতি।[২] অমাত্যগণ তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন—

'দেব, মর্ষয়বীতশোকম্। দেবস্যৈষ ভ্রাতা।[৩]

রাজা বলিলেন—'মমভ্রাতুঃ স্নেহাদস্য সপ্তাহং রাজ্যং প্রযচ্ছামি।[৪] 'অশোক-চরিত' নাটকেও বীতশোক বৌদ্ধদের ভোগবাদী বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। অবশেষে অশোক কৌশলে বীতশোককে সিংহাসনে বসাইলেন এবং যথাসময়ে উপনীত হইয়া বীতশোককে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন—'কি! বীতশোক সিংহাসনে আরূঢ়। আমি জীবিত থাকিতে আমার মরণ কামনা এত বড় স্পর্ধা, এত বড় স্পৃহা! কে ও![৫] কর্মচারিগণ প্রবেশ করিলে বলিলেন—

বীতশোককে এখান হইতে লইয়া যাও।[৬]

রাধগুপ্ত বলিলেন—বীতশোক আপনার সহোদর। তাঁহাকে মারিলে আপনার নামে চিরকাল কলঙ্ক থাকিবে।'[৭] অবশেষে রাজার আদেশে বীতশোক সাতদিনের জন্য মগধের রাজা হইলেন। সাতদিন শেষে বীতশোকের প্রাণদণ্ড ধার্য হইল।

দিব্যাবদানে কর্মচারিগণ 'বীতশোকের রাজত্বের—'দিবসে গতে বীতশোকস্যাগ্রতঃ স্থিত্বা আরোচয়ন্তি—নির্গতং বীতশোক একং দিবসম্। ষড়হান্যবশিষ্টানি।'[৮] বীতশোকের অন্তরে সর্বদা মৃত্যুভয় জাগরূক রহিল। সাতদিন পরে তিনি ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন।

নাটকে প্রথমদিনের রাজসভা সমাপন হইলে কর্মচারিগণ বলিলেন—'মহারাজ সাতদিনের একদিন গেল। আর ছয় দিন আছে।'[৯] এইভাবে

১, ২। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭২। ৩। ঐ, পৃঃ ২৭৩। ৪। ঐ।
৫, ৬। অশোক চরিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।
৭। ঐ, পৃঃ ৯।
৮। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৩। ৯। অশোক চরিত, পৃঃ ১১।

অহরহ মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিয়া সাতদিন পরে বীতশোক রাজভবন ত্যাগ করিয়া গেলেন।

দিব্যাবদানে পুণ্ড্রবর্ধনে কোন নির্গ্রন্থ উপাসক নির্গ্রন্থের পদতলে বুদ্ধ প্রতিমা চিত্রণ করায় অশোক আদেশ করিয়াছেন—পুণ্ড্রবর্ধনের সমস্ত আজীবিকদের হত্যা করা হউক। যে কেহ কর্তিত শির লইয়া আসিবে তাহার পুরস্কার এক দীনার। কোন আভীর ও আভীর-পত্নী পুরস্কারের লোভে বীতশোকের ছিন্নশির অশোকের নিকট উপস্থিত করিল। ভ্রাতার আত্মত্যাগে শোকাভিভূত রাজা তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। এই উপাখ্যানের অনুসরণে নাট্যকার অশোক নাটকে লিখিয়াছেন—'পুণ্ড্রবর্ধন ও পাটলিপুত্র নগরের ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধমূর্তি চূর্ণ করিবার অপরাধে অশোক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর মস্তক ছেদনের আদেশ প্রদান করেন। দীনারের লোভে কোন আভীর পত্নী বীতশোককে হত্যা করে'।

ত্যাগব্রতী সম্রাট অশোকের শেষ জীবনের চিত্রেও প্রাচীন উৎসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অশোকচরিতে সম্রাট ৯৬ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা সঙ্ঘে প্রেরণ করিয়াছেন, স্বর্ণ, রৌপ্যপাত্রও সঙ্ঘে পাঠাইয়াছেন। অবশেষে রহিল একটি মাত্র অমলক ফল। ইহাই তাঁহার আহার্য। তাহার অর্ধাংশও তিনি সঙ্ঘে প্রেরণ করিয়াছেন। অশোকাবদানে তাঁহাকে 'অর্ধামলকেশ্বরঃ'[১] বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। নাটকেও অশোকের সেই দানগৌরবের ঐতিহ্য বজায় রহিয়াছে। অবশেষে সসাগরা ধরণী ধর্মপ্রচারের জন্য বৌদ্ধসঙ্ঘকে দান করিয়া জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর[২] ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। অশোকের উপাসক জীবনের উপাখ্যানে নাটকের আরম্ভ এবং ভিক্ষুব্রত গ্রহণে নাটকের সমাপ্তি।

শরচ্চন্দ্র সরকার

নাট্যকার তাঁহার 'শাক্যসিংহ প্রতিভা বা বুদ্ধদেব চরিত' নাটক রচনায় প্রাচীন ঐতিহ্যধারার অনুসরণ করিয়াছেন। Arnold-এর 'Light of Asia'

১। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮০। R. G. Basak, Buddha and Buddhism (Bhuddhist Emperor Asoka's Liberality), pp., 94—102,

২। অশোক 'দীপচক্রবর্তী' সম্রাট ছিলেন, তিনি বিম্বিসার অথবা প্রসেনজিতের ন্যায় 'প্রদেশরাজ' ছিলেন না। শেষ জীবনে কল্যাণকর কাজের জন্য অশোক 'ধর্মাশোক' নামে অভিহিত হইয়াছেন। দীপবংশে তিনি 'পিয়দস্সী' নামে পরিচিত হইয়াছেন। অনুশাসনেও অশোক নিজেকে—'দেবানং পিয় পিয়দসি' নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

গিরিশ ঘোষের 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটক, তারকেশ্বর চৌধুরীর 'শাক্যসিংহ', অঘোরনাথ গুপ্তের 'শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছে। নাটকে পটিসন্ধি গ্রহণের পূর্বাহ্নে মহামায়া স্বপ্ন দেখিতেছেন—দেবদূতগণ শয্যাসহ তাঁহাকে বহন করিয়া হিমালয়শৃঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। তথায় এক শালবৃক্ষ তলে তাঁহার পার্থিব কলঙ্করাশি মোচন করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে এক দিব্য সরোবরে স্নান করাইলেন। পরে দিব্য বস্ত্র ও স্বর্গীয় কুসুমমালায় তাঁহাকে সজ্জিত ও ভূষিত করা হইল। দেবদূতগণ রোপ্যপর্বতের সুবর্ণ প্রাসাদে তাহাকে শয্যায় শায়িত করিয়াদিলেন। এই সময় আকাশের একটি তারকা খসিত হইয়া ষড়দন্তশোভিত সুন্দর মাতঙ্গরূপে তিনবার অবনত মস্তক হইয়া মহামায়ার উদরের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। পালি নিদান কথার 'মহামায়ায় সুপিনং'[১]-এর কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীর আশ্চর্য সাদৃশ্য বজায় রাখিয়াছেন। দৈবজ্ঞের সাহায্যে এই স্বপ্নের অর্থ সুস্পষ্ট হইল। শুদ্ধোদন মহামায়াকে বলিলেন—

ধর্মপথগামী যদি হয়
সুত, প্রদানিবে জ্ঞান, অজ্ঞানমানবে
পৃথিবীর পাপভার করিবে হরণ।[২]

জন্মগ্রহণের পর সদ্যোজাত শিশু সপ্তপদ অগ্রসর হইলেন। 'ততো সত্তমপদে ঠিতো অগ্‌গো অহং অস্মি লোকস্মা'তি আদিকং আসভিং বাচং নিচ্ছারেন্তো সীহনাদং নাদি।'[৩] নাট্যকার এই সুর একেবারে অবিকৃত রাখিয়া লিখিয়াছেন সদ্যোজাত শিশু—

'আমি ভূমণ্ডলে সর্বশ্রেষ্ঠ—প্রণম্য সবার।' এই কথা বলিয়া নিকটস্থ পর্বতমালা কম্পিত করিয়া এক ভীষণ গর্জন করিলেন।[৪] দেবশিশুর মহান্ আবির্ভাবের পূর্বে রাজপ্রাসাদে অষ্টপ্রকার শুভ নিমিত্ত ঘটিয়াছিল। নাট্যকার বুদ্ধদেবকে নাটকে 'কমলাপতি বৈকুণ্ঠবিহারীর' মানব অবতাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শিশু বুদ্ধের উপরও অতিলৌকিকত্ব আরোপ করা হইয়াছে।[৫]

১। Fausboll, Jātaka, Vol. I, p. 50.

২। শাক্যসিংহ প্রতিভা, ১২৯৫, পৃঃ ১৪। ৩। Fausboll, Jātaka, Vol. I, p. 53.

৪। তুলনীয়—ললিতবিস্তর পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত পৃঃ ৬২।

৫। শাক্যসিংহ প্রতিভা, ১২৯৫, পৃঃ ৩৩।

বুদ্ধদেবের বাল্য ও কৈশোর জীবনের ঘটনা পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যের অনুকরণে রচিত। পাঠশালায় গুরু বিশ্বামিত্র সিদ্ধার্থের জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন, গুরু তাঁহাকে 'ভগবান' বলিয়া সম্বোধন করিলে 'সর্বার্থসিদ্ধ' বলিলেন 'আমি সেই, সেই এক, দুই নয়। যে যেথায় আছ দেখ আমার লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান আমি পুরুষ-প্রধান।'[১] নাট্যকার এইভাবে বুদ্ধদেবকে গীতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একীকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার সিদ্ধার্থ বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন দেখিয়া কৈলাসশিখরে দেবগণ সম্মিলিত হইয়াছেন। উপলক্ষ—কমলাপতি আত্মবিস্মৃত হইয়া যদি দারপরিগ্রহ করেন তবে ধরার ভার হরণ করিবে কে? সর্বার্থসিদ্ধির অন্তঃকরণেও প্রশ্ন জাগিয়াছে—'আমার এক আত্মা কয় জনকে দিব? পৃথিবীকে না স্ত্রীকে'? বিশ্বের দুঃখের ভার হরণের জন্যই কমলাপতির মানব অবতার। এইজন্য সুখের ক্রোড়ে লালিত সর্বার্থসিদ্ধি সারথীকে বলিয়াছেন—'সুখী দুঃখীতে কত প্রভেদ, দুঃখীজনে কিভাবে জীবন যাপন করে, আজ আমায় তাহাই দেখাও।' অবশেষে দুঃখ-তাড়িত বিশ্বমানবের জন্য মুক্তির সন্ধানে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন—

চলিনু জন্মের মত
হের ঐ সকাতরে—ডাকিছে জগজ্জনে
মুছাতে নয়ন।[২]

এই নাটকে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনার নিবিড় স্পর্শে উপভোগ্য হইয়াছে। পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্য-বহির্ভূত বহু বিষয় কেবল লেখকের অন্তরের ভক্তি ও কল্পনার রঙে রঞ্জিত হইয়া নাটকে স্থান পাইয়াছে। বুদ্ধদেব তাঁহার নিকট বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের অবতার। এইজন্য বুদ্ধের জীবন-আখ্যানেও নাট্যকার হিন্দু-বৌদ্ধ মতের সমন্বয়-সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

বৌদ্ধবিষয়ক কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বিদুরথ' এবং 'অশোক' নাটক রচনা করিয়াছেন। বিদুরথ[৩] নাটকে পালি সাহিত্যের

১। ঐ, পৃঃ ৬৪। ২। ঐ, পৃঃ ১২৯।

৩। পালি বিড়ূড়ভ; সংস্কৃত বিরূঢ়ক। জাতকে (৪৬৫) এই নামকরণের কাহিনী পাওয়া যায়। বিদুরথের জন্মের পর মহারাজ প্রসেনজিৎ আনন্দচিত্তে তাঁহার পিতামহীকে নবজাতশিশুর নামকরণের জন্য অনুরোধ করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। সংবাদ বাহক একটু বধির ছিলেন। মহারাজের

বিভিন্ন সূত্র, গাথা ও কাহিনী প্রায় অবিকৃতভাবে স্থান পাইয়াছে। বিদূরথের কাহিনী জাতকে[১] ধম্মপদ অট্‌ঠকথায়[২] এবং বিরূঢ়কাবদানে[৩] রহিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত কাহিনী অপেক্ষা পালি সাহিত্যের কাহিনীর সঙ্গে নাটকের সামঞ্জস্য অধিকতর। পালি সাহিত্যে এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ—

মহারাজ প্রসেনজিতের অনুরোধে আনন্দ প্রত্যহ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ রাজপ্রাসাদে পিণ্ডপাত গ্রহণ করিতেন। ক্রমশ রাজার অবহেলা এবং পরিবেশনকারীদের অশ্রদ্ধা দর্শন করিয়া ভিক্ষুগণ রাজভবনে পিণ্ডপাত গ্রহণ বন্ধ করিলেন। প্রসেনজিৎ ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং একজন শাক্যকুমারী বিবাহ করিয়া ভিক্ষুদের বিশ্বাসভাজন হইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি তাঁহার করদরাজ্য শাক্যপ্রধান মহানামের নিকট শাক্যরাজকন্যার পাণিপ্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। মহানামের নাগমুণ্ডানাম্নী দাসীগর্ভে জাত কন্যা বাসবখত্তিয়াকে শাক্যদুহিতা পরিচয়ে প্রসেনজিতের নিকট প্রেরণ করা হইল। বিবাহের সময় প্রসেনজিতের সন্দেহ অপনোদনের জন্য মহানাম তাঁহার কন্যা বাসবখত্তিয়ার সঙ্গে আহারে বসিলেন। পূর্বনির্দেশিত ব্যবস্থানুযায়ী মহানাম আহার গ্রহণোদ্যত হওয়ামাত্র একজন সংবাদদাতা একটি জরুরী পত্র প্রদান করিল। মহানাম কন্যাকে আদেশ করিলেন—'মা তুমি আহার কর।' এবং নিজে পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। বাসবখত্তিয়ার আহার শেষ হইল, প্রসেনজিতের দূতগণ মহানামের এই প্রতারণা বুঝিতে পারিল না। মহারাজ প্রসেনজিৎ বাসবখত্তিয়াকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। বিড়ূডভ বাসবখত্তিয়ার গর্ভজাত সন্তান। তাহার বয়স যখন সপ্তবর্ষ তখন তাহার অন্যান্য ভ্রাতা ও বন্ধুদের মামার বাড়ীর আদর আপ্যায়নের গল্পদ্বারা প্রণোদিত হইয়া সে বাসবখত্তিয়াকে প্রশ্ন করিল—মা, আমার মাতুলালয় কোথায়, তাঁহারা কেন

পিতামহী বলিলেন—শাক্যরাজকন্যা বাসবখত্তিয়া পূর্বেই সকলের মন জয় করিয়াছে, পুত্রের জন্মহেতু তিনি এখন রাজার আরো বল্লভা হইবেন। সংবাদবাহক 'বল্লভ' শব্দ বিড়ূডভরূপে শ্রবণ করিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিলেন 'মহারাজ, নবজাত শিশুর বিড়ূড়ভ নামকরণ করুন'। প্রসেনজিৎ ইহা তাঁহার প্রাচীন বংশদত্ত নাম মনে করিলেন। নবজাত রাজকুমারের নাম হইল 'বিড়ূডভ'।

১। ভদ্দসালজাতক, জাতক, ৪র্থ খণ্ড, ৪৬৫ নং।

২। ধম্মপদ অট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭-৬১।

৩। ক্ষেমেন্দ্র, বোধিসত্ত্ব অবদানকল্পলতা, শরচ্চন্দ্র দাস অনূদিত, ১ম খণ্ড, একাদশপল্লব।

আমাকে কোন উপহার পাঠায় না। বাসবখত্তিয়া বলিলেন—'শাক্যরাজ তোমার মাতামহ। বহু দূর দেশ বলিয়া তাঁহারা কিছু করিতে পারেন না।' বিড়ূড়ভের বয়স যখন ষোড়শবর্ষ হইল তখন তিনি বহু কষ্টে মাতার অনুমতি আদায় করিয়া এক বৃহৎ বাহিনীসহ কপিলাবস্তুর পথে যাত্রা করিলেন। শাক্যগণ বিড়ূড়ভের আগমন সংবাদ পাইয়া সমস্ত শাক্য রাজকুমার যাহারা বিড়ূড়ভ অপেক্ষা কম বয়স তাহাদের অন্যত্র প্রেরণ করিলেন। বিড়ূড়ভ মাতুলবংশীয় শাক্যদের প্রতি সর্বপ্রকার সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু শাক্যগণ কেহই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না, কারণ তাঁহারা সকলেই বিড়ূড়ভ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। অতঃপর কিছুদিন কপিলাবস্তুতে অবস্থান করিয়া বিড়ূড়ভ কোশল যাত্রা করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার এক সঙ্গী কোন প্রয়োজনে সংস্থাগারে আসিয়া এক দাসীকে দুগ্ধ ও জলদ্বারা বিড়ূড়ভের কক্ষ ধৌত করিতে দেখিলেন। দাসীর উক্তি হইতে আরো জানা গেল বাসবখত্তিয়া মহানামের দাসীকন্যা। এই সংবাদ বিড়ূড়ভেরও কর্ণগোচর হইল। শাক্যগণ তাঁহার পিতার প্রতি যে প্রতারণা করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া যুবরাজ শাক্যবংশ ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহারাজ প্রসেনজিৎ শাক্যগণের প্রতারণার বিষয় জানিয়া বাসবখত্তিয়া ও তাঁহার পুত্রকে রাজকীয় সম্মানচ্যুত করিলেন। পরে বুদ্ধদেবের উপদেশে তাঁহাদের আবার পূর্বগৌরবে অধিষ্ঠিত করিলেন। বিড়ূড়ভ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া শাক্যরাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধ জ্ঞাতিকুল রক্ষার নিমিত্ত কোশল রাজ্যের সীমানায় উপনীত হইয়া শাক্য রাজ্যের অন্তর্গত একটি স্বল্প ছায়াযুক্ত বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। এই বৃক্ষের অদূরে কোশল রাজ্যের সীমানায় এক ছায়াঘন বিরাট বটবৃক্ষ ছিল। বিড়ূড়ভ বুদ্ধদেবকে সেই বৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধদেব বলিলেন—মহারাজ আমার জ্ঞাতির ছায়াই আমাকে সুশীতল রাখিবে। বিড়ূড়ভ বুঝিলেন এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শাক্যদের অপরাধ ক্ষমা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তিনি দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এবারেও বুদ্ধদেবকে পূর্বাবস্থায় দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তৃতীয়বারেও তাহাই ঘটিল। চতুর্থবারে বুদ্ধদেব অদৃষ্টানুযায়ী ফলভোগের জন্য দূরে সরিয়া রহিলেন। বিড়ূড়ভও শাক্য রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ নির্বিশেষে শাক্যদের হত্যা করিলেন। মহানাম বন্দী হইলেন এবং বিড়ূড়ভ-এর সঙ্গে

আহার করিতে তাঁহাকে বাধ্য করা হইল। মহানাম স্নান করিবার ভান করিয়া হ্রদে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন। সেই রাত্রে বিড়ূড়ভ ও তাঁহার বাহিনী অচিরাবতী নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। রাত্রে হঠাৎ জলপ্লাবনে বিড়ূড়ভ এবং তাঁহার বাহিনী নদীজলে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

ধম্মপদ অট্ঠকথা এবং ভদ্দসাল জাতকে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে বিদুরথ নাটকের কাহিনীগত সাদৃশ্য বজায় আছে। পালি বাসবখত্তিয়া বিদুরথ নাটকে বাসবীতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। তিনি শাক্যরাজ মহানামের দাসীগর্ভে জাত কন্যা। মহানাম কোশলরাজ প্রসেনজিতের অনুরোধে শাক্যরাজকুমারী পরিচয়ে তাঁহাকে কোশলে প্রেরণ করিয়া শাক্যরাজ্যকে সম্রাটের রোষবহ্নি হইতে রক্ষা করেন। বিদুরথও ষোড়শবর্ষে শাক্যরাজ্যে আগমন করিয়াছেন— মাতুলালয়ের স্নেহের পরিচয় গ্রহণের জন্য। নাট্যকার শাক্যদের প্রতারণার ভিন্নতর দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন। নাটকে বিদুরথ মহানামকে প্রণামোদ্যত হওয়ামাত্র পূর্বনিযুক্ত সংবাদ বাহক মহাপ্রজাবতী গৌতমীর মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিয়াছে। অশুচি অবস্থায় মহানাম প্রিয়তম দৌহিত্রকে আলিঙ্গন করিতে পারেন না, এইভাবে প্রথমাগত দৌহিত্রের সঙ্গে একত্র ভোজনের দায় হইতেও তিনি রক্ষা পাইলেন। পালি সাহিত্যে দৈবক্রমে বিড়ূড়ভের কোন অনুচর জানিতে পারে—'বাসভখত্তিয়া দাসিয়া কুচ্ছিস্মিং মহানামসক্কস্স জাতা।'[১] এই কথা ছড়াইয়া পড়িতেও সময় লাগে নাই। তখন চারিদিকে মহাকোলাহল উঠিল—

'বাসভখত্তিয়া কির দাসিয়া ধীতা।'[২]

নাট্যকার এই ঘটনাটিকে একটু পরিবর্তন করিয়াছেন। নাটকে বিদুরথ স্বয়ং গৃহ শোধনরতা দাসীর নিকট জানিয়াছেন—'সে হচ্ছে, আমাদের রাজার দাসীর বেটীর ছেলে।'[৩] ইহার পর তিনি শাক্যবংশ ধ্বংসোদ্যত হইয়াছেন। বিদুরথও শাক্যরাজ্য ধ্বংসের জন্য যাত্রাপথে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া তিনবার শাক্যরাজ্য আক্রমণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন।

শাস্তা জ্ঞাতিকুল রক্ষার নিমিত্ত বিড়ূড়ভকে বলিয়াছেন—

'হোতু মহারাজা, ঞাতকানং ছায়া নাম সীতলা।'[৪]

১, ২। Fausboll, Jātaka, Vol. IV, No. 465, p. 147

৩। বিদুরথ, ১৩২৯, পৃঃ ১০৪।

৪। Fausboll, Jātaka, op. cit , p 152.

বিদুরথ নাটকেও সেই একই ভাবসূত্র রক্ষিত হইয়াছে। শাক্যবংশ ধ্বংসকামী বিদুরথের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব জানাইয়াছেন—

'তোমার পিতার সে ঐশ্বর্যময় প্রাসাদের চেয়ে জ্ঞাতিদের শীতল ছায়া আমার অধিক তৃপ্তিপ্রদ'।[১] পালি সাহিত্যে বিড়ূড়ভ নৃশংস হত্যাকারী, চৈনিক গ্রন্থেও তাঁহার অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা পাওয়া যায়। অবদান-কল্পলতাতে আছে বিরূঢ়ক সপ্তসপ্ততি সহস্র শাক্যকে হত্যা করেন এবং সহস্র সহস্র শাক্য বালক-বালিকাকে অপহরণ করেন। বালিকাগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করায় তিনি তাহাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। নাটকে বিদুরথ সত্যসন্ধ, দয়ালু এবং প্রেমিক পুরুষ। শাক্যরাজ্য ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা লইয়া সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় তিনি কপিলাবস্তুর প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু সত্যব্রত বিদুরথ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় যূপকাষ্ঠে আত্মজীবন বলি দিয়াছেন। পালি সাহিত্যে অচিরাবতী নদীর জলপ্লাবনে বিড়ূড়ভের জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত ঘটিয়াছে। বিড়ূড়ভের জীবন-কাহিনীর অবসানে বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের দেশনা প্রদান করিয়াছেন—

পুপ্ফানি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং
সুত্তং গামং মহোঘোর মচ্চু আদায় গচ্ছতি।[২]

—যেমন বন্যা কোন সুপ্তগ্রামকে ভাসাইয়া লইয়া যায় তেমনি (কামনারূপ) পুষ্পচয়নকারীর ন্যায় বিষয়বর্ণনায় আসক্তচিত্ত মনুষ্য মৃত্যুর দ্বারা অধিকৃত হয়। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের বিদুরথের জীবন বুদ্ধদেবের এই দেশনার বাঙ্ময় মূর্তি। বিদুরথ সত্যপরায়ণ, কিন্তু তাঁহার জীবনের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত হইয়াছে রূপাসক্তি দ্বারা। চিত্রার প্রতি তাঁহার আসক্তি এবং রূপজ মোহ অনিবার্যরূপে তাঁহাকে চরমপরিণতির মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। অচিরবতীর বক্ষে মৃত্যুবিভীষিকাময় কালপরিবেশে তাঁহার রূপজ-মোহের চরম পরিণতি ঘটিয়াছে।

বিদুরথ নাটকের কাহিনীর মাধ্যমে পালি সাহিত্যের বিভিন্ন সূত্র, গাথা এবং দেশনার ভাবাদর্শ প্রায় অবিকৃতভাবে নাট্যকার উপস্থাপিত করিয়াছেন। থেরী অপদানে মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া গাহিয়াছেন—

১। বিদুরথ, ১৩২৯, পৃঃ ১৪৩।

২। ধম্মপদ, পুপ্ফবগ্গো, শ্লোক সং, ৪, Dhammapada-Aṭṭhakathā Vol. I, Pt—II, P. T. S. p. 361.

অহং সুগত তে মাতা, ত্বং চ বীর পিতা মম
সদ্ধম্ম সুখদনাথ তয়া জাতাম্‌হি গোতম ।[১]

সুগত, আমি তোমার জননী, তুমি আমার বীর পিতা। তুমি উত্তম ধর্ম দান করিয়া আমাকে নবজন্ম দান করিয়াছ। নাটকে গৌতমী বুদ্ধদেবকে বলিতেছেন—'সত্য বটে আমি তোমার মা, তুমি আমার পুত্র। কিন্তু এখন তুমি আমার পিতা—আমি তোমার কাছ থেকে নবজীবন লাভ করে তোমার কন্যা হয়েছি।'[২] পালি গাথায়—

মুহুত্তং তণ্‌হা সমণং খীরং তং পায়িতো ময়া।
তয়াহং সন্তং অচ্চন্তং ধম্মকৃখীরং পি পায়িতা ॥[৩]

মুহূর্তের জন্য যে তৃষ্ণা তাহা প্রশমনের জন্য তোমাকে আমি দুগ্ধ পান করাইয়াছিলাম, তুমি আমাকে ধর্মদুগ্ধ পান করাইয়া অক্ষয় শান্তি প্রদান করিয়াছ। নাট্যকার লিখিয়াছেন—'আমি তোমাকে স্তন্যপান করিয়েছিলুম, তুমি অমূল্য ধর্মামৃত আমাকে পান করিয়েছ।'[৪]

পালিগাথায়—

রঞ্ঞোমাতা মহেসীতি সুলভং নাম মিৎথিনং
বুদ্ধমাতাতিয়ং নামং এতং পরম দুল্লভং ॥[৫]

রাজমাতা, রাজমহিষী এই সকল নাম স্ত্রীলোকের পক্ষে সুলভ, কিন্তু বুদ্ধমাতা এই নাম পরম দুর্লভ। বিদুরথ নাটকেও গোতমী বলিতেছেন—'রাজমাতা হওয়া সহজ, কিন্তু বুদ্ধমাতা হওয়া সুদুর্লভ—কোটি কোটি জন্মের তপস্যার ফল।'[৬]

পালিগাথায়—

ইৎথিকাণঞ্চ পব্বজ্জং অহং তং যাচিং পুনপ্‌পুনং।
তত্থ চে অত্থি দোসোমে, ত্বং খমস্সু নরাসভ ॥[৭]

স্ত্রীলোকদিগকে প্রব্রজ্যার অধিকার দিবার জন্য আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলাম। যদি কিছু দোষ করিয়া থাকি হে নরোত্তম, তাহা ক্ষমা করিও। নাট্যকার লিখিয়াছেন—'তোমার একান্ত অনিচ্ছা জেনেও তোমার নিকট থেকে স্ত্রীজাতির জন্য প্রব্রজ্যা ভিক্ষা করে অপরাধী হয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।'[৮]

১। Apadāna (ii) Buddha-Vaṁsa—Cariyāpiṭaka, Khuddakanikāya, Vol. VII, ed. Bhikkhu J. Kashyap. 1959, p. 208

২, ৪। বিদুরথ, ১৩২৯, পৃঃ ৪।

৩, ৫, ৭। Apadāna, op. cit, pp. 208, 204, ৬, ৮। বিদুরথ, পৃঃ ৪—৫।

নিরঞ্জনাতীরে মহাজ্ঞান লাভ করিয়া শাক্যসিংহ 'বুদ্ধ' হইয়াছেন। বারাণসী হইতে গয়ার পথে আজীবিক উপাসক উপকের সঙ্গে তাঁহার দেখা। উপকের নিকট তিনি তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

সব্বাভিভূ সব্ববিদূহমস্মি
সব্বেসু ধম্মেসু অনূপলিত্তো
সব্বঞ্জহো তণ্হক্খয়ে বিমুত্তো
সয়ং অভিঞ্ঞায় কমুদ্দিসেয্যং।[১]

আমি সর্বজয়ী, সর্বজ্ঞ, কোন পদার্থেই অনুলিপ্ত নহি। আমি সর্বত্যাগী আমার তৃষ্ণাক্ষয় ও বিমুক্তি লাভ হইয়াছে। স্বয়ং এই সকল জ্ঞাত হইয়া কাহাকে উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করিব? এই আত্ম-পরিচয়ের ক্ষীণ আভাস নাটকের ১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যে উপকের নিকট বুদ্ধদেবের পরিচয় প্রদানেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—তিনি 'সম্যক্ সম্বুদ্ধ।'······সমস্ত বিষয় থেকে নির্লিপ্ত হয়ে সকল বাধা অতিক্রম করে আমি সর্বজ্ঞতা লাভ করেছি।··· আমার গুরু নেই।······আমার তুল্য নেই। নরলোকে দেবলোকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই[২]।

বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে অনোমা নদীতীরে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তাঁহার অশ্বশ্রেষ্ঠ কণ্টক এবং অশ্বপাল ছন্দককে বিদায় দিয়া মুক্তিপথের সন্ধানী হইয়াছেন। ছন্দক সিদ্ধার্থের রত্ন আভরণ বহন করিয়া কপিলাবস্তুতে মহাপ্রজাপতী গৌতমীকে প্রদান করেন। জননী গৌতমী শোকে দুঃখে কাতর হইয়া সেই আভরণাদি রাজপুরীর কাননকুঞ্জের পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করেন। তাঁহারই একজোড়া রত্নবলয় নাট্যকারের কবিকল্পনাকে উদ্বোধিত করিয়াছে।

অগ্‌গঞ্ঞসুত্তন্তে[৩] বুদ্ধদেব বেসট্‌ঠকে বলিয়াছেন—'জানাতি খো বাসেট্‌ঠ রাজা প্রসেনদি কোসলো সমণো গোতমো অনুত্তরো সাক্যকুলা পব্বজিতো তি। সাক্যা খো পন বাসেট্‌ঠ রঞ্ঞো পসেনদি কোসলস্স অনুযুত্তা ভবন্তি। করোনতি খো বাসেট্‌ঠ সাক্যা রঞ্ঞে পসেনদিম্হি কোসলে নিপচ্চকারং

১। মজ্ঝিমনিকায়, ১ম খণ্ড. পৃঃ ১৭১; বিনয়পিটক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮; ধম্মপদ, তণ্হাবগ্গ, শ্লোক ২০।
২। বিদুরথ, ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য, পৃঃ ৯।
৩। দীঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, পি. টি. এস. পৃঃ ৮৩।

অভিবাদনং পচ্চুট্‌ঠানং অঞ্জলিকম্মং সামীচি কম্মং। ইতি খো বাসেট্‌ঠ অয়ং করোন্তি সাক্যা রঞ‍্‌ঞে পসেনদিম্‌হি কোসলে নিপচ্চকারং অভিবাদনং পচ্চুট্‌ঠানং অঞ্জলিকম্মং সামীচি কম্মং করোতি তং রাজা পসেনদি কোসলো তথাগতে নিপচ্চকারং অভিবাদনং পচ্চুট্‌ঠানং অঞ্জলিকম্মং সামীচিকম্মং—'নামু সুজাতো সমণো গোতমো? দুজ্জাতো অহম অস্মি; বলভা সমণো গোতমো, দুব্বলো অহম অস্মি; পাসাদিকো সমণো গোতমো, দুব্বণ্ণো অহম অস্মি, মহেসক্‌খো সমণো গোতমো, অপ্‌পেসক্‌খো অহম অস্মীতি।' অথ খো তং ধম্মং যেব সক্করোন্তো ধম্মং গরুকরোন্তো ধম্মং মানেন্তো ধম্মং পূজেন্তো ধম্মং অপচায়মানো, এবং রাজা পসেনদি—কোসলো তথাগতে নিপচ্চকারং করোতি অভিবাদনং পচ্চুট্‌ঠানং অঞ্জলিকম্মং সামীচি কম্মং'। বিদুরথ নাটকের ৩য় অঙ্কের ৭ম দৃশ্যে বুদ্ধদেব বশিষ্ঠকে প্রশ্ন করিয়াছেন—'তোমরা জান, আমি শাক্যকুলে জন্মেছি?' বশিষ্ঠ—জানি ভগবন।

বুদ্ধ—আর এটাও বোধ হয় জান, শাক্যেরা রাজা প্রসেনজিতের অধীন?[১]

বশিষ্ঠ—জানি ভগবান।

বুদ্ধ—শাক্যেরা তার সম্মান করে, একরূপ পূজা করে। কিন্তু সেই প্রসেনজিৎ আমার এখানে এসে ভূলুণ্ঠিত হয়, বন্দনা করে। কেন? আমি শাক্য বলে? না আমার শৌর্য বীর্য বংশমর্যাদা তার চেয়ে বেশী বলে?

বশিষ্ঠ—না, ভগবন, আপনি সংসারত্যাগী ধর্মসেবী বুদ্ধ বলে।

বুদ্ধ—হাঁ, ধর্মকেই তিনি পূজা করে থাকেন—আমাকে নয়।[২]

এই কথোপকথনের মধ্যে পূর্বোক্ত পালি সুত্তের অন্তর্নিহিত ভাব এবং ভাষা দুই-ই প্রস্ফুট হইয়াছে।

অগ্‌গঞ‍্‌ঞসুত্তন্তে বুদ্ধদেব বলিতেছেন[৩]—তুম্‌হে খ্‌ অথ বাসেট্‌ঠ নানা জচ্চা নানা নামা নানা গোত্তা নানা কুলা অগারস্মা অনগরিয়ং পব্বজিতা। 'কে তুম্‌হে তি'? পুট্‌ঠা সমানা, 'সমণা সক্য-পুত্তিয় অম্‌হাতি পটিজানাথ।'

১। সুত্তনিপাতে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—হিমবন্ত প্রদেশের ঠিক পার্শ্বে ঐশ্বর্যশালী কোশলের অধিবাসিগণ বাস করে, তাহারা আদিত্যবংশ, জাতিতে শাক্য, সর্বকামনাবিরত হইয়া এই পরিবার হইতে আমি বহির্গত হইয়াছি। মজ্ঝিমনিকায়েও বুদ্ধদেবকে কোশলীয় বলা হইয়াছে—ভগবা পি কোসলকো অহম পি কোসলকো (২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪)। 'ভদ্দসাল জাতকে'ও বলা হইয়াছে শাক্যগণ কোশলরাজের অধীন ছিলেন। —জাতক সংখ্যা ৪৬৫।

২। মজ্ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত ধম্মচেতিয় সুত্তে কোশলরাজ বুদ্ধদেবকে কি কি কারণে ভক্তি প্রদর্শন করিতেন তাহা উক্ত হইয়াছে।—মজ্ঝিমনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮-২৫।

৩। দীঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, পি. টি. এস. পৃঃ ৮৪।

বৌদ্ধসঙ্ঘে বহু জাতি বহু কুলগোত্রের এই শাশ্বত মিলনবাণী নাট্যকার লেখনীমুখে প্রায় হুবহু তুলিয়া ধরিয়াছেন—

বুদ্ধদেব—তোমরা বহু জাতি, বহু নাম, বহু গোত্র, বহু কুল থেকে এসে এই ভিক্ষুব্রত নিয়েছ। কেউ যদি তোমাদের প্রশ্ন করে, তোমরা কে? তোমরা কি উত্তর দেবে?

বশিষ্ঠ—আমরা বলব শাক্যপুত্র শ্রমণ।[১]

আলোচ্য নাটকে লেখক হিন্দু-বৌদ্ধ-ভাবধারার সুসম সমন্বয়-সাধনেও প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার নাটকে—'যিনি একদিন মীনরূপে সাগরের ভিতরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই ভগবান বুদ্ধরূপে কপিলাবস্তুতে অবতীর্ণ হয়েছেন।'[২] যদুবংশ ও শাক্যবংশ ধ্বংসের কাহিনীকেও নাট্যকার একসূত্রে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—'যে দম্ভ যদুবংশে প্রবেশ করে তার উচ্ছেদ করেছে, সেই দম্ভ শাক্যবংশেও প্রবেশ করেছে'।[৩] নাটকে শাস্তা গৌতমের শেষ-বাণী হিন্দু-বৌদ্ধ ভাবধারার সর্বাত্মক সমন্বয় ঐতিহ্যকে ঐতিহাসিক সমুজ্জ্বলতায় অনাগত যুগ-সম্ভাবনার পথে মুক্তি দিয়াছে। যে স্থলে তথাগতের মনে অন্নগ্রহণের ইচ্ছা হইয়াছে সেই স্থল এক সর্বাত্মক প্রেমধর্মের অভ্যুদয় সম্ভাবনাকে সাঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—'যখন নানা অসংখ্য উপধর্মের আক্রমণে ভারত ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে, তখন যে কেউ এখানে এসে, এই অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করবে—যে কেউ সাধনহীন, ভজনহীন, নীচবৃত্তি—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ—সেই বিনা আয়াসে ধর্ম লাভ করবে। এর নাম হবে জগদ্বন্ধু ধর্মমূর্তির নিত্যধাম-পুরী।'[৪]

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'অশোক' নাটক ততটা মূলানুগত নয়, যতটা নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত। এই নাটকে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে বিবৃত অশোকের মৌল পরিচয় স্পষ্ট হইতে পারে নাই। নাটকের অশোকজননী 'ধারিণী'[৫]; অশোক পত্নী 'অনীতা'[৬] এবং বীতশোকের জননী 'চিত্রা' নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। নাটকে অশোক অপেক্ষা বিন্দুসার, চিত্রা ও বীতশোক প্রভৃতি

১। বিদুরথ, ১৩২৯, পৃঃ ১৪৩। ২। ঐ, পৃঃ ৪২।
৩। ঐ, পৃঃ ১৬। ৪। ঐ, পৃঃ ১৫৭।
৫। 'ধারিণী' মহাযান সাহিত্যের অশোকজননী 'সুভদ্রাঙ্গী' এবং পালি সাহিত্যের 'ধম্মা'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।
৬। 'অনীতা' নাটকে কুনাল ও মহেন্দ্রের জননী। দিব্যাবদানে কুনালের মাতা 'পদ্মাবতী' এবং মহাবোধিবংশে মহেন্দ্রের মাতা 'দেবী'।

অধিকতর গুরুত্ব পাইয়াছেন। মহারাজ বিন্দুসার তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী চিত্রা এবং তাঁহার পুত্র বীতশোকের প্রতি অধিকতর অনুরাগী ছিলেন, অশোক ও অশোক-মাতা ধারিণীকে পছন্দ করিতেন না। বিন্দুসার অশোককে তাঁহার দুরারোগ্য কুষ্ঠজাতীয় ব্যাধির অজুহাতে রাজ্যচ্যুত করেন। কিন্তু মন্ত্রী রাধগুপ্ত অশোকের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধ কাহিনীতে পাওয়া যায় বিন্দুসারের জীবিতকালে কোন আজীবিক শ্রমণ রাজকুমার অশোকের সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব এবং সিংহাসনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। অশোকের জননী এই ভবিষ্য-দ্বাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। নাটকে বৌদ্ধভিক্ষু শার্ঙ্গধরের ভবিষ্যৎ গণনা সেই প্রাচীন কাহিনীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ভিক্ষু শার্ঙ্গধর তাঁহার গুরুর নিকট জানিতে পারিলেন ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম একদা সমগ্র বিশ্বে বিতরিত হইবে এবং সেই বিতরণ কর্তা এ রাজ্যের ভাবী রাজ্যেশ্বর। কুমার অশোককে দেখিয়া ভিক্ষু শার্ঙ্গধর তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির কামনা করেন এবং তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর হওয়ার আশীর্বাদ করেন। বৌদ্ধধর্মে কামনা—তাহা ভালোই হউক, মন্দই হউক সর্বদা পরিত্যাজ্য। নাটকে এই কামনারই পরিণতি অশোকের চণ্ডরূপ। ইহার পরিণতি যে কত ভয়ঙ্কর তাহা ভিক্ষু কৃপানন্দের বাণীতে প্রকাশ পাইয়াছে—'সময়ে যে ধর্মাশোক, তোমার সকাম আশীর্বাদ অসময়ে তাকে চণ্ডাশোকে পরিণত করেছে'।[১] এইখানে দিব্যাবদানের অন্তর্গত 'পাংশুপ্রদানাবদানম্'-এর বিম্বিসার কর্তৃক রাজকুমারদের পরীক্ষা গ্রহণ কাহিনীর ঐক্য পাওয়া যায়। দিব্যাবদানে বিন্দুসার পুত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের বাসনা প্রকাশ করিলে অশোকজননী পুত্রকে বলিলেন—'বৎস, রাজা কুমারান্ পরীক্ষিতুকামঃ সুবর্ণমণ্ডপমুদ্যানং গতঃ, ত্বমপি তত্র গচ্ছেতি।'[২] অশোক বলিলেন—'রাজ্ঞোঽহমনভিপ্রেতো দর্শনেনাপি, কিমহং তত্র গমিষ্যামি ?'[৩] তিনি বলিলেন—'তথাপি গচ্ছেতি'। অশোক হস্তিনাগ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পরীক্ষাস্থলে উপনীত হইলেন। পৃথিবীর উপর উপবেশন করিলেন, দধিমিশ্রিত শাল্যোদন ভোজন করিলেন। অন্যান্য রাজকুমারগণ রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া অতি উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিলেন। রাজা বিন্দুসার পরিব্রাজক পিঙ্গল-বৎসাজীবকে বলিলেন—'উপাধ্যায়, পরীক্ষ কুমারান্—কঃ শক্যতে মমত্যয়া-দ্রাজ্যং কর্তুমিতি[৪] ? পিঙ্গল দেখিলেন—'অশোকো রাজা ভবিষ্যতি।' কিন্তু

১। অশোক, ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী, বসুমতী পৃঃ ৩১।
২, ৩, ৪। দিব্যাবদানম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ২৩৩।

অশোক রাজার অভিপ্রেত প্রার্থী নহেন। সুতরাং তিনি ব্যক্তি নির্বিশেষে বলিলেন —'যস্য যানং শোভনং স রাজা ভবিষ্যতি'[১]।—

—তারপর—। 'যস্যাসনমগ্রম্ স রাজা ভবিষ্যতি।...এবং ভাজনং ভোজনং পানম্'[২]।

'অশোক' নাটকে মন্ত্রী রাধগুপ্ত নির্বাসিত অশোককে রাজসভায় উপস্থিত হইবার জন্য বিন্দুসারের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। পরীক্ষক বৌদ্ধভিক্ষু শার্ঙ্গধর, আজীবিক পরিব্রাজক পিঙ্গলবৎস নহেন। রাজকুমার অশোক রাজসভায় উপস্থিত হইয়া ভূম্যাসনে উপবেশন করিয়াছেন। অশোকের ভ্রাতা বীতশোক রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। শার্ঙ্গধর অশোককে প্রশ্ন করিলেন—'তুমি কিসে এসেছ রাজকুমার?

—এক বৃদ্ধ হাতীতে আরোহণ করে এসেছি।

—আহার?

—তণ্ডুলমিশ্রিত চিপিটক।[৩] এইখানেও পরীক্ষান্তে ভিক্ষু শার্ঙ্গধর ব্যক্তি নির্বিশেষে ঘোষণা করিয়াছেন—'এই দুই রাজকুমারের মধ্যে যাঁর শ্রেষ্ঠ আসন, শ্রেষ্ঠ যান ও শ্রেষ্ঠ আহার তিনিই এই শক্তিমান নরপতির উত্তরাধিকারী।'[৪] দিব্যাবদানে অশোক-জননীর প্রশ্নের উত্তরে অশোক জানাইয়াছেন যে যাহার যান আসন পান ভাজন ভোজন শ্রেষ্ঠ সেই রাজা হইবে। সুতরাং তিনিই ভবিষ্যৎ রাজা। কারণ 'মম হস্তিস্কন্ধং যানং পৃথিবী আসনং মৃন্ময়ং ভাজনং শাল্যোদনং দধিব্যঞ্জনং পানীয়ং পানমিতি।'[৫] নাটকেও অশোকের পরীক্ষাশেষে মন্ত্রীদের তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজসিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—"শুনুন—এই ব্যাধিগ্রস্ত ভিখারীই ভারতের ভাবী সম্রাট। হস্তীর তুল্য শ্রেষ্ঠ বাহন আর কি আছে? যাতে সমগ্র জাতির জীবনরক্ষা—রাজা হতে কুটীরবাসী পর্যন্ত যার কৃপায় জীবন রক্ষা করে—যার অভাবে প্রাণপূর্ণ দেশ একদিনে শ্মশানে পরিণত হয় সেই তণ্ডুলকণা অপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ খাদ্য আছে সচিবপ্রধান? আর আসন শূন্য উপেক্ষিত রাজকুমারকে রাজসভা মধ্যে ভিখারীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বয়ং সর্বংসহা ধরিত্রী করুণায় নিজ বক্ষে স্থান দিয়েছিলেন; এ হতে শ্রেষ্ঠ আসন আর ত আমার বিদিত নেই।"[৬]

১,২,। দিব্যাবদানম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ২৩৩।
৩, ৪। অশোক, ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী, বসুমতী, পৃঃ ২৬।
৫। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪। ৬। অশোক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭

এইভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্বাচনের আখ্যানে নাট্যকার পাংশুপ্রদানাবদানম্-এর কাহিনীকে প্রায় অবিকৃতভাবে রক্ষা করিয়াছেন।

'অশোক' নাটকের অন্যান্য উপাখ্যানে প্রাচীন কাহিনীর প্রতি বিশেষ আনুগত্য প্রদর্শন করা হয় নাই। পিতার প্রত্যাখ্যান, বিমাতার ষড়যন্ত্র এবং দুরারোগ্য ব্যাধি অশোককে বিদ্রোহী করিয়াছে। তক্ষশীলার বিদ্রোহের কারণও নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনা—মহারাজ বিন্দুসার তক্ষশীলার অধিপতি কনিষ্ককে[১] ক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত করেন নাই। বিষপান করিয়া অশোকের রোগমুক্তি, দেহে ও প্রাণে বল ও উদ্দীপনালাভ এবং অনীতা ও কনিষ্কের কাহিনী লেখকের কল্পনার রঙে রঞ্জিত।

অশোকের পুত্র কুনালের কাহিনীতে কিছুটা প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য পাওয়া যায়। দিব্যাবদানে (কুনালাবদান) এবং অবদানকল্পলতায় (৩য় খণ্ড) তাহার বিমাতা তিষ্যরক্ষিতার আকর্ষণ বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু নাটকে কুনালের পদ্মপলাশলোচনের প্রতি আকৃষ্ট তাঁহার বিমাতা নহেন, পিতামহী চিত্রা। প্রাচীন বৌদ্ধ কাহিনীতে বিমাতা তিষ্যরক্ষিতার আদেশে কুনালের চক্ষুরুৎপাটিত হইয়াছে, অশোক নাটকে কুনালের পিতামহ বিন্দুসারের আদেশে বালক কুনালের চক্ষুরুৎপাটিত হইয়াছে। পরে চক্ষুহীন কুনাল দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন।

নাটকের শেষাংশে নাট্যকার বৌদ্ধ করুণার মূল্যায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দানবীয় প্রকৃতি চণ্ডাশোকের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। এই ক্রোধবহ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য প্রয়োজন বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী সাধনা। অশোক পুত্র কুনালের কণ্ঠে সেই অপ্রমেয় মৈত্রীর শুভ উদ্বোধন সূচিত হইয়াছে। করুণাধারায় বিগলিত হৃদয় কুনাল পরের কল্যাণের নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে কুনালের প্রাণ রক্ষার জন্য বৌদ্ধভিক্ষুর কণ্ঠে করুণাভিক্ষা প্রার্থনা-বাণী উদ্গীত হইয়াছে। কণামাত্র করুণা তিনি চাহিয়াছেন—"করুণা—যে করুণায় জগৎ প্রসূত হয়, তরল আকাশ কঠিন মৃত্তিকা হয় সেই করুণা।"[২] অবশেষে বৌদ্ধভিক্ষু কৃপানন্দের করুণায় অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে। পৃথিবী শীতল হইয়াছে এবং অগ্নিস্নাত

১। অবদানকল্পলতায় তক্ষশীলার অধিপতির নাম কুঞ্জরকর্ণ, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, শরচ্চন্দ্র দাস অনূদিত, ৩য় খণ্ড, উনষষ্টিতম পল্লব।

২। 'অশোক' প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

কুনাল সজীব প্রাণবত্তায় মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছে। সর্বশেষে চণ্ডাশোকের জীবনের শেষ যবনিকা পাত করিয়া বৌদ্ধভিক্ষুর কণ্ঠে নবরূপে ধর্মাশোকের জীবনায়নের প্রস্তাবনা ঘোষিত হইয়াছে—

'উঠ, জাগ—বরলাভে
প্রবুদ্ধ হইয়া, গুরুদেব গৌতমের
প্রেম বিলাইয়া, তব রাজ্য ধর্মরাজ্যে
কর পরিণত।'[১]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'সিংহল বিজয়' নাটক রচনা করেন। এই নাটকের নায়ক লঙ্কাদ্বীপ বিজয়ী বঙ্গবীর বিজয়সিংহ। দ্বীপবংশ, মহাবংশ ও কুলবংশ প্রভৃতি সিংহলী গ্রন্থে বিজয়সিংহের অমরকাহিনী স্থান পাইয়াছে। সিংহলী কাহিনীটি নিম্নরূপ—

বঙ্গরাজ কন্যা সুসিমা সুন্দরী ও স্বাধীন প্রকৃতির ছিলেন। একদা তিনি স্বাধীন জীবনের আনন্দ উপভোগের জন্য রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইলেন। লালদেশের জঙ্গলে রাজকুমারীর সঙ্গে এক সিংহের মিলন হইল। রাজকন্যার গর্ভে পুত্র সিংহবাহু এবং কন্যা সিংহসিবলী জন্মগ্রহণ করিল। ষোড়শ বর্ষ পরে রাজকুমারী পুত্রের সাহায্যে সিংহের গুহা হইতে পলায়ন করিয়া পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। পরে সিংহবাহু তাঁহার পিতাকে বধ করিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে বঙ্গের সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। সিংহবাহু তাঁহার ভগিনী সিংহসিবলীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ৩২টি পুত্র ছিল। বিজয় তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং সুমিত দ্বিতীয় পুত্র। বিজয় অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের অত্যাচারে রাজা বাধ্য হইয়া তাঁহাদের নির্বাসন আজ্ঞা প্রদান করেন। বিজয়সিংহ তাঁহার সঙ্গিগণসহ যেদিন লঙ্কাদ্বীপে পদার্পণ করিলেন সেদিনই তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ প্রতীক্ষায় শালবনে শায়িত ছিলেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

বিজয়ো লাড়বিসয়া সীহবাহুনরিন্দজো
এসো লঙ্কং অনুপ্পত্তো সত্তভচ্চসতানুগো
পাতিট্‌ঠিস্সতি দেবিন্দ লঙ্কায়ং মম সাসনং
তস্মা সপরিবারং তং রক্‌খ লঙ্কং চ সাধুকং।[২]

১। অশোক, পৃঃ ৬৬। ২। মহাবংস, গাইগার, পি. টি. এস. সত্তমো পরিচ্ছেদো, পৃঃ ৬২।

সিংহবাহুপুত্র বিজয় শত শত অনুচরসহ লাঢ়দেশ হইতে লঙ্কায় আসিতেছে। হে দেবগণ, লঙ্কায় আমার ধর্ম প্রচারিত হইবে, সুতরাং অনুচরসহ তাহাকে লঙ্কায় যত্নসহকারে রক্ষা কর। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের আদেশে উৎপলবর্ণ দেবতাকে লঙ্কা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। সেই দেবতা পরিব্রাজক সাধুর ছদ্মবেশে লঙ্কায় উপনীত হইয়া বিজয় ও তাঁহার সঙ্গিগণের গাত্রে কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের হস্তে রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া দিলেন।

লঙ্কায় কুবন্না নামে এক যক্ষী ছিল। বিজয়ের সাতশত অনুচর কুবন্না যক্ষীর প্রতারণায় বন্দী হইলেন। অবশেষে বিজয় সঙ্গিগণের উদ্ধার মানসে তথায় উপস্থিত হইয়া কুবন্নাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কুবন্না প্রাণভয়ে রাজকুমারকে বলিল—

জীবিতং দেহি মে সামি, রজ্জং দস্সামি তে অহং।
করিস্সাম ইত্থি-কিচ্চং চ কিচ্চং চঞ্ঞং যথিচ্ছিতং॥[১]

যক্ষী কুবন্না ষোড়শবর্ষীয়া পরমা সুন্দরী রমণীরূপে বিজয়ের শয্যাসঙ্গিনী হইল। কুবন্না ভাবিল—রজ্জং চ সামিনো দেহং সব্বে যক্‌খা চ ঘাতিয়া
মনুস্সাবাসকারণা যক্‌খা মং ঘাতয়ন্তি হি।[২]

সমস্ত যক্ষদের বিনাশ করিয়া আমার প্রভুকেই রাজ্য দান করিব। তাহা না হইলে মানুষের সঙ্গে সহবাসহেতু যক্ষগণ আমাকেই বধ করিবে।

অবশেষে কুবন্না যক্ষীর সহায়তায় বিজয় যক্ষরাজ কালসেনকে বধ করিয়া লঙ্কা অধিকার করেন। দক্ষিণ ভারতের পাণ্ডুরাজ বহু উপঢৌকনসহ রাজকুমারীকে বিজয়ের নিকট প্রেরণ করেন। বিজয় তাঁহাকে রাজ্ঞীর পদে অভিষিক্ত করেন। বিজয় অপুত্রক ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার ভ্রাতা সুমিত্তকে রাজ্যগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইয়া পত্র প্রেরণ করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার জীবন অবসান ঘটে।

এই কাহিনীর সূত্রে 'সিংহলবিজয়' নাটকের বিষয়বস্তু বিধৃত হইয়াছে। মহাবংসে আছে সিংহবাহুর হাত পা কতকটা সিংহের স্থায় গঠন ছিল। এইজন্য তাহার নাম সিংহবাহু হইয়াছে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অতি সুনিপুণভাবে সেই প্রাচীন কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সিংহবাহুর অন্তরের গোপন পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

১। মহাবংস, গাইগার, পি. টি. এস. সত্তমো পরিচ্ছেদো, পৃঃ ৬৪।
২। ঐ, পৃঃ ৬৫।

'সিংহ ব্যাঘ্র নিজের সন্তান খায় জানিস্‌;...আজ এই ঘোর বনের মধ্যে, এই ক্ষুদ্র কান্তারের রক্তাক্ত জমির উপর—এই ভয়ানক নির্জনে, আমার মধ্যে সেই বন্য জন্তু লাফিয়ে উঠেছে; আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমি আজ তোকে খাব, খাব।'[১] অন্যত্র—'আমি কে জানিস, আমি সিংহবাহু। সিংহ আমার বাপ। সিংহ সন্তানের রক্ত পান করে জানিস্‌';[২] নাটকে সিংহবাহুর আত্মকাহিনীর মধ্যেও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়—

"সিংহ রাশিতে আমার জন্ম, সিংহ আমার বাপ, সেই সিংহ বধ করে আমার রাজ্য।...এই বন্য সৌন্দর্যের মধ্যে শৈশব কাটিয়েছি—বন্যপশুদের রাজত্বে আমি নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়িয়েছি, বন্য জাতিদের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে লড়েছি। আমার আবার ভয়। এই চেহারা দেখছিস্‌; সিংহের মত না?'[৩]

নাটকে সিংহবাহুর দুই পুত্র বিজয় ও সুমিত্র (পালি সুমিত্ত)। মহাবংসে বিজয় চরিত্র অন্যায়, অত্যাচার ও দুশ্চরিত্রতার কলঙ্কে লিপ্ত। প্রজাবর্গ তাহার অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে রাজা সিংহবাহু পুত্র ও তাহার কুকর্মের সহায়ক শত শত সঙ্গীদের রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। নাট্যকার বঙ্গবীরের জয়শ্রীদীপ্ত চরিত্রকে এতখানি হেয় করিতে পারেন নাই। পুরুষসিংহ বিজয়ের ত্যাগপূত সর্বংসহ পিতৃভক্ত চরিত্র নাট্যকারের কবিকল্পনাকে উদ্বোধিত করিয়াছে। নাট্যকারের বিজয় বীরর্ষভ, পিতার স্নেহভিখারী, বন্ধু ও প্রজাবৎসল। মহাবংসের উপ্‌পলবণ্ণ দেবতা নাটকে লঙ্কার পুরোহিত উৎপলবর্ণ। তিনি বিজয়কে মায়ার অভেদ্য করার জন্য হস্তে সূত্র বন্ধন করিয়া গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়াছেন। পালি কাহিনীর কুবণ্ণা যক্ষী নাটকে রাজকন্যা কুবেণী। তিনি সিংহলের রাণী বসুমিত্রার কন্যা। নাটকে কুবেণীকে বিজয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কুবেণী যাদুদণ্ডের সহায়তায় বিজয়সিংহকে বশীভূত করিয়াছে। পালি কাহিনীতে বিজয় পাণ্ডু রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে রাজ্ঞীপদে অভিষিক্ত করেন। নাটকেও পাণ্ড্যরাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বিজয় লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাহিনীতে অপুত্রক লঙ্কাধিরাজ বিজয়সিংহ জীবনসায়াহ্নে তাঁহার ভ্রাতা

১। সিংহলবিজয়, ৩য় সং, ৪র্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, পৃঃ ১৬৪-৬৫।
২। ঐ, তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, পৃঃ ১০৭।
৩। ঐ, চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, পৃঃ ১৬৪।

সুমিত্তকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। নির্বাসিত পিতৃপরিত্যক্ত বিজয়কে পিতার স্নেহের ক্রোড়ে পুনরাহ্বান জানাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে সুমিত্র লঙ্কায় আসিয়াছেন। পালি কাহিনীতে বিজয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডু বাসুদেব সিংহলের রাজা হইয়াছেন। পাণ্ডুবাসুদেবের বংশধর তিস্‌স যখন সিংহলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তখন জম্বুদ্বীপের সম্রাট অশোকের পুত্রকন্যা—মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্মের উদার বাণী প্রচার করেন। কিন্তু নাটকে বিজয়সিংহই সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক। তিনিই বঙ্গের বৌদ্ধধর্ম সর্বপ্রথম সিংহলে লইয়া আসেন। বৌদ্ধধর্মের মহিমায়, বিজয়ের দানে বঙ্গের বিজয় বিশ্বের বিজয়-এ পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার দানে লঙ্কাবাসী সেইদিন শাশ্বত সত্যের সন্ধান পাইয়াছে—

বঙ্গের বিজয় নহে—বিশ্বের বিজয়।
বঙ্গের গৌতম নয়—বিশ্বের গৌতম।
ঐ দেখ অহিংসায় মোক্ষের সোপান,
দুঃখ ও মৃত্যুর রাজ্য আজি অবসান।
সুখমায়া, দুঃখভ্রান্তি, নিত্য মোক্ষ, নিত্য শান্তি
লও লঙ্কাবাসী। আমি করিতেছি দান।[১]

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের কাহিনী রচনায়ও কেবল হিন্দু পুরাণ ও কিংবদন্তীর উপরই একমাত্র নির্ভর করেন নাই। মহাবংস, দিব্যাবদান ও মহাপরিনির্বাণসুত্ত প্রভৃতি পালি গ্রন্থ হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

অনুরূপা দেবী

অনুরূপা দেবীর রচিত 'কুমারিল ভট্ট' নাটকে অবনমিত বৌদ্ধধর্মের চরম পরিণাম এবং দৃঢ়ব্রত বৈদিক ব্রাহ্মণ কুমারিল ভট্ট কর্তৃক আর্যাবর্তে পুরাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাহিনী লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম তখন মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, সৌগত প্রভৃতি বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের উপদেশের আর ধার ধারেন না—সকলেই স্বেচ্ছাচারী। প্রাচীন বৌদ্ধদের নশ্বরবাদ মহাশূন্যবাদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু দুই-এর মধ্যে পার্থক্য অনেক। বর্তমান বৌদ্ধদের শূন্যবাদ যে কি বস্তু নাটকে কুমারিল ভট্ট

১। ঐ, পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য, পৃঃ ২২২।

তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'শম নাই, দম নাই, উপরতি নাই, তিতিক্ষা নাই, বিবেক-বৈরাগ্য কিছুই নাই—এক কথায় শরীর বা মনের কোন প্রকার কৃচ্ছ্র-সাধনেরই আর আবশ্যক করে নাই, পঞ্চ কামোপভোগ স্বভাবতঃ কামাভিলাষী মানবচিত্তে বাসনা-বহ্নি প্রজ্জলিত করে, সেই অনলের হবনরূপে তাদের দহন করাই এখনকার সর্বপ্রধান ধর্মসাধনা।'[১] বৌদ্ধসঙ্ঘের শ্রমণদের চরম উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। তাহারা সুরাপান, বাদ্যগীত এবং রাজভোগ আহারে অভ্যস্ত। এমন কি নারীর জন্য শ্রামণ্যধর্ম বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। বৌদ্ধধর্মের এই চরম অবনতিতে দেশব্যাপী এক প্রলয় ঝড় উঠিয়াছে। কুমারিল বুঝিয়াছেন এই প্রলয়ের শেষ শান্তি নয়, মৃত্যু। কারণ এখন বৌদ্ধধর্মে 'আর ধর্মের সুধা প্রবল নাই, দুগ্ধ যেমন বিকৃত মূর্তিতে অপেয় হয়, মধু মদ্যে পরিণত হয়ে যায়, তেমনি এও এখন গরলে পরিণত হয়ে দেশের প্রাণসংহার করবার জন্য তার দেহরক্তের মধ্যে মিশে যেতে বসেছে।'[২] অবশেষে আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ আশ্রমে বৌদ্ধাচার্য দিঙ্নাগের শিষ্যরূপে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ পায়—তাঁহার বৌদ্ধাচার ভাণ মাত্র, উদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ়ার্থ সংগ্রহ করিয়া বৌদ্ধদের পরাভব পূর্বক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

নাটকে ধর্মদ্বন্দ্ব দেশের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করিয়াছে। বৌদ্ধরাজা উজ্জয়িনী নৃপতি বৌদ্ধ জালন্ধর নৃপতিকে সাহায্য করিয়াছেন কিন্তু রুদ্রপুরের রাজা শৈব উগ্রসেন পার্বত্য খস জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উজ্জয়িনীরাজের সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই। মণিকর্নিকার চক্রতীর্থ লইয়া ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে কাশীরাজ জয়ন্ত এক বিশেষ সম্মানিত শ্রমণকে শাস্তি প্রদান করেন এবং সমস্ত বৌদ্ধজগতের মনোবেদনার কারণ হইয়া উঠেন। দেবোপাসক রাজা বিক্রমাদিত্যের কীর্তি বলিয়া মহাকালের মন্দির বৌদ্ধ রাজার পক্ষে সংস্কার করা অনুচিত—রাজসভায় এই মত গৃহীত হইয়াছে।

সমগ্র ভারতব্যাপী এই চরম দুর্যোগের দিনে অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন আর্যাবর্তে কুমারিল ভট্ট বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রচার আরম্ভ করেন।[৩] পণ রাখিয়া কাশীরাজ

১। অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, বসুমতী, পৃঃ ৩৩১।

২। ঐ, পৃঃ ৩৩২। ৩। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য প্রভৃতি প্রখ্যাত আচার্যদের আবির্ভাব ঘটে। ইঁহাদের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও অখণ্ড যুক্তিবলের নিকট মাধ্যমিক

সভায় কুমারিল ও বৌদ্ধাচার্যের মধ্যে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হয়। কুমারিল বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করিলে সশিষ্য বৌদ্ধাচার্য বেদমার্গ গ্রহণ করেন। কুশীনগরের সঙ্ঘাচার্য দিঙ্‌নাগকেও কুমারিল তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। এইবার পণ পরাজিতকে তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। তর্কে দিঙ্‌নাগাচার্য পরাজিত হইলেন এবং মৃত্যু বরণ করিলেন। কুমারিলের পাণ্ডিত্যে এবং তর্কের কূটনীতিতে মুগ্ধ হইয়া অবন্তীরাজ সুধন্বাও বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করিলেন।

এই নাটকে অবনমিত বৌদ্ধধর্মের এক ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাহারই পরিণাম কুমারিল ভট্ট কর্তৃক বৌদ্ধমতবাদ খণ্ডন এবং আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ্যধর্মের গৌরবপূর্ণ বিজয়বাণী পুনঃপ্রচার।

জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত Maritime Activities of India গ্রন্থ এবং রাজনারায়ণ বসুর মধুসূদন দত্তকে 'সিংহল বিজয়' কাব্য লিখিবার জন্য অনুরোধ পত্র তাঁহাকে 'সিংহল বিজয়' নামক নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। মহাবংস প্রভৃতি সিংহলী সাহিত্যের প্রভাবে এই নাটকের কাহিনী বিশেষ নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। লঙ্কাদ্বীপে অশোকের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু এই নাটকে বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। বিজয়সিংহের জীবনব্রত—

যত স্থান সুদূর সাগর মাঝে, গিয়া
তথা বিতরিব জ্ঞানালোক। অজ্ঞান ও
তিমিরাচ্ছন্নজনে শিখাইব মহিমা
বুদ্ধের, লয়ে আনি সভ্যতা আলোক।[১]

বিজয়সিংহ নাটকে লালপুরের রাজা সিংহবাহুও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ বৌদ্ধধর্ম প্রচার বাসনায় ব্রাহ্মণদের উপর উৎপীড়ন করিলে তিনি স্বীয় পুত্রকে নির্বাসিত করেন। মহাবংসে নির্বাসিত রাজপুত্র বিজয়সিংহ কুবন্না যক্ষীর সহায়তায় যক্ষদের নিহত করিয়া লঙ্কার সিংহাসন অধিকার

ও যোগাচার উভয় সম্প্রদায় পর্যুদস্ত হইতে থাকে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। পরিণামে বৌদ্ধধর্ম হীনবল হইয়া সমাজের উচ্চস্তর হইতে বিদায় গ্রহণ করে এবং নিম্নস্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করে।

১। সিংহল বিজয়, ১৩১৯, ১ম অঙ্ক, পৃঃ ১৮।

করিয়াছেন। 'সিংহল বিজয়' নাটকে 'কুবেণী' কুবন্না যক্ষীর উন্নততর সংস্করণ। সে যক্ষী নহে, সর্দারকুমারী। কুবেণী বেলাভূমিতে মূর্ছাহত বিজয়সিংহকে শুশ্রূষা করিয়া জীবন দান করিয়াছে, তাহারই সহায়তায় বিজয়সিংহ যাস্ককে পরাজিত করিয়াছেন। মহাবংসে তাহার স্বদেশবাসী যক্ষগণের হাতেই কুবন্না যক্ষীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। নাটকেও কুবেণীর মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার পিতার পালিত পুত্র লঙ্কাবাসী যাস্কের আঘাতে। বিজয়সিংহের লঙ্কাজয়ে বিজয়ীর দর্প অপেক্ষা ধর্মপ্রচারকের আকৃতি অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। বিজীত লঙ্কাবাসীদের প্রতি বিজয়সিংহের বাণী প্রণিধানযোগ্য—

প্রেম অবতার
বুদ্ধদেব দয়া করেছেন তোমা 'পরে।
আমি দাস তাঁর, বিলাইতে সে রতন
গৃহে তব আসিয়াছি হেথা।
… … …
ভারতের কূল ছাপি আসিয়াছে, সেই
প্রেমবন্যা তোমাদের মাঝে, ধর ধর,
পিয়, সবে আজি সেই প্রেমসুধা।[১]

মহাবংসে আছে বিজয়সিংহের প্রার্থনায় পাণ্ডুরাজ তাঁহার কন্যা এবং কন্যার সহচরীদের বহুধনরত্নসহ সিংহলদ্বীপে প্রেরণ করেন। বিজয়সিংহ পাণ্ডু-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন ও তাঁহাকে প্রধানা মহিষীপদে অভিসিক্ত করেন এবং রাজকুমারীর সহচরীদের তাঁহার সঙ্গী বঙ্গসৈনিকদের অর্পণ করেন। নাটকেও এই ঐতিহ্যের স্বীকৃতি বজায় আছে।

সিংহবাহুর দ্বিতীয় পুত্র সুমিত্র ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষক ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণের চেষ্টা করেন। অজপার বৌদ্ধ-মঠধারী ভিক্ষুগণ রাজার যজ্ঞাশ্ব বাঁধিয়া নিজপ্রাণের বিনিময়ে হিংসাপূর্ণ যজ্ঞে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে রাজগুরু শুভঙ্করের মধ্যস্থতায় ইহার নিষ্পত্তি ঘটিয়াছে। তিনি কুশনির্মিত অশ্বে যজ্ঞ সমাপন করিয়াছেন। বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রতি তাঁহার শেষবাণী ভবিষ্যৎবাণীতে পরিণত হইয়াছে—

শুন বৌদ্ধগণ।
আর্যভূমি মাঝে সনাতন আর্যধর্ম না হবে নিধন কভু
রুধিয়া সে আর্যধর্ম, হবে বিতাড়িত আর্যাবর্ত হতে।[২]

১। সিংহল বিজয়, ৪র্থ অঙ্ক, পৃঃ ১০৭-১০৮। ২। ঐ, ৫ম অঙ্ক, পৃঃ ১৩০।

অবশেষে বৌদ্ধভিক্ষুগণও লালদেশ ত্যাগ করিয়া সিংহল দ্বীপে উপনীত হইয়াছেন।

অসিত হালদার

অসিত হালদার তাঁহার 'কুনাল' নামক একাঙ্কিকায় বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত অশোক ও কুনাল আখ্যানের ভাব ও বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়া এক নূতন রসলোক সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। এই নাটিকায় মহারাজ অশোকের চারিজন মহিষীর নাম পাওয়া যায়—অগ্রমহিষী অসন্ধিমিত্রা এবং পদ্মাবতী, কারুবাকী ও তিষ্যরক্ষিতা। ইহাদের নাম অশোকের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া বৌদ্ধসাহিত্যে ও অশোক অনুশাসনে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। মহাবংসে অশোকের অগ্রমহিষী অসন্ধিমিত্তা, দিব্যাবদানে অশোকের তৃতীয়া মহিষী এবং ধর্মবিবর্ধন বা কুনালের জননী পদ্মাবতী, অনুশাসনে দ্বিতীয়া দেবী তীবরমাতা কারুবাকী এবং মহাবংস ও দিব্যাবদানে অশোকের সর্বশেষ প্রধানা মহিষীরূপে তিষ্যরক্ষিতা স্থান পাইয়াছেন। নাটকে অশোকের পুত্রকন্যারূপে কুনাল, চারুমতী, জালাউক ও তীবরের নাম পাওয়া যায়। নাটকে রাজকন্যা চারুমতী অগ্রমহিষী অসন্ধিমিত্রার কন্যা এবং জালাউক ও তীবর দ্বিতীয়া দেবী কারুবাকীর সন্তান। কিন্তু অশোক অনুশাসনে কারুবাকী কেবল তীবর-মাতারূপে পরিচিতা। জালাউক একমাত্র কাশ্মীরী ঐতিহ্যে স্বীকৃতি পাইয়াছেন। নাটকে মহেন্দ্র অশোকের পুত্র নহেন, ভ্রাতা। অশোকের সমস্ত পুত্রদের মধ্যে কুনাল তীর চালনায়, অসি সঞ্চালনে, ধনুর্বিদ্যায় ও সর্বপ্রকার অস্ত্রকৌশলে শ্রেষ্ঠ। কুনাল কাহিনীর মূল উৎসে অশোকের মহিষী তিষ্যরক্ষিতা কুনালের কুনালপক্ষীর ন্যায় মনোরম চক্ষুর সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কুনালের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কুনাল নাটকেও তিষ্যরক্ষিতার উক্তিতে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিষ্যরক্ষিতা বলিয়াছেন—

'কুনালের বাঁশীর স্বর বা তার পদ্মপলাশ চোখ দুটো দেখলেই আমার সর্ব অঙ্গে যেন অগ্নি সঞ্চার করে।'[১] মূল উৎসে তিষ্যরক্ষিতা কুনালের নিকট উপেক্ষিতা হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। নাটকেও তিষ্যরক্ষিতা সপত্নী-পুত্র কুনালের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণা বিমাতা। অবশেষে বিমাতার

১। কুণাল, ১৩৩৭, পৃঃ ৩।

ষড়যন্ত্রে তক্ষশীলার শাসনভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহারই ষড়যন্ত্রে কুনালের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে নির্বাসিত করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সম্রাট্ অশোকের নিকট তাঁহার মৃত্যু সংবাদও প্রদান করা হইয়াছে। মূল উৎসে কুনালের পত্নী কাঞ্চনমালা। অন্ধ কুণালকে সে-ই পথ দেখাইয়া তক্ষশীলা হইতে পাটলিপুত্রে লইয়া আসিয়াছে। নাটিকায় অন্ধকুনালের সঙ্গিনী কাঞ্চনমালা নহে, ঋতা—বণিক মধুদত্তের কন্যা। ঋতা পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে আর কুনাল পিছনে পিছনে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইয়াছে। পরে এই বিদুষী ও রূপসী বণিককন্যার সঙ্গে কুনালের বিবাহ হইয়াছে। মূল উৎসে কুনাল চরিত্র ত্যাগে ও ক্ষমায়, বৈরাগ্যে ও সহনশীলতায় এক মহিমময় স্তরে উন্নীত হইয়াছে। কুনাল নাটকেও সেই মূল সুর অব্যাহত রহিয়াছে। নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য বিমাতাকে দায়ী না করিয়া নিজের ভাগ্যকেই সে দায়ী করিয়াছে। পিতাকে বলিয়াছে—"আপনি—আমার জনক। আপনার আদেশে এই অধম বিধিলিপির ফলভোগ করেছে মাত্র।"[১] মূল কাহিনীসমূহে কুনালের পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ তাঁহার সত্যক্রিয়ার এবং ক্ষমা ও দুরূহ তপস্যার পুরস্কার। কিন্তু নাটকে নাট্যকার করুণাকেই শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছেন। কুনালের চক্ষু উৎপাটন—তিষ্যরক্ষিতার পাপমনের নৃশংসতার পরিচায়ক। মহাকরুণার প্রবাহে সেই কলুষ কালিমা ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে এবং কুনালের চক্ষু আবার সৌন্দর্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। বৌদ্ধ করুণার মহিমা ও স্বরূপ এই ঘটনায় চিরন্তন মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে। এই মহান যজ্ঞের নাম ভগবান তথাগতের করুণবাণী ঘোষণার যজ্ঞ। তথাগতের করুণবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ করুণাবিগলিত হৃদয়ে যে অশ্রুবিন্দুপাত করে প্রত্যেকে তাহা নিজ নিজ পাত্রে সংগ্রহ করিয়া মহাথের মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের সম্মুখস্থ পাত্রে জমা দিয়াছে। সেই করুণাবিগলিত অশ্রুধারায় মহাথের অন্ধ কুনালের চক্ষু ধৌত করিয়াছেন। বিশ্বের কল্যাণ আদর্শে প্রণোদিত হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় বিধৌত হইয়া অন্ধ কুনাল আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। এইভাবে করুণার মহাধারায় তিষ্যরক্ষিতার পরম নৃশংসতার নিদর্শন নিঃশেষে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

১। কুনাল, পৃঃ ৭৪।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
উপন্যাস ও ছোটগল্প

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্প এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই পর্যায়ের রচনায় দেশকালনিরপেক্ষ মানবহৃদয়ের বাণী, তাহার হাসিঅশ্রু ও সুখদুঃখের বাস্তব চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বৌদ্ধ জাতক

পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যেই উপন্যাস ও আখ্যান রচনার প্রথম অঙ্কুরোদ্‌গম হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে কথাসরিৎসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি, পঞ্চতন্ত্র এবং বৌদ্ধ জাতক ও অবদানের মধ্যে বাংলা উপন্যাসের মৌলিক উপাদানসমূহ নিহিত রহিয়াছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে সংস্কৃত সাহিত্য অপেক্ষা বৌদ্ধ জাতকের গুরুত্ব অধিকতর। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চতন্ত্র ও জাতকের আলোচনা করিয়া বাস্তব জীবনের চিহ্ন, বাস্তব সমস্যার ছাপ ইত্যাদি বিষয়ে পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা জাতকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[১] তাঁহার মতে 'বৌদ্ধ জাতকগুলির মধ্যে এই বাস্তবতার রেখা স্পষ্টতর ও গভীরতর হইয়া দেখা দেয়। বস্তুতঃ সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্যের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তুলনায়, বাস্তবতার সুরটি অধিকতর তীব্র ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বোধ হয় ইহার একটি কারণ এই যে, বৌদ্ধধর্ম অনেকটা গণতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত, ইহা হিন্দুধর্মের সনাতন শ্রেণীবিভাগগুলি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া মানুষকে একটি নূতন ঐক্য ও সাম্যের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং চিরপ্রথাগত রাজন্য ও অভিজাতবর্গের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া মধ্যশ্রেণীর লোকের বাস্তব জীবনকে নিজ বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।'[২] সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে জাতকই ইহার বাস্তবতা গুণের জন্য বাংলা উপন্যাসের অঙ্কুরোদ্‌গমের সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্যকারী হইয়াছে।

বর্তমান অধ্যায়ে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশ এবং বৌদ্ধ ভাবধারা কতখানি বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা আলোচিত হইল। এই কার্যে প্রথম অগ্রসর হইয়াছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশে তিনিই প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাসের জন্ম দান করেন।

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৬৯, পৃঃ ৩—১১।
২। ঐ, পৃঃ ২।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

স্বর্গত শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'বেনের মেয়ে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'বেনের মেয়ে ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়।······বেনের মেয়ে একটা গল্প।'[১] 'বেনের মেয়ে' খৃঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় রচিত সহজিয়াতন্ত্রের উপন্যাস। এই উপন্যাসে হরপ্রসাদ সহজযানী বাংলার এক মনোরম ছবি আঁকিয়াছেন। সেযুগের বাংলায় হিন্দু-বৌদ্ধ জীবনবাচ্যের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য থাকা সত্বেও বাঙালীর মূল জীবনসাধনায়—তাহার নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক সমন্বয় ঐতিহ্যই প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে বাঙালী নরনারী শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে পারস্পরিক মিলন ও সমন্বয় দ্বারা পূর্ণায়ত সার্বিক জীবনাদর্শের জয় ঘোষণা করিয়াছিল। উপন্যাসে মহারাজাধিরাজ হরি বর্মা ধরমবিহার অধিকার করেন, কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ধর্মস্থানে কোন অত্যাচার করেন নাই। মহারাজাধিরাজ হরিবর্মা 'গুণীজন মহাসভাও' আহ্বান করেন। এই সভায় সনাতন-ধর্মে বিশ্বাসী হরিবর্মা হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ নির্বিশেষে দেশ, জাতি, সম্প্রদায় নির্বিচারে গুণীজনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। বৌদ্ধ কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, সূত্রধর, স্বর্ণকার, জ্যোতিষী ও চিকিৎসকগণকেও তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন। গুণীজন সমাগমে বাংলাদেশ ভারতীয় ঐতিহ্যের সমস্ত বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যকণিকা আহরণ করিয়া তাহার যথার্থ মূল্যদান করিয়াছে। এই সৃষ্টিকল্পনায় হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্য যেন এক সুরে, সৌন্দর্যে ও সুষমায় একাত্ম হইয়া গিয়াছে। অনন্ত-শয়ানে নারায়ণ ও মহাপরিনির্বাণে বুদ্ধদেব মূর্তি রূপায়ণে পরমসত্য দ্বিরূপে একই রূপদক্ষের তুলিকায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সর্বাত্মক বঙ্গ সংস্কৃতির বাহক রাজা হরিবর্মা দুইটি চিত্রকেই শ্রদ্ধাবনত স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। এই মহাসভায় বিষ্ণু, লোকেশ্বর, জ্যোতির্লিঙ্গ শিব মূর্তি সোনার তাড়ের গায়ে দশ অবতার, হাতীর দাঁতের মুখ, মন্দিরের শিলাপাত্র, দানপাত্র, অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা, চক্রসম্বরতন্ত্র, হিন্দু-বৌদ্ধ কবির কাব্য-কবিতা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় ঐতিহ্যরূপে রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এইভাবে গুণীজন সমাগমের বৃহত্তম মিলনভূমিতে বাঙালী হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন নির্বিশেষে বিভেদ বন্ধনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে পূর্ণায়তির ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছে। এই যুগে সমাজজীবনে ও ধর্মীয় জীবনেও হিন্দু-

১। হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, বসুমতী, ১৯১৯, মুখপাত।

বৌদ্ধগণ পারস্পরিক আদান-প্রদান দ্বারা গ্রহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে তাহার সার্থক স্বীকৃতি পাওয়া যায়। সেকালের হিন্দুরা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুযায়ী দশকর্ম শান্তিস্বস্ত্যয়ন করাইতেন আবার বৌদ্ধ-মন্দিরে পূজা দিয়া ও বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ও করিতেন। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে সাতগাঁ বিহারের মহাস্থবির শান্তশীলের আশীর্বাদে বিহারী বেনের কন্যা সন্তান লাভ করিবার কথা আছে। হিন্দুর বাড়ীতে অসুখে ব্রাহ্মণ ভিষক যেমন আসিতেন, সজ্ঘ বৈদ্যকেও তেমনি ডাকা হইত। নাগরিকগণ মন্দিরে বিহারে একই সঙ্গে হেরুক, বুদ্ধ-বিষ্ণু-শিব মূর্তির পূজা করিত আবার সন্ন্যাসী যোগী-সিদ্ধাচার্যের সেবা করিত। হিন্দুদের সামাজিক অনুষ্ঠানে—বিবাহে, জাতকর্মে, পোষ্যগ্রহণে বৌদ্ধগণও আমন্ত্রিত হইতেন। গৃহস্থ শুভ কর্মারম্ভের পূর্বে ব্রাহ্মণ ও প্রাচীনদের সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও অনুমতি গ্রহণ করিতেন। বৌদ্ধভিক্ষুগণও মঠের পুষ্প চন্দন এবং আর্থিক অবস্থানুযায়ী আশীর্বাদী প্রদান করিতেন।

বৌদ্ধগণ হিন্দুদের ন্যায় দোলোৎসব উদ্‌যাপন করিতেন। রাজা হরিবর্মার আদেশে রাজসভার একদিকে হিন্দু, অপরদিকে বৌদ্ধদের দোলোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। থেরীরা এবং শক্তিসহ ভিক্ষুরা প্রকাশ্যভাবে দোল খেলিতেন। ফাগের ব্যবহার দুই দিকে সমানভাবেই চলিত।

'বেনের মেয়ে' উপন্যাসের রূপাবয়বের মধ্যে লেখক বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের ধর্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য, তাহাদের ব্যক্তিসম্পর্কাশ্রিত গুহ্য সাধন-জীবন এবং সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনস্মৃতির যুগচিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি যেমনি জীবন্ত তেমনি রূপময়। বৌদ্ধ গাজন ও বিহার প্রতিষ্ঠার একটি সর্বাবয়ব চিত্র উপন্যাসের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত রূপারাজার রাজত্বে ধরমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এক গাজনের শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। সম্যক্‌সম্ভোজনেরও একটি সুস্পষ্ট চিত্র উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে। সম্যক্‌সম্ভোজনে কেবল ভিক্ষুভিক্ষুণী, নাঢ়া-নাঢ়ীগণই নহেন, বৌদ্ধ দেবদেবীগণও হাজির হইতেন। রূপারাজার আয়োজিত এই উৎসবে প্রজ্ঞা, উপায়, তারা, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ, বজ্রতারা, বজ্রবরাহী, বজ্রযোগিনী, বজ্র-ধাত্বীশ্বরী, লোকেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, গগনগঞ্জ, আকাশগর্ভ, ক্ষিতিগর্ভ প্রভৃতি বোধিসত্ত্বগণ এবং অর্ধ-বুদ্ধ অর্ধ-অসুরমূর্তি চণ্ডরোষণ প্রভৃতি দেবদেবীগণও আছেন, তাঁহাদের দেহ

সোনার পাতে মোড়া, প্রত্যেকের মাথায় রেশমের ও পশমের ছত্র, ঝালর হইতে মুক্তা ঝুলিতেছে, সম্মুখে চাদর পাতা। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী নাঢ়া-নাঢ়ীগণের সম্মুখেও চাদর প্রসারিত। রাজা বুদ্ধ ও ধর্মমূর্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া উপবেশন করিলে সাধুগুপ্ত ও শ্রীফলবজ্র তারাদেবীর স্রগ্ধরা স্তোত্র গান করিলেন। সম্যক্ সম্ভোজনে রাজা প্রথমে প্রজ্ঞা ও উপায় এবং অন্যান্য দেবদেবীদের স্বর্ণখণ্ড দান করিলেন, পরে ভিক্ষুভিক্ষুণী, নাঢ়া-নাঢ়ীগণও প্রচুর রাজদান পাইলেন। রাজার দানকার্য শেষ হইলে সহজিয়া উপাসক উপাসিকা-গণও দান করিলেন। অবশেষে রূপারাজা যুগনদ্ধ প্রতিমা শ্রীহেরুকের নামে মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া 'কলিযুগ পাবন সাক্ষাৎ গৌতমবুদ্ধের ন্যায় সিদ্ধাচার্য শ্রীশ্রী ১০৮ লুইপাদদেবকে তাহা দান করেন। ধরমপুর মহাবিহারের উপরে নীচে চারিশত ঘর, মধ্য অঙ্গনে যুগনদ্ধ হেরুক মন্দির, সম্মুখে বুদ্ধ মন্দির ও নাটমন্দির। বুদ্ধমন্দিরের অভ্যন্তরে অশোক রাজার ছোট্ট একটি চৈত্য, নাটমন্দিরের বাহিরে শাক্যসিংহের মূর্তি। প্রত্যেক প্রতিমার মস্তকে আচ্ছাদন, প্রতিমাসমূহ বারেন্দ্রভূমির ভাস্করের তৈরী। বিহার ও ভিক্ষুভিক্ষুণীদের ব্যয়ভার বহনের জন্য রূপারাজা ৫০ খানি গ্রামও গুরুদেবকে দান করেন। বুদ্ধদেব যেমন ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য অনাথপিণ্ডদের জেতবন, বিম্বিসারের বেণুবন দান অনুমোদন করিয়াছিলেন, তেমনি সহজসঙ্ঘের কল্যাণের জন্য লুইপাদও রূপারাজার দান গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মতে স্বয়ং শাক্যসিংহ গৌতম যাহা করিতে পারেন নাই, লুইপাদ জগতের সেই মহোপকার সাধন করিয়াছেন। গৌতমের নির্বাণ বহুজন্মব্যাপী, বহু আয়াসসাধ্য ধ্যানধারণা, তপজপ ও কঠোর সাধনার ফল, কিন্তু লুইপাদের নির্বাণ অতি সহজ। বাংলাদেশে সহজিয়া শিষ্যদের নিকট তিনি সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন। ভোটদেশ, মঙ্গলদেশ, নেপাল, সুবর্ণদ্বীপ ও হংসদ্বীপে লুইসিদ্ধার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই সমস্ত দেশে বৌদ্ধগণ তাঁহার সোনার, পাথরের ও অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তির পূজা করিত এবং তাঁহার নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা, যাত্রা ও মহোৎসব করিত। লুইসিদ্ধা রাজহস্তির পৃষ্ঠে চড়িতেন, লম্বা দাড়ি রাখিতেন, গায়ে আলখাল্লা পরিতেন, আলখাল্লার গায়ে ছোট ছোট নানা রঙের রেশমের, পাটের ও বাকলের টুকরা লাগানো থাকিত। গুরুপুত্রের পোশাকের বর্ণনা হইতেও জানা যায় এই সময়ে বৌদ্ধ সহযাচার্যগণ রঙিন ত্রিচীবর পরিধান করিতেন বটে, কিন্তু সেই চীবর রেশমে প্রস্তুত হইত এবং আঁচলায় ও পাড়ে চুমকীর কাজ থাকিত। এই সময়ে

বাংলায়, মগধে ও উড়িষ্যায় বৌদ্ধগণ শিল্পকলা ও বিদ্যাচর্চায় শ্রেষ্ঠস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র বৌদ্ধমঠেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে। কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র নহে, সমস্ত শিল্প ও কলা—কার্পাস বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র বয়ন, চিত্রকার্য, ভাস্কর্য, শিলালিপি, সোনার গহনা, কাঠের নকসা, সঙ্গীত প্রভৃতিতে বৌদ্ধগণ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ভাস্কর্যে বৌদ্ধদের খ্যাতি সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। ব্রাহ্মণগণ দেবভাষার চর্চা করিতেন, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষু ও পণ্ডিতগণ দেশীভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেন।

পূর্বে গৃহস্থাশ্রম হইতে মানুষ মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভিক্ষুভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিতেন। এখন ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুগণ সমাজে আসিতে চাহিতেছেন কিন্তু সমাজ তাহাদের স্থান দিবে কোথায়? পূর্বে সঙ্ঘে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর মিলন অবাধ ছিল না। এখন ভিক্ষুরা শক্তি গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতেছে। তাহাদের অবৈধ সন্তান এত বাড়িয়া গিয়াছে যে সঙ্ঘের পক্ষে পোষণ করা কষ্টকর। হিন্দুসমাজেও তাহাদের স্থান নাই। একজন বৌদ্ধ-রাজা এইরূপ সমাজ-পরিত্যক্ত ভিক্ষুণী সন্তানদের 'যুগী' উপাধি প্রদান করিয়া কাপড় বুনিবার ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা কামনারহিত ছিলেন না। থাকার প্রয়োজনও বোধ করিতেন না। সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রয়োজনে তাঁহারা শক্তি গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের মতে পরকীয়া শক্তিই প্রকৃত শক্তি। যদি স্বেচ্ছায় কোন নারী বৌদ্ধ ভিক্ষুর যোগিনী হইতে না চাহিত তবে তাহার উপর বলপ্রয়োগ করাও দূষণীয় ছিল না। সমাজে ভিক্ষুণীদের স্থান সম্মানার্হ ছিল না। কারণ ভিক্ষুণীসঙ্ঘে যোগদান করিলে মেয়েদের স্বভাবচরিত্র ভাল থাকিত না, তাহারা লজ্জা সরম বিসর্জন দিয়া একেবারে অধঃপাতে যাইত।

বৌদ্ধসঙ্ঘের নিয়মানুসারে ভিক্ষুসঙ্ঘই ভিক্ষুর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু স্বেচ্ছায় তখন কেহ ভিক্ষুসঙ্ঘে বড় একটা যোগদান করিতে চাহিত না। ভিক্ষুগণ সম্পত্তির লোভে রাজার সন্তান, বণিকের উত্তরাধিকারী বা অবস্থাপন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে চুরি করিয়া সঙ্ঘে লইয়া আসিতেন এবং দীক্ষাদান করিয়া সঙ্ঘভুক্ত করিয়া ফেলিতেন। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে রাজার পুত্রকে লুইপাদ গোপনে আনয়ন করিয়া সহজসঙ্ঘের শিষ্যভুক্ত করিয়াছেন। মায়াকে ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশ করাইবার জন্যও বৌদ্ধদের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়া যায়। মহাযান, বজ্রযান,

সকলেরই এক চেষ্টা মায়াকে নিজ দলে পাইতে হইবে। কারণ মায়াকে নিজদলের ভিক্ষুণী করিতে পারিলে মায়ার ও তাহার পিতা বিহারীর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যাইবে। এই সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা ব্যবসা-ব্যণিজ্য সম্পাদন করিতেন। সঞ্চিত ধন তাঁহারা নিজেদের ভোগবিলাস ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ব্যয় করিতেন। সহজাচার্যদের নিকট সৌগত আদর্শের ইন্দ্রিয়দমন, বুদ্ধত্ব লাভ, নির্বাণ ইত্যাদি মূল্যহীন ও নিষ্প্রয়োজন-রূপে বিবেচিত হইত। তাহাদের মতে নির্বাণ যদি শূন্যতা হয় তবে তাহার আর আবশ্যকতা কি? তাহা পাথর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সুখদুঃখ, ধর্মাধর্মের অতীত জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য 'শূন্য' হইয়া কি প্রয়োজন? 'নির্বাণ'কেও তাঁহারা মানিতে রাজী নহেন, তাঁহারা বৌদ্ধ নির্বাণের জায়গায় মহাসুখবাদের আমদানী করিয়াছেন। মহাসুখই সারবস্তু। শাক্যসিংহ এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কারণ তিনি জন্ম-জরা-মৃত্যুর হাত হইতে মানুষকে উদ্ধারের পথই খুঁজিতেছিলেন। এই অবস্থার পর কি হইবে তাহা তাঁহার চিন্তার অতীত ছিল। ইঁহাদের শূন্যতা দেবী, সাধক ভৈরব। সাধক আর সাধিকা দুই-এ জলে লবণে মিশিয়া অনন্তকাল মহাসুখের অধিকারী হইলেন—ইহাই সহজধর্ম। এই সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুভিক্ষুণীগণ প্রাচীন বৌদ্ধসঙ্ঘের বিকাল ভোজনের নিষেধও যথাযথ পালন করিতেন না। মঠের বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যক্ষ প্রভৃতি কয়েকজন ভিক্ষু ব্যতীত অধিকাংশই দুইবেলা আহার করিতেন। বৌদ্ধদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ছিল না। মহাযানীরা অন্য কোন যানকেই শ্রদ্ধা করিতেন না, প্রত্যেক যানই স্ব স্ব উন্নতি ও স্বার্থের বিষয়ে ব্যস্ত থাকিত। শ্রীফলবজ্র লুইসিদ্ধার উপর আবার লুইসিদ্ধা নাঢ়পণ্ডিতের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। অবশ্য উপন্যাসে রূপারাজার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য জাগরণে সকল বৌদ্ধই মনের বিষ চাপিয়া সহজিয়া বৌদ্ধ উপাসক রূপারাজার পক্ষ অবলম্বন করেন।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের কীর্তন এই সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। খুলিদের খোলের চাটি, খঞ্জনীর খরতাল ও শিঙ্গার ফুৎকারের সাথে একতানে কীর্তনীয়াদের কণ্ঠের সহজিয়া পদের গান এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করিত। গানের সুরের ঐকান্তিকতায় সহজিয়া পদের ভাবের গভীরতায় এক ক্ষণস্থায়ী আনন্দলোক যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিত। লেখকের ভাষায় সহজিয়া বৌদ্ধগণ 'এই ক্ষণিক সুখকে নিত্যসুখ করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হয়। একাগ্র হয়—মনে করে যদি এইভাবে চিরদিন থাকিতে পারি, এইভাবে এই সুর নিরন্তর

কানে বাজে, এইরূপ প্রেম যদি নিত্য হয়, এইরূপ সুখ যদি নিত্য হয়, এইরূপ মোহ যদি নিত্য হয়, এইরূপ মোহিনীও যদি নিত্য হয়, সেই ত নিত্যানন্দ, সেই ত নির্বাণ, সেই ত শূন্যময়, বিজ্ঞানময়, মহাসুখময় নিত্য বুদ্ধভাব, সেই ভাবের জন্য তাহারা পাগল হইয়া উঠে, উন্মাদ হইয়া উঠে।'[১] প্রাচীন বৌদ্ধ নির্বাণ এই ক্ষণসুখের মধ্য দিয়া গায়কের ও শ্রোতার প্রাণে ক্ষণ-আভাস প্রদান করিত।

'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে খৃঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ বিহার ও মঠসমূহের পরিণতির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মগধ তখনও বৌদ্ধপ্লাবিত দেশ। মগধের রাজধানী ওদন্তপুরী, এখানের বিহারের চূড়া গগনস্পর্শী। এই বিহারের দ্বার বহু ক্রোশ দূর হইতে পথিকের নয়নগোচর হইত বিহারে একসঙ্গে দুই হাজার ভিক্ষুর বাসের ব্যবস্থা ছিল, ভাণ্ডারে বহু খাদ্য সংগ্রহ থাকিত। বিহারের অভ্যন্তরে প্রচুর মূল্যবান সম্পত্তি হীরা, পান্না, নীলায় অলঙ্কৃত বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব মূর্তি, সোনারূপার তৈয়ারী প্রতিমাও প্রচুর। রাশি রাশি তালপাতার পুঁথি, সিন্দুক ভর্তি রঞ্জিত রেশম বস্ত্র, অসংখ্য নিশান ও আরতির সরঞ্জাম, যাত্রার উপকরণও থাকিত। দুই শত বৎসর পরে মহম্মদ বক্তিয়ার এই বিহারের মহামূল্য সম্পদ্‌রাজি সত্তরটি অশ্বে বাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। মগধের অন্যান্য বিহারে তখন কবি দার্শনিক ও শিল্পীর অভাব ছিল না। নগরে নগরে কষ্টিপাথরের থাম, থামের গায়ে বিচিত্র কারুকার্য, বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব ও নানা দেবদেবীর মূর্তি। খৃঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নালন্দার পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ না থাকিলেও তাহার শেষ আলোকচ্ছটায় বিদেশীয়গণ মুগ্ধ হইতেন। নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ সর্বজ্ঞ পণ্ডিত বালাদিত্য বিহারের সর্বোচ্চ তলায় বাস করেন। বিহারবাসী ১২ জন চাকর পালা করিয়া দিবারাত্রি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকে। সর্বজ্ঞ পণ্ডিত মহাযানপন্থাবলম্বী, বালাদিত্য বিহার ও নালন্দা বিহার তাঁহার নির্দেশানুযায়ী পরিচালিত হয়।

রাজগৃহের মনিয়ার মঠে এবং গৃধ্রকূটে বহু ভিক্ষু গভীর সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। বোধগয়ার মন্দির তখন প্রায় অসংস্কৃত অবস্থায়। বোধিবৃক্ষের শিকড়ে মন্দিরে ফাটল দেখা দিয়াছে, ফল্গু নদীর বালির তলায় মন্দিরের চারিদিকের রেলিং প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে। কাশী হিন্দু ও বৌদ্ধ দুইটি ছোট

১। হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, বসুমতী, ১৯১৯, পৃ ১৮৪-১৮৫।

ছোট নগরে বিভক্ত ছিল। বৌদ্ধ মৃগদাবে দুইটি স্তূপ, একটি ১৬০ ফুট উঁচু। স্তূপের গাত্রে উজ্জ্বল পলস্ত্রা, মাথায় সোনার ছাতি, অর্ধনীমিলিত চারি জোড়া চক্ষু ধ্যানমগ্ন। এই স্তূপ বর্তমানে একেবারে ধ্বংসীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহার পার্শ্বে ছিল বিরাট ধর্মরাজিক স্তূপ—ছত্রবিহীন, গাত্রে বিচিত্র অলঙ্করণ। মৃগদাবে তখনও বড় বড় বিহারের ভগ্নাবশেষ সংস্কার করিয়া প্রচুর ভিক্ষু বাস করিতেন।

এই সময়ের কয়েকজন খ্যাতনামা বৌদ্ধ দার্শনিক, পণ্ডিত ও সিদ্ধ ব্যক্তির পরিচয়ও এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। নালন্দার পণ্ডিত বজ্রদত্ত, ছয়টি ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রণীত 'লোকেশ্বর শতক' তখন বৌদ্ধদের মধ্যে বহু প্রচলিত গ্রন্থ। বোধিচর্যাবতারের টীকাকার প্রজ্ঞাকরমতি এই সময় নালন্দায় বাস করিতেন। তিনি মহাযানী পণ্ডিত। উড়িষ্যারাজ ইন্দ্রভূতির কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা দেবী যদিও এই সময়ে দেহরক্ষা করিয়াছেন তথাপি তাঁহার গ্রন্থ 'অদ্বয়সিদ্ধি'র প্রতিপত্তি ও প্রচলন ব্যাপক ছিল। তাঁহার শিষ্যা 'প্রকটনিতম্বা' সহজিয়া বৌদ্ধদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। কাব্যে তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপে প্রসিদ্ধা। বিক্রমশীলা বিহারের দ্বাররক্ষক রত্নাকরশান্তি কাব্যে ও ন্যায়ে, সংস্কৃত ও দেশভাষায় সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি দার্শনিক, নৈয়ায়িক, বোধিসত্ত্বপাদীয় সিদ্ধপুরুষ এবং বাংলাভাষায় একজন সুকবি। শুভাকরগুপ্ত বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম স্মৃতিগ্রন্থ প্রণেতা। সিংহলদ্বীপীয় জয়ভদ্র অর্থ শরণতার উপর বেশী জোর দিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণদের 'সুশব্দবাদী' বলিয়াছেন। জ্ঞানডাকিনী নিগু প্রতিভাশালিনী সহজিয়া বৌদ্ধ রমণী। সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এ ছাড়া সিদ্ধ সহজিয়া দারিদা, ভাদে, ঢেণ্ঢন, এবং পদকর্তা চাটিলাপাদ, বীনাপাদ, সরহপাদ প্রভৃতির উল্লেখও এই উপন্যাসে পাওয়া যায়।

বাঙলাদেশে বৌদ্ধ মননচিন্তার পুষ্টি ও ঋদ্ধির পটভূমিকায় হরপ্রসাদের এই শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসের বিকাশ ঘটিয়াছে। অষ্টম-দশম শতাব্দীর বৌদ্ধ-বাঙালীর জীবনলোক পুরাতাত্ত্বিক হরপ্রসাদকে আহ্বান করিয়াছিল। সে যুগের জ্ঞান, ধনদৌলত ও সমৃদ্ধির অতলস্পর্শতায় অবগাহন করিয়া এই যুগের অনুসন্ধিৎসুদের দাবীকেই লেখক চরিতার্থ করিয়াছেন এবং নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে ইতিহাস প্রজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি যুক্ত করিয়া উপন্যাসটিকে সাবলীলতা দান করিয়াছেন। সুদূর অতীতের অজ্ঞাত পটভূমিকায় রচিত

হইলেও উপন্যাসের মধ্যে কোথাও চিন্তার দুরবগাহতা নাই, বরং সে যুগের পরিবেশে মানবজীবনের মর্মোৎসারী গভীর দৃষ্টির পরিচয় আছে।

ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা[১] গ্রন্থের‘কুনালাবদান’-এর কাহিনী অবলম্বনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার ‘কাঞ্চনমালা’[২] উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। অবদানে কাঞ্চনমালিকা বা কাঞ্চনমালাই কুনালপত্নী। কুনাল অশোকের মহিষী পদ্মাবতীর পুত্র। নবজাত শিশু কুনাল নামক হংসের ন্যায় মনোরম নয়নের অধিকারী ছিল বলিয়াই তাহার এই নামকরণ। অশোকপত্নী যুবতী তিষ্যরক্ষিতা কুনালের আয়ত লোচনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি আসক্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু কুনালের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার আয়তচক্ষুর অহঙ্কার ঘুচাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। রাজা অশোক তক্ষশীলাধিপতি কুঞ্জরকর্ণকে জয় করিবার জন্য কুনালকে তক্ষশীলায় প্রেরণ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘কাঞ্চনমালা’ উপন্যাসে ইহা তিষ্যরক্ষিতার ষড়যন্ত্র, অবদানে ইহা রাজার সাম্রাজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। কিন্তু কুনালের সঙ্গে রাজা কুঞ্জরকর্ণের যুদ্ধ হয় নাই। কুঞ্জরকর্ণ রাজার বিপুল সৈন্যবাহিনী দর্শন করিয়াই কুনালের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। অবদানের কাহিনী অনুসরণ করিয়া ‘কাঞ্চনমালা’ উপন্যাসে তিষ্যরক্ষিতা উপস্থিতবুদ্ধি প্রয়োগে রাজা অশোককে কঠিন ব্যাধি হইতে আরাম করিয়া তুলিয়াছেন। অবশেষে কৃতজ্ঞ রাজার নিকট সাতদিন সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণের বর লাভ করিয়াছেন। তিষ্যরক্ষিতা রাজ-সিংহাসনের অধিকার লাভ করিয়াই কুনালের চক্ষুরুৎপাটনের আদেশ প্রদান করিয়াছে। অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ উপলক্ষে ললিতবিস্তর অভিনয় এবং কাঞ্চনমালার দেহে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের আবির্ভাব লেখকের নিজস্ব পরিকল্পনা। অবদানে কাঞ্চনমালাও কুনালের সঙ্গে তক্ষশীলায় আসিয়াছে। সে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাঞ্চনমালার ন্যায় সেবাপরায়ণা কিনা জানা যায় না, তবে পতিভক্তি-পরায়ণা। অবদানে সত্যক্রিয়াবলে কুনাল চক্ষু লাভ করিয়াছে। কিন্তু হরপ্রসাদের ‘কাঞ্চনমালা’ উপন্যাসে কুনালের চক্ষুপ্রাপ্তি বৌদ্ধ চণ্ডালের গুরুদক্ষিণা। তাঁহার কাঞ্চনমালা বৌদ্ধ ক্ষান্তি ও সেবার মূর্ত প্রতীক এবং কুনাল ক্ষমা ও তিতিক্ষার জীবন্ত বিগ্রহ। বৌদ্ধধর্ম অনুধ্যানের ফলে ইঁহারা যে গভীর অন্তরদৃষ্টি ও ঔদার্য লাভ করিয়াছিলেন তাহার নিকট জগতের কোন

১। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, ৩য় খণ্ড, অনুঃ শরচ্চন্দ্র দাস, কুনালাবদান, পৃঃ ৫১৭
২। হরপ্রসাদ রচনাবলী, ২য় সম্ভার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৩০৭।

বস্তু, এমন কি দৈহিক সুখদুঃখও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। প্রাণের গভীরতম অনুভূতির আনন্দে চরম শত্রুকেও তাঁহারা ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন।

ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে এই উপন্যাসে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংগ্রাম সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।[১] তিনি গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন—

'কাঞ্চনমালা একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, অর্থাৎ ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তুকে কাঠামো করিয়া কল্পনাবলে তাহাকে, রক্ত, মাংস, বেশভূষা ও অলঙ্কারে সুশোভিত করা, যাহাতে বিষয়বস্তু হৃদয়গ্রাহী হয়।[২] কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যতাই কাঞ্চনমালা উপন্যাসের বড় কথা নহে'। উপন্যাসটিতে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত যে ক্ষমা ও তিতিক্ষার সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহাই এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ। এই ক্ষমা ও তিতিক্ষা বৌদ্ধধর্মের পরম আশীর্বাদরূপে কুনাল ও কাঞ্চনমালার হৃদয়কে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহার বলেই কুনাল ও কাঞ্চনমালা তাঁহাদের পরম শত্রু তিষ্যরক্ষিতাকে ক্ষমা করিয়াছেন। উপন্যাসের শেষাংশে উন্মাদিনী তিষ্যরক্ষিতাও বৌদ্ধধর্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পূর্ববঙ্গের হিন্দুকুলরবি বীরবল মহারাজ আদিশূরের সঙ্গে গৌড়েশ্বর বৌদ্ধ পালরাজার যুদ্ধ এবং গৌড়েশ্বরের পরাজয় লেখকের ইতিবৃত্তমূলক নবন্যাস 'বীরবরণ'[৩]-এর বিষয়বস্তু। 'বৌদ্ধ পরিপ্লাবিত জন্মভূমির' উদ্ধার সাধন সনাতন আর্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা মহারাজ বীরসেনের সঙ্কল্প। লেখক দেখাইয়াছেন বৌদ্ধ-শাসনে এই সময়ে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু প্রজাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চরমে উঠিয়াছে, চারিদিকে যথেচ্ছাচার-শাসন, ন্যায়বিচার দেশে নাই বলিলেই চলে। দেশে হিন্দু-বৌদ্ধদের জন্য স্বতন্ত্র দণ্ডবিধি ব্যবস্থা প্রচলিত। বৌদ্ধ সাধুগণও পথভ্রান্ত এবং ভিক্ষুজীবনের আদর্শচ্যুত। 'বৌদ্ধরাজা ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস'—ইন্দ্রিয়সেবার জন্য, পাশবিক কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য রাজা সুন্দরী হিন্দু কুমারীদিগকে হরণ করিয়া বন্দনী করিয়া রাখেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের পাণিগ্রহণ করেন। 'বীরবরণ'

১। ঐ, কাঞ্চনমালা, মুখবন্ধ, পৃঃ ৩০০।
২। ঐ, পৃঃ ২৯৬।
৩। বীরবরণ, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১২৯০, পৃঃ ২০৪

উপন্যাসে গৌড়েশ্বর মলয়াকে অপহরণ করিয়া নির্বাণকাননে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন। এইভাবে সনাতন আর্যধর্ম, বৌদ্ধদের দ্বারা পদদলিত হইলে বিধর্মীলোপ করিবার উদ্দেশ্যে শৈবধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে। দাতাকর্ণ বা সমীরণেরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বৌদ্ধধর্ম লোপ করিয়া মাতৃভূমির ও সনাতন আর্যধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। হিন্দু-বৌদ্ধ যুদ্ধে এই বীরপুরুষ অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। মহারাজ আদিশূর ঘোষণা করিয়াছিলেন—'যে ক্ষত্রিয় বীর সর্বাগ্রে সেই বৌদ্ধ পালরাজার মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিতে পারিবেন সেই কুমারী (মলয়া) অপরূপলাবণ্যময়ী সেই মহাবীরকে বরণ করিবে'। যুদ্ধে বিক্রমপাল, সুরপাল ও মদনপাল পরাজিত হইলেন, গৌড়েশ্বরের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইল। মহারাজ বীরসেন আদিশূর নামে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সমগ্র গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে শৈবধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল।

যে অসাম্প্রদায়িকতা ও ক্ষান্তির অনুপ্রেরণায় পালযুগের নৃপতিগণ ও তাঁহাদের প্রকৃতিপুঞ্জ ধর্মবিষয়ে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়াছিলেন এবং কর্মে, আচরণে ও চিন্তায় সর্ব বিষয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন 'বীরবরণ' উপন্যাসে পালযুগের সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। চরম অবনতি ও দুর্দিনের কালিমালিপ্ত অধ্যায়ে পালবংশ যখন অবলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে সেই দুর্দিনে শৈবরাজার সঙ্গে সংগ্রামে বৌদ্ধ গৌড়েশ্বরের পরাজয়ই এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু। উপন্যাসে পাল রাজত্বের অবনতির যুগে বৌদ্ধধর্মের চরম পরিণতিও অতি সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে ও পুরাতত্ত্বে আজীবন গভীর সাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতকে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। হরপ্পা ও মহেনজোদাড়ো সভ্যতার আবিষ্কার তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। প্রাচীন ভারত ইতিহাসের গবেষণায় নিমগ্ন থাকিয়া তিনি যে সুদূরপ্রসারী কল্পনাশক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস সমূহ তাহার নিদর্শন। তাঁহার কল্পনানেত্রে প্রাচীনযুগের বৌদ্ধ-ভারত তথা বাংলা একখানি সুস্পষ্ট চিত্রপটের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছে। তাঁহার রচিত 'করুণা', 'শশাঙ্ক' ও 'ধর্মপাল' উপন্যাসসমূহ বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশে রচিত হইয়াছে।

'করুণা' উপন্যাসে গুপ্তযুগের ভারতে বৌদ্ধধর্মের পরিণতির চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। পুরুষপুর নগরোপকণ্ঠে অবস্থিত কণিষ্কচৈত্য তখন প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। সেই ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকার মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। ইহারা প্রাচীন বৌদ্ধসঙ্ঘের বিনয় অনুসারে চলিতেন। এই সময় বর্বর হূণজাতি উত্তরাপথের তোরণে হানা দেয়। পুরুষপুর বিহারের সঙ্ঘস্থবিরগণ গুরু-পরম্পরাক্রমে জানিতেন নাসিকাবিহীন বর্বর হূণজাতির আক্রমণে আর্যসঙ্ঘের বিনাশ ঘটিবে। জানা যায় বোধিসত্ত্ব নাগার্জুন গণনা করিয়া এই ঘটনার ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং হূণ আক্রমণের সংবাদে কনিষ্কবিহারের সঙ্ঘস্থবির বুদ্ধভদ্র গান্ধার ও কপিশার দূতরূপে উত্তরাপথের তোরণ রক্ষার আবেদন লইয়া শত শত মাইল পদব্রজে মগধে আগমন করেন। এই সময়ে পাটলিপুত্রের কুক্কুটারাম বিহার, কপোতিক ও পারাবত সঙ্ঘারাম এবং মঞ্জুশ্রী বিহার গোপন ষড়যন্ত্র ও নীতিভ্রষ্টতার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। মগধ ও পাটলিপুত্রের মহাস্থবিরগণ শিবিকায় ও যানারোহণে ভ্রমণ করেন, ভিক্ষুগণ সঙ্ঘারামে অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করিয়া রাখেন এবং প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করিতেও ইতস্ততঃ করেন না। উপন্যাসে গুপ্তসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে কুক্কুটারাম মহাবিহারস্বামী হরিবল নিযুক্ত রহিয়াছেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন এবং অভিজাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বনাশ সাধন দ্বারা সদ্ধর্মের পুনরুদ্ধার তাঁহার অভিপ্রায়। ইহাই তাঁহার রাষ্ট্রনীতি। তাঁহার উক্তি—'এই বৈষ্ণব সাম্রাজ্য, বৈষ্ণব অভিজাত সম্প্রদায় ও সমুদ্রগুপ্তের রাষ্ট্রনীতি সমূলে উৎপাটন না করিলে সদ্ধর্মের পুনরুদ্ধার হইবে না, বা আর্যাবর্তে বৌদ্ধসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবে না। অনন্তার পুত্র সদ্ধর্মী হইবে। সে মগধের রাজা হইবে।'[১] এই জন্যই অনন্তাকে মগধের আর্যপট্টে স্থাপন করার কাজে বৌদ্ধসঙ্ঘ সহায়তা করিয়াছে। গুপ্তবংশের বীর নায়কগণ যখন উত্তরাপথের তোরণে হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রাণপাত সংগ্রামে আত্মবিসর্জন দিতেছে মগধে কপোতিক মহাবিহারে তখন নিত্য মহোৎসব। সঙ্ঘারামের শত সহস্র চৈত্যে বুদ্ধ বোধিসত্ত্বগণের পূজা আরত্রিক চলিতেছে। উপাসক-উপাসিকার আগমনে ধূপধুনার গন্ধে ও আলোকমালায় সঙ্ঘারামে উৎসবস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

হূণ আক্রমণে আটবিক প্রদেশের বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ দগ্ধীভূত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। পঞ্চশত সাম্রাজ্যের সেনা লইয়া গোবিন্দগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত শিলাস্তম্ভ

১। করুণা, ১৩২৪, পৃঃ ২২২।

বেষ্টিত বৌদ্ধস্তূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্তূপ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন। অবশেষে বৌদ্ধভিক্ষুদের ভারতবর্ষে সদ্ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন সফল হইয়াছে—বৌদ্ধগণ অনন্তা ও তাহার শিশুপুত্র পুরগুপ্তকে কারামুক্ত করিয়াছে। মগধের বৌদ্ধভিক্ষুদের পরামর্শে সদ্ধর্মের উন্নতির আশায় নূতন সম্রাট পরম সৌগত পুরগুপ্ত উত্তরাপথের একাংশ—বাহ্লীক, কপিলা, গান্ধার ও পঞ্চনদ হূণরাজকে প্রদান করিয়া সন্ধি করিয়াছেন। বৌদ্ধভিক্ষুগণ জানিতেন একদিক হইতে হূণরাজ অন্যদিক হইতে পুরগুপ্তের সৈন্য স্কন্দগুপ্তকে আক্রমণ করিলে 'অনায়াসে সদ্ধর্মের কণ্টক উন্মূলিত' হইবে। দেশ, ধর্ম, পূর্বগৌরব বিসর্জন দিয়া, মগধ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘ চাহিয়াছিল সদ্ধর্মের প্রচার ও উন্নতি। কিন্তু হূণপদানত বৌদ্ধ-মগধের কালিমা দূর করিবার জন্য বৈষ্ণব অভিজাত সম্প্রদায় আজীবন কঠিন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন।

গান্ধারবাসী বৌদ্ধভিক্ষু বুদ্ধভদ্রের উক্তি হইতে জানা যায় গুপ্তরাজগণ বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী হইলেও অন্যধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নহেন। গুপ্তসাম্রাজ্যে বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছে। এইজন্য কোন ধর্মের উৎকর্ষে বা প্রতিষ্ঠায় বাধা হয় নাই।

কুক্কুটারাম মহাবিহারবাসী হরিবলের সদ্ধর্মপ্রীতি সংকীর্ণতার পরিপোষক। তাঁহার সদ্ধর্ম প্রচার-প্রচেষ্টা শুধু অসুন্দর নহে, অশ্রদ্ধেয়ও। আর্যাবর্তের অখণ্ডতার বিনিময়ে সদ্ধর্মের উন্নতিবিধান করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—'হূণ যেমন শত্রু, গোবিন্দ, দামোদর, স্কন্দ আর বৈষ্ণব অভিজাত সম্প্রদায় তেমনি শত্রু, শত্রুবিনাশে শত্রু ক্ষয় হউক, সাম্রাজ্য রসাতলে যাউক, মগধের আধিপত্য থাকিলেই আমাদের যথেষ্ট।'[১] সে কেবল দেশদ্রোহীই নহে, ধর্মদ্রোহীও। যখন মগধসেনা বাহ্লীকে, কপিশায়, গান্ধারে, পঞ্চনদে আত্মবিসর্জন দিতেছে, হূণবাহিনী যখন পুরুষপুর ও তক্ষশীলা অধিকার করিয়া বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারামের ধ্বংস করিতেছে সেই চরম সময়ে কপোতিক সঙ্ঘারামের মহাবিহার-স্বামী মগধমণ্ডলের সঙ্ঘস্থবির পদে অভিষিক্ত হইয়া মহাবিহারের অভ্যন্তরে আপন ভোগাসক্তির আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি করিতেছে। গুপ্তবংশ ধ্বংস করিবার জন্য সে নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াছে সর্বশেষে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য উত্তরাপথের একাংশ হূণরাজকে প্রদান করিয়া কেবল গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই নহে, পুরুষপুর ও তক্ষশীলাবাসী বৌদ্ধগণেরও চরম সর্বনাশ করিয়াছে। ইহাই তাহার বিচারহীন

১। করুণা, পৃঃ ২২২।

অন্ধ সদ্ধর্ম প্রীতির উৎকট পরিণাম। ইন্দ্রলেখার সহিত তাহার হাস্ত-পরিহাস, কপট মান-অভিমান ও প্রণয় নিবেদন দৃশ্য বৌদ্ধভিক্ষুর চরম পথভ্রষ্টতার নিদর্শন।

গান্ধারবাসী বৌদ্ধভিক্ষু বুদ্ধভদ্রের চরিত্রে বৌদ্ধধর্মের মহিমা রক্ষিত হইয়াছে। ক্ষুদ্রস্বার্থের উর্ধ্বে তাঁহার সহানুভূতিস্নিগ্ধ, স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ কামনায় সতত উন্মুখ প্রাণ বৌদ্ধভিক্ষুর জীবনাদর্শের সম্যক্ পরিচয়বাহী। তিনি বুঝিয়াছিলেন হূণ স্বদেশ ও স্বজাতির শত্রু, তাহার নিকট বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব অভিন্ন। মগধের বৌদ্ধসঙ্ঘ আর্যাবর্তের একাংশ হূণরাজকে প্রদান করিয়া সদ্ধর্মের পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলে তিনি সখেদে বলিয়াছেন—'হে সুগত, এই মগধ কি সেই মগধ।'[১] হরিবলের নিকট তাঁহার কাতর আবেদন—'সদ্ধর্মী মগধ কি অত্যাচার-প্রপীড়িত সদ্ধর্মীকে পদদলিত হইবার জন্য বর্বরের পদতলে নিক্ষেপ করিবে।'[২] এইভাবে তাঁহার সদ্ধর্মপ্রীতি কোথাও স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতিকে পদদলিত করে নাই।

'করুণা' উপন্যাসে গুপ্ত সম্রাটদের হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি সর্বধর্মে সমদর্শিতা, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সাম্রাজ্যে অন্তর্দ্রোহিতা প্রভৃতি বিষয়ের ঐতিহাসিক স্বীকৃতিও পাওয়া যায়। পরম বৈষ্ণব গুপ্ত সম্রাটগণ জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উন্নতিপ্রয়াসী ছিলেন। ১২৯ গুপ্তাব্দে মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের রাজ্যে ভিক্ষু বুদ্ধমিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বুদ্ধ প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে।[৩] বসুবন্ধুর জীবনীকার পরমার্থ স্কন্দগুপ্তের বৌদ্ধধর্মানুরাগ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—স্কন্দগুপ্ত প্রথমে সাংখ্যদর্শনের প্রতি অনুরাগী ছিলেন কিন্তু পরে সুবিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য বসুবন্ধুর ওজস্বিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠেন। তিনি বৌদ্ধ দার্শনিকদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতেন। বসুবন্ধুকে তিনি নিজ সভায় আহ্বান করিয়া রাজসম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন।[৪]

কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যমিত্রিয়গণ, এবং মধ্য এশিয়া হইতে উত্তর-পশ্চিম গিরিসঙ্কট পথে অসভ্য হূণগণ গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এই উভয় যুদ্ধে যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত অতুল বীরত্ব, স্বদেশপ্রেম ও অসামান্য রণকৌশল প্রদর্শন করেন। কথিত আছে পিতৃকুলের বিচলিতা রাজলক্ষ্মীকে স্থির করিবার

১। করুণা, পৃঃ ৩৭৯। ২। ঐ, পৃঃ ৩৭৭।
৩। Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III p 46.
৪। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, নগেন্দ্রনাথ বসু, ১ম ভাগ, বৈশ্যকাণ্ড, ১৩১৮, পৃঃ ১৫৯, ১৭৪।

জন্য তিনি ত্রিযামারজনী ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অনন্তাদেবীর পুত্র পুরগুপ্ত[১] সিংহাসন আরোহণ করেন। পুরগুপ্তের পৌত্র ২য় কুমারগুপ্তের রাজমুদ্রায় স্কন্দগুপ্তের নাম উল্লেখ না থাকায় স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করিয়াছেন সিংহাসনের উত্তরাধিকার ব্যাপারে উভয়ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ হইয়াছিল।[২]

'করুণা' ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইতিহাস নহে। সুতরাং গ্রন্থের প্রতিটি ঘটনার ঐতিহাসক নিদর্শন উপস্থাপিত করা সম্ভব নহে। এই গ্রন্থে গুপ্ত সাম্রাজ্য তথা উত্তরাপথের ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে বৌদ্ধচক্রান্ত অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। একদিকে হূণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ,[৩] অন্যদিকে পঞ্চনদ প্রদেশে হূণরাজ তোরমাণ বৌদ্ধ মহীশাসক সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের জন্য সঙ্ঘারাম প্রস্তুত করিতেছেন।[৪] আবার দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের মুদ্রায় স্কন্দগুপ্তের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সমস্ত কারণে লেখক গুপ্ত সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনের সময়ে বৌদ্ধবিপ্লবের সূচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বদেশ-বাৎসল্য, শৌর্যবীর্য ও মনুষ্যত্ববোধের সহিত কেবল আত্মসম্প্রদায়ের উন্নতিকামী পথচ্যুত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের ইতিহাস চিত্রিত হইয়াছে। এই সময়ে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুদের অধঃপতন এতই সুস্পষ্ট যে লেখক কল্পনার আশ্রয়ে তাহার একটি পরিপূর্ণ চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের পরিবেশে উপন্যাসের পটভূমিকা রচিত হইলেও বৌদ্ধধর্মকে তিনি ছোট করেন নাই, খর্বও করেন নাই। গান্ধারবাসী বৌদ্ধভিক্ষু বুদ্ধভদ্র তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যে ধর্ম আপন স্বার্থ সাধনের জন্য পরদেশী শত্রুকে আহ্বান করিয়া আনে জাতিনিরপেক্ষ স্বদেশনিরপেক্ষ সেই ধর্মকে তিনি সমর্থন করেন নাই। 'করুণা' উপন্যাসে ধর্ম অপেক্ষা দেশাত্মবোধ অনেক উর্ধ্বে স্থান পাইয়াছে। একদিকে দেশপ্রেমিক স্কন্দগুপ্তের সাধনা ও আত্মত্যাগের পথ, অন্যদিকে বৌদ্ধভিক্ষু হরিবলের গোপন ষড়যন্ত্রের ক্লেদপিচ্ছিল পথ দুই-এর মধ্যে পরম বৈষ্ণব স্কন্দগুপ্তের পথের মহিমাই এই উপন্যাসে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

১। Epigraphia Indica, Vol, III, Appendix, p. 10
২। বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ৭১
৩। Beal's Buddhist Record of the Western World, Vol. I, p. XCI and C.
৪। Epigraphia Indica, Vol. I. p 239.

'শশাঙ্ক' উপন্যাসে পাটলিপুত্রে অবস্থিত একটি বৌদ্ধমন্দিরের ভিক্ষুদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে অবনমিত বৌদ্ধধর্মের পরিচয় অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গোপন প্রণয়ের ক্লেদপিচ্ছিল পথযাত্রী দেশানন্দের আচরণে ভিক্ষুজীবনের নৈতিক দায়িত্বকে পদদলিত করা হইয়াছে। এই সময়ে বৌদ্ধসঙ্ঘের মহাস্থবিরদের আদেশে বৌদ্ধভিক্ষুগণ রাজপ্রাসাদে, রাজসভায়, মন্ত্রণাগারে, রাজ্যের প্রতি জনপদে জনপদে আত্মগোপন করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। আর্যাবর্তে একচ্ছত্র বৌদ্ধসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে শশাঙ্কের উচ্ছেদ করিয়া স্থাণ্বীশ্বর রাজ্যের সম্প্রসারণের জন্য তাহারা ছদ্মবেশে দৌত্যকার্য করিত। আর্যসঙ্ঘের উন্নতির জন্য অন্যধর্মাবলম্বীর পদস্থ রাজপুরুষদিগের প্রাণহরণ করিতে এবং নরহত্যা শিশুহত্যা করিতেও তাহারা পরাঙ্মুখ ছিল না। মেঘনাদের পূর্বতীরবর্তী অধিবাসিগণ এবং সমতটের সামন্তরাজগণ অধিকাংশই মহাযান মতাবলম্বী ও ব্রাহ্মণবিদ্বেষী বৌদ্ধ ছিলেন। মেঘনাদের পশ্চিমতীরবর্তী সামন্তরাজগণ দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণসহবাস হেতু ততটা ব্রাহ্মণ্যবিদ্বেষী ছিলেন না। বন্ধুগুপ্ত, শক্রসেন প্রভৃতি সঙ্ঘনায়কগণের প্রচেষ্টায় এবং স্থাণ্বীশ্বর রাজ্যের অর্থ ও উৎসাহে বঙ্গদেশে গোপন ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়।

বৌদ্ধদের অত্যাচারে পাটলিপুত্রের নাগরিকদের জীবনযাত্রা দুর্বহ হইয়া উঠে। শত শত দেবমন্দিরের সম্পত্তি অপহৃত হইল এবং বাসুদেব-মহাদেব মন্দিরে বৌদ্ধ-প্রতিমা অধিষ্ঠিত হইল। স্থাণ্বীশ্বররাজ প্রভাকর বর্ধনও সঙ্ঘনায়কদের সহায়তায় এই সময়ে প্রকাশ্য শত্রুতা আরম্ভ করেন। তিনি জানিতেন শশাঙ্ক বর্তমান থাকিলে আর্যাবর্তে তাঁহাকে কেহ একচ্ছত্র অধীশ্বর বলিয়া স্বীকৃতি দিবে না। বৌদ্ধসঙ্ঘনায়কগণও যে ব্যক্তি বৌদ্ধ নহে, তাহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে সঙ্ঘস্থবির ও স্থাণ্বীশ্বর রাজ্যের মধ্যে গভীর ও গোপন ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়।

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদিগের প্রধান অভিযোগ তিনি গয়ার বোধিদ্রুম বিনাশ করিয়াছিলেন। 'শশাঙ্ক' উপন্যাসেও এই কাহিনী স্বীকৃতি পাইয়াছে। কিন্তু উপন্যাসে শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া বোধিবৃক্ষ বিনাশ করেন নাই—ইহা অপরাধী বৌদ্ধভিক্ষুকে দণ্ডদান প্রচেষ্টায় পরিণতি। মহানায়ক যশোধবলদেবের পুত্রহন্তা বন্ধুগুপ্তকে ধরিবার জন্য শশাঙ্ক মহাবোধি বিহারে আগমন করেন। তিনি জানিতে পারিলেন বিহারের গর্ভগৃহের প্রাচীরের মধ্যবর্তী সুড়ঙ্গপথ বজ্রাসন ও বোধিদ্রুমের নিম্ন দিয়া গিয়াছে এবং সে পথে

বন্ধুগুপ্ত পলায়ন করিয়াছে। শশাঙ্ক বিহারস্বামী জিনেন্দ্রবুদ্ধির নিকট প্রশ্ন করিয়া বন্ধুগুপ্তের কোন সংবাদ পাইলেন না। বিহারবাসী সমস্ত ভিক্ষুগণ বজ্রাসন স্পর্শ করিয়া মিথ্যা শপথানুষ্ঠান করিল। অবশেষে শশাঙ্কের আদেশে বোধিবৃক্ষ কর্তিত হইল। সুড়ঙ্গ পথ পাওয়া গেল কিন্তু বন্ধুগুপ্ত তখন দীর্ঘ রন্ধ্রপথ অতিক্রম করিয়া লৌহময় দ্বারপথে নিরঞ্জনানদীর পরপারে বনপথে কুক্কুটপাদ-গিরিতে হাজির হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক লিখিয়াছেন এই খণ্ডীকৃত, উৎপাটিত মহীরুহ অশোকের বংশধর পূর্ণবর্মার ভক্তি ও যত্নে একরাত্রির মধ্যে ষষ্ঠিহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ ও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিংসাপরবশ হইয়া শশাঙ্ক মহাবোধিবৃক্ষ কর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া মেদিনী শশাঙ্ককে গ্রাস করিয়া নরকে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য নহে। চীনদেশীয় শ্রমণের ভ্রমণবৃত্তান্তে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ ও বৌদ্ধ নির্যাতনের আরো বহু অতিরঞ্জিত কাহিনী পাওয়া যায়।[১]

বাণভট্টের হর্ষচরিত, চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ এবং দুইখানি খোদিত লিপি হইতে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সঙ্গে স্থাণ্বীশ্বররাজের বিবাদের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বাণভট্ট লিখিয়াছেন—গৌড়াধিপ মিথ্যা প্রলোভনদ্বারা বিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া তাঁহাকে (রাজ্যবর্ধনকে) স্বভবনে অস্ত্রহীন অবস্থায় একাকী গোপনে হত্যা করিয়াছিলেন।[২] হর্ষবর্ধনের তাম্রশাসনদ্বয়েও উল্লেখিত হইয়াছে—রাজ্যবর্ধন সত্যানুরোধে অরাতিভবনে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।[৩] হর্ষচরিতকার লিখিয়াছেন গৌড়াধিপ রাজ্যবর্ধনকে নিরস্ত্র হত্যা করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক-এর বিবরণ এবং বাণভট্টের উক্তি ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণসত্যরূপে বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার মতে—বাণভট্ট স্থাণ্বীশ্বরের রাজবংশের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন এবং হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের নিকট হইতে নানাবিধ সাহায্য ও উপহার পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত চীনদেশীয় শ্রমণ ঘোরতর ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিলেন। যিনি অনায়াসে মালবাধিপকে পরাজিত করিয়াছিলেন ও একাকী দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে দুর্ধর্ষ হূণজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন তিনি যে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রু ভবনে গমন করিবেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।[১] 'শশাঙ্ক'

১। Watter's Yuan Chwang, Vol. I, p 343; Beals Buddhist Records of the Western World, Vol. 1 210. pp.

২। প্রবোধেন্দু ঠাকুরের অনূদিত, 'হর্ষচরিত' ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস, পৃঃ ২১৮।

৩। Epigraphia Indica, Vol. I, P. 72; Vol. VI, p 210.

উপন্যাসে শশাঙ্ক ও রাজ্যবর্ধনের মধ্যে যে অসিযুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হইয়াছে, রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি নহে। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুযায়ী শশাঙ্ক কেবল বৌদ্ধবিদ্বেষীই নহেন, বৌদ্ধহন্তা এবং বৌদ্ধধর্মের বিনাশকামীও। অধ্যাপক রিস ডেভিডস্ এই সমস্ত উক্তি সর্বাংশে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[২] ঐতিহাসিকগণের মতে শশাঙ্ক যদি বৌদ্ধতীর্থসমূহের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন তবে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে পরিব্রাজক স্বয়ং গৌড়ে, রাঢ়ে ও মগধে সুসমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ বিহার ও সঙ্ঘারাম ইত্যাদি দেখিতে পাইতেন না। ডঃ রমাপ্রসাদ চন্দও শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ এত ব্যাপক ও নাশকতামূলক ছিল বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই।[৩] 'শশাঙ্ক' উপন্যাসেও শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের কারণ বৌদ্ধভিক্ষুদের অন্তর্দ্রোহিতা এবং স্থাণ্বীশ্বররাজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। তাঁহার বৌদ্ধবিদ্বেষ বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষ নহে ; তাহা রাজনৈতিক কারণ-সঞ্জাত।

এই গ্রন্থে বন্ধুগুপ্ত, বুদ্ধঘোষ, বুদ্ধশ্রী, জিনেন্দ্রবুদ্ধি প্রভৃতি যে কয়জন বৌদ্ধ-ভিক্ষু স্থান পাইয়াছে তাহাদের চরিত্রে অবনমিত বৌদ্ধধর্ম তাহার কলঙ্কিত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধসঙ্ঘের বোধিসত্ত্বপাদ সঙ্ঘস্থবির বন্ধুগুপ্ত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অপরাধে অপরাধী, উত্তরাপথের বৌদ্ধসঙ্ঘের মহাস্থবির বুদ্ধঘোষ রাজদ্রোহাপরাধে অপরাধী, বুদ্ধশ্রী শশাঙ্ককে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, মহাবোধি-বিহারস্বামী জিনেন্দ্রবুদ্ধি মিথ্যাভাষণের জন্য অপরাধী, ভিক্ষু দেশানন্দ গোপন প্রেমের ক্লেদপিচ্ছিল পথের যাত্রী, কেবল বৌদ্ধভিক্ষু বজ্রাচার্য শক্রসেনের চরিত্রে মানবিক উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শশাঙ্কের প্রাণদাতা, সাহায্য-কারী ও পরামর্শদাতা। পদমর্যাদার মোহও তাঁহার ছিল না। শশাঙ্ক তাঁহাকে কপোতিক মহাবিহারের অধ্যক্ষ পদে বরণ করিতে চাহিলে তিনি তাহা অস্বীকার করেন। অপর দিকে শশাঙ্ক তেজস্বী, আদর্শবাদী ও ভাবপ্রবণ। তিনি 'লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি ছিলেন, কিন্তু অনুষ্ঠিত পন্থার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের বিচার করেন নাই।' বৌদ্ধধর্মের জীর্ণ ধ্বংসস্তূপের উপর তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের নবীন সৌধ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বোধিদ্রুম বিনাশ ও বৌদ্ধনিধন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়—বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত নহে।

১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ১০৯।
২। Journal of the Pali Text Society. 1896, pp 87-92,107—11.
৩। গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৩

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্মপাল' উপন্যাস মহাযান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গৌড়রাজ ধর্মপালদেবের কাহিনী। তিব্বতদেশীয় লামা তারনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এবং ধর্মপালদেবের খালিমপুর তাম্রশাসনের বর্ণনানুযায়ী 'ধর্মপাল' উপন্যাসে মাৎস্যন্যায়ের অরাজকতা এবং প্রকৃতিপুঞ্জকর্তৃক স্বেচ্ছায় গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসন গোপালদেবকে প্রদান করার কাহিনী উপস্থাপিত হইয়াছে। এই সময়ে সমগ্র আর্যাবর্তে বৌদ্ধধর্ম ক্রমক্ষীয়মাণ, দাক্ষিণাত্যেও মহাযানের বিশেষ প্রাধান্য স্থাপিত হয় নাই, স্থাণ্বীশ্বররাজ হর্ষবর্ধনের দেহত্যাগের পর সমগ্র আর্যাবর্তে বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহ বঞ্চিত হইয়া অভিভাবকহীন হইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশে ও লাঢ়দেশে বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ অস্তিত্ব বজায় আছে। গ্রন্থে গৌড়ে মহাযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ছিল না। মহাযানী বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-অর্চনার প্রতি আস্থাবান ছিলেন, কিন্তু বজ্রযানীরা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। 'ধর্মপাল' উপন্যাসে নারায়ণ ঘোষ বজ্রযানী বৌদ্ধ, গঙ্গাজলের পবিত্রতা ইত্যাদি হিন্দু সংস্কারের প্রতি তাহার প্রবল ঘৃণা। বঙ্গের পালনৃপতিগণও মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজধর্ম কখনও প্রজাহিতৈষণার বিরোধিতা করে নাই। গ্রন্থমধ্যে মহারাজ ধর্মপাল সঙ্ঘস্থবির বুদ্ধভদ্রকে প্রশ্ন করিয়াছেন,

—"সদ্ধর্মের সেবা কি?"

—'বৌদ্ধের রক্ষণ।'

—'সদ্ধর্মের রক্ষা করিতে হইলে অন্য ধর্মের উৎপীড়ন আবশ্যক নহে ত?'

—'না।'

—'তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।'[১]

পালযুগের ঐকান্তিক এষণা হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সৌহৃদ্য ও ধর্ম বিষয়ে সংকীর্ণতা পরিহার। মহারাজ ধর্মপাল সদ্ধর্মনিরত হইয়াও, সর্বধর্মে সমদর্শী। গৌড় নগরে লোকনাথ বোধিসত্ত্ব এবং দেবাদিব বুড়াশিব সমান শ্রদ্ধা ও পূজা পাইতেন। হিন্দু-বৌদ্ধ দুই দেবতা সর্ববৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া গৌড় নগরে পাশাপাশি অবস্থান করিতেন। রাজধানীতে সাড়ম্বরে লোকনাথের পূজা হইত। বৌদ্ধভিক্ষু ও রাজকুলকামিনী হইতে সাধারণ গৌড়বাসী পর্যন্ত লোকনাথের মন্দিরে পূজা নিবেদন করিতে উপস্থিত হইত।

পাল সাম্রাজ্যে লোকনাথ সর্বজনপূজ্য ও বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন দেবতা ছিলেন।

১। ধর্মপাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩২৯, পৃঃ ৯৭।

ধর্মপালদেবের খালিমপুর তাম্রশাসনেও লোকনাথের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। পালনৃপতিগণের প্রতীক চিহ্ন ছিল ষড়ভুজ ধর্মচক্র—অসিতে, খড়্গে, ধ্বজে হেমরেখায় তাহা অঙ্কিত থাকিত।

উত্তরাপথের সঙ্ঘস্থবির বুদ্ধভদ্র বৌদ্ধভিক্ষুর চারিত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। বুদ্ধভদ্র সামান্য স্বর্ণের লালসায় গৌড়রাজকে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং মণিদত্তের সঞ্চিত ধনরাশি গৌড়েশ্বরকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। গৌড়েশ্বর ও চক্ররাজ বিশ্বানন্দের অজ্ঞাতে ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রের মাধ্যমে গুর্জরেশ্বর নাগভট্টদেবের সঙ্গে বৌদ্ধসঙ্ঘের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। এই বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিণতিতে শত শত গৌড়বাসীর রক্তে আর্যাবর্ত প্লাবিত হইয়াছে।

গোবর্ধনমঠের সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের প্রচেষ্টায় পালরাজবংশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধভিক্ষু অথবা হিন্দু সন্ন্যাসী চিনিয়া লওয়া কষ্টকর। তিনি কখনও আর্যসঙ্ঘের সমবেত চক্ররাজগণের মধ্যে একজন, আবার কখনও গৈরিক পরিহিত, কখনও রক্তাম্বরধারী; কণ্ঠে কখনও রুদ্রাক্ষের মালা, কখনও বা মহাশঙ্খের মালা। আবার কখনও সন্ন্যাসীর গাত্রেই যোদ্ধার বর্ম ও হস্তে অস্ত্র উঠিয়াছে। মাৎস্যন্যায়ের ঘোর অরাজকতায় তিনি নিশ্চিত হইয়া সাধন-জীবন যাপন করিতে পারেন নাই। সংসারের হিতে, দেশের কল্যাণে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

ভগবান শাক্যসিংহের বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় ধর্মের আদর্শকে বরণ করিয়া 'কল্যাণী' লোকনাথের পাদমূলে আত্মজীবন বিসর্জন দিয়াছেন। "দেবি! মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনার জন্ম হইয়াছে। আপনার দ্বারা সমগ্র আর্যাবর্তের কল্যাণ সাধিত হইবে। দেবি। সার্ধ সহস্র বর্ষ পূর্বে আচার্যগণ শাক্যসিংহ বোধিসত্ত্বের কোষ্ঠি গণনা করিয়া এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাইয়া-ছিলেন।...আপনি বালিকা, কিন্তু সত্বর আপনি জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি অতিক্রম করিবেন। অনন্তকালচক্রে আপনার পরিক্রম শেষ হইয়া আসিতেছে।"[১] —বৌদ্ধভিক্ষুর কণ্ঠের এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহাকে মহাশূন্যের চিররুদ্ধ নির্বাণপথের যাত্রী করিয়াছে। কল্যাণী জানেন আত্মোৎসর্গে সেই অনন্তশূন্যের রুদ্ধদ্বার খুলিতে হইবে—ইহাই তাঁহার অদৃষ্টলিপি। যে পথে শোকদুঃখ জরামৃত্যু নাই কানা-বালকও তাঁহাকে সেই পথে আহ্বান জানাইয়া গিয়াছে। সর্বজগতের হিতসুখের জন্য যাঁহার জন্ম সে এই মরজগতের মানবী নয়, সর্বজগতের হিত-

১। ধর্মপাল, পৃঃ ১৮৮

সুখের জন্য, গৌড়বাসীর দুঃখশোক উপশমের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া কল্যাণী তাঁহার পুণ্যধারায় গৌড়বাসীর দুঃখের অগ্নি নির্বাপিত করিয়াছেন। কল্যাণীর আত্মদান বৌদ্ধধর্মের পরহিতার্থে আত্মোৎসর্গের মহত্তম আদর্শের নিদর্শন। একদিন যে অনন্যতুল্য দৃঢ়পদক্ষেপে শাক্যসিংহ ছাগশিশুর প্রাণরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে ধীর প্রশান্তচিত্তে মৃগরাজ বোধিসত্ত্ব আপন জীবনের বিনিময়ে অপরের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন সেই একই অতুলনীয় মহিমা কল্যাণীর আত্মোৎসর্গকেও চিরভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। তিনি পরহিতার্থে আত্মোৎসর্গের দ্বারা যাঁহারা বরণীয় হইয়াছেন তাঁহাদেরই যথার্থ উত্তরসাধিকা।

'করুণা', 'শশাঙ্ক' ও 'ধর্মপাল' উপন্যাসে স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ইতিহাসের যে যুগকে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা হিন্দু-বৌদ্ধ প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রা নহে। এইজন্য পারস্পরিক মিলন সমন্বয়ের গ্রন্থি রচনা অপেক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। 'করুণা' ও 'শশাঙ্ক' উপন্যাসে অবনমিত বৌদ্ধভিক্ষুদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কাল্পনিক হইলেও ইতিহাসের অমর্যাদা করে নাই। বৌদ্ধধর্মের চরম অবনতি, তাহার প্রতিক্রিয়া এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংগ্রাম তৎকালীন ইতিহাসের যথার্থ চিত্র। লেখক কল্পনার সহায়তায় তাহার সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'কথা নিবন্ধ' গ্রন্থের 'কল্যাণী', 'চপলা', 'মণিমালা' প্রভৃতি ছোটগল্পে বৌদ্ধ বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইয়াছে। এই গল্পসমূহে বৌদ্ধ-ধর্মের ত্যাগবৈরাগ্য এবং সংসারবিতৃষ্ণা অপেক্ষা প্রণয়োচ্ছ্বাসের বেদনা ও মাধুর্য অধিকতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'মণিমালা' সম্রাট রাজ্যবর্ধনের একমাত্র কন্যা। বালবিধবা মণিমালা পিতৃগৃহে বৌদ্ধভিক্ষুণীর ন্যায় সংযত জীবন যাপন করিতেন। তিনি গৈরিক পরিতেন, বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, নির্বাণ-ধ্যান অভ্যাস করিতেন। মহারাজের আত্মীয় ও সৈন্যাধ্যক্ষ সোমদত্ত মণিমালার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাহা বুঝিতে পারিয়া মণিমালা সংযত আবেগে নিজেকে আরো গভীর ভাবে বৌদ্ধ ধর্মানুশীলনে উদ্বুদ্ধ রাখিতেন। অবশেষে একদিন মণিমালা ভিক্ষুণীব্রত বরণ করিয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন। সোমদত্তও ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়া মণিমালার সন্ধান আরম্ভ করিলেন। মণিমালা তখন ভিক্ষুণী 'সঙ্ঘদাসী'। রাজগৃহে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। মণিমালা জানিলেন সোমদত্ত তাঁহারই জন্য ভিক্ষু হইয়াছেন। এই সাক্ষাৎকারের জন্য সঙ্ঘের নিকট

সোমদত্ত তিরস্কৃত হইলেন। মণিমালার নির্মল ভক্তিপ্লুত চিত্ত সোমদত্তের জন্য বেদনাস্নিগ্ধ হইয়া উঠে। মুক্ত ভিক্ষুণী ও মণিমালার কথোপকথনে মণিমালার এই হৃদয়-বেদনা গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—'আপনাদের সমগ্র বৌদ্ধবিহারে যদি কাঞ্চনলোভশূন্য কেহ থাকে, সে সোমদত্ত। যদি কেহ পরম সৌগতের মত জিতেন্দ্রিয় থাকে, সে সোমদত্ত।'[১] সন্ন্যাসের কঠিন নিগড়ের তুলনায় শাশ্বত প্রেমধর্মই তাঁহাকে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অবশেষে সোমদত্ত বৌদ্ধসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া কলিঙ্গাধিপতির আতিথ্য গ্রহণ করেন। চিল্কাতটের এক মনোরম সান্ধ্য পরিবেশে আত্মবিসর্জনোন্মুখ মণিমালার সঙ্গে সোমদত্তের সাক্ষাৎ হইল। এই গল্পের প্রতিপাদ্য—'প্রেমই ধর্ম, প্রেমই মুক্তি,' নিছক জ্ঞান বা ধ্যান এবং আত্মনিগ্রহের মধ্যে ধর্মের মহান্ ঐতিহ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের সংসার-বৈরাগ্য এবং অনাগারিক জীবন অপেক্ষা হৃদয়বেদনা ও তাহার মাধুর্য লেখককে অধিকতর প্রণোদিত করিয়াছে।

উদাসীন—রাজগৃহে ইন্দ্রগুপ্ত।

জনৈক উদাসীন রচিত 'রাজগৃহে ইন্দ্রগুপ্ত' (১ম সং—১৩১১) উপন্যাস মৌর্য সম্রাট অশোকের বিশ্বস্ত সেনাপতি ইন্দ্রগুপ্তের বৌদ্ধধর্ম ও প্রব্রজ্যা গ্রহণের কাহিনী। ইন্দ্রগুপ্ত সম্রাটের ছয় লক্ষ সেনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্তব্যনিষ্ঠ, সাহসী ও যুদ্ধনিপুণ ছিলেন। একদা ইন্দ্রগুপ্ত জননীর অনুরোধে দুষ্টবুদ্ধি সুতজাতীয় কাককে পরাজিত করিয়া খড়্গবর্মার কন্যা সুনন্দাকে উদ্ধার করেন এবং তাহাকে স্বীয় কেট্ঠকে বা বাসভবনে আশ্রয় প্রদান করেন। ক্রমশঃ ইন্দ্রগুপ্ত ও সুনন্দা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই সময়ে সম্রাট ইন্দ্রগুপ্তকে পুরুষপুরের বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরণ করেন। সম্রাটপুত্র কুনালের সঙ্গে ইন্দ্রগুপ্তের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। পুরুষপুরের বিদ্রোহ দমন করিয়া ইন্দ্রগুপ্ত গান্ধারের শাসন-কর্তা কুনালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কুসুমপুরের পথে ভিক্ষুবেশী অন্ধ কুনালের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। কুনালের চারিত্রিক মহত্ত্বে তিনি মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার নিকট বৌদ্ধধর্মের বাণী শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রগুপ্তের হৃদয় বৈরাগ্য ও নির্বাণাভিমুখী হইল। গৃহ হইতে যে মন লইয়া ইন্দ্রগুপ্ত নির্গত হইয়াছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত মন লইয়া তিনি প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার 'মনে হইতে লাগিল তাঁহাকে নিগড় ভাঙ্গিতেই হইবে, তাহা স্বর্ণময় হইলেও অচ্ছেদ্য

১। কথা নিবন্ধ, ১৩১২, পৃঃ ৪২।

ও অসহ্য।'[১] সুনন্দার জন্য তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইতে লাগিল, কিন্তু বিবেক-বৈরাগ্য অভিভূত হইল না। দেশে প্রত্যাগমনের পর সম্রাটকর্তৃক কলিঙ্গ অধিপতি দুর্বৃত্ত চণ্ডসেনকে দমন করিবার জন্য তিনি পুনরায় কলিঙ্গে প্রেরিত হইলেন। যুদ্ধে ইন্দ্রগুপ্ত জয়ী হইয়াও শত্রুর প্ররোচনায় সম্রাটকর্তৃক কারারুদ্ধ হইলেন। ইন্দ্রগুপ্তের অন্তরে সংসার-বৈরাগ্য আরো দৃঢ় হইল। শ্রমণীর সাহচর্যে সুনন্দার অন্তরও তখন বৈরাগ্য অভিমুখী হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে কারামুক্তির পর ইন্দ্রগুপ্ত ও সুনন্দা শ্রামণ্যব্রত গ্রহণ করিয়া প্রবরগিরিতে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

উপন্যাসে লেখক অশোকযুগের প্রতিবেশ রচনার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। অশোকের প্রতিবেশী রাজ্যের নাম, পথঘাট ও পর্বত ইত্যাদির নাম এবং খলতিক পর্বতে আজীবিক সন্ন্যাসীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'সুপিয়া কুভা' প্রভৃতির বর্ণনার দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। অশোকপুত্র কুনাল বা ধর্মবর্ধনের কাহিনীও এইজন্যই সংযোজিত হইয়াছে।

লেখক ধর্মপদ অর্থকথা, সুত্তনিপাতের অর্থকথা, জাতক, এবং জাতকার্থ-কথা প্রভৃতি মূল পালি গ্রন্থ অবলম্বনে 'ভাগিনেয় সঙ্ঘরক্ষিতের বস্তু', ক্ষেমা-দেবীর বস্তু, ভেরিবাদক জাতক, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত, মৃদু লক্ষণাজাতক, নন্দ জাতক, কুণ্ডলকেশী স্থবিরার বস্তু ইত্যাদি বৌদ্ধগল্প রচনা করিয়াছেন। কয়েকটি বস্তু অবলম্বন করিয়া 'সিরিমা বা শ্রীমতীর কথা' লিখিত হইয়াছে। তিনি 'গোপার বুদ্ধ দর্শন' নামে একটি কবিতাও রচনা করিয়াছেন।

অনুরূপা দেবী

অন্যতমা মহিলা ঔপন্যাসিক অনুরূপা দেবীর 'রামগড়' ও 'ত্রিবেণী' উপন্যাসে বৌদ্ধভারতের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। যখন উত্তরভারতে বৌদ্ধ-ধর্মের প্লাবন জাগিয়াছে—মগধে কোশলে বৌদ্ধধর্মের জয়জয়কার, শ্রাবস্তীর, বালুকারাম ও পূর্বারাম বিহারে স্বয়ং বুদ্ধদেব অজস্র উপদেশামৃত বর্ষণ করিতেছেন সেই যুগের পটভূমিকায় লেখিকা এই উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। উপন্যাসের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে বুদ্ধদেবকে সশরীরে আনয়ন করা হইয়াছে। এই দুঃসাহসিক কার্যে লেখিকাই সর্বপ্রথম অগ্রবর্তিনী হইয়াছেন। উপন্যাসের গতি-প্রবাহের মধ্যে উপস্থাপিত হইয়াও সমস্ত জাগতিক ঘটনাবলীর মধ্যে পরম

১। রাজগৃহে ইন্দ্রগুপ্ত, ১৩৩১, পৃঃ ১৭।

নিস্পৃহভাবে তাঁহার অবস্থিতি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন—'ইহাতে বৌদ্ধজগতের কেন্দ্রস্থল ও মধ্যমণি গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু উপন্যাসমধ্যে তাঁহার প্রভাব সেরূপ লক্ষণীয় নহে। তাঁহার নিষ্ক্রিয়তা ও সংসার-বৈরাগ্য তাঁহাকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উদাসীন দর্শক-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে।'[১] এইখানেই লেখিকার সার্থকতা। তাঁহার উপন্যাসে বুদ্ধদেব চির উদাসীন, অনাসক্ত পুরুষ, ক্ষমা ও মৈত্রীর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

শাক্যা স্ত্রী গ্রহণ শাক্যবংশের কুলপদ্ধতি। শাক্যা স্ত্রী গ্রহণ ব্যতীত সিংহাসনে উত্তরাধিকার লাভ সম্ভব নয়। এই পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে 'রামগড়' উপন্যাস রচিত হইয়াছে। শাক্যবংশ ধ্বংসের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। গৌতমবুদ্ধের জীবিতকালেই শাক্যকুল ধ্বংস হইয়াছিল। শাক্যসিংহ আপন কুলরক্ষার কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। ভদ্দসাল জাতকে[২] পাওয়া যায় কোশল রাজ প্রসেনজিৎ শাক্যকুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলে শাক্য-প্রধান মহানাম বাসবথত্তিয়া নামে তাঁহার এক দাসীকন্যাকে শাক্যরাজকুমারী পরিচয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট প্রেরণ করেন। বাসবথত্তিয়ার পুত্র বিড়ূড়ভ মাতুলালয়ে আসিয়া দৈবক্রমে এই ঘটনা জানিতে পারেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন, শাক্যবংশ ধ্বংস করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। পরবর্তীকালে বিড়ূড়ভ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া শাক্যকুল নির্মূল করেন।[৩] অনুরূপা দেবী জাতকের এই কাহিনী বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই উপন্যাসে সংযোজিত করিয়াছেন। উপন্যাসে দেবদহের রাজা সুরজিতের মহিষীর পালিতাকন্যা অজ্ঞাতকুলশীলা শুক্লার সঙ্গে কোশল নৃপতি বিরূঢ়কদেবের পুত্র পুষ্পমিত্রের বিবাহ হইয়াছে এবং এই বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া দেবদহ ও রামগড় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

পালি ঐতিহ্যানুযায়ী জেতকুমার রাজা প্রসেনজিতের পুত্র। শাক্যকুলধ্বংস-কার্যে সহায়তা না করার অপরাধে তিনি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিড়ূড়ভ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।[৪] রামগড় উপন্যাসেও এই সত্য রক্ষিত হইয়াছে।

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৬৯, পৃঃ ৩০০।

২। Fausboll, Jātaka, Vol. IV, No. 465.

৩। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ২য় খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে ক্ষীরোদপ্রসাদের বিদুরথ নাটক আলোচনায় করা হইয়াছে।

৪। Rockhill, The Life of the Buddha, 1884, p. 121

উপন্যাসেও রাজকুমার জেৎ কনিষ্ঠভ্রাতা কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। তাঁহার চারিত্রিক মহত্ত্বের পরিচয় লেখিকা প্রদান করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের পরম ভক্তরূপে তিনি চিত্রিত হইয়াছেন। শ্রাবস্তী বিহারের পুণ্য অঙ্গনে ভ্রাতার প্রেরিত আততায়ী তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিয়াছেন—

'আমায় তোমরা বধ্যভূমে নিয়ে চল, এখানকার পুণ্যভূমি আমার শোণিতে কলঙ্কিত হইলে দয়াবতার প্রভু আর কখনও এখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না'।[১]

লিচ্ছবি-গণতন্ত্রের ধ্বংসও এই উপন্যাসে সংযোজিত হইয়াছে। পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় বৈশালীর লিচ্ছবিগণ বুদ্ধদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের চরিত্রের সাতটি 'অপরিহানীয়ধম্মা'[২] সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। মগধরাজ অজাতশত্রু বৈশালীরাজ্য জয় করিবার ইচ্ছা করেন। তিনি তাঁহার মন্ত্রী বস্‌সকারকে যুদ্ধে জয়পরাজয় সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মতামত জানিবার জন্য প্রেরণ করেন। বুদ্ধদেব বস্‌সকারকে বলিলেন—যতদিন লিচ্ছবিগণ একতাবদ্ধ থাকিবে ততদিন তাহারা অজেয়। অবশেষে অজাতশত্রু লিচ্ছবিদের মধ্যে অনৈক্য আনয়ন করিয়া অনায়াসে বৈশালী রাজ্য জয় করেন।[৩] 'রামগড়' উপন্যাসে বুদ্ধভক্ত লিচ্ছবিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বৈশালী ধ্বংস হইয়াছে অজাতশত্রুর দ্বারা নহে, বিরূঢ়কের সেনাপতি অম্বরীষের নৃসংশতায়। বৈশালী গণতন্ত্রের অধিবাসীদের চরিত্রে বুদ্ধভক্তি, সহিষ্ণুতা ও একত্ববোধ প্রদর্শিত হইয়াছে। আক্রমণকারী শত্রুকে তাহারা বাধা দান না করিয়া বিনাযুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে।

লিচ্ছবিরাজকন্যা সুদক্ষিণা বৌদ্ধ খন্তি বা ক্ষান্তি পারমিতার মূর্তিমতী প্রতিমা। বুদ্ধদেবের চরণে উপদেশপ্রার্থিনী সুদক্ষিণাকে ভগবান বলিয়াছেন—'বৎসে সুদক্ষিণা,—এ জীবনে তোমার সাধনা ক্ষমা পারমিতা। সব সাধনার এই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনাই যে, একমাত্র সাধিত হইতে তোমার এখনও বাকি আছে।'[৪] মহাগুরুর এই উপদেশ সে তাহার মননে ও আচরণে পূর্ণ সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষমা পারমিতায় দীক্ষা লাভ করিয়া সুদক্ষিণা তাহার

১। রামগড়, ১৩৬৫, পৃঃ ৩০।

২। দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পি. টি. এস. পৃঃ ৭৩।

৩। ঐ, পৃঃ ৫২৪।

৪। রামগড়, পৃঃ ৪২।

পিতৃঘাতী, স্বদেশবৈরী, নারী মর্যাদার চরম অবমাননাকারী মহাশক্রকেও অম্লান বদনে ক্ষমা করিয়াছে। শুধু মৌখিক ক্ষমাতেই তাহার পারমিতা পূর্ণ হয় নাই। অসীম ধৈর্যে মাতৃস্নেহে সে তাহার পরম শক্রর সেবা করিয়াছে। তাহার মধ্যে কোন সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিশোধ বা প্রতিবিধিৎসার ভাব জাগ্রত হয় নাই। তিতিক্ষা ও আত্মনিগ্রহ, ক্ষমা ও সেবা তাহাকে মানবী হইতে দেবীতে উন্নীতা করিয়াছে। ক্ষান্তির সাধনায় কর্মজগতে যেদিন তাহার চরম সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে সেইদিন মহাগুরুর নিকট সে নৈষ্কর্ম্যের দেশনা লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ-যুগের মহীয়সী থেরীদের উত্তরাধিকার তাহার চরিত্রে যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে।

সুপ্রিয়া ভিক্ষুণী হইয়াও সন্তানস্নেহ বক্ষে লইয়া আবার রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে ভিক্ষুণীধর্ম অপেক্ষা নারীধর্ম প্রাধান্য পাইয়াছে। সর্বশেষ তাঁহার চরম আত্মদানে বিরূঢ়কের রোষানল হইতে দেবগড়ের শাক্য প্রজাগণ রক্ষা পাইয়াছে। পালি ঐতিহ্যে মহানাম আপন কুলমর্যাদা রক্ষার্থ হ্রদের জলে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। কিন্তু রামগড় উপন্যাসে ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া নদীজলে আত্মবিসর্জন দিয়া দেবগড়বাসীদের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

উপন্যাসে বিরূঢ়ক ও অম্বরীষ ক্ষাত্রশক্তির মাদকতায় অন্ধ, বৌদ্ধধর্মকে তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন নাই। অম্বরীষের মতে—'গৌতমের নবধর্ম বলীর ধর্ম নয়,—ভিক্ষুর ধর্ম—ভিক্ষুকের ধর্ম। এ রাজাকে ভিখারী করে—ভিখারীকে রাজা করিতে পারে না।'[১] উপন্যাসে বিরূঢ়ক প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী না হইলেও জটিল সন্ন্যাসীকর্তৃক বালভিক্ষুর প্রাণবিনাশের যথাযথ বিচার তিনি করেন নাই। রাজ-অতিথিশালায় বৌদ্ধভিক্ষুগণ অন্নগ্রহণ না করায় তিনি বৌদ্ধনির্যাতনের আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং শাক্যকুল ধ্বংসের আয়োজন করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্মের মহান্ আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সরলতা লেখিকা যথাসাধ্য এই উপন্যাসে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে।

অনুরূপা দেবীর 'ত্রিবেণী' উপন্যাস পালবংশীয় দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচার এবং রামপালকর্তৃক পালবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। পালনৃপতিগণ

১। রামগড়, পৃঃ ৬৭।

ধর্মবিষয়ে উদারদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। উপন্যাসে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি অবস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গৌড় রাজধানী মহানগরী বিপুলায়তন চৈত্য-বিহার, মন্দির ও সৌধে শোভাশালিনী ছিল। সন্ধ্যাকাশে দেবায়তন ও মহাবিহারের সন্ধ্যারতির গম্ভীর ধ্বনির সঙ্গে ভিক্ষুগণের ত্রিশরণমন্ত্র ঘণ্টা ও বিবিধ বাদ্যযোগে ঐকতানে উত্থিত হইত। পৌণ্ড্রবর্ধন নগরের পশ্চিম বিভাগে বাশিভা সঙ্ঘারাম অবস্থিত ছিল। এই সঙ্ঘারামে বহির্ভারত হইতেও বহু পর্যটক আগমন করিতেন এবং তুলোট কাগজে এদেশীয় পুঁথি নকল করিয়া লইয়া যাইতেন। অভ্যাগতদের এবং সঙ্ঘারামের শিক্ষক ও ছাত্রদের সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনায়, পঠন-পাঠনে এবং তর্ক-আবৃত্তিতে সঙ্ঘারাম সারাদিন মুখরিত থাকিত।

রাজপথে, পুরতোরণে, নগর-প্রহরী প্রহরে প্রহরে প্রভু বুদ্ধের অমর বাণী—তাঁহার সংসার ত্যাগ, তাঁহার ধর্মের সার সত্য, ইত্যাদি ঘোষণা করিত। বৌদ্ধমন্দিরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মুদ্রায় সারি সারি বৌদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিত। বৌদ্ধদের উপর তখন তারাদেবীর বিশেষ প্রাধান্য। 'ত্রিবেণী' উপন্যাসে প্রধান মন্দিরে সমুজ্জ্বল বেশভূষায় বিভূষিতা স্বর্ণময়ী তারামূর্তির উল্লেখ আছে। তারা প্রতিমার বদনে হাস্যজ্যোতি, হস্তে বরাভয়। মন্দিরে ভোটদেশীয় ও গান্ধার দেশীয় বৌদ্ধভিক্ষুগণেরও সমাবেশ হইত। তাঁহারা জপমন্ত্র ঘুরাইয়া একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ নাম জপ করিতেন।

পালনৃপতিগণ বিদ্বজ্জন প্রতিপালক ও ধার্মিকজন রক্ষক ছিলেন। কিন্তু বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পর মহীপালদেবের রাজত্বে অত্যাচারের স্রোত আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধমন্দির ও বিহারসমূহ রাজসাহায্যে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। এইজন্য মহীপালের রাজত্বের উপর ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় সমপরিমাণে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

'ত্রিবেণী' উপন্যাসে বৌদ্ধধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম কোনটাই রাজনীতিকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। রাজনীতির দ্বন্দ্ব জটিল আবর্তের বাহিরে থাকিয়া মন্দির ও বিহারের ভিক্ষু সন্ন্যাসিগণ যথাসাধ্য ধর্মতত্ত্ব চিন্তায় রত থাকিতে চাহিয়াছেন। তবে বৌদ্ধগণ সম্ভবতঃ কৈবর্তরাজ ভীমের আধিপত্যকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। উপন্যাসের শেষভাগে পাল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামী রামপালের প্রতি অশীতিপরবৃদ্ধ আচার্য তারনাথের আশীর্বাণী[১] এই সম্ভাবনার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে।

১। ত্রিবেণী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত, পৃঃ ৪৭৬।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইঁহার 'মেঘমল্লার', 'প্রত্নতত্ত্ব' প্রভৃতি ছোটগল্পে বৌদ্ধ প্রসঙ্গ স্থান পাইয়াছে। জৈষ্ঠ্য সংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে দশপারমিতার মন্দিরে পূজাদানকে উপজীব্য করিয়া 'মেঘমল্লার' গল্পটির আরম্ভ। গল্পের নায়ক প্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ বিহারের ছাত্র। আচার্য শীলব্রত সেই বিহারের অধ্যক্ষ। বৌদ্ধ বিহারের বর্ণনা, পাঠার্থীদের সমবেতকণ্ঠের 'যে ধম্মা হেতুপ্পভবা' প্রভৃতি স্তোত্রগান লেখকের বৌদ্ধযুগের পরিবেশ রচনার সার্থক প্রয়াস। কাহিনীতে তন্ত্রসাধক গুণাঢ্য প্রদ্যুম্নের সহায়তায় দেবী সরস্বতীকে বন্দিনী করিয়াছেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আত্মবিস্মৃতা হইয়া মর্ত্যলোকে বন্দিনী হইলে পরিণামে সমগ্র দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ব্যাহত হইয়াছে। বৌদ্ধেরাও এই দুর্যোগের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। এই সময়ে ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজাদেশে ভগবান তথাগতের মূর্তি প্রস্তুত করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। প্রদ্যুম্ন শুনিয়াছেন—মিহিরগুপ্তের নির্মিত সেই বুদ্ধ প্রতিমার—'মুখশ্রী এমন রূঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে যে তা বুদ্ধের মূর্তি কি মগধের দুর্দান্ত দস্যু দমনকের মূর্তি, তা সে দেশের লোক ঠিক বুঝতে পারছে না।'[১] মহাকোট্‌ঠী বিহারের চিত্রবিদ্যা শিক্ষক ভিক্ষু সুব্রতের বুদ্ধ ও সুজাতার চিত্র রচনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। অবশেষে প্রদ্যুম্নের আত্মদানে দেবীর মুক্তিলাভ ঘটিয়াছে। গল্পে প্রদ্যুম্নের সঙ্গিনী সুনন্দাও অল্পবয়সে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়া জীবনের ব্যর্থতার বোঝা অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছে। বৌদ্ধগণ হিন্দুদের দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বিহারের কলাবিদ্যার অধ্যাপক বসুব্রতের উক্তিতে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। তাঁহার মতে—'কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে মূর্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা নিছক কল্পনাই, তার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই।'[২]

'প্রত্নতত্ত্ব'[৩] গল্পে স্বপ্নরচিত কল্পনার আবছায়ায় দীপঙ্করের সময়ের প্রতিবেশ রচনার প্রচেষ্টা হইয়াছে। বিক্রমপুরের একটি বহু পুরাতন ঢিবি খননের ফলে রাজমহলের কালো পাথরের তৈয়ারী একটি দেবীমূর্তি পাওয়া যায়। এই মূর্তিটিকে অবলম্বন করিয়া এই গল্পটি রচিত। গল্পে পাওয়া যায় নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই মূর্তিটির নির্মাতা। তিব্বতের

১। মেঘমল্লার, ১৩৬৫, পৃঃ ১৬।

২। ঐ, পৃঃ ৮-৯।

৩। মৌরীফুল, ১৩৬৩ পৃঃ ৭২।

অনাচারগ্রস্ত বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের জন্য দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রা, নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের সঙ্গে চেদীরাজকন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহের পৌরোহিত্য ইত্যাদি অভিজ্ঞতার ছায়াদৃশ্য স্বপ্নের অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিভূতিভূষণের 'নাস্তিক' গল্পটি ধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যতিকগ্রস্ত দার্শনিক লোকনাথের কাহিনী। এই কাহিনীতে মহামণ্ডলী মঠের প্রধান দার্শনিক বৈভাষিক পন্থী এক আচার্যের উল্লেখ আছে। তিনি মুক্তি কি, মুক্তি কয়প্রকার, মুক্তি ও নির্বাণের মধ্যে প্রভেদ ইত্যাদি বিষয়ে লোকনাথকে উপদেশ দিয়াছেন।

'মেঘমল্লার', 'প্রত্নতত্ত্ব' ইত্যাদি গল্পে লেখক বৌদ্ধযুগের প্রতিবেশ রচনার চেষ্টা করিলেও তাঁহার প্রচেষ্টা সর্বাংশে সার্থক হয় নাই। সাহিত্যসমালোচকের মতে তাঁহার 'বৌদ্ধযুগের বিবরণটি বিশেষত্ববর্জিত ও বিশেষজ্ঞানের পরিচয়হীন।'[১]

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৯, পৃঃ ৫৮৫-৮৬

তৃতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ

পটভূমিকা

আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের বিকাশক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে স্বীয় জীবনসীমায় গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে জাতীয় সম্পদরূপে যিনি স্বীকৃতি দিয়াছিলেন তিনি হইতেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রজীবনে বুদ্ধের অলোকসামান্য প্রভাবের সম্যক্ মূল্যায়ন করিতে হইলে যে পরিবেশ ও অনুকূল পরিস্থিতি তাঁহাকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল তাহা অবহিত হওয়া দরকার। কৈশোরে তিনি বিদগ্ধ পুরাতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন। রাজেন্দ্রলাল দুর্লভ বৌদ্ধশাস্ত্রের সংগ্রহ ও পর্যালোচনায় বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থটি কবির অন্যতম প্রিয়গ্রন্থের অন্তর্গত। তিনি তাঁহার বহু নাটক ও কাব্যের উপাদান এই গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করেন। কেশব চন্দ্র সেনের কনিষ্ঠভ্রাতা 'অশোকচরিত' রচয়িতা কৃষ্ণবিহারী সেনও ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন।[১] রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে পরিবার-পরিবেশের মধ্যেও বৌদ্ধধর্মের ও সাহিত্যের গভীর চর্চা ও অনুশীলন হইত। বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্য এবং মননশীলতা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। তাঁহার অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থও লেখকের গভীর অনুধ্যানের পরিচয়বাহী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মনীষার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের গবেষণা ও বৌদ্ধ পুরাবৃত্তের পর্যালোচনার ধারায় নবীন সঞ্জীবন দেখা দিয়াছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, অঘোরনাথ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি চিন্তাশীল মনীষিগণ অমিতনিষ্ঠা ও যত্নসহকারে সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় কবি Arnold-এর Light of Asia কাব্য, Rhys Davids-এর বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ ও সমালোচনা গ্রন্থ এই যুগের কৃতবিদ্য মনীষীদের বৌদ্ধ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে প্রণোদিত করিয়া তুলিতেছিল। গিরিশ ঘোষের বুদ্ধচরিত,

১। ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃঃ ৬৯

অশোক প্রভৃতি নাটকও বিষয়গৌরবে ও রসের বিচ্ছুরণে পাঠক সমাজের প্রশংসা আদায় করিয়াছিল। এই শতাব্দীতেই সিংহলী ভিক্ষু দেবমিত্র ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯২১) বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ব্রতী হইয়া ভারতে আগমন করেন। কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটির ধর্মরাজিক চৈত্যবিহার এবং সারনাথে মূল গন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম কীর্তি। এই মহৎ কর্মকৃতি রবীন্দ্রনাথ[১] ঠাকুর এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত[২] প্রভৃতি সৃজনকুশল কবি-মনীষাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বের চর্চা ও গবেষণার ফলে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিদগ্ধ বাঙালী সমাজে চেতনা দেখা দেয়। শতাব্দীর এই মহৎ ভাবরাজী অনুভূতি স্নিগ্ধ কবিমনের আনন্দময় স্পর্শে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যে শতদলের ন্যায় পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

বৌদ্ধযুগের পুনরুদ্বোধন তাঁহারও কাম্য ছিল। তাঁহার সাহিত্যে বৌদ্ধ কীর্তিস্পন্দিত প্রাচীন ভারত যেমন শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পাইয়াছে তেমনি তাঁহার কর্মজীবনের বহুবিধ প্রচেষ্টায় বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাও সূচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পালিভাষা ও বৌদ্ধসংস্কৃতির চর্চায় মনোনিবেশ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি বিশ্বভারতীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রদেরও বৌদ্ধধর্ম চর্চার জন্য সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশে প্রেরণ করেন। সিংহল, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, জাভা-শ্যাম প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ ভ্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সম্প্রসারিত হইয়াছিল। পালিভাষা ও সাহিত্যকে তিনি ছাত্রদের পঠনীয় বিষয়ের অন্তর্গত করেন। পালি 'ধম্মপদ' গ্রন্থটি তাঁহার অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—'আমরা জানি সেই যুগেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে রথীন্দ্রনাথ প্রমুখ ছাত্রদের বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ বলেন তথনকার দিনে তাঁকে 'ধম্মপদ' গ্রন্থখানি আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করতে হয়েছিল এবং অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' নামক কাব্যখানি বাংলায় অনুবাদ করতে হয়েছিল'।[৩] রথীন্দ্রনাথ লিখিত 'বুদ্ধচরিত' গ্রন্থটি পরবর্তীকালে

১। 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ। ইহা ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বুদ্ধ জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের সভাপতির অভিভাষণ। 'বুদ্ধদেবের প্রতি' কবিতাও, 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

২। বুদ্ধবরণ—বেলাশেষের গান কাব্যে সঙ্কলিত হইয়াছে।

৩। ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৫৫।

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 'ধম্মপদ' গ্রন্থটির প্রতি তাঁহার এতই অনুরাগ ছিল যে কবি নিজেই গ্রন্থটির সরল বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের পালিভাষা শিক্ষাদানের জন্য রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী পালি ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ প্রাতিমোক্ষের অনুবাদ সতীশচন্দ্র রায়ের 'চণ্ডালী' কবিতা, চারু বসুর 'ধম্মপদং' এবং শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক শরৎ রায়ের 'বৌদ্ধভারত' ও 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ শান্তিনিকেতনে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার স্মারক। শান্তিনিকেতনে 'চীন ভবন' প্রতিষ্ঠা এবং 'চীন-ভারত' সংস্কৃতি সমিতি স্থাপনও বৌদ্ধসংস্কৃতি চর্চার সহায়ক হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের নূতন পরিচয়ের সন্ধানে শান্তিনিকেতনের কৃতবিদ্য মনীষী ও পণ্ডিতগণ এইখানে তিব্বত হইতে আনীত জীর্ণ পুঁথির গবেষণায় রত থাকিতেন। শান্তিনিকেতনে বুদ্ধের জন্মতিথি বৈশাখী পূর্ণিমা এবং ধর্মচক্র প্রবর্তন তিথি আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের ব্যবস্থাও তিনিই করেন।

বহু কবিতায়, গানে, নাটকে এবং প্রবন্ধে ও সমালোচনায় লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য পরিবেশিত হইয়াছে। বৌদ্ধযুগের ত্যাগ-ধর্ম, বিশ্বমৈত্রী, বুদ্ধের প্রতি শিষ্যের আনুগত্য তাঁহাকে সেই যুগের কাহিনী অবলম্বনে কথা-কাব্য রচনায় প্রেরণা দিয়াছে। অজিত চক্রবর্তী তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সেই যুগের ত্যাগধর্ম এবং রবীন্দ্রকাব্যে তাহার গভীর প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'ভারতবর্ষ তখনকার জাতীয় জীবনকে ত্যাগের সুরে খুব কঠিন করিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে কি রকমের ত্যাগ? যে ত্যাগের আবেগে নারী একমাত্র পরিধেয় বসন প্রভু বুদ্ধের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে, আপনার ভোগের উৎসৃষ্ট অংশ হইতে কিছু দেওয়াকে ত্যাগ মনে করে নাই, যে ত্যাগ নৃপতিকে ভিখারীর বেশ পরিধান করাইয়া দীনতম সন্ন্যাসী সাজাইয়াছে, পূজারিণী রাজদণ্ডের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া পূজার জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে…সেই সকল ত্যাগের কাহিনীই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথ জাগাইয়া তুলিলেন।[১] বৌদ্ধ যুগের কাহিনীর প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার বিষয় কবি নিজেও স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। 'এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির

১। রবীন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩, পৃঃ ৮১-৮২।

প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ কথা ও কাহিনীর গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল, সুতরাং বলতে পারা যায় 'কথা ও কাহিনী' সেই কালেরই বিশেষ রচনা। কিন্তু এই কথা ও কাহিনীর রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ—তাই তো বলেছে, আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্য রেখে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয় এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হত তাহলে সমস্ত দেশ জুড়ে কথা ও কাহিনীর হরিলুট পড়ে যেত। আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এ সকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পায় নি।'[১]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন বুদ্ধদেবের বাণী সার্বভৌম। আর্য-অনার্য, উচ্চনীচ, দীনদরিদ্র সকলের জন্য তিনি তাঁহার নবধর্মের অমৃতবাণী প্রচার করেন। আচারনিষ্ঠার পরিবর্তে বিচারনিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরতাকে তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন। 'নটীর পূজা' নাটকে, 'পূজারিণী' কবিতায় এবং 'মালিনী' ও 'চণ্ডালিকা' নাটকে এই তত্ত্বই প্রমাণিত হইয়াছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের উদার করুণার শুভ্র রশ্মি সম্পাতে পতিতা শ্রীমতীর আত্মা জাগ্রত হইয়াছে। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি হীনজাতীয়া হইলেও বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দ তাহার প্রদত্ত পানীয় অগ্রাহ্য করেন নাই। রাজকন্যা মালিনী ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচার-অনুষ্ঠানকে পরিহার করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রেমমূলক জ্ঞান ও সহজ অনাড়ম্বর আবেদনে সাড়া দিয়াছেন। এই সমস্তই সম্ভব হইয়াছে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি কবির অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধাবোধের জন্য।

'বিসর্জন', 'রাজর্ষি', 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' গ্রন্থে কবির পশুবলি বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। যে করুণাধারা একদা শাক্যমুনির হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া অপরিমিত মানসে সর্বপ্রাণীর প্রতি প্রবাহিত হইয়াছিল রবীন্দ্রচিত্তে তাহারই উত্তরাধিকার রক্ষিত হইয়াছে। বৌদ্ধ করুণার মৃণালে কবির প্রাণপদ্ম

১। সাহিত্যের স্বরূপ, 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা, পৃঃ ৪৫-৪৬।

প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। 'বাল্মীকি' প্রতিভায় কালীপূজক বাল্মীকির চিত্ত করুণায় প্লাবিত হইয়াছে। বন্দিনী বালিকাকে বলি দিতে গিয়া তাহার করুণ আবেদনে হিংসার লেলিহান শিখা নির্বাপিত হইয়াছে এবং প্রেমের ও করুণার জয় ঘোষিত হইয়াছে। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে পাওয়া যায় একদা পশুবলির শোণিতে গোমতীর স্রোতোধারা রঞ্জিত হইত। একদিন বালিকা হাসি শ্বেতপ্রস্তরের ঘাটের সোপান বহিয়া যে রক্তধারা জলে নামিয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া রাজাকে প্রশ্ন করিয়াছে—'এ কিসের দাগ বাবা?'

রাজা বলিলেন: 'রক্তের দাগ, মা।'

সে কহিল, 'এত রক্ত কেন?' মৃত্যুশয্যায় বিকারের ঘোরেও কাতরকণ্ঠে সে সেই একই প্রশ্ন করিয়াছে—'মাগো, এত রক্ত কেন? এত রক্ত কেন?'[১] 'রাজর্ষি' উপন্যাসে বালিকা হাসির এই কাতর প্রশ্নে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে জীববলির বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। 'বিসর্জন' নাটকেও ছাগশিশুর প্রতি অপর্ণার করুণাই জয়যুক্ত হইয়াছে। যে ছাগশিশুকে সে পরমস্নেহে করুণায় বড় করিয়া তুলিয়াছে তাহার রক্তের ধারা মন্দিরের সোপানে দেখিয়া সে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। অপর্ণার অভিযোগ—বিশ্বের যিনি জননী তিনি তো সকল প্রাণীরই জননী। জননী কি কখনও সন্তানের রক্তে প্রীতিলাভ করেন? ভিখারিণী অপর্ণাকে কবি যেন বৌদ্ধযুগের বাতাবরণ হইতে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। হিংসা, কুসংস্কার ও মিথ্যাকে সে প্রেম, করুণা ও ক্ষমার দ্বারা জয় করিয়া লইয়াছে। অহিংসার পূজারী রাজা গোবিন্দমাণিক্য বৌদ্ধ নৃপতি বিম্বিসারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি জানেন জননী রক্তপিপাসিনী রাক্ষসী কখনই নহেন। তিনি বিশ্বের জননী।[২] বিম্বিসার বুদ্ধদেবের প্রেমধর্ম গ্রহণ করিয়া নিজ রাজ্যে পশুবলি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যও ধর্মের যথার্থ স্বরূপ যেদিন উপলব্ধি করিয়াছেন সেদিনই নিজ রাজ্যে পশুবলির চিরাচরিত প্রথা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও পশুবলির প্রতি লেখকের অন্তর্চেতনার এই গভীর অনুভূতির মূলে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণা রহিয়াছে এই কথা অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্র মানসবৃত্তি ও বৌদ্ধভাবধারার মধ্যে বহু বৈসাদৃশ্যও

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৩৭৭—৩৭৯।

২। তুলনীয়—Arnold, The Light of Asia, Book the Fifth,

রহিয়াছে। বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, ভগবানের অস্তিত্বকে তিনি স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরে বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্ম সংসারত্যাগী ভিক্ষুর ধর্ম, অনাসক্তি ও উপেক্ষা, অনিত্যতা ও ভোগবিরতি, অনাত্মা ও নির্বাণ প্রভৃতি ইহার লক্ষ্য। আর রবীন্দ্রনাথ শিব-সুন্দরের উপাসক কবি, সুন্দরের স্বপ্নে মগ্ন হইবার সাধনাই তাঁহার কাম্য। জগৎ ও জীবনকে তিনি অনিত্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, বরং গভীর আবেগে এবং নিবিড় আগ্রহে এই মাটির পৃথিবীকে তিনি ভালোবাসিয়াছেন। অনস্তিত্বের সাধনা নহে, পরিপূর্ণ অস্তিত্বের সাধনাই তাঁহার কাম্য। কবির বাণী—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্যবন্ধন মাঝে, মহানন্দময়
লভিব মুক্তির সাধ।[১]

এই পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের বেদনার ভারে, বাসনার টানে তিনি বাধা পড়িয়াছেন। তবে বুদ্ধের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ আনুগত্য কি কেবল কথার কথা? তাহাও নয়। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের নঙর্থক দিককে নহে, সদর্থক দিককেই গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের সাম্য মৈত্রীর বাণী, ক্ষমা আত্মত্যাগের বাণীর মধ্যে কবি বিশ্বসৌভ্রাত্রের ও বিশ্বজনীনতার পরিচয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের সাধনা কত সরল, অনাড়ম্বর ও প্রাণস্পর্শীরূপে তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—'তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ, অহংকার ত্যাগ, ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা।'[২] বৌদ্ধধর্মের নিগেটিভ দিক—দুঃখ, অনিত্য, অনাত্মা তাঁহার কবি-কল্পনাকে উদ্বোধিত করিতে পারে নাই। শাক্যমুনি বুদ্ধের অন্তর হইতে উৎসারিত সেই অপরিমেয় প্রেমের বাণী—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।[৩]

২। বুদ্ধদেব, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩, পৃঃ ৫৩।

৩। মেত্তসুত্ত, সুত্তনিপাত, ১ম খণ্ড, পি. টি. এস. পৃঃ ২৬।

মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দ্বারা রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীর প্রতি সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করিবে।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এই মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধ ভারতের প্রবুদ্ধ আত্মার অধিকারী। বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন মূর্তি, তাঁহার অন্তরের নিশ্চল স্তব্ধতা ও প্রশান্তি, স্বস্তি ও সন্তোষ কবির চিত্তকে প্রভাবিত করিয়াছে। ফলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি গৃহী হইয়াও চিরবৈরাগী, সৌন্দর্যরসিক হইয়াও চির অনাসক্ত ঋষি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কীয় প্রধান প্রধান আলোচনাসমূহ 'বুদ্ধদেব'[১] গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কেবল বৌদ্ধধর্মের আলোচনা বা মূল্যায়ন মাত্র নহে, ইহা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির আলোয় সমুজ্জ্বল অনবদ্য শ্রদ্ধার্ঘ্যও। বৌদ্ধভারতের চিরন্তন বাণী তাঁহার হৃদয়ে যে ভাবপুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়াছে শুচিস্নাত উদার হৃদয়ে কবি তাহা চিরসুন্দরের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া দিয়াছেন। কবি তাঁহাকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রণতিও সেই নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের প্রতি নিবেদিত হইয়াছে। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন ভারত ইতিহাসে যে কয়জন মহামানবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে বুদ্ধদেব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এই অসাধারণ শ্রদ্ধাবোধের তন্ময়তায় বিমুগ্ধচিত্তে তিনি বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধপ্রতিমার প্রতি তাঁহার প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন।[২] তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন—বুদ্ধের জীবনে তিনি যে মুক্তির বাণী পাইয়াছিলেন বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম তলায় তাহা ধ্বনিত হইয়াছে, এই বোধগয়ার গগনে গগনে লোক লোকান্তরে তাহা শাশ্বতকালের বক্ষে গাঁথা হইয়া আছে। সেই বোধিদ্রুম, সেই নিরঞ্জনা নদী, সর্বোপরি মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রশান্ত ধ্যানমূর্তির অনুপম সৌন্দর্য ও করুণামিশ্রিত আঁখি কবির চিত্তে সুগভীর ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দীপ্ত করিয়াছে। শান্তসুন্দর মন্দিরের নির্জন পরিবেশ প্রাচীন কালের শতস্মৃতির মূর্ছনায় কবিকে পরমেশ্বরের ধ্যান ও উপলব্ধিতে তন্ময় করিয়া তুলিয়াছে।[৩] নানা কবিতায় ও গানে এবং প্রবন্ধে রসসৃষ্টির মাধ্যমে সেই ভাবানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে। কখনও কখনও তাঁহার প্রাণে দুঃখ জাগ্রত হইয়াছে—কেন তিনি সেই যুগে জন্মগ্রহণ করেন নাই যে যুগে ভগবান বুদ্ধ এই মাটির পৃথিবীকে ধন্য করিয়াছিলেন? আবার তাঁহার মনে হইয়াছে সেই যুগেও তো

১। ভগবান বুদ্ধের সার্ধ দ্বিসাহস্রিক পরিনির্বাণ জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সঙ্কলিত, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩।

২। Only once in his life, said Rabindranath, did he feel like prostrating himself before an image, and that was when he saw the Buddha at Gaya.

—Visva-Bharati Quarterly, 1943 April, p. 179.

৩। ১৯০৪ সালে কবি একবার বুদ্ধগয়া দর্শনে গিয়াছেন, ১৯১৪ সালে আর একবার তিনি এইখানে আসিয়াছেন। গীতালির কয়েকটি গানও বুদ্ধগয়ায় রচিত হইয়াছে।

ক্ষুদ্র মনের কত ঈর্ষা তাঁহাকে পদে পদে মিথ্যা অপবাদের সম্মুখীন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, মহাপুরুষের মাহাত্ম্য খর্ব করিয়া মিথ্যা অপবাদের কণ্টক মুকুট তাঁহাকে পরাইয়া দিয়াছে। দেবদত্ত, সুভদ্র, চিঞ্চা, মাগন্ধিয়া—ইহারা ইন্দ্রিয়গতভাবে তাঁহার সান্নিধ্য পাইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে প্রেমের একটি জীবন্ত সত্যমূর্তিরূপে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এইজন্য বাস্তব জীবনের শত তুচ্ছতার মধ্যে তাঁহাকে না পাওয়ার দুঃখ তিনি ভুলিয়াছেন—'সেদিনকার প্রত্যক্ষ ধাবমান ঘটনাবলীর অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁকে যে দেখিনি সে ভালোই হয়েছে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা জন্মমুহূর্তেই স্থান গ্রহণ করেন মহাযুগে, চলমান কালের অতীত কালেই তাঁরা বর্তমান দূরবিস্তীর্ণ ভাবী কালে তাঁরা বিরাজিত।'[১] রবীন্দ্রনাথ জানেন—বুদ্ধদেব মহামানব। এইজন্য নিজের কালের সীমানার মধ্যে তিনি নিঃশেষিত হইতে পারেন নাই। ভাবী যুগের মানুষ ইন্দ্রিয়গতভাবে তাঁহাকে কাছে না পাইলেও, অন্তরগতভাবে তাঁহাকে জীবনে উপলব্ধি করিতে পারে।

কবির মতে বুদ্ধদেব যদি প্রবল প্রতাপান্বিত রাজারূপে অথবা দিগ্বিজয়ী বীররূপে[২] জন্মগ্রহণ করিতেন তবে তিনি সেযুগের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সেই যশোভাতি সে যুগের সীমানার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত। কিন্তু বুদ্ধের জন্ম মহাযুগে—চলমানকালের ঊর্ধ্বে মহাযুগের পটভূমিকায় চিরকালীন বুদ্ধের আবির্ভাব। তিনি লিখিয়াছেন—'তাই আজ ভগবান বুদ্ধকে দেখছি যথাস্থানে মানবমনের রত্নসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, যার মধ্যে অতীত কালের মহৎপ্রকাশ বর্তমানকে অতিক্রম করে চলেছে। আপনার চিত্তবিকারে আপন চরিত্রের অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ আজও তাঁরই কাছে বলতে আসছে—বুদ্ধের শরণ কামনা করি।'[৩] কবি বিশ্বাস করেন মনুষ্যত্বের খণ্ড প্রকাশ জ্ঞানীর তত্ত্বালোচনায়, বীরের শৌর্যে, রাষ্ট্রনীতিবিদের কূটকৌশলে, ইহারা মানুষের চালক, ইতিহাসের গতিপথের নিয়ামক, কিন্তু মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতম প্রকাশ ইহাদের মধ্যে নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন। যাঁর চেতনা খণ্ডিত হয় নি রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।'[৪]

১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ২।

২। 'বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজাণ্ডার করেন নি'—ঘরে বাইরে, বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃঃ ১৮২। ৩, ৪। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৩-৪।

ভগবান বুদ্ধের মধ্যে কবি মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণ প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—'মানুষের সেই মহাভাগ্য ঘটেছে মানুষের সত্যরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। ন ততো বিজুগুপ্সতে, আর তাঁকে গোপন করবে কিসে, দেশকালের কোন সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে, কোন সত্ত্ব প্রয়োজনসিদ্ধির প্রলুব্ধতায়?'[১]

ভারতবর্ষের মাটিতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। কিন্তু ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে তিনি আবদ্ধ থাকেন নাই। কারণ বুদ্ধ আপনার মধ্যে সকলকে এবং সকলের মধ্যে নিজেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর নিকট সেই মহান্ বার্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। সেদিন—'ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করেনি, এই জন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশবিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন, ব্রহ্মদেশ, জাপান, এল তিব্বত, মঙ্গোলিয়া. দুস্তর গিরিসমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবার্তার কাছে। দূর হতে দূরের মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি—মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ।'[২] এই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে মানুষের পূজার অর্ঘ্যও উৎসর্গিকৃত হইয়াছে। কবির ভাষায়—'অদ্ভুত অধ্যবসায়ে মানুষ রচনা করলে বুদ্ধ-বন্দনা, মূর্তিতে, চিত্রে, স্তূপে। মানুষ বলেছে, যিনি অলোকসামান্য দুঃসাধ্য সাধন করেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাঁদের মনে, নিবিড় অন্ধকারে গুহাভিত্তিতে তারা আঁকল ছবি, দুর্বল প্রস্তরখণ্ডগুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্মাণ করলে মন্দির, শিল্প প্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্প সম্পদ্ রচনা করলে, শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাশ্বত কালকে এই মন্ত্র দান করে গেল: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। জাভাদ্বীপে বরোবুদরে দেখে এলুম সুবৃহৎ স্তূপ পরিবেষ্টন করে শত শত মূর্তি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতককথার বর্ণনায়, তার প্রত্যেকটিতেই আছে কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ, কোথাও লেশমাত্র আলস্য নেই, অনবধান নেই, একে বলে শিল্পের তপস্যা, একই সঙ্গে এই তপস্যা ভক্তির—

১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৬।
২। ঐ, পৃঃ ৬।

খ্যাতিলোভহীন নিষ্কাম কৃচ্ছ্রসাধনায় আপন শ্রেষ্ঠশক্তিকে উৎসর্গ করা চিরবরণীয়ের, চিরস্মরণীয়ের নামে।······সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান্ পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধ্বনি, শৈলশিখরে মরুপ্রান্তরে, নির্জন গুহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে সেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে।'[১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে রণক্লান্ত পৃথিবীর বেদনাহত মূর্তি, পৃথিবীর জাতিতে জাতিতে সেই পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বেষ ও লোভের হানাহানি, ভ্রাতৃ-বিরোধের সেই ক্রুর করাল পরিণতি রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি বিশ্বাস করেন বুদ্ধদেবের সাম্য মৈত্রীর বাণী, ক্ষমা ও করুণার বাণীই এই মরণোন্মুখ বিশ্বকে প্রলয় যাত্রার তাণ্ডবতা হইতে রক্ষা করিতে পারে। ভগবান বুদ্ধ একদা বলিয়াছিলেন—

যো সহস্‌সং সহস্‌সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে,
একঞ্চ জেয্যমত্তানং স বে সঙ্গামজুত্তমো।[২]

যদি কেহ সংগ্রামে সহস্রগুণ সহস্র ব্যক্তিকে জয় করেন, এবং অপর কেহ কেবল নিজেকেই জয় করেন, তবে তিনিই সংগ্রামে জয়ীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই মহাসঙ্কটের দিনে এইজন্যই কবি তাঁহার শরণ লইয়াছেন। বলিয়াছেন—'পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করিতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্রোধেন জিনে কোধং,' আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।······আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।'[৩] যথার্থই বুদ্ধদেবের মৈত্রীর বাণী ও বিশ্বপ্রেমের বাণী যাহা একদা এই ভারতবর্ষে উচ্চারিত হইয়াছিল পরিপূর্ণতম সার্থকতায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাহা প্রতিভাত হইয়াছে। সমস্ত

১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৭—৮
২। ধম্মপদ, সহস্‌স বগ্‌গো, শ্লোক সং ১০৩।
৩। বুদ্ধদেব, পৃঃ ১১-১২।

বিশ্বকে তিনি আপন করিয়া লইবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানব প্রেমের অভিপ্রকাশ তাঁহাকে বিশ্বমানবতার পূজারীদের মধ্যে এক চিরস্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। মানব-দরদী কবি সেই সর্বব্যাপী অপরিমেয় মৈত্রী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াই মহামানবকে আহ্বান জানাইয়াছেন—'তুমি আপনার প্রকাশ দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো।'

কবির দৃষ্টিভঙ্গীর ঔদার্যে বৌদ্ধ ও ঔপনিষদিক চিন্তাধারার আশ্চর্য সুন্দর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। তাঁহার মতে বৌদ্ধ মৈত্রী-সাধনার চরমে উপনিষদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি। 'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—'অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।'[১] তাঁহার মতে ব্রহ্মে বিহার করিয়া সাধক উপনিষদের ভূমাকে উপলব্ধি করিতে পারেন।

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—'আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্ব বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।' যথার্থই বৌদ্ধযুগের উত্তরাধিকার তিনি পরিপূর্ণরূপে লাভ করিয়াছিলেন। স্তবে, বন্দনায়, কাহিনীতে বৌদ্ধযুগ এত মহনীয় রূপে বাংলা সাহিত্যে আর কখনও প্রতিষ্ঠা পায় নাই। মহৎ চিন্তা, মহান্ উক্তি এবং সর্বপ্রসারিত প্রাণময় সৃষ্টির আবেদনে বৌদ্ধচিন্তা বারে বারে তাঁহার স্মরণতীর্থে আবির্ভূত হইয়াছে। পরম সৌগতরূপে বুদ্ধের চরণে তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রণতিও নিবেদিত হইয়াছে। প্রশ্ন আসে বৌদ্ধধর্মের কোন্ আদর্শের প্রেরণা নবযুগের শ্রেষ্ঠতম কবিকে এতখানি মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল? বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ, অনিত্য, অনাত্মা প্রভৃতি তত্ত্ব তাঁহাকে বিশেষ প্রভাবিত করিতে পারে নাই। ইহার পঞ্চশীল, দশশীল প্রভৃতি চারিত্রিক নীতিকথাও তাঁহার প্রাণে রসের স্পর্শ জাগাইতে পারে নাই। শীল সম্বন্ধে তিনি 'কালান্তর' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলে পঞ্চশীল সে শুধু 'না'-এর সমষ্টি, কিন্তু সকল বিধিনিষেধের উপরেও অন্তরে আছে ভালবাসা, সে 'না' নয়, 'হাঁ'। মুক্তি তাঁর মধ্যেই'।[২] বৌদ্ধনির্বাণও তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগ্রত করিয়াছে—সে কি শূন্যতা, মানবমনের এত আশা-আকাঙ্ক্ষা, এত কামনা বাসনা, এই রূপরস শব্দ-স্পর্শ গন্ধময় পৃথিবীর ভোগের বিচিত্র আয়োজন মানুষ ত্যাগ করিবে কিসের কামনায়? শুধু সর্বশূন্যতা বা অনস্তিত্বের জন্য, কেবল

১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ২২।
২। রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৫৭।

প্রদীপ শিখার ন্যায় নিঃশেষে নিবিয়া যাওয়ার জন্যই মানুষের এত ত্যাগ, এত তপস্যা? কিন্তু কেবল সর্বশূন্যতার বন্ধ্যাবাণী শ্রবণ করাইবার জন্যই পৃথিবীতে বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহা বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার মতে বুদ্ধের বাণী অমৃতনিস্যন্দী—তাহা পূর্ণতার বাণী, রিক্ততার নহে। এইজন্যই বৌদ্ধধর্মের নিগেটিভ দিক—দুঃখনিবৃত্তি, বাসনাজয়, অনিত্য, অনাত্মা প্রভৃতি তত্ত্ব তাঁহাকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন—'যদি দুঃখ দূরই চরম কথা হয় তাহলে বাসনালোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়—কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালবাসা কেন, দয়া কেন?'[১] বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী ভাবনা ও বিশ্বতোমুখী বিশুদ্ধ প্রেমের আবেদন কবির প্রাণে প্রেরণা জাগাইয়াছে। তাঁহার মতে বুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল অনির্বচনীয় আনন্দলোক প্রাপ্তি। কিন্তু অহংবোধ নির্বাপিত না হইলে এই বিশুদ্ধ আনন্দলাভ সম্ভব নয়। এইজন্যই বুদ্ধদেব অহং নির্বাণের সাধনা অর্থাৎ বাসনা বিলোপের সাধনা করিয়াছিলেন। 'নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চার দিকে ভিড় করে আসত না।'[২] তিনি বিশ্বাস করেন বুদ্ধের সাধনা কেবল নঙর্থক নহে, সর্বশূন্যতার মধ্যে বাসনানির্বাপনই ইহার চরম কথা নহে, এ সাধনা মঙ্গলের, প্রেমের—যে প্রেম আদানবিহীন প্রদানে, আনন্দ ও পরিপূর্ণতায় সাধকের চিত্তকে সর্বপ্রাণীর প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলে। বিপুল বৌদ্ধসাহিত্যের যে রত্নকণিকা রবীন্দ্রনাথের প্রাণের তারে পরশমণির স্পর্শ দিয়াছে তাহা হইতেছে—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।[৩]

বৌদ্ধধর্মের 'ব্রহ্মবিহার' ভাবনা এক অভিনব তাৎপর্যে তাঁহার চিন্তারাজ্যে ধরা দিয়াছে। 'কালান্তর' গ্রন্থে ব্রহ্মবিহারের সংজ্ঞাও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন—'সকল জীবের প্রতি প্রেম যখন অপরিমেয় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন কামনা করব সকলের ভালো হোক, তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রহ্মবিহার অর্থাৎ

১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৫৫। ২। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৫৬।
৩। মেত্তসুত্ত, সুত্তনিপাত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

বৃহৎ সত্য যিনি তাঁকে পাওয়া। এইটিই সদর্থক কেবলমাত্র পঞ্চশীল বা দশশীল নঙর্থক।'[১] তাঁহার মতে বুদ্ধদেবের অনুশাসন সর্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন। নিজের বা নিজের সন্তানের জন্য মানুষের যে দুঃসাধ্য কর্ম বা নিজ দল ও সম্প্রদায়ের জন্য যে দুরূহ ত্যাগ স্বীকার তাহার উদাহরণ আহরণ করিয়া বুদ্ধের করুণার ব্যাখ্যা করা চলে না। এই করুণা কেবল প্রভূত প্রাচুর্যে ও স্বতঃপ্রবৃত্ত অযাচিত প্রদানে বিশ্বের সর্বভূতের প্রতি ধাবিত হইয়াছে। কোথাও তাহা বাধা মানে নাই। এই করুণার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—'তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য।'[২] যথার্থই বুদ্ধদেব তাঁহার তপস্যালব্ধ মহাবোধি কেবল নিজের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। যদি তাহা রাখিতেন তবে গভীর অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্যপ্রদেশের গুপ্তস্থানে অবস্থিত অজ্ঞাত জলসঞ্চিকার ন্যায় তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথের মতে বুদ্ধদেব করুণার্ণব—পুঞ্জ পুঞ্জ জলভারাক্রান্ত মেঘের সৃষ্টি করিয়া দীর্ঘকালের পিপাসার্ত ধরিত্রীকে তিনি করুণাধারায় সিক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহাই বুদ্ধদেবের মৈত্রী ও করুণার বৈশিষ্ট্য। 'জাতক'গ্রন্থের মহৎ আবেদনও কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। 'জাতক' গৌতমবুদ্ধের অতীত জীবনের কাহিনী। বোধিসত্ত্বের করুণা, দয়া, আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের কণিকা সঞ্চয়ই ক্রমশঃ অনন্ত অসীম করুণা সমুদ্র 'বুদ্ধ'রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধসাহিত্যের এই গৌরবোজ্জ্বল পরিকল্পনায় কবি একেবারে মুগ্ধ বিস্মিত হইয়াছেন। জাতককার অতি সরল সহজভাবে বিশ্বের সর্বপ্রাণীর হৃদয়ের করুণাকণা যেন তিল তিল আহরণ করিয়া করুণারূপী বুদ্ধের মহান্ আবির্ভাবকে সুগম করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অতি সহজ অনাড়ম্বরভাবে জাতককারের এই সরলতার বর্ণনা করিয়াছেন—

'মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোঁপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধ চক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে, দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই যে তাঁর কোনো এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, এ কথা বলতে জাতককথা লেখকের একটুও বাধত না কেননা, গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পৌঁছেছে মুক্তির মধ্যে।'[৩] জাতক এক সর্বব্যাপী বিশ্বানু-

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৫৭।
২। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৫০। ৩। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৬২-৬৩।

ভূতির বাহকরূপে কবিকে প্রেরণা দিয়াছে। যিনি বুদ্ধরূপে বিশ্বের বরণীয় তিনিও অতীত যুগে বহুতর যোনিতে জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং বিশ্বের সর্বজীবের মধ্যে একত্বের উপলব্ধি জাতকের শিক্ষা।

কঠিন কৃচ্ছ্রতা বা দুস্কর তপস্যাকে বুদ্ধদেব স্বীকার করেন নাই। বুদ্ধদেবের সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। অপ্রাপ্তির ব্যর্থতায় তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার পর বোধিদ্রুমের নীচে আসিয়াছেন সুজাতা, হস্তে ভক্তি ও প্রীতির অর্ঘ্য। বুদ্ধদেব সুজাতার ভক্তি ও শ্রদ্ধার, প্রীতি ও সেবার অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন, এবং চরম সত্যরূপে স্বীকৃতিও প্রদান করিলেন। কবি 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'কৃচ্ছ্রসাধনে মুক্তি নেই, মুক্তি আছে প্রেমে। সেই ভক্তহৃদয়ের অন্ন উৎসর্গের মধ্যে মাতৃ-প্রাণের যে সত্য ছিল সেই সত্যটি থেকেই কি বুদ্ধ বলেন নি এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই অপরিমেয় প্রেমে সমস্ত বিশ্বকে আপন করে দেখাকেই বলে ব্রহ্মবিহার। অর্থাৎ মুক্তি শূন্যতায় নয়, পূর্ণতায়।'[১] প্রশ্ন আসে তবে শীল বা চরিত্রনীতিসমূহের সৃষ্টি হইয়াছিল কোন্ প্রয়োজনে? তাঁহার মতে বুদ্ধদেব দুঃখনিবৃত্তির পথে দুঃখস্বীকারকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন কারণ—দুঃখ স্বীকার ব্যতীত, ত্যাগ ও কঠিন সাধনা ব্যতীত মানুষ আপন মহৎ সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। বুদ্ধদেব তপস্যার বলে জানিয়াছিলেন যে আবরণ মানুষের আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে তাহা উন্মোচন করিতে পারিলেই মানুষের মুক্তি। তিনি সেই আবরণ দূর করিবার জন্যই শীলের প্রবর্তন করিয়াছেন। শীল আচরণে মানুষের আত্মা বাধামুক্ত হইবে—আত্মার বিশুদ্ধ নির্মল স্বরূপ উদঘাটিত হইবে। আত্মার এই বিশুদ্ধ স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ 'শূন্যতা' বা 'নৈষ্কর্ম্য' বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বলিয়াছেন—'সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়। সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।'[২]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বুদ্ধের জীবনে মানবপ্রেমের চরম অভিপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। পৃথিবীর দুঃখবেদনার জ্বালায় জর্জরিত মানুষের মুক্তির পন্থা

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪০০।
২। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৫২।

নির্ণয়ের জন্যই তিনি অভিযাত্রী। তিনি মানুষে মানুষে জাতিবিচার করেন নাই, মানুষের উন্নতির জন্য দেবতার কৃপা অপেক্ষা আত্মাশক্তির উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ—আত্মাশক্তিকে অবলম্বন কর—অত্ত সরণা অনঞঞ সরণা'। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যে দেবদুর্লভ বোধিলাভ করিয়া সকল দেবতার উপরে বুদ্ধদেব আপনার আসন পাতিয়া লইয়াছিলেন সেই বোধিলাভ সকল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কারণ বুদ্ধ অসংখ্য জীবজন্তুর ভিতর দিয়াই ক্রম উত্তরণের এই চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের এই মানব-স্বীকৃতি বিশ্বকবির অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন 'মানুষের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মানুষের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন, বলেছিলেন, অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে। এই বাণী অসংকোচে সকলকে শুনিয়ে তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করেছিলেন।'[১] এই মহান্ আদর্শের উৎসরণ আমরা কবির জীবনেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মানব মহিমার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাঁহার অন্তরকে বিশ্বাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। যিনি দেশকালের অতীত মহামানব, মানুষের মুক্তি কামনায় তিনি রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, মানুষের দুঃখব্যথা বেদনা ও হাহাকার, অশান্তি ও অসাম্য তাঁহাকে পীড়া দিয়াছিল। অবশেষে অমৃতের সন্ধানে তিনি চির-অভিযাত্রী হইয়াছিলেন—

শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক।[২]

বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ হীনযান ও মহাযান দুই শাখায় বিভক্ত। হীনযান বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর জোর দিয়াছে, চরিত্রনীতির উপদেশই ইহার মুখ্যবস্তু। মহাযান ভক্তির উপর জোর দিয়াছে—'কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই।' রবীন্দ্রনাথ মনে করেন কোনটাই বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ পরিচয় বহন করে নাই। কারণ হীনযানের যে আদর্শ অর্থাৎ চরিত্রনীতির উপদেশ তাহার মধ্যে আনন্দের বা রসের খোরাক নাই—'তাহা ঔষধ, তাহা খাদ্য নহে, তাহার সাড়া পাইলে ছুটিয়া লোক জড়ো হয় না, বরঞ্চ উল্টাই হয়।'[৩] যদিও হীনযানী মতকেই বিশুদ্ধ

১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৬৪।
২। চিত্রা, এবার ফিরাও মোরে, বিশ্বভারতী, পৃঃ ২১। ৩। বুদ্ধদেব, পৃঃ ২৬।

বৌদ্ধধর্মের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে তথাপি এই মতবাদ তাঁহাকে বিশেষ প্রভাবিত করিতে পারে নাই। তিনি লিখিয়াছেন—ইতিহাসের কোন একটা বিশেষ স্থানে যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম বলিব—আর, যাহা মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নব নব খাদ্যকে আত্মসাৎ করিয়া আপন জীবনকে পরিপুষ্ট প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাকে বৌদ্ধধর্ম বলিব না—এই যদি পণ করিয়া বসি তবে কোনো জীবিত ধর্মকে ধর্ম নাম দেওয়া চলে না। বৌদ্ধ ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ অর্থাৎ ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের মধ্যে তিনি বৌদ্ধধর্মের পরিপূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেশকালপাত্র অনুযায়ী কোথাও হয়ত একটা অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে কিন্তু তাহাই বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ পরিচয় বলিয়া তিনি স্বীকার করেন নাই। হীনযান ও মহাযানের তুলনাত্মক আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—

'হীনযানের দিকে যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্মে পূজা ভক্তি বুঝি নাই। প্রত্যক্ষের অতীত কোনো মহৎসত্যকে বৌদ্ধধর্ম বুঝি একেবারেই অস্বীকার করে—আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম নানা বিচিত্ররূপ রস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই'।[১] হীনযান ও মহাযান মতের অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্বকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—'আসল কথা' বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এই দুটা দিকই আছে। সমস্ত বাসনা ও কর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নির্বাণ মুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে 'না' করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নহে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।'[২] এইজন্যই বৌদ্ধধর্মের—'একদিকে স্বার্থপর বাসনাকে ক্ষয় ও অন্যদিকে স্বার্থত্যাগী প্রেমকে সমস্ত সীমা অবলুপ্ত করিয়া বিস্তার করা এই দুই শিক্ষাই যেখানে প্রবল মাত্রায় একত্র মিলিত হইয়াছে, বুঝিতেই হইবে, শূন্যতাই সেখানে লক্ষ্য নহে।'[৩] বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত—'হীনযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে। বৌদ্ধধর্ম সংসারের অতীত কোনো পূজনীয় সত্তাকে স্বীকার যে করে না এ কথাকে আমরা বৌদ্ধধর্মের নিত্য সত্য বলিয়া মানি না—এবং বৌদ্ধধর্ম যে আত্মশক্তির সাধনাকে ভক্তির জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে এ কথাও তাহার চিরসত্য নহে। বৌদ্ধধর্ম এখনো মানুষের জ্ঞান,

১, ২। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৩৫।
৩। ঐ, পৃঃ ৩৬।

ভক্তি ও কর্মের মধ্যে আপনার অমর সত্যকে বাধামুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সেই লক্ষ্য অভিমুখে চলিয়াছে সকল ধর্মেরই গম্যস্থান যেখানে।[১]

বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মে জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয় করিয়াছিলেন। এই সমন্বয়ের ফলে যে বিপুল আলোড়ন বা ভাববন্যা জাগিয়াছিল তাহা ভারতবর্ষের সমস্ত চিন্তা ও মননধারাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত—'বৌদ্ধযুগের পরবর্তী দর্শনে পুরাণে কোথাও বা নবীনরূপে, কোথাও পুরাতনকে নূতন আকার দিয়া, সেই ধারা নানা শাখা-প্রশাখায় নামে আজও প্রবাহিত হইতেছে।'[২] তাঁহার মতে বুদ্ধদেব জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয় করিয়াছিলেন। এই সমন্বয়ের ফলে যে আলোড়ন বা ভাববন্যা জাগিয়াছিল তাহা ভারতবর্ষের সমস্ত চিন্তাশক্তি ও মননধারাকে প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতীয় অধ্যাত্মরাজ্যে অবতারবাদের বীজও রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই প্রথম অঙ্কুরিত দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমত—'বৌদ্ধযুগের পূর্বে আমরা যে বৈদিক দেবতাদিগকে দেখি তাঁহারা স্বর্গবাসী দিব্যপুরুষ। সংসারপাশে আবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করিবার জন্য পরম দয়া যে মানবরূপে মর্ত্যলোকে আবির্ভূত—এই ভাবটির উদ্ভব কি সর্বপ্রথমে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নহে? বৈদিক যুগে কি কোথাও আমরা ইহার কোন আভাস পাইয়াছি।[৩] বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট বুদ্ধ মানুষের সমস্ত স্বাভাবিক সীমানা অতিক্রম করিয়া অলৌকিকত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কবির ভাষায় 'তিনি যেন মূর্তিমান অসীম প্রজ্ঞা, অসীম করুণা। তিনি মুক্ত হইয়াও কেবল জীবকে দুঃখ হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন—সে তাঁহার কর্মফলের অনিবার্য বন্ধন নহে, সে তাঁহার প্রেমের দ্বারা, দয়ার দ্বারা স্বেচ্ছারচিত বন্ধন'।[৪] 'কোন বিশেষ একজন মানুষকে এমন করিয়া' দেখার মধ্যেই অবতারবাদের উৎপত্তি। বৈষ্ণবধর্ম যে বৌদ্ধধর্মের নিকট হইতে অবতারবাদ ও ভক্তিবাদকে গ্রহণ করিয়াছে এই অভিমত রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করেন।

বুদ্ধদেব বিশ্বমানবের প্রতি চিরজাগ্রত করুণায় সকলের জন্য আলোকতীর্থের দ্বার খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। সমস্ত মানবের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে নরশ্রেষ্ঠরূপে বন্দনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৪৬—৪৭। ২। ঐ, পৃঃ ৪১।
৩। ঐ, পৃঃ ৩২। ৪। ঐ, পৃঃ ৩৩।

'একদিন বুদ্ধ বলিলেন, আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব। দুঃখ তিনি সত্যই দূর করতে পেরেছিলেন কিনা সেটি বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন'।[১] রবীন্দ্রনাথ মনে করেন—বুদ্ধদেব সর্বমানবের মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন—তাহা বুদ্ধের জীবনের একটি মহামুহূর্ত, আবার মানব জাতির নিকটও একটি পরম ঘটনা। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়াই তাঁহার একের জীবন বহুর নিমিত্ত উৎসর্গিকৃত হইয়াছে, আবার তাঁহার সাধনা ও তপস্যা তাঁহার একের না হইয়া বহুর জন্য হইয়াছে। 'সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ' করা—এই মহৎ উদার ভাবসমুদ্রকে রবীন্দ্রনাথ জহ্নুমুনির ন্যায় পান করিয়াছেন এবং আপন হৃদয়পাত্রে তাহাকে গ্রহণ করিয়া জীবনসত্যে পরিণত করিয়াছেন। নিখিল বিশ্বমানবতা ও বিশ্ব-জাগতিকতার জন্য এক গভীর তীব্র আকুলতা তাঁহাকে এই ভাবসমুদ্রের সচেতন বিগ্রহে পরিণত করিয়াছে। নিখিল মানবকে তিনি তাঁহার হৃদয়রাজ্যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন, এবং একত্বের সূত্রে, সাম্যমৈত্রী ও হিংসাবিদ্বেষহীন মানবিক অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার নিকট এই যুগের প্রধান সমস্যা রাজনৈতিক নহে, ধর্মাদর্শের। তিনি চাহিয়াছেন সকল দেশের, সকল জাতির মানুষকে এই মিলনসূত্রে বন্ধন করিয়া মহাভারতের পত্তন করিতে। এই বিশ্বমানবতার নিকট হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান, এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপ-আমেরিকা কোন ভেদাভেদ নাই। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁহার সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে বিশ্বনাগরিক রবীন্দ্রনাথকে মহাযানী ভারতের রূপকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৌদ্ধ মহাযান শব্দও এক বিরাট ঐতিহ্যের দীপোজ্জ্বল প্রভায় সমালোচকের দৃষ্টিরশ্মিতে ধরা দিয়াছে। যে মহান্ আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বমানবিকতার উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে তাহার যথার্থ মূল্যায়নের পক্ষে তাঁহার অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—'প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্মের যে শাখাটি বিশ্বমৈত্রীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রায় সমগ্র এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তুর্কিস্থান থেকে জাপান ও মঙ্গোলিয়া থেকে যবদ্বীপ পর্যন্ত সর্বমানবকে জাতিধর্মনির্বিশেষে একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিল তার নাম মহাযান। যে

১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৫৯—৬০।

মহাতরণী তখন উদ্ভাবিত হয়েছিল সে তরণী ছোট ছিল না। দেশবিদেশের ছোটোবড়ো উচ্চনীচ সকল নরনারীরই ঠাঁই হয়েছিল সে মহাতরণীতে। গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সমগ্র ভারতবর্ষই এই মহাযানধর্মী। এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস বস্তুতঃ এই ভারতমহাযানেরই ইতিহাস। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত আর্য, অনার্য, গ্রীক, পারসিক, শক, হূন, আরব, তুরকি, পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতি কত জাতি যে এই মহাতরণীতে আরোহণ করে একই সার্থকতা, একই অখণ্ড মহাজাতীয়তার লক্ষ্যাভিমুখে যাত্রা করে কালসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বস্তুতঃ ভারতমহাযানের যাত্রাপথই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারত মহাপথরূপে প্রতিভাত হয়েছে।'[১]

যথার্থই রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের অমৃতধারা নিঃশেষে পান করিয়া মহাযানী ভারতের রূপদান করিয়াছেন। তাঁহার মনন ও চিন্তারাজ্যের সর্বতোমুখী সমন্বয়বাদী ভাবধারা ও বিশ্বমৈত্রীর জন্য সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি 'সর্বাস্তিবাদী'রূপে প্রতিভাত হইয়াছেন—

'পূর্বোক্ত বৌদ্ধমহাযান ধর্মের একটি মতবাদ সর্বাস্তিবাদ নামে পরিচিত। 'সর্বাস্তিবাদী'দের দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের ক্ষুদ্রবৃহৎ সমস্ত কিছুরই সার্থকতা স্বীকৃত হয়ে থাকে, কোনো কিছুরই অস্তিত্ব অস্বীকার্য নয়। ভারতদার্শনিক রবীন্দ্রনাথকেও সর্বাস্তিবাদী নামে অভিহিত করলে অন্যায় হয় না। কেননা, ভারতবর্ষকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তাতে মহাভারতবর্ষ গঠনের উপাদান হিসাবে দেশী-বিদেশী প্রাচীন-নবীন সমস্ত জাতিশক্তি ও ধর্মমতেরই সার্থকতা ও উপযোগিতা স্বীকৃত। ভারতবর্ষে তিনি যে মহাজাতি সমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন সেই সমন্বয়ের সাধনায় প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক ধর্মেরই সমবেত আত্মোৎসর্গ একান্ত আবশ্যক। 'সবার পরশে পবিত্রকরা তীর্থনীরে' ছাড়া যে মার অভিষেক সুসম্পন্ন হতে পারে না। এ বাণীতো তাঁরই।'[২]

বৌদ্ধ যুগকে রবীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই যুগে ভারতবর্ষ শিল্পে বিজ্ঞানে বাণিজ্যে এবং রাজ্যের সীমানা বিস্তারে সর্ব বিষয়ে উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে। তাহার কারণ এই যুগে ভারতবর্ষ

১। ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১২—১৩।

২। ঐ, পৃঃ ১৩।

সর্ব প্রকার জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরিপূর্ণতার সাধনায় আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধ-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার রবীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে শাক্যসিংহ বুদ্ধকে স্থাপন করিয়াছেন। বুদ্ধের আলো-ঝঙ্কৃত বাণী এবং বৌদ্ধযুগের যাহা কিছু মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম অসীম দাক্ষিণ্যের পরিচয় বহন করিয়া সূর্যালোকের ন্যায় তাহা তাঁহার অন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। আতসকাচের এক পিঠের ব্যাপ্ত সূর্যালোক যেমন অন্য পিঠে সংহত দীপ্তরশ্মি প্রদান করে, তেমনি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-ভারতের বিপুল জ্যোতি-পুঞ্জের সংহত জ্যোতি রবীন্দ্রনাথ। রূপে, রসে, জ্ঞানে, আনন্দে এবং উজ্জ্বল শোভায় বৌদ্ধ-ভারত তাঁহার কাছে ধরা দিয়াছে। বৌদ্ধ-ভারতের মৃত্যুহীন অতীত তাঁহার রচনায় বাঙময় হইয়া উঠিয়াছে। আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে 'যাত্রী' গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—

'সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করেনি, মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্বোধিত করেছিল, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে, সংগীতে, সাহিত্যে। তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায়।'[১] তিনি বিশ্বাস করেন নিষ্ক্রিয়তার বৈরাগ্য প্রচারে বৌদ্ধ-ভারতের কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া যায় নাই, সুন্দরের স্বপ্নে ও বিশ্লেষণীতে মগ্ন হইবার সাধনাও প্রচার করিয়াছে। কেবল অনাসক্তি ও উপেক্ষার বিরাগই ছিল না, ছিল প্রাণপ্রাচুর্য, দাক্ষিণ্য ও আত্মদান। যে মন্ত্রের অনুধ্যানে বৌদ্ধভারত মগ্ন ছিল তাহা—'সন্ন্যাসীর যে মন্ত্র মানুষকে রিক্ত করে, নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু করে, মানবচিত্ত বৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব করে, এ সে মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণ প্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।'[২] এই জন্যই রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্থানে স্থানে বুদ্ধ ও বৌদ্ধযুগের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা বারে বারে নিবেদিত হইয়াছে; একমাত্র বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগ ব্যতীত ভারত ইতিহাসের আর কোন যুগ রবীন্দ্রসাহিত্যে এত-খানি গৌরবের আসন পায় নাই।

বহির্ভারতের বৌদ্ধ দেশসমূহে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে তিনি স্বাগত জানাইয়াছেন। বুদ্ধের বাণী বক্ষে লইয়া বিশ্বপথিক কবি দেশে দেশে, রাজ্যে রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। সমগ্র

১, ২। রবীন্দ্র রচনাবলী, উনবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৫৬।

বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া ভারত-আত্মার সেই চিরন্তন বাণীই তাঁহার কণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছে। সিংহল, শ্যাম, চীন, জাপান, মালয়, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, প্রভৃতি বৌদ্ধদেশকে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান ভারতের তীর্থ-ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত করিয়াছেন। মহাসত্যের বন্যা একদিন ভারতবর্ষের তটরেখাকে প্লাবিত করিয়া এই সমস্ত দেশকেও ভাসাইয়া দিয়াছিল। আজ ভাটার টানে মূল উৎসের প্রাণ-প্রবাহিনী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে কিন্তু এই সমস্ত দেশের সঞ্চয় এখনও পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন—'এই কারণেই সেই সকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেন না, ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেই সব জায়গাতেই।'[১] এমন ভাবে তিনি এই সব দেশের বর্ণনা করিয়াছেন যেন তাঁহার সঙ্গে ইহাদের বহুকালের পরিচয় ও প্রগাঢ় তদাত্মতা রহিয়াছে। সভ্যতার অতি প্রত্যূষকাল হইতে ভারত ও চীন পরস্পরের নিকট সান্নিধ্যে আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মতে চীনের সঙ্গে ভারতের এই নৈকট্য রাজনৈতিক কারণে বা বাহুবলে স্থাপিত হয় নাই, হইয়াছে আধ্যাত্মিক কারণে। দুই হাজার বৎসর পূর্বে মননশীলতার বাসভূমি ভারত হইতে মৈত্রীর বাণী, বিনয় ও সততার বাণী চীনে প্রচারিত হইয়াছিল। একদা চীনের সঙ্গে ভারতের এই যে আত্মিক সেতু গড়িয়া উঠিয়াছিল কবির আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা পুনর্নির্মাণ করিবেন।

কবির চীন ভ্রমণ সর্বাংশে সার্থক হইয়াছিল। চীনদেশের বৌদ্ধতীর্থ লংমেন, হাজার খানেক বৌদ্ধগুহা এবং মন্দিরগাত্রের বুদ্ধের জীবনকাহিনীর বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বৌদ্ধ দেশসমূহের সঙ্গে কবি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ভারতের সুগম্ভীর মহিমোজ্জ্বল প্রশান্ত মূর্তি তিনি বহির্ভারতেই দর্শন করিয়াছিলেন। ভাববিমুগ্ধ ভাষায় 'কালান্তর' গ্রন্থে তাহার স্বীকৃতিও দিয়াছেন—'ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।'[২]

১। বুদ্ধদেব, পৃঃ ৬১।

২। রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৩৭১।

কবির জাপান দেশ ভ্রমণকালে জাপানীরাও স্বীকার করিয়াছে তাহাদের চরিত্রের সদ্‌গুণরাজি—সুগম্ভীর ধৈর্য, আত্মসংযম, সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধের প্রেরণা তাহারা ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের নিকট পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে উদ্ভূত সে দেশের জনগণের চরিত্রে ও জীবনযাত্রায় সামঞ্জস্যবোধের অভাব কবিকে পীড়িত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী সম্বন্ধে এক জাপানবাসী বৌদ্ধের ব্যাখ্যা কবির অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার মতে—'মৈত্রী কেবল একটা হৃদয়ের ভাব নয়, এ একটা বিশ্ব সত্য, যেমন সত্য এই আকাশের আলোক, এ তো কেবল কল্পনা নয়, ভাব নয়।'[১]

আধুনিকতার বিচিত্র আয়োজনের মধ্যেও ব্রহ্মদেশের একটি বৌদ্ধমন্দির অতীত যুগের ব্রহ্মদেশের প্রতীক রূপে কবির নিকট ধরা দিয়াছে। এই মন্দির দেখিয়া 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থে আবেগোচ্ছল হৃদয়ে তিনি লিখিয়াছেন—

'আধুনিকতার এই প্রাচীরের মধ্যে দেশের একটা গবাক্ষ হঠাৎ একটু খোলা পেয়েছিলুম। ...বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।'[২] ব্রহ্মীরা তাহাদের সংসারে ও মন্দিরে—বাস্তব জীবনে ও অধ্যাত্মজীবনে কোন পার্থক্য রাখে নাই। মন্দিরের চারিদিকে কেনাবেচা, রান্না, ঘরকন্না, খাওয়া-দাওয়া সমস্তই চলিতেছে, সেখানে মাছ-মাংসও বিক্রয় হইতেছে। 'মন্দিরের চারিদিক নিরালা নয়, অথচ নিভৃত; স্তব্ধ নয়, শান্ত। ...সে মন্দিরে গাম্ভীর্য নেই, কারুকার্যের ঠেসাঠেসি ভিড়; সমস্ত যেন ছেলে মানুষের খেলনার মতো।'[৩]

জাভার বেরোবুদুরের মন্দিরের গঠন সৌষ্ঠব কবির মনকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি 'যাত্রী'গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'এটা যেন কেবলমাত্র একটা আধারের মতো। বহুশত বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের জাতককথার ছবিগুলি বহন করবার জন্যে মস্ত একটি ডালি।'[৪] কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরের ভাস্কর্য ও মূর্তিসমূহ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, ইহারা 'প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ, অথচ তার মধ্যে ইতর অশোভন বা অশ্লীল কিছুমাত্র নেই।'[৫] তাঁহার মতে—উচ্ছৃঙ্খলতা বর্জিত শোভন ও সুসংযত প্রকাশই বৌদ্ধভারতের

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭।
২। ঐ, উনবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮।
৩। ঐ, পৃঃ ৩০৯।
৪, ৫। ঐ, পৃঃ ৫২০,

আদর্শ। জীবজন্তু হইতে রাজা ভিখারী সকলেই বৌদ্ধশিল্পীর নিকট সমান শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। অন্যান্য মন্দিরে দেবদেবী ও দেবতুল্য মহাপুরুষের জীবন আখ্যান স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এই মন্দিরে মানুষ হইতে ভিখারী পর্যন্ত সকলের অবারিত প্রবেশ, কেবল মানুষ নয়, মনুষ্যেতর জীব-জগতও বাদ যায় নাই। জীবনের অতি সামান্য বস্তুও পরম শ্রদ্ধা ও সরলতায় মন্দির গাত্রে স্থান পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ-সভ্যতার পুণ্যশ্লোক বাণীবাহক। সমগ্র এশিয়াখণ্ডে, শুধু এশিয়া খণ্ডেই নয়, পৃথিবীর সমগ্র বৌদ্ধধর্মানুরাগী দেশে বৌদ্ধ সভ্যতার জন্মদাত্রী ভারতের বাণী তিনি বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে জর্জরিত ইউরোপের নিকটও তিনি প্রাচ্যের বাণী, বুদ্ধের মানব মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছেন।

'ধম্মপদং'[১] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে, ভোগ ও ঐশ্বর্য অপেক্ষা ত্যাগ ও তিতিক্ষাকে অধিকতর গৌরবদান করিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতা কর্মকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত, আর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করিয়া, কল্যাণকে বরণ করিয়া সমৃদ্ধ। বৌদ্ধশাস্ত্র 'ধম্মপদ' গ্রন্থে কবি প্রাচীন ভারতের সেই মর্মবাণী শ্রবণ করিয়াছেন। সমস্ত কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে উঠিয়া অনাসক্ত ধ্যানদৃষ্টিতে ভারতপুরুষ জগৎ ও জীবনকে দর্শন করিয়াছেন। 'ধম্মপদং' প্রবন্ধ তাঁহার সেই জীবন-দর্শনের বাক্ প্রতিমা।

মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বহু নীতিবাক্য সমাজে বুদ্ধের পূর্বে ও সমসাময়িককালে প্রচলিত ছিল। এইজন্যই ধম্মপদের কোন কোন শ্লোকের সঙ্গে মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, মনুসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থের ভাবগত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবসাদৃশ্যের কারণ উল্লেখ করিয়াছেন—

'এই সকল ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।...বুদ্ধ এইগুলি চতুর্দিক হইতে সহজে আকর্ষণ করিয়া, আপনার

১। প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত এই প্রবন্ধটি চারুচন্দ্র বসু প্রণীত 'ধম্মপদং' নামক অনুবাদ গ্রন্থের সমালোচনারূপে লিখিত। 'ধম্মপদ' পালি খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত। খুদ্দকনিকায় ১৫ খানি গ্রন্থের সমষ্টি। এই ১৫ খানি গ্রন্থের মধ্যে ধম্মপদ, জাতক, থেরথেরী গাথা প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন। পালি 'ধম্মপদ' গ্রন্থে ৪২৩টি গাথা ছাব্বিশটি বর্গে বিভক্ত। আচার্য বুদ্ধঘোষ পালি ভাষায় 'ধম্মপদ-অট্ঠকথা' নামে ইহার ভাষ্য রচনা করেন।

করিয়া সুসম্বদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন—যাহা বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া মানবের ব্যবহারযোগ্য করিয়া গেছেন'।[১] সুতরাং 'ধম্মপদ' প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মচিন্তা ও মননের একটি মহিমোজ্জ্বল স্বাক্ষর, 'ভারতবর্ষের চিত্তের' একটি শ্রেষ্ঠ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের মতে 'ভারত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যেই লুকায়িত আছে। এই শাস্ত্রসমূহের পরিচয়ের অভাবেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পঙ্গু হইয়া আছে।' ভারতীয় তরুণ সম্প্রদায়কে তিনি বিস্মৃত অনাদৃত বৌদ্ধশাস্ত্রের উদ্ধার সাধনে প্রণোদিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সংস্কৃত ও বৌদ্ধসাহিত্যের আদর্শ ও ভাবধারার নব সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাঁহার ভারত অর্চনা সমাপ্ত করিয়াছেন।

বুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্য অশোককে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারত ইতিহাসের দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বরণ করিয়াছেন। অশোকের চরিত্র অবলম্বনে যদিও তিনি কোন নাটক বা কাব্যাদি রচনা করেন নাই[২], কেবল প্রবন্ধে স্থানে স্থানে অশোকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি ত্যাগ, বিশ্বমৈত্রী এবং বুদ্ধের প্রতি আনুগত্যের দৃষ্টান্ত আহরণ করিতে গিয়া তিনি অশোক ও অশোকযুগের ভারতকে বারে বারে স্মরণ করিয়াছেন। অশোক বিষয়ক গবেষণা কর্মের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন প্রভৃতি গবেষকদের বৌদ্ধভারতের ঐতিহাসিক গবেষণা, গিরিশচন্দ্রের 'অশোকচরিত' নাটক এবং ভিনসেণ্ট স্মিথের Asoke, The Buddhist Emperor of India এবং Rhys davids-এর Buddhist India তাঁহাকে অশোকযুগের ভারতের প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। অশোকের দিগ্বিজয়—যে দিগ্বিজয়ে এক বিন্দু রক্তপাত হয় নাই অথচ সিংহলে, চীনে, জাপানে, ব্রহ্মদেশে দিকে দিকে ভারতের মহিমা সগৌরবে প্রচারিত হইয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিজয়কাহিনীর তুলনা নাই। সর্বসাধারণের মঙ্গলকার্যে নিযুক্ত রাজশক্তির এই অমিত তেজকে রবীন্দ্রনাথ পরম শ্রদ্ধায় স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।

রাজধর্মের দুইদিক। একদিকে দণ্ডনীতি—শক্তির অহঙ্কারের দিক আর একদিকে সামাজিক প্রথা, চিরাচরিত নিয়ম, দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির

১। প্রাচীন সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৩৬৬, পৃঃ ৮২। ২। ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে অশোক' প্রবন্ধে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথ কেন অশোকচরিত অবলম্বনে কাব্য নাটকাদি রচনা করেন নাই তাহার ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন।

সংরক্ষণের, আইন, শৃংখলা, ও সাম্যের দিক—এককথায় জনসেবার দিক। মানবপ্রেমিক অশোক রাজধর্মের শেষ দিকটাকেই তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। যুদ্ধ, রক্তপাত, বহুলোকের দুঃখ, এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া যে রাজ্যজয় 'পিয়দসি' কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সেইপথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে রাজচক্রবর্তী সম্রাটের মধ্যে মঙ্গলশক্তির মহিমারূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 'ধর্ম' গ্রন্থে কবি তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় লিখিয়াছেন—'এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট্ অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্যে মঙ্গলসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী সুতীব্র তাহা আমরা সকলেই জানি—সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মতো গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না—ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্য বিস্তার নহে—ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য—ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে এক মুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো রাজার বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত বিস্মৃত ধূলিস্মাৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির মহান্ আবির্ভাব ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে।'[১]

সৌন্দর্যবোধ ও ভোগবিলাস একসূত্রে গ্রথিত হইবার নহে। রবীন্দ্রনাথের মতে অশোক তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। সম্রাট্ অশোক তাঁহার ভোগকে—তাঁহার প্রমোদ উদ্যান, রাজবাটি, প্রভৃতিকে অমরতা প্রদান করিতে চাহেন নাই। নিজের সমস্ত মহত্ত্ব দিয়া যিনি মহত্তম তাঁহার উদ্দেশ্যেই অশোকের শ্রেষ্ঠ প্রণতি নিবেদিত হইয়াছে। এইজন্যই "যে পুণ্যস্থানে ভগবান বুদ্ধ মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন রাজচক্রবর্তী অশোক সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজের ভোগকে এই পূজার অর্ঘ্য তিনি এমন করিয়া দেন নাই।'[২]

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৩৯৭।
২। ঐ, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, সাহিত্য, পৃঃ ৩৬৮।

বুদ্ধশিষ্য অশোক তাঁহার প্রজাবর্গের হিতার্থে মানুষের শ্রেষ্ঠ ভাবনা ও মহত্তম আদর্শের বাণী পর্বতগাত্রে এবং শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে অশোক তাঁহার অনুশাসনকে চিরকালীন মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা দিতে চাহিয়াছিলেন। পাহাড়ও দীর্ঘকাল তাঁহার অনুশাসন বহন করিয়াছে। কিন্তু কালচক্রের আবর্তে সে ভাষার পরিচিতি এই যুগের মানুষ হারাইয়া ফেলিয়াছে। অবশেষে ইউরোপীয় পণ্ডিত Prinsep সাহেব তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন। এই মহৎ ঘটনা কবিকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি অশোকের হৃদয়ের সেই একাগ্র আকাঙ্ক্ষা—চিরকালীন মানুষের হৃদয়ে অমর হইবার বাসনাকে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।[১]

অশোক যুগকেই রবীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়রূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। তাঁহার মতে—'বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তীযুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাঁহার সকল শক্তিই বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে।',[২] এইভাবে অশোকের জীবনাদর্শ ও নীতি কবিকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ধারা সন্ন্যাসী-ভিক্ষুদের নির্জন গিরি গুহা ও বিহারসমূহ হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত জ্ঞানের চর্চা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—'ভারতবর্ষের যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক ও বৌদ্ধযুগ—সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন্, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন—রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায়নি—বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।'[৩]

১। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। পথের সঞ্চয়, যাত্রার পূর্বপত্র, ১৩৫৪, পৃঃ ১৪-১৫।

৩। শিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৯৬০, পৃঃ ১০২।

ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি ভারতবর্ষরূপে গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি বেদ, উপনিষদ ও বৌদ্ধযুগের শিক্ষা ও অনুশাসনের অনুগত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাচীন যুগে ভারত যে সত্যের সাধনা করিয়াছিল—'সে সত্য প্রধানতঃ বণিগ্বৃত্তি নয়, স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্য ব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্য তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকে প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সেই সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।'[১]

বুদ্ধদেবের সময়ে দেবভাষা সংস্কৃত ছিল বিশ্বজ্ঞানের ভাষা, লোকভাষা ছিল প্রাকৃত। লোকগুরু বুদ্ধ লোকভাষাতেই দেশনা প্রদান করিয়াছিলেন।[২] সর্বলোক-হিতব্রতী সম্রাট অশোকও প্রত্যেক স্থানের আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষাতেই প্রজাগণের নিমিত্ত শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন লোকভাষাকে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম সেদিন সমগ্র ভারতের চিত্তে আশ্রয় পাইয়াছিল। কেবল ভারতবর্ষেই নয়, বৌদ্ধধর্ম যে একদিন পৃথিবী জয় করিয়াছিল তাহার কারণ ইহা যে দেশে গিয়াছে সেই দেশবাসীর মাতৃভাষাকেই বাহনরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ এই সত্যই মানিয়া লইয়াছেন—'মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এই জন্যেই সে সকল দেশে সে ধর্ম সর্বজনের অন্তরের সমগ্রী হতে পেরেছে। এক একটি সমগ্র জাতিকে মানুষ করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।'[৩] বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন এবং বাংলা সাহিত্যকে শিক্ষার ভিত্তিরূপে স্থাপন করা ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনা। এই সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি তাঁহার 'শিক্ষা' গ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধ ও মহাপ্রভু চৈতন্যের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—'কোন শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে

১। শিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৯৬০, পৃঃ ১২৬।
২। দ্রষ্টব্য, অনুযানামি ভিক্খবে, সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণিতুন্তি।
৩। শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৩।

হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে, তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সঞ্জীবিত, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়। বুদ্ধ সেই জন্য পালি ভাষায় ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।'[১]

বৌদ্ধভারতের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা বর্ষিত হইয়াছে। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' প্রবন্ধে তিনি নালন্দা বিক্রমশীলা, প্রভৃতি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'এই বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। যে সকল আচার্য অধ্যাপক ছিলেন, হিউয়েন সাঙ বলেন, তাঁহাদের যশ বহুদূরব্যাপী, তাঁহাদের চরিত্র পবিত্র অনিন্দনীয়। তাঁহারা সদ্ধর্মের অনুশাসন, অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। অর্থাৎ যে বিদ্যা প্রচারের ভার ছিল তাঁদের 'পরে, সমস্ত দেশ এবং দূর দেশের ছাত্রেরা তাকে সম্মান করত, সেই সম্মানকে উজ্জ্বল করে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাঁদের 'পরে, কেবল মেধা দ্বারা নয়, বহু শ্রুতের দ্বারা নয়, চরিত্রের দ্বারা, অস্খলিত কঠোর তপস্যার দ্বারা।...সমস্ত দেশের প্রতিভাও আপন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এখানে পূর্ণ শক্তিতে নিবেদন করেছিল। সেই উপলক্ষে দেশ আপন শিল্পরচনার উৎকর্ষ এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিতে ভিত্তিতে মিলিত করেছে, ঘোষণা করেছে, ভারতের কলাবিদ্যা ভারতের বিশ্ববিদ্যাকে প্রণাম করেছে।'[২]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন আপন চিৎপ্রকর্ষের উদার দাক্ষিণ্যে বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ জ্ঞানের বিশ্বদান যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিল। এই বিশ্বদান যজ্ঞে ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীকে স্বাগত জানাইয়াছিল। কারণ—'যার সম্পদে উদ্বৃত্ত আছে সেই ডাকে অতিথিকে। গৃহস্থ আপন অতিথিশালায় বিশ্বকে স্বীকার করে। নালন্দায় ভারত স্বদেশ বিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশ বিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল তার এমন সম্পদ্ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা'।[৩]

১। সাধনা, ১৩০০, আষাঢ়, পৃঃ ১৯৭।

২ ৩। শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৮—২৫৯।

রবীন্দ্রনাথ গভীর আত্মবিশ্বাস সহকারে বলিয়াছেন—বৌদ্ধযুগে যদি নালন্দা তক্ষশীলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়া থাকে তবে ভারতের এই দুর্গতির দিনে ভারতের সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুবর্তনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না কেন? তক্ষশীলা, বারাণসী, নালন্দা ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের আদর্শে তিনি নাগরিক জীবন হইতে দূরে বোলপুরের গ্রাম্য পরিবেশে প্রকৃতির শান্ত ক্রোড়ে তাঁহার শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কবিগুরু তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা ও সত্যদৃষ্টির প্রভাবে বুঝিয়াছিলেন—ব্রহ্মচর্যব্রত অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিতভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুর নিকট তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা—ইহাই ভারতবর্ষের পথ।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বৌদ্ধভারতের গুণমুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু অন্ধ ভক্তির উপর তাঁহার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এইজন্য বৌদ্ধভারতের একটি প্রধান ত্রুটি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। 'পরিচয়'[১] গ্রন্থে তিনি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে সমাজে আর্য-অনার্যের মিলন-সংযম কঠিন ছিল। ইহার প্রবল প্রতিক্রিয়ারূপে ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাব। গৌতমবুদ্ধের ধর্মের প্লাবনে আর্য-অনার্যের মিলনের প্রতিবন্ধকতা দূর হইল। এবং ভারতের অভ্যন্তরে রক্তে ও ধর্মে আর্য-অনার্য সংমিশ্রণ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। কেবল অভ্যন্তরেই নয়, এই সময়ের বিদেশীয় অনার্যগণও দলে দলে ভারতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। কারণ বৈদেশিক শক্তিকে বাধা দিবার যে প্রকৃতি তাহাই তখন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে অনার্যদের ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পাইল যে আর্য-অনার্য সামঞ্জস্য বজায় রাখা আর চলিল না। বৌদ্ধধর্মের গৌরবের দিনে এই অসামঞ্জস্য তেমন অস্বাস্থ্যকর ছিল না। কিন্তু ইহার অবনতির যুগে সমাজজীবনে চরম বিপর্যয় ও দুর্যোগ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'অবশেষে একদিন এই বৌদ্ধ-প্রভাবের বন্যা যখন সরিয়া গেল তখন দেখা গেল সমাজের সমস্ত বেড়াগুলা ভাঙিয়া গিয়াছে। যে একটি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্র্য ঐক্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল, সেই ব্যবস্থাটা ভূমিসাৎ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৩৮—৪০।

ঐক্যের চেষ্টাতেই ঐক্য নষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্যগুলি অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল—যাহা বাগান ছিল তাহা জঙ্গল হইয়া উঠিল।'[১]

এই সময় জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে একটি 'দৃঢ়নিশ্চল কেন্দ্র' এবং 'ধারাবাহিক পরিধিসূত্র' অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। তিনি লিখিয়াছেন—'আমরা কী এবং কোন্ জিনিসটা আমাদের—চারিদিকের বিপুল বিশ্লিষ্টতার ভিতর হইতে এইটাকে উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল। সেই যুগের ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়া সীমাচিহ্নিত করিল। তৎপূর্বে বৌদ্ধসমাজের যোগে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এত দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে সে আপনার কলেবরটাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাইতেছিল না।'[২] রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ব্যাসদেব সংগৃহীত বেদ সেই দৃঢ়নিশ্চল কেন্দ্র এবং মহাভারত সেই ধারাবাহিক পরিধিসূত্র।

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের যে রূপ ধরা দিয়াছে তাহা তাঁহার স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। বৌদ্ধশিল্পিগণ আপন মনের উচ্চতম কল্পনায় বুদ্ধ প্রতিমাকে রূপদান করিয়াছেন। সদ্ধর্ম কোবিদ রবীন্দ্রনাথও কবি-প্রাণের অকুণ্ঠ মমতা ও প্রীতি মিশাইয়া সাহিত্যে বুদ্ধদেবের এক অভিনব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কবির এই চিত্র আবেগ সংরাগে অনবদ্য, সুরুচি, সংযম ও সামঞ্জস্য বোধের সুমিত সমন্বয়ে অতুলনীয়। তাঁহার সৃষ্টিতে ঐশ্বর্যের দীপ্তি নাই, অতি ভক্তির আড়ম্বর নাই, আছে তাঁহার দীপ্তোজ্জ্বল প্রতিভার এক মহান্ পরিচয়। কেবল বুদ্ধই নহেন, পুরা বৌদ্ধযুগটাই ত্যাগ ও করুণায়, আত্মোৎসর্গ ও ধ্যানের স্তব্ধ মহিমায় রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতিভাত হইয়াছে। এককথায় বৌদ্ধধর্মের প্রজ্ঞা ও শান্তি, স্বস্তি ও সন্তোষ তাঁহার মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার সৃষ্টির বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে তিনি চলমান কালের উর্ধ্বে মহাযুগের পটভূমিকায় স্থাপন করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার মৌলিকতা। 'যাত্রী' গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—'ঐতিহাসিক বুদ্ধের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনায়, তাঁহার রোগ, জরার বর্ণনায় ক্ষণকালের

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৩৮-৩৯।
২। ঐ, পৃঃ ৪৪০

বুদ্ধকে পাওয়া যায়। কিন্তু 'সুদীর্ঘকাল মানুষের সজীব চিত্তের সিংহাসনে বসে যিনি অসংখ্য নরনারীর ভক্তি-প্রেমের অর্ঘ্যে অলঙ্কৃত হয়েছেন তিনি চিরকালের বুদ্ধ। তাঁর ছবি সুদীর্ঘ যুগযুগান্তরের পটে আঁকা হয়েই চলেছে। তাঁর সত্য কেবলমাত্র তাঁকে নিয়ে নয়, তাঁর সত্য বহু দেশকালপাত্রের বিপুলতাকে নিয়ে, সেই বৃহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর দৈনিক ঘটনা, তাঁর সাময়িক মানসিক অবস্থার চঞ্চল ছায়ালোকপাত চোখে দেখতেই পাওয়া যাবে না। যদি কোন অণুবীক্ষণ নিয়ে সেইগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি তাহলে তাঁর বৃহৎ রূপটাকে দেখা অসম্ভব হবে।'[১] রবীন্দ্রসাহিত্যে এই 'চিরকালের বুদ্ধই' বিরাজিত। কবির শ্রেষ্ঠ প্রণতিও তাঁহার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হইয়াছে।

রবীন্দ্ররচনাবলী, উনবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৪০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাব্য

'কথা ও কাহিনী', 'জন্মদিনে', 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বুদ্ধদেবের মহানুভবতা, বৌদ্ধযুগের মহৎ ঘটনাবলী এবং বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের পূর্ণতামুখী সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রকাশ ভাবতন্ময় কবির ভাব ও বোধির সমন্বয়ে প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে তাহা আলোচিত হইল।

কথা ও কাহিনী[১]

এই কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতাটির বিষয়বস্তু 'অবদানশতক'[২] হইতে গৃহীত হইয়াছে। মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ উপাসক অনাথপিণ্ডদ রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের কল্যাণার্থ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছেন। হস্তিচালিত রাজপথে তিনি চলিয়াছেন। নগরবাসীরা কেহ কেয়ূর, কেহ জাতরূপমালা, কেহ অঙ্গুলিমুদ্রা, কেহ মুক্তাহার, কেহ রৌপ্য মুদ্রা, কেহ স্বর্ণ কার্ষাপণ অনাথপিণ্ডদের গন্তব্যপথে নিক্ষেপ করিল। অনাথপিণ্ডদও তাহা গ্রহণ করিলেন—

গৃহপতিরপি পরানুগ্রহার্থং প্রতিগৃহ্নাতি।

এইবার এক দরিদ্রা নারী পথে বাহির হইয়া আসিল। তিন মাসে বহুকষ্টে সে একটিমাত্র বস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে—

তয়া ত্রিভির্মাসৈঃ কৃচ্ছ্রেণ পটক উপার্জিতঃ।

তাহার অন্তরেও দানের বাসনা জাগ্রত হইল। কিন্তু—'সা স্বকং বিভবমবলোকয়ন্তী ন কিংচিৎপশ্যতি ঋতে পটকাৎ'। পরিধানের এই একটি বসন মাত্র তাহার সম্বল। সে চিন্তা করিল—স্বহস্তে আমি এই বস্ত্র প্রদান করিতে পারি না, শরণপৃষ্ঠের আশ্রয়ে নগ্নদেহ লুকায়িত করিতে হইবে।—যদ্যহমিহস্থৈব পটকং প্রদাস্যামি, নগ্না ভবিষ্যামি। যন্নহং শরণপৃষ্ঠমভিরুহ্য পটকং ক্ষিপেয়মিতি। (সম্ভবতঃ) কোন বৃক্ষ অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে নিজদেহের বস্ত্র উন্মোচন করিল এবং অনাথপিণ্ডদের দিকে তাহা নিক্ষেপ

১। কথা ও কাহিনী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

২। অবদানশতকম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, বস্ত্রম্ পৃঃ ১৩৯।

করিল। এই অদ্ভুত দান লাভ করিয়া অনাথপিণ্ডদ সমবেত পুরুষদের আদেশ করিলেন—গচ্ছন্ত ভবন্তঃ অবলোকয়ন্তু কেনায়ং পটকঃ ক্ষিপ্ত ইতি। শরণপৃষ্ঠের আড়ালে তাঁহারা দেখিলেন—যাবদুৎকুটুকা নিষণ্ণা—উপুরভাবে উপবিষ্টা এক রমণী। তাহাদের সে জানাইল—যো মে বিভব আসীৎস মে ভগবদগুণানুকীর্তনং প্রতিশ্রুত্য দারিদ্র্যভয়ভীতয়া তথাগত প্রমুখে ভিক্ষুসংঘে দত্ত ইতি। ইহা শুনিয়া বিস্মিত অনাথপিণ্ডদ এই রমণীকে বিচিত্রবস্ত্রাভরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। মৃত্যুর পর সে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে দেবকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করে। সেখানেও—উপ্‌পন্নমাত্রায়া স্তস্যাস্তথাবিধানি বস্ত্রাণি প্রদুর্ভূর্তানি, ন কস্যচিদন্যস্য দেবপুত্রস্য বা দেবকন্যায়া বা।

এই পরম দরিদ্রা রমণীর একমাত্র পরিধেয় চীরখণ্ড দানের মহত্ত্ব কবি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই দানই সর্বশ্রেষ্ঠের জন্য মানুষের শ্রেষ্ঠদান। রাজার সম্পদ অপেক্ষা, ধনীর বিত্ত অপেক্ষা ইহা শতগুণে মহৎ। ভগবান বুদ্ধের জন্য দরিদ্রা নারীর এই শ্রেষ্ঠ দানের আখ্যান বৌদ্ধ আখ্যায়িকাকে অপূর্ব ঔজ্জ্বল্য ও অপরূপ সৌন্দর্যদান করিয়াছে। এই দানের ত্যাগ ও মহত্ত্ব কবিকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছে। তিনি ভিখারিণীর দানকে আরো গৌরবোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। অবদানশতকে অনাথপিণ্ডদ নগরবাসীদের কল্যাণার্থ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা সকলের দানের অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনাথপিণ্ডদ চাহেন ভিক্ষুশ্রেষ্ঠের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দান—

"ওগো পৌরজন, করো অবধান
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান।
দেহো তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে।"

তাঁহার পথের দুই পার্শ্বে স্তূপাকারে জমিয়া থাকে—বিবিধ রত্ন, কণ্ঠহার, মাথার মণিকা, থালি থালি স্বর্ণ, মহামূল্য বসনভূষণ! ধনীর বিপুল বিত্তের কণিকামাত্র যে দান তাহার দিকে তিনি ফিরিয়াও চাহেন না।

ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোনো ভেট—
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট—
আননে।

কিন্তু অবদান শতকের অনাথপিণ্ডদের পথপরিক্রমায় কেচিদ্ধারং প্রযচ্ছতি, কেচিৎকটকম্, কেচিৎকেয়ূরম্, কেচিজ্জাতরূপমালাম্, কেচিদঙ্গুলিমুদ্রাম, কেচিন্মুক্তাহারম্, কেচিদ্ধিরণ্যম, কেচিৎসুবর্ণং, কেচিদন্তশঃ কার্ষাপণম্ এবং অনাথপিণ্ডদও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন—'গৃহপতিরপি প্রতিগৃহ্ণাতি।' সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের অনাথপিণ্ডদের পথপরিক্রমা অবদানশতকের উন্নততর সংস্করণ।

একবস্ত্রা দীনা রমণীর চিত্র উভয় ক্ষেত্রে একই। অবদানশতকে দরিদ্রা রমণী দেখিল পরিধেয় বসনটিই তাহার একমাত্র বৈভব—

সা স্বকং বিভবমবলোকয়ন্তী ন কিঞ্চিৎপশ্যতি ঋতে পটকাৎ।

রবীন্দ্রনাথেও—

দীননারী এক ভূতলশয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ—
সে আসি নমিল সাধুর চরণ—
কমলে।

অবদানশতকে সে চিন্তা করিয়া দেখিল—

যন্ত্বহমিহস্থৈব পটকং প্রদাস্যামি, নগ্না ভবিষ্যামি। যন্ন্বহং শরণপৃষ্ঠমভিরুহ্য পটকং ক্ষিপেয়মিতি। ততঃ সা শরণপৃষ্ঠমভিরুহ্যস্বশরীরাৎপটকমবনীয় অনাথপিণ্ডদস্যোপরি ক্ষিপ্তবতী।

রবীন্দ্রকাব্যে এই রমণী—

অরণ্য-আড়ালে রহি কোনোমতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।

অবদানশতকের লেখক বস্তুগত পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহার দানের মর্যাদা দিয়াছেন,—

'ততোনাথপিণ্ডদেন গৃহপতিনা পরমবিস্ময়জাতেন সা দারিকা বিচিত্রৈর্বস্ত্রৈরাভরণৈশ্চাচ্ছাদিতা।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনাথপিণ্ডদ কোন বস্তুগত পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহার ত্যাগ ও মহত্ত্বের গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেন নাই। তাহার আত্মবিলোপী দানের অর্ঘ্য শিরে ধারণ করিয়া অনাথপিণ্ডদ আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—

"ধন্য মাতঃ করি আশীর্বাদ
মহাভিক্ষুকের পূরাইলে সাধ
পলকে।"

তারপর— চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর
সঁপিতে বুদ্ধের চরণনখর—
আলোকে।

ইহাই নরোত্তমের জন্য ভক্তের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

'মস্তকবিক্রয়' কবিতাটির বিষয়বস্তু 'মহাবস্তু' অবদানের অন্তর্গত 'অজ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য জাতক' হইতে গৃহীত।[১] সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি নিম্নে বিবৃত হইল।

একদা কোশলরাজ্যে এক পরম ধার্মিক, ক্ষমতাবান ও ঐশ্বর্যশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রজাগণ সুখ, সম্পদ ও শান্তিতে কাল যাপন করিত। মহানুভব কোশলরাজ অন্যের প্রতি কৃপাপরবশ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কাশীরাজ ছিলেন হিংসাপরায়ণ ও স্বার্থে সংকীর্ণ চিত্ত। বিপুলবাহিনী লইয়া তিনি কোশলরাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং কোশল সৈন্যের শৌর্যেবীর্যে পরাজিত হইলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়াও নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন, আবার আক্রমণ করিলেন ও পরাজিত হইলেন। এইভাবে বারে বারে আক্রমণের ফলে বহুশতসহস্র কোশল সৈন্য ধ্বংস হইল, নানা গজ, অশ্ব ও রথীর ক্ষয় হইল। কোশলরাজ উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিলেন—আমার রাজ্য আজ অন্যের লোভ ও ক্রূরতায় ধ্বংসীভূত হইয়াছে। তিনি রাজ্য ছাড়িয়া ছদ্মবেশে বনে গমন করিলেন। বনবাসী, হিংসাপাশমুক্ত কোশলরাজ ভাবিলেন, যে কোন উপায়ে আমি আমার জীবিকা নির্বাহ করিব—

যেন কেনচিদ্ ব্যবহারেণ আত্মনো বৃত্তিং কল্পয়িষ্যামি।

একদা পথে কোশলরাজ এক পথশ্রান্ত বণিকের দেখা পাইলেন। দূর সমুদ্রে তাহার বাণিজ্য তরণী ডুবিয়া গিয়াছে। সর্বস্বান্ত বণিক শুনিয়াছে কোশলরাজ কৃপাপূর্ণমনা কল্পবৃক্ষসদৃশ, তিনি অর্থিগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। সুতরাং বণিক আজ কোশলের পথযাত্রী।

১। Senart, Mahāvastu Avadānam, Vol. III, pp 349—53.

'সো মে অর্থমাত্রং দাস্যতি যেন পুনর্ব্যবহারং করিষ্যামি আত্মনং চ পতিতং উদ্ধরিষ্যামি।'

কোশলরাজ বুঝিলেন বণিক আজ তাঁহারই দ্বারে প্রার্থী। প্রতিকারহীন হতাশায় বনবাসী রাজার দুই চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হইল। বণিককে বলিলেন—আমিই কোশলরাজ, কিন্তু আজ আমি কাশীরাজকর্তৃক হৃতরাজ্য ও বনবাসী। কিন্তু তুমি বহু দূরদেশ হইতে আসিয়াছ, তোমার অভিলাষ আমি পূর্ণ করিব, তোমার জন্য আমি আত্মদান করিব—

'ত্বং দূরতো মমাশাভূতো উদ্দিশ্য ইহাগতো অহং তত্র তথা করিষ্যামি যথা তব নিষ্ফলং আগমনং ন ভবিষ্যতি। তব কারণেনাত্মনং পরিত্যজিষ্যামি।'

কাশীরাজের ঘোষণা ছিল যে ব্যক্তি কোশলরাজের ছিন্ন শির আনয়ন করিবে রাজা তাহাকে পুরস্কৃত করিবেন।—

যঃ কোশলরাজ্ঞো শীর্ষমানয়তি তস্য মহান্তং দানং দদামীতি।

কোশলরাজ বণিককে বলিলেন—

'মম পশ্চাদ্বাহুং বংধিত্বা কাশিরাজ্ঞো উপনামেহি। ততো তে কাশিরাজা তুষ্টো প্রভূতং অর্থং দাস্যতি।' রাজার নির্দেশ অনুযায়ী সার্থবাহও তাহাই করিলেন।

কোশলরাজের এই মহান্ আত্মদানে হিংসাপরবশ কাশীরাজের হৃদয় পরিবর্তিত হইল। তিনি বলিলেন—এই মহানুভব রাজাকে প্রতারণা করা আমার অনুচিত—

'ন যুক্তমস্মাকং এবং ধার্মিকস্য রাজ্ঞো রাজ্যমপহর্তু্ নিতি।'

তিনি কোশলরাজকে সিংহাসনে বসাইয়া মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করিলেন। কোশলরাজও আপন রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বণিককে তাহার বাঞ্ছিত ধন প্রদান করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কোশল নৃপতির ঔদার্যও তুলনা রহিত। অবদান কাহিনী অনুসরণে তিনিও আপন মস্তকের বিনিময়ে অর্থির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। মহাবস্তু অবদান কাহিনীর সঙ্গে 'মস্তকবিক্রয়' কবিতার বিশেষ সাদৃশ্য বজায় রহিয়াছে—মহাবস্তু অবদানে কোশলনৃপতি অর্থিজনশরণ, করুণার্দ্রহৃদয় ও ন্যায়পরায়ণ—

'তস্য চ রাজ্ঞো দেশে দেশে কল্যাণকীর্তিশব্দশ্লোকো দায়কদান প্রতিসংকৃতঃ পরানুগ্রহপ্রবৃত্তো পরলোকদর্শী।'

রবীন্দ্রনাথের কোশলরাজও এই চারিত্রিক ঐশ্বর্যের মহিমায় ভাস্বর। এইজন্যই—

কোশল নৃপতির তুলনা নাই
জগৎ জুড়ি যশোগাথা।
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই
দীনের তিনি পিতামাতা।

মহাবস্তু অবদানের 'অপরলোকদর্শী কাশীরাজা' প্রতিবেশী কোশলরাজ্য জয় করিতে গিয়া বারে বারে পরাজিত হইয়াছেন। তথাপি রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই। অবশেষে কোশলরাজ পরাজিত হইয়াছেন এবং ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

কোশলরাজ হারি রণে
রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে
পলায়ে গেল দূর বনে।

অবদানে কাশীরাজ চাহেন না যে তাঁহার শত্রু বাঁচিয়া থাকুক। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন—

'যঃ কোশলরাজ্ঞো শীর্ষমানয়তি তস্য মহান্তং দানং দদামীতি।

রবীন্দ্রনাথের কাশীরাজও মন্ত্রীকে আদেশ করিয়াছেন—

রটি দাও নগর-মাঝে
ঘোষণা করো চারি ধারে—
যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে
কনকশত দিব তারে।

বনবাসী কোশলরাজ মলিন চীর পরিধান করিয়া ছদ্মবেশে ফিরিতেছেন। পথে এক বণিক জানাইল—

'অহং ভদ্রমুখ অমুকাতো অধিষ্ঠানাতো সার্থবাহো সমুদ্রযাত্রিকো। সো অহস্ততো স্বকাতো অধিষ্ঠানাতো প্রভৃতেনার্থেন নানাপ্রকারং পণ্যমাদায় সমুদ্রপত্তনেষু যুক্তেন যানপাত্রেণ মহান্তং সমুদ্রমোত্তীর্ণো। তত্র যে মহাসমুদ্রে তং যানপাত্রং অর্থভরিতং বিপন্নং ফলকেনাহং সমুদ্রাতো জীবন্তো প্রত্যুত্তীর্ণো শরীরমাত্রেণ। সো অহং গচ্ছামি কোশলরাজ্ঞো সকাশং অর্থমাত্রস্য অর্থায়ে যেন পুনঃ ব্যবহারং করেয়ং পতিতং চাত্মানং উদ্ধরেয়ং।'

রবীন্দ্রনাথের বনবাসী কোশল নৃপতির প্রশ্নের উত্তরে পথিকও জানাইয়াছে—

"আমি বণিক জাতি।
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।
এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি
কেমনে রব প্রাণ ধরি।
করুণা পারাবার কোশলপতি।
শুনেছি নাম চারি ধারে—
অনাথ নাথ তিনি দীনের গতি
চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে।

দৈববিড়ম্বিত বণিক আজ অর্থিজনশরণ কোশলরাজের করুণাপ্রার্থী। রাজা বলিলেন—বহু দূরদেশ হইতে তুমি আসিয়াছ, তোমার আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তোমার জন্য আমি আত্মদান করিব—

'অহং তত্র তথা করিষ্যামি যথা তব নিষ্ফলং আগমনং ন ভবিষ্যতি তব কারণেনাত্মানং পরিত্যজিষ্যামি।'

রবীন্দ্রনাথের কোশলরাজও একই সুরে বলিলেন—

"পান্থ, যেথা তব বাসনা পূরে
দেখায়ে দিব তারি পথ।
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে
সিদ্ধ হবে মনোরথ।"

আশ্রিতজন বৎসল কোশলরাজ আপন প্রাণের বিনিময়ে বণিককে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কোশলনৃপতিও একই কারণে কাশীরাজের সভায় উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

কোশলরাজ আমি বনভবন

* * * *

আমায় ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহো তা মোর সাথিটিরে।

এতদিন পরে কাশীরাজের চৈতন্য হইল। কাশীরাজ মহতের যথার্থ সম্মান রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি—

'পুনরপি কোশলরাজানং স্বকে রাজ্যে অভিষিংচ্য কাশিরাজ্যং গতঃ।'

রবীন্দ্রনাথের কাশীরাজেরও ক্ষমতা গর্ব ও অহঙ্কার কোশলরাজের মহানুভবতার নিকট নতমস্তক হইয়াছে। বাহুবলের উন্মত্ততা ও দর্পের দ্বারা তিনি কোশল-রাজকে পরাজিত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ঔদার্য ও মহত্ত্বের নিকট নতশির হইয়া অবশেষে সত্য-দিদৃক্ষার দ্বারা মহত্তের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে জয় করিয়া লইয়াছেন। তিনি কোশলরাজকে বলিলেন—

ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি।
তোমার সে আশায় হানিব বাজ
জিনিব আজিকার রণে—
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ
হৃদয় দিব তারি সনে।"

অবদানের 'অজ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য' জাতকের সরলতা ও মর্মস্পর্শী সহৃদয়তা 'মস্তকবিক্রয়' কবিতায়ও সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

'পূজারিণী' কবিতাটির উৎস অবদান শতকের অন্তর্গত 'শ্রীমতী' নামক আখ্যান।[১] রাজ-অন্তঃপুরিকা শ্রীমতীর অমর আত্মদান এই আখ্যানের বিষয়বস্তু। নিম্নে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণিত হইল।

মহারাজা বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধের নিকট সত্যধর্ম লাভ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হইয়া উঠিলেন। একদা তাহার অন্তঃপুরিকাগণ রাজসমীপে নিবেদন করিলেন—'দেব বয়ং ন শক্নুমোঽহন্যহনি ভগবন্তমুপসংক্রমিতুম্। তৎসাধু দেবোঽস্মিন্নন্তঃপুরে তথাগতস্য কেশনখস্তূপং প্রতিষ্ঠাপয়েদ যত্র বয়মসকৃৎপুষ্পৈর্গন্ধৈ-র্মাল্যৈর্বিলেপনৈশ্ছত্রৈর্ধ্বজৈঃ পতাকাভিঃ পূজাং কুর্যামেতি।' মহারাজ অন্তঃপুরিকাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের কেশনখকণা প্রার্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন এবং রাজ-অন্তঃপুরে স্তূপমধ্যে তাহা সযত্নে রক্ষা করিলেন—'রাজ্ঞা বিম্বিসারেণ মহতা সৎকারেণান্তঃপুরসহায়েন তথাগতস্য কেশনখস্তূপোঽন্তঃপুরমধ্যে প্রতিষ্ঠাপিতঃ'। সেই দিন হইতে রাজ-অন্তঃপুরে স্তূপ পূজা প্রবর্তিত হইল—তত্র চান্তঃপুরেঽন্তঃপুরিকা দীপধূপপুষ্পগন্ধমাল্যবিলেপ-নৈরভ্যর্চনং কুর্বন্তি।'

১। অবদানশতকম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬।

অবশেষে একদিন এই ধর্মশীল রাজা আপন পুত্র অজাতশত্রুর দ্বারা নিহত হইলেন। পিতৃঘাতী অজাতশত্রু সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম দলনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই দিন হইতে—'ভগবচ্ছাসনে সর্বদেয়ধর্মাঃসমুচ্ছিন্নাঃ। ক্রিয়াকারশ্চ কারিতো ন কেনচিত্তথাগতস্তূপে কারাঃ কর্তব্যা ইতি।' পঞ্চদশীর প্রবারণা দিবসেও কেহ সেই স্তূপ পরিষ্কার করিতে বা দীপধূপপুষ্পে তথায় আরতি করিতে সাহসী হইল না। শ্রীমতী নামে এক নারী রাজ অন্তঃপুরে বাস করিত। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া একদা সে স্তূপমূল মার্জনা করিল এবং দীপমালায় তাহা সুশোভিত করিয়া তুলিল। প্রাসাদোপরি দণ্ডায়মান অজাতশত্রু স্তূপসন্নিকটে প্রজ্বলিত আলোকমালা দেখিয়া প্রহরীর নিকট জানিলেন—শ্রীমত্যা কেশনখস্তূপে দীপমালা কৃতেতি। তিনি শ্রীমতীকে প্রশ্ন করিলেন—'কিমর্থং রাজশাসনমতিক্রমসীতি।' নির্ভয়ে অবিচলিতকণ্ঠে শ্রীমতী জবাব দিল—আমি যদিও আপনার শাসন অমান্য করিয়াছি, কিন্তু ধর্মরাজ বিম্বিসারের শাসন অমান্য করি নাই। ক্রুদ্ধ অজাতশত্রুর চক্রাঘাতে শ্রীমতীর মৃত্যু হইল। অতঃপর 'সা ভগবতি প্রসন্নচিত্তা কালগতা প্রণীতেষু দেবেষু ত্রায়স্ত্রিংশেষুপপন্না।'

মূল কাহিনীর অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধের পদনখকণা ভক্তিভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রাসাদ কাননে এক অপরূপ শিলাময় স্তূপ অভ্যন্তরে তাহা রক্ষা করেন। মূলকাহিনীতে আছে পুরনারীগণ ধূপ দীপ ও পুষ্পমাল্যে সেই স্তূপের অর্চনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনকপ্রদীপমালা।

ইহার পর পিতৃঘাতী অজাতশত্রু রাজা হইলেন। অবদানের অনুসরণে কবি তাঁহার বৌদ্ধ দলনের বর্ণনা করিয়াছেন—

অজাতশত্রু রাজা হল যবে,
পিতার আসনে আসি

পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে,
সঁপিল যজ্ঞ অনল আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্র রাশি।

অজাতশত্রুর শাসনে স্তূপে পূজা-আরতি বন্ধ হইল। রাজবাড়ীর দাসী শ্রীমতী মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া রাজাদেশ লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত হইল। ভগবান বুদ্ধের স্তূপে পূজা নিবেদনের জন্য শ্রীমতী পুষ্প প্রদীপ সাজাইয়া রাজমহিষী, রাজবধূ, রাজকন্যা সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া আসিলেন কিন্তু কেহই রাজাদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না, পুরবাসীদের নিকটও শ্রীমতীর আহ্বান ব্যর্থ হইল। তাহার সেই আহ্বানে—

শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়
কেহ দেয় তারে গালি।

অবশেষে শ্রীমতী একাই স্তূপপদমূলে পূজার প্রদীপ প্রজ্বলিত করিল। অবদানকার লিখিয়াছেন—সা স্বকং জীবিতমগণয়িত্বা বুদ্ধগুণাংশ্চানুস্মৃত্য কেশনখস্তূপং সংমৃজ্য দীপমালামকার্ষীৎ। স্তূপসন্নিধানে সারি সারি প্রদীপমালা জ্বলিতে দেখিয়া মুক্ত কৃপাণ হস্তে পুররক্ষক ছুটিয়া আসিল। প্রশ্ন করিল—

"কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি।"

শান্তস্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর ধ্বনিত হইল—

"শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাসী।"

অবদানশতকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াও শ্রীমতী নির্ভীক, তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমাদের চমৎকৃত করিয়া দেয়। চণ্ড, স্বৈর শাসক অজাতশত্রু তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

তুমি রাজশাসন লঙ্ঘন করিয়াছ কেন?

সে উত্তর করিয়াছে—আমি আপনার শাসন লঙ্ঘন করিলেও ধর্মরাজ বিম্বিসারের শাসনতো লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই।

'যদ্যপি ময়া তব শাসনমতিক্রান্তম্। কিং তু ধর্মরাজস্য ময়া বিম্বিসারস্য শাসনং নাতিক্রান্তমিতি।' মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই অনমনীয়তা ও ভয়হীন প্রত্যুত্তর পরিণামে তাহার চরম মুহূর্তকে আহ্বান করিয়াছে। একদিন যে সত্যকে সে জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিল সেই সত্যকে অম্লান অক্ষুণ্ন

রাখিতে গিয়া সে আত্মাহুতি দিয়াছে। কিন্তু তাহার এই মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়, ইহা সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যু, যাহা তাহাকে জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে, অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শ্রীমতী পূজারিণী, ভক্তিপ্লুতপ্রাণের আত্ম নিবেদনরত প্রতিমা। বৌদ্ধধর্মের প্রতি স্থির অবিচলিত বিশ্বাস ও একাগ্রভক্তির অনির্বাণ দীপশিখার ন্যায় 'পূজারিণী' কবিতায় সে অবস্থান করিতেছে। রাজভয়, মৃত্যুভয়, মুহূর্তের জন্যও সেই দীপশিখাকে কম্পিত করিতে পারে নাই। শ্রীমতী কোমল, শান্ত, সমাহিত উপাসিকা। মরণের দিগন্ত সীমানা হইতে তাহার প্রশান্ত কণ্ঠ শ্রুত হইয়াছে—

'শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাসী।'

বুদ্ধের দাসী আসিয়াছিল ভগবানের চরণবেদীমূলে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিতে। অর্ঘ নিবেদন শেষ হইল, কিন্তু পূজারিণীর পূজা সমাপ্ত হইল না।

সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সে দিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

সেদিন বুদ্ধ উপাসিকা শ্রীমতী চির আকাঙ্ক্ষিত ভগবানের পদতলে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া তাহার পূজা সমাপ্ত করিল। পুষ্প প্রদীপের অর্ঘ্যের সঙ্গে তাহার জীবন প্রদীপের অর্ঘ্যও নিবেদিত হইল। শ্রীমতীর এই মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যু তাহাকে সৌন্দর্যে, সৌগন্ধে ও শুভ্রতায় একটি শতদলের ন্যায় ভগবানের চরণপ্রান্তে স্থাপন করিয়া দিয়াছে।

অবদানকার স্তূপ পদমূলে প্রদীপদানের সুকৃতির জন্য শ্রীমতীকে দিব্যজ্যোতি সম্পন্না দেবকন্যারূপে দেবসমিতি সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় দিব্য দেহশ্রী দর্শন করিয়া শক্র প্রশ্ন করিয়াছেন—

গাত্রং কেন বিমৃষ্টকাঞ্চননিভং পদ্মোৎপলাভং তব
গাত্রশ্রীরতুলা কুতেয়মিহ তে দেহাৎপ্রভা নিঃসৃতা
বক্ত্রং কেন বিবুদ্ধপদ্মসদৃশং চামীকরাভং তব
ব্রুহি ত্বং মম দেবতে ফলমিদং সৎকর্মজং ভুজ্যতে॥

দেবকন্যা জানাইয়াছেন—ইহা ত্রিলোকনাথ ভগবান বুদ্ধের স্তূপপদমূলে প্রদীপ দানের সুকৃতি।

রবীন্দ্রনাথ কোন বাহ্যদানের দ্বারা শ্রীমতীর আত্মদানের মূল্যায়ন করেন নাই। শুচিস্নাতা শ্রীমতী একাগ্র নিষ্ঠা ও পরম শ্রদ্ধায় মহাবোধিকে আশ্রয় করিয়া নিজে অমৃতলোকে যাত্রা করিয়াছে এবং স্নিগ্ধ ক্ষমা ও করুণায় সিক্ত হইয়া অনন্ত অসীম চিরসুন্দরের দিকে পাঠককে পথ প্রদর্শন করিয়াছে। পিতৃহন্তা, বৌদ্ধধর্মদ্বেষী অজাতশত্রুর স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করিয়া নবধর্মের মহত্তম আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীমতীর এই আত্মাহুতির প্রয়োজন ছিল। এই জন্য তাহার এই আত্মদান শুধু দেহের অবসান নহে—সত্যের জন্য, পরের হিতের জন্য সে মৃত্যুহীন মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। শ্রীমতীর এই মহিমময় মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দেয় কল্যাণব্রতী বোধিসত্ত্বদের জীবনচর্চা যাঁহারা সমস্ত সীমা অবলুপ্ত করিয়া আপন অন্তরের স্বার্থত্যাগী প্রেমকে বিশ্বের প্রাণিজগতের প্রতি বিস্তার করিয়া দিয়াছিলেন।

'অভিসার' কবিতার বিষয়বস্তু ক্ষেমেন্দ্রের 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা[১]' হইতে সমাহৃত। রবীন্দ্রনাথ অবদানকল্পলতার বহু অংশ বর্জন করিয়াছেন। নিম্নে সংক্ষেপে উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার আখ্যান বর্ণিত হইল।

অতীতে মথুরাবাসী গুপ্ত নামে এক গন্ধবণিকের উপগুপ্ত নামে এক পুত্র ছিল। উপগুপ্তের পিতার বাসনা তাঁহার পুত্র শাণবাসী ভিক্ষুর শিষ্য হইবে। যুবক উপগুপ্ত ভোগবিরাগী ও বৈরাগ্যপ্রবণ ছিলেন। পিতার আদেশে তিনি কিছুকাল হরিচন্দন, কস্তুরী প্রভৃতি বিক্রয় কর্মে নিয়ত হইলেন। গণিকা বাসবদত্তা দাসীর মুখে উপগুপ্তের রূপগুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া উঠিল। বাসবদত্তা তাহার এক বিশ্বস্ত দূতীর মুখে উপগুপ্তকে সংবাদ প্রেরণ করিল—

সংজাতরাগসংবেগা গণিকা সংগমার্থিনী।
বিসৃজ্যাভিমতাং দূতীং ভাবং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥ (৭নং শ্লোক)

উপগুপ্ত জানাইলেন—এখনও তাহার সঙ্গে দেখা করিবার উপযুক্ত সময় আসে নাই—

অয়ং নাভিমতঃ কালস্তস্যাং সংদর্শনে মম। (৮নং শ্লোক)

দূতী ফিরিয়া গেল। একদিন বাসবদত্তার গৃহে একসঙ্গে দুইজন প্রার্থীর

১। ক্ষেমেন্দ্রের অবদানকল্পলতা, ২য় খণ্ড, পি.এল বৈদ্য সম্পাদিত, উপগুপ্তাবদানম্, পৃঃ ৪৪৯-৫৩

আবির্ভাব ঘটিল। একসঙ্গে দুই পুরুষকে সন্তুষ্ট করা যায় কিভাবে? বাসবদত্তা ভাবিল—আমরা ধর্ম বা কামের জন্য জন্মাই নাই, জন্মিয়াছি বিত্তের জন্য—

ন ধর্মায় ন কামায় বয়মর্থায় নির্মিতাঃ। (১৬নং শ্লোক)

সে প্রথম প্রার্থীকে হত্যা করিয়া মহাধনবান দ্বিতীয় প্রার্থীকে আহ্বান জানাইল। এই নিষ্ঠুর ঘটনা রাজার কর্ণগোচর হইলে রাজা তাহাকে অতি কঠিন শাস্তি প্রদান করিলেন। উপগুপ্ত বাসবদত্তার প্রতি এই কঠিন রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল—ইহাই উপযুক্ত সময়—

তদ্বিলোকনকালোঽয়মিত্যুক্ত্বা তাং ভুবং যযৌ॥ (২৩নং শ্লোক)

উপগুপ্ত বধ্যভূমিতে হস্তপদ-কর্ণনাসিকা কর্তিতা, রক্তকর্দমে লুণ্ঠিতা বাসবদত্তার নিকট গমন করিলেন। উপগুপ্তের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল সৌন্দর্য দর্শন করিয়া নগ্না বাসবদত্তা রমণীসুলভ লজ্জানুভব করিল। নতমুখে অশ্রুসজল কণ্ঠে সে উপগুপ্তকে বলিল—একদা আমি তোমায় আহ্বান জানাইয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন তুমি আগমন কর নাই, সেদিন আমার অতুল ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্য ছিল। আজ আমার সেই সৌভাগ্য গিয়াছে, এখনই কি তোমার উপযুক্ত সময়। আজ আমি—

কৃত্তাঙ্গী রুধিরাদিগ্‌ধা চ্যুতাহং ক্লেশসাগরে।
কালঃ কমলপত্রাক্ষ কিময়ং দর্শনস্য মে॥ (২৯নং শ্লোক)

উপগুপ্ত আজ তাঁহার আগমনের কারণ ব্যক্ত করিলেন। তিনি বাসবদত্তাকে মানবদেহের দুঃখপরম্পরা, নশ্বরতা এবং ভগবান বুদ্ধের কল্যাণময় নির্বাণধর্মের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। উপগুপ্তের উপদেশে সত্য দর্শন করিয়া মৃত্যুর পর বাসবদত্তা প্রভাময় দেবনিকায়ে জন্মগ্রহণ করিল।

বাসবদত্তার কাহিনী এইখানে সমাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'অভিসার' কবিতায় অবদানকল্পলতার কাহিনীর অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়াছেন। ভোগের চরম পরিণতি দেখাইতে গিয়া অবদানকার বাসবদত্তার এক বীভৎস পরিণতি দেখাইয়াছেন, কিন্তু 'অভিসার' কবিতায় মথুরা নগরীর রূপজীবা বাসবদত্তা সংবেদনশীল কবিহৃদয়ের সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 'অবদানকল্পলতা' এবং 'অভিসার' কবিতার কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কবি মূলকাহিনীর কতখানি পরিসংস্কার করিয়াছেন। অবদানকল্পলতায় মথুরানগরীর রূপজীবা বাসবদত্তা দূতীর মুখে উপগুপ্তের রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া সঙ্গমার্থিনী হইয়া তাঁহার নিকট

দূতী প্রেরণ করিয়াছে। দূতীর মুখে বাসবদত্তার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া উপগুপ্ত মৃদুহাস্যে জানাইয়াছেন—এখনও তাহার সহিত দেখা করিবার উপযুক্ত সময় হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অন্য পথ ধরিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপগুপ্ত মথুরানগরীর প্রাচীরের নিম্নে শায়িত ছিলেন। অভিসারিকা বাসবদত্তার নূপুর সিঞ্জিত পায়ের স্পর্শে তাঁহার নিদ্রা ভগ্ন হইল। তরুণ সন্ন্যাসীর গৌরকান্তি, স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল বদন অভিসারিকাকে মুগ্ধ করিল, লজ্জিত কণ্ঠে সে আহ্বান জানাইল—

"ক্ষমা করো মোরে, কুমার কিশোর—
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর—
এ নহে তোমার শয্যা।"

অবদানকল্পলতার উপগুপ্তের উত্তরের প্রতিধ্বনি এইখানেও পাওয়া যায়—

"অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে
এখনো আমার সময় হয়নি,
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী ;
সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।"

ইহার পর অবদানকল্পলতার কবি বাসবদত্তাকে তাহার উন্মত্ত যৌন-ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং অর্থলোলুপতার জন্য চরম দণ্ড দিয়াছেন। ঘাতকেরা তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে নগ্নদেহে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়াছে। রাজাদেশে তাহার হস্তপদকর্ণ ও নাসিকা কর্তিত হইয়াছে। রক্তে কর্দমে লুণ্ঠিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় সে চিৎকার করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এই বীভৎস নারকীয় দৃশ্য একেবারে বর্জন করিয়াছেন। 'অভিসার' কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে—এক চৈত্রসন্ধ্যায় বসন্তের উতলা বাতাস দিয়াছে। মথুরা নগরীর পুরবাসীরা মধুবনে ফুল উৎসবে বাহির হইয়াছে। কিন্তু অভিসারিকা আজ সর্বজনপরিত্যক্তা। নিদারুণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় নগরবাসিগণ পুর-পরিখার বাহিরে তাহাকে স্থান দিয়াছে, তাহার সঙ্গ আজ বিষাক্ত। অবদানকল্পলতায় বাসবদত্তা বধ্যভূমিতে উপগুপ্তকে প্রশ্ন করিয়াছে—'হে পদ্মপলাশলোচন, এই কি তোমার দেখা করিবার উপযুক্ত

সময়' ? রবীন্দ্রনাথের উপগুপ্ত সেই রাত্রে সর্বজন পরিত্যক্তা বাসবদত্তার আড়ষ্ট শির নিজ অঙ্কে তুলিয়া লইলেন। তাহার মুখে জল দিলেন, দেহে শীতল চন্দন লেপন করিলেন। নারী তখন প্রশ্ন করিল—

"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়।"

সন্ন্যাসী বলিলেন— "আজি রজনীতে হয়েছে সময়—

এসেছি বাসবদত্তা।"

অবদানকল্পলতায় উপগুপ্ত ধর্মোপদেশ দান করিয়া ধর্মমার্গে তাহার প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাহিনী উপগুপ্তের কল্যাণময় সেবাকার্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

কবি ক্ষেমেন্দ্রের বাসবদত্তা নির্মম, কঠিন হৃদয়া রমণী। ভোগসুখ ও অর্থ লালসায় সে তাহার প্রণয়ী বণিকপুত্রকে হত্যা করিয়াছে। ধর্ম বা প্রেম তাহার জীবনে কোন মূল্য পায় নাই। সে জানে—আমরা ধর্ম বা প্রেমের জন্য সৃষ্ট নই, আমরা অর্থের জন্য সৃষ্ট। নারীচরিত্রের অবিশ্বস্ততা ও কামপ্রবণতা প্রদর্শন করা অবদানকল্পের উদ্দেশ্য। এই অপরাধের শাস্তিও তিনি অতি কঠিন হস্তে তাহাকে প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরম দরদীর হস্তে তাঁহার বাসবদত্তাকে অঙ্কিত করিয়াছেন। সে মথুরাপুরীর শ্রেষ্ঠ নটী। অভিসারের পথে সন্ন্যাসী উপগুপ্তের বক্ষে চরণাঘাত তাহাকে উৎকণ্ঠিত ও লজ্জিত করিয়াছে। অবদানকল্পলতায় বধ্যভূমির বিভীষিকাময় পরিবেশের অতি সূক্ষ্ম সঙ্কেতমাত্র কবি প্রদান করিয়াছেন—

সহসা ঝঞ্চা তড়িৎ শিখায়\
মেলিল বিপুল আস্য।\
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে\
প্রলয় শঙ্খ বাজিল বাতাসে,\
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে\
হাসিল অট্টহাস্য।

একদিকে বধ্যভূমির বিভীষিকাময় পরিবেশে হস্তপদকর্ণনাসিকাকর্তিতা রক্তকর্দমে লুণ্ঠিতা নগ্না রমণীদেহ, অন্যদিকে পুরপরিখার পারে আম্রবনের আঁধারে কালো তনু বসন্ত রোগিনী। দুই দৃশ্যে কত তফাৎ। একদৃশ্যে কবি নিজেই যেন নির্মম দণ্ডদাতা বিচারক, অন্যদৃশ্যে কবি সংবেদনশীল দরদী শুশ্রূষাকারী।

ক্ষেমেন্দ্রের উপগুপ্ত যখন বাসবদত্তার সংস্পর্শে আসিয়াছে তখনও সে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করে নাই। সে ব্যবসাকর্মে নিযুক্ত তরুণ যুবক। তবে তাহার চিত্ত বৈরাগ্যনিরত ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু উপগুপ্তকে এই কাহিনীতে আনয়ন করিয়াছেন। 'অভিসার' কবিতায় উপগুপ্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি সর্বকামনা বাসনা বিজয়ী। যৌবনমদমত্তা যে অভি-সারিকাকে তিনি একদিন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহার পরম দুঃখের দিনে একান্ত সেবাযত্নে তাহাকে আবার আপন কোলে টানিয়া লইয়াছেন। করুণার কী অপূর্ব সুন্দর চিত্র! বাসবদত্তার অপরাধের বিচার তিনি করেন নাই। মূল কাহিনীতে উপগুপ্ত বাসবদত্তার ভীষণ কষ্টাবস্থা শুনিয়া তাহাকে ধর্মদেশনা প্রদান করিতে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপগুপ্তের অভিসার সর্বজন পরিত্যক্তা নগরীর নটী বাসবদত্তাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য। বৌদ্ধ ভিক্ষু উপগুপ্তের যে চিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা কঠিন বৈরাগ্যদীপ্ত তাপস মূর্তি নহে। সে মূর্তি শান্তি ও করুণায় স্নিগ্ধ এবং অনিন্দ্যসুন্দর। বাসবদত্তা রাজপথে—

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌরকান্তি—
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

নিদারুণ যাতনায় মৃত্যুপথ যাত্রিনী বাসবদত্তাকে কবি এই করুণারূপী বিগ্রহের 'চরণোপান্তে' স্থাপন করিয়াছেন। এইখানেই বুদ্ধ-শিষ্যের অভিসার পথ শেষ হইল—

সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির
তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে
শীতচন্দন পঙ্কে।

বৌদ্ধধর্মের ত্যাগবৈরাগ্যের, অনিত্য অনাত্মার দেশনা অপেক্ষা করুণা সেবা ও মৈত্রীর আদর্শ কবিকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছিল। 'অভিসার' কবিতা তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'পরিশোধ' কবিতার কাহিনী মহাবস্তু অবদানের অন্তর্গত 'শ্যামাজাতক'[১] হইতে গৃহীত। শ্যামাজাতকের গল্পাংশ নিম্নরূপ :—

তক্ষশীলায় বজ্রসেন নামক এক অশ্ববাণিজক বাস করিতেন। তিনি তক্ষশীলা হইতে বারাণসী অভিমুখে অশ্ববাণিজ্যার্থে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহার সঙ্গী সার্থবাহগণ প্রাণ হারাইলেন, তাঁহাদের ধনরত্ন ও অশ্বাদি লুণ্ঠিত হইল। বজ্রসেন মৃত বণিকের শবদেহের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া দস্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন—

'সো দানি সার্থবাহো কুতকেন পুরুষকুণপেন আত্মানং প্রতিচ্ছাদেত্বা শয়িতো এবং ন হতো।'

অবশেষে বজ্রসেন বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাত্রিকালে নগরীর এক পরিত্যক্ত গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেইরাত্রে রাজপ্রাসাদের বহু ধন সম্পদ চুরি গেল। মন্ত্রিগণ রাজাকে জানাইলেন—

'মহারাজ প্রভূতো রাজকুলতো দ্রব্যং হৃতং।

রাজা মন্ত্রীদের তস্করের সন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশে বারাণসীর প্রতি গৃহ, প্রতি মন্দির, প্রতি শূন্যাগারে অন্বেষণ করা হইল। প্রহরিগণ শূন্যাগারে নিদ্রিত বজ্রসেনকেই চোর বলিয়া সাব্যস্ত করিল।

—অয়ং চৌরো রাজকুলমোষকো।

বজ্রসেন বলিলেন—

আর্যা প্রসীদথ নাহং চৌরো অশ্ববাণিজকো অহং তি।

তাহারা বজ্রসেনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাজসমীপে আনয়ন করিলেন। এবং বলিলেন—মহারাজ, চোর ধৃত হইয়াছে। শূন্যাগারে নিদ্রিত অবস্থায় তাহাকে বন্দী করিয়াছি—এবং দেব শূন্যাগারে শয়িতো লব্ধো। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন রাজাদেশ ঘোষিত হইল—

১। Senart, Mahāvastu Avadānaṁ. Vol. 11, pp 166-77

কণবের জাতকেও (জাতক—Fousboll, vol. 111) শ্যামা ও বজ্রসেনের কাহিনী পাওয়া যায়। কণবের জাতকে বোধিসত্ত্ব চৌর্যবৃত্তিপরায়ণ ছিলেন এবং এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে অপহরণ করিতে গিয়া ধৃত হইয়াছিলেন। এখানেও শ্যামা প্রবঞ্চনাপূর্বক তাহার প্রণয়ী এক শ্রেষ্ঠিপুত্রের জীবনের বিনিময়ে বজ্রসেনকে বাঁচাইয়া দেয়।

গচ্ছথ নং অতিমুক্তকশ্মাশানে নেত্বা জীবশূলকং করোথ।

রাজপুরুষগণ বহুবিধ অত্যাচার ও যন্ত্রণা প্রদান করিতে করিতে বজ্রসেনকে গণিকাবীথির মধ্য দিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতেছিল। পথে শ্যামা বজ্রসেনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। শ্যামা বারাণসীর অন্যতমা রূপজীবা। সে প্রচুর সম্পদশালিনী—মহাধনা মহাকোশা প্রভূতজাতরূপরজতোপকরণা প্রভূত দাসীদাস-কর্মকরপৌরুষেয়া। সে দর্শন মাত্রেই বজ্রসেনের প্রতি অনুরক্তা হইয়া উঠে। সহ দর্শনমাত্রেণ গণিকায়ে তস্মিং সার্থবাহে প্রেম্নং নিপতিতং।
তাহাদের এই প্রেম সম্পর্ক বহু জন্মান্তর কালীন বলিয়া দর্শনমাত্রেই জাত প্রেমও অতি প্রবল হইল। সে ভাবিল—

যদি এতং পুরুষং ন লভামি মরিষ্যামি।

সে তাহার এক দাসীকে নগররক্ষকের নিকট প্রেরণ করিল। বলিল—'আমি তোমাদের প্রচুর হিরণ্য প্রদান করিতেছি, এই ব্যক্তির অনুরূপ অন্য এক ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিব, তাহার পরিবর্তে বজ্রসেনকে ছাড়িয়া দাও। রাজপুরুষেরা রাজী হইয়া দাসীকে বলিল—

বাঢ়ং এবং ভবতু

এই সময়ে শ্যামার আবাসে বারাণসীবাসী এক শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র বাস করিত। তাহার সর্ত ছিল সে দ্বাদশ বর্ষ শ্যামার গৃহে বাস করিবে, দশম বর্ষ অতীত হইয়াছে, আর দ্বিবর্ষ অবশিষ্ট। শ্যামা একটি পাত্রে ভোজনদ্রব্য সাজাইয়া তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইল। শ্রেষ্ঠিপুত্র জিজ্ঞাসা করিল—

শ্যামে কিমিদং ভবিষ্যতি।

শ্যামা উত্তর করিল—

আর্যপুত্র তং মে বধ্যং দৃষ্ট্বা কৃপা উৎপন্না। তস্যা মে এতদভূষি।
স্বয়ং ইমং ভোজনং হরিষ্যামি।

শ্যামার ছলনা শ্রেষ্ঠিপুত্র অনুধাবন করিতে পরিল না। সে বলিল—

আনেহি অহং গমিষ্যামি মা ত্বং স্বয়ং গচ্ছাসি।

শ্যামার ইঙ্গিতে ভোজনপাত্রবাহী শ্রেষ্ঠিপুত্রকে হত্যা করা হইল এবং বজ্রসেন মুক্তি লাভ করিলেন। 'তেহি দানি বধ্যঘাতকেহি তং শ্রেষ্ঠিপুত্তং ঘাতেত্বা সো অশ্ববাণিজকো ওসৃষ্টঃ।' ব্রজসেন গোপনে শ্যামার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্যামা ও বজ্রসেন উভয়ে বিলাসলীলায় আনন্দোচ্ছল জীবন যাপন করিতেছিল—

উভৌ ক্রীড়ন্তি রমন্তি প্রবিচারয়ন্তি।

নিহত শ্রেষ্ঠিপুত্রের মাতাপিতাকর্তৃক প্রেরিত অবশিষ্ট বর্ষদ্বয়ের অর্থ দ্বারা শ্যামার বিলাস লীলা চলিতে লাগিল। বজ্রসেন নিজের ভবিতব্য চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল তিনিও শ্রেষ্ঠিপুত্রের ন্যায় ভবিষ্যতে এই গণিকাকর্তৃক নিহত হইবেন—'অহং পি তথা এব হনিষ্যমি যথা সো পুরিমকো শ্রেষ্ঠিপুত্তো।' বজ্রসেনের চিন্তাগ্রস্ত, পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া উৎকন্ঠিতা শ্যামা প্রশ্ন করিল—

কিংপ্রার্থয়সি কস্য বা তে অভিলাষো তং অভিলষ্যতি।

বজ্রসেন উত্তর করিলেন—আমার দেশে সুবিস্তীর্ণ উদ্যানযুক্ত ও পদ্মসুশোভিত দীর্ঘিকায় জলক্রীড়া করিতাম। তাহা স্মরণ করিয়া চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। শ্যামা বজ্রসেনের জন্য পদ্মসুশোভন দীর্ঘিকাযুক্ত একটি উদ্যানভূমি স্থাপন করিল এবং বজ্রসেনকে বলিল—

যদি আর্যপুত্রস্য উদ্যানগমনে অভিপ্রায়ো নিধবামি উদ্যান ভূমিং ক্রীড়ার্থং।

বজ্রসেন বলিলেন—বাঢ়ং নিধবামো তি। জলক্রীড়া আরম্ভের প্রাক্কালে বজ্রসেন শ্যামাকে জানাইলেন—আমরা অন্যের অগোচরে জলক্রীড়া করিব, সুতরাং দীর্ঘিকার চতুর্দিকে যবনিকা রচনা করা হউক। এতাং পুষ্করিণীং প্রতিসীরাহি প্রতিবেঠাপেহি বিশ্বস্তা দকক্রীড়াং ক্রীড়িষ্যামঃ ন কোচিৎ পশ্যতি।

শ্যামা পদ্মদীর্ঘিকার চতুর্দিকে যবনিকা রচনা করিল। যবনিকার অন্তরালে—তে দানি উদকক্রীড়ায়ে ক্রীড়ন্তি রমন্তি প্রবিচারয়ন্তি উভয়ে অতৃতীয়া।

বজ্রসেন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে তৎপর হইলেন। তিনি শ্যামাকে প্রচুর মদ্য পান করাইলেন। এবং শ্যামার অনুচরদের আদেশ করিলেন—

গচ্ছথ ভূয়ং ভাণ্ডমূলে আসথ বয়ং বিশ্বস্তা উদকক্রীড়াং ক্রীড়িষ্যাম।

উভয়ে একত্রে জলক্রীড়ার জন্য দীর্ঘিকায় অবতরণ করিলেন। বজ্রসেন শ্যামাকে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত করিতে লাগিলেন। শ্যামা শ্রান্ত ও পীড়িত হইল। কিন্তু ভাবিল—আর্যপুত্র উদক ক্রীড়াং করোন্তি। ক্রমশঃ শ্যামা হতচেতন হইয়া পড়িল। বজ্রসেন মনে করিলেন—শ্যামা মরিয়া গিয়াছে। তিনি ক্রীড়া পুষ্করিণী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিলেন। শ্যামার প্রতীক্ষ্যমাণ অনুচরগণ দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করিয়া যবনিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং শুশ্রূষা করিয়া হতচেতন শ্যামার দেহে প্রাণসঞ্চার করিল। চেতনা লাভ করিয়া শ্যামা জানিল—বজ্রসেন পলায়ন করিয়াছেন। সে নগরে প্রত্যাবর্তন করিল। তাহার ভয় হইল যদি পূর্বতম শ্রেষ্ঠিপুত্রের পিতামাতা

তাহাদের সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ জানিতে পারে তাহা হইলে কি উপায় হইবে। সে চণ্ডালদের নিকট হইতে একটি সদ্যমৃত 'আনদষ্ট' শবদেহ চাহিয়া আনিল। মৃতদেহটি গন্ধ দ্রব্যের দ্বারা অভিসিঞ্চিত করিয়া শবাধারের মধ্যে বহুমূল্য বস্ত্রাবরণে ঢাকিয়া দিল এবং পরিচারকদের বলিল 'সর্বএককণ্ঠা রোদনং করোথ এবং চ বদথ আর্যপুত্রো কালগতো তি।'

নিহত শ্রেষ্ঠিপুত্রের মাতাপিতা সেই ক্রন্দনশব্দে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল—অপহরম এতাং চমুং পশ্চিমদর্শনং পুত্রং পশ্যাম।

শ্যামা তাহাদের জানাইল—আর্যপুত্রের অন্তিম অভিলাষ তাঁহার আত্মীয়বর্গ যেন তাঁহার শবদেহ দর্শন করিতে না পায়। আমি আমার প্রাণ থাকিতে তাঁহার শেষ ইচ্ছা ব্যর্থ হইতে দিব না। শ্যামার ছলনা তাঁহারা বুঝিতে পারিল না। শবদেহ শ্মশানে ভস্মীভূত করা হইল। শ্যামা পুত্রশোকাতুর শ্রেষ্ঠী দম্পতির গৃহে প্রবেশ করিল। তথায় 'সা দানি ও মুক্তামণিসুবর্ণা ওদাতবস্ত্রাম্বরধরা একবেণীধরা বজ্রসেনমশ্ববাণিজকং শোচন্তী আসতি।' কিন্তু শ্রেষ্ঠী দম্পতি মনে মনে ভাবে শ্যামা—'অস্মাকমেষা এক পুত্রস্য শোচতি।'

একদা তক্ষশীলাবাসী একদল নটের সঙ্গে শ্যামার সাক্ষাৎ হইল। শ্যামা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল—প্রত্যভিজানথ যূয়ং তক্ষশিলায়াং শ্রেষ্ঠিপুত্রো বজ্রসেনো নাম আশ্ববাণিজো। তাহারা উত্তর করিল—আম প্রত্যভিজানাম। শ্যামা তাহাদের বলিল এই গাথাটি বজ্রসেনের নিকট নিবেদন করিও—

যান্ত্বং সালেহি ফুল্লেহি শ্যামাং কৌশেয়বাসিনীং।
গাঢ়ং অংকেন পীড়েসি সা তে কৌশল্যাং পৃচ্ছতি॥

কিন্তু বজ্রসেন জানেন শ্যামা নিহত হইয়াছে। সে কিভাবে তাঁহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে? নটগণ বলিল—

নাপি সা মৃয়তে নারী নাপ্যন্যমভিকাঙ্ক্ষতি।
একবেণী ধরা বালা ত্বামেব অভিকাঙ্ক্ষতি॥

শ্যামার ভয়ে বজ্রসেন ভীত, শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, তিনি ভাবিলেন হয় ত পূর্বতন শ্রেষ্ঠিপুত্রের নিয়তি তাঁহারও ঘটিবে। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন দূর হইতে দূরতর দেশে পলায়ন করাই বিধেয়।

তখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন বজ্রসেন, এবং যশোধরা ছিলেন শ্যামা। শ্যামা জাতকের এই কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ বহু পরিবর্তন ও পরিসংস্কার করিয়াছেন। তথাপি ইহার স্থানে স্থানে কাহিনীগত মিলও বড় কম নহে। অবদানকার

জানাইয়াছেন—রাজাপ্রাসাদে চুরি হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছে—মার্গথ তাং চোরাং।

রবীন্দ্রনাথ মূলকাহিনীর সত্যতা রক্ষা করিয়াছেন। রাজপ্রাসাদে চুরির অভিযোগে রাজাদেশ ঘোষিত হইয়াছে—

"রাজকোষ হতে চুরি! ধরে আন চোর
নহিলে, নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর—
মুণ্ড রহিবে না দেহে!"

কঠিন রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া নগররক্ষিগণ বারাণসীর প্রতি গৃহ, প্রতি মন্দির, প্রতি শূন্যাগার অন্বেষণ করিতে লাগিল—তে রাজ আণত্তীয়ে তম্মুহূর্তং বারাণসীয়ে চোরা মার্গীয়ন্তি সর্বগৃহানি লোলীয়ন্তি দেবাগারাণি শূন্যাগারাণি। রবীন্দ্রনাথ তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন—রাজার শাসনে

রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে।

অবশেষে এক শূন্যাগারে শ্রান্তক্লান্ত নিদ্রিত বিদেশী বণিক বজ্রসেনকে পাওয়া গেল, প্রহরিগণ ভাবিল এই বিদেশী নিশ্চয়ই চোর। সুতরাং—

হস্তে পদে বাঁধি তাঁর লোহার শিকলি
লইয়া চলিল বন্দীশালে।

অবদানকার লিখিয়াছেন, অশ্ববাণিজক বজ্রসেনকে রাজা মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন—'গচ্ছথ নং অতিমুক্তকশ্মশানে নেত্বা জীবশূলকং করোথ।' অতিমুক্তক শ্মশানের পথে কঠিনশৃঙ্খলে বন্দী বিদেশী বণিক বজ্রসেন শ্যামার নয়নপথে পতিত হইলেন। 'পরিশোধ' কবিতায় বন্দীশালে লইয়া যাইবার পথে কাশীর সুন্দরী-প্রধানা শ্যামা বাতায়ন পথে বজ্রসেনকে দেখিতে পাইল। এবং বলিল—

"আহা মরি মরি
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে।

বজ্রসেনকে দেখিয়া শ্যামা মুগ্ধ হইল। অবদানে সে রাজপুরুষদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে 'অন্যো পুরুষো আগমিষ্যা এতবর্ণো এতদ্রূপো চ তং গৃহ্য তং মারেথ।'

'পরিশোধ' কবিতায় শ্যামা শুধু দুইদিনের সময় প্রার্থনা করিয়াছে—'শুধু দুটি রাত বন্দীরে বাঁচায়ে রেখো'। তারপর বজ্রসেনের প্রাণরক্ষার জন্য সে তাহার অপর এক প্রণয়ীকে বলি দিয়াছে। উভয়ক্ষেত্রে শ্যামার নিদারুণ নৃশংসতার বিষয় জানিতে পারিয়া বজ্রসেন তাহার প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন। অবদানে বজ্রসেন কৌশলে শ্যামাকে হত্যা করিয়া তাহার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উদ্যানশোভিত দীর্ঘিকায় জলক্রীড়ার সময় প্রণয়ের ভাণ করিয়া তিনি শ্যামাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছেন এবং হতচেতন অবস্থায় তাহাকে দীর্ঘিকার সোপানে স্থাপন করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। 'পরিশোধ' কবিতা মূলকাহিনীর এই ইঙ্গিতকে বহন করিতেছে। এইখানে আলিঙ্গনাবদ্ধা শ্যামার কণ্ঠ বজ্রসেনের দুই লৌহকঠিন হস্তের নিষ্পেষণে নিপীড়িত হইয়াছে—

অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কি যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব।
মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে
বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম কাকুতি স্বর,—তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমিপরে অসাড় পতনে।

নারীচরিত্রের অবিশ্বস্ততা ও ভোগলোলুপ জিঘাংসা প্রদর্শন করাই অবদান কাহিনীর উদ্দেশ্য আর অন্ধপ্রেম মানুষের চিন্তাশক্তি ও বিচার-বিবেচনাকে কতখানি আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহা নির্ণয় করিয়া প্রণয়ীর দুর্জ্ঞেয় হৃদয়রহস্যের উপর আলোক সম্পাত করা 'পরিশোধ' কবিতার উদ্দেশ্য। মূল কাহিনীতে বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার প্রণয় কেবল তাহার গণিকাসুলভ ক্ষণিক ভোগাকাঙ্ক্ষা-মাত্র নহে, ইহা তাহার জন্মজন্মান্তরের বন্ধন। এইজন্য দর্শনমাত্রেই সে বজ্রসেনের প্রতি আসক্তা হইয়াছে। কারণ শ্যামা 'তহিং অশ্ববাণিজকে জাতীসহস্রাণি প্রেমানুবদ্ধা—তস্যা তহিং অভ্যর্থং প্রেম্নং উৎপন্নং।' এই পুরুষকে লাভ করিতে না পারিলে তাহার জীবনই ব্যর্থ বোধ হইয়াছে। অবদানকাহিনীর অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের শ্যামাও প্রথম দর্শনে বজ্রসেনের প্রতি আসক্তা হইয়াছে। এই আকর্ষণ সুন্দরীশ্রেষ্ঠা শ্যামার লীলাকৌতুক মাত্র নহে। সেও বজ্রসেনকে জানাইয়াছে—

"হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে।
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ-অলঙ্কার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

প্রহরীর প্রতি তাহার কাতর অনুনয়—

"আমার যা আছে লয়ে নির্দোষ বন্দীরে
মুক্ত করে দিয়ে যাও।"

অবদান কাহিনীতে শ্যামা ছলনাময়ী। 'স্ত্রী মায়াহি অনন্তিকা'—ইহাই অবদানকার তাহার জীবনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সে ছলনাপূর্বক শ্রেষ্ঠিপুত্রকে ভোজনপাত্রসহ বজ্রসেনের নিকট প্রেরণ করিয়াছে। তাহারই নির্দেশে রক্ষিগণ ভোজনপাত্রবাহী শ্রেষ্ঠিপুত্রের বিনিময়ে বজ্রসেনকে মুক্তি দিয়াছ। তেহি দানি বধ্যঘাতকেহি তং শ্রেষ্ঠিপুত্তং ঘাতেত্বা সো অশ্ববাণিজকো ওসৃষ্টঃ। কেবল তাহাই নহে। পরে এই পাষাণহৃদয়া রমণী সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রের পিতামাতার প্রেরিত অর্থে বজ্রসেনের সঙ্গে ভোগসুখে কালযাপন করিয়াছে। অবদানকারের ছলনাময়ী দানবী রবীন্দ্রনাথে পাষাণহৃদয়া মানবীতে রূপান্তরিতা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শ্যামা প্রেমাস্পদকে রক্ষা করিবার জন্য একটি চরম পাপকে বরণ করিয়াছে। অবশেষে এই পাপ লেলিহান অগ্নিশিখার ন্যায় প্রাণের সমস্ত কমনীয়তাকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। অবদানে সে স্বচ্ছন্দে বজ্রসেনের সঙ্গে প্রণয়লীলায় কাল যাপন করিয়াছে, কিন্তু 'পরিশোধ' কবিতায় তাহা সে পারে নাই। প্রেমাস্পদের সকৃতজ্ঞ গদগদ ভাষণে মর্মদাহের শতবৃশ্চিক জ্বালায় সে জর্জরিত হইয়াছে। প্রিয়কণ্ঠের 'দয়াময়ী' সম্বোধনে সে অপ্রতিরোধনীয় বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বলিয়াছে—

'আমি দয়াময়ী
এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা,
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নহে আর।

'পরিশোধ' কবিতায় উত্তীয়ের জীবন উৎসর্গও অবদানকাহিনীর কপটতা দ্বারা কালিমালিপ্ত হয় নাই। শ্যামার অনুরোধে স্বেচ্ছায় সে মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছে। বজ্রসেনের প্রশ্নের উত্তরে শ্যামার শত ধারায় রক্তাক্ত হৃদয় আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে শ্যামা সেই মহিমময় আত্মত্যাগের কাহিনী জানাইয়াছে—

উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি অপবাদ নিজ স্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।

ইহার পর নিয়তির কঠিন বজ্রাঘাতের ন্যায় কৃতপাপের অভিসম্পাত তাহার উপর নামিয়া আসিয়াছে। বজ্রসেনের পাষাণহৃদয়ে শ্যামার উচ্ছ্বসিত প্রেমতরঙ্গ আহত হইয়া বারে বারে ফিরিয়া গিয়াছে। আর্তকরুণ কণ্ঠে সে আবেদন জানাইয়াছে—

.........ক্ষমা করো, নাথ,
এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর—
তোমা লাগি যা করেছি তুমি ক্ষমা করো।'

কিন্তু বজ্রসেনের ক্ষমা সে পায় নাই। দুর্দমনীয় প্রণয়তৃষ্ণায় এক ব্যথামৌন প্রণয়ীকে সে গ্রাস করিয়া লইয়াছিল। অবশেষে নিয়তির রোষপ্রদীপ্ত অভিশাপ তাহার জীবনকে দলিত, বিধ্বস্ত, করিয়া তাহাকে একেবারে সর্বহারা করিয়া দিয়াছে।

অবদানের মুক্তাভরণা, একবেণীধরা, শুক্লবসনা শ্যামার জন্য পাঠকের সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইলেও তাহার এই ত্যাগস্বীকারের মধ্যেও নিষ্ফলকামনা ও লালসাই যেন ক্রূর সর্পের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শ্যামা বিবেকের নিষ্ঠুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত অসহায়া নারী।

অবদানে পৌরুষের অভাব ও হীন পলায়নবৃত্তি বজ্রসেনের চরিত্রকে অবনমিত করিয়াছে। শ্যামার নৃশংস আচরণে ব্যথিত হইয়া নহে, আত্মরক্ষার তাগিদে তিনি শ্যামার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহার সর্বদাই দুশ্চিন্তা—অহং পি তথা এব হনিস্যাম যথা সো পুরিমকো শ্রেষ্টিপুত্তো। তাঁহার চরিত্রে বোধিসত্ত্বোচিত গাম্ভীর্য ও মহত্ত্বের প্রকাশ নাই। কপট জলক্রিড়ার সুযোগে তিনি শ্যামাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্যামার প্রতি তাঁহার প্রণয়ের আভাসও অবদানে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ 'পরিশোধ' কবিতায় বজ্রসেনের চরিত্র আমূল সংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার বজ্রসেন অমিত শক্তিশালী বীরপুরুষ। শ্যামার জন্য সীমাহীন প্রেমে তাঁহার হৃদয় ভরপুর। শ্যামার নিকট তিনি ঋণী। এই ঋণ তাঁহার প্রণয়কে আরো প্রগাঢ় করিয়াছে। কিন্তু শ্যামার

কঠিন হৃদয়হীনতার পরিচয় পাইয়া এক মুহূর্তে তিনি নিয়তির ন্যায় কুলিশ-কঠিন হইয়া উঠিয়াছেন। একদিকে গভীর প্রণয়, অন্যদিকে জাগ্রত বিবেকবুদ্ধি দুই-এর সংঘাতে তিনি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। সুতীব্র ভাষায় শ্যামাকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

"আমার এ প্রাণে
তোমার কী কাজ ছিল। এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত। কলঙ্কিনী
ধিক্ এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।
ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে।"

অবদানকারের বজ্রসেনের ন্যায় 'পরিশোধ' কবিতাতেও তিনি শ্যামার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চাহিয়াছেন। তথাপি শ্যামার সঙ্গ তাঁহার চিরবাঞ্ছিত। অবদানে বজ্রসেন ভীরু, কাপুরুষ, 'পরিশোধ' কবিতায় তিনি সত্যসন্ধ, প্রণয়ী। এই সত্যনিষ্ঠাই প্রাণদাত্রী প্রেয়সীর প্রতি তাঁহার অন্তরে ক্ষমাহীন আক্রোশ জাগাইয়া রাখিয়াছে। তিনি প্রেমে অপ্রতিম, ক্রোধে প্রচণ্ড, সংকল্পে দৃঢ়চেতা। এই চরিত্রের ব্যর্থতা ও বেদনাময় গৌরব পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটির কাহিনী 'মাকন্দিকা অবদান'[১] হইতে গৃহীত হইলেও কবিকল্পনার স্পর্শে ইহা সম্পূর্ণ নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। কবিতাটি কাশীরাজের অসামান্য ন্যায়নিষ্ঠা ও অবিচলিত কর্তব্যবোধের সার্থক পরিচয় বহন করিতেছে। অবদানে আছে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পাঁচশত মহিষী ছিল। একদা মহিষিগণ রাজোদ্যানে আনন্দোৎসবে গিয়াছেন। নদীর সুশীতল সলিলে অবগাহন করিয়া—'তা অন্তঃপুরিকাঃ ক্রীড়াপুষ্করিণ্যাং স্নাত্বা শীতেনানুবদ্ধাঃ।' এই ছোট কাহিনীটি এই কবিতায় ছন্দ বর্ণ ও ভাব-সুষমায় এক অপরূপ উল্লাসময় কবিকল্পনাকে উদ্বোধিত করিয়াছে—

আজি উতরোল উত্তর বায়ে
উতলা হয়েছে তটিনী।
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে
পুলকে উছলি ঢেউ ছলোছলে
লক্ষ মাণিক ঝলকি আঁচলে
নেচে চলে যেন নটিনী।

১। দিব্যাবদানম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, মাকন্দিকাবদানম্, পৃঃ ৪৬১

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি
মৃণাল ভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চল নদী মাতে উল্লাসে
আলাপে প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠিল আকুলি।

দিব্যাবদানের ক্রীড়াপুষ্করিণীতে স্নানরত পঞ্চশত রমণীর মদির সুষমা ও উল্লাস এবং পুষ্করিণীর তরঙ্গলীলাচাঞ্চল্যের কবি যেন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। স্নান সমাপন করিয়া শীতকম্পিতা প্রধানা মহিষী নিকটে নদীতীরে একটি পর্ণ কুটির দেখিয়া সখীকে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন— 'দারিকে, শীতেনাতীব বাধ্যামহে। গচ্ছ এতস্যাং কুটিকায়ামগ্নিং প্রজ্বলয়েতি।' কবির রাজমহিষী করুণাও বিলাসকলা কৌতূহলের অবসানে একই ভাষায় সখীদের বলিলেন—

"উহু, শীতে মরি।
সকল শরীর উঠিছে শিহরি;
জ্বেলে দে আগুন ওলো সহচরী,
শীত নিবারিব অনলে।"
... ...
"ওলো তোরা আয়, ওই দেখা যায়
কুটির কাহার অদূরে।
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল
তপ্ত করিব করপদতল।

রাণীর সখী প্রজ্বলিত উল্কার আলোয় দেখিল যে সে কুটিরে এক প্রত্যেকবুদ্ধ ধ্যানরত। সে রাণীকে জানাইল—

দেবি, প্রব্রজিতোহস্যাং তিষ্ঠতীতি।'

কিন্তু রাণীর কঠিন আদেশ—

প্রব্রজিতো বা তিষ্ঠতু, অগ্নিং দত্বা তাং প্রজ্বলয়েতি।'

সখী এই নিষ্ঠুর কাজ সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক নয়। শুনিয়া কুপিত রাজমহিষী স্বহস্তে কুটিরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন।—ততস্তয়া কুপিতয়া স্বয়মেব দত্তম্।' অবদানকারের এই সহচরী রবীন্দ্রকাব্যে 'মালতী' নামে আবির্ভূতা

হইয়াছে। রাণী করুণার নির্দয় আদেশ শুনিয়া সকরুণ কণ্ঠে সে প্রতিবাদ জানাইয়াছে—

'একি পরিহাস রাণী মা।
আগুন জ্বালায়ে কেন দিবে নাশি—
এ কুটির কোন সাধু সন্ন্যাসী
কোন দীনজন কোন্ পরবাসী
বাঁধিয়াছে নাহি জানি মা।'

কিন্তু বিলাসকৌতুহল-উন্মত্তা শত রমণীর পরিহাস ও হাসিঠাট্টায় সেই করুণহৃদয়া সখীর আকুতি শূন্যে মিশিয়া গেল। তখন—

অতি দুর্দাম কৌতুকরত
যৌবন মদে নিষ্ঠুর যত
যুবতীরা মিলি পাগলের মতো
আগুন লাগালো কুটিরে।

কুটির ভস্মীভূত হইল। অবদানে প্রমোদ-বিহ্বলা শত সখী রাণীর কাজের প্রশংসা করিয়া বলিল—'দেবি, শোভনং ত্বয়া যদগ্নির্দত্তঃ। সর্বা বয়ং প্রতপ্তা ইতি।' এই পর্যন্ত অবদানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল পাওয়া যায়। ইহার পর কবিতায় গৃহহীন প্রজাগণের করুণ আবেদনে রাজহৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা কঠিনকণ্ঠে রাজমহিষীকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

'মহিষী, একি ব্যবহার।
গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার
বলো কোন্ রাজধরমে।'

কিন্তু যে রাণী বিলাস কৌতুকের সুখমদিরা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, ব্যথিতের বেদনা তিনি বুঝিবেন কি করিয়া? সুতরাং রাজার ন্যায়বিচারের দণ্ড রাণীর শিরে নামিয়া আসিল—

রাজার আদেশে কিংকরী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া
অরুণবরণ অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি
ভিখারী নারীর চীরবাস আনি
দিল রাণীদেহে তুলিয়া।

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
'মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে কটি কুটির হল ছারখার
যত দিনে পারো সে কটি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।'

এই কর্তব্যনিষ্ঠ প্রজাবৎসল কাশীরাজ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। অবদানে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের এই মহত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয় নাই। অবদানকারের রাজমহিষী রবীন্দ্রনাথের করুণা চরিত্রে আপন উত্তরাধিকার বজায় রাখিয়াছে। উভয়েই কঠিনহৃদয়া, বিলাস ও কৌতুকোন্মত্তা নারী। কুলিশকঠিন রমণীহৃদয়ে করুণার স্থান নাই। আপন সুখতৃষ্ণায় তাহারা অন্যের চরম ক্ষতি করিতেও ইতস্ততঃ করে না। অবদানকারের রাজমহিষী প্রত্যেকবুদ্ধের অভিশাপে পরজন্মে (উদয়নপত্নী শামাবতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) অগ্নিদগ্ধ হইয়া পূর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজমহিষীকে রাজার ন্যায়দণ্ড বহন করিয়া এক বৎসর কালের মধ্যেই তাহার কৃত অপরাধের ক্ষতিপূরণ করিতে হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি' অবদানকাহিনীর সার্থক উন্নয়ন। অবদানে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের শত মহিষী বৎসরাজ উদয়নের পত্নীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মদত্তের প্রধানা মহিষী হইয়াছেন উদয়নের প্রধানা মহিষী শ্যামাবতী। পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে তাঁহারা এই জন্মে অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। উদয়ন বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিলেন—'কিং ভদন্ত শ্যামাবতীপ্রমুখৈঃ পঞ্চাভিঃ স্ত্রীশতৈঃ কর্মকৃতং যেনাগ্নিনা দগ্ধানি?' বুদ্ধদেব তাহাদের পূর্বজন্মের কর্মফলের বিষয় উল্লেখ করিলেন—'আভিরেব মহারাট্ট কর্মাণিকৃতান্যুপচিতানি লব্ধসংভারাণি পরিণতপ্রত্যায়ানি পূর্ববত্তাবৎফলন্তি খলু দেহিনাম।' প্রসঙ্গক্রমে তিনি উদয়নের শতমহিষীর অতীত জন্মের কাহিনী নৃপতির নিকট বিবৃত করিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাশীরাজ-মহিষী ইহজন্মেই কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কবি জন্মান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ইহা অবদানকাহিনীর যুগোপযোগী সংশোধন।

অবদানশতকের আখ্যানে শ্রাবস্তীর এক দরিদ্র মালীর জীবনে মানব-মহত্ত্বের পরিচায়ক ত্যাগ ও আত্মসমর্পণ প্রত্যক্ষ করিয়া 'মূল্যপ্রাপ্তি' কবিতায় কবি তাহাকে চিরবন্দিত করিয়া রাখিয়াছেন। অবদানশতকের কাহিনীটি[১] নিম্নরূপ—

শ্রাবস্তীর এক মালীর পুষ্পোদ্যানে একটি নবপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মালী তাহা নৃপতি প্রসেনজিতের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত। এক তীর্থিক উপাসক পদ্মের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া প্রশ্ন করিলেন—

কিমিদং পদ্মং বিক্রীণিষ্যে ?

মালী উত্তর করিল—আমেতি। এই সময় অনাথপিণ্ডদ এই পথে যাইতেছিলেন। তিনি আরো দ্বিগুণ মূল্যে পদ্মটি ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইলেন। উপাসকও ছাড়িবার নহেন। উভয়ে পরস্পর বাজি রাখিয়া পদ্মের মূল্য বাড়াইয়া চলিলেন। ক্রমশঃ তাহা বাড়িতে বাড়িতে সহস্র কার্ষাপণে উপনীত হইল। অবাক মালী প্রশ্ন করিল—কাহার জন্য এই পুষ্পের মূল্য আপনারা এত বাড়াইয়া তুলিয়াছেন ? উপাসক বলিলেন—'অহং ভগবতো নারায়ণস্যার্থে ইতি।'
অনাথপিণ্ডদ বলিলেন—'অহং ভগবতো বুদ্ধস্যার্থে ইতি।'
মালীর মনে প্রশ্ন জাগিল—'ক এষ বুদ্ধো নামেতি ?' অনাথপিণ্ডদ সবিস্তারে বুদ্ধগুণ ব্যাখ্যা করিলেন। মুগ্ধ বিস্মিত মালী জানাইল—'গৃহপতে অহং স্বয়মেব তং ভগবন্তমভ্যর্চয়িষ্য ইতি।' জেতবনে উপস্থিত হইয়া মালী তাহার সেই নবপদ্ম ভগবানকে অর্পণ করিল। পদ্মটি আরো বিকশিত হইয়া শকটচক্রের আকৃতি ধারণ করিল এবং ভগবানের মস্তকোপরি শোভা পাইতে লাগিল। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া মালী ভগবানের চরণে কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্মদেশনা প্রার্থনা করিল।

অবদানশতকের সামান্য মালীর এই মহত্তম ত্যাগ স্বীকার কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। কবিচিত্তের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য লাভ করিয়া 'মূল্যপ্রাপ্তি' কবিতায় সে অমর আসন লাভ করিয়াছে। তাঁহার সুদাস মালীও তাহার সরোবরের অকালপদ্মটি—

তুলি লয়ে বেচিবারে গেল সে প্রাসাদদ্বারে,
মাগিল রাজার দরশন—

১। অবদানশতকম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পদ্ম, পৃঃ ১৮

এমন সময়ে অবদানশতকের তীর্থিক উপাসক বুদ্ধ-ভক্ত পথিকরূপে দর্শন দিলেন। পথিক বলিলেন—

'অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনে লব
কত মূল্য লইবে ইহার।
বুদ্ধ ভগবান আজ এসেছেন পুরমাঝ
তাঁর পায়ে দিব উপহার।'

সুদাস এক মাষা স্বর্ণমূল্যে পদ্ম বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। এমন সময় রাজেন্দ্র প্রসেনজিত মহাসমারোহে বুদ্ধপূজার উদ্দেশ্যে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। অকালের পদ্ম রাজচক্ষুকেও অভিভূত করিল। জিজ্ঞাসা করিলেন—'কত মূল্য'? মালী জানাইল—"হে রাজন স্বর্ণ মাষা দিয়ে পণ
কিনিছেন এই মহাশয়।"

এইবার অবদানশতকের কাহিনীর অনুসরণে দুই ক্রেতার মধ্যে দাম হাঁকাহাকি শুরু হইল এবং—

দোঁহে কহে "দেহো দেহো" হার নাহি মানে কেহ
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।

সুদাস অবদানশতকের মালী অপেক্ষা বুদ্ধিমান। সে ভাবিল যাঁহাকে উপহার দিবার জন্য ইহাদের এত আগ্রহ তাঁহার কাছে নিশ্চয় আরো বেশী মূল্য পাওয়া যাইবে। এইজন্য—

কহিল সে করজোড়ে, "দয়া করে ক্ষম মোরে
এ ফুল বেচিতে নাহি মন।"
এত বলি ছুটিল সে যেথা রয়েছেন বসে
বুদ্ধদেব উজলি কানন।

কিন্তু সেখানে সে দেখিল—

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্য জ্যোতি।

এই বর্ণনায় যিনি অনন্থভবনীয় তাঁহার অনন্ত জ্যোতির্ময় সৌন্দর্য রূপদক্ষ কবির তুলিকায় মৈত্রীকরুণায় উজ্জ্বল চিত্ররূপ পাইয়াছে। সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া সুদাসের নয়নে আর পলক পড়ে না, মুখেও আর কোন কথা সরে

না। মুগ্ধ আত্মসমাহিত সুদাস ভূলুণ্ঠিত হইয়া পদ্মটি বুদ্ধের চরণে নিবেদন করিল।

বরষি অমৃত রাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি
"কহো বৎস, কী তব প্রার্থনা"

কিন্তু যিনি মহোত্তম তাঁহার নিকট কি পার্থিব বিষয়বস্তু প্রার্থনা করা যায়? সুদাস প্রভুর চরণের এককণা ধূলি চাহিয়া লইল। সহস্র কার্ষাপণ বা সুবর্ণমুদ্রার বিনিময়ে যে পদ্ম বিক্রয় করা যাইত, বুদ্ধচরণের এক কণা ধূলির বিনিময়ে তাহা অর্পিত হইল।

ব্যাকুল সুদাস কহে, "প্রভু আর কিছু নহে।
চরণের ধূলি এক কণা।"

সুদাসের এই ত্যাগ ও আত্মসমর্পণ চিরন্তন সাহিত্যের সামগ্রীরূপে স্বীকৃতি পাইয়াছে। অবদানে বুদ্ধের চরণে অর্পিত পদ্ম শকটচক্রের আকৃতি ধারণ করিয়া তাঁহার মস্তকোপরি শোভা পাইয়াছে। এই অপ্রাকৃত পরিবেশকে এই যুগের কবি সংশোধন করিয়া সহজ স্বাভাবিকরূপে চিত্রায়িত করিয়াছেন।

'নগরলক্ষ্মী' কবিতার উৎস কল্পদ্রুমাবদান[১]। অবদানের অনাথপিণ্ডদকন্যা সুপ্রিয়ার একটি গতানুগতিক কাহিনী কবি-কল্পনার প্রাণময় স্পর্শে এই কবিতায় একটি অনিন্দ্যসুন্দর আলেখ্যরূপে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

অনাথপিণ্ডদের কন্যা সুপ্রিয়া সপ্তমবর্ষ বয়সে গৌতমীর নিকট দীক্ষিতা হইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। কিছুকাল পরে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সুপ্রিয়া নগরবাসীদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া নগরের সমস্ত দুঃখীজনগণের অভাব দূর করিতেন। বুদ্ধদেব শিষ্যদের সুপ্রিয়ার দান গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তিন মাস পরে বুদ্ধদেব সশিষ্য শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহে যাইতেছেন। যাত্রাসময়ে এক অরণ্যে দারুণ খাদ্যসঙ্কট দেখা দিল। সুপ্রিয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—যদি তিনি অতীতে কোন সদ্‌কর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন তবে সেই পুণ্যে আজ তাঁহার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়া উঠিবে। এই সত্যক্রিয়া অরণ্যের এক দেবতার কর্ণগোচর হইল। তিনি

১। সংস্কৃত 'কল্পদ্রুমাবদান' গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথ এ কাহিনীটি রাজেন্দ্র লাল মিত্রের The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থের ২৯৮ পৃঃ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

অমৃতদ্বারা সুপ্রিয়ার পাত্র পূর্ণ করিয়া দিলেন। ইহার দ্বারা সুপ্রিয়া সশিষ্য বুদ্ধদেবের সেবা করিলেন। এই পুণ্যকাজের জন্য তিনি অর্হত্ত্ব পর্যায়ে উন্নীতা হইলেন।

মূলে সুপ্রিয়া পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে অলৌকিক শক্তিসম্পন্না ও দৈব অনুগৃহীতা। অবদানকার প্রথম হইতে শেষ অবধি সুপ্রিয়ার অতিলৌকিক মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুপ্রিয়া মানবীকন্যা, মানুষের সম্মিলিত শক্তির উপর তাহার গভীর আস্থা। অবদানকারের সুপ্রিয়া যখন অতীত জন্মের সুকৃতির নিকট হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের সুপ্রিয়া তখন আত্মশক্তিতে মস্তক উত্তোলন করিয়া ধীরে সংযত কণ্ঠে জানাইয়াছে—

কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।

স্তম্ভিত বিস্মিত সভাগৃহ জানিতে চাহিল কোন্ অহঙ্কারে ভিক্ষুকন্যা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া আজ এই গুরুভার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সাহসী হইল। কিন্তু সুপ্রিয়ার এই অভিপ্রায়ের প্রেরণা ব্যথিত ক্ষুধিত মানুষের প্রতি তাহার হৃদয়ের উদার করুণা। বিনম্রাবনত কণ্ঠে সে জানাইয়াছে তাহার শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে—

আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে
তাই তোমাদের পাব দয়া—
প্রভু আজ্ঞা হইবে বিজয়া—

আরো একটি সুমহান্ সত্য সে উপলব্ধি করিয়াছে—সে একা নগণ্য হইতে পারে কিন্তু সম্মিলিত শক্তির দ্বারা সে অসাধ্যও সাধন করিতে পারিবে—

আমার ভাণ্ডার আছে ভরে,
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'

রবীন্দ্রনাথের সুপ্রিয়া যেন বৌদ্ধধর্মের সেবা ও করুণার মূর্তিমতী বিগ্রহিণী। যে গুরু দায়িত্বভার রত্নাকর শেঠ গ্রহণ করে নাই, সামন্ত জয়সেন যাহা পালন করিতে অক্ষম, ধর্মপালও যাহা বহন করিতে অস্বীকার করিয়াছে, সেই নির্বাক

সভাগৃহে অশ্রুপ্লুতা সুপ্রিয়া সেই কঠিন দায়িত্ব সর্বান্তঃকরণে শিরে বহন করিয়া লইয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত খাদ্যহারা মানুষ যে তাহার সন্তান। প্রতি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আজ নগরীর ক্ষুধা তাহাকে মিটাইতে হইবে। কবির সুপ্রিয়া যথার্থই শ্রাবস্তীর নগরলক্ষ্মী।

সামান্য দুই এক পংক্তির মধ্যে এই কবিতায় ভগবান বুদ্ধের যে অপরূপ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তুলনারহিত। শ্রাবস্তীতে দুর্ভিক্ষের দিনে বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদের কাছে প্রতি জনে জনে জানিতে চাহিলেন—

ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা।

কিন্তু এত বড় কঠিন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে কেহই সাহসী হইল না—

রহে সবে মুখে মুখে চাহি
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।

নির্বাক্ সভাগৃহ। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবাকে জীবনব্রত করিতে কেহই অগ্রসর হইয়া আসিল না। অপরিসীম বেদনায় বুদ্ধের বিশাল হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কী প্রশান্ত করুণ সেই মূর্তি!

নির্বাক্ সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী 'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।

'করুণাকে' কবি এখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্ররূপ প্রদান করিয়াছেন। করুণার এই রূপময়তা, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রায়ণ কবির অন্তরের গভীরতম অনুভূতির প্রকাশ।

জন্মদিনে (৪নং কবিতা)

১৯৪০ সালে কবির জন্মোৎসব মংপুতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।[১] এই অনুষ্ঠানে একজন নেপালী ভিক্ষু কবির কল্যাণে বুদ্ধস্তোত্র আবৃত্তি করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী বসু লিখিয়াছেন—'সকাল বেলা দশটার সময় স্নান করে কালো জামা কালো রংয়ের জুতো পরে বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুদ্ধ মূর্তির সামনে বসে একজন বৃদ্ধ বৌদ্ধ বুদ্ধস্তোত্র পাঠ করল।'[২] বৌদ্ধভিক্ষু হরকামান লামার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত মহামানবের সেই বাণী কবির জন্মদিনকে কল্যাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত

১। রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২১৩।
২। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৫, পৃঃ ২৬৪।

করিয়া তুলিল। বুদ্ধের তুলনারহিত ঔদার্য তাঁহার সেই মহান্ আবর্ভাব কবিকে অতীতের স্মরণতীর্থে উপনীত করাইয়া দিল।—

এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন
মানুষের-জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরার সৃষ্টির অভিপ্রায়,—

জন্মদিনের শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রের প্রভাবে কবিও সেই উদার ঐতিহ্যের সঞ্চিত পুণ্যের ভাগী হইয়াছেন —

তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশিবর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

ভগবান বুদ্ধের প্রতি ভক্তজনোচিত উদার শ্রদ্ধার স্পর্শে কবিতাটি সরস স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

পত্রপুট, নবজাতক

পত্রপুটের সতেরো সংখ্যক কবিতা এবং নবজাতকের 'বুদ্ধভক্তি' কবিতার ভাববস্তু এক।[১] ১৯২৩ সালে কবি জাপান ভ্রমণে আসেন। জাপানে আসিয়া তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন সর্বত্র চীনকে পরাভূত করিবার জন্য প্রস্তুতিপর্ব চলিতেছে। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিয়াছেন—'কবি গিয়াই দেখিলেন যে জাপানের সর্বত্র চীনকে লাঞ্ছিত করিবার বিপুল আয়োজন চলিতেছে।...জাপানের উগ্র সাম্রাজ্য-লিপ্সা কোরিয়ার প্রতি তাহার অকথ্য অত্যাচার কাহিনী, চীনের প্রতি অপমানকর শর্তাদির বিস্তৃত বিবরণ সবই জানিতে পারিলেন। জাপান 'সভ্য' হইয়া পশ্চিমের আগ্নেয়াস্ত্র ও কূটনীতি আয়ত্ত করিয়া তাহার প্রথম পরীক্ষা করিয়াছিল দুর্বল চীনের উপর। সেই হইতে জাপানের চীনকে অপমানিত ও লুণ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা।'[২] প্রতিবেশী রাজ্যের প্রতি কূটরাজনীতির প্রকাশ্য ও গোপন আচরণ এবং উন্মত্ত সাম্রাজ্যলিপ্সা কবির সমর্থন পায় নাই। জাপানের কোন সংবাদপত্রে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন—'জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য

১। পত্রপুট, সতেরো সংখ্যক কবিতা, পৃঃ ৬০ ; নবজাতক, বুদ্ধভক্তি, পৃঃ ১৯।
২। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৪।

কামনা করে বুদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।'[১] যিনি মৈত্রী ও করুণার সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল যাঁহার প্রসাদ হাসিতে ক্ষমার অম্লান জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, যাঁহার মন্ত্র—

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং,
অবেরেন, চ সম্মন্তি, এস ধম্মো সনন্তনো।[২]

রণোন্মত্ত জাপান তাঁহারই মন্দিরদ্বারে সমবেত হইয়াছে। জাপান আজ—

হিংসায় উন্মাদ দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির—
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে। —নবজাতক

করুণাময় বুদ্ধের মন্দিরে তাহাদের—

ধূপ জ্বলল, ঘণ্টা বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে,
করুণাময়, সফল হয় যেন কামনা। —পত্রপুট

তাহাদের প্রার্থনা সকরুণ আবেদন নয়, সরোষ গর্জন। তাহাদের আচরণে, মন্ত্রে, উপাসনায় বিনীত শ্রদ্ধা ও সংযত আত্মসমর্পণ নাই, আছে উৎকট আড়ম্বর, পৈশাচী শক্তির আস্ফালন ও হিংসার উন্মত্ত চণ্ডরূপ। তাহারা—

বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে। —নবজাতক

শক্তিগর্বী জাপান—মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে। —নবজাতক

বৌদ্ধধর্মী জাপানের ভক্তির অর্ঘ্য আজ শক্তির অহঙ্কারে রূপান্তরিত হইয়াছে। যিনি শান্তির অগ্রদূত, মৈত্রীর দিশারী ইহা তাঁহারই প্রতি অবমাননা। এইজন্য কবি লিখিয়াছেন—'ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।' মহাপুরুষের প্রতি শক্তিমানের ভক্তির বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাঁহার কালেও। মহাপরিনিব্বানসুত্তে[৩] আছে, রণপ্রিয় রাজা অজাতশত্রু প্রতিবেশী বজ্জিদের প্রতি বিদ্বেষমূলভ মনোভাব হেতু মন্ত্রী বস্‌সকারকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন কি উপায়ে লিচ্ছবিদের পরাজিত করা যায় তাহা জানিবার জন্য।

১। নবজাতক, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃঃ ১৯।
২। ধম্মপদং, যমকবগ্গো, শ্লোক সং ৫। ৩। দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭২।

পরিশেষ

বৌদ্ধরাজা[১] জানিতেন তাঁহার দোর্দণ্ড রাজপ্রতাপ, অতুল ঐশ্বর্য ও অপ্রতিহত ক্ষমতা একদিন কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে। রাজা চাহিলেন তাঁহার অন্তরের সত্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপদান করিয়া তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিবেন। 'বোরোবুদুর[২]' কবিতায় বোরোবুদুরের মন্দিরের শুদ্ধ শালীনতায় এবং মহনীয় শিল্প সৌন্দর্যে রাজহৃদয়ের সেই অনুভূতিই রূপময়তা লাভ করিয়াছে। অবাঙ্‌মনসোগোচরের প্রতি নরপতির অন্তরের ভক্তির অর্ঘ্য কালজয়ী হইয়া বিরাজিত হইবে—ইহাই তাঁহার প্রাণের বাসনা—

উচ্চে উচ্ছ্বাসিল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
আপন পূজার মন্ত্র যুগ যুগান্তরে।
অপরূপ অমৃত অক্ষরে
লিখিল বিচিত্র লেখা, সাধকের ভক্তির পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা—
সর্বকাল সর্বজন
আনন্দে পড়িতে পারে যে ভাষার লিপির লিখন।

তাহার পর কালস্রোত ভাসিয়া চলিয়াছে। রাজার ঐশ্বর্য, ধনসম্পদ্‌ কোথায় মিশিয়া গিয়াছে, রাজার নামটি পর্যন্ত বিস্মৃতির অতলে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনন্ত অসীমের উদ্দেশে তাঁহার সেই অমর প্রণতি কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা

১। পরিশেষ, বোরোবুদুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃঃ ১৮২।

২। যবদ্বীপের বোরোবুদুরের মন্দির শৈলেন্দ্রবংশীয় কোন নরপতির কালজয়ী কীর্তি। এই মন্দির ৭৫০—৮৫০ খৃঃ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খৃঃ অষ্টম শতব্দীতে যবদ্বীপ ও মালয়ে শৈলেন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ এক শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৭৮২ খৃঃ লিখিত যবদ্বীপের কেলুরক অনুশাসনে পাওয়া যায় এই সময়ে 'শৈলেন্দ্রবংশ তিলক' ধরণীন্দ্র শৈলেন্দ্ররাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। বাঙলার রাজা দেবপালের রাজত্বকালে প্রাপ্ত নালন্দা তাম্রশাসনে পাওয়া যায় শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবপাল পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। বালপুত্রদেবের পিতা সমরাগ্রবীর এবং পিতামহ শৈলেন্দ্রবংশতিলক যবভূমিপাল। ঐতিহাসিকগণ নালন্দা অনুশাসনের 'বীর বৈরী মথন' এবং যবদ্বীপ অনুশাসনের 'বৈরী বরবীর বিমর্দন' উভয়ে এক ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সুতরাং ধরণীন্দ্র, যবভূমি পাল, সমরাগ্রবীর এবং বালপুত্রদেব—এই চার রাজার কোন একজন বা একাধিক জন বোরোবুদুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় রাজগুরু কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্ররাজ্যে এক মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় শৈলেন্দ্র নরপতিগণ মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন।

করিয়া এখনও বিরাজিত। তাঁহার মহিমময় সৃষ্টি এখনও স্রষ্টার কণ্ঠনিঃসৃত পূজামন্ত্র আবৃত্তি করিতেছে—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।' যুগ যুগ ধরিয়া কত তীর্থযাত্রী, কত উপাসক, কত ভক্ত পূজারী এই অপূর্ব সুন্দর মন্দিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের কণ্ঠেও সেই কালজয়ী অনন্তধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছে—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।' কিন্তু বোরোবুদুরের এই মৌন মন্ত্রোচ্চারণ এই যুগের ভক্তিহীন ভ্রমণবিলাসীদের নিকট ব্যর্থ হইয়াছে। তাহাদের অন্তর অর্ঘ্যশূন্য, দৃষ্টি বোধশূন্য। কবি জানেন এই যুগের বেদনাহত, নিষ্ঠুর ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত মানুষকে আবার সেই মুক্তিমন্ত্রের দ্রষ্টার মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইতে হইবে, এই তীর্থদ্বারেই মানুষ শুনিতে পাইবে—

অমেয় প্রেমের মন্ত্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'

সিয়াম (১)—১৯২৭ খৃঃ রবীন্দ্রনাথ সিয়ামে পদার্পণ করেন। এই দেশে আসিয়া কবি গৌরবদীপ্ত অতীত ভারতকে নূতন করিয়া দর্শন করিয়াছেন। একদা প্রেমের পুণ্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ আহ্বান করিয়াছিলেন—

অপারূতা তেসং অমতস্স দ্বারা
যে সোতবন্তো, পমুঞ্চন্তু সদ্ধং
বিহিংসসঞ্ঞী পগুণং ন ভাসি,
ধম্মং পণীতং মনুজেসু ব্রহ্মে।[১]

অমৃতের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে। যাহাদের কান আছে শ্রবণ কর—শ্রদ্ধা দ্বারাই এই অমৃতের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এই অমৃত-মন্ত্র ভারত সেইদিন দেশে দেশে দিশে দিশে ছড়াইয়া দিয়াছিল। পশ্চিমে, পূরবে, মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে-উপকূলে ঘুমন্ত মানুষের প্রাণের দ্বারে সেই অপ্রতিবীর্য মহাঘোষণা ধ্বনিত হইয়াছিল। সেই মন্ত্র কোন শুভক্ষণে জ্ঞানে, গুণে, শ্রীতে এবং নিঃস্বার্থ প্রাণের উদার প্রসারতায় সিয়ামের চিত্তকেও জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।[২] আর তাহারই পরিণতি—

১। Mahāvagga। Vinaya Pitakam, Vol. I, ed. Oldenberg, P. 7.

২। খৃঃ প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্যামের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সংযোগ ঘটিয়া থাকে। মালয়, শ্যাম, কম্বোডিয়া ও কোচীন চীন, ফুনাল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পঙটুকে অমরাবতী শিল্পের নিদর্শন ২য় শতাব্দীর একটি ব্রোঞ্জময় বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন ২য় শতাব্দীতে দক্ষিণভারত হইতে কোন বৌদ্ধ প্রচারক শ্যামদেশে গিয়াছিলেন। গুপ্ত ও পালযুগের বৌদ্ধশিল্পের প্রভাবও শ্যামদেশের শিল্পে পাওয়া যায়। দ্বারাবতীকে কেন্দ্র করিয়া ৫০০—১০০০ খৃঃ-এর মধ্যে মধ্য-শ্যামে হীনযান মতাবলম্বী মন জাতি প্রতিপত্তির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। এই যুগের শিল্পকে অমরাবতী, গুপ্ত ও পালযুগের শিল্প-প্রভাবিত করিয়াছে। শ্যাম-নিষ্ঠাবান্ হীনযান মতাবলম্বী। Eliot, Hinduism and Buddhism, Vol. III, p 78

দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসার যাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুবকেন্দ্র সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে—
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে,
এক ধর্ম, এক সঙ্ঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।

সেই দিন ভারতবর্ষের সঙ্গে একই সাধনায় একই ধর্মনীতিতে এবং একই মহাগুরুর পুণ্যজ্যোতিতে সিয়ামের মিলন হইয়াছিল। কিন্তু অতীত ভারতের সেই মহিমাভাস্বর ঔদার্যের পরিচয় আজ কোথায়? কবি আজ সেই ভারতের প্রতিনিধি যে ভারতের—

ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।

কিন্তু সিয়াম ভারতের সেই অতুলনীয় দানকে অবহেলায় ভুলিয়া যায় নাই বরং শ্রদ্ধাভরে মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছে। অতীত ইতিহাসে ভারতের সঙ্গে সিয়ামের সংস্পর্শ কখন ঘটিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাব তাহার অণুপরমাণুতে জড়াইয়া আছে এবং সিয়ামের ধর্ম কর্ম ও চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ভারতের বৌদ্ধধর্ম ভারতে চিরপ্রবাসী। এইজন্য বৌদ্ধভারতের পূজারী কবি আজ ভারত-বাহিরে সিয়ামে মৈত্রীকরুণার অধীশ্বর ভগবান বুদ্ধের প্রতি তাঁহার পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া লইবেন।

ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।

সিয়াম (২)—সিয়ামের কাছে ভারতের দান যুগে যুগে বহুরূপে আসিয়াছে। ভারতের সেই সুউচ্চ সভ্যতা ও সংস্কৃতি সিয়াম অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধায় রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। কবি আজ সিয়ামের ধর্মে কর্মে, তাহার স্থাপত্যে ভাস্কর্যে বৌদ্ধভারতের দানকে অতি সহজেই চিনিয়া লইয়াছেন। বিদায়কালে সেই প্রসারিত ঔদার্যের প্রতি মুগ্ধ কবিচিত্তের বরমাল্য অর্পিত হইয়াছে—

পরাইনু গলে
বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে
অম্লান কুসুম যার ফুটেছিল বহুযুগ আগে।

সারনাথে সিংহলী ভিক্ষু দেবপ্রিয় ধর্মপালদ্বারা মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে 'বুদ্ধদেবের প্রতি'[১] এই প্রশস্তিমূলক কবিতাটি রচিত। ভগবান বুদ্ধ একদিন এই ভারতের বোধিদ্রুমনিম্নে বহুকল্পসুদুর্লভ সিদ্ধিকে করায়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মুক্তির বাণী ভারত দেশদেশান্তরে প্রচারিত করিয়াছিল। কিন্তু আজ সেই দেশ বিভেদ-বিশীর্ণতায় আবিষ্ট অল্পায়ু এবং শত তুচ্ছতার আবরণে মোহগ্রস্ত। ভক্ত কবিকণ্ঠে প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে—

অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান্।

বৌদ্ধ ভারতের সাধনায় বহুত্বের মধ্যে, অখণ্ডতার মধ্যে নিখিলবিশ্বকে উপলব্ধি করার প্রেরণা আছে। এইজন্য বৌদ্ধভারতের চিন্তা ও কর্মে এবং বিশ্বমৈত্রীর উদ্বোধনে কবি একান্তভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। কবির আকাঙ্ক্ষা মহাজীবনের আবির্ভাবে জীবনের যত ক্ষুদ্রতা, জীর্ণতা ও খণ্ডতা বিদূরিত হউক এবং মঙ্গলশঙ্খে শতকণ্ঠে অমৃত-বার্তা বিঘোষিত হউক।

'নটীর পূজা' নাটকে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভিক্ষুকণ্ঠে 'বুদ্ধজন্মোৎসব'[২] এই গানটি উদ্‌গীত হইয়াছে। রাজশক্তির অপ্রতিহত প্রভুত্বে ও ক্ষমতাগর্বে রাজ্যব্যাপী এক চরম দুর্যোগ দেখা দিয়াছে। স্বার্থ, বিরোধ ও সংশয়ের বেড়াজালে ধর্মের সহজ পথ মালিন্য ও খণ্ডতায়

১। পরিশেষ, পৃঃ ১৯০।
২। ঐ, পৃঃ ২০৬।

অগ্নিজালে নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত, চারিদিকে নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের আলোড়ন, দম্ভ ও প্রতাপ সত্য ও ন্যায়কে পদদলিত করিয়া সগৌরবে ধাবিত হইতেছে। লোভ ও স্বার্থসিদ্ধির বাসনা মানুষকে মৃগয়ার মৃগের ন্যায় নিষ্ঠুরভাবে তাড়না করিয়া ফিরিতেছে। পৃথিবীর এই নিদারুণ দিনে ভিক্ষুকণ্ঠে নবজন্মের উদ্বোধন সঙ্গীত উচ্চারিত হইয়াছে—

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

ক্ষুধিত হিংসা ও আত্মম্ভরিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষ নিত্যসত্যের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে চলিয়াছে। মহাজীবনের দ্বারে শান্তিকামী মানুষের প্রার্থনা—হে মহাবীর, হে মহাভিক্ষু, আমাদের অহঙ্কার তুমি ভিক্ষা লও, তোমার ত্যাগমন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত কর, আমাদের মোহকে বিদূরিত কর, অন্তরকে আলোকিত কর—হৃদয়ের উদয়গিরিতে জ্ঞানসূর্যের আবির্ভাব হউক।

তিনি শান্ত, মুক্ত, করুণাঘন বিগ্রহ। তাঁহার মহান্ আবির্ভাবে বিশ্বব্যাপী পুঞ্জীভূত গ্লানি ও কলুষ কালিমা দূরীভূত হইয়া ত্যাগ তিতিক্ষা সমুজ্জ্বল, কল্যাণসুষমা ভাস্বর এক নবযুগের সূচনা হইবে। কবিকণ্ঠে নম্র আবেদন ধ্বনিত হইয়াছে—

তব মঙ্গল শঙ্খ আন তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সংগীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

'প্রার্থনা' কবিতায় পরস্বলোভী, ধনসঞ্চয়প্রিয় ও মনুষ্যত্বপীড়ক উদ্ধত মানুষের অর্থগৃধ্নু সভ্যতার নগ্নরূপ কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহার প্রতি প্রবল ঘৃণায় তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের এই চরম অবমাননায় কবি বলিয়াছেন—

চিত্ত মম
নিষ্কৃতি সন্ধানে ফিরে পিঞ্জরিত বিহঙ্গসম।

আজ পৃথিবীর সাধারণ মানুষ প্রতাপান্বিতের দাপটে দলিতপিষ্ট, ক্ষুধাতুরের সঞ্চয়মুষ্টি ভূরিভোজীর বিলাসদ্রব্যে পরিণত, আত্মজাতির মাংসলুব্ধ মানুষ রক্তপঙ্কে ধরণীকে কলুষিত করিয়াছে। এই রক্তপ্লাবিত ধরণীবক্ষে শান্তির বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবে কে? এমন সময় কবির অন্তর জগজ্জ্যোতি বুদ্ধের রশ্মিপাতে আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই রাজার পুত্র সর্বমানবের মুক্তিকামনায় প্রথম যৌবনে সুন্দরী পত্নী ও রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। আজ বর্তমান যুগের মনুষ্যত্বপীড়ক সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ কবিও সেই দীনজন শরণ অনন্তমৈত্রীর আশ্রয় লইয়াছেন।

শার্দূলকর্ণাবদানের[১] আনন্দকর্তৃক অস্পৃশ্যা প্রকৃতির নিকট জল প্রার্থনা এবং প্রকৃতি ও আনন্দের কথোপকথন অবলম্বনে 'জলপাত্র' কবিতা লিখিত। পরে এই কবিতার বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'চণ্ডালিকা' নাটক লিখিত হইয়াছে।[২] অবদানে পিপাসার্ত আনন্দ প্রকৃতির নিকট পানীয় প্রার্থনা করিয়াছেন—'দেহি মে ভগিনী পানীয়ম্, পাস্যামি।' অস্পৃশ্যা প্রকৃতি ভাবিয়াছেন আনন্দ হয়ত তাহাকে চিনিতে পারে নাই, সে যে অস্পৃশ্য জাতি, তাহার স্পৃষ্ট পানীয় আনন্দের পক্ষে তো গ্রহণীয় নয়। আনন্দকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সংক্ষেপে সে উত্তর দিয়াছে—'মাতঙ্গদারিকাঽহমস্মি ভদন্ত আনন্দ'। বৌদ্ধভিক্ষু বর্ণবৈষম্যের ধার ধারেন না, বলিলেন—'নাহং তে ভগিনি কুলং বা জাতিং বা পৃচ্ছামি। অপি তু সচেত্তে পরিত্যক্তং পানীয়ম্, দেহি পাস্যামি।' রবীন্দ্রনাথ অবদানের এই সংযত কথোপকথনকে অন্তবেদনার উচ্ছ্বাসে অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি অবদানকারের প্রকৃতির অব্যক্ত হৃদয়বেদনা অনুভব করিয়াছেন। আনন্দকে সে জানাইয়াছে—

চাহিলে তৃষ্ণার বারি,
আমি হীন নারী
তোমারে করিব হেয়
সে কি মোর শ্রেয়।

এইজন্য আনন্দের চরণে প্রণাম জানাইয়া গভীরতর অন্তর্বেদনায় সে জানাইয়াছে—

"অপরাধী করিয়ো না মোরে!"

১। দিব্যাবদানম্. পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ৩১৪।
২। চণ্ডালিকা নাটকের সমালোচনা—এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের আনন্দ বলিলেন—রমণী বসুন্ধরার সমগোত্রীয়া, তাহার কোন জাতি নাই, সে অশুচিও নহে। সে যে বিধাতার সৃষ্টি। আর—

বিধাতা প্রসন্ন যেথা আপনার হাতের সৃষ্টিতে
নিত্য তার অভিষেক নিখিলের আশিস্‌বৃষ্টিতে।

অবদানে প্রকৃতি আনন্দের প্রতি আসক্তা হইয়া তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়াছে এবং পরে বুদ্ধের প্রচেষ্টায় ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া পরমপদে উন্নীতা হইয়াছে। 'জলপাত্র' কবিতায় প্রকৃতি চির প্রতীক্ষিতা। আনন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে—

এ ভঙ্গুর পাত্রখানি প্রতিদিন উষার আলোতে
নানাবর্ণে আঁকি,
নানাচিত্র রেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।
হে মহান্, নেমে এসে তুমি যারে করেছ গ্রহণ
সৌন্দর্যের অর্ঘ্য তার তোমা পানে করুক বহন।

বেদনাস্নিগ্ধ হৃদয়-পাত্রে অর্ঘ্য সাজাইয়া শবরীর ন্যায় সমগ্র জীবন সে আনন্দের প্রতীক্ষা করিয়াছে।

পুনশ্চ

মহাবস্তু অবদানের অন্তর্গত 'কুশজাতক'-এর বিষয়বস্তুর রসমাধুর্যের উপর 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শাপমোচন'[১] কবিতার প্রতিষ্ঠা।[২]

১। পুনশ্চ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃঃ ১৮০।

২। নাটকের অধ্যায়ে রাজা, অরূপরতন প্রভৃতি রবীন্দ্রনাট্যের বিচার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাটক

'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা', 'মালিনী', 'রাজা', 'অরূপরতন', 'শাপমোচন' প্রভৃতি নাটক বৌদ্ধযুগের কাহিনী এবং বৌদ্ধসাহিত্যের আখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধভারতের আত্মোৎসর্গের মহিমা এবং বৌদ্ধ আখ্যান-সমূহের ভাবগভীরতা কবির মানসপটে সংযত শোভন ভাব জাগ্রত করিয়া তাঁহার মনোবীণায় যে অনন্ত সুর সৃষ্টি করিয়াছে নাটকসমূহে তাহাই অপরিম্লান জ্যোতিতে ধরা দিয়াছে। নাটকসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও কাহিনীর প্রতি কবির সেই গভীর আন্তরিকতার পরিচয় প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করা হইল।

নটীর পূজা

'নটীর পূজা' নাটকের শ্রীমতীর কাহিনী 'কল্পদ্রুমাবদান'[১] এবং 'অবদানশতক'-এর আখ্যান অবলম্বনে রচিত। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—একদা বিম্বিসার তাঁহার এক পুত্রকে 'জ্যোতিষ্ক' নামে একটি সুন্দর রাজপ্রাসাদ উপহার দিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অপর পুত্র অজাতশত্রু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার বন্ধু দেবদত্তের প্ররোচনায় পিতাকে হত্যা করিয়া নিজে রাজা হইলেন। পরবর্তীকালে তিনি শিকারের জন্য কোন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে একজন শ্রমণের নিকট দেশনা লাভ করেন। রাজা শাক্যসিংহের নিকট কৃতপাপের অনুশোচনা করিয়া আত্মশুদ্ধি করেন এবং বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় লাভ করেন। বিম্বিসার কি কারণে নিজের পুত্রের হস্তে নিহত হইয়াছেন তাহার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভগবান বলিলেন—'পূর্ব জন্মে বিম্বিসার বারাণসীর একজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। পথে একজন প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন 'এই মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষুগণের পদযুগল ক্ষুর দ্বারা কাটিয়া দেওয়া উচিত।' এই পাপের ফলেই তাঁহার পদযুগল তাঁহার পুত্রকর্তৃক কর্তিত হইয়াছে।

অজাতশত্রু প্রথমে বৌদ্ধধর্মের মহাশত্রু ছিলেন। সত্যধর্ম বিনাশ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বন্ধু দেবদত্তের প্ররোচনায় তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

১। The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, pp. 300—301
এই গ্রন্থের কাব্যের পরিচ্ছেদে 'পূজারিণী' কবিতার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

করিবে তাহার শিরশ্ছেদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে। একদা এক রমণী বুদ্ধের স্তূপ ধূলি সমাকীর্ণ দেখিয়া তাহা পরিষ্কার করিলেন। এই সংবাদ অজাতশত্রুর কর্ণগোচর হওয়ামাত্র তিনি অনতিবিলম্বে সেই রমণীর শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ কার্যকরী হইল। রমণীর আত্মা (spirit of the lady) দিব্যদেহে স্বর্গে গমন করিয়া বুদ্ধদেবের সেবায় নিযুক্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথ 'নটীর পূজা' নাটকে মূল আখ্যানের বহু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। মূলে শ্রীমতী নটী নহে, রাজবাড়ীর পরিচারিকা বা দাসী। রাজাদেশ লঙ্ঘন করিয়া স্তূপপদমূলে প্রদীপদানের অপরাধে তাহার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনীর ছায়ামাত্র গ্রহণ করিয়া কল্পনার অভিনবত্বে ও ঘটনাবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যে অপূর্ব কাব্যসুষমামণ্ডিত সম্পূর্ণ নূতন একটি নাটক সৃষ্টি করেন। নৃত্যের মধ্য দিয়া ভগবান তথাগতের পূজা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পরিকল্পনা। মূলকাহিনীতে বিম্বিসারের চরিত্র পুত্রবিশেষের প্রতি পক্ষপাতদোষে লিপ্ত। বৌদ্ধধর্মের প্রতিও তাঁহার কোন প্রকার অনুরাগ প্রদর্শিত হয় নাই। প্রত্যেকবুদ্ধের প্রতি তাঁহার আচরণ শুধু রূঢ়ই নহে, অত্যন্ত গর্হিতও বটে।

অবদানশতকের 'শ্রীমতী' আখ্যানে বিম্বিসার বুদ্ধভক্ত। রবীন্দ্রনাথের বিম্বিসারও আদর্শ বৌদ্ধ উপাসক। রাজসিংহাসনের প্রতি পুত্রের আসক্তি দেখিয়া তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। নাটকে 'পুত্রের রাজ্যলোভ দেখে মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় যেদিন সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারলেন সেদিন তিনি যে রাজ্য জয় করেছিলেন'[১]—সে জয় সাম্রাজ্য জয় অপেক্ষা অনেক বড়। কারণ সে জয় আত্মজয়। এই জয়ের মধ্য দিয়া তাঁহার বিষয়আসক্তিবর্জিত চিত্তের ঔদার্য ঘোষিত হইয়াছে।

কল্পদ্রুমাবদানের বিন্দুসার চরিত্রের সমস্ত কলুষ যেন এই ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার দ্বারা বিধৌত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ক্ষমাসুন্দর মহনীয় মূর্তিই নাটকীয় ঘটনার অন্তরাল হইতে পাঠকের মনশ্চক্ষুতে ভাসিয়া উঠে। প্রাণপ্রতিম পুত্রের সিংহাসনের প্রতি লোভ তাঁহার অন্তরকে সংসারের মালিন্য ও বিষয়তৃষ্ণার ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে। লোকেশ্বরী দেবী যথার্থই বলিয়াছেন—'কোন মরুর ধর্ম কানে মন্ত্র দিল, অমনি কত সহজেই রাজত্ব থেকে তিনি খসে পড়লেন, অস্ত্র হাতে না, রণক্ষেত্রে না, মৃত্যুর মুখে না।'[২]

১। নটীর পূজা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃঃ ১১। ২। ঐ, পৃঃ ৩৯।

অজাতশত্রু কিছু পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত আকারে নাটকে স্থান পাইয়াছেন। মূলে অজাতশত্রুর পিতৃহত্যা করিবার কারণ, পিতা একটি রাজপ্রাসাদ ভ্রাতাকে উপহার দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অজাতশত্রুকে এই নৃশংসতা ও হীনতা হইতে মুক্তি দিয়াছেন। 'নটীর পূজা' নাটকে বিম্বিসারের মৃত্যু ঘটিয়াছে দেবদত্তের উন্মত্ত শিষ্যদের হাতে। অজাতশত্রু দেবদত্তের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—'দেবদত্তের শক্তির জোরে পিতা থাকতেই রাজা হবেন এই ছিল তাঁর আশা।'[১] সেদিন এই যে ক্রূর দানবীয় শক্তিকে তিনি নিজের হিত সাধনে নিয়োগ করিলেন সেই শক্তিকে সংযত করিবার ক্ষমতা নৃপতির ছিল না। এই উন্মত্ত ক্ষমতাগর্বই একদিন রাজাকেও অগ্রাহ্য করিয়া রাজপিতা বিম্বিসারকে গ্রাস করিয়াছে। রাজকুমারী মল্লিকা বলিয়াছে—'দেবদত্তের শিষ্যদের মহারাজ এখন আর নিজেই সামলাতে পারছেন না।…… সবাই অনুমান করছে পথের মধ্যে ওরা বিম্বিসার মহারাজকে হত্যা করেছে।'[২] চারিত্রিক ঔদার্য ও সমুন্নতির প্রতি কবিচিত্তের সহজাত প্রবণতা হেতু নৃপতি অজাতশত্রুকে প্রত্যক্ষ পিতৃহত্যার ঘোরতর পাতক হইতে রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করিয়াছেন। মূল কাহিনীতে পিতাকে হত্যা করিয়াও অজাতশত্রুর অন্তরে কোন অনুশোচনা জাগে নাই। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অজাতশত্রুর অন্তরের এই গ্লানি ও অনুশোচনাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন—মহারাজকে যেন আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি কোন একটা অনুশোচনায় ছটফট করে বেড়াচ্ছেন।'[৩] মূল গল্পে আছে অজাতশত্রু প্রথমে বৌদ্ধধর্মের শত্রু ছিলেন, সত্যধর্মকে তিনি বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, দেবদত্তের সাহায্যে পিতাকে হত্যা করেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য পরবর্তী জীবনে তিনি উপোসথ অবলম্বন করিয়া আত্মশুদ্ধি করেন। রবীন্দ্রনাথ অজাতশত্রুর অনুশোচনাদগ্ধ হৃদয়ের সুন্দর আভাস দিয়াছেন—'রাজ্যে যেখানে যত বুদ্ধের শিষ্য আছে মহারাজ অজাতশত্রু সবাইকে ডাকতে দূত পাঠিয়েছেন।'……'ওরা রাজার হয়ে অহোরাত্র পাপমোচন মন্ত্র পড়তে আসছে। মহারাজ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।'[৪] মহারাণী লোকেশ্বরী দেবী এবং রাজকুমারী মল্লিকার কথাবার্তার মধ্য দিয়াও জানা যায় রাজোদ্যানের অশোকবেদীতলে পূজা নিবেদন করিতে আসিয়া সন্ত্রস্ত হৃদয়ে তিনি ফিরিয়া গিয়াছেন—

১। নটীর পূজা, পৃঃ ১১।
২। ঐ, পৃঃ ৩৬।
৩। ঐ, পৃঃ ৬৭।
৪। ঐ, পৃঃ ৬৬

মল্লিকা—মহারাজ এলেন না, ফিরে গেলেন।

লোকেশ্বরী—কেন ?

মল্লিকা—সংবাদ শুনে তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠলেন।

লোকেশ্বরী—কাকে তাঁর ভয় ?

মল্লিকা—ওই হতপ্রাণ নটীকে।[১]

অজাতশত্রুর যে অনুশোচনাদগ্ধ সন্ত্রস্ত মূর্তি এই আলোচনার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না যে পরবর্তী জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী উপাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া মূল কাহিনীর সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছিলেন।

শ্রীমতীর নৃত্য এই নাটকের প্রাণবস্তু। জন্মলগ্নে পরমানন্দের মহামাহেন্দ্রক্ষণে পরমবরণীয় ক্ষমাসুন্দর মূর্তিতে শ্রীমতীর চিত্তে আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই পুণ্যস্পর্শে তাহার দেহে প্রাণে রসের প্লাবন জাগিয়াছে। তাহার ছন্দে বাধা দেহপাত্রের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অমৃতরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীমতী শ্রাবিকা নয়, সে নৃত্যশিল্পী। শিল্পীর কাজ সৃষ্টি, সৃষ্টি অর্থে অরূপকে রূপের সীমানায় ধরিয়া রাখা, অসীমকে সীমার বন্ধনে বাঁধিয়া দেওয়া। শ্রীমতীর তনুরেখায় সংযতঘন আবেগে অসীমের অনুভূতি মুখরিত হইয়া উঠে—

আমার সকল দেহের আকুলরবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।[২]

অসীমের পদতলে পূজা নিবেদনের আকুল আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার কান্না নৃত্যের মধ্য দিয়া এক বেদনাভরা কম্পমানা রাগিণীর ন্যায় ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে থাকে—

এ কি পরম ব্যথায় পরাণ কাঁপায়,
কাঁপন বক্ষে লাগে।
শান্তি-সাগরে ঢেউ খেলে যায়,
সুন্দর তায় জাগে।[৩]

১। নটীর পূজা, পৃঃ ৮৩
২, ৩। ঐ, পৃঃ ৭৮।

দুঃখবেদনার দাহে পরিশুদ্ধ হৃদয় শ্রীমতী পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি করিয়াছে। শান্তি-সাগরের সন্ধান সে লাভ করিয়াছে। নিঃশেষ আত্মদানের মধ্য দিয়া পরমসুন্দর আজ তাহার অন্তরে ধরা দিয়াছে—

শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।

শ্রীমতী নৃত্যশিল্পী। তাহার অন্তরের অতি নিগূঢ় সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশের বাহন নৃত্য। ছন্দের দোলা ও সুরের কম্পন অপেক্ষা ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনাই বেশী শক্তিশালী। যে সূক্ষ্ম ও চঞ্চল ভাব কথায় ও ছন্দে প্রকাশ হয় না, দেহভঙ্গীর প্রতি রেখায় রেখায় তাহা ব্যঞ্জনামুখর হইয়া উঠে। এইজন্য নৃত্য শ্রীমতীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রকাশের সহায়তা করিয়াছে। শিল্পীর অজ্ঞানিতে তাহার দেহপটের প্রতি রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্তরের যত 'অকথিত বাণী, অগীত গান, বিফলবাসনারাশি'। তাহাই শেষ অর্ঘ্য হইয়া পরম আকাঙ্ক্ষিতের পূজাবেদীমূলে নিবেদিত হইয়াছে—

আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে[১]।

ভগবানের পূজার আদেশ আসিয়াছে। কিন্তু অর্ঘ্য তখনও সাজানো হয় নাই,

আমি কানন হতে তুলিনি ফুল
মেলেনি মোর ফল
কলস মম শূন্যসম
ভরিনি তীর্থজল।[২]

যে আত্মনিবেদন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যে অন্তর বেদনার অভিব্যক্তি রঙ ও রেখার সীমানায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না, শ্রীমতীর অন্তরগহন-বাসী সেই বেদনাভরা আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য তাহার তনুরেখায় রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। পরম আকাঙ্ক্ষিতের বন্দনায় তাহাই শ্রীমতীর অর্ঘ্য—

১। নটীর পূজা, পৃঃ ৭৮। ২,। ঐ, পৃঃ ৭৯।

আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরা ধারা
তোমার চরণে হোক তা সারা
পূজার পুণ্য কাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।[১]

নৃত্যের নব নব ভঙ্গিতে আপন দেহপাত্রের পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিতে করিতে নৃত্য অগ্রসর হইয়া চলিল। শ্রীমতী বাহিরে সৌন্দর্যপ্রতিমা রাজনটী—অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে, বসনের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায়, দেহ সৌন্দর্যের চমৎকারিত্বে অতুলনীয়া; কিন্তু অন্তরে চিরশুদ্ধা পুণ্য প্রতিমা পূজারিণী। নৃত্যের তালে তালে দেহের ঘন আন্দোলনে নানাবর্ণের অপস্রিয়মান আলোকরশ্মির ন্যায় রাজনটীর বসন ভূষণ দূরে বিক্ষিপ্ত হইল—বিক্ষিপ্ত হইল পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্যের গরিমা—আবর্জনাস্তূপের ন্যায় পড়িয়া রহিল বহুমূল্য অলঙ্কার—কঙ্কণ, কেয়ূর, রত্নমালা। চঞ্চলা নৃত্যপটিয়সীর কম্পিত অঞ্চল লুটাইয়া পড়িল পদতলে। আর শুচিস্নাতা পুণ্যব্রতা শ্রীমতী ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্রে একটি উজ্জ্বল প্রদীপ শিখার ন্যায় ভগবানের বেদীতলে শেষ আরতির ভঙ্গিতে জানু পাতিয়া উপবেশন করিল। দুঃসহ তেজে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া মরণের দিগন্ত সীমানা হইতে শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে পূজার পুণ্যমন্ত্র আবৃত্তি করিল—

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

পূজা শেষ হইল। ভগবান তথাগতের চরণবেদীতলে প্রদীপশিখার শেষ প্রণতি নিবেদিত হইল।

শ্রীমতীর নৃত্যের অন্তরালে একটি গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে। তাহার 'একশো বাতি জ্বালা' দেহের বর্ণসুষমার অন্তরালে সৃষ্টির একটা চিরন্তন সত্য রহিয়াছে। অভিরূপা নারীদেহের রূপটাই তাহার একমাত্র পরিচয় নয়, দেহের সৌন্দর্য ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু সেই সৌন্দর্য মন্থন করিয়া যে অমৃত উত্থিত হইয়াছে তাহাতেই সৌন্দর্যের চরম সার্থকতা। শ্রীমতী অপূর্ব কলানৈপুণ্যে নৃত্যের অভিনয় ছন্দের ভঙ্গীতে ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব সম্পদ্ ধূলিমুষ্টির ন্যায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া

১। নটীর পূজা, পৃঃ ৭৯।

ছড়াইয়া দিয়াছে। ইহারা জগতের নিত্যনৈমিত্তিক বস্তু। কিন্তু এই নিত্যনৈমিত্তিক-এর অন্তরালে আছে তাহার আসল রূপ যাহা ভোগতৃষ্ণায় অচঞ্চল, চির উপাসিকার আত্মনিবেদনের করুণ আকুতিতে স্নিগ্ধ ও পরিপূর্ণ। বৃহৎ শান্তি, অপরিমেয় শক্তি ও সৌন্দর্যের সুরলোকে ধ্যানরতা শ্রীমতী দর্শকের অন্তরে প্রেরণা জাগাইয়াছে। শক্রতাকামী, জাগতিক ভোগসর্বস্ব দর্শকদের কল্যাণধর্মের পথ প্রদর্শন করিয়া শিল্পীর জীবনক্রিয়া সমাপ্ত হইয়াছে।

পূজারিণী আসিয়াছিল চির আকাঙ্ক্ষিত ভগবানের চরণবেদীতে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে, নিবেদিতও হইল। কিন্তু এই অর্ঘ্য পুষ্প প্রদীপ, ধূপধুনার অর্ঘ্য নিবেদন নয়, এই অর্ঘ্য চরম আত্মোৎসর্গের অর্ঘ্য। বুদ্ধ উপাসকের কণ্ঠে পূজামন্ত্র ধ্বনিত হয়—

বণ্ণগন্ধ গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং।
পূজয়ামি মুনিন্দস্স সিরিপাদ সরোরুহে ॥[১]

কিন্তু শ্রীমতী তো সুন্দর বর্ণগন্ধযুক্ত পুষ্পরাশি চয়ন করিতে পারে নাই—

আমি কানন হতে তুলিনি ফুল
মেলেনি মোর ফল
কলস মম শূন্যসম
ভরিনি তীর্থজল।[২]

এইজন্য আপন দেহ-পাত্রে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কলাসৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত করিয়া সে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিল—

আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরাধারা
তোমার চরণে হোক তা সারা
পূজার পুণ্য কাজে।

বুদ্ধ-পূজারী জানেন—

পুপ্ফং মিলায়তি যথা ইদং মে
কায়ো তথা যাতি বিনাসভাবং।[৩]

যদি ক্ষণস্থায়ী পুষ্পে বুদ্ধের পূজা হইতে পারে তবে উপাসিকার পেলব দেহলতার ছন্দে ছন্দে যে দিব্যানুভূতি উল্লসিত হইয়া উঠে তাহাই বা কেন চরম সার্থকতায় ভগবানের চরণে উৎসর্গিত হইবে না? পূজারিণীর অন্তরে

১। নটীর পূজা, পৃঃ ৪৪ ; সদ্ধর্ম রত্নমালা, ধর্মপাল ভিক্ষু ১৯৫৭, পৃঃ ৩০।
২। নটীর পূজা, পৃঃ ৭৯। ৩। সদ্ধর্ম রত্নমালা, পৃঃ ৩১-৩২।

অন্তরে ভক্তি ও ঐকান্তিকতার, প্রেম ও আত্মনিবেদনের যে ঐকতান গড়িয়া উঠে শ্রীমতীর অঙ্গভঙ্গীর রেখায় রেখায় তাহাই ধরা দিয়াছে এক অনৈসর্গিক প্রেরণায়।

ভগবানের বন্দনারত পূজারীর হাতের প্রদীপশিখা ভক্তের ভক্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে—

ঘন সারপ্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা।
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং ॥[১]

প্রদীপ শিখার এই দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে শ্রীমতীর দেহরেখায় অগ্নিশিখার ন্যায় কম্পিত আবেগে, বিরুদ্ধ পরিবেশে পূজামন্ত্র উচ্চারণের অমোঘশক্তিতে এবং কোন দুর্বলতার কাছে হার না-মানা কাঠিন্যে।

বুদ্ধপূজারী বিশ্বের সৃষ্টিসৌন্দর্যের মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে সেই সৌন্দর্যকে আপন প্রাণপাত্রে আহরণ করিয়া তাহাই পরম সুন্দরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। সৌন্দর্যকে বিশ্বপ্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া খণ্ডিত করিয়া গ্রহণ করেন নাই। পত্রপুষ্পে সুশোভন বৃক্ষের পুষ্প বৃক্ষ হইতে উৎপাটন না করিয়াই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন—

কুসুমং ফুল্লিতং-এতং পগ্গহেত্বান অঞ্জলিং
বুদ্ধসেটঠং সরিত্বনি আকাসেমপিপূজয়ে।[২]

শ্রীমতীর বন্দনায়, তাহার অর্ঘ্য নিবেদনরত ইঙ্গিতমূলক মুদ্রাতে সেই পুষ্পাঞ্জলিই রূপায়িত হইয়াছে।

শ্রীমতীর বন্দনা শেষ হইল। শেষ আরতির মন্ত্রও উচ্চারিত হইল। সহসা বেদীমূলে শেষ প্রণতি রাখিয়া প্রদীপ শিখা নিবিয়া গেল। এই নিবিয়া যাওয়ার মধ্যেই পূজারিণীর জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা।

পর্বতগৃহত্যাগিনী নদীর চরম অভিসার যাত্রা অনন্ত সাগরের পদপ্রান্তে আপনাকে নিঃশেষে বিলীন করিয়া অবসান হয়। শ্রীমতীর চরম নৃত্যও অপরিসীম আনন্দ-বিষাদে চরম অনুভূতির মধ্য দিয়া কোন দুর্লভ ভূমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তাহার 'সব চেতনা', 'সব বেদনা' পরমপ্রাপ্তিতে সার্থকতামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব-আভরণমুক্তা গৈরিক বসনা ভিক্ষুণী শ্রীমতীর শেষ নৃত্য Aestheticsকে ছাড়িয়া ethics-এ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাই শিল্পীর রসাদর্শ ও সৌন্দর্যাদর্শ

১। নটীর পূজা, পৃঃ ৪৫ ; সদ্ধর্ম রত্নমালা, পৃঃ ৩১-৩২। ২। সদ্ধর্ম রত্নমালা, পৃঃ ৩১-৩২

হইতে আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণ। শ্রীমতীর তনুরেখার বিচিত্র ভঙ্গিমায় আর্ট এবং অন্তরে ethics-এর প্রেরণা। শিল্পী তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্য স্বপ্নকে sublimity প্রদান করিয়া মহামরণকে বরণ করিয়াছে। শ্রীমতীর এই মৃত্যু-মুহূর্ত চলমান কালের বুকে একটি অনন্ত মুহূর্ত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে রাজনটী শ্রীমতীর নৃত্য কোথা হইতে এই আধ্যাত্মিকতা লাভ করিল? প্রাচীন কলারসিকগণ নৃত্যকে শুধু আদিরসাত্মক বা দৈহিক স্থূল আকর্ষণজাত বিলাসের উপকরণরূপে গ্রহণ করেন নাই। দেহ সমুদ্র মন্থন করিয়া উৎসারিত হইয়াও ভারতীয় নৃত্যের রস দেহ সীমানাকে অতিক্রম করিয়া এক অপার্থিব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রতিমা দেবী লিখিয়াছেন—'নৃত্যকে তাঁরা কেবল বিলাসের উপকরণ মনে করেননি। তাঁদের কাছে নৃত্য ছিল সাধনার প্রণালী, সেই রূপক কলার মধ্য দিয়া তাঁদের আধ্যাত্মিক জগৎ মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত। ...ভারতীয় নৃত্য একদিন অনঙ্গ দহনের অর্থাৎ স্থূল অঙ্গ সীমানা অতিক্রমণের পথে আধ্যাত্মিক প্রেরণাতে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল।'[১] প্রাচীন নৃত্যরসিকের নিকট নৃত্য ছিল আত্মিক তপস্যার সোপান। দেহ সীমানায় অসীমের ইঙ্গিত ফুটাইয়া তোলাতেই, রূপের আড়ালে অরূপরতনের খোঁজ করাতেই ভারতীয় নৃত্যকলার সার্থকতা। ভারতীয় নৃত্যে রূপকারদের অঙ্গভঙ্গীতে দেহের রেখায় রেখায় যে রসধারা উৎসারিত হইয়া উঠে তাহা দেহসীমানা অতিক্রম করিয়া দেহাতীত সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ পক্ষ বিস্তার করিয়া দেয়। ভারতীয় নৃত্যের এই অতি সুশোভন, শান্ত-সংযত ও ইন্দ্রিয়াতীত রসের আবেদন শ্রীমতীর নৃত্যে উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে।

নৈবেদ্য, পুষ্পপ্রদীপ ও ধূপধুনায় যদি অসীমের আরতি সম্ভব হয় তবে কলাশিল্পীর দেহসমুদ্র মন্থনজাত অমৃতরসেই বা কেন দেবতার অর্চনা ব্যর্থ হইবে? ভারতীয় ঋষি ও অধ্যাত্ম গুরুগণ সুকুমার কলাশিল্পকে কামজ বলিয়া পুণ্য তপোবনে অথবা পূজামন্দিরে অপাংক্তেয় করিয়া রাখেন নাই। বেদে নৃত্যপরা নারীদের মণ্ডল নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মাথায় পূর্ণ কলসী লইয়া তাহারা বীণার তালে তালে যজ্ঞস্থালীর চারিদিকে ঘুরিয়া নৃত্য করিত এবং অগ্নিতে জল ঢালিয়া দিয়া ইন্দ্রদেবতার নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করিত। ভগবতীর রণনৃত্য, নটরাজ শিবের তাণ্ডবনৃত্য, দেবসভায় ইন্দ্রের নৃত্য, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী

১। নৃত্য, প্রতিমা দেবী, পৃঃ৮-৯।

প্রভৃতি স্বর্গীয় অপ্সরীগণের নৃত্য, গোপিনীসহ শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্য ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেবমন্দিরে একসময়ে পুষ্পপ্রদীপের ন্যায় দেবদাসী নৃত্যও বিগ্রহপূজার অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অবশ্য পালনীয় দশ শিক্ষাপদে নৃত্যগীত অভিনয় দর্শন পরিত্যাজ্য হইয়াছে।[১] স্তূপমূলে, মন্দিরগাত্রে, অথবা ভিক্ষুদের বিহারে নারীমূর্তি অঙ্কন করাও এক সময়ে নিষিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে নৃত্যগীতকে পরিহার করা হইয়াছে। কিন্তু কলাশিল্পীর প্রাণে যে আদিম সৌন্দর্য লক্ষ্মীর প্রেরণা ও সূক্ষ্মরসের আবেদন রহিয়াছে কোন নীতির বন্ধন তাহাকে চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে নাই। একদিন চির অবর্জনা সৌন্দর্যরূপিণী উর্বশীর প্রেরণা রসিক ভক্তের অন্তরে জয়লাভ করে। বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পে স্তূপগাত্রে, মন্দিরে, তোরণে বিচিত্র দেহভঙ্গিমায় আঁকা নারীমূর্তি, যক্ষিণী মূর্তি, নৃত্যবাদ্যরতা দেবীমূর্তি দেখা দেয়। কিন্তু নৃত্যের মধ্য দিয়া ভগবান বুদ্ধের অর্চনা কলাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দান। 'শ্রীমতী' উপাখ্যানের কোন উৎসেই (কল্পদ্রুমাবদান বা অবদানশতক) শ্রীমতীর নৃত্যের উল্লেখ নাই। প্রশ্ন আসে রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রেরণা পাইলেন কোথায়?

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে বৌদ্ধশিল্পে বহু নৃত্যপরা দেবদেবী ও দেবসভার নৃত্যগীতের দৃশ্য প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। ভারহুত স্তূপের তোরণগাত্রে সিরিমা দেবতার[২] মূর্তি রহিয়াছে। এই সিরিমা কে? সিরিমা রূপজীবা শালবতীর কন্যা, মাতৃপরিত্যক্ত জীবকের ভগিনী, রাজগৃহের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বারবণিতা যাহার একরাত্রির দক্ষিণা ছিল হাজার কার্ষাপণ। কিন্তু এই পরিচয়ই তো তাহার শেষ পরিচয় নয়। দৈহিক স্থূল ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির মধ্যেই সিরিমার সমস্ত পরিচিতি নিঃশেষে অবলুপ্ত হইয়া যায় নাই। দীনজন-শরণ ভগবান বুদ্ধের চরণে প্রণতা পুণ্যপ্রতিমা সিরিমাই শিল্পীকে প্রেরণা জোগাইয়াছে। এইজন্য ভারহুতের স্তূপ-তোরণে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক সিরিমার দেবীমূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে। এই সিরিমা শ্রীমতীর রূপান্তরিত নাম কিনা তাহাই বা কে বলিবে? অবদানশতকে কবি শ্রীমতীর যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই অনুমানই মনে রেখাপাত করে। অবদান-

১। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্সনা বেরমনী সিকখাপদং সমাদিয়ামি।

২। Barua, Barhut, Book III, Pl VIII, No. 7A; Ludwing Bachhofer, Early Indian Sculpture, part 1, pl 21.

শতকে স্তুপপদমূলে প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য শ্রীমতীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুর পর শ্রীমতী দিব্যজ্যোতিসম্পন্না দেবীরূপে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

'সা ভগবতী প্রসন্নচিত্তা কালগতা প্রণীতেষু দেবেষু
ত্রয়স্ত্রিংশেষুপপন্না।'[১]

তাঁহার উজ্জ্বল দেহকান্তি স্বর্গীয় দেবতাদেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

সিরিমা ও শ্রীমতী দুইজনেই রাজগৃহের রূপজীবা, দুইটি কাহিনীতেই মহারাজ বিম্বিসারের উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের আবির্ভাব কালও একই সময়ে। বৌদ্ধস্তূপের তোরণগাত্রে অঙ্কিত রূপজীবা সিরিমার প্রশান্ত দেবীমূর্তি সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথকে বুদ্ধদেবের চরণবেদীমূলে নৃত্যপরা রাজনটী শ্রীমতীর চরিত্র রূপায়ণে প্রেরণা জোগাইয়াছিল।

নাটকটির 'নটীর পূজা' নামকরণেরও বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। শ্রীমতী রাজবাড়ীর নটী, সর্বকলাবিদ্যাপারঙ্গমা। নৃত্য শুধু তাহার জীবিকামাত্র নয়, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদও। মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ দ্বারা ভগবানের অর্চনা করাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পূজা। নটীর জীবনেও মহাপূজার আহ্বান আসিয়াছে। নাটকের প্রস্তাবনায় তাহার ইঙ্গিত আছে—

'উপালি—ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা চাই।

নটী—প্রভু অনুমতি করুন রাজকন্যাদের ডেকে আনি।

উপালি—আজ তোমারই কাছে ভিক্ষা জানাতে এসেছি।

নটী—আমি যে অভাগী, প্রভুর ভিক্ষাপাত্রে আমার দান কুণ্ঠিত হবে। কী দেব অনুমতি করুন।

উপালি—তোমার যা শ্রেষ্ঠ দান'।[২]

প্রশ্ন আসে নটীর জীবনের শ্রেষ্ঠ দান কি? নৃত্যই নৃত্যশিল্পী নটীর সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ যাহা তাহার সৃজনী ক্ষমতার মহাতপস্যারূপে, জীবনব্যাপী কঠিন সাধনার সিদ্ধিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীমতী তাহার প্রেমভক্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা—তাহার যথাসর্বস্ব নৃত্যের মধ্য দিয়া পরমপ্রেয়কে নিঃশেষে দান করিয়াছে। এই দানের অর্থ ই তাঁহাকে পূজা করা।

চারিদিকে ঘোর দুর্যোগের ঘনঘটা। এই অন্ধকারের পটভূমিকায় আদেশ পালন করার, তাঁহাকে পূজা নিবেদন করার কোন পথসংকেত শ্রীমতীর জানা

১। অবদানশতকম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৭
২। নটীর পূজা, পৃঃ ৬।

নাই। নিরাশা ও বেদনার মধ্য দিয়া কেবল একটা দূর সান্ত্বনার তটরেখা তাহার চোখে পড়িয়াছে। কি সেই সান্ত্বনা? নৃত্যশিল্পী নটী তাহার জীবনের পরম সাধনার সম্পদ্ দুঃখের রাঙা শতদলেই পরম কারুণিক বুদ্ধের পূজা সমাপন করিবে। অবশেষে তনুরেখার লীলায়িত ভঙ্গিমার আভাসে ইঙ্গিতে সরল প্রাণের নিঃশেষ দানে তাহার পূজা সমাপ্ত হইয়াছে। এই নৃত্যকে শ্রীমতী পূজারই সঙ্কেতরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এইজন্য তাহার নৃত্যের মধ্য দিয়া যাহা দৃশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই ইন্দ্রিয়াতীত লোকোত্তর অনুভূতির দিকে দর্শকদের টানিয়া লইয়া গিয়াছে। রাজনটীর জীবনই তাহার চরম পরিচয় নয়—সে পূজারিণী। তাহার বাহ্যিক রূপের মধ্যে জৌলুষ আছে। কিন্তু অন্তরে আছে বিরাটত্বের গভীর উপলব্ধি। নৃত্য ও গানের মধ্যে আভাসে ইসারায় তাহাই ধরা দিয়াছে।

পূজা নিবেদনের জন্য কেন এই নৃত্যের সঙ্কেত গ্রহণ করা হইল? যে সত্যকে কবি শ্রীমতীর জীবনে রূপ দিতে চাহিয়াছেন তাহাকে অমূর্ত রাখিয়াছেন কেন? তাহার একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। যে সহজ সত্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপলব্ধিতে তাহার অন্তর আলোকিত হইয়াছে, সাধারণভাবে বর্ণনা করিলে, শুধু ধূপদীপের অর্ঘ্য নিবেদিত হইলে তাহা দর্শকদের মর্ম স্পর্শ করিত না, অমূর্ত রূপই তাহার অন্তরের পরম সত্যকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্য নটীর আবরণের তলায় লুকাইয়া আছে ভিক্ষুণীর পীত বসন। নৃত্যকে নাটকে কবি পূজার প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতীক গ্রহণ তখনই সার্থক হইয়া উঠে যখন প্রতীকের মধ্যে সীমা ও অসীমের সঙ্গম উপলব্ধি করা যায়। অসীম, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে উপলব্ধি করিবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা তাহাকে প্রতীকে বাঁধিয়া দেওয়া। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, স্থাপত্যে সকল সুকুমার কলায় প্রতীক হইতেছে সেই মিলনভূমি। শ্রীমতীর চরম নৃত্যের সাঙ্কেতিকতার আড়ালে পরম কারুণিক ভগবানের উদ্দেশে পূজা নিবেদিত হইয়াছে।

'নটীর পূজা' নাটকের পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে মহারাণী লোকেশ্বরী দেবীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানের মধ্য দিয়াই নবধর্মের প্রতিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে। কোমলে কঠোরে, স্নেহে শৌর্যে, বিশ্বাসে শঙ্কায় এই চরিত্র পাঠকের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। সকলের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া ভগবান তথাগতের প্রচারিত সত্যধর্মকে একদিন লোকেশ্বরী দেবীই রাজ অন্তঃপুরে স্বাগত জানাইয়াছিলেন। কিন্তু নবধর্মকে তিনি গ্রহণ

করিয়াছিলেন চিরন্তন নারীধর্মের প্রেরণায়, এই ধর্মের আদর্শের প্রতি স্বীকৃতি জানাইয়া নয়। ভগবান সম্বুদ্ধের শুভ প্রসাদে নৃপতি বিম্বিসার বিপন্মুক্ত হইবেন, রাজসিংহাসন নিষ্কণ্টক হইবে এই কামনায়। স্বামীপুত্রের কল্যাণ-কামনায় প্রজাসাধারণের মঙ্গলার্থে তিনি প্রতিদিন রাজগৃহে কল্যাণ 'পঞ্চবিংশতিকা' পাঠ করিয়াছেন, শত ভিক্ষুকে পিণ্ডপাত দান করিয়াছেন, বর্ষশেষে ভিক্ষু সঙ্ঘে বর্ষাবাস বিতরণ করিয়াছেন। রাজ উদ্যানে ভগবান তথাগতকে আহ্বান করিয়া তাঁহার চরণে উপাসিকার ভক্তিনম্র আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু নবধর্মের যথার্থ স্বরূপ তিনি সেদিন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, করিয়াছেন সেদিন যেদিন সর্বস্ব ত্যাগের মন্ত্র লইয়া নবধর্ম তাঁহার দুয়ারে আসিয়াছে। সেদিন তিনি বুঝিতে পারিলেন এই ধর্ম সাংসারিক সুখ ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির ধর্ম নয়—এই ধর্ম সর্বস্ব ত্যাগের, চরাচরকে দয়া করার, আর সংসার বিমুখতার ধর্ম। যেদিন নবধর্মের প্রেরণায় মহারাজ বিম্বিসার রাজসিংহাসনের মায়া ছাড়িয়া নির্জনবাসী হইলেন, একমাত্র পুত্র রাজকুমার চিত্র ভিক্ষুব্রতধারী হইলেন, সেদিন রাজ অন্তঃপুরে নির্বাসিতা রাজমহিষীর শূন্য অন্তর চরম বেদনায় ও অভিমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। মহারাজের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'আমার সব পূজা নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়েছি। কেউ বা ফুল দেয়, দীপ দেয়, আমি আমার সংসার শূন্য করে দিয়েছি। ······আমার একমাত্র ছেলে চিত্র, রাজপুত্র আমার, তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ভিক্ষু করে। তবু বলে পূজা দাও। লতার মূল কেটে দিলে, তবু চায় ফুলের মঞ্জরী।'[১] তিনি চাহিয়াছেন—'অন্ত স্বপ্নটা যাকে বলে বিত্ত, যাকে বলে পুত্র, যাকে বলে মান'[২]—এই স্বপ্ন যখন ভাঙিল, তখন চরম আক্রোশে তিনি এই ধর্মকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অবচেতন মনে তাঁহার অজানিতে এই ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল।

নাটকের মধ্যে স্থানে স্থানে মহারাণীর মাতৃহৃদয়ের সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্র—তাঁহার একমাত্র পুত্র, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া সে সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। শুধু তাহা নয়, তাহার মায়ের দেওয়া নামটাও আজ তাহার পরিত্যাজ্য। যে মানবকোরকটিকে তিনি একদিন এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে আনিয়াছিলেন তাঁহার সেই সন্তান মুহূর্তে এক নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে। পুত্রের সেই অনাসক্ত মুক্তদৃষ্টি মহারাণীর মাতৃহৃদয়ে মৃত্যুর অধিক

১। নটীর পূজা, পৃঃ ৯—১০। ২। ঐ, পৃঃ ১১।

যন্ত্রণা দিয়াছে। কোমল মাতৃহৃদয়ের সঙ্গে ক্ষত্রিয় রমণীর, রাজকুলবধূর দুর্জয় তেজ, দৃঢ় মন ও দীপ্ত অভিমান লোকেশ্বরী দেবীর চরিত্রকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। 'দয়ামন্ত্রের হাওয়ায় যে রাজা সিংহাসনের উপর কেবল টলমল করে, রাজদণ্ড যার হাতে শিথিল, জয়তিলক যার ললাটে ম্লান', তাহাকে বরণ করিয়া লইতে লোকেশ্বরী দেবী নারাজ। পুরুষের পৌরুষকে জাগাইয়া তোলাকেই তিনি ক্ষত্রিয় নারীর শ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করিয়াছেন। দুই প্রবল শক্তি দুই দিক হইতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে। একদিকে নবধর্মের ত্যাগদীপ্ত শান্ত সংযত আবেদন, অন্যদিকে চিরাচরিত অভ্যাসের জড়তা, একদিকে চিরন্তন নারীধর্ম, সন্তানস্নেহ এবং রাজকুলবধূর জীবনাদর্শ, অন্যদিকে অবচেতন মনের অন্তরালে নবধর্মের প্রতি নিগূঢ় অনুরাগ—এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির তীব্র আকর্ষণ বিকর্ষণে তাঁহার অন্তর ঘড়ির দোলকের ন্যায় দোলায়মান। অন্তরে তিনি সেই পরমজ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুর সেবারতা উপাসিকা আর বাহিরে নিষ্ঠুরা ক্ষত্রিয় রাজবধূ। জীবনের স্নেহ প্রেম সৌন্দর্য মাধুর্যের সঙ্গে পরমকারুণিক তথাগতের সংসারাসক্তিবর্জিত ধর্মের প্রবল দ্বন্দ্বে তাঁহার অন্তর পথহারা পথিকের ন্যায় দিশেহারা হইয়া আশ্রয় খুঁজিয়াছে এবং তাঁহার জীবনকে নিতান্ত করুণ ও বিড়ম্বিত করিয়াছে। শ্রীমতীকে মন্ত্র উচ্চারণের জন্য তিরস্কার করিতে গিয়া তিনি নিজেও অজানিতে সে মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন। একটু আবৃত্তি করিয়াছেন আবার বলিয়াছেন—'থাম, থাম। ···ওরে ওরে অনাথা, অনাথা। শ্রীমতী একবার বলো তো, মহাকারুণিকো নাথো— ···হয়েছে, হয়েছে, থাক, থাক, আর নয়। নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ।'[১] অনুচরীর নিকট হইতে পুত্র চিত্রের আগমন সংবাদ শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন'—পুণ্যমন্ত্রের যেমনি উচ্চারণ অমনি গেল অমঙ্গল। ওরে বিশ্বাসহীনারা, তোরা আমার দুঃখ দেখে মনে মনে হেসেছিলি। মহাকারুণিকো নাথো, তাঁর করুণার কত বড়ো শক্তি! পাথর গলে যায়।' নবধর্মদ্বেষী দেবদত্ত ও অজাতশত্রুর দল উদ্যানের প্রাচীর ভাঙিয়া পূজার বেদী ধ্বংস করিতে আসিতেছে, আকাশে বাতাসে চারিদিকে ভাঙনের সুর—'জয় কালী, করালী', 'নমঃ পিনাকহস্তায়,' আর অন্য সুরটা—'নমো বুদ্ধায়' ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। তখন নবধর্মবিরোধী রাজকুলবধূ লোকেশ্বরী দেবীর মধ্যে উপাসিকা লোকেশ্বরী দেবী জাগিয়া উঠিয়াছে—'দেবদত্ত

১। নটীর পূজা, পৃঃ ২৬,

ক্রূর সর্প, নরকের কীট। যখন অহিংসাব্রত নিয়েছিলেম তখনও মনে মনে তাকে প্রতিদিন দগ্ধ করেছি, বিদ্ধ করেছি। আর আজ! যে আসনে আমার সেই পরমনির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব।'[১]

ভগবানের পূজাবেদীতল নটীর চরণাঘাতে অবমানিত হইবে উপাসিকা লোকেশ্বরী দেবীর অন্তর তাহাতে সায় দেয় নাই। শ্রীমতীকে বিষ পান করিতে দিয়া তিনি তাহাকে রাজাদেশ পালনের শোচনীয় পরিণতি হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছেন। অবশেষে শ্রীমতীর নৃত্যে, তাহার ত্যাগনিষ্ঠ অবিচল আত্মত্যাগের পুণ্যজ্যোতির স্পর্শে তাঁহার চিত্ত হইতে সংসারাসক্তির আবরণ খসিয়া পড়িল। শ্রীমতীর আত্মবিসর্জনে তাঁহার সমস্ত দ্বন্দ্বের নিরসন হইল, ক্ষমা ও করুণার স্পর্শে তাঁহার চিত্ত নব জন্মলাভ করিল। শ্রীমতীর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি বলিলেন—'নটী তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। (বসনের একপ্রান্ত মাথায় ঠেকাইয়া) এ আমার।'[২]

শ্রীমতী কোমল শান্ত সমাহিত; অসীম আকাশের নিস্তব্ধতা ও প্রশান্তি তাহার প্রাণে। লোকেশ্বরী দেবী বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্না, সমুদ্রের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা তাঁহার অন্তরদ্বন্দ্বে পরিস্ফুট হইয়াছে।

মালতী নিষ্ফল প্রণয়ের কারুণ্য প্রতিমা। নব প্রচারিত ধর্মের মধ্যে সে সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইয়াছে। মালতী পল্লীবালিকা, সরল প্রাণের স্বতঃউৎসারিত আবেগে সে শ্রীমতীর কাছে নিজের অন্তর-বেদনাকে অর্গলমুক্ত করিয়া দিয়াছে। শ্রীমতীর আবেগসমাহিত মূর্তি, শান্ত মধুর উপদেশ ও গান তাহার ব্যর্থ প্রেমের মর্মবেদনায় সান্ত্বনার প্রলেপ বুলাইয়া দিয়াছে। নবধর্মকে সে গ্রহণ করিয়াছে কোন গভীর তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে নয়, চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসে বীতশ্রদ্ধ হইয়াও নয়, যে আলোর মুক্ত ধারায় আজ দিকে দিকে বান ডাকিয়াছে, যাহার সন্ধানে তাহার ভাই পথে বাহির হইয়াছে, মিলনমুহূর্তে বরমাল্য ব্যর্থ করিয়া প্রিয়তম ফিরিয়া গিয়াছে সে আলোর পুণ্য ধারায় সে তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে চাহিয়াছে, অবশেষে দুঃখ ও বিচ্ছেদের হোমাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মালতীর শান্ত প্রেম খাঁটি ও পরিশুদ্ধরূপে অনন্ত প্রেম-উৎসের দিকে যাত্রা শুরু করিয়াছে। মালতীকে যখন বলিতে শুনি—'তাঁকে দেখিবার আশায় মনকে ব্যাকুল করেছি

১। নটীর পূজা পৃঃ ৪৪।
২। ঐ, পৃঃ ৮১।

মনে করো না। ভয় হচ্ছে ওঁকে তারা মারবে। তাই কাছে থাকতে চাই।... তাঁকে বাঁচাতে পারব না, কিন্তু মরতে তো পারব'—[১] তখন মনে হয় কবি বিশ্বাস করেন মালতীর ব্যাকুল প্রাণের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম একদিন তাহাকে অনন্ত প্রেমের পথে আহ্বান জানাইবে এবং চরম সার্থকতায় উপনীত করিয়া দিবে।

শ্রীমতী এই নাটকের অন্যতম চরিত্র। সে রাজবাড়ীর নটী—বহুজনভোগ্যা, গৃহের কল্যাণবেদীতে গৃহলক্ষ্মীরূপে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বিরাট রাজপুরীর একান্তে সে কুণ্ঠিত জীবন যাপন করিতেছিল। এমন সময় ভিক্ষু উপালি আসিলেন, তিনি ভগবান তথাগতের নামে ভিক্ষার আবেদন জানাইলেন। কিন্তু সমাজ-সংসারে যে চিরকাল অবহেলা ও অবমাননা পাইয়া আসিয়াছে তাহার হাতের নৈবেদ্য কি ভগবান গ্রহণ করিবেন? শ্রীমতী বলিলেন—'আমি যে অভাগী। প্রভুর ভিক্ষাপাত্রে আমার দান কুণ্ঠিত হবে'। কিন্তু নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিল তাহার অন্তরে। ভিক্ষু উপালি জানাইলেন—'তাই নেবেন, তোমার পূজার ফুল। ঋতুরাজ বসন্ত যেমন করে পুষ্পবনের আত্মদানকে আপনি জাগিয়ে তোলেন তোমার সেই দিন এসেছে, আমি তোমাকে জানিয়ে গেলুম। তুমি ভাগ্যবতী'।[২]

ভগবান তথাগত যেদিন রাজবাড়ীতে অন্তঃপুরিকাদের ধর্মদেশনা প্রদান করিতে আগমন করেন সেদিন শ্রীমতী নিজেকে আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার মলিন দেহমন লইয়া সেই চিরনির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুর সামনে উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিন্তু সেইদিন হইতে তাহার শুরু হইয়াছে উপাসিকার জীবনচর্যা, পুরুষোত্তমের পূজায় নিঃশেষে আত্মদানের প্রস্তুতি। অবশেষে বন্ধনক্ষয়ের পথে মুক্তিসাধনায় সিদ্ধি আসিল। পূজার নৈবেদ্য প্রস্তুত হইল। পুষ্পপ্রদীপের নৈবেদ্য নয়—ভোর বেলাকার শিশিরধোয়া শিউলির ন্যায় নিজেকেই সে ভগবানের বেদীতলে উৎসর্গ করিয়া দিল। এই প্রস্তুতির ইতিহাসটুকু আছে বলিয়াই শ্রীমতী শুধুমাত্র ভাবের ফানুসে পরিণত না হইয়া রক্তমাংসের মানবীতে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার আত্মোৎসর্গও পাঠকের অন্তরকে এত গভীরে নাড়া দিতে পারিয়াছে। নাটকের মধ্যে স্থানে স্থানে আভাসে ইঙ্গিতে এই প্রস্তুতির পরিচয় রহিয়াছে। শ্রীমতী মালতীকে বলিয়াছে—'এখনো আমার মনের মধ্যে পুরানো ক্ষত চাপা আছে, সে আবার ব্যথিয়ে উঠল।

১। নটীর পূজা পৃঃ ৬০।
২। ঐ, পৃঃ ৬।

বন্ধনকে বাইরে থেকে যতই তাড়া করেছি ততই সে ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে।[১] রক্ষিণী রোদিনীর প্ররোচনায় ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়ার ইচ্ছাও মুহূর্তে তাহাকে পথচ্যুত করিয়াছে—

'শ্রীমতী—লোভ দেখিয়ো না রোদিনী। আমি নটী, তোমার ঐ তলোয়ার দেখে আমার এই নাচের হাতও চঞ্চল হয়ে উঠল।

পাটলী—তা হলে, এই নাও। (তরবারি দান)।'[২]

কিন্তু চরমমুহূর্তে নিজেকে সে সামলাইয়া লইয়াছে—

'শ্রীমতী (শিহরিয়া হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল) না, না। প্রভুর কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছি। চলছে আমার যুদ্ধ, মার পরাস্ত হোক, প্রভুর জয় হোক'।[৩]

এই অস্ত্র কিসের অস্ত্র, প্রভুর কাছে বুদ্ধ-সেবিকা শ্রীমতী কোন অস্ত্র লাভ করিয়াছে? সে অস্ত্র হইতেছে—

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥[৪]

এই অস্ত্র শত্রুতা শূন্যতার অস্ত্র, অক্রোধের অস্ত্র, যে অস্ত্রবলে বৈরতাকে প্রশান্ত করা যায়।

বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি মৈত্রীমন্ত্র শ্রীমতী তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করিয়াছে। রাজকুমারীদের বিদ্রূপ কটূক্তি সে শুধু সহ্যই করে নাই, ক্ষমাসুন্দর স্নেহের মন্দাকিনী ধারায় তাহাদের সমস্ত অপরাধকে সে লঘু করিয়া দিয়াছে। রাজকুমারীদের বিদ্রূপ বাণ, রক্ষিণীদের অপমান, লোকেশ্বরী দেবীর বিরূপ সমালোচনা কোন কিছুতেই তাহার মনের প্রশান্তি ব্যাহত হয় নাই।

তাহার সেই সর্ববন্ধনমুক্ত, স্থির, অচঞ্চল মূর্তি স্মরণ করাইয়া দেয়—

গতদ্ধিনো বিসোকস্স বিপ্পমুত্তস্স সব্বধি।
সব্বগন্থপ্পহীণস্স পরিলাহো ন বিজ্জতি ॥[৫]

১। নটীর পূজা, পৃঃ ৬০।
২, ৩। ঐ, পৃঃ ৫৬।
৪। ধম্মপদ, যমকবগ্গো শ্লোক সংখ্যা, ৫।
৫। ঐ, অরহন্ত বগ্গো, শ্লোক সংখ্যা ১।

যাঁহার পথ চলা শেষ হইয়াছে, যিনি বিগতশোক, যিনি সর্বপ্রকারে মুক্ত হইয়াছেন, যিনি সকল গ্রন্থি বা বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন তাঁহার কোন দুঃখ নাই। প্রকৃত বুদ্ধভক্তের সমস্ত গুণাবলী শ্রীমতী আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। শ্রীমতীর চরিত্রে যে মহত্ত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তাহার অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার সহায়তা করিয়াছে। তাহার পার্শ্বে রাজকুমারীগণ অত্যন্ত নিষ্প্রভ ও সাধারণ, লোকেশ্বরীদেবীও স্বামী পুত্রের অভাবে কতকটা যেন উন্মাদগ্রস্তা। নাটকের সূচনাতেই দেখা যায় শ্রীমতী divinely inspired—প্রজ্ঞার আলোকে দীপ্যমান হইয়া সে এখন মুক্তির পথপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশেষে চরম নৃত্যে sublimity-র আভাস প্রদান করিয়া কবি তাহাকে মৃত্যুহীন মৃত্যুর রাজ্যে উপনীত করিয়া দিয়াছেন।

রাজবাটীর নটী শ্রীমতীই এই নাটকে কবির একাগ্র মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীমতীকে পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রস্ফুটিত করিতে গিয়া তিনি যখন যেটুকু প্রয়োজন অন্য চরিত্রগুলিকে হাজির করিয়াছেন। অন্যান্য-পাত্রীদের সঙ্গে একত্র বাস করিলেও শ্রীমতী অনন্যা। সমগ্র রাজ্যব্যাপী ধর্মদ্বন্দ্ব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাত আসিতেছে যাইতেছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের লেলিহান অগ্নিশিখা মহারাজা বিম্বিসারকে, ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণাকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও শান্তি আসে নাই। দেবদত্তের চেলা বিদ্রোহীর দল আরো বেপরোয়া অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। কে আনিবে শান্তি? কাহার আত্মাহুতিতে নির্বাপিত হইবে এই লেলিহান শিখা। শ্রীমতী আগাইয়া আসিল। এই ভাঙনের মুখে কেবল সেই ধীর স্থির অবিচলিত রহিয়াছে। রাজাদেশ লঙ্ঘন করিয়া ভগবান বুদ্ধের চরণবেদীতলে চিরকালের জন্য তাহার হৃদয়স্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার আত্মোৎসর্গে অশান্তির আগুন নিবিয়া গেল, সকল সন্দেহ সংশয় বিদূরিত হইল, নবধর্মের বিজয়বার্তা ঘোষিত হইল। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখিয়াছেন—'কবির প্রশ্ন,—নটীর পূজার অর্ঘ্য কাহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়াছে। কিসের জন্য সাধনা তাহার? 'নটীর পূজা' তো একটি অবিচ্ছিন্নতার (abstraction) নিকট আত্মাহুতি। নটীর সাধনা তো পরিপূর্ণ জীবনানন্দের জন্য নহে। নেতি নেতির শেষ কোথায়? জীবনশিল্পী কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সাধনা অবিচ্ছিন্ন নঞর্থক —আনন্দহীন—সর্বশূন্যতার প্রতীকতলে আত্মোৎসর্জন কখনই সৌন্দর্যসাধক

কবির পরম কাম্য হইতে পারে না।'[১] কিন্তু শ্রীমতীর আত্মাহুতিকে নঞর্থক বা নেতিবাচক বলা চলে না। সমস্ত বাসনাকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া সর্বশূন্যতা অথবা নির্বাণমুক্তি লাভই শ্রীমতীর আত্মবিসর্জনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে হয় না। এই মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তির পরিচায়ক নয়। কারণ—'পূর্ণ স্বরূপের বিচিত্র ঐশ্বর্যকে সর্ব ইন্দ্রিয় মন প্রাণ আত্মা দিয়া সম্ভোগের মহোৎসবে যে আত্মসমর্পণ তাহাই কবির ধর্মে মুক্তি।'[২] শ্রীমতীর মৃত্যুও সেই মুক্তিরই স্বাক্ষর। এই মৃত্যুর মধ্যে সূচিত হইয়াছে নবজীবনের আগমনী। কারণ যে মৃত্যুর মধ্যে অপরের জন্য নিঃশেষে নিজেকে দান করা আছে সে মৃত্যুর মধ্য দিয়াই মানুষ মুক্তি লাভ করে, অমৃতে অধিষ্ঠিত হয়। 'রক্তকরবী' নাটকে রঞ্জনের মৃত্যু, 'মুক্তধারায়' অভিজিতের মৃত্যু এবং 'রাজারাণী' নাটকে সুমিত্রার মৃত্যু—ইহা শুধু দেহের অবসান নয়, ইহা বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য, বহু জীবনের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য মৃত্যু বরণ। শ্রীমতীর মৃত্যুও জীর্ণ পুরাতনের বুকে নূতনের ঘুম ভাঙ্গানোর প্রচেষ্টা। সুতরাং তাহার সাধনাকেও নঞর্থক বলা যায় না। নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া সে নূতন জাগরণকে স্বাগত জানাইয়াছে। আপন মৃত্যুর বিনিময়ে অন্যের জীবনের খণ্ডতা ও সঙ্কীর্ণতাকে মুছিয়া দিয়াছে। আপন প্রাণের বিনিময়ে যাহারা কল্যাণব্রতকে গ্রহণ করেন অপমান ও অপমৃত্যু তাঁহাদের ললাটে জয়তিলক আঁকিয়া দেয়! কিন্তু সেই মৃত্যু তো মহামৃত্যু! সত্যের জন্য, পরের হিতের জন্য এই আত্মদান কখনই 'নঞর্থক—আনন্দহীন' নয়।

'নটীর পূজা' নাটকে কবি ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিধিনিষেধ দ্বারা আবদ্ধ মানব-আত্মার রুদ্ধাবস্থা অঙ্কন করিয়াছেন। যে সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় বিধান মানুষকে অবহেলা ঘৃণা ও পীড়ন করে সেখানে সর্ববন্ধনমুক্ত সত্যদর্শী মানুষের অপমান ও লাঞ্ছনাই প্রাপ্য। 'নটীর পূজা' নাটকে সমাজের আচারের বন্ধনে মানুষ পীড়িত হইয়াছে, ক্ষমতাবানের বলপ্রয়োগে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত ও নির্যাতীত হইয়াছে। ধর্ম, সমাজ ও রাজশক্তির এই সংকীর্ণতা ও রুদ্ধাবস্থা দূরীকরণের জন্যই শ্রীমতীর আত্মোৎসর্গ। মানুষকে হনন, মনুষ্যত্বের প্রতি মানুষের চিরকালের পাপ। শ্রীমতীর আত্মোৎসর্গে সেই পাপের ক্ষালন হইয়াছে। তাহার মৃত্যুসিন্ধু মন্থনে যে অমৃত উঠিয়াছে সকল মানুষের কাছে তাহা বৃহৎ ও

১। রবীন্দ্রজীবনী. ৩য় খণ্ড, ১৩৫৯, পৃঃ ২০৫

২। ঐ, পৃঃ ২০৫।

মহৎ জীবনের স্বর্ণদ্বার খুলিয়া দিয়াছে। এই মৃত্যুকে কি চরম অবলুপ্তি বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়? শ্রীমতীর মৃত্যুর এই সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচক লিখিয়াছেন 'নটীর পূজা' নাটকে 'কবি শক্তি ও আচারের দ্বারা অবরুদ্ধ মানব আত্মার করুণ ক্রন্দন শুনতে পেয়েছেন এবং মৃত্যুর দ্বারাই মুক্তির সন্ধান এনে দিয়েছেন।'[১]

নাটকের কাহিনী অংশে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার স্বীকৃতি রহিয়াছে। নাটকে বর্ণিত অজাতশত্রু এবং বিম্বিসার ঐতিহাসিক পুরুষ। প্রাচীন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও নবপ্রচারিত বৌদ্ধধর্মের দ্বন্দ্বও ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রামাণিক স্বীকৃতি পাইয়াছে। ইতিহাসের মূল সত্যকে অবিকৃত রাখিয়া কবি ইতিহাসকে নাটকীয় গুণমণ্ডিত করিবার জন্য নূতন নূতন চরিত্রসৃষ্টি এবং কাল্পনিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন।

বিম্বিসার মহিষী লোকেশ্বরীদেবী কাল্পনিক চরিত্র। বৌদ্ধ অথবা জৈন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে বিম্বিসারের এই নামীয় কোন মহিষীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিম্বিসার মদ্র, কোশল এবং বৈশালীর রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পশ্চিম ও উত্তরদিকে রাজ্যবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। ২৩৯, ২৮৩, ৪৯২ সংখ্যক জাতকের তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ডঃ রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন—

Bimbisara's Kosalan wife brought a Kasi village producing a revenue of a hundred thousand for bath and perfume money.[২]

এই কোশল রাজকন্যার নাম কোশলা দেবী। 'থুস' জাতক এবং 'মুসিক' জাতকে তাঁহাকে অজাতশত্রুর জননী বলা হইয়াছে। পালি সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে অজাতশত্রুর জননীর নাম 'মদ্দা' বা 'মদ্রা'। বিম্বিসারের মদ্রদেশীয় মহিষীর নাম ছিল ক্ষেমা। ক্ষেমা তাঁহার প্রধানা মহিষীদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীর যে নগরশোভিকাকে গ্রহণ করেন তাঁহার নাম পদ্মাবতী বা নন্দা। জৈন গ্রন্থে বিম্বিসারের অন্য এক মহিষীর নাম পাওয়া যায়—বৈশালী রাজকন্যা 'চেল্লনা দেবী'। 'নটীর পূজা' নাটকেও বিম্বিসার যে বহুপত্নীক ছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু মহারাণী লোকেশ্বরী দেবী এবং ভিক্ষুধর্মাবলম্বী রাজকুমার 'চিত্র' সম্পূর্ণ কবি-কল্পনার সৃষ্টি। বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে

১। রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়, ক্ষুদিরাম দাস, পৃঃ ৩৮৭।
২। Political History of Ancient India, p. 206.

মহারাজ বিম্বিসারের একাধিক পুত্র—অজাতশত্রু, অভয়, বিমলকোণ্ডঞ্ঞ, হল্ল বেহল্ল, কালগ, সীলবৎ, জয়সেন, এবং কন্যা চুন্দী প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। বিমলকোণ্ডঞ্ঞ অম্বপালীর পুত্র। বিম্বিসারের একজন পুত্র ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার নাম চিত্র নয়, বিমলকোণ্ডঞ্ঞ। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ নামান্তরে চিত্ররূপে বিমলকেই নাটকে স্থাপন করিয়াছেন।

সিংহল দেশীয় ঐতিহ্যে[১] মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হর্যক বংশকে 'পিতৃঘাতক বংস' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অজাতশত্রু তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এই তথ্যকে ঐতিহাসিকগণও স্বীকৃতি জানাইয়াছেন।[২]

অজাতশত্রুর দেহের প্রতি শিরায় শিরায় পিতৃহন্ত্রী রক্ত প্রবাহিত ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া জাতককার সুন্দর একটি গল্প রচনা করিয়াছেন। অজাতশত্রু তখন মাতৃগর্ভে, রাজমহিষী কোশলাদেবীর বাসনা হইল রাজার দক্ষিণ বাহুর রক্ত পান করিবেন। এই অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর বাসনাকে তিনি প্রাণপণে রুদ্ধ করিতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না, বুঝিলেন যে প্রাণকোরকটিকে তিনি নিজের দেহাভ্যন্তরে পালন করিয়া চলিয়াছেন একদিন সেই বলবীর্য লাভ করিয়া ক্রূর সর্পের ন্যায় জন্মদাতাকেই দংশন করিতে উদ্যত হইবে। রাণী স্থির করিলেন বিষবৃক্ষ বীজেই তিনি উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু রাণীর ইচ্ছা ব্যর্থ হইল। বিম্বিসার রাণীর বাসনা জানিতে পারিয়া নিজের দেহরক্তে রাণীকে পরিতৃপ্ত করিলেন।[৩] যথাসময়ে শিশু জন্মাইল। এই শিশুই অজাতশত্রু —যিনি বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবদানশতকেও অজাতশত্রুকে পিতৃহন্তারূপে চিত্রিত করা হইয়াছে—

যদাপুনা রাজ্ঞা অজাতশত্রুণা দেবদত্তবিগ্রাহিতেন পিতা ধার্মিকো ধর্মরাজো জীবিতাদ্ ব্যবরোপিতঃ স্বয়ং চ রাজ্যং প্রতিপন্নঃ।[৪] বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর এই কাহিনীকে অবিকৃত রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। তবে ঘটনার একটু রদ বদল করিয়াছেন। 'নটীর পূজা'

১। Geiger, Mahāvaṃsa, Catuttho paricchedo, p. 21
২। Smith, The Early History of India, 1908, p. 82 ;
H. C. Roy Chaudhury, Political History of Ancient India, p. 209.
৩। Fausboll, Jātaka, Vol. III, pp 121-2, Sumaṅgala Vilāsinī. Vol, I, P. T. S. p 188 ff.
৪। শ্রীমতী. অবদানশতকম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬।

নাটকে অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন নাই। নৃপতি বিম্বিসারই পুত্রের সিংহাসনের প্রতি লোভ দেখিয়া নিজেই রাজবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়াছেন। এখানে বিম্বিসারের মৃত্যু ঘটিয়াছে দেবদত্তের ক্রুদ্ধ শিষ্যদের হাতে। এই মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষভাবে অজাতশত্রুকে দায়ী করা হয় নাই।

'নটীর পূজা' নাটকে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম শাসিত, বর্ণ বিদ্বেষের গ্লানিগ্রস্ত সমাজ কঠিন সঙ্কীর্ণতার ইট পাথর দিয়া মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধির আড়াল সৃষ্টি করিয়াছিল। এক শ্রেণীর মানুষ সনাতন বেড়া দেওয়া সভ্যতা ও শাস্ত্রবচনে নিজেদের জীবনকে চিরকালের মত স্থাবর করিয়া চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষে অন্য শ্রেণীর প্রতি মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। গভীর জ্ঞান, কঠোর তপস্যা ও উচ্চ আদর্শ অপেক্ষা মন্ত্রতন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানই সমাজে প্রাধান্য পাইল। ব্রাহ্মণ আচার্য ও তপস্বিগণ সত্যভ্রষ্ট হইয়া আর ব্রাহ্মণ রহিলেন না। মানুষের বিচারবুদ্ধিও সেই অন্ধ তামসিকতায় বিলীন হইয়া গেল। সমাজের শূদ্রদের বা নীচু জাতদের অবমাননা ও দুঃখের সীমা রহিল না। ভারতবর্ষের সেই তামসিক পটভূমিকায় সর্বজীবের প্রতি হিতানুকম্পী বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। ক্ষত্রিয়কুলে তাঁহার জন্ম, সমাজে ব্রাহ্মণদের আভিজাত্যকে তিনি খর্ব করিলেন, ক্ষত্রিয়ের কৌলিন্যকে স্বীকৃতি জানাইলেন। 'নটীর পূজা' নাটকের স্থানে স্থানে সেই যুগের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। সমাজের উচ্চবর্ণেরা সেদিনের সেই বিরাট জনসমাজকে অবহেলা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে তাহাদের যাচাই করে নাই, করিয়াছে জীবিকার মাপকাঠিতে। ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণা বসন্ত পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসবে অশোকবনে পূজা নিবেদনের দায়িত্ব শ্রীমতীর উপর অর্পণ করেন। ক্ষত্রিয় রাজকুমারীর আত্মাভিমানে তাহা প্রবল আঘাত দিয়াছে—

'রত্নাবলী—বোধ হয় ভুল শুনলেন। কোন্ শ্রীমতীর কথা বলছেন?

ভিক্ষুণী —এই যে, এই শ্রীমতী।

রত্নাবলী—রাজবাড়ীর এই নটী?

ভিক্ষুণী—হাঁ, এই নটী।

রত্নাবলী—স্থবিরদের কাছে উপদেশ নিয়েছেন?

ভিক্ষুণী—তাঁদেরই এই আদেশ।

চন্দ্রাবলী—কে তাঁরা? নাম শুনি।
ভিক্ষুণী—একজন তো উপালী।
চন্দ্রাবলী—উপালি তো নাপিত।
ভিক্ষুণী—সুনন্দও বলেছেন।
চন্দ্রাবলী—তিনি গোয়ালার ছেলে।
ভিক্ষুণী—সুনীতেরও এই আদেশ।
চন্দ্রাবলী—তিনি নাকি জাতিতে পুক্‌কুস।
ভিক্ষুণী—রাজকুমারী, এঁরা জাতিতে সকলেই এক, এঁদের আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জান না।
চন্দ্রাবলী—নিশ্চয়ই জানিনে। বোধ হয় এই নটী জানে। বোধ হয় এর সঙ্গে জাতিতে বিশেষ প্রভেদ নেই। নইলে এত মমতা কেন?"[1]

এই বিদ্বেষের বিষ আরো মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণার মৃত্যুতে। ক্ষমতাগর্ব ও নির্লজ্জ স্বেচ্ছাচারিতা মানুষের প্রাণবধ করিয়াও সঙ্কোচ বোধ করে নাই।

'রত্নাবলী—দেবদত্তের শিষ্যেরা ভিক্ষুণীকে মেরেছে। তা নিয়ে এত ভাবনা কিসের? ওতো ছিল সেই ক্ষেত্রপালের মেয়ে।
মল্লিকা—কিন্তু আজ যে ও ভিক্ষুণী।
চন্দ্রাবলী—মন্ত্র পড়ে কি রক্ত বদল হয়।
মল্লিকা—আজ কাল তো দেখছি মন্ত্রের বদল রক্তের বদলের চেয়েও ঢের বড়ো।[2]

বর্ণভেদ প্রথা যখন সমাজে প্রবর্তিত হয় তখন তাহার মধ্যে একটা কল্যাণ আদর্শ ছিল। জ্ঞানচর্চা, সত্যনিষ্ঠা ও কঠোর তপস্যাই ছিল সমাজের উন্নয়ন মার্গ। এইজন্য ক্ষত্রিয়ের এমন কি শূদ্রেরও ব্রহ্মত্ব অর্জনের পথে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু পরবর্তীযুগে সামাজিক অনুদার নীতির চাপে সমাজ-ব্যবস্থা বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় বিষাক্ত হইয়া উঠে। সেই সামাজিক অবিচারের যুগে সর্ববিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে মানব-প্রেমিকের আবির্ভাব তাঁহার আহ্বানে ভারতের সর্বজাতি এক ঠাঁই আসিয়া মিলিয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে শুরু করিয়া গোয়ালা, নাপিত, পুক্‌কুস, ক্ষেত্রপাল কেউই বাদ যায় নাই, শুধু তাহাই

১। নটীর পূজা, পৃঃ ৩০—৩১।
২। নটীর পূজা, পৃঃ ৬২।

নব সূর্যের উদার আলোকধারা যেমন চরম পাপীর দুয়ারকেও উজ্জ্বল করে তেমনি সেই কল্যাণধর্ম সর্বপরিত্যক্তদেরও চরম সার্থকতা দিয়াছে। রক্ষিণী, নটী, বারবণিতারাও অবহেলিত হয় নাই। কলন্দক যে চল্লিশ বৎসর জুয়া খেলিয়া জীবন কাটাইল সেও জীবনসায়াহ্নে আসিয়া সত্যদৃষ্টি লাভ করিল। নবধর্ম সেদিনের জড় প্রাণহীন সমাজে যে প্রাণচাঞ্চল্যের আলোড়ন আনিয়াছিল তাহার ফলে সমগ্র সমাজের ভিত্তিমূল অবধি নড়িয়া উঠিল। নবধর্মের স্বরূপ মানুষের বুঝিতে অসুবিধা হইল না, তাহারা বুঝিল—'উচ্চ আসনকে ধুলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম। যেখানে রাজার প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে'।[১]

নাটকে দুই বিরোধী পক্ষের সংগ্রাম দেখানো হইয়াছে, একদিকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত রাজশক্তি, অন্যদিকে নবপ্রচারিত বৌদ্ধধর্ম সমাজের অন্ত্যজ জনগণকেও যাহা আপন বক্ষে আশ্রয় দিয়াছে। এইজন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি অভিজাত সম্প্রদায় নবধর্মকে হীন চক্ষে দেখিতে লাগিল। রাজমহিষীর উক্তিতে নবধর্মের প্রতি অভিজাত সম্প্রদায়ের এই মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়াছে—'মূঢ়ে, রাজবংশের মেয়ে হয়ে তোরা এই ধর্মকে অভ্যর্থনা করতে বসেছিস্, উচ্চ আসনকে ধুলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম। যেখানে রাজার প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে, একে ধর্ম বলিস্ তোরা আত্মঘাতিনীরা?' বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতিহাসে দেখা যায় অবশেষে ব্রাহ্মণ, সম্রাট্ ও শ্রেষ্ঠিগণও একসময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচক অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে রোমে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'যে ধর্মে পতিতা, ভিক্ষুণী ও ছোটজাতীয় লোক নেতৃস্থান পাইয়াছে অভিজাত সম্প্রদায় তাহাকে গ্রহণ করিবে কি করিয়া? তাহারা ইহাকে ব্যঙ্গ করিয়াছে অথচ অলক্ষিতে তাহাদের মন ইহার প্রতি আকৃষ্টও হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। সাম্রাজ্যমদদীপ্ত রোমে খৃষ্টধর্ম প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল অন্ত্যজদের ধর্ম হিসাবে, তখন অভিজাত সম্প্রদায় ইহাকে বিদ্রূপ করিয়াছে, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহারা ইহার অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল এবং শেষে রোমের সম্রাটই এই ধর্ম গ্রহণ করিলেন।'[২]

১। নটীর পূজা, পৃঃ ২৫।
২। রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪১, পৃঃ ২৪৪,

নাটকে লোকেশ্বরী দেবীও বলিয়াছেন—"দুর্বল করাই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। যত উঁচু মাথাকে সব হেঁট করে দেবে। ব্রাহ্মণকে বলবে 'সেবা করো, ক্ষত্রিয়কে বলবে 'ভিক্ষা করো"।[১] ব্রাহ্মণ্যের কৌলিন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষত্রিয়ের আভিজাত্য-বোধ ও ক্ষমতা গর্ব—নবধর্ম সমস্তই অস্বীকার করিল, শুধু অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, সমাজ-ব্যবস্থা যাহাদের এতদিন অপাংক্তেয় অন্ত্যজ করিয়া রাখিয়াছিল নবধর্ম তাহাদের আপন কোলে টানিয়া লইল। সমাজে আপন শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে যাহারা অভিমানভরে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল নবধর্মের বাণী ও আদর্শ সেই অহংবোধের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সামাজিক সাম্য আনয়নে ব্রতী হইল।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও নবধর্মের এই দ্বন্দ্বকে আরো শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে রাষ্ট্রবিপ্লব। রাজপিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া দেবদত্তের শিষ্য বিদ্রোহীর দল রাজ্যে অরাজকতা আনয়ন করিয়াছে, চারদিকে ভীতি, সন্ত্রস্ততা ও ভাঙনের সাড়া। ধর্মদ্বন্দ্ব পরিণামে রাষ্ট্রবিপ্লবকে আহ্বান জানাইয়াছে। নাটকের স্থানে স্থানে দুর্যোগের ঘনঘটা ও মৃত্যুর সংকেত আছে। যেমন—

'ভদ্রা—শুনছ অজিতা, রাস্তায় ও কি ক্রন্দন না গর্জন?

নন্দা—আমার তো মনে হচ্ছে উদ্যানের ভিতরেই কারা প্রবেশ করে ভাঙচুর করছে। শ্রীমতী, শীঘ্র চলো রাজমহিষী মাতার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিই গে।

ভদ্রা—এসো অজিতা, সমস্তই যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে।

মালতী—দিদি, বাইরে ওই যেন মরণের কান্না শুনতে পাচ্ছি। আকাশে দেখেছ ওই শিখা। নগরে আগুন লাগল বুঝি? জন্মোৎসবে এই মৃত্যুর তাণ্ডব কেন'?[২]

রাজপথেও বিষম কোলাহল। দেবদত্তের উন্মত্ত শিষ্যদের চিৎকার ও নবধর্মের জয়ধ্বনি দুই শব্দতরঙ্গ আজ এক স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে—

মল্লিকা—মহারাণী, শুনতে পাচ্ছ?

লোকেশ্বরী—শুনছি বৈকি, বিষম কোলাহল।

মল্লিকা—নিশ্চয় এঁরা এসে পড়েছেন।

লোকেশ্বরী—কিন্তু, ওই যে এখনো শুনছি, নমো—

১। নটীর পূজা, পৃঃ ৩৬।
২। ঐ, পৃঃ ৫০।

মল্লিকা—সুর বদলেছে। 'নমো বুদ্ধায়,' গর্জন আরো প্রবল হয়ে উঠেছে আঘাত পেয়েই। সঙ্গে সঙ্গে ওই শোনো 'নমঃ পিনাকহস্তায়' আর ভয় নেই।

লোকেশ্বরী—ভাঙল রে ভাঙল। যখন সব ধুলো হয়ে যাবে তখন কে জানবে ওর মধ্যে আমার প্রাণ কতখানি দিয়েছিলেম।...[১]

অজাতশত্রু একদিন পিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, রাজার এই স্বেচ্ছাচারিতা প্রজারা মানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু অন্তর দিয়া সমর্থন করে নাই। আজ দেশব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগে সেই গণশক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। রাজপিতা বিম্বিসারকে হত্যা করায় দুর্যোগ আরো চরমে উঠিয়াছে। অবশেষে শ্রীমতীর আত্মাহুতিতে এই চরম দুর্যোগের অবসান হইয়াছে।

দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে যাহা জয়ী হইয়াছে শ্রীমতী তাহাকেই প্রকাশ করিয়াছে। বাহিরে সে রাজবাড়ীর নটী, সমাজে অখ্যাত, কার্যতঃ তাহারই জয় হইল। শক্তিধর রাজা অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্মবিরোধী, দেবদত্তের অনুগত, শাস্ত্রাচার ও চিরাচরিত প্রথাকে বজায় রাখিবার জন্য তিনি বুদ্ধ-পূজা বন্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু নাটকের শেষে তাঁহাকে তাঁহার রাজপ্রতাপ ত্যাগ করিয়া হার মানিতে হইয়াছে। তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে রাজকুমারী মল্লিকার উক্তিতে—'রাজ্যে বুদ্ধপূজায় যে নিষেধ প্রচার হয়েছিল সে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পথে পথে দুন্দভি বাজিয়ে তাই ঘোষণা চলছে। হয় তো এখনি এখানেও আসবে তাই সংবাদ দিয়ে গেলেম। আরো একটি সংবাদ আছে। আজ মহারাজ অজাতশত্রু স্বয়ং এখানে এসে পূজা করবেন তার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছেন।'[২] অবশেষে নবধর্মের বিজয় পতাকা দৃঢ়ভাবে উড্ডীন করিয়া শ্রীমতী আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে লোকেশ্বরী দেবীর সংশয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হওয়ায় তিনিও মুক্তিপথের পথিক হইয়াছেন। রাজকুমারীগণও আভিজাত্যের বেড়া ভাঙ্গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের এই বিজয় ব্যক্তিগত বা খণ্ডিত কালগত সত্যের উপর সার্বজনীন সত্যের জয় ঘোষণা করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে ও প্রবন্ধে দুইটি বিপরীতমুখী ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি নিত্যসত্য মানবধর্ম, অন্যটি সংকীর্ণ লৌকিক ধর্ম—একটি

৩। নটীর পূজা, পৃঃ ৪০,
১। ঐ, পৃঃ ৭৫।

চির শাশ্বত, বিশুদ্ধ শ্রেয়োনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যটি শুষ্ক আচার ও মিথ্যা স্বার্থসিদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের যে আদর্শরূপ এই নাটকে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে তাহা পরিপূর্ণ ও অখণ্ড। যাহা পিতা বর্তমানে পুত্রকে সিংহাসনে বসিতে প্ররোচিত করে, যে কল্যাণী ভিক্ষুণী আপন জীবন তুচ্ছ করিয়া রক্ষামন্ত্র আবৃত্তি করিতেছিল তাহাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, যাহা আপন ঘরের লোককে অন্ত্যজ বলিয়া পৃথক্ করিয়া দিয়া মানুষের মনুষ্যত্বকে অবমাননা করে, ভক্ত পূজারীর ভক্তির অর্ঘ্য কাড়িয়া লইয়া আপন সুখতৃপ্তির জন্য ব্যবহার করে তাহা চিরকালের পাপ, পৃথিবীর কোন ধর্মই তাহাকে স্বীকার করে না। তাহাতে চিরন্তন শ্রেয়োধর্ম মহৎ সামঞ্জস্যবোধ ও সর্বমানবের কল্যাণাদর্শ গৌণ, স্বার্থান্ধতা ও বাহ্যাড়ম্বরের তর্জনী সঙ্কেতই মুখ্য। কবি ইহাকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তিনি ইহাকে বলিয়াছেন ধর্মতন্ত্র।[১] 'নটীর পূজা' নাটকে ধর্মতন্ত্রের বেড়াজালে ধর্মের সত্যপথ জটিল ও নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে, পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত, চারিদিকে নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বের আলোড়ন, দম্ভ ও প্রতাপ, সত্য ও ন্যায়কে পদদলিত করিয়া সগৌরবে ধাবিত হইতেছে, লোভ ও স্বার্থসিদ্ধির বাসনা মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়না করিয়া ফিরিতেছে। পৃথিবীর সেই নিদারুণ দিনে ঘনীভূত মোহান্ধকারের দুর্গম গহনমধ্যে ক্ষুধিত হিংসা ও আত্মম্ভরিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষ নিত্যসত্যের বিজয় পতাকা উড্ডান করিয়াছে। শান্তিকামী মানুষের কণ্ঠে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব......
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,

অজাতশত্রু সত্যভ্রষ্ট—দম্ভ ও স্বৈরশাসনের প্রতীক, পিতৃদ্রোহী রাজা। সত্যাসত্য বিচার ও ন্যায়নীতিকে পদদলিত করিয়া তিনি ধর্মান্ধতাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আত্ম-অহংকার পরিতৃপ্তির জন্য অন্যায়, অত্যাচার ও পরপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ লৌকিক বিকৃত ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছেন। পরে পিতৃহত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবার দরুন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন। আত্মস্বার্থসিদ্ধি করিতে গিয়া তিনি হৃদয়ধর্ম, সন্তানধর্ম এবং ন্যায়ধর্মকে বিসর্জন দিয়াছেন, মানুষের অন্তরের ভক্তিকে অবমাননা করিয়া চিরন্তন মানবধর্মের বিরোধিতা করিয়াছেন। প্রজাদের নিজ নিজ ধর্মপালনের স্বাধীনতা হরণ করিয়া শাশ্বত

১। দ্রষ্টব্য কালান্তর—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

রাজধর্মে আঘাত হানিয়াছেন। অনুতাপের অনির্বাণ অগ্নিতে অহরহ দগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে।

চন্দ্রাবলী সামাজিক ও লৌকিক সংস্কার এবং রাজবংশের দম্ভকে সবলে ধরিয়া রাখিয়াছে। ক্ষুদ্র ঈর্ষা কঠিন ও নিষ্ঠুর কার্যসাধনে তাহাকে প্রণোদিত করিয়াছে। এই জন্যই সে বলিতে পারিয়াছে—'ও যেখানে পূজারিণী হয়ে পূজা করতে যাচ্ছিল সেখানেই ওকে নটী হয়ে নাচতে হবে।' চন্দ্রাবলীর এই সিদ্ধান্ত নিষ্ঠুর ও বিবেকহীন। মিথ্যা সমাজধর্ম ও সামাজিক আচারের কাছে সে তাহার হৃদয় ধর্মকে বিসর্জন দিয়াছে। পরে দাম্ভিকতার নেশা কাটিয়া গেলে নিজের কাজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া শ্রীমতীর মহত্ত্বের পদতলে আপনাকে সভয়ে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে।

নিত্যধর্মের মহিমা নৃপতি বিম্বিসারকে একমুহূর্তে নূতন মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। বিম্বিসার ক্ষত্রিয় নৃপতি, বাহুবলগর্বিত, বহুশোণিতমোক্ষণকারী। আপন রাজত্ববৃদ্ধি, প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্যবৃদ্ধি তাঁহারও কাম্য ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে প্রলোভন ও ক্ষমতার মোহকে অতিক্রম করিয়া তিনি প্রজ্ঞালোকিত অমৃতপথের যাত্রী হইয়াছেন। পুত্রের সিংহাসনের প্রতি লোভ দেখিয়া তিনি যে দিন সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন সেদিন রাজত্ব তিনি হারাইলেন কিন্তু লাভ করিলেন অমৃতরাজ্যের অধিকার। তাঁহার চিত্ত সেদিন নির্ভয় হইল, বন্ধনহীন হইল। মুকুটবিহীন উন্নত ললাটে তিনি নির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাপুরুষকে আশ্রয় করিলেন।

হননে প্রবৃত্ত, ঈর্ষায় অন্ধ শত্রুকে ক্ষমা করিয়া শ্রীমতী ধর্মের আর এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। শত্রুর প্রতি বিরূপতা, শত্রুকে নিধন করা জীবধর্ম। পৃথিবীর ইতিহাসে শত্রু হননের কাহিনীর অভাব নাই। তাহাদের অপরিমেয় ক্ষমতা ও বাহুবলে মানুষ বিস্মিত হয়। কিন্তু শত্রুকে ক্ষমা করা শাশ্বত মানবিক ধর্ম। এই ধর্ম হননে প্রবৃত্ত শত্রুকেও ক্ষমা করিতে শিক্ষা দেয়—

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো ॥[১]

শ্রীমতী এই চিরন্তন ক্ষমাধর্মের বাণীমূর্তি।

১। ধম্মপদ, যমকবগ্‌গো, শ্লোক সংখ্যা ৫।

ধর্মের মহত্তম আদর্শ, যে আদর্শ মানুষকে আনন্দরূপামৃতরসের সন্ধান দেয় শ্রীমতীর চিত্ত ধর্মের সেই মঙ্গল শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইয়াছে—সেই আহ্বানে সংসারে শতধারায় বিভক্ত চিত্ত এক মুহূর্তে একমুখী হইয়া সমুদ্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় অনায়াসে চরম সার্থকতায় অবারিত অমৃত পারাবারের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন, বিপদ-আপদ প্রবল জলস্রোতের মুখে শরবনের ন্যায় মাথা নত করিয়া তাহাকে পথ করিয়া দিয়াছে। অসত্য ও প্রলোভন তাহার দ্বারের নিকট আসিয়াছে কিন্তু পাপের আবর্ত তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। অসত্য হইতে খণ্ডতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ভগবানের পদপ্রান্তে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। এইজন্য তাহার মৃত্যুতে অন্ধকার নাই, অবসান নাই—আছে সৌন্দর্য ও শুভ্রতা, আছে ত্যাগ ও তিতিক্ষা।

একদা বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে ভক্তি ও প্রাণরসের বন্যা সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল সেই যুগের পটভূমিকায় 'নটীর পূজা' রচিত। বৌদ্ধধর্মের রসের প্রস্রবণ যাহা মানুষের জ্ঞানকে ছাড়াইয়া ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছে এবং ভক্তচিত্তকে আনন্দরসে পরিপ্লাবিত করিয়াছে তাহারই ইঙ্গিত এই নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীমতীর পূজার অর্ঘ্য, তাহার চরম আত্মনিবেদন অসীমকরুণাঘন মূর্তি ভগবানের চরণবেদীতলে উৎসর্গিত হইয়াছে। একটি প্রদীপ শিখা যেমন বহু প্রদীপ শিখাকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতে পারে, তেমনি শ্রীমতীর অন্তরের শুদ্ধা ভক্তিও নাটকের অন্য চরিত্রকে প্রভাবিত করিয়াছে। পল্লীবালা মালতী, রাজকিংকরীগণ, অন্তঃপুর রক্ষিণীগণ এবং পরিচারিকারাও নবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই আকর্ষণ যুক্তি বা জ্ঞানদ্বারা প্রভাবিত হইয়া নয়, নবধর্মের তত্ত্ব উপলব্ধির দ্বারাও নয়, তাহারা প্রভাবিত হইয়াছে ভগবান বুদ্ধের অলোক-সামান্য ব্যক্তিত্বের দ্বারা। ভগবান তথাগত শুধু ধ্যানী জ্ঞানীই নহেন, তিনি অসীম করুণাময়ও। তাঁহার এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণাধারা 'জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে।' দুঃখী পাপী তাপীও তাঁহার করুণাধারায় বঞ্চিত হয় নাই। রাজকুমারীগণের ও শ্রীমতীর কথাবার্তায় ভগবানের সেই কারুণ্যের দিকটাই প্রতিফলিত হইয়াছে।

'নন্দা—ভগবানকে দেখতে গিয়েছিলাম আমরা, ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছেন শ্রীমতীকে ওর অন্তরের মধ্যে।

রত্নাবলী—বিনয় ভুলেছ নটী। একথার প্রতিবাদ করবে না?

শ্রীমতী—কেন করব রাজকুমারী ? তিনি যদি আমারও অন্তরে পা রাখেন তাতে কি আমার গৌরব, না তাঁরই ?'[১]

ভগবানের আসন তাঁহার ভক্ত উপাসক উপাসিকার হৃদয়ে হৃদয়ে পাতা। সে আসন অক্ষয়। ধনীর ঐশ্বর্য তাহাকে গড়িতে পারে না। রাজার প্রতাপ তাহাকে ভাঙিতে পারে না। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই শ্রীমতী বলিয়াছে—'কী বলিস মালতী। তাঁর আসন অক্ষয়। মহারাজ বিম্বিসার যা গড়েছিলেন তাই ভেঙেছে। প্রভুর আসনকে কি পাথর দিয়ে পাকা করতে হবে। ভগবানের নিজের মহিমাই তাকে রক্ষা করে।'[২] ভগবানের সেই অক্ষয় আসনই প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে ভক্ত উপাসিকা শ্রীমতীর অন্তরে।

অন্তঃপুর রক্ষিণীরাও তাঁহার করুণাধারার বর্ষণ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। রাজকর্তব্যে নিযুক্তা রক্ষিণীর উক্তি—'তুমি জেনো আমি তাঁর দাসী। যেদিন তিনি এসেছিলেন অশোকছায়ায় সেদিন আমি যে তাঁকে এই পাপচোখে দেখেছি, তারপর থেকে আমার অন্তরে তিনি আছেন'।[৩]—

অন্যত্র—

'রক্ষিণী—আমার মুখে কি পুণ্যমন্ত্র বের হবে ?

শ্রীমতী—ভক্তি আছে হৃদয়ে, যা বলবে তাই পুণ্য হবে। বলো, 'নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়।'[৪]

রাজকর্তব্য পালন করিতে গিয়া সে প্রভুর সেবিকা শ্রীমতীকে আঘাত করিয়াছে, কিন্তু অন্তরের ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে—'প্রভুর ভক্ত সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, সেদিনও আমার প্রণাম।'[৫] প্রভুর সেবিকা শ্রীমতী তাহাদের চোখে শুধু নটীই নয়। তাহার মধ্যে তাহারা দেখিয়াছে 'স্বর্গের আলো'। এই স্বর্গীয় আলোকরশ্মিকে শ্রীমতী শ্রোতা ও দর্শকদের মন হইতে মনে, হৃদয় হইতে হৃদয়ে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে। রাজার প্রতাপ, ক্ষমতাবানের ক্ষমতাগর্ব উপাসিকার অন্তরের ভক্তিকে অপমানিত করিয়াছে। এই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে অজাতশত্রুকে, নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে রাজকুমারী চন্দ্রাবলীকে। অবশেষে রাজার আদেশ অমান্য করিয়া শ্রীমতী তাহার পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়ের উদ্দেশে। এইখানেই ভক্তির নিকট প্রতাপের পরাজয়।

১। নটীর পূজা, পৃঃ ২৮-২৯। ২। ঐ, পৃঃ ৫৪।
৩, ৪। ঐ, পৃঃ ৫৩। ৫। ঐ, পৃঃ ৫৫।

শ্রীমতীর ভক্তিকে অপমানিত করার জন্য চন্দ্রাবলী ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সেই ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হইয়াছে। যে কৌশলে সে শ্রীমতীর ভক্তির প্রতি চরম আঘাত হানিতে চাহিয়াছিল তাহা শ্রীমতীকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। নাটকের অবসানে ভক্তির জয় ঘোষিত হইয়াছে।

'নটীর পূজা' কেবল নারীচরিত্র লইয়া লিখিত নাটিকা। নবধর্মের ভাব বন্যার যুগে নারীর মূল্যায়ন কিভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল এবং 'নটীর পূজা' নাটকের পাত্রীদের চরিত্রে তাহা কতখানি প্রতিভাত হইয়াছে তাহা আলোচনাযোগ্য। বৌদ্ধশাস্ত্র রাহুল-জননী যশোধরার পাতিব্রত্যকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। স্বামী অনাগরিক প্রব্রজিত জীবন গ্রহণ করায় তিনিও রাজবধূর বিচিত্র বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিনীর জীবনব্রত বরণ করেন। সম্বোধি-প্রাপ্ত স্বামী যেদিন কপিলাবস্তু নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন সেদিনও তিনি কোন অভিমান জানাইলেন না। নিরভিমানিনী নারী, অবিচলিতচিত্তে তাঁহার একমাত্র পুত্র রাহুলকে বলিলেন—'রাহুল, ইনিই তোমার পিতা, তাঁহার নিকট তোমার পিতৃধন চাহিয়া লও।'[১] বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনি আদর্শ পত্নী ও আদর্শ জননী। বৌদ্ধসাহিত্য নারীকে এইজন্য গৌরব দিয়াছে—'ইত্থি ভাণ্ডানম উত্তমম।' নারীর প্রয়োজন অপরিহার্য কারণ তাহারই গর্ভে বোধিসত্ত্ব ও পৃথিবীর সাধকেরা জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মানুষ হিসাবে নারীর মর্যাদা বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃত হয় নাই। উপাসিকা, ভিক্ষুণী ব্যতীত খুব কম সংখ্যক নারীর জীবনই বৌদ্ধসাহিত্যে উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষের সহিত জাতকে বহু কাল্পনিক নারী-চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহারা কামতৃষ্ণা ও ভোগবিলাসের প্রতীক। নারীর কামতৃষ্ণা, পাপাচার, লাম্পট্য এবং ব্যভিচারের কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিয়া পুরুষের চিত্তকে নির্বাণাভিমুখী করিতে চাহিয়াছেন। জাতককারদের নারী-বিদ্বেষ এতই প্রবল ছিল যে অসাতমন্ত জাতকে[২] বোধিসত্ত্ব-জননীর চরিত্রেও অবিশ্বাস্য পাপাচার আরোপ করা হইয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রিণী বৃদ্ধার কামতৃষ্ণার যে বিবরণ এইখানে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা শুধু অশোভনই নয়, বীভৎসও, মানুষের রুচিবোধকে তাহা পীড়িত করে।

কিন্তু স্নেহ ও ক্ষমা যাহাদের অপার, সেবা যাহাদের ব্রত সেই নারীর সাধনা, ত্যাগ ও পুণ্যবলকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। পৃথিবীর মহাপুরুষগণ

১। Fausboll, Jātaka, Vol. I, p. 91.
২। Fausboll, Jātaka, Vol. I no. 61.

তাঁহাদের গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই জন্মের সঙ্গে বৌদ্ধসন্ন্যাসীর শুধু বিচ্ছেদ নয়, বিরোধ। কারণ 'রক্তমাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে এঁরা যে নির্মল নূতন জন্মলাভ করেন।' কিন্তু রক্তমাংসের জন্মের সঙ্গে নারীর নাড়ীর বন্ধন, নারী এখানে স্রষ্টী। বৌদ্ধধর্মের ভাববন্যার মুখে দলে দলে পুরুষেরা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেছিল। লোকেশ্বরী দেবীর অভিযান তাহার বিরুদ্ধে। এই সংঘর্ষ সেদিন অনিবার্য ছিল। এইজন্যই লোকেশ্বরী দেবীকে বলিতে শুনা যায়—'আজ খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেম এ ধর্ম পুরুষের তৈরী। এ ধর্মে মা-ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক। স্ত্রীকে স্বামীর প্রয়োজন নাই। যারা না পুত্র, না স্বামী, না ভাই সেই সব ঘরছাড়াদের একটুখানি ভিক্ষা দেবার জন্য সমস্ত প্রাণকে শুকিয়ে ফেলে আমরা শূন্য ঘরে পড়ে থাকব। মল্লিকা, এই পুরুষের ধর্ম আমাদের মেরেছে, আমরাও একে মারব।'[১] নারীর মধ্যে প্রেয়সী, নারীর মধ্যে জননী, চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কাজ করিয়া যাইতেছে। নারীত্বের দাবী, মাতৃত্বের ক্ষুধা নারী জীবনের সহজধর্ম। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের সহজ দাবীকে জীবনরসের বিচিত্র আস্বাদনকে নিঃশেষে অবলুপ্ত করিবার যে সাধনা জীবনধর্মী লোকেশ্বরীদেবীর অন্তর তাহাতে সাড়া দেয় নাই। বৌদ্ধধর্মের অনাসক্তি ও সংসারবিমুখতার বিরুদ্ধে লোকেশ্বরী দেবীর জীবন এক অনন্ত জিজ্ঞাসা। ভগবান বুদ্ধের চরণতলে লোকেশ্বরীদেবী তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রণতি রাখিয়াও সহজাত নারীধর্মের প্রেরণায় বলিয়াছে—'কখনো কখনো বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পুরুষ আপন পৌরুষধর্ম ভুলে যায়, কিন্তু নারীরা যদি তাকে সেটা ভুলতে দেয় তা হলে মরণ যে সেই নারীর।'[২] যে ধর্ম জায়াজননী, কন্যাভগিনীর প্রেম ভালবাসার বন্ধনকে অগ্রাহ্য করিয়া সংসারবন্ধনকে তুচ্ছ করিয়া নির্বাণপ্রাপ্তির অভিমুখে চলে সেই ধর্মের আদর্শ ও ধর্মগুরুর প্রতি অন্তরের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াও সেদিন কোন কোন নারী জীবনের সহজাত সংস্কারের বশে ইহার প্রতি কুণ্ঠা জানাইয়াছে। থেরগাথায় দেখা যায় প্রব্রজ্যাভিলাষী পুরুষকে গৃহবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নারীর কত প্রচেষ্টা। শিশু সন্তানবুকে বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া তাহারা স্বামীকে গৃহবন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছে।[৩] কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি গাথায় স্বামীর চরম অবহেলা ও বিরাগ

১। নটীর পূজা, পৃঃ ৩৫। ২। ঐ, পৃঃ ৩৮।

৩। Thera and Therī Gāthā, P. T. S. p 85; Psalms of the Early Buddhists, pp 15-16, 184, 226.

লাভ করিয়া নারীকে ফিরিতে হইয়াছে। তাহাদের অন্তরের সেই ব্যর্থ প্রেম ও মর্মবেদনাই যেন সমব্যথী কবির লেখনীমুখে লোকেশ্বরী দেবীর জীবনে ও বাণীতে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণার মুখে মহারাজ বিম্বিসারের আগমন সংবাদ পাইয়া অভিমানিনী রাজবধূ বলিয়াছেন—

'মহারাজ বিম্বিসার সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আজ আসবেন। তাঁর ইচ্ছা আমি প্রস্তুত থাকি। তোমরা ভাবছ ওঁর জন্যে সাজব। যে মানুষ ভোগেও নেই, ত্যাগেও নেই, তাকে অভ্যর্থনা! কখনো না।'[১] যে পুরুষ গৃহের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, রাজসিংহাসনের লোভ সংবরণ করিয়াছে, স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধন পরিহার করিয়াছে তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে হইবে তুচ্ছ বসনভূষণের চাকচিক্যে—প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী রাজবধূ লোকেশ্বরীদেবীর অন্তর তাহাতে সাড়া দেয় নাই। থেরগাথায় এক রমণী স্বামীর সংসার পরিত্যাগে গভীর মর্মবেদনায় নিজেও গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীসঙ্ঘে যোগদান করেন।[২] স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত সংসার-জীবন তাহার নিকট একেবারেই নিরর্থক মনে হইয়াছে। মহারাণী লোকেশ্বরীদেবীও জীবনের চরম পরিণতিতে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

নবধর্মের ভাববন্যা যেদিন জাতির প্রাণে নবজাগরণের জোয়ার আনিয়াছিল, সেদিন শুধু পুরুষেরাই নয়, নারীরাও দলে দলে এই শ্রেষ্ঠধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। প্রশ্ন জাগে সেদিনের নারী সমাজ আপন স্বভাব-ধর্মের বিরোধী যে জীবন-পথ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা কি আত্মার মুক্তি কামনায় বা পরিপূর্ণ নির্বাণ লাভের আকাঙ্ক্ষায়, অথবা পিতাভ্রাতা, স্বামীপুত্র-পরিত্যক্ত গার্হস্থ্য জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া। শ্রীমতীর কণ্ঠে কবির প্রশ্ন ধ্বনিত হইয়াছে—'কত মেয়ে ঘর বেঁধেছিল, আজ তারা ঘর ভাঙল। কত মেয়ে চীবর পরে পথে বেরিয়েছে, কে জানে সে কি পথের টানে না পথিকের টানে'?[৩] তাহাদের জন্য সহৃদয় কবির মর্মবেদনাও শ্রীমতীর কণ্ঠে প্রকাশ পাইয়াছে—'কতবার হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করি, বলি, মহাপুরুষ, উদাসীন থেকো না। আজ ঘরে ঘরে নারীর চোখের জল তুমিই বন্যা বইয়ে দিলে, তুমিই তাদের শান্তি দাও'।[৪] মনে হয় পথের টান অপেক্ষা পথিকের টানই ভিক্ষুণীসঙ্ঘ

১। নটীর পূজা, পৃঃ ৩৯।
২। Thera Gāthā Aṭṭhakathā, ed. Woodward, Vol I, p 58.
৩, ৪। নটীর পূজা, পৃঃ ১৯।

প্রতিষ্ঠায় বেশী কার্যকরী হইয়াছে। ভগবানের ধাত্রীমাতা গৌতমী ভিক্ষুণীসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী। তাঁহার একমাত্র পুত্র নন্দ। সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণে, রাজকুমার নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণে নিশ্চয় মাতৃহৃদয়ের সংসারের শেষ গ্রন্থিটিও সেদিন ছিন্ন হইয়াছিল, সেদিন সেই শোকবিহ্বলা মাতার পক্ষে রাজগৃহের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিষবৎ পরিণত হইয়াছিল। তিনি মুণ্ডিতমস্তকে ধূলি ধূসরিত কায়ে পীতবসন ধারণ করিয়া ভগবান বুদ্ধের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় তথাগতের নিয়ম ও ধর্মানুসারে ভিক্ষুণীসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু যিনি বুদ্ধ, তিনিই যে পুত্র সেকথা কি সেদিন গৌতমী ভুলিতে পারিয়াছিলেন? যদি ভুলিতে পারিতেন তবে সন্তান-গর্বে গরবিনী জননী নিশ্চয় লিখিতে পারিতেন না—

মদ্ধতাদি নরিন্দানং, যা মাতা সা ভবণ্ণবে
নিমুগ্‌গাহং তয়া পুত্ত, তারিতা ভবসাগরা।[১]

যে পুত্র একদিন গৌতমীর নারী-জীবনের পরিপূর্ণ সিদ্ধিরূপে তাঁহার মাতৃহৃদয়ের স্নেহের ক্ষুধা ও সেবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছিল সেই পুত্রই পরম পিতারূপে তাঁহার পূজার আসনে আরূঢ় হইল—

অহং সুগত তে মাতা, ত্বং চ বীর পিতা মম।
সদ্ধম্ম সুখদ নাথ, তয়া জাতম্হি গোতম ॥[২]

রাহুলজননী যশোধরা একান্তই পতি অনুরাগিনী। স্বামীর ভালবাসাই তাঁহার জীবন। পুত্রের জন্ম দিবসে এই অনুরাগের বন্ধন কাটিয়া সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলেন। সেদিন এই পতিগতপ্রাণা নারীর হৃদয়ে যে কি গভীর বেদনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কে পরিমাপ করিবে? কিন্তু সত্যধর্ম উপলব্ধি করিবার উপযোগী স্বাধীন চিন্তাধারা তাঁহার ছিল। এইজন্যই একমাত্র পুত্রকে বলিতে পারিয়াছিলেন—'রাহুল ইনিই তোমার পিতা, ইঁহার নিকট তোমার পিতৃধন চাহিয়া লও।' অতঃপর রাজপ্রাসাদের আর কোন্ অবলম্বন তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবে? সেদিন তথাগতের নিয়মানুসারে যে ধর্মচক্র-প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার প্রান্তসীমায় নিজের জন্য একটুখানি আশ্রয় লাভ করিয়া তিনি কৃতার্থ হইলেন।

১। Apadāna (II) Buddha Vaṁsa-Cariyāpitaka, Vol. VII, Khuddaka-nikāya, ed. J. Kashyap, 1959, p. 208

২। ঐ, পৃঃ ২০৩।

ভগবান বুদ্ধের সদ্ধর্মের ছত্রছায়াতলে বহু গৃহিণী, জননী, ভগিনী, বধূ ও কন্যা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় থেরীগাথা ও তাহার ভাষ্যে। কিন্তু সে কিসের আকর্ষণে? দিব্য জ্ঞানচর্যা ও অর্হত্বপ্রাপ্তির আশায় অথবা অহং বিলোপের সাধনার আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া? মনে হয় লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের মহান্ ব্যক্তিত্বের পুণ্যজ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়াই সেদিন নারীরা দলে দলে তাঁহার শরণ লইয়াছিল। মহারাণী লোকেশ্বরী দেবী, পল্লীবালা মালতী, রাজনটী শ্রীমতী তাহাদেরই দলের অন্তর্গত। জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি, তত্ত্বনিষ্ঠা অপেক্ষা করুণার বাণীই তাঁহাদের বেশী আকর্ষণ করিয়াছে। পথের শ্রেষ্ঠত্ব অপেক্ষা পথিকের করুণাঘন শান্তসৌম্য কান্তিই তাহাদের চলার পথে অধিকতর অনুপ্রেরণা দিয়াছে।

মানুষের সাধনা পূর্ণত্বপ্রাপ্তির জন্য, সমগ্রতার জন্য সাধনা। মানুষের পরিপূর্ণত্ব মানুষকে পুত্রত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াও নয়, মাতৃঋণের দাবীকে অস্বীকার করিয়াও নয়। এইজন্য পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়াছিল যে মহামানবের মধ্যে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াও তিনি যে পুত্র সেদিন তিনি কি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পরিয়াছিলেন? ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়া জননী মায়াদেবীকে ধর্মদেশনা প্রদান, গৌতমীকে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় অনুমতিদান ভগবান বুদ্ধের মাতৃঋণের দাবীকে স্বীকৃতি প্রদান করা নয় একথা কে বলিবে? একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন কেন? আনন্দ জানিতেন মাতৃঋণ অপরিশোধ্য। শাস্তাকে বলিলেন—'হে প্রভু, যেহেতু মহাপ্রজাপতি গোতমী ধাত্রীরূপে ভগবান বুদ্ধের বাল্যকালে তাঁহাকে সেবা করিয়াছেন, দুগ্ধপান করাইয়াছেন এবং মাতার মৃত্যুর পর তাহাকে বক্ষঃস্তন্যে বর্ধিত করিয়াছেন; সেই হেতু স্ত্রীলোককে সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তথাগতের নিয়ম ও অনুশাসন পালনপূর্বক সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিবার অনুমতি দান করুন।'[১] ত্রিলোকপূজ্য দেব মনুষ্যের শাস্তা জননী গোতমীর পরম আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করিবার পক্ষে সেদিন আর কোন যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন নাই।

বুদ্ধত্ব সত্য, ভিক্ষুত্ব সত্য, কিন্তু নারী-হৃদয়ের মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্বের মধ্যে কি কোন সত্য নাই? লোকেশ্বরীদেবীর কণ্ঠেও প্রশ্ন ধ্বনিত হইয়াছে—'হায় রে

১। বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৫৩—৫৬।

রক্তমাংস, হায় রে অসহ্য বেদনা! রক্তমাংসের তপস্যা এদের এই শূন্যের তপস্যার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম।' সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াও ভগবান বুদ্ধ তাঁহার পুত্রত্বকে নিঃশেষে ধ্বংস করেন নাই এবং করেন নাই বলিয়াই তিনি পরিপূর্ণ মানব—মহামানব। বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম, নির্বাণমুক্তির ধর্ম। কিন্তু এই নির্বাণমুক্তির পথে যে সাধনা ও তপস্যার প্রয়োজন সেই তপস্যার পথেও নারীর দানকে কেউ কি অস্বীকার করিতে পারিয়াছে? বোধিবৃক্ষমূলে সত্যার্থী গৌতম ছয় বৎসর একাসনে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর নিগ্রহে ও কৃচ্ছ্রতাসাধনে তাঁহার অভীপ্সিত বোধি লাভ করিতে পারিলেন না। অতঃপর বোধিবৃক্ষমূলে কল্যাণীমূর্তিতে সুজাতা দেখা দিল। তাহার হাতের সেবা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য যেদিন নিবেদিত হইল সেইদিন গৌতম কৃচ্ছ্রভগ্ন, তপক্লিষ্ট শরীরে নব বল পাইলেন, সাধনার পথে নূতন প্রেরণা আসিল। তিনি পরমবোধি প্রাপ্ত হইলেন। সেদিন বোধিবৃক্ষমূলে যে মহাসত্য গৌতমের হৃদয়াকাশে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল নারীর মঙ্গলহস্তের পরিচর্যা তাহার আবির্ভাবকে সহজ ও সুগম করিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

চণ্ডালিকা

'চণ্ডালিকা' দিব্যাবদানের অন্তর্গত শার্দূলকর্ণাবদানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাহিনীটি কবি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়াছেন। মূলকাহিনীটি[১] সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডদের জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছেন। একদা তাঁহার শিষ্য আনন্দ শ্রাবস্তীর কোন গৃহস্থের বাড়ী পিণ্ডপাত গ্রহণ করিয়া আরামে ফিরিতেছেন। পথে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি মাতঙ্গদারিকা প্রকৃতির নিকট পানীয় প্রার্থনা করিলেন—

'দেহি মে ভগিনী পানীয়ম্, পাস্যামি।'

প্রকৃতি জানাইল সে অস্পৃশ্যা—'মাতঙ্গদারিকাঽহমস্মি ভদন্ত আনন্দ'। বৌদ্ধেরা জাতিবৈষম্য মানেন না। আনন্দ বলিলেন—

'নাহং তে ভগিনি কুলং বা জাতিং বা পৃচ্ছামি। অপি তু সচেত্তে পরিত্যক্তং পানীয়ম্। দেহি পাস্যামি।'

১। দিব্যাবদানম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, শার্দূলকর্ণাবদানম্, পৃঃ ৩১৪—১৭।

অতঃপর প্রকৃতি আনন্দকে জলদান করিল। আনন্দ জল পান করিয়া প্রস্থান করিলেন। আনন্দের দৈহিক সৌন্দর্যে ও কণ্ঠস্বরে প্রকৃতি মুগ্ধ হইল, সে স্থির করিল—আনন্দকে সে বিবাহ করিবে। তাহার জননী অভিচারতন্ত্রে পারদর্শিনী। মাতার সাহায্যে সে আন্দকে লাভ করিবার সঙ্কল্প করিল এবং এই অভিপ্রায়ে জননীকে বলিল—

আনন্দো নাম শ্রমণো মহাশ্রমণ গৌতমস্য শ্রাবক উপস্থাপকঃ। তমহং স্বামিনমিচ্ছামি। শক্ষ্যসি তমত্র আনয়িতুম্?

তাহার জননী সর্বকামনাবিজয়ী শ্রমণ গৌতমের শিষ্যদের বিষয়ে জানিত। এইজন্য কন্যাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু আনন্দকে লাভ করিতে না পারিলে প্রকৃতি জীবন পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত। অবশেষে জননী আশ্বাস প্রদান করিল—'মা তে পুত্রি জীবিতং পরিত্যজসি। আনয়ামি শ্রমণমানন্দম্'।

জননী তাহার গৃহাঙ্গন গোময় দ্বারা লিপ্ত করিয়া একটি বেদী প্রস্তুত করিল এবং তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ১০৮টি অর্ক পুষ্পে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিল। মন্ত্রপ্রভাবে আনন্দের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চণ্ডালগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। আনন্দকে' আগত দেখিয়া জননী কন্যাকে শয্যা প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিল —'অয়মসৌ পুত্রি শ্রমণ আনন্দ আগচ্ছতি। শয়নং প্রজ্ঞপয়।' প্রকৃতি উৎফুল্লচিত্তে শয্যা প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইল। আনন্দ বেদীর উপর আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে গভীর অনুতাপ জাগ্রত হইল। বিবেকের কষাঘাতে ব্যসনপ্রাপ্ত আনন্দ নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ভগবান বুদ্ধ আনন্দের দুর্দশা বুঝিতে পারিয়া সম্বুদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা শিষ্যকে উদ্ধার করিলেন। সম্বুদ্ধ মন্ত্রটি নিম্নরূপ—

স্থিতিরচ্যুতিঃ সুনীতিঃ। স্বস্তি সর্বপ্রাণিভ্যঃ॥
সরঃ প্রসন্নং নির্দোষং প্রশান্তং সর্বতোঽভয়ম্
ঈতয়ো যত্র শাম্যন্তি ভয়ানি চলিতানি চ॥
তস্মৈ দেবা নমস্যন্তি সর্বসিদ্ধাশ্চ যোগিনঃ।
এতেন সত্যবাক্যেন স্বস্ত্যানন্দায় ভিক্ষবে॥

এই মন্ত্রের প্রসাদে চণ্ডালীমন্ত্র পরাজিত হইল। আনন্দ বিহারে ফিরিয়া আসিলেন। প্রকৃতিও সেই রাত্রে স্নান সমাপন করিয়া শুদ্ধবস্ত্র ও

মুক্তামাল্যাদিতে বিভূষিতা হইয়া শ্রাবস্তী নগরীর প্রাচীরদ্বারে আনন্দের আগমন পথে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। যথাসময়ে আনন্দ ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। প্রকৃতিও তাঁহার পিছনে পিছনে অনুগমন করিল। বিব্রত আনন্দ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবানের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন—

'ইয়ং মে ভগবন্ প্রকৃতির্মাতঙ্গদারিকা পৃষ্ঠতঃ পৃষ্ঠতঃ সমনুবদ্ধা গচ্ছন্তমনু-গচ্ছতি, তিষ্ঠন্তমনুতিষ্ঠতি। যদ্যদেব কুলং পিণ্ডায় প্রবেশামি, তস্য তস্যৈব দ্বারে তূষ্ণীভূতা তিষ্ঠতি। ত্রাহি মে ভগবন্, ত্রাহি মে সুগত।' ভগবান্ আনন্দকে প্রকৃতির কী প্রয়োজন জানিতে চাহিলেন—'কিং তে প্রকৃতে মাতঙ্গদারিকে আনন্দেন ভিক্ষুণা'। প্রকৃতি জানাইল—স্বামিনং ভদন্ত আনন্দমিচ্ছামি।' ভগবান প্রকৃতির মাতাপিতাকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের কন্যা প্রকৃতি আনন্দ ভিক্ষুর প্রতি অনুরক্ত ইহা কি তোমাদের জ্ঞাত। তাহারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিল। ভগবান প্রকৃতিকে জানাইলেন আনন্দকে বিবাহ করিতে হইলে তাহার ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে—'তেন হি প্রকৃতে য আনন্দস্য বেষঃ স ত্বয়া ধারয়িতব্যঃ।' প্রকৃতি তাহাতেও প্রস্তুত—'ধারয়ামি ভগবন্, ধারয়ামি সুগত। প্রব্রাজয়তু মাং সুগত, প্রব্রাজয়তু মাং ভগবন্।' প্রকৃতি মুণ্ডিতমস্তক হইয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিল। ভগবান তাহাকে দেশনা প্রদান করিলেন—'এহি ত্বং ভিক্ষুণি, চর ব্রহ্মচর্যম্।' বুদ্ধের ধর্মের প্রভাবে তাহার চিত্ত সর্বপ্রকার কলুষ হইতে মুক্ত হইল।

অস্পৃশ্যতার রূঢ় যবনিকা যখন মানুষে মানুষে ভেদাভেদের গণ্ডী টানিয়া দিয়াছে সেই তামসিকতার যুগে মহামানব বুদ্ধের আবির্ভাব। বর্ণবৈষম্যের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর ভাঙিয়া তিনি সর্বমানবের মুক্তির বাণী প্রচার করিলেন। তাঁহার নবগঠিত সঙ্ঘের দ্বার আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ শূদ্র জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত হইল। সমাজের পতিত অবনমিতেরা তাঁহার সঙ্ঘে প্রবেশ করিল। জাতিভেদকে তিনি একেবারেই অস্বীকার করিলেন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রাণিগণের জাতিবিভঙ্গ ব্যাখ্যা করিলেন।[১] সুতরাং বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে ভারতের সমাজে, রাষ্ট্রে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সর্ববিষয়ে এক অত্যাশ্চর্য পুনর্জাগরণ দেখা দেয়। ক্ষৌরকার উপালি হইলেন—বৌদ্ধ বিনয়ের শ্রেষ্ঠ

১। সুত্তনিপাত, Fausboll সম্পাদিত, বাসেট্‌ঠ সুত্ত, পৃ ১১২-২১।

ধারক, বুদ্ধের তিনি দক্ষিণহস্ত। রাজার অসন্তোষ অগ্রাহ্য করিয়া বুদ্ধ পতিতা অম্বপালীর অন্ন গ্রহণ করিলেন। বারাঙ্গনা অম্বপালী ভিক্ষুণীশ্রেষ্ঠারূপে স্বীকৃতা হইলেন। স্থবির শীলবান বলিলেন—চণ্ডালগৃহে জন্মিয়াও আমি বুদ্ধের ধর্মপ্রভাবে সর্বমানবের বরণীয় হইয়াছি। কর্মকারপুত্র চুন্দের আমন্ত্রণও বুদ্ধ সানন্দে গ্রহণ করিলেন। দাসদাসীগণকেও তিনি সঙ্ঘে আশ্রয় দিলেন।[১] এইভাবে সর্ববিধ সামাজিক বাধার প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া সেইদিন ভারতবর্ষ সাম্য মৈত্রী মুক্তির আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। বৌদ্ধশাস্ত্র ও কাহিনী সেই স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

শার্দুলকর্ণাবদানে বুদ্ধশিষ্য আনন্দ চণ্ডালকন্যার প্রদত্ত জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছেন। ভারতীয় সমাজে চণ্ডালজাতি চির অস্পৃশ্য, সমাজের বাহিরে তাহাদের স্থান। বর্ণশ্রেষ্ঠগণ তাহাদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করেন না। এই অবদানে অস্পৃশ্যা চণ্ডালকন্যা বৌদ্ধভিক্ষুর পানীয় প্রার্থনায় বিস্মিত হইয়া জানাইয়াছে—'মাতঙ্গদারিকাহমস্মি ভদন্ত আনন্দ।' আনন্দ বলিলেন—'নাহং তে ভগিনি কুলং বা জাতিং বা পৃচ্ছামি। অপি তু সচেত্তে পরিত্যক্তং পানীয়ম্, দেহি, পাস্যামি।' এই সাম্যনিষ্ঠাই বৌদ্ধভিক্ষুকে মহত্ত্ব দান করিয়াছে, বৌদ্ধসঙ্ঘকেও কল্যাণশ্রী মণ্ডিত করিয়াছে। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিকে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার প্রদান করায় রাজা প্রসেনজিৎ ও শ্রাবস্তীবাসী ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়গণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব কেবল প্রকৃতিকে দীক্ষাদান করিয়াই কাজ শেষ করেন নাই, চণ্ডাল জাতির সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহাদি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের সমস্ত বাধাও অপসারিত করিয়াছেন।[২]

১। সামঞ্ঞফলসুত্ত; থেরীগাথা—পুন্নিকা।

২। এখানে বুদ্ধদেব প্রকৃতির পূর্বজন্মের কাহিনী আহরণ করিয়াছেন। পূর্বে ত্রিশঙ্কু নামে এক চণ্ডাল ছিল। সে বেদ, ইতিহাস ও সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিল। তাহার শার্দুলকর্ণ নামে এক পুত্র ছিল। সে পুত্রকেও সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পুষ্করসারীর সর্ব সুলক্ষণা একটি কন্যা ছিল। ত্রিশঙ্কু এই কন্যাটি তাহার পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিল। ফলে ত্রিশঙ্কু ও পুষ্করসারীর মধ্যে জাতিভেদ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। ত্রিশঙ্কু বহুযুক্তিতর্কদ্বারা প্রমাণিত করিলেন ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের মধ্যে জন্মমৃত্যু, দৈহিক গঠন ইত্যাদিতে কোন পার্থক্য নাই। পুষ্করসারী গায়ত্রী, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ত্রিশঙ্কু সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তরদান করিলে শার্দুলকর্ণের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহে আর কোন আপত্তি রহিল না।

মানুষের প্রতি অন্যায় অবিচারে মানবদরদী কবির অন্তরও নীরব অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে। 'চণ্ডালিকা' নাটকে প্রকৃতির জন্ম চণ্ডালগৃহে। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় ফুলওয়ালা তাহাকে ঘৃণা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, দইওয়ালা তাহাকে দই বিক্রয় করে নাই, চুড়িওয়ালা তাহার হাতে চুড়ি পরাইয়া দেয় নাই। কারণ সে অস্পৃশ্যা, তাহার স্পর্শে শুচিতা নষ্ট হয়। নারীকণ্ঠে সাবধানবাণী উচ্চারিত হইয়াছে—

ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ছি,
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি ॥[১]

মানুষের প্রতি এই অবমাননায় কবির অন্তরাত্মা অভিমানে গুমরাইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির কণ্ঠে তিনি যেন বিশ্বনিয়ন্ত্রীকেই প্রশ্ন করিয়াছেন—

জন্ম কেন দিলে মোরে—
লাঞ্ছনা জীবন ভরে—
মা হয়ে আনিলি এই অভিশাপ।
কার কাছে বল করেছি কোন্ পাপ,
বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্যায়।[২]

অবদানে তৃষ্ণার্ত প্রকৃতি জানাইয়াছে—সে চণ্ডালকন্যা, সুতরাং তাহার প্রদত্ত পানীয় অস্পৃশ্য। রবীন্দ্রনাথ তাহার এই মর্মবেদনা আরো সুস্পষ্ট ও সুগভীর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে—
আমি চণ্ডালের কন্যা,
মোর কূপের বারি অশুচি।
তোমারে দেব জল হেন পুণ্যের আমি
নহি অধিকারিণী
আমি চণ্ডালের কন্যা ॥[৩]

কিন্তু বৌদ্ধভিক্ষু তো জাতিভেদ মানেন না। ছোট-বড়, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, আর্য-অনার্য, সকলেই তো বৌদ্ধধর্মের সাম্যমৈত্রীর পতাকাতলে সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া থাকে। এইজন্য নিঃসঙ্কোচে আনন্দ জানাইলেন—

১। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃঃ ৪।
২। ঐ, পৃঃ ৫।
৩। ঐ, পৃঃ ৬,

যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা
সেই বারি তীর্থবারি
যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে
যাহা তাপিত শ্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে
সেই তো পবিত্র বারি
জল দাও, আমায় জলদাও।[১]

বর্ণবৈষম্যের গুরুভার অচল পাষাণের ন্যায় তাহার বুকে চাপা ছিল। শঙ্কায়, ভয়ে, অসম্মানে আজীবন সে অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতেছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুর উদার মহিমায় সেই অচল বাধা আজ অপসারিত হইল। এ যে কত বড় কাজ, কত সাহসের কাজ তাহার তুলনা নাই। প্রকৃতির কণ্ঠে কবি এই মহৎ উদারতার প্রশস্তি গাহিয়াছেন—

তাঁর সাহসের নাই তুলনা।
কেউ যে কথা বলতে পারেনি
তিনি বলে দিলেন কত সহজে—
জল দাও।
ঐ একটু বাণী—
তার দীপ্তি কত ;
আলো করে দিল আমার সারা জন্ম।[২]

সেই সুদূর অতীতকালে বুদ্ধের সার্বভৌম ধর্মের পুণ্যজ্যোতিতে দেশের অবহেলিত অনাদৃত, নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যেও যে জাগরণ আসিয়াছিল প্রকৃতির কণ্ঠে মানবপ্রেমিক কবি তাহারই স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

'চণ্ডালিকা' নাটকের নায়ক ভগবান বুদ্ধের প্রিয়তম শিষ্য ভিক্ষু আনন্দ। লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেবের অন্তরের পুণ্যজ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া যে মণ্ডলীর সৃষ্টি হইয়াছিল আনন্দ সেই মণ্ডলীর সর্ব জনপ্রিয় ও অনন্য সদস্য, শাস্তার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও অনলস সেবা পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ ও একান্ত অনুরাগ এই চরিত্রটিকে একটি অম্লান শুভ্র মহিমা প্রদান করিয়াছে। তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তিনি আদর্শ শিষ্য—বুদ্ধের একান্ত অনুগামী ও পরমপ্রিয় সেবক। নাটকে আনন্দ-চরিত্রের এই বিশেষ দিকটা প্রতিভাত হয় নাই।

১। চণ্ডালিকা, পৃঃ ৬।
২। ঐ, পৃঃ ১৭।

মায়াদর্পণে আনন্দের যে প্রতিচ্ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে তিনি রিপুবিজয়ী সুখদুঃখ তৃষ্ণাজয়ী সাধক আনন্দ নহেন,—চিরন্তন মানবিক তৃষ্ণার কাছে পরাভূত আনন্দ। প্রকৃতির জননীর যাদুবিদ্যার আকর্ষণী গুণ আনন্দের মধ্যে এই চিরন্তন মানবিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করিয়াছে। একদিকে হৃদয়ের কোন অজানিত কক্ষে গুহায়িত চিরন্তন মানবিক কামনা বাসনা, অন্য দিকে কঠিন ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী সাধকের সাত্ত্বিক জীবনব্রত—এই দুয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের চিত্র প্রকৃতির মায়াদর্পণে আভাসিত হইয়াছে। প্রকৃতি তাহার জননীকে জানাইয়াছে—'প্রথম দেখেছি আকাশ জোড়া কুয়াশা, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত দেবতার ফ্যাকাশে মুখের মতো। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে বেরুচ্ছে আগুন। তারপরে কুয়াশাটা স্তবকে স্তবকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল—ফুলে ওঠা ফেটে পড়া প্রকাণ্ড বিষফোড়ার মতো—লাল হয়ে উঠল রঙ। সেদিন গেল, পরের দিন দেখি পিছনে ঘন কালো মেঘ, বিদ্যুৎ খেলছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—জ্বলছে আগুন সর্বাঙ্গ ঘিরে।····· যে পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন আপনাকে তোর অগ্নিনাগিনী ফোঁস ফোঁস করে তাকে ছোবল মারছে, চলছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ।'[১] ধম্মপদে আছে—মনুজস্স পমত্তচারিনো তণ্হা বড্ঢতি মালুবাবিয়।[২] প্রমত্ত মানুষের তৃষ্ণা মালুবা লতার ন্যায় বর্ধনশীল। আনন্দের অন্তরেও আজ অজানিতে যে ভোগতৃষ্ণা মুকুলিত হইয়াছে তাহার দুর্নিবার বেগ প্রতিরোধ করা তাঁহার পক্ষে বুঝি বা অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রকৃতি বলিতেছে—'শুধু দুঃখ দুঃখ দুঃখ। অসীম দুঃখের মূর্তি।'[৩] ভোগতৃষ্ণার কাছে পরাজিত, কামে পর্যুদস্ত সাধকের আত্মগ্লানির কী করুণ চিত্র। এই তৃষ্ণাই মানুষের জীবনে অনন্ত দুঃখ বহন করিয়া আনে। কেননা—

তসিনায় পুরক্খতা পজা
পরিসপ্পন্তি সসো ব বাধিতো,
সঞ্ঞোজনসঙ্গসত্তকা
দুক্খমুপেন্তি পুনপ্পুনং চিরায়।[৪]

তৃষ্ণা-পরিবৃত মনুষ্য জালনিবদ্ধ শশকের ন্যায় বারংবার আবর্তিত হয়। সংযোজনশৃঙ্খলে আসক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখপ্রাপ্ত হয়। অতৃপ্ত তৃষ্ণার সহস্র

১। চণ্ডালিকা, পৃঃ ৩৪-৩৫।
২। ধম্মপদ, তণ্হাবগ্গো, শ্লোক সংখ্যা ১।
৩। চণ্ডালিকা, পৃঃ ৩৫।
৪। ধম্মপদ, প্রাগুক্ত।

নাগিনীর জ্বালাময় দংশনে আনন্দ সময়ে সময়ে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। এই ক্রোধ সেই নারীর প্রতি, যে নারী ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় আজ তাঁহার সমস্ত সাধনার সিদ্ধিকে সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখার স্থায় দহন করিয়া চলিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে প্রলয়ের দেবতা রুদ্রের স্থায় তাঁহার উন্মত্ত ক্রোধ জাগ্রত হইয়াছে। ধ্যানসমাহিত মহাদেবের অন্তরে কামতৃষ্ণা জাগরিত করিতে গিয়া তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ সাধকের জীবনে ক্রোধ পরিত্যাজ্য। বৌদ্ধ-ভিক্ষু আনন্দের সাধনবল ও আত্মশক্তি বজ্রপানি ইন্দ্রকেও হার মানাইয়াছে। যে মন্ত্রশক্তিতে স্বর্গের দেবতার আসন অতি সহজেই টলানো যাইত আনন্দের উপর তাহার প্রভাব কার্যকরী করার জন্য চণ্ডালীকে কী কঠিন মরণান্তিক সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রকৃতির জননী বলিয়াছে—'মন্ত্রের সব অঙ্গ পূর্ণ করেছি—এতে বজ্রপাণি ইন্দ্রকে আনতে পারত টেনে। তবু দেরী হচ্ছে।'[১] সমস্ত মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অব্যর্থ মন্ত্রশক্তি দুর্বল হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃতির জননীর উক্তি—'আর পারছি নে, বাছা। মন্ত্র দুর্বল হয়ে এল, আমার প্রাণ ও শরীর এসেছে অবশ হয়ে।'[২] অবশেষে যাদুবিদ্যার দুর্নিবার আকর্ষণে একদিন তাঁহাকে মন্ত্রশক্তির কাছে—চিরন্তন মানবিক তৃষ্ণার কাছে হার মানিতে হইয়াছে। আনন্দের অন্তরের অন্তঃস্থলে যে কামনা বসনার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহার তাড়নায় তিনি 'বৈশালীর সিংহ দরজা পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে, গভীর রাত্রে। বোধ হয় গোপনে, শ্রমণদের না জানিয়ে। তারপরে কখনো দেখেছি নদী পেরোলেন খেয়া নৌকায়, দেখেছি দুর্গম পাহাড়ে, দেখেছি সন্ধ্যে হয়ে এসেছে মাঠে তিনি একা—দেখেছি অন্ধকারে গভীর রাত্রে বনের পথে।'[৩] আসক্তি ও ধর্মবুদ্ধি, কামনা ও বৈরাগ্য দুইয়ের দ্বন্দ্বে তাঁহার অন্তর্জীবন ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু মোহভঙ্গ হয় নাই। একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। যখন পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার আর শক্তি নাই এবং জীবনে একটা অনিবার্য অমঙ্গল নিশ্চিতপ্রায় তখন সেই আত্মঘাতী মোহে তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছেন। প্রকৃতি জানাইয়াছে—'স্বপ্নের ঘোর আসছে ঘন হয়ে, চলেছেন কোন বিচার না করে, নিজের সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্ব শেষ করে দিয়ে। মুখে একটা বিহ্বলতা দেহে একটা শৈথিল্য—

১। চণ্ডালিকা, পৃঃ ৩৪।

২। ঐ পৃঃ ৪০।

৩। ঐ, পৃঃ ৩৮।

দুই চোখের সামনে যেন বস্তু নেই, নেই সত্যমিথ্যা, নেই ভালোমন্দ আছে চিন্তাহীন অন্ধ লক্ষ্য, নেই তার কোন অর্থ।'[১] অবশেষে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়াছে। সাত্ত্বিকতার শুভ্র আবরণ উন্মোচন করিয়া পরাজয়ের কালিমালিপ্ত ললাটে আনন্দ বাহির হইয়া আসিয়াছেন। আনন্দের সেই সর্বস্ব হারানো ক্লান্ত মলিন মূর্তি দেখিয়া প্রকৃতি শিহরিয়া উঠিয়াছে—'কী ম্লান, কী ক্লান্ত, আত্ম-পরাজয়ের কী প্রচণ্ড বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে। মাথা হেঁট করে এল।'[২]

পালি সাহিত্যে বর্ণিত আনন্দের সহিত একই নামে অভিহিত হওয়ায় সাধারণ্যের চিত্তে 'চণ্ডালিকা' নাটকের নায়ক আনন্দ সম্পর্কে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা অত্যন্ত বেশী। এই অমর চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ শার্দূলকর্ণাবদানের বিষয়বস্তু ও নিজের ভাবকল্পনার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়া 'চণ্ডালিকা' নাটকের নায়করূপে রূপায়িত করিয়াছেন। কিন্তু পালি সাহিত্যের সেই বুদ্ধ-সেবক, শান্ত সমাহিত, সদাপ্রসন্ন আনন্দ 'চণ্ডালিকা' নাটকের নায়ক আনন্দের মধ্যে কতখানি প্রতিভাত হইয়াছেন? সমগ্র জীবন ছায়ার ন্যায় যিনি বুদ্ধের অনুগমন করিয়াছেন সেই শীলবান্ শুদ্ধনির্মল চরিত্র আনন্দ ক্রমবিবর্তনের কোন্ পথে 'চণ্ডালিকা' নাটকের নায়কে রূপান্তরিত হইলেন?

পালি সাহিত্যে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম। এক বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে শাক্যরাজ পরিবারে দুইটি শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। একজন মৈত্রীকরুণার বিগলিত বিগ্রহ শাক্যসিংহ গৌতম অন্যজন তাঁহারই পিতৃব্য অমিতোদনের পুত্র আনন্দ। সম্বোধিলাভের প্রথম বিংশতিবর্ষে সর্ব সময়ের জন্য শাস্তার কোন সেবক ছিল না। একদা ভিক্ষুমণ্ডলীর এক সমবেত সভায় শাস্তা ঘোষণা করিলেন—তিনি এমন একজন পরিচারক চাহেন যিনি সর্ব বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্তী হইবেন। শ্রেষ্ঠ-ভিক্ষুগণ তাঁহাদের আবেদন উপস্থিত করিলেন। কিন্তু শাস্তা কাহারো আবেদনে স্বীকৃত হইলেন না। আনন্দ তখনও একান্তে নীরবে দণ্ডায়মান। শাস্তা প্রশ্ন করিলেন—আনন্দ, তোমার কোন ব্যক্তব্য আছে কি? সলজ্জ কুণ্ঠিতকণ্ঠে আনন্দ জানাইলেন—কাহাকে মনোনয়ন করিতে হইবে সে তো ভগবান ভালোভাবেই জানেন। সেদিন হইতে আনন্দ শাস্তার সর্বক্ষণের উপস্থাপক পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইহার পর পঁচিশ বৎসর এই একান্ত অনুরাগী সেবক দিবারাত্র

১। চণ্ডালিকা, পৃঃ ৩৮-৩৯।
২। ঐ, পৃঃ ৪৫-৪৬।

প্রহরীর স্থায় শাস্তার সেবা করিয়াছেন। নগরে, পল্লীতে, পাহাড়ে, অরণ্যে সর্বত্র ছায়ার স্থায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। কর্তব্যে প্রতিষ্ঠ আনন্দ দিনে সর্বক্ষণ শাস্তার আদেশ পালনের জন্ত প্রস্তুত থাকিতেন। রাত্রেও সুদীর্ঘ দণ্ড ও আলোকবর্তিকাহস্তে নিদ্রিত শাস্তার নিরাপত্তা বিধানের জন্ত গন্ধকুটির চতুর্দিকে নয়বার প্রদক্ষিণ করিয়া নিজেকে জাগরিত রাখিতেন।'[১] শাস্তার প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ, অবিচলিত নিষ্ঠা ও অপরিসীম ভালবাসার পরিচয় বৌদ্ধ সাহিত্যে সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। মহাপরিনির্বাণ আগতপ্রায় হইলে শাস্তার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আনন্দ একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। শাস্তার দেহের প্রতিটি রোগলক্ষণ তাঁহাকে একান্তই কাতর ও বেদনার্ত করিয়া তুলিল। শাস্তা প্রিয় শিষ্যকে শেষ দেশনা প্রদান করিলেন—'বয়ো ধম্মা সংখারা।'

আনন্দ বাগ্মী ও স্মৃতিধর ছিলেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি 'ধম্মভণ্ডাগারিক'—শাস্তা যেখানে যে ধর্মদেশনা প্রদান করিতেন শ্রুতিধর আনন্দ তাহা যথাযথরূপে স্মৃতির পাতায় ধরিয়া রাখিতেন। পালিশাস্ত্রে আছে আনন্দ শাস্তার কথিত প্রতিটি দেশনার প্রথম ষাটহাজার শব্দ ক্রমান্বয়ে প্রতিটি অক্ষর নির্ভুলভাবে স্মরণ রাখিতেন। সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া পঁচিশ বৎসর তিনি ছিলেন 'সেখ' অর্থাৎ আত্মপ্রস্তুতির পথচারী। এই সুদীর্ঘ সময়ে কোন মন্দ চিন্তা তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হয় নাই। শাস্তার প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ ও নিষ্ঠা তাঁহাকে কখনও সত্যভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই।

প্রাচীন বৌদ্ধসঙ্ঘের এই সর্বজনশ্রদ্ধেয়, কর্তব্যনিষ্ঠ, শীলবান, আনন্দকে পরবর্তী সাহিত্যে পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চিত্রিত করা হয় নাই। পালি সাহিত্যে যে আনন্দ, শীলতেজে দীপ্ত, প্রেমে করুণায় পরিপূর্ণ পরবর্তীযুগে 'শার্দুলকর্ণাবদান' গ্রন্থে সেই আনন্দকে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত করিয়া আনন্দ চরিত্রে বিচ্যুতির ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। আনন্দ ঐতিহাসিক পুরুষ, কিন্তু শার্দুলকর্ণাবদানের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে কবিকল্পনার সৃষ্টি। আনন্দ বাস্তব সত্যের গৌরবে পালি সাহিত্যে আসন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু অবদানকার আনন্দ-চরিত্রে বাস্তব সত্যের অনুসরণ করেন নাই, ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে কাল্পনিক সত্যের সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। সম্ভবতঃ

১। Theragathā commentary, Vol. II, p. 121ff.
Manorathapūranī, Vol. I p. 159 ff.

অবদানকার তাঁহার রচনায় ইঙ্গিতের অনুসরণ করিয়াছিলেন। পালি সাহিত্যের আনন্দ-চরিত্রের মানবিক স্পর্শসমুজ্জ্বল ইঙ্গিতসমূহকে একটি কবি-কল্পনার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া শার্দূলকর্ণাবদানের কবি শীলবান আনন্দ-চরিত্রের পরিবর্তে আত্মপরাজয়ে সন্ত্রস্ত, ভোগতৃষ্ণায় তাড়িত আনন্দ-চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। পালি সাহিত্যে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত সেই ইঙ্গিত গুলির পর্যালোচনা করিয়া সেই দর্পণে অবদানের কাল্পনিক আনন্দকে আভাসিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। বৈরাগ্যের কাঠিন্য এবং ব্রহ্মচর্যের কৃচ্ছ্রতার অন্তরালে আনন্দের হৃদয়ে করুণামন্দাকিনী বহমানা ছিল। অন্যের সামান্যতম ব্যথা বেদনায় তিনি বিচলিত হইয়া পড়িতেন এবং তাহার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিতেন। মহাবগ্‌গে আছে—একটি পরিবারে সবাই আনন্দকে খুব ভক্তি করিত। মড়কে সে পরিবারের দুইটি বালক ছাড়া আর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মাতৃপিতৃহীন শিশু দুইটির জন্য আনন্দের কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহাদের বয়স ছিল ১৫ বৎসরের কম। সুতরাং সঙ্ঘে প্রবেশ করাইবারও উপায় নাই। আনন্দ বুদ্ধদেবের বিশেষ অনুমতিক্রমে তাহাদের সঙ্ঘে আশ্রয় দান করিলেন। তাহারা কাক তাড়ানোর কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল।[১] ব্যক্তিগত জীবনেও দুঃখ-আঘাতের সম্মুখীন হওয়ামাত্র তিনি অভিভূত হইয়া-যাইতেন। তিনি যেন নিজেকেও ভুলিয়া যাইতেন। সংসার-বিরাগী ভিক্ষু হইয়াও আনন্দের হৃদয় যে কত কোমল ছিল সংযুত্তনিকায়ে সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। চুন্দ সমমুদ্দেসের নিকট তিনি তাঁহার পরম বন্ধু সারিপুত্তের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। এই শোক-সংবাদে তিনি একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেন।[২] তাহার দেহ ক্রন্দনাবেগে কাঁপিতে লাগিল, বোধশক্তি প্রায় অবলুপ্ত হইয়া আসিল এবং সংসার শূন্যবোধ হইতে লাগিল। ভাষ্যগ্রন্থেও পাওয়া যায় সারিপুত্তের বিয়োগ ব্যথায় আনন্দ মার্জার-তাড়িত মোরগের ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিলেন।২ সে এক অতি করুণ মর্মান্তিক দৃশ্য। তাঁহার বাহিরে ত্যাগ ও অনাসক্তির কাঠিন্য, অথচ অন্তর পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। এইরূপ ধৈর্যচ্যুতি ও শোকাবেগ ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীর জীবনে একেবারেই

১। Vinaya Pitaka, ed. Oldenberg, Vol. 1, p—79

২। সংযুত্তনিকায়, ৫ম খণ্ড, পি. টি. এস. পৃঃ ১৬১ ; থেরগাথা, পি. টি. এস., শ্লোক সং ১০৩৪-৫ ; সারত্থপ্পকাসিনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮০।

অনভীপ্সিত। কিন্তু এইখানেই আনন্দের অনন্যসাধারণত্ব। কঠোরতার আধারে তিনি যেন অফুরন্ত করুণাধারার প্রতীক।

মাতৃজাতির প্রতিও আনন্দের শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও অনুকম্পার বহু নিদর্শন বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। চীবরপরিহিতা ছিন্নকেশা মহাপ্রজাপতী গৌতমী পঞ্চশত শাক্যরমণীসহ ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান তাঁহাদের প্রস্তাব অনুমোদন না করায় ধূলিধূসরিত কায়ে কূটাগারশালার দ্বার প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ব্যাপার জানিয়া আনন্দের কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি শাস্তাকে গৌতমী কর্তৃক মাতৃহীন শিশু সিদ্ধার্থের লালন পালনের বিষয় স্মরণ করাইয়া তাঁহার নিকট মাতৃঋণ পরিশোধের আবেদন জানাইলেন। আনন্দের সেই করুণ মর্মস্পর্শী আবেদন শাস্তার অন্তরকে স্পর্শ করিল। তিনি ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করিলেন।[১] ইহার ফলে নারীদের অন্তর তাহাদের পরিত্রাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্যবোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে বহু কাহিনী পাওয়া যায় যাহা আনন্দের প্রতি মেয়েদের পক্ষপাতিত্ব ও তাহাদের সঙ্গে আনন্দের নৈকট্যের সাক্ষ্য বহন করে। একবার আনন্দ আয়ুষ্মান কস্সপকে ভিক্ষুণীদের ধর্মদেশনা প্রদান করার জন্য আনয়ন করিলেন। তাঁহার দেশনা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুণী থুল্লতিস্সা বলিলেন—'আয়ুষ্মান আনন্দের ন্যায় পরম জ্ঞানীর উপস্থিতিতে ভিক্ষু কস্সপ কি করিয়া নিজেকে ধর্মদেশনা প্রদানের উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন ?[২] উপাসিকাদের মধ্যেও আনন্দের জনপ্রিয়তা অটুট ছিল। সংযুক্তনিকয়ের commentaryতে পাওয়া যায় উপাসিকারাও আনন্দের কাছেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করিতে বেশী পছন্দ করিত[৩]। জাতক commentaryতে[৪] আছে রাজঅন্তঃপুরিকাদের প্রশ্ন করা হয় অষ্ট প্রধান শিষ্যের মধ্যে তাঁহারা কাহাকে আচার্যরূপে পাইতে চাহেন। সকলেই এক বাক্যে আনন্দের নাম প্রস্তাব করেন। এইভাবে ভিক্ষুণী উপাসিকা প্রভৃতির সহিত তিনি ক্রমশঃ এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন

১। বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৫৩-৫৬।
২। সংযুত্ত নিকায়, ২য় খণ্ড, পি. টি. এস. পৃঃ ২১৫ হইতে গৃহীত।
৩। সারত্থপপ্ কাসিনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১০।
৪। Jataka Commentary, Vol 1, p 382

যে এ ব্যাপারে তাঁহার মনেও এক সময়ে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল। তিনি শাস্তাকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

'ভদন্ত, মাতৃজাতির প্রতি আমাদের কিরূপ আচরণ করিতে হইবে?'

—আনন্দ, মাতৃজাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিও না।'

—ভদন্ত, যদি দৃষ্টিপাত করিতে হয় তবে আমরা কি করিব?'

—আনন্দ, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে কথা কহিও না।

—যদি কথা বলিতেই হয়, তবে আমরা কি করিব?

—আনন্দ, কথা বলিতে হইলে সাবধানে সতর্ক থাকিও।[১]

আনন্দের নারী হিতৈষণা সম্পূর্ণ তাঁহার কোমল প্রাণের পরিচায়ক। ইহা কোনরূপ সমালোচনার অপেক্ষা রাখে নাই। এই হিতৈষণাবশে যে সমস্ত কাজ তিনি করিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলি সেইদিনও বৌদ্ধসঙ্ঘ মঞ্জুর করে নাই। এবং তাহার জন্য তাঁহাকে অভিযুক্তও করা হইয়াছিল—কেন তিনি মহাপরি-নির্বাণের পর বুদ্ধদেবের মরদেহ নারীদের প্রথম দর্শন ও প্রণাম করার নির্দেশ দিয়াছিলেন, কেন তিনি মাতৃজাতিকে সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য শাস্তাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধভিক্ষুর জীবন স্নেহ-মায়া-মোহ ও আসক্তি বিজয়ের জীবন। কিন্তু আনন্দ আসক্তি-বিজয়ী পুরুষ ছিলেন না। শাস্তার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। এই আসক্তির প্রাবল্য এত বেশী ছিল বলিয়াই সুদীর্ঘ সময় বুদ্ধের এত নৈকট্য লাভ করিয়া এবং ধর্মদেশনা শ্রবণ করিয়া তিনি পরিপূর্ণতা অর্জন করিতে পারেন নাই। প্রথম সঙ্গীতিতে প্রথমতঃ আনন্দকে এই কারণে গ্রহণ করায় বাধা ছিল যে তিনি তখনও পর্যন্ত 'সেখ' বা শিক্ষানবিশ, অর্হৎ নহেন।

বাস্তবক্ষেত্রে আনন্দ-চরিত্রের এই ঔদার্য ও কমনীয়তা, সারল্য ও সহৃদয়তা এবং মাতৃজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ সৌজন্য ও অনুকম্পা পরবর্তী যুগের কবিকল্পনায় শুধু উপেক্ষিতই হয় নাই, এই বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিই পরবর্তী যুগের লেখকদের আনন্দ-চরিত্রে বিচ্যুতির ইঙ্গিত পরিকল্পনায় প্রণোদিত করিয়াছে। ধম্মপদ অট্‌ঠকথায় আছে আনন্দ তাঁহার অতীতজন্মে কর্মকারপুত্র-রূপে কোন বিবাহিতা নারীর সঙ্গে পাপ সম্পর্কে যুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু গল্পাংশটি যে ভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় ইহা অট্‌ঠকথা

১। দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত, পি. টি. এস. পৃঃ ১৪১।

রচনারও পরে প্রক্ষিপ্ত আকারে কাহিনীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আরো পরবর্তীযুগে শার্দূলকর্ণাবদানের কবি চণ্ডালীর বশীকরণমন্ত্রের শক্তিতে আনন্দের অন্তঃকরণে কামনাবাসনার উদ্রেক করিয়াছেন। শার্দূলকর্ণাবদানে আনন্দ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

'ব্যসনপ্রাপ্তোঽহমস্মি। ন চ মে ভগবান সমন্বাহরতি।'[১]

অট্‌ঠকথার লেখক আনন্দের ন্যায় মহাপুরুষের বর্তমান জীবনকে কালিমালিপ্ত করিয়া কাহিনী রচনার পথ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দের অতীত জীবনকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অবদানকার সোজাসুজি আনন্দের মুখেই তাঁহার পথচ্যুতির স্বীকৃতি দিয়াছেন। এইদিক হইতে আনন্দ-চরিত্রে কবিকল্পনার ক্রমবিবর্তনের একটা ধারা লক্ষ্য করা যায়। পালি সাহিত্যে বর্ণিত আনন্দের রজতশুভ্র চরিত্রপটে একটি মসীবিন্দু হইতেছে ধম্মপদ অট্‌ঠকথার আনন্দের পূর্ব জীবনের পাপকাহিনী। পরবর্তীযুগে আনন্দের বর্তমান জীবনকে কালিমাসম্পাত করা হইয়াছে। এই 'ব্যসনপ্রাপ্ত' আনন্দচরিত্রের উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কতখানি তাহাই বিচার্য। 'চণ্ডালিকা' নাটকের আনন্দ স্থূলভাবে শার্দূল-কর্ণাবদানের আনন্দ-চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আনন্দকে নিজের ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ করিয়া তাঁহার চারিত্রিক উন্নয়ন সাধন করিয়াছেন। অবদানশতকের আনন্দ তাঁহার অবনতি ও অসহায় অবস্থার জন্য পাঠকের কৃপা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। কিন্তু 'চণ্ডালিকা' নাটকের নায়ক আনন্দের করুণাদীপ্ত মূর্তি পাঠকের চিত্তে নূতন গৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মূলে আনন্দ চরিত্রগৌরবে বিশেষ সমৃদ্ধ নহেন। চণ্ডালীর মন্ত্রের প্রভাবে অন্তর কামসংশ্লিষ্ট হওয়ায় তিনি প্রকৃতির বাড়ী আসিয়া হাজির হইয়াছেন। প্রকৃতি তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত করিয়াছে। 'অথ প্রকৃতির্মতঙ্গদারিকা হৃষ্টতুষ্টা-প্রমুদিতমনা আয়ুষ্মত আনন্দস্য শয্যাং প্রজ্ঞপয়তিস্ম।'[২] এই বর্ণনার মধ্যে সংসারবিরাগী ভিক্ষুর জীবনে যে অনভিপ্রেত পরিবেশের ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা শালিনতাবিরুদ্ধ ও রুচিবিরোধী। অবদানে আত্মপরাজয়ের হতাশায় ক্রন্দনরত আনন্দ শাস্তার সমৃদ্ধ মন্ত্রের শক্তিতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। 'চণ্ডালিকা' নাটকের আনন্দ আপন আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সহিত কঠিন যুদ্ধ করিতে করিতে জীবনপথে গমন করিয়াছেন এবং চরমক্ষণে হতাশার অশ্রু মোচন না করিয়া শান্তস্তব্ধ চিত্তে, উদাত্তকণ্ঠে বুদ্ধ বন্দনা আবৃত্তি করিয়া

১, ২। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৫।

শার্দুলকর্ণাবদানের অশোভন পরিবেশে অনির্বচনীয় ভক্তি ও পবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আনন্দ চণ্ডালীমন্ত্রের আকর্ষণীশক্তিতে আত্মজয়ে ব্যর্থ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু পরাজিত হইয়াও দৈবশক্তির সহায়তায় অথবা ভগবান বুদ্ধের সম্বোধিমন্ত্রের প্রভাবে আপনাকে বিপন্মুক্ত করেন নাই। জীবনসংগ্রামে প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যেন বিরাট সহনশক্তি ও আত্মসংগ্রামের জীবন্ত প্রতীক। তাঁহার আত্মশক্তি দেবরাজ ইন্দ্রের ক্ষমতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। এক অজানিত ক্রূর শক্তির কাছে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পরাজয়ের কালিমা তাঁহাকে বরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু আত্মপরাজয়ের চরমক্ষণটিও কামসংশ্লিষ্ট ও অশোভন হইয়া উঠে নাই। আনন্দের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির জননীর মৃত্যু হইয়াছে। এইখানেই সমস্ত আকর্ষণী শক্তি ও অপ্রাকৃত কর্মপ্রচেষ্টার অবসান ঘটিয়াছে। যে অপ্রাকৃত উপদ্রব অশান্তি ও নিদারুণ ধর্মভ্রষ্টতার অভিসম্পাতরূপে আনন্দের জীবনকে নিষ্ঠুর ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছিল বুদ্ধবন্দনায় সেই বিরুদ্ধ পরিবেশে অজানিতে একটা অনির্বচনীয় প্রশান্তির সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। আনন্দ প্রকৃত আত্মজয়ী বীরের ন্যায় অনিবার্য ধ্বংসের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার নীরব করুণাবর্ষণে প্রকৃতির অন্তরও কালিমামুক্ত হইয়াছে।

'চণ্ডালিকা' নাটকের প্রকৃতি চিরন্তন অবরুদ্ধ মানব আত্মার প্রতীক। বাহিরের চাপে, সংকীর্ণ সমাজবিধানে তাহার অন্তরাত্মা পাষাণ চাপা ছিল, আনন্দের আবির্ভাবে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া প্রকৃতি তাহার পরিপূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে সমাজের বিধান যাহা তাহাকে এতদিন তুচ্ছ ক্ষুদ্র আচারের জালে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহা নিতান্তই মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্য। ভোগ ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরও আজ তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হইয়াছে। যে রাজপুত্র সেদিন তাহাকে বরণ করিতে চাহিয়াছিল সেও তাহাকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারে নাই, চিনিয়াছিল শিকার বলিয়া। প্রকৃতির জননী তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছে—'তবু তো শিকার বলেও ঐ মুখ লক্ষ্য করেছিল সে। আর ভিক্ষু, সে কি নারী বলে চিনেছে তোমাকে'। প্রকৃতি জবাব দিয়াছে—'বুঝবে না তুমি, বুঝবে না। আমি বুঝেছি এতদিন পরে সে-ই আমাকে প্রথম চিনেছে। সে বড়ো আশ্চর্য।'[১]

১। চণ্ডালিকা, পৃঃ ১৬-১৭॥

এই স্বীকৃতি লাভ করিয়াই সে নিজের পরিপূর্ণ স্বরূপ ও মহত্তম সত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছে। তাহার আত্মা চারিদিকের সেই রুদ্ধ অবস্থাকে ভাঙিয়া বাহির হইতে চাহিয়াছে। আনন্দ তাহার নূতন জন্মদাতা। সে বলিয়াছে—'আমি যে ওঁর নিজের হাতের নতুন সৃষ্টি'। রাজ ঐশ্বর্যের চাবিকাঠি হাতের নাগালের মধ্যে পাইয়াও সে স্পর্শ করে নাই। তাহার পূর্ব জীবনের গতানুগতিক ধারার মধ্যে, জীবনের সহস্র আড়ম্বরের মধ্যে সে তৃপ্তি পায় নাই। যাঁহার ক্ষণিক আবির্ভাবে তাহার অন্তরাত্মা জাগিয়াছে তাঁহার নৈকট্য লাভ না করিলে জীবনের কোন সার্থকতা নাই, শান্তি নাই। এইজন্যই প্রকৃতি আনন্দের সাহচর্য কামনা করিয়াছে। আত্মার মুক্তিই মানুষের চরম কাম্য। মুক্তিতেই সন্তোষ। আনন্দ প্রকৃতির কাছে সেই মুক্তির বার্তাবাহী দূত—তাহার অবহেলিত, ক্ষুদ্র আচারের পাষাণ প্রাচীরে অবরুদ্ধ অন্তরাত্মার মুক্তিদাতা।

কোন সমালোচক প্রকৃতির আকর্ষণকে 'রূপজ প্রেম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতি কেবল প্রবৃত্তির তাড়নায় আনন্দের সাহচর্য কামনা করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি সমাজের অন্ত্যজশ্রেণী-ভুক্তা। সমস্ত জীবন সে সমাজের কাছে তাহার প্রতিবেশীর কাছে কেবলই অবহেলা ও ঘৃণা পাইয়াছে। মানুষ বলিয়া কেহ তাহাকে স্বীকৃতি দেয় নাই, দিয়াছে তাহার রূপকে। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় তাহার অবহেলিত জীবন ছবি আরো সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। দইওয়ালা, তাহাকে দই বিক্রয় করে নাই, ফুলওয়ালা তাহাকে স্পর্শ করে নাই। সে নিজেও জানে তাহার স্পর্শে জাত যায়, পানীয়ও দূষিত হয়। অবহেলা ও ঘৃণার পেষণে তাহার বৃহত্তর জীবন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ইহাই তো তাহার আত্মার যথার্থ স্বরূপ নয়। জননীকে সে জানাইয়াছে—'আমি আর কোন ভয় করিনে—ভয় করি, আবার যাব থেমে, আবার আপনাকে ভুলব, আবার ঢুকব আঁধার কোঠায়। সে যে মরণের বাড়া'।[১]

অন্যত্র—'যে ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে। অন্ধ করে, মুখ বন্ধ করে সবাই মিলে সেই ধর্ম আমাকে মানিয়েছে। কিন্তু সেদিন থেকে এই ধর্ম মানা আমার বারণ।'[২] সে চাহিয়াছে এই 'অন্ধকারের কোঠা' এই ধর্মবিশ্বাসের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিশ্বব্যাপ্ত মুক্তির সহিত হৃদয়ের আনন্দ-বন্ধনে যুক্ত হইতে।

১। চণ্ডালিকা, পৃঃ ২০।
২। ঐ, পৃঃ ২১।

প্রকৃতির অন্তরাত্মা যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে তাহার মূর্তিমান্ প্রকাশ সে দেখিয়াছে আনন্দের মধ্যে। তাঁহার করুণার স্পর্শে তাহার অবদমিত অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠিয়াছে, সে তাহার আপন স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে—

ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষ্টি
আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম
তোমায় প্রণাম শতবার।
আমি তরুণ অরুণ লেখা,
আমি বিমল জ্যোতির রেখা
আমি নবীন শ্যামল মেঘে
প্রথম প্রসাদবৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম
তোমায় প্রণাম শতবার ॥[১]

মৈত্রী করুণার উদার স্পর্শে সে তাহার জীবনের সত্য স্বরূপটির দর্শন পাইয়াছে, এবং পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি করিয়াছে। সে বুঝিয়াছে সে ঘৃণ্য নয়, তুচ্ছও নয়, তাহারও সেবার অধিকার আছে। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া জননীর সম্মোহিনী বিদ্যার আশ্রয় তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কারণ আনন্দকে অবিলম্বেই তাহার প্রয়োজন। যে মানবিক অধিকার সে লাভ করিয়াছে, যে নূতন আবির্ভাবের আলোয় তাহার আত্মা জাগ্রত হইয়াছে আত্মসমর্পণ দ্বারা তাহাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। অতীত জীবনের অন্ধকার আবর্তে যদি এই আলোক-শিখা নিবিয়া যায় তাহা যে মৃত্যুর বাড়া। বিজয়ী মূর্তিতে আনন্দের গৌরবোদ্দীপ্ত আবির্ভাবই তাহার কাম্য, সম্মোহিনী মন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় যে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তাহা সে কামনা করে নাই। এইজন্যই বৈরাগ্য ও ভোগের দ্বন্দ্বে পরাজিত ক্লান্ত আনন্দকে দেখিয়া দুঃখে ক্ষোভে সে শিহরিয়া উঠিয়াছে।

অবদানকার ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনেই এক হৃদয়াবেগসর্বস্ব, জীবনরসপিপাসু নারীর মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু পরিণতিতে দুইজনের সৃষ্টির দুই রূপ। অবদানে প্রকৃতি চিরন্তন মানবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দের সাহচর্য লাভ করিতে চাহিয়াছে, তাহার

১। চণ্ডালিকা পৃঃ ১৭

প্রেম রূপজ, আকাঙ্ক্ষা তীব্র ও আকর্ষণ দুর্বার। রূপমুগ্ধ ভ্রমরের ন্যায় বৈশালীর পথে পথে ভিক্ষু আনন্দের পিছনে পিছনে সে ফিরিয়াছে, এবং সরল বিশ্বাসে ভগবান বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে আনন্দের প্রতি তাহার আকর্ষণের কথা জানাইয়াছে—

স্বামিনং ভদন্ত আনন্দমিচ্ছামি।[১]

বালিকার এই দুর্বার আকর্ষণের হাত হইতে আনন্দকে রক্ষা করিবার জন্য অবদানকার কৌশলে তাহাকে ভিক্ষুণী সাজাইয়াছেন। এই ভিক্ষুণীর জীবন তাহার স্বেচ্ছাগৃহীত বৈরাগ্যব্রত নয়, অবদানের প্রথমাংশে যে নারী তাহার নবজাগ্রত প্রণয়তৃষ্ণায় দুর্বার শক্তিতে আনন্দকে আকর্ষণ করিয়াছে, শেষাংশে অবদানকার তাহাকে সমস্ত সুখদুঃখ ভালমন্দের উর্ধ্বে অনাসক্তা দেবীপ্রতিমায় পরিবর্তন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি আগাগোড়াই মানবী—প্রেম-প্রীতিভক্তির রসে প্রস্ফুটিত একটি শতদল। পরিদৃশ্যমান্ জগতের রূপরসগন্ধ-শব্দস্পর্শের মধ্য দিয়া স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার সুর ঝঙ্কার শ্রবণ করিতে করিতে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি অনন্ত অসীম চিরসুন্দরের দিকে যাত্রা শুরু করিয়াছে। এই যাত্রাপথের দিশারী আনন্দ। প্রকৃতি তাহার নূতন জন্মদাতার, তাহার আত্মার উদ্বোধকের চরণপ্রান্তে বিনম্র প্রণতি নিবেদন করিয়াছে। পরিণতিতে অবদানকারের প্রকৃতি এবং চণ্ডালিকা নাটকের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্ দুই নারী; অবদানকার মানবীকে কৃচ্ছ্রসাধনার দীপ্তিতে উজ্জ্বল দেবীরূপে সম্মানিতা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ মানবীর মধ্যে ভক্তিপ্রণতা পূজারিণীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অবদানকার লেলিহান কামনার শিখাকে কৌশলে গৈরিকদীপ্ত বেশবাস পরাইয়া মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিতা করিয়াছেন। আর রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রথম জাগ্রত প্রদীপ্ত প্রেমবহ্নিকে পূজার মঙ্গল প্রদীপে পরিণত করিয়া দেবতার চরণে তাহার সর্বরিক্ত প্রণতি নিবেদন করাইয়াছেন। বাহিরে সে অশান্ত, অপরিতৃপ্ত যেন এক সর্বগ্রাসিনী শক্তিরূপিণী। কিন্তু তাহার অন্তরের গূঢ় মর্মস্থলে এক পূজানিবেদনরতা নারী মহত্তম আবির্ভাবের জন্য নিরসনে শান্ত সজলনেত্রে তপস্যা করিতেছে।

'চণ্ডালিকা' সাঙ্কেতিক নাটক। নাটকে প্রকৃতির মায়া-দর্পণে আনন্দের মানসছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রলয়রাত্রি, আকাশজোড়া কুয়াশা, ঘূর্ণিঝড়, বিদ্যুৎ ও পাবকশিখার অবতারণা করিয়া কবি মানবহৃদয়ে যে নিগূঢ়

১। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৬।

তত্ত্ব গুহায়িত তাহাই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতি তাহার জননীকে জানাইয়াছে—'ঐ দেখ, পশ্চিমে জমল মেঘ, ঝড়ের মেঘ'। অন্যত্র—'কী ভয়ঙ্কর দুঃখের ঘূর্ণিঝড়। বনস্পতি শেষকালে কি মড় মড় করে লুটোবে ধুলায়, অভ্রভেদী গৌরব তার পড়বে ভেঙে।' এই ঝড় আনন্দের অন্তর জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্বের দ্যোতক। বৈরাগ্য ও কামতৃষ্ণা, ক্রোধ ও ক্ষমা, সংশয় ও নিষ্ঠা সমস্ত মিলিয়া তাঁহার মনে একটা ঘূর্ণিঝড় তুলিয়াছে। এই ঝড়ের বেগে সম্বিৎহারা অবস্থায় অজানা নিয়তির রহস্যময় হাতে তিনি নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন। পশ্চিম আকাশের ঝড়ের মেঘে কবি আনন্দের অন্তর বিপ্লবের সঙ্কেত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আনন্দের অন্তরের ঝড় কেবল তাহার মনের মায়ামরীচিকামাত্র নহে, নাটকের সাঙ্কেতিকতার মধ্যে যে নিগূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে বৌদ্ধ অভিধম্ম শাস্ত্রের আলোকে সেই রহস্যের আবরণ উন্মোচনের চেষ্টা করা যাইতেছে।

অভিধর্মশাস্ত্রে চিত্তকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—কামভূমিতে বিচরণকারী বা কামাবচারী, রূপভূমিতে বিচরণকারী বা রূপাবচারী, অরূপ-ভূমিতে বিচরণকারী বা অরূপাবচারী, এবং লোকোত্তর ভূমিতে বিচরণকারী বা লোকোত্তরাবচারী। মায়াদর্পণে আনন্দের যে চিত্ত প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা কামাবচার চিত্তের প্রতীক। এই চিত্তের বিষয়—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্য। কামতৃষ্ণা সংযুক্ত হইয়া ইহা উৎপন্ন হয়। কামাবচার চিত্ত অধ্যায়ী, সহেতুক, ইহার প্রতিক্রিয়া অকুশল। অকুশলের হেতু লোভ, দ্বেষ ও মোহ।

মানুষের চিত্ত প্রাকৃত বস্তুর ন্যায়ই শুভ্র, ভাস্বর ও অনঞ্জন। আগন্তুক দোষ দ্বারাই চিত্ত আবিলতাপ্রাপ্ত হয়। পালি সাহিত্যে তাহা 'নীবরণ' বা চিত্তের আবরক ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। নীবরণ পাঁচ প্রকার—'কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, কুকৃত্য ও বিচিকিৎসা। চিত্তের উন্নততর পরিণতিলাভের জন্যই সন্ন্যাস জীবনের এষণা। মানসিক উন্নয়নের পথে পঞ্চনিবরণ সাধকের চিত্তে অন্তরদ্বন্দ্বের সূচনা করে। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা দ্বারা পঞ্চনিবরণকে নিরুদ্ধ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। চণ্ডালিনীর 'সম্মোহিনী মন্ত্র' পঞ্চনিবরণের প্রতীক। আনন্দের নির্মলচিত্ত সম্মোহিনী মন্ত্রের আসব দ্বারা প্রদুষ্ট হইয়াছে।[১] পূর্বের অনাবিল অবস্থা ফিরিয়া

১। তুলনীয়, আগন্তুক দোসেহি উপকিলিটেঠা।

পাইবার জন্য তিনি কাতর হইয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে চিত্তের এই অবস্থা সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্ট করা হইয়াছে।

বারিজোব থলে খিত্তো ওকমোকত উবভ্‌তো
পরিফন্দতিদং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে।[১]

উদকে উদ্ভূত ও স্থলে প্রক্ষিপ্ত মৎস্যের ন্যায় এই চিত্ত মারের রাজ্য অতিক্রম করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। প্রকৃতি তাহার জননীর মায়াদর্পণে দেখিয়াছে—'আকাশজোড়া কুয়াশা, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে দেবতার ফ্যাকাশে মুখের মতো। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে বেরোচ্ছে আগুন, তার পরে কুয়াশাটা স্তবকে স্তবকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল—ফুলে ওঠা ফেটে পড়া প্রকাণ্ড বিষফোড়ার মতো লাল হয়ে উঠল রঙ'।[২] এই আকাশজোড়া কুয়াশা কিসের প্রতীক? ইহা সংশয়ের প্রতীক। জীবনপথে চলিতে চলিতে আজ তিনি এমন একটি জায়গায় আনিয়া উপনীত হইয়াছেন যেখানে পথ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একপথে বৈরাগ্য ও সংযম, অন্যপথে ভোগ ও তৃষ্ণা। কোন্ পথটি অনুসরণীয়? অভিধম্মে এই সংশয় 'বিচিকিৎসা' নামে অভিহিত হইয়াছে। বিচিকিৎসা দ্বিমতি। আনন্দের চিত্ত যখন ঘড়ির পরিদোলকের ন্যায় কুশল ও অকুশলের মধ্যে অহরহ দোলায়মান, কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না সেই অবস্থা কবির বর্ণনায় কুয়াশার রূপকে রস সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আধ্যাত্মিক জীবনে বিচিকিৎসা নিম্নগতির প্রথম অবতরণিকা ও শ্রেষ্ঠ নিবরণ। ক্রমে সংশয় ও বিচিকিৎসার অবসান ঘটিয়াছে—'কুয়াশাটা স্তবকে স্তবকে ছিঁড়ে গেল—ফুলে ওঠা ফেটে পড়া প্রকাণ্ড বিষফোড়ার মতো'।[৩] বৈরাগ্য ও তৃষ্ণার দ্বন্দ্বে তৃষ্ণার জয় হইল—'লাল হয়ে ওঠল রঙ।' লাল রঙ কামতৃষ্ণার প্রতীক। আনন্দের চিত্তে যে অকুশল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার হেতু মোহ। কবির ভাষায় তাহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে—

'যত যাচ্ছে দিন, স্বপ্নের ঘোর আসছে ঘন হয়ে, চলেছেন কোনো বিচার না করে, নিজের সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্ব শেষ করে দিয়ে। মুখে একটা বিহ্বলতা, দেহে একটা শৈথিল্য—দুই চোখের সামনে যেন বস্তু নেই। নেই সত্যমিথ্যা, নেই ভালোমন্দ—আছে চিন্তাহীন অন্ধ লক্ষ্য, নেই তার কোন অর্থ'।[৪] বৌদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত চিত্ত 'মোমূহ চিত্ত' নামে পরিচিত। মোহ কি?

১। ধম্মপদ, চিত্তবগ্গো, শ্লোক সং ২। ২। চণ্ডালিকা, পৃঃ ৩৪।
৩। চণ্ডালিকা, পৃঃ ৩৪। ৪। ঐ, পৃঃ ৩৮—৩৯।

মুয়্হন্তীতি মোহো, মুয়্হন্তি সত্তা এতেনাতি মোহো।' যাহা দ্বারা প্রাণী মুহ্যমান হয় তাহাই মোহ বা অবিদ্যা। ইহা চিত্তের সংশয়, অনিশ্চয়তা বা দোলায়মান অবস্থা। অন্ধকার আলোকের বিরোধী, মোহও চিত্তের কল্যাণ ও সত্যদৃষ্টির প্রতিবন্ধক, মিথ্যাদৃষ্টি ও অজ্ঞতার সহায়ক। অন্ধকার রাত্রি যেমন পৃথিবীকে তমিস্রায় ঢাকিয়া দেয়, মোহও তেমনি প্রজ্ঞা ও সত্যদৃষ্টিকে মুহ্যমান করিয়া রাখে। অগ্নিশিখা দেখিয়া যেমন পতঙ্গ অনিবার্য পরিণতির পথে অগ্রসর হয় মোহাচ্ছন্ন আনন্দও তেমনি 'বৈশালীর সিংহদরজা পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে গভীররাত্রে। বোধ হয় গোপনে, শ্রমণদের না জানিয়ে। তারপরে কখনও দেখেছি নদী পেরোলেন খেয়া নৌকায়। দেখেছি দুর্গম পাহাড়ে, দেখেছি অন্ধকারে গভীর রাত্রে বনের পথে'।[১]

কামাবচার চিত্ত অকুশল চৈতসিকের উৎপাদন ক্ষেত্র। অকুশল চৈতসিক ঔদ্ধত্যের লক্ষণ চিত্তের অশান্তি, অস্থিরতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা। চিত্তকে আনন্দ পুনঃ পুনঃ ত্যাগ ও বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভস্মস্তূপে দণ্ডাঘাত করিলে যেমন ভস্মরাশি ইতস্তত: ছড়াইয়া পড়ে তেমনিভাবে তাঁহার চিত্তও অবলম্বন হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। আগুনের রূপকের সাহায্যে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে—'সৃষ্টির দেবতা, প্রলয়ের দেবতার চেয়ে ভয়ঙ্কর—আগুনকে চাবকাচ্ছেন তাঁর কাজে, আর আগুন কেবলই গোমরাচ্ছে গর্জাচ্ছে···ভাঙছে, জ্বলে উঠছে, গলে যাচ্ছে, ছিটকে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ'।[২] বাত্যাঘাত যেমন তরঙ্গহীন নদীপ্রবাহে প্রবল উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে তৃষ্ণার অভিঘাত আনন্দের চিত্তেও সেই প্রলয় তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছে। অকুশল চৈতসিক তৃষ্ণা মানুষকে সুখ-মরীচিকার ন্যায় হাতছানি দিয়া আহ্বান করে। তাহার আকর্ষণে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে অনিবার্য দুঃখসমুদ্রে তলাইয়া যায়। প্রকৃতি তাহার জননীকে জানাইয়াছে—'পরের দিন দেখি পিছনে ঘন কালো মেঘ, বিদ্যুৎ খেলছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—জ্বলছে আগুন সর্বাঙ্গ ঘিরে।'[৩] ইহা অতৃপ্ত পিপাসার জ্বালা। আনন্দ সর্বদেহে এই জ্বালা অনুভব করিয়াছেন। প্রকৃতি বলিয়াছে—'যে পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন আপনাকে তোর অগ্নিনাগিনী ফোঁস ফোঁস করে তাকে ছোবল মারছে, চলছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ'।[৪] চণ্ডালিনীর অগ্নিনাগিনী তৃষ্ণার সহস্র বাহুর প্রতীক। অগ্নির সহস্র লেলিহান

১। চণ্ডালিকা, পৃঃ ৩৮। ২। ঐ, পৃঃ ৩৬।
৩। ঐ, পৃঃ ৩৪—৩৫। ৪। ঐ, পৃঃ ৩৫।

শিখার ন্যায় আনন্দকে তাহা আষ্টেপৃষ্টে বেষ্টন করিয়াছে'।[১] যে পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন আপনাকে তাহা বৈরাগ্যের ও আত্মসংযমের প্রতীক। আনন্দের অন্তরে বৈরাগ্যের সঙ্গে তৃষ্ণার, ত্যাগের সঙ্গে ভোগের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হইয়াছে। এই আন্তর যুদ্ধে বৈরাগ্যের পরাজয় ও তৃষ্ণার জয় হইয়াছে—'ফিরে এসে আয়না তুলে দেখি আলো গেছে—শুধু দুঃখ দুঃখ দুঃখ, অসীম দুঃখের মূর্তি।' বৌদ্ধ দর্শনেও তৃষ্ণাই পুনর্জন্মের সুতরাং দুঃখের হেতু। তৃষ্ণা ও দুঃখকে এইখানে তৈল ও প্রদীপ শিখার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। তৃষ্ণারূপ তৈলদ্বারাই দুঃখরূপ প্রদীপশিখা প্রজ্বলিত হয়। আনন্দের জীবনেও কবি তৃষ্ণার সেই পরিণতির ইঙ্গিত রাখিয়াছেন—'শুধু দুঃখ দুঃখ দুঃখ, অসীম দুঃখের মূর্তি।'

অকুশল চৈতসিক দ্বেষের প্রকাশ চণ্ডতারূপে। সাধনপথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারিণীর প্রতি প্রবল ক্রোধে আনন্দ অশনির ন্যায় ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিয়াছেন। সেই ক্রোধের অন্তর্দাহের দাবাগ্নি কী ভয়ঙ্কর। প্রকৃতির গানে প্রলয়দেবতার সেই রুদ্ররূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—

হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ঙ্কর,
ওহে শঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর।
হোক জটানিঃসৃত অগ্নিভুজঙ্গম
দংশনে জর্জর স্থাবর জঙ্গম,
ঘন ঘন ঝম ঝম, ঝন নন ঝন নন
পিনাক টঙ্করো।[২]

বিষধর নাগরাজের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ও ভীষণতর তাঁহার এই জাগ্রত ক্রোধ। এই বিষের আগুনের স্পর্শই প্রকৃতির জননীর দেহে লাগিয়াছে। ক্রমে ক্রোধের বহ্নিশিখা আরো ভয়ঙ্কর হইয়াছে। 'মনে হচ্ছিল, থেকে থেকে চোখ লাল হয়ে উঠছে, অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন'।[৩] মহাদেবের উদ্দীপ্ত ক্রোধাগ্নি কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছিল, আনন্দের ক্রোধাগ্নি প্রত্যাবর্তন করিল নিজের দিকে। প্রকৃতি বলিয়াছে—'শেষকালে দেখলেম, তাঁর রাগ ফিরল কাঁপতে কাঁপতে শেলের মতো নিজের দিকে, বিঁধল গিয়ে মর্মের মধ্যে'।[৪]

১। পালি 'জয়মঙ্গল অট্ঠগাথায়' তৃষ্ণাকে সহস্রবাহু ও সসৈন্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।
২। চণ্ডালিকা, পৃঃ ৩৬। ৩, ৪। ঐ, পৃঃ ৩৭।

অস্থির উত্তেজনা ও তৃষ্ণার উদ্বেলিত স্রোতে কাণ্ডারীবিহীন তরণীর ন্যায় আত্মকর্তৃত্ব শূন্য ও অসহায়ভাবে ভাসিতে ভাসিতে তিনি দীর্ঘ পনের দিন পথ চলিয়াছেন—কখনও খেয়া নৌকায় নদীর বুকে, কখনও দুর্গম পাহাড়ে, কখনও নির্জনমাঠে আবার কখনও গভীর অরণ্যের মধ্যে। কুশল ও অকুশলের তীব্র বিক্ষোভে মনে হইয়াছে যে কোন মুহূর্তে তরণী শতখণ্ড হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তারপর এক সন্ধ্যায় তিনি ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত পাটলগ্রামে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চলার পথে সেই 'শেওলা ধরা' বেদী ভগবানের চরণস্পর্শের নীরব সাক্ষী। এইবার স্মৃতির সমুদ্রে আলোড়ন উঠিল। মোহের পর্দা যেন একটু নড়িয়া উঠিল। তিনি 'সেইখানে এসেই হঠাৎ চমকে দাঁড়ালেন।' তাঁহার অন্তরে বুদ্ধানুস্মৃতি জাগ্রত হইল। তিনি 'দুই হাতে মুখ চোখ ঢেকে বসে পড়লেন, স্বপ্ন বুঝি ভাঙল হঠাৎ'।[১] বুদ্ধানুস্মৃতি কুশল চৈতসিক। ইহা তাঁহার অন্তর্দাহে প্রশান্তির তুলিকা বুলাইয়া দিল। কুশল অবলম্বন স্মরণ করিয়া তিনি স্মৃতিবান্ বা সতিবান্ হইলেন। স্মৃতি মানুষের চিত্ত হইতে অবিদ্যা ও তৃষ্ণাকে দূরীভূত করিয়া তাহাকে শমথ বা বিদর্শন অবস্থায় উন্নীত করে, চিত্তের নীবরণাদি অকুশলবৃত্তিকে শান্ত করে, নামরূপ ও সংস্কারধর্মের যথার্থ স্বরূপ—অনিত্য দুঃখ অনাত্মা উদ্ঘাটন করে। বুদ্ধানুস্মৃতিই আনন্দের চিত্তকে মোহমুক্ত করিয়া তাহাকে পথচ্যুতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। প্রকৃতির গৃহে আনন্দকে যখন আমরা দেখি তখন তাঁহার মধ্যে কামতৃষ্ণা-তাড়িত অবিদ্যাচ্ছন্ন আনন্দকে পাই না, পাই বুদ্ধ-প্রশস্তির উদ্গাতা, শীলবান্, স্মৃতিবান্ আনন্দকে। প্রকৃতির কলুষময় উত্তেজনার সর্বগ্রাসী আকর্ষণ তাঁহাকে প্রকৃতির দুয়ারে টানিয়া আনে নাই, আনিয়াছে সমাজের সর্বজন-পরিত্যক্তা ও অবহেলিতা প্রকৃতির অন্তরের গভীর আকৃতি। 'সব্বে সত্তা সব্ব দুক্খা পমুচ্চন্তু—এই মহান্ আদর্শই তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছে। যে করুণা ও অনুকম্পা মানবশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে পর্ণকুটিরে অস্পৃশ্যা শবরীর দুয়ারে টানিয়া আনিয়াছিল, পরিশেষে সেই করুণাই আনন্দের অন্তরে জয়ী হইয়াছে এবং তাঁহাকে অন্ত্যজকন্যা প্রকৃতির দুয়ারে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। যে মানুষ দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার আবেগে দীর্ঘপথ আসিয়াছেন বুদ্ধানুস্মৃতির প্রভাবে চরমক্ষণে সেই মানুষ আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মৈত্রীকরুণায় উদ্ভাসিত হৃদয়ে বুদ্ধস্তোত্র আবৃত্তি করিয়া প্রকৃতিকে তিনি বৃহত্তর জীবনপথে আহ্বান

১। চণ্ডালিকা, পৃঃ ৩৯।

করিয়াছেন। নাটকের পরিসমাপ্তিতে বুদ্ধ-প্রশস্তি এই ইঙ্গিতই বহন করে যে আনন্দের জীবনে ছন্দপতনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পরিসমাপ্ত হইয়াছে এবং প্রকৃতির দেহপাত্রে উচ্ছ্বসিত কামনার মদিরা পূজার নৈবেদ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে।

মালিনী

'মালিনী' নাটকের উৎস বৌদ্ধসাহিত্যের 'মহাবস্তু' অবদানের অন্তর্গত মালিন্যাবস্তু। গ্রন্থটি বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষায় রচিত। নিম্নে সংক্ষেপে মালিন্যাবস্তুর কাহিনী বিবৃত হইল।

প্রত্যেকবুদ্ধ গ্রামে আহার্যবস্তু না পাইয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে গ্রাম হইতে বহির্গত হইলেন দেখিয়া কোন শ্রদ্ধাসম্পন্ন গ্রামিক তাঁহার পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেন। এই গ্রামিকের দুহিতা শুচি শুভ্রবসনযুক্তা হইয়া সম্বুদ্ধের সেবা করেন। এই সুকৃতির ফলস্বরূপ এই আচারগুণসম্পন্না দুহিতা ত্রয়স্ত্রিংশ-দেবলোকে সর্বাঙ্গশোভনা অপ্সরারূপে জন্মগ্রহণ করেন। আবার তথা হইতে তিনি কৃকি রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন—

তেতো তাসাং চ্যবিত্বান দেবকন্যা মহর্ধিকা
রাজ্ঞো কৃকিস্য ভার্যায় কুক্ষিস্মিং উপপদ্যিথ।[১]

এই কন্যার নাম মালিনী। মালিনী অনিন্দ্যসুন্দরী এবং রাজকন্যাদের মধ্যে অনন্যা ছিলেন—

…অতিবর্ণা, অতিরূপবতী অভূৎ
শ্রেষ্ঠা চ রাজকন্যানাং ধীতা সা কাশিরাজিনো।[২]

কাশীরাজ কৃকি ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কন্যাকে ব্রাহ্মণ সেবায় নিযুক্ত করিলেন। পিতার আদেশে মালিনীও বিংশতি সহস্র ব্রাহ্মণকে সর্বকাম্যবস্তু দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রিয়দমনে অসমর্থ ছিলেন। তাঁহারা রাজকন্যার অনুপম রূপ-লাবণ্যদর্শন করিয়া 'রাগগ্রসিতচিত্তাশ্চ উল্লপন্তিপুনর্পুনঃ।' ব্রাহ্মণদের এই অভব্য আচরণ রাজনন্দিনীকে তাহাদের প্রতি বিমুখ করিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—ইহারা দক্ষিণার্হ হইবার যোগ্য নহেন—'ন ইমে দক্ষিণারহা'। এই সময় প্রাসাদশীর্ষ হইতে মালিনী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা 'বাহিতপাপাং অন্তিমশরীরাং' এবং

১। মহাবস্তু অবদানং, রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, মালিন্যাবস্তু, পৃঃ ৩৯১।
২। ঐ, পৃঃ ৩৯২।

'বিশারদা, অগ্রপণ্ডিতালোকে'। তাঁহাদের পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত, তাঁহারা শেষবার শরীরধারী এবং বিশারদ ও পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে গণনীয়। রাজকন্যার আমন্ত্রণে ভিক্ষুসঙ্ঘ রাজপ্রাসাদে তাঁহার শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিলেন। মালিনী ভিক্ষুসঙ্ঘের মুখে লোকনাথ কাশ্যপকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কাশ্যপও রাজনন্দিনীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। পর দিবস মালিনী সর্বপ্রযত্নে সশ্রাবক কাশ্যপের সেবা করিলেন। ভগবানও তাঁহাকে ধর্মদেশনা প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। মহারাজ কৃকির রাজপ্রাসাদে যে বিংশতি সহস্র ব্রাহ্মণ এতদিন নিত্য আহার্য ও সেবা পাইতেন তাঁহারা অপমানিত ও কুপিত হইয়া মালিনীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রতি মালিনীর অবজ্ঞা এবং শ্রাবকসঙ্ঘের প্রতি তাঁহার আচরণের বিষয় রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা রাজার নিকট মালিনীকে পরিত্যাগ করার জন্যও দাবী জানাইলেন—

'যদি তে ব্রাহ্মণ্যং অপরিত্যক্তং মালিনীং পরিত্যজাহি। অথ তে মালিনী অপরিত্যক্তা নাস্তিতে ব্রাহ্মণ্যং।'[১] রাজা স্বীয় কন্যাকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বলিলেন—আপনাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী হউক। 'যথা ব্রাহ্মণ পরিষায়ে অভিপ্রায়ং তথা ভবতু।'[২] মালিনী পিতাকর্তৃক ব্রাহ্মণহস্তে পরিত্যক্তা হইলেন। পিতৃ পরিত্যক্তা মালিনীকে দূত সমব্যভিহারে ব্রাহ্মণসভায় উপস্থিত করা হইল। মালিনী পিতাকে বলিলেন—

ইয়ং মহারাজ মালিনী।[৩]

পিতা অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে কন্যাকে ব্রাহ্মণদের হস্তে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। মালিনী মৃত্যুকাল সমাগত জানিয়া একসপ্তাহ সময় প্রার্থনা করিলেন। স্থির হইল সপ্তাহ অন্তে তাঁহাকে বধ করা হইবে। মালিনীর ইচ্ছা এই সপ্তদিবারাত্র যেন ব্যর্থ হইয়া না যায়। তিনি রাজপ্রাসাদে গিয়া প্রথম দিবসে মাতাপিতার মধ্যগত হইয়া ভগবান কাশ্যপসহ ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন করাইলেন। আহারান্তে শাস্তা রাজা ও রাজ অন্তঃপুরের সকলকে ধর্মকথা শ্রবণ করাইলেন। দ্বিতীয় দিবসে ভগবান পাঁচশত রাজপুত্রকে দীক্ষা দিলেন, তৃতীয় দিবসে রাজার পরিজনগণ শাস্তার দেশনা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিল, চতুর্থ দিবসে

১, ২। মহাবস্তু অবদানং, রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯।
৩। ঐ, পৃঃ ৪০০।

রাজার অমাত্যবর্গ, পঞ্চমদিবসে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সেনাগণ, ষষ্ঠ দিবসে রাজাচার্য এবং সপ্তম দিবসে নগরবাসিগণ কাশ্যপের নিকট দীক্ষিত হইলেন। এইভাবে সাতদিনের মধ্যে কাশীরাজ ও তাঁহার মহিষী, পাঁচশত রাজকুমার, প্রধান অমাত্য ও শ্রেষ্ঠ সেনানায়কগণ, রাজাচার্য এবং সমগ্র নগরবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—'অস্মাকং মালিনী কল্যাণমিত্রা মালিনীমাগম্য অস্মাকং সর্বধর্মেষু ধর্মচক্ষুর্বিশুদ্ধং'।[১] আমাদের নিজেদের জীবনের বিনিময়েও তাহাকে বাঁচাইতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা মালিনীর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। এইবার ব্রাহ্মণগণ ভীত হইয়া মালিনীর উপর প্রদত্ত দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিলেন; এবং শ্রাবকসজ্ঘসহ কাশ্যপকে বিনাশ করিবার জন্য লোক নিয়োগ করিলেন। কিন্তু যাহারাই তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য গমন করিল তাহারাই ভগবানের মৈত্রীর প্রভাবে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল এবং বিরুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল—'ভগবাং কাশ্যপো সম্যক্‌সংবুদ্ধো মহাত্মা মহাকারুণিকো লোকস্যানুগ্রহপ্রবৃত্তো'।[২] সুতরাং আপনারা তাঁহার কোন ক্ষতি না করিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করুন। কিন্তু বিদ্বেষপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না এবং ভগবান কাশ্যপকে বিনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। ভগবান পৃথিবী দেবতাকে আহ্বান জানাইলেন। পৃথিবী দেবতা একটি বৃহৎ তালবৃক্ষ স্কন্ধে ব্রাহ্মণদের দিকে ধাবমান হইলে 'তে ব্রাহ্মণা ভীতা নাশনষ্টাঃ'।[৩] ইহাই মালিন্যাবস্তুর গল্পাংশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মালিনী' নাটকে ইহার কতখানি গ্রহণ করিয়াছেন এবং কতখানি বর্জন করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

'মালিনী' নাটকে রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধ অর্হৎ কাশ্যপের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ভিক্ষু তাঁহাকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহার দেশনা—সুখ-আশা, দুঃখভয়, বিষয়তৃষ্ণা, সংসার আসক্তি—এই সব কিছু পরিহার করিতে হইবে। প্রমোদ চঞ্চলতা বর্জন করিয়া রাত্রিদিন চিত্তকে প্রশান্ত প্রজ্ঞার আলোয় পরিপূর্ণ রাখিতে হইবে। কিন্তু মালিনী যে সংসার-চক্রে আবদ্ধ সুখ সম্পদের সহস্র জালে মৃত জড়প্রায়। সে জানাইল—

১। মহাবস্তু অবদানং, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৩।
২। মহাবস্তু অবদানং, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৫।
৩। ঐ, পৃঃ ৪০৭

ভগবান রুদ্ধ আমি, নাহি হেরি চোখে,
সন্ধ্যায় মুদ্রিত দল পদ্মের কোরকে
আবদ্ধ ভ্রমরী—স্বর্ণরেণুরাশি মাঝে
মৃত জড়প্রায়।[১]

গুরু তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন—

জ্ঞানসূর্য উদয় উৎসবে
জাগ্রত ও জগতের জয়জয় রবে
শুভলগ্নে সুপ্রভাতে হবে উদ্‌ঘাটন
পুষ্পকারাগার তব।[২]

অবশেষে সেই মহাক্ষণ আসিয়াছে। অকস্মাৎ এক নূতন আলোক-বন্যায় তাঁহার অন্তর প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। গুরুর আশীর্বাদে তাঁহার জীবনে এক মহাক্ষণ আগতপ্রায়—

আশীর্বাদ করিলাম, অবসান হবে
বিভাবরী—……
সেই মহাক্ষণ
এসেছে নিকটে।[৩]

কিন্তু মালিনী তাঁহার এই সৌভাগ্য একা ভোগ করিতে চাহেন না। নবধর্মের আলো তিনি রাজপ্রাসাদে ও রাজ্যের সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে চাহেন। সমগ্র বিশ্বের আহ্বান যেন তাঁহার হৃদয়-দুয়ারে আজ হানা দিয়াছে—

ব্যথা সম
কী যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারংবার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে।[৪]

বিশ্বের গৃহহীন যাত্রীদের নৌকার কর্ণধার তাঁহাকে হইতে হইবে। এইজন্য নিয়ত তিনি স্বপ্নে জাগরণে তাঁহার এই বিশেষ দায়িত্ব চিন্তায় উদ্বিগ্ন। এদিকে সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা এই নবধর্মকে চাহেন না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম আচার অনুষ্ঠান যাগযজ্ঞ এবং ক্রিয়াকাণ্ডের উপর

১। মালিনী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৩, পৃঃ ১১।
২, ৩। ঐ, পৃঃ ১২।
৪। ঐ, পৃঃ ১২—১৩।

সর্বপ্রকার প্রাধান্য দিয়াছে। সনাতন ধর্মের শাশ্বত সত্যকে বিসর্জন দিয়া তাঁহারা ধর্মের কেবল আঙ্গিকের দিকটাকেই বড় করিয়া লইয়াছে। সুতরাং মালিনীর নবধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়াই স্বাভাবিক। ধর্মনাশ আশঙ্কায় ব্রাহ্মণের দল এক হইয়া রাজার নিকট রাজকন্যার নির্বাসন দাবী করিয়াছেন—

প্রজাগণ

ক্ষুব্ধ অতিশয়। চাহে তারা নির্বাসন
মালিনীর।[১]

রাজকন্যা মালিনী দীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সমস্ত দুঃখকে বরণ করিয়া রাজপ্রাসাদের ভোগ ঐশ্বর্যকে, চতুর্দিকের সুখের প্রাচীরকে এক মুহূর্তে ভাঙিয়া দিয়া বহির্বিশ্বে ছুটিয়া গিয়াছে। আজ সে সুখলালিতা রাজকন্যা নহে,—অগ্নিময়ী মহাবাণী।

কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুত—যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি।[২]

ব্রাহ্মণগণ যখন প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তির উদ্বোধনের জন্য প্রার্থনারত এমন সময় মন্দির প্রাঙ্গণে মালিনী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে, তাঁহার নেত্রের স্নেহ জ্যোতিতে, এবং চিত্তের ক্ষমা ও করুণায় ব্রাহ্মণবিদ্রোহ এক মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা শতকণ্ঠের জয়ধ্বনিতে নির্বাসিতা রাজকন্যাকে রাজপ্রাসাদে রাখিয়া আসিলেন। এই পর্যন্ত মূল কাহিনীর সঙ্গে কতকটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

অবদানে কাশ্যপ-শিষ্যা মালিনীর নির্বাসনদণ্ড তাহার পিতাও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুখলালিতা রাজকন্যা অপরিচিত পৃথিবীর বুকে নির্বাসিতা হইবেন। পিতার অতি সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া মালিনী বলিল—

ইয়ং মহারাজ মালিনী।

'মালিনী' নাটকেও ব্রাহ্মণ্য বিদ্রোহের এক চরম মুহূর্তে রাজকন্যা মালিনী মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন—

'আমি আসিয়াছি।'

১। মালিনী, পৃঃ ১৮। ২। ঐ, পৃঃ ২২।

অবদানে মালিনী অন্তঃপুরবাসীদিগকে এবং রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীদিগকে কাশ্যপের দ্বারা আর্যধর্মে দীক্ষিত করাইয়াছেন। তাহাদের নিকট তিনি কল্যাণমিত্র—উপকারী বন্ধু, নাটকে এই গুরুতর কাজের দায়িত্ব মালিনী নিজেই বহন করিয়াছেন। রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীদের প্রাণের অমৃত পিপাসা মিটাইবার দায়িত্ব সে নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে—

অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের পরে
অনন্ত প্রবাহে।[১]

অবদানে মালিনী তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা নির্বাসন মুক্তি লাভ করিয়াছে। নাটকের মালিনী যেন আলোকপ্রতিমা। তাঁহার আবির্ভাবে ব্রাহ্মণগণ অভিভূত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্কর কবির নিজস্ব সৃষ্টি। অবদানের অনুকম্পাপরায়ণ নাগরিকবৃন্দ যাহারা নিজের প্রাণের বিনিময়ে মালিনীকে বাঁচাইতে চাহিয়াছে নাটকের সুপ্রিয় যেন তাহাদেরই প্রতিভূ। নাটকে সে মালিনীর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছে—

পথ আছে শত লক্ষ শুধু আলো নাই ;
ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী—তাই আমি চাই
একটি আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে।[২]

ক্ষেমঙ্কর ব্রাহ্মণ্যতেজের জীবন্ত বিগ্রহ। সেই তেজ যেমনি প্রলয়ঙ্কর তেমনি অপরূপ মহিমায় ভাস্বর। অবদানে অর্হৎ কাশ্যপ যে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বধ করিতে আসিয়াছে তাহাদের ক্ষমা ও মৈত্রীর দ্বারা জয় করিয়াছেন। নাটকে মালিনী হিংসা দ্বেষহীন কল্যাণধর্ম দ্বারা বিরোধী ব্রাহ্মণ সমাজকে অভিভূত করিয়াছেন। উভয়ক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতাই মালিনী চরিত্রের প্রধান অবলম্বন। নাটকের শেষ পরিণতিতে নবধর্মের প্রতি তাঁহার সেই অমোঘ আকর্ষণ হ্রাস পাইয়াছে। অবদানে নবধর্মের প্রতি মালিনীর

১। মালিনী, পৃঃ ৩৬।
২। ঐ, পৃঃ ৫৫।

বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত অবিচলিত রহিয়াছে। কিন্তু নাটকে নবধর্ম মালিনীর মনে একটা ক্ষণস্থায়ী আলোড়নমাত্র আনয়ন করিয়াছে।

মহাবস্তু অবদানে মালিনী প্রত্যেক বুদ্ধের স্তূপে একটি রত্নমালা সমর্পণ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছেন—আমি প্রতি জন্মে যেন এইরূপ রত্নমালা শোভিত হইয়া জন্মগ্রহণ করি—

এতাদৃশী মে শিরসি ভোতু মালা যথা অয়ং।
যত্রযত্রোপপদ্যেহং তত্র মেতং সমৃধ্যতু ॥[১]

কৃকি রাজার প্রাসাদেও সে স্বর্গচ্যুত দেবকন্যা—সুন্দরী, রমণীয়া, দর্শনীয়া এবং মস্তকে একটি বহুমূল্য রত্নমালায় সুশোভিতা। এই জন্যই তাহার নাম হইয়াছিল মালিনী। নাটকেও কবি মালিনী চরিত্রে তাঁহার এই পূর্ব গৌরব ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এখানেও মালিনী যেন স্বর্গভ্রষ্টা দেবকন্যা। জননীর কাছে সে সামান্য বালিকামাত্র নহে—সে দীপ্ত অগ্নিশিখা—

আমি কহিলাম আজি শুনি লহো কথা—
এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন দেবতা
এসেছে তোমার ঘরে।[২]

বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণও দয়াময়ী বিশ্বজননীরূপে তাহার স্তুতি করিয়াছেন—

এসো, এসো মা জননী,
শতচিত্ত শতদলে দাঁড়াও অমনি
করুণামাখানো মুখে।[৩]

সৈন্যগণ ও প্রজাগণের সমারোহের মধ্যে মালিনী যেন সমুদ্রমন্থনে আবির্ভূতা বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মী আলোকপ্রতিমা—

সমুদ্রমন্থনে যবে
লক্ষ্মী উঠিলেন—তাঁরে ঘিরি কলরবে
মাতিল উন্মাদনৃত্যে উর্মিগুলি সবে,
সেই মতো উচ্ছ্বসিত জনপারাবার
মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা।[৪]

১। মহাবস্তু অবদানং, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৯
২। মালিনী, পৃঃ ১৯।
৩। ঐ, পৃঃ ৩৫।   ৪। ঐ, পৃঃ ৫০।

অবদানে এই পুণ্যবতী বালিকা পিতার স্নেহধন্যা, পরিজনদের প্রিয়পাত্রী এবং সমগ্ররাজ্যের কল্যাণমিত্র, নাটকেও সে পিতার স্নেহপুত্তলী, মাতার অঞ্চলের নিধি এবং পুরবাসীর নিকট লোকমাতা বিগ্রহিনী দয়া। নবধর্মের সর্বজীবে মৈত্রী ও ক্ষমার আদর্শ মালিনীর অন্তরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। যে বিপ্রগণ তাহার নির্বাসন দাবী করিয়াছে তাহাদেরই সঙ্গে সমদুঃখের অধিকার সে মাথায় তুলিয়া লইতে চাহিয়াছে—

শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের সব পরিচয়
তোমাদের সাথে।

আবার সুপ্রিয়ের নিকট যখন জানিয়াছে ক্ষেমঙ্কর তাহার চরম ক্ষতি সাধনের জন্য অভিযান করিয়াছে তখনও পরম শত্রুর প্রতি তাহার বিদ্বেষ জাগ্রত হয় নাই। তাহার মধ্যে নবধর্মের মৈত্রীকরুণায় গরীয়ান এক বিরাট হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর যখন ক্ষেমঙ্করের আঘাতে সুপ্রিয় মৃত্যুবরণ করিয়াছে তখনও সে বলিয়াছে—'মহারাজ ক্ষমো ক্ষেমঙ্করে'। এই মহৎ উদারতা সে নবধর্মের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে। হিংসাকে অহিংসায়, ক্রোধকে অক্রোধে জয় করিতে হইবে,—নবধর্মই তাহার অন্তরে এই প্রেরণা জাগ্রত করিয়াছে। অহিংসাকে সে কেবল তত্ত্বরূপেই গ্রহণ করে নাই, গভীরতম অনুভূতিরূপে বাস্তব জীবনে তাহার শুভ উদ্বোধন করিয়াছে।

রাজগৃহের সুখসম্পদের মধ্যে তাহার জন্ম হইলেও বিশ্বের দুঃখী ব্যথাহত মানুষের আহ্বান তাহাকে রাজ অন্তঃপুরের শতভিত্তি অন্তরালে স্থির থাকিতে দেয় নাই, বৃহৎ সংসারের আহ্বানে রাজকুমার সিদ্ধার্থের ন্যায় একমুহূর্তে সমস্ত ভোগসুখ তুচ্ছ করিয়া সে বহির্বিশ্বে পা বাড়াইয়া দিয়াছে—

জন্ম লভিয়াছি রাজকুলে
রাজকন্যা আমি—কখনো গবাক্ষ খুলে
চাহিনি বাহিরে; দেখি নাই এ সংসার
বৃহৎ বিপুল—কোথায় কি ব্যথা তার
জানি না তো কিছু। শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের সব পরিচয়
তোমাদের সাথে।[১]

১। মালিনী, পৃঃ ৩৫।

সত্যধর্মের স্পর্শে নবপ্রবুদ্ধ মালিনী এক মুহূর্তে নিজেকে সকলের জন্য, পরের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে, রাজ অন্তঃপুরে সমগ্র রাজ্যকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছে—

মা আমার
এ প্রাচীরে মোরে আর নারিবে লুকাতে
তব অন্তঃপুরে আমি আনিয়াছি সাথে
সর্বলোক—দেহ নাই মোর, বাধা নাই,
আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ।'[১]

মনে হয় অবদানের কৃতপুণ্যা মালিনীই যেন তাহার কল্যাণকর্মের সুকৃতিস্বরূপ আর এক জন্মে কবির কাব্যে আবার মালিনী নামে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

'মালিনী' নাটকের নবধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে এই সময়ে কবি যে গভীর অনুধ্যানে রত ছিলেন তাহা প্রকাশ করা প্রয়োজন। তিনি লিখিয়াছেন—'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরী-শঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকার হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে নি। কোন দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। সত্য যার স্বভাবে যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবে এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।'[২] ধর্মের এই গভীরতম অনুভূতির ও তাহার সর্বাত্মক মানবমুখিনতার উপর মালিনীর নবধর্মের প্রতিষ্ঠা। গতানুগতিক আচারনিষ্ঠা, বাহ্যিক আড়ম্বর ও পৌরাণিক জটিলতা হইতে মুক্ত হইয়া নবধর্ম মানুষের প্রতি প্রেম ও করুণার সার্থক পথিকৃৎরূপে 'মালিনী' নাটকে চিরবন্দিত হইয়াছে। নবধর্ম আনুষ্ঠানিক ধর্মের জটিলতাবিহীন, অহিংসায় বিশ্বাসী, প্রেম ও বিশ্ব সেবায় আগ্রহী। নবধর্মের ভিত্তি ভগবান বুদ্ধের করুণা ও ক্ষমা, মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক ধর্ম-বিশ্বাসের রুদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে রাজকুমারী মালিনীর জন্ম কিন্তু আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব শাস্ত্রের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ নাই। জগতের

১। মালিনী, পৃঃ ৫০।
২। ঐ, সূচনা পৃঃ ৬।

দুঃখতাড়িত মানুষের ব্যথা দূর করিবার জন্য সে একটা তীব্র প্রেরণা অনুভব করিয়াছে। অপরিমেয় করুণার অনুভূতিরূপে নবধর্ম তাহার অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম—'শাস্ত্রের ধর্ম নয়—আবির্ভূত ধর্ম। ইহাকে সম্পূর্ণ প্রকাশের ভাষা নাই, কারণ এরূপ অভিজ্ঞতা কদাচিৎ হয়; ইহাকে চিরকাল ধারণের শক্তি তাহার নাই—কারণ সাধনালব্ধ সম্পদে সে গরীয়সী নহে[১]।' বৌদ্ধধর্মের উদার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আকস্মিক উন্মাদনায় বিশ্বজগৎকে সে সান্ত্বনার সুধা দান করিতে চাহিয়াছে।

নাটকের অন্যান্য চরিত্রকেও নবধর্ম নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। রাজমহিষীর নিকট নবধর্ম তাহার সহজ সরল সংসারধর্মের বিরোধীরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। এইজন্য কন্যার নবধর্মে তাঁহার অনুমোদন নাই—

এ যে তব
স্মৃষ্টিছাড়া বেদছাড়া ধর্ম অভিনব
আজিকার গড়া। কোথা হতে ঘরে আসে
বিধর্মী সন্ন্যাসী? দেখে আমি মরি ত্রাসে।
কী মন্ত্র শিখায় তারা, সরল হৃদয়
জড়ায় মিথ্যার জালে? লোকে নাকি কয়
বৌদ্ধেরা পিশাচপন্থী, জাদুবিদ্যা জানে,
প্রেতসিদ্ধ তারা।[২]

নবধর্মের উদ্দাম স্রোতমুখে মহিষীর সুখনীড় গৃহধর্ম আজ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম। এইজন্য তিনি এই ধর্মকে একেবারেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন—

নবধর্ম নবধর্ম কারে বল তুমি!
কে আনিল নবধর্ম, কোথা তার ভূমি
আকাশ কুসুম! কোন মত্ততার স্রোতে
ভেসে এল—কন্যারে মায়ের কোল হতে
টানিয়া লইয়া যায়,—ধর্ম বলে তায়?[৩]

সুপ্রিয় নবধর্মকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন দেবীস্বরূপিণী রাজদুহিতার মাধ্যমে—মালিনীই তাঁহার নিকট নবধর্মের বিগ্রহিণী দেবী। রাজকুমারীর

১। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড, প্রমথনাথ বিশী, ১৩৬০, পৃঃ ৭৬-৭৭
২। মালিনী, পৃঃ ১৬—১৬, ৩। ঐ, পৃঃ ৫৩।

দয়াধর্ম ও প্রেমধর্মের বাহিরে অন্য কিছুকে তিনি স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নহেন—

সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়াধর্ম তার,
সর্বজীবে প্রেম—সর্বধর্মে সেই সার
তার বেশী যাহা আছে, প্রমাণ কি তার ?[১]

ব্রাহ্মণ্য স্বর্গ, দেবদেবী, তীর্থ পর্যটন তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই, নবধর্ম হৃদয়ধর্মরূপে তাঁহার কাছে আবির্ভূত হইয়াছে—

আজি আমি লভিয়াছি
ধর্ম মোর, হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি।
সবার দেবতা তব, শাস্ত্রের দেবতা
আমার দেবতা নহে।[২]

নবধর্মের একটি জীবন্ত প্রতীকরূপে মালিনী তাঁহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। তাহার নবধর্ম মানবীয় প্রেমের গভীরতম অনুভূতিরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—

মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারী মূর্তি ধরি। শাস্ত্র এতদিন
মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবনবিহীন,
ওই দুটি নেত্রে জলে যে উজ্জ্বল শিখা
সে আলোকে পড়িয়াছি বিশ্বশাস্ত্রে লিখা—
যেথা দয়া সেথা ধর্ম যেথা প্রেমস্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।[৩]

নবধর্মরূপিণী দেবীর জয়গান করিয়া সে মৃত্যুকে নির্ভয়ে বরণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মে অচলপ্রতিষ্ঠ ক্ষেমঙ্কর নবধর্মের আবির্ভাবের মধ্যে সনাতন ধর্মের মহাদুর্যোগের আভাস পাইয়াছে—

এবার লাগিল অগ্নি। পুড়ে হবে ছাই
পুরাতন অট্টালিকা, উন্নত উদার।
সমস্ত ভারতখণ্ড কক্ষে কক্ষে যার
হয়েছে মানুষ।

১। মালিনী, পৃঃ ২৯। ২। ঐ, পৃঃ ৩৮—৩৯॥
৩। ঐ, পৃঃ ৭৩।

নবধর্মের আবির্ভাবে পিতৃকুল উদ্বেগে অধীর, আর্যধর্মের মহাদুর্গ পুণ্যতীর্থ কাশী নগরী শত্রু আক্রান্ত।

উন্মত্তা নগরী আজি ধর্মের চিতায়
জ্বালায় উৎসব-দীপ।[১]

পিতৃধর্ম রক্ষায় মহৎ কর্তব্যব্রত সাধক বাহির হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছে, অবশেষে ব্যর্থ হইয়া মৃত্যুর কষ্টিপাথরে ধর্মের সত্যাসত্য বিচার করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

কিন্তু ইহাদের কাহারো উক্তিতে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মর্মবাণী ও তাহার যথার্থ স্বরূপ সম্যক্ উদ্ঘাটিত হয় নাই। একমাত্র ভিক্ষু কাশ্যপের উক্তিতেই বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি সর্বাধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে। শিষ্যা মালিনীকে তিনি ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিতা করিতে চাহিয়াছেন, বিষয়পিপাসা পরিহার করিয়া, সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া হৃদয়ে প্রজ্ঞার আলোকরশ্মি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে—ইহাই নির্বাণ লাভের মাহেন্দ্রক্ষণ।

ত্যাগ করো বৎসে, ত্যাগ করো সুখ আশা
দুঃখভয়, দূর করো বিষয় পিপাসা
ছিন্ন করো, সংসারবন্ধন, পরিহরো
প্রমাদ প্রলাপ চঞ্চলতা, চিত্তে ধরো
ধ্রুবশান্ত সুনির্মল প্রজ্ঞার আলোক
রাত্রিদিন মোহশোক পরাভূত হোক।[২]

সুতরাং 'মালিনী' নাটকে বৌদ্ধ আখ্যানের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ত্যাগ ও বৈরাগ্য, মৈত্রী ও ক্ষমার আদর্শই অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

'মালিনী' নাটকের সূচনায় কবি এই নাটক রচনার ইতিহাস ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত।…স্বপ্নে দেখলুম যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল, দুই হাতে শিকল তাঁর

২। মালিনী, পৃঃ ৪৩। ১। ঐ, প্রথম দৃশ্য, পৃঃ ১

মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ধূলিসাৎ করে'।[১] বৌদ্ধ আখ্যানের সঙ্গে এই স্বপ্নকাহিনীর সংমিশ্রণে 'মালিনী' নাটক রচিত। নাটকের ১ম হইতে ৩য় দৃশ্য পর্যন্ত বৌদ্ধ আখ্যান এবং ৪র্থ দৃশ্যে স্বপ্নঘটিত কাহিনী প্রাধান্য পাইয়াছে। তৃতীয় দৃশ্য পর্যন্ত মালিনী ত্যাগব্রতী কাশ্যপশিষ্যা, এই করুণার প্রতিমা বৌদ্ধ উপাসিকার নিকট উগ্রতরোষ ব্রাহ্মণগণ মুহূর্তে মস্তক অবনত করিয়াছে। ৪র্থ দৃশ্যে কবি স্বপ্নকাহিনী দ্বারা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন। এই দৃশ্যে মালিনী আর লোকমাতা বিশ্বদেবী নহেন—'সে দেবী না রে, দয়া না রে, ঘরের সে মেয়ে'।[২] নবধর্মের মহত্তম মহিমা যাহা তাহাকে আদর্শের সন্ধানে ঘুরাইয়াছিল তাহাও অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—

যে দেবতা মর্মে মোর বজ্রলোক হানি
বলেছিল একদিন বিদ্যুন্ময় বাণী
সে আজি কোথায় গেল'।[৩]

'মালিনী' নাটকের এই দ্বৈত সত্তার মধ্যে কবি বৌদ্ধধর্মকে ক্ষমা, মৈত্রী ও অহিংসায় উদ্ভাসিত এক মহিময়স্তরে উন্নীত করিয়া দিয়াছেন।

রাজা, অরূপরতন, শাপমোচন

এই নাটকত্রয়ের কাহিনীর সঙ্গে বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থের কুশ জাতক[৪] এবং মহাবস্তু অবদানের কুশ জাতক[৫]-এর কাহিনীগত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। জাতক কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

মল্লরাজ ইক্ষ্বাকুর অগ্রমহিষী শীলবতী দেবরাজ শক্রের কৃপায় দুইটি পুত্র-লাভ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম কুশকুমার—তিনিই বোধিসত্ত্ব, কনিষ্ঠের নাম জয়ম্পতি। বোধিসত্ত্ব কুশকুমার পরম প্রজ্ঞাবান্ অথচ কদাকার ছিলেন, কনিষ্ঠ জয়ম্পতি পরমরূপবান্ অথচ নির্বোধ ছিলেন। শক্র শীলবতীর উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কুশতৃণ, দিব্যবস্ত্র, দিব্যচন্দন, মান্দারপুষ্পমালা এবং কোকোনদ নামক একটি বীণা প্রদান করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব বয়প্রাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং পুত্রকে

১। সূচনা, মালিনী, পৃঃ ১—২। ২। মালিনী, পৃঃ ৬৯।
৩। ঐ, পৃঃ ৫৫—৫৬।
৪। Fausboll, Jātaka, Vol. V, no 531, pp 278—312.
৫। Mahāvastu Avadānaṁ, Senart, Vol. III, pp 1—27.

তাহার ইচ্ছামত পাত্রী মনোনীত করিতে বলিলেন। বোধিসত্ত্ব মাতাপিতার সনির্বন্ধ অনুরোধে একটি পরম সুন্দর সুবর্ণপ্রতিমা প্রস্তুত করিয়া মাতার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন—'এবরূপং লভন্তো গণ্হামীতি'।[১] রাজার অমাত্যগণ বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মদ্ররাজ্যের রাজধানী শাকল নগরে অনুরূপ সুন্দরী রাজকন্যা লাভ করিলেন। মদ্ররাজকন্যা প্রভাবতীই এই অনিন্দ্যসুন্দরী। এই অপূর্ব সুন্দরী মদ্ররাজকন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে ইক্ষ্বাকুরাজ্যের যুবরাজ কুরূপ কুশকুমারের বিবাহ হইল। বিবাহের পর কুশকুমার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং প্রভাবতী অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত হইলেন। কুশরাজের মাতা শীলবতী সুন্দরী বধূ পুত্রের কুরূপ দর্শন করিয়া কুশরাজকে পরিত্যাগ করে এই ভয়ে একটি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে কুশরাজ ও প্রভাবতী দিবসে পরস্পরকে দেখিতে পাইতেন না, রাত্রের অন্ধকারে বরবধূ সম্মিলিত হইতেন—'প্রভাবতীং পন দিবা পস্সিতুং ন লভতি, সাপি তং দিবা পস্সিতুং ন লভতি, উভিন্নং পি রত্তিং দস্সনম্ এব হোতি'।[২] রাত্রি অবসানের পূর্বেই বোধিসত্ত্ব শয়নগৃহ পরিত্যাগ করিতেন। কিছুদিন পরে বোধিসত্ত্ব জননীর নিকট দিনমানে প্রভাবতীকে দর্শন করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। রাজমাতা নিরূপায় হইয়া হস্তি-মঙ্গলোৎসবে হস্তিশালায় ও অশ্বশালায় উভয়ের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু প্রভাবতী স্বামীকে চিনিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে প্রভাবতীও স্বামীকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজমাতা বধূকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন অবশেষে ব্যর্থ হইয়া বলিলেন—'আগামীকল্য যখন আমার পুত্র নগর প্রদক্ষিণ করিবে তখন তোমার বাতায়ন হইতে তাহাকে দেখিও।' —রাজমাতা তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র জয়ম্পতিকে রাজবেশে হস্তিপৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন, কুশরাজ হস্তিপালকের ছদ্মবেশে জয়ম্পতির পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজমাতা বধূকে বলিলেন—'পস্স তব সামিকস্স সিরিসোভগ্গন্তি'।[৩] প্রভাবতী পরম রূপবান্ জয়ম্পতিকুমারকে রাজাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া—'সা অনুচ্ছবিকো মে সামিকো লদ্ধো' ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন। শোভাযাত্রা পার হইয়া গেলে রাজমাতা বধূকে প্রশ্ন করিলেন—'দিট্ঠো তে অস্স সামিকো।'[৪] বধূ বলিলেন—আম অয্যে, পচ্ছিমাসনে পন, অস্স নিসিন্নো হত্থিমেন্ডো অতিবিয়

১। Fausboll, Jataka, Vol. V. p 283 ২। ঐ, পৃঃ ২৮৬।
৩। ঐ, পৃঃ ২৮৬,। ৪। ঐ, পৃঃ ২৮৭।

ত্বব্বিনীতো ময়হং হত্থবিকারাদীনি দস্সেসি, কস্সা এবরূপং অলক্খিকং রঞ্ঞো পচ্ছিমাসনে নিসিদাপেস্সন্তি।[১]

একদিন রাজোদ্যানের পঞ্চবিধ পদ্মসুশোভিত পুষ্করিণীতে প্রভাবতী জলক্রীড়া করিতেছেন এমন সময় মহাসত্ত্ব পদ্মপত্রের আবরণতল হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন—'অহং কুসরাজা।' প্রভাবতী মহাসত্ত্বের রূপ দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'যক্খো মং গণ্হাতি'।

অবশেষে প্রভাবতী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন এই কদাকার ও দুর্মুখ স্বামী লইয়া আমি কি করিব? যদি বাঁচিয়া থাকি আমি অন্য পতি গ্রহণ করিব। তিনি পিত্রালয়ে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কুশরাজও তাহাকে বাধা দিলেন না। ভাবিলেন আত্মবলেই তাহাকে জয় করিব, বলপ্রয়োগে নহে—'ত্বং অত্তনো বলেন আনেস্সামীতি।'[২]

প্রভাবতী পিতৃরাজ্যে প্রস্থান করিলে শোকসন্তপ্ত কুশরাজ সেই শক্রপ্রদত্ত কোকোনদ বীণাটি লইয়া শাকল নগরের হস্তিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইখানে বসিয়া মহাসত্ত্ব বীণা বাজাইতে লাগিলেন। বীণার সুমধুর ঝঙ্কারে প্রভাবতী বুঝিতে পারিলেন—কুশরাজ এই রাজ্যে আগমন করিয়াছেন। পত্নীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মহাসত্ত্ব একবার কুম্ভকার, একবার রাজমালাকার, অবশেষে সুপকাররূপে প্রভাবতীর চিত্ত বিনোদন করিতে চাহিলেন। কিন্তু ক্রোধে ও বিরক্তিতে তিনি কুশরাজের প্রতি আরো বিরূপ হইয়া উঠিলেন। প্রভাবতীর দাসী কুব্জা মহাসত্ত্বের গুণমুগ্ধ ছিল, সেও রাজকন্যার মন পরিবর্তন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। অবশেষে দেবরাজ শক্রের চক্রান্তে সাতজন রাজা মদ্ররাজা আক্রমণ করিল। রাজগণ মদ্ররাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন প্রভাবতীকে আমাদের সকলের নিকট প্রদান করিতে হইবে অথবা যুদ্ধ করিতে হইবে—সব্বেসম পি অম্হাকং পভাবতীং বা দেতু যুদ্ধং বা।[৩] কর্তব্যবিমূঢ় ভীতসন্ত্রস্ত মদ্ররাজ ঠিক করিলেন, প্রভাবতীকে সাত খণ্ড করিয়া তাহাদের নিকট প্রেরণ করিবেন, ইহাই জম্বুদ্বীপের সেই শ্রেষ্ঠ রাজাকে পরিত্যাগ করার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত—'সকল জম্বুদীপে অগ্গরাজানং ছড্ডেত্বা আগমনস্স ফলং লভতু, বধিত্বা নং সত্তখণ্ডানি কত্বা সত্তন্নং পেসেস্সামীতি।'[৪] রাজমহিষী অভাগিনী কন্যার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আজ যদি

১, ২। ঐ, পৃঃ ২৮৮।
৩। ঐ, পৃঃ ৩০০, ৪। ঐ, পৃঃ ৩০১।

কুশরাজ এইখানে উপস্থিত থাকিতেন তিনি এই সাতজন রাজাকে পরাজিত করিয়া আমার কন্যাকে বাঁচাইতে পারিতেন। এই সময় প্রভাবতী মাতাকে জানাইলেন—কুশরাজ এই রাজপ্রাসাদে সূপকারবেশে আত্মগোপন করিয়া আছেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া কুশরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কন্যাকেও আদেশ করিলেন কুশরাজের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে—

গচ্ছে বালে খমাপেহি কুসরাজং মহাবলং
খমাপিতো কুসরাজা সো তে দস্‌সতি জীবিতন্তি।[১]

প্রভাবতী বোধিসত্ত্বের পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বোধিসত্ত্ব বীরদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সাতজন রাজাকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। পরে মদ্ররাজের অনুমতিক্রমে রাজার সাত কন্যাকে তাঁহাদের নিকট সমর্পণ করিলেন। অবশেষে শক্রের প্রদত্ত বিরোচন মণির প্রভাবে কুরূপ কুশরাজ রূপবান হইলেন। তাঁহারা এখন—

সমানবণ্ণরূপেন ন' অঞ্ঞমঞ্ঞাতিরোচিসুং।[২]

উভয়েই তুল্যরূপযুক্ত—সৌন্দর্যে আর কোন প্রভেদ রহিল না।

জাতকের কাহিনীর সঙ্গে অবদান কাহিনীর আখ্যানগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু নামগত সাদৃশ্য পুরোপুরি রক্ষিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ রাজা ও অরূপরতন নাটকে অবদান কাহিনীর দ্বারাই বেশী প্রভাবিত হইয়াছেন।

এই কাহিনীতে কুশের জননীর নাম অলিন্দা, ভ্রাতা কুশদ্রুম। রাজমাতার নির্দেশে অজ্যোতিক গর্ভগৃহে সুদর্শনা তাঁহার স্বামীর সান্নিধ্য লাভ করেন। একদিন রাজবধূ দিবালোকে স্বামী সন্দর্শন কামনা করিলেন। অলিন্দা পুত্রবধূর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া অনুমতি দিলেন—রাজা যেদিন উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিবে সেদিন তাহাকে তোমার বাতায়ন পথে দর্শন করিও। উৎসবে ভ্রাতা কুশদ্রুম রাজা সাজিলেন, রাজা কুশ হইলেন তাহার ছত্রবাহক। সুদর্শনা রাজাকে দেখিয়া খুশী হইলেন কিন্তু ছত্রবাহকের কদাকার রূপ দেখিয়া তিনি তাহার বহিষ্কার দাবী করিলেন। ইহার পর একদিন পদ্মাসরোবরে, একদিন আম্রকাননে রাজার সঙ্গে সুদর্শনার সাক্ষাৎ হইল। সুদর্শনা রাজাকে রাক্ষস মনে করিয়া মূর্ছিত হইলেন। একদা হস্তিশালায় আগুন লাগিল। কুশ সেই অগ্নিদাহকে অগ্রাহ্য করিয়া বীরবিক্রমে হস্তিযূথকে মুক্তি দিলেন। সেই অগ্নিশিখায় সুদর্শনা স্বামীর ভয়ঙ্কর কুশ্রীরূপ দর্শন

১। ঐ, পৃঃ ৩০৮, ২। ঐ, পৃঃ ৩১১।

করিলেন। তিনি ক্ষোভে অভিমানে পিত্রালয়ে চলিয়া আসিলেন। কুশরাজও তাঁহার বীণাটি লইয়া সুদর্শনার পিতৃরাজ্য কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সুদর্শনার অভিমান কিছুতেই ভাঙান যায় না। অবশেষে সুদর্শনাকে লাভ করিবার আগ্রহে সাত জন রাজা তাঁহার পিতা মহেন্দ্রকের রাজ্য আক্রমণ করিল। পিতা কন্যাকে স্বামী পরিত্যাগ করার জন্য দোষারোপ করিয়া বলিলেন তাহাকে সাতটুকরা করিয়া রাজ্যের সাতজন শত্রুর নিকট প্রেরণ করিবেন। এবার সুদর্শনা ভয়ে কুশরাজের আশ্রয় লইলেন। তাঁহার মাতাপিতাও জানিলেন জামাতা রাজপ্রাসাদে উপস্থিত। কুশরাজ কৌশলে সাতজন রাজাকে পরাজিত করিলেন এবং শক্রপ্রদত্ত মণির প্রভাবে পূর্বের যৌবনশ্রী ফিরিয়া পাইলেন।

এই কাহিনী দুইটি নানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও কবি-কল্পনায় নব রূপায়ণের মাধ্যমে 'রাজা', 'অরূপরতন' ও 'শাপমোচনে' অনবদ্য রসমূর্তি লাভ করিয়াছে।

নাটকে রাজার সঙ্গে সুদর্শনার কোন্ বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ দিবালোকে রাজাকে সে দেখিতে পায় নাই। অন্ধকার গৃহে রাজার সঙ্গে রাণীর মিলন ঘটে। কিন্তু সে চায়—'যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখী মাটি পাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।'[১] রাজার অন্ধকার ঘরের দাসীর নাম সুরঙ্গমা, রাজার প্রতি তাহার অপরিসীম ভক্তি। সে তাহাকে রাজার মহত্ত্বের বিষয় জানাইল। অবশেষে রাণী রাজাকে দেখিবার অনুমতি পাইল—

'বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো।'[২] 'কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে, কেউ তোমাকে বলে দেবে না—আর বলে দিলেই বা বিশ্বাস কি!'[৩] কেবল রাণীকেই নহে রাজ্যের প্রজাদেরও রাজা কখন দেখা দেন নাই। রাজার অদর্শনের সুযোগে সুরূপ অথচ কাপুরুষ সুবর্ণ রাজার ছদ্মবেশে বসন্তোৎসবে যোগদান করিল। কাঞ্চীরাজ রাজার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। সুবর্ণের ফাঁকি সে বুঝিতে পারিল, সে স্থির করিল সুবর্ণের সাহায্যে সুদর্শনাকে লাভ করিতে হইবে। বসন্তোৎসবে রাণী ছদ্মবেশী সুবর্ণকেই রাজা বলিয়া ভুল করিল, পদ্ম পাতায় ফুলের অর্ঘ্য সাজাইয়া দাসী রোহিণীর হাতে সুবর্ণকে পাঠাইয়া দিল। রাজা যে ধরা পড়িয়াছেন তাহাই সে বোঝাতে চায়—'তাঁর মনে ছিল আমি চিনতেই পারব

১। রাজা, পৃঃ ১৩। ২। অরূপরতন, পৃঃ ১৪। ৩। রাজা, পৃঃ ১৩।

না—ধরা পড়েছেন সেটা না জানিয়ে ছাড়চি নে।'[১] এই ইঙ্গিত সুবর্ণ না বুঝিলেও কাঞ্চীরাজ বুঝিতে পারিল। সে সুবর্ণের কণ্ঠের একটি মুক্তামালা উন্মোচন করিয়া রাণীকে পাঠাইয়া দিল। রাণীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল কিন্তু তবু সেই অগৌরবের দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। সুদর্শনাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় কাঞ্চীরাজ রাণীর করভোত্থানে আগুন ধরাইয়া দিল। করভোত্থানের মধ্যেই রাণীর প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদের চারিদিকেও আগুন ছড়াইয়া পড়িল। এই চরম দুর্যোগের ক্ষণে সুদর্শনা জানিল—সুবর্ণ প্রকৃত রাজা নহেন। সেই সর্বনাশের আগুনের মধ্যে রাণী প্রকৃত রাজাকে প্রত্যক্ষ করিলেন। সে রূপ—'ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো। আমার মনে হয় ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো, ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কুলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো।'[২] রাণীর ভালবাসা সেইদিন হইতে রাজার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। রাজাকে বলিল—'আমাকে এখানে থেকে যেতেই হবে, তোমার সঙ্গে মিলন, সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।'[৩]

সুদর্শনা তাহার পিতৃগৃহে প্রস্থান করিল। দাসী সুরঙ্গমা সে রাণীর 'সমস্ত ভালোমন্দ নিজের গায়ে মেখে নিয়েছে।' সে রাণীর সঙ্গ কিছুতেই ছাড়িবে না। পিতৃগৃহে স্বামীত্যাগিনী কন্যা অগৌরবের পদে অধিষ্ঠিতা হইল। পিতা বলিল— 'ইচ্ছা করে সে আপনার একেশ্বরী রাণীর পদ ত্যাগ করে এসেছে— এখানে রাজগৃহে তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।' ......'আমার এই কন্যাকে আমি আজ কি রকম ভয় করছি—সে আমার ঘরের মধ্যে শনিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসচে।'[৪] অবশেষে যথার্থই কান্যকুব্জ রাজের রাজ্যে শনির দৃষ্টি পড়িল। কাঞ্চীরাজ, কোশলরাজ, অবন্তীরাজ, কলিঙ্গরাজ, বিরাট, পাঞ্চাল ও বিদর্ভরাজ সুদর্শনাকে লাভ করিবার জন্য সসৈন্যে কান্যকুব্জ আক্রমণ করিল। সাতরাজাই সুদর্শনাকে লাভ করিতে চাহে। অবশেষে স্থির হইল স্বয়ম্বর সভায় সুদর্শনা যাহার গলায় বরমাল্য দিবে সে-ই সুদর্শনাকে লাভ করিবে। স্বয়ম্বর সভা আরম্ভ হইল। দুঃখে, অপমানে, লজ্জায় সুদর্শনা বলিল—'দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধূলোয় লুটিয়ে

১। রাজা, পৃঃ ৫৬। ২। অরূপরতন, পৃঃ ৪৫।
৩। রাজা, পৃঃ ৮৩। ৪। রাজা, পৃঃ ৮৯—৯০।

যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি। বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না?'[১] এমন সময় স্বয়ম্বর সভায় যোদ্ধ্‌বেশে ঠাকুরদা প্রবেশ করিলেন। তিনি রাজার সেনাপতি। তিনি সমবেত রাজগণকে রণক্ষেত্রে আহ্বান জানাইলেন। রণক্ষেত্রে সাতজন রাজাই পরাজিত ও বন্দী হইলেন। ছয়জন রাজদণ্ড পাইলেন 'কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিচারকর্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।'[২] যুদ্ধ শেষ হইল, রাজা কিন্তু সুদর্শনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। এইবার রাণীর সকল অহংকার, সকল অভিমান বিলুপ্ত হইল। সে আজ দীনবেশে, পায়ে হেঁটে রাজার সন্ধানে পথে বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার ঘরে রাণী আবার রাজার সান্নিধ্য লাভ করিল, বলিল—'প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।'[৩] রাজা প্রশ্ন করিলেন—'আমাকে সইতে পারবে,' রাণী বলিল—'পারব রাজা, পারব। আমার প্রমোদ বনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম, সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।' অন্ধকার ঘরের লীলার এইখানে অবসান। যাওয়ার আগে রাণী বলিল—'আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।'[৪]

জাতকে রাত্রির অন্ধকারে এবং অবদানে অজ্যোতিক গর্ভগৃহে বরবধু পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করে। বর মহাবলবান ও মহাধনবান পরাক্রান্ত ও ভুবনবিখ্যাত নরপতি—তিনি মহাযশস্বী, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, রাজরাজেশ্বর, সিংহনাদ ভূপতি, কিন্তু পরম কদাকার। বধূ অনিন্দ্যসুন্দরী—সে রূপের জ্যোতি প্রাতঃসূর্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, অন্ধকার কক্ষকেও তাহা চতুর্হস্ত পরিমিত আলোকিত করিত।—'তস্সা সরীরতো বালসুরিয়স্স বিয় পভা বা নিচ্ছরন্তি কালন্ধকারে পি চতুহত্থগব্বে পদীপকিচ্চং নাম ন'ত্থি, সব্বো গব্বো একভাসো বা হোতি।'[৫] এমনি এক রূপলাবণ্যবতী বধূর সঙ্গে মহোত্তম অথচ ভয়ঙ্কর

১। রাজা, পৃঃ ১১২। ২। ঐ, পৃঃ ১২৭।
৩। অরূপরতন, পৃঃ ৬৮ ৪। অরূপরতন, পৃঃ ৬৮।
৫। জাতক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৩—৮৪।

কুৎসিত এক নরপতির সম্মিলনের এই কাহিনী কবিকল্পনাকে কেবল উদ্দীপিতই করে নাই কবির রস-বাসনায় সমর্থন লাভ করিয়া তাঁহার রচনায় নূতন প্রেরণা ও রসের সংবেদনাও প্রবর্তন করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র ইঙ্গিতের শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার রাজা, অরূপরতন, শাপমোচন প্রভৃতি নাটকের অবয়ব গঠন করিয়াছেন। কবি এই বৌদ্ধকাহিনীর নায়ক-নায়িকার প্রতি কেবল আন্তরিকতা ও সৌজন্যই অনুভব করেন নাই, তাহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে তিনি ঐকাত্ম্যও বোধ করিয়াছেন। তুলনামূলক আলোচনায় মাধ্যমে দেখা যাইবে রবীন্দ্রনাথ কতখানি মূলকাহিনী হইতে গ্রহণ ও কতখানি বর্জন করিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি বৌদ্ধকাহিনীর আঁধার ঘরকে কেন্দ্র করিয়া কবিকল্পনা উদ্দীপিত হইয়াছে। সুদর্শনা নামটাও কুশাবদান হইতে গৃহীত। বৌদ্ধ-কাহিনীর সুদর্শনা ও প্রভাবতী এবং রবীন্দ্রনাথের সুবর্ণনার মধ্যে মিল অনেকটা। ইঁহারা সকলেই অপূর্বরূপলাবণ্যবতী। রবীন্দ্রনাথের সুরঙ্গমা এইখানে দ্বৈত ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে। রাজমাতা শীলবতী বা অলিন্দা এবং সহচরী কুব্জা উভয়ের কাজ সুরঙ্গমা একাই সম্পন্ন করিয়াছে। রাজভ্রাতা জয়ম্পতি বা কুশদ্রুম রবীন্দ্রনাটকে সুবর্ণের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে। অবদানের 'অজ্যোতিকং গর্ভগৃহং' রাজা নাটকেও 'মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরী।'[১] রাজা বিশেষ করিয়া রাণীর জন্যই এই ঘর তৈয়ারী করিয়াছেন। এই ঘরেই রাণীর সঙ্গে রাজার সম্মিলন ঘটে। জাতকে রাণী তাঁহার স্বামীকে দিবালোকে দর্শন করিতে চাহিলে রাজমাতা বলিলেন—তেন হি সে মম পুত্তো নগরং পদক্খিণং করিস্সতি, ত্বং সীহপঞ্জরং বিবরিত্বা-পস্সেয়্যাসীতি।'[২] এই উৎসবানুষ্ঠানে রাজার রূপবান কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজহস্তির উপর উপবিষ্ট ছিলেন আর প্রকৃত রাজা ছিলেন তাহার হস্তিপালক। রাণীর সপ্রশংস দৃষ্টি রাজবেশীর উপর পতিত হইল। তিনি রাজমাতাকে অভিযোগ করিলেন কেন এই দুর্বিনীত লক্ষ্মীছাড়া হস্তিপালককে রাজার পশ্চাতে বসিতে দেওয়া হইয়াছে—'কস্মা, এবরূপং অলক্খিকং রঞ্ঞো পচ্ছিমাসনে নিসীদাপেস্সন্তি।'[৩]

১। রাজা, পৃঃ ২। ২। জাতক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৬
৩। ঐ, পৃঃ ২৮৭।

রবীন্দ্রনাথের নাটকেও রাণীর একান্ত আগ্রহ রাজাকে সে প্রত্যক্ষ দিবালোকে দেখিবে। রাজা বলিল—'আজ বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো।'[১] এখানেও রাণী রাজবেশীকেই রাজা বলিয়া ভুল করিয়াছে। আর প্রকৃত রাজা তাহার দাক্ষিণ্যে বঞ্চিত হইয়াছেন। উৎসবান্তে শাপমোচনে রাণী কমলিকাও রাজাকে প্রশ্ন করিয়াছে—

'যেন চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষে লেগেছে তুফান। কেবল একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ করলে। ও যেন রাহুর অনুচর। কী গুণে ও পেল প্রবেশের অধিকার।'[২]

অবদান কাহিনীতে কররোভ্যানে অগ্নিপ্রজ্বলিত হইলে সেই অগ্নিশিখায় রাণী সুদর্শনা কুশরাজাকে প্রত্যক্ষ করিল। স্বামীর সেই কুশ্রী ভয়ঙ্কররূপ দর্শন করিয়া ক্ষোভে অভিমানে সে পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। এত বড় প্রতারণা সে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না। 'রাজা' ও 'অরূপরতন' নাটকেও অগ্নি-সংযোগের ফলে এক চরমক্ষণে রাণী সুদর্শনা কেবল মুহূর্তের জন্য রাজাকে দর্শন করিয়াছে। সেই রূপ দেখিয়া সে বলিয়াছে—'ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো। আমার মনে হয় ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো, ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো।'[৩] ইহার পর রাণী তাহার পিতৃরাজ্যে প্রস্থান করিয়াছে। জাতকে, অবদানে এবং রবীন্দ্রনাটকে রাণীর গমনপথে রাজা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন নাই। জাতকে কুশরাজ স্থির করিয়াছেন রাণীকে আত্মবলেই জয় করিবেন—'ত্বং অত্তনোবলেন আনেস্সামীতি'। রবীন্দ্রনাথের রাজার প্রতিজ্ঞাও প্রেমের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।[৪]

বৌদ্ধকাহিনীদ্বয়ের প্রভাবতী বা সুদর্শনাকে লাভ করার জন্য সাতজন

১। রাজা, পৃঃ ১৪। ২। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পঃ বঃ সঃ, শাপমোচন, পৃঃ ৬৯৮
৩। অরূপরতন, পৃঃ ৪৫। ৪। রাজা, পৃঃ ৮১ ; অরূপরতন, পৃঃ ৪৫।

নরপতি মদ্ররাজ্য বা কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা প্রত্যেকেই রাজকন্যাকে লাভ করিতে চাহে। নিরুপায় পিতা জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নরপতি মহাবল কুশরাজকে পরিত্যাগ করার জন্য কন্যাকে অভিযোগ করিয়াছেন এবং তাহাকে সাতখণ্ড করিয়া সাতজন রাজার নিকট প্রেরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

'সকলে জম্বুদ্বীপে অগ্গরাজানং ছড্ডত্বা আগমনস্স ফলং লভতু, বধিত্বা নং সত্তখণ্ডানি কত্বা সত্তন্নং পেসেস্সামীতি।'[১]

রবীন্দ্রনাটকে কবি সুদর্শনার কণ্ঠে এই কাহিনীর স্বীকৃতি দিয়াছেন—'যুদ্ধে যাবার পূর্বে বাবা এসে বল্লেন, তুই 'একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ সাতজনকে টেনে আনলি—ইচ্ছে করছে তোকে সাত টুকরো করে ওদের সাত জনের মধ্যে ভাগ করে দিই।'[২] বৌদ্ধকাহিনীতে কুশরাজের বীরত্বে সাতজন রাজা পরাজিত ও বন্দী হইয়াছে। কুশরাজ পরাজিত নৃপতিদের হাতে রাণীর সাত ভগিনীকে সমর্পণ করিয়াছেন। নাটকে রাজা কেবল কাঞ্চীরাজকেই পুরস্কৃত করিয়াছেন, অন্য রাজাদের তিনি যথাযোগ্য শাস্তি দিয়াছেন। বৌদ্ধ-কাহিনীর শক্রপ্রদত্ত কোকনদ বীণা রবীন্দ্রনাটকে বিশেষ গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধকাহিনীতে কুশরাজ এই বীণাটি সম্বল করিয়া পত্নীর সন্ধানে রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়াছেন, কুশরাজের বীণার সুমধুর সুর-ঝঙ্কারে রাণী বুঝিয়াছেন কুশরাজ তাঁহার পিতৃরাজ্যে আগমন করিয়াছেন। রাজার বীণার ঝঙ্কার রবীন্দ্রনাথের সুদর্শনার অন্তর্লোকে শাশ্বত প্রেমের সুরকেই যেন মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই সে রাজাকে বলিয়াছে—

'বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে তখন আমার এমনি হয় যে আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়।'[৩] কুশরাজ হস্তিশালায় আশ্রয় লইয়া কোকনদ বীণার গানে রাণীর নিকট তাঁহার আগমনলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুদর্শনাও চিরদিনের চেনা রাজার সেই গান শুনিতে পাইয়াছে। সুরঙ্গমাকে বলিয়াছে—

'দেখ সুরঙ্গমা। আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে আমার জানলার নীচে থেকে যেন বীণা বাজচে।'[৪] শাপমোচনে সেই কোকনদ বীণা কবিকল্পনার বিচিত্রবর্ণচ্ছটায় রসলোকের স্বীকৃতি লাভ

১। জাতক, পৃঃ ৩০১। ২। রাজা, পৃঃ ১০২। ৩। ঐ, পৃঃ ১০। ৪। রাজা, পৃঃ ১০৩।

করিয়াছে। শাপমোচনে মদ্ররাজকন্যা কমলিকার সঙ্গে গান্ধাররাজের বিবাহ হইয়াছে।

'রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে রাজার প্রতিনিধি হয়ে এল অরুণেশ্বরের বক্ষো-বিহারিণী বীণা, রাজার অশ্রুত আহ্বান সঙ্গে করে।'[১]

স্তব্ধ সংগীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ। আবার নির্জনবনের রাজগৃহে আত্মনির্বাসিতা রাজমহিষী বীণাধ্বনির আর্ত রাগিণী শুনিতে পায়। সেইদিন—'বীণায় বাজতে থাকে কেদারা বেহাগ, বাজে কানাংড়া।'[২] বীণার সুরেই রাণীর কাছে ফুটিয়া উঠে অভিসারের অন্তবিহীন পথ। সেই পথের শেষে বীণা থামিল। এইখানে রাজার সঙ্গে রাণীর মিলন।

ঠাকুরদা, রোহিণী (রাজা) ও সুরঙ্গমা কবির নিজস্ব সৃষ্টি। বৌদ্ধ কাহিনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নাটকে কবির মৌলিকতা কোথাও আচ্ছন্ন হয় নাই। বৌদ্ধকাহিনীর আলোকে কবি নূতন ভাবজগতে চলিয়া গিয়াছেন। 'রাজা' ও 'অরূপরতন' নাটকে রাজাকে কবি বৌদ্ধকাহিনীর সমস্ত হীনতা ও দীনতা হইতে উর্ধ্বে তুলিয়া লইয়াছেন। যিনি বোধিসত্ত্ব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার হীন আচরণ কবিকে যে পীড়িত করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। তাঁহার রাজা বজ্রাদপি কঠোর, অদম্য, অজেয়, আবার শান্তস্নিগ্ধ, কোমলমধুর। তাঁহার ধ্বজে পদ্মের মাঝে বজ্র চিহ্নিত।

বৌদ্ধকাহিনীর প্রতিপাদ্য রমণীর প্রতি আসক্তির চরম দুর্ভোগ ও পরিণতি। বোধিসত্ত্ব কুশ মহোত্তম, বীরশ্রেষ্ঠ নরপতি কিন্তু রমণীর প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া দুঃখ ও দুর্গতি ভোগ করিয়াছেন। 'রাজা' ও 'অরূপরতন' নাটকে রাজা ব্যক্তিবিশেষের সামগ্রী নহেন, তিনি একাধারে ভয়ালসুন্দর, কান্তকঠোর, তিনি বিশ্বনিয়ন্তা, অদৃশ্যে থাকিয়া বিশ্বের সমস্ত কিছু সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করিতেছেন। তিনি অনম্য ও অতীন্দ্রিয় রহস্যে আবৃত। বৌদ্ধকাহিনীর নায়ক রক্তমাংসের মানুষ, তাঁহার প্রেম ঐহিক জগতের বস্তু—অধ্যাত্মজগতের সম্পদ্ নহে। রবীন্দ্রনাথের রাজা রূপচক্ষুর দ্বারা উপলব্ধিগোচর নহেন, ইন্দ্রিয়-মনোহর সুন্দর নহেন—দুর্যোগ-দুঃখের অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লইতে হয়। কুশরাজ অন্ধকার দ্বারা তাঁহার দৈহিক বিকৃত সৌন্দর্যকে মহিষীর নিকট ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, রমণীর সৌন্দর্য ভোগাকাঙ্ক্ষা তাঁহার মধ্যে প্রবল। তিনি মর্ত্যের ধূলিমাটিতে গড়া সাধারণ নায়কমাত্র, কিন্তু

১। শাপমোচন, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পঃ বঃ সঃ, পৃঃ ৬৯৩ ২। ঐ, পৃঃ ৭০০

রবীন্দ্রনাথের রাজা অলোকরাজ্যের, অমূর্ত অধ্যাত্মরাজ্যের অধিবাসী, তাঁহার ভয়াল সুন্দর, অদৃশ্যরূপ মানবিক অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে অচিন্ত্যরাজ্যের অন্ধকারে আবৃত।

বৌদ্ধ আখ্যানের রাণীর ইন্দ্রিয়ানুভূতিগম্য সৌন্দর্যস্পৃহা রবীন্দ্রনাথের নাটকেও উত্তরাধিকার রক্ষা করিয়াছে। উভয়ক্ষেত্রে সৌন্দর্যস্পৃহা ও রূপতৃষ্ণা রাণীর চরিত্রের প্রধান অবলম্বন। বৌদ্ধ আখ্যানে রাণী স্বামীর ভয়ঙ্কর কদাকার মূর্তি দর্শন করিয়া অধীরচিত্তে স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে। কুরূপ স্বামীকে সে কিছুতেই ভালবাসিতে পারে নাই। তারপর দুঃখদুর্যোগের প্রচণ্ড আঘাতে সে কুশরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও সুদর্শনা কিছুতেই হার মানিতে চাহে নাই। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশেষে অশ্রুজলের কঠিন তপস্যায় অগ্নিসিদ্ধা রাণীর অন্তরে প্রেমের দীপশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রে রাণীর আত্মাভিমান ও রূপতৃষ্ণা যেদিন নিঃশেষে অবসান হইয়াছে সেদিনই সে রাজাকে পাইয়াছে।

'রাজা' ও 'অরূপরতন' অপেক্ষা 'শাপমোচন' অনেকটা বাস্তবমুখিন। এইজন্য বৌদ্ধকাহিনীর মানবিক অনুভূতি শাপমোচনে পাওয়া যায়। এইখানে রাজা অলোকরাজ্যের অতীন্দ্রিয় সত্তা নহেন। তিনি শাশ্বত প্রেমের পূজারী মর্ত্যমানব। জাতকে প্রত্যেকবুদ্ধের প্রতি রূঢ় আচরণের অপরাধে বিকৃতদেহ কুশরাজের জন্ম।[১] শাপমোচনে স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে বিকৃত-সৌন্দর্য গান্ধাররাজ অরুণেশ্বরের জন্ম। মহিষীর প্রতি কুশরাজের প্রবল আসক্তি একটি জীবন্ত সত্যরূপে শাপমোচনে দেখা দিয়াছে। রাণী কমলিকা সুন্দরের পূজারিণী, রসবিকৃতির পীড়া সে সহ্য করিতে পারে না। অরুণেশ্বরের কুৎসিত চেহারা দেখিয়া ঘৃণায়, প্রবঞ্চনার অপমানে সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

১। পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে বাস করিতেন। একদা একজন প্রত্যেক বুদ্ধ ভিক্ষার জন্য আসিলে বোধিসত্ত্বের ভ্রাতৃবধূ তাঁহার জন্য রক্ষিত পিষ্টক বোধিসত্ত্বকে প্রদান করেন। এই সময় ঘটনাস্থলে তিনি উপস্থিত হইয়া প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্র হইতে পিষ্টকাদি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ তাহার জননীর নিকট হইতে ঘৃত আনয়ন করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রদান করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন জন্মান্তরে যেন আমি পরমাসুন্দরী হই এবং এইরূপ দুষ্টলোকের সহিত যেন আমাকে বাস করিতে না হয়। বোধিসত্ত্বও পিষ্টকটি প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্রে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন—এই রমণী যত দূরেই বাস করুক আমি যেন ইহাকে আমার পদ পরিচারিকা করিতে পারি। বোধিসত্ত্ব প্রত্যেকবুদ্ধকে অর্পিত পিষ্টক গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কুৎসিত সৌন্দর্য-কুশরাজরূপে জন্মগ্রহণ করেন।—Jātaka, ed. Fausboll, Vol. V. pp. 288-289.

বৌদ্ধকাহিনীর সাতরাজার আক্রমণের দুর্যোগ এখানে বিরহের দুঃখ ও আত্মগ্লানিতে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধকাহিনীতে বিরোচন মণির স্পর্শে কুশরাজ তাঁহার কদাকার দেহে নবযৌবন ফিরিয়া পাইয়াছেন, শাপমোচনে বিরহের তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া অরুণেশ্বর তাঁহার পূর্ব জন্মের অনবধানতার প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়াছেন। জাতকে তাঁহারা উভয়েই এখন 'সমানবন্নরূপেন ন অঞঞমঞঞাতিরোচিংসু'। 'শাপমোচনে'ও বিরহের তপস্যায় দৈব অভিশাপের অবসান হইয়াছে। মহিষী বিগত অভিশাপ সৌরসেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—

প্রভু আমার, প্রিয় আমার—
এ কী সুন্দর রূপ তোমার।[১]

অচলায়তন, গুরু

বৌদ্ধ কাহিনী 'চূড়াপক্ষ' অবদানের[২] পন্থক ও মহাপন্থক নামের পাঠান্তর পঞ্চক ও মহাপঞ্চকের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'অচলায়তন' নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন। এই নামকরণের সুন্দর ইতিহাসও অবদানে দেওয়া হইয়াছে। অবদানের সঙ্গে এই রবীন্দ্রনাটকের কাহিনীগত সাদৃশ্য বিশেষ না থাকিলেও নামগত ও চরিত্রগত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল :—

মহানগরের এক মৃত-বৎসা ব্রাহ্মণী পুনর্বার সন্তান প্রসব করিলে পাড়ার এক বৃদ্ধ যুবতী শিশুটির জীবনরক্ষায় অগ্রসর হইল। সে দাসীর নিকট নবজাত শিশুটিকে প্রদান করিয়া বলিল—ইহাকে বড় রাস্তার মোড়ে লইয়া গিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিও এবং শ্রমণ ব্রাহ্মণ দেখিলে বলিও—

"অয়ং দারকঃ পাদাভিবন্দনং করোতীতি।"

দাসীও তাহাই করিল। সেই পথে যত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ যাতায়াত করিলেন সকলেই নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করিলেন। ভগবান বুদ্ধদেবও সেই পথে ভিক্ষার জন্য একবার গেলেন একবার ফিরিয়া আসিলেন। তিনিও নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—'চিরং জীবতু, দীর্ঘমায়ুঃ পালয়তু। মাতাপিত্রোর্মনোরথং পূরয়তু'—এইভাবে মহাপুরুষদের আশীর্বাদ লাভ করিয়া মৃতবৎসা ব্রাহ্মণীর এই শিশুটি বাঁচিয়া গেল। মহাপথে ভগবান বুদ্ধ ও শ্রমণ-

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭০১।
২। দিব্যাবদানম্—চূড়াপক্ষাবদানম্, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ৪২৭

ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদবলে জীবন লাভ করিয়াছে বলিয়া নবজাত শিশুর নাম হইল 'মহাপন্থক'।

'অয়ং দারকো মহাপথে ধারিতঃ। ভবতু দারকস্য মহাপন্থক ইতি নাম।'

মহাপন্থক বড় হইয়া ধীমান ও বুদ্ধিমান হইলেন। তিনি বেদ ও নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ষট্‌কর্মনিরত ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হইলেন। কয়েক বৎসর পরে ব্রাহ্মণপত্নী আবার একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। পূর্বানুযায়ী শিশুটিকে দাসীহস্তে প্রদান করিয়া পথপ্রান্তে প্রেরণ করা হইল। এইবারও শিশুটি বাঁচিয়া গেল। দাসী নবজাত শিশুসহ ছোট রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল, এইজন্য এই শিশুর নাম হইল 'পন্থক'—'অয়ং দারকঃ পন্থলিকায়াং ধারিতঃ। ভবতু দারকস্য নামধেয়ং পন্থক ইতি।'

পন্থক একেবারে নির্বোধ ছিল। কিছুতেই কোন বিদ্যা সে আয়ত্ত করিতে পারিল না। আচার্য বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি বহু ছাত্র পড়াইয়াছি কিন্তু পন্থকের মত নির্বোধ কেহই নহে, ওঁ বলিতে তাহার 'ভূরি, বিস্মরণ ঘটে আবার 'ভূরি' বলিতে সে ওঁ ভুলিয়া যায়—

"প্রভূতা মাণবকাঃ পাঠয়িতব্যা ময়া। ন শক্যাম্যহং পন্থকং পাঠয়িতুম্। অস্য ওঁমিতুক্তে ভূরিতি বিস্মরতি, ভূরিত্যুক্ত ওঁমিতি বিস্মরতি।"[১]

মহাপন্থক শারিপুত্র ও মোদ্‌গল্যায়নের সংস্পর্শে আসিয়া ভিক্ষু হইয়া গেলেন। আর পন্থক পিতার সঞ্চিত ধনভাণ্ডার ক্ষয় করিয়া চলিল। একদা পথে মহাপন্থকের সঙ্গে পন্থকের সাক্ষাৎ হইল। মহাপন্থক ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

পন্থক, কথং যাপয়সি ?

পন্থক উত্তর করিল—কৃচ্ছ্রেণ যাপয়ামি।

মহাপন্থক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিং ন প্রব্রজসি" ; সে বলিল—আমি পরম মূর্খ। পরম নির্বোধ। সুতরাং—'কো মাং প্রব্রাজয়িষ্যতীতি'। মহাপন্থক ভ্রাতাকে প্রব্রজ্যা দান করিয়া একটি শিক্ষাপদ অভ্যাস করিতে দিলেন। কিন্তু সেই শিক্ষাপদ তিন মাসেও কিছুতেই তাহার আয়ত্ত হইল না। তাহার মুখে শুনিতে শুনিতে গোপালক পশুপালকগণও তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। অবশেষে মহাপন্থক তাহাকে বিহার হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এখন সে—'ন গৃহী ন প্রব্রজিতঃ'—এই ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভগবান বুদ্ধ তাহার কান্নার

১। দিব্যাবদানম্, পৃঃ ৪২৮।

কারণ জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি তথাগতের নিকট পাঠ লইতে পার না। সে বলিল 'মহাশয়, আমি পরম মূর্খ, পরম নির্বোধ।' ভগবান বুদ্ধ আনন্দের উপর তাহাকে পাঠদানের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু আনন্দও তাহাকে কিছুই শিখাইতে পারিলেন না। এইবার ভগবান নিজেই পন্থককে শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি পন্থককে দুইটি শিক্ষাপদ প্রদান করিলেন—

"রজো হরামি, মলং হরামীতি।"

কিন্তু এইবারও পন্থক ব্যর্থ হইল। ভগবান তাহাকে ভিক্ষুদের জুতা পরিষ্কার কর্মে নিযুক্ত করিলেন। পন্থক পরম নিষ্ঠাসহকারে এই কাজ সম্পন্ন করিত। অবশেষে একদিন সে বুদ্ধদেবের দেশনার মর্ম উপলব্ধি করিল। পন্থক অর্হত্বপদে আরূঢ় হইলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকেই ভিক্ষুণী সঙ্ঘে গুরুর অভিভাষণ প্রদান করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ভিক্ষুণীগণ মনে মনে রুষ্ট হইলেন কিন্তু পন্থক তাহা অগ্রাহ্য করিয়া জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করিলেন। বৌদ্ধভিক্ষুসঙ্ঘে তাঁহার অধ্যাত্মজ্ঞানের গভীরতা স্বীকৃতি পাইল। তিনি যশস্বী হইলেন।

নাটকের 'অদীনপুণ্য'[১] নামটিও বৌদ্ধসাহিত্য হইতে গৃহীত। ভগবান বুদ্ধ কোন এক পূর্বজন্মে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম নরপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আপন জীবনের বিনিময়ে অর্থীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাটকে অদীনপুণ্য জ্ঞানসাধক। তিনি অচলায়তনে সর্বাধ্যক্ষ আচার্যের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন।

অচলায়তন উচ্চ প্রাচীরের যবনিকায় ঘেরা অতি প্রাচীন একটি আশ্রম। বহিবিশ্বের সঙ্গে তাহার কোন সংযোগ নাই। এই আশ্রমে বাস করেন—উপাচার্য, উপাধ্যায়, মহাপঞ্চক, অধ্যাপক, এবং পঞ্চক প্রভৃতি বিদ্যার্থিগণ। বিদ্যার্থীরা কঠিন নিয়মের বন্ধনে শাস্ত্রানুযায়ী জীবনযাপন করে—মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করে, নানাপ্রকার ব্রত উদ্‌যাপন করে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থী সকলের জীবন শাস্ত্রের কঠিন নিগড়ে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধা। মহাপঞ্চকের ভ্রাতা পঞ্চকও আশ্রমের বিদ্যার্থী কিন্তু সে এই অচলায়তনের একটি জীবন্ত ব্যতিক্রম। অচলায়তনের তন্ত্রমন্ত্র, ক্রিয়াকাণ্ড ব্রত-অনুষ্ঠান কোনটাতেই সে আনন্দ পায় না, আয়তনের একটি মন্ত্রও সে কণ্ঠস্থ করিতে পারে নাই। তাহার ভ্রাতা মহাপঞ্চককে সে জানাইয়াছে—'দাদা, তুমি তো দেখলে—তোমাদের এখানকার মন্ত্রতন্ত্র আচার আচমন সূত্রবৃত্তি কিছুই

১। অবদানকল্পলতা, ২য় খণ্ড, পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ৩২০

পারলুম না।'[১] আশ্রমের হাজার হাজার বছরের পুরাতন নিয়মের প্রতি তাহার একটুও শ্রদ্ধা নাই। অদীনপুণ্যকে সে জানাইয়াছে—'আচার্যদেব, যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না'।[২] আশ্রমের উত্তর দিকটা একজটাদেবীর। আশ্রমবাসীদের পক্ষে ঐ দিকের জানালা খোলায় চিরন্তন নিষেধ। আশ্রম-বালক সুভদ্র কৌতূহলবশে সে জানালা খোলায় উপাধ্যায় ও মহাপঞ্চক তাহার জন্য 'মহাতামস' প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন কিন্তু আচার্য অদীনপুণ্য ও পঞ্চক এই প্রায়শ্চিত্তের বিরোধিতা করেন। আচার্য ভয়-কম্পিত সুভদ্রকে বলিলেন—'তুমি কোনো পাপ করনি বৎস। যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে পাপ তাদেরই।'[৩] অচলায়তনের সুদীর্ঘ কালের অন্ধ সংস্কার ও আচার-নিষ্ঠার ইতিহাসে আচার্যের এই অভয়বাণী এক আলোড়ন সৃষ্টি করিল। মহাপঞ্চক আচার্যদেব ও অদীনপুণ্যকে নির্বাসিত করিলেন। তাঁহারা পতিত ও অন্ত্যজ দর্ভক পল্লীতে নির্বাসিত হইলেন। অচলায়তনের বাহিরে দর্ভক ও শোণপাংশুদের আবাস। আশ্রমবাসীদের নিকট তাহারা অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ। অনাচারী শোণপাংশুরা যখন রাজ্যের সীমানার প্রাচীর ভাঙ্গিতে শুরু করিয়াছে তখন আশ্রমবাসীরা তাহা একজটাদেবীর অভিশাপ বলিয়া মনে করিল। এই চরম দুর্যোগের দিনে অস্ত্রধারী শোণপাংশুদের সঙ্গে অচলায়তনের প্রতিষ্ঠাতা গুরু প্রবেশ করিলেন। যিনি আয়তনবাসীদের গুরু তিনিই শোনপাংশুদের দাদাঠাকুর। আবার তিনিই দর্ভকদের গোঁসাইঠাকুর। গুরুর আদেশে অচলায়তনের চারিদিকের আচার-নিষ্ঠার সীমাহীন অলঙ্ঘ্য প্রাচীর ভূমিসাৎ হইল। আশ্রমবাসিগণ গুরুর নিকট আত্মনিবেদন করিল। কেবল মহাপঞ্চক বলিলেন—'পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার। কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।'[৪] এইবার গুরু নূতনভাবে আবার আয়তনের পুনর্গঠন করিলেন।

একদা প্রকৃতির শান্ত তপোবনে আরণ্যক ঋষির কণ্ঠে হৃদয়ের সহজ সুরে এবং প্রীতি ও শ্রদ্ধার স্নিগ্ধ রসে সঞ্জীবিত অমৃতবাণী উদ্‌গীত হইয়াছিল। তাঁহাদের

১। অচলায়তন, ১৯৫৭, পৃঃ ১
২। ঐ , পৃ-৩১।
৩। ঐ , পৃ-৩৬।
৪। ঐ , পৃঃ ৯০-৯১।

সাধনা ছিল সহজ ও সরল। কিন্তু দীর্ঘকালের ব্যবধানে বৈদিক সাধনায় ক্রিয়াকাণ্ড, মন্ত্রতন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য দেখা দেয়। এইভাবে মানুষের প্রাণ যখন শুষ্কতা ও কঠোরতার পাষাণ পীড়নে মুমূর্ষু তখন বুদ্ধদেবের হৃদয় হইতে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমধারা নির্গত হইয়া সেই পাষাণস্তূপকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। কেবল বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেই নহে, এই রীতি যুগে যুগে সকল মহামানবের জীবনেই দেখা গিয়াছে। যখনই সঙ্কীর্ণতা ও আচারের স্তূপ পর্বত-প্রায় হইয়া সহজ সুন্দরের প্রকাশকে রুদ্ধ করিয়াছে তখনই নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তিকামী নূতন যুগস্রষ্টার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তিকামী-রূপে যাঁহার আবির্ভাব, দীর্ঘকালের ব্যবধানে তাঁহার অনুবর্তিগণ আবার সেই অর্থহীন যুক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করিতেছে। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে এই সত্য সর্বাপেক্ষা বেশী প্রযোজ্য। একদা বৈদিকধর্মের বাহ্য আড়ম্বর ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বুদ্ধের চিরন্তন আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কিছু কালের ব্যবধানে তাঁহার ধর্ম কেবল স্রষ্টার দেশনা ও আদর্শকেই হারাইয়া ফেলে নাই তান্ত্রিক বৌদ্ধদের আত্মবিস্মৃতির মধ্যে প্রতিপদে আচারের দাসত্ব ও মন্ত্রতন্ত্রের কুহেলীকে স্বীকৃতি জানাইয়াছে। পরবর্তী বৌদ্ধধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড ও সঙ্কীর্ণতার স্তূপ ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে মন্ত্রতন্ত্রই মননের স্থান অধিকার করিয়াছে। Buddhist Prayer wheel সংখ্যাতীত উৎকট দেবদেবী, মন্ত্র ও আচারগত সাধন সেই বিপর্যয় যুগের সৃষ্টি। এই যুগে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ বুদ্ধের স্থান দখল করিয়া ধর্মকে মঠ ও বিহারের সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া বিকৃত ক্রিয়াকাণ্ডের সীমাহীন প্রাচীর খাড়া করিয়াছে। 'অচলায়তন' নাটকেও আচার্য অদীনপুণ্যের কণ্ঠে এই তত্ত্বই স্বীকৃতি পাইয়াছে। একদা গুরু আয়তনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে আয়তনে বহু পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। 'গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; তার শুকনো পাতায় ক্ষুধা যতই মেটে না ততই পুঁথি কেবল বাড়াতে থাকি। খাদ্যের মধ্যে প্রাণ যতই কমে তার পরিমাণ ততই বেশী হয়। সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে। অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী,

গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।'[১] বুদ্ধদেবকে এইখানে গুরুরূপে এবং বৌদ্ধসংঘ বা বিহারকে অচলায়তনরূপে গ্রহণ করা যায়। লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ তাঁহার সদ্ধর্মের অমৃতবাণী লোকসমাজে প্রচারের জন্য বহুজনহিতায়, বহুজন সুখায় সংঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিন্তু কালক্রমে সেই সংঘের কি পরিণতি হইয়াছিল? মহাপরিনির্বাণের পর তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া সেই অনুযায়ী জীবনসাধনায় রত ছিলেন। কালক্রমে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা শাখায় বৌদ্ধ সঙ্ঘ বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের আচার্যগণ শিষ্যদের প্রতি নির্দেশ করিলেন—'ধারণী মুখস্থ কর, ধারণী জপ কর, ধারণী পূজা কর। তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ করিবে'। অসংখ্য অর্থশূন্য ধারণী মন্ত্রও প্রস্তুত হইল। কেবল তাহাই নহে অসংখ্য দেবদেবী, ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী এবং প্রেত ও ভৈরবও বৌদ্ধদের পূজা লাভ করিয়া বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশাধিকার পাইল। অচলায়তনের অধিবাসিগণ ধর্মের অর্চনার নামে রুদ্ধগৃহে যে পর্বতপ্রায় সঙ্কীর্ণতা ও আচারের স্তূপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা অবনমিত বৌদ্ধসংঘের ইতিহাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাট্য সমালোচক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও অচলায়তন সম্পর্কে লিখিয়াছেন—'অবশ্য এখানে কবি হিন্দু-সমাজকেই লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলিয়াছেন বটে, কিন্তু অচলায়তন বৌদ্ধ বিহারেরই সাদৃশ্য বহন করে এবং মন্ত্রগুলিও বৌদ্ধ তন্ত্রের মন্ত্রেরি মতো'।[২] নির্বাণবক্তা বুদ্ধদেবের মৈত্রীধর্ম কালক্রমে কেবল মন্ত্রতন্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ডে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল। অচলায়তনেও আয়তনিকদের আচার-নিষ্ঠা ও মন্ত্রতন্ত্রের চাপে সহজ সুন্দরের প্রকাশ রুদ্ধ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের চরম অবনতির যুগে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত হাজার বৎসরের মধ্যে কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য, উদয়নাচার্য, রামানুজ এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যুগপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া দার্শনিক ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। ইহারা ধর্মের মহান্ নীতিকে বরণ করিয়া প্রচলিত ধর্মের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। 'অচলায়তন' নাটকে গুরুও প্রাচীন যুগসংস্কারের ধ্বংসকারী এবং নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তিকামী যোদ্ধা।

'অচলায়তন' নাটকে যে সমস্ত দেবদেবীর নাম পাওয়া যায় যেমন একজটা, মহামারীচি পর্ণশবরী, মহামায়ূরী, মহাভৈরব, মহাশীতবতী, উষ্ণিষবিজয় প্রভৃতি

১। অচলায়তন, পৃঃ ৬৫। ২। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, ১৩৬৬, পৃঃ ৩১৯।

ইহারা সকলেই মহাযান বৌদ্ধ দেবায়তনের দেবদেবী। নাটকে উল্লিখিত অভয়ঙ্করী, চণ্ড ভট্টারিকা, বজ্রবিদারণ, গৃহমাতৃকা, মহাসহস্রপ্রমর্দিনী, মহামায়ূরী, হয়াহয়হৃদয় এবং ধ্বজাগ্রকেয়ূরী প্রভৃতি মন্ত্র ও ধারণী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ হইতে গৃহীত।[১] সুতরাং এই নাটক রচনাকালে তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী অনুষ্ঠানসর্বস্ব অবনমিত বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়স্থল বৌদ্ধ বিহারসমূহের ছবি কবির মনশ্চক্ষে আভাসিত হয় নাই তাহা বলা যায় না। তাহা যদি না হইয়া থাকে তবে তিনি হিন্দু দেবদেবী ও পূজাপদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ মন্ত্রতন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কেন?

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীও 'অচলায়তন' নাটকের পরিবেশের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা অপেক্ষা বৌদ্ধ বিহার ও আচার-ব্যবহার, মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাব অধিকতর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই মত যুক্তিপূর্ণ ও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

'অচলায়তনের দুর্ভেদ্য প্রাচীরবেষ্টিত অট্টালিকা ওদন্তপুরী, নালন্দা ও বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ বিহারকেই মনে আনিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল তপোবন। সেখানে অচলায়তনের মতো কেবল পুরুষ বিদ্যার্থীর বাস ছিল না। তপোবনগুলি জনপদ হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও জনপদের কাঠামোকে অনুসরণ করিত। তপোবনে গুরুর আশ্রম সংসারাশ্রমের ছাঁচে ঢালা, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা—সকলেরই সেখানে স্থান ছিল, যেসব বিদ্যার্থী আসিত, তাহারা পুত্রবৎ পালিত ও শিক্ষিত হইত। অচলায়তনে এ সব কিছুই নাই। ওখানকার সমাজব্যবস্থার ছাঁচটাই তপোবনের ছাঁচ হইতে স্বতন্ত্র। অচলায়তনের 'পিউরিটান' জীবনযাত্রার সহিত হিন্দুসমাজের যোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। অচলায়তনের পরিবেশ যেমন বৌদ্ধ বিহারের আদর্শে রচিত তেমনি ইহার অদ্ভুত রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার মন্ত্র ও মন্ত্রের নামের অধিকাংশই মহাযান মতবাদের সংগ্রহ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। বস্তুত নাটকখানির পরিবেশ হিন্দু সমাজের পরিচিত নহে।'[২]

'অচলায়তন' নাটকের গুরু পার্থিবদেহধারী ঈশ্বর নহেন, বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষ। অবদানে অজ্ঞান মূর্খ পন্থককে তাহার অকৃতকার্যতার জন্য মহাপন্থক সংঘ হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন। স্বয়ং আনন্দ তাহাকে শিক্ষা দিতে অস্বীকার

১। Sanskrit Buddhist Litarature of Napal, p 292
২। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯-৯০।

করিয়াছেন। কিন্তু লোকগুরু বুদ্ধদেব তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি জ্ঞানকে কেবল শিক্ষাপদ আবৃত্তির বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় করিয়াছেন। ভিক্ষুদের জুতা পরিষ্কার কার্যে নিরত পন্থকের অন্তরে বুদ্ধের 'রজো হরামি, মলং হরামীতি' দেশনার সত্যোপলব্ধি ঘটে। ইহাই জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়মূলক সাধনা। 'অচলায়তন' ও 'গুরু' নাটকে দাদাঠাকুরও এই কাজটিই সম্পন্ন করিয়াছেন। কর্মমার্গী শোণপাংশুদের সাহায্যে অচলায়তনের জ্ঞানের গণ্ডীকে ভাঙিয়া তিনি শুষ্ক জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চক ও মহাপঞ্চক চরিত্রের সঙ্গে অবদানের পন্থক ও মহাপন্থকের মিলও প্রণিধানযোগ্য। পন্থক মহাপন্থকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সে জন্ম-নির্বোধ ও মূর্খ। বৌদ্ধ সঙ্ঘে আশ্রয় লাভ করিয়া সে কোন শিক্ষাপদ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তিন মাসের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় একটি শিক্ষাপদ সে কণ্ঠস্থ করিতে পারে নাই অথচ তাহার কণ্ঠের আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে গোপালক-পশুপালকগণও তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার এই অযোগ্যতার জন্য মহাপন্থক তাহাকে বিহার হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। নাটকের পঞ্চকও মহাপঞ্চকের কনিষ্ঠভ্রাতা। সে পন্থকের ন্যায় মূর্খ নহে, সে জীবন-সাধনার রসপিপাসু, তাহার অভাবেই সে বিদ্রোহী। এই জন্যই অচলায়তনের শিক্ষাকে সে জীবনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। অচলায়তনে গুহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট মন্ত্র আবৃত্তি রত পঞ্চকের মূর্তি অবদানের পন্থকের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সাতদিনের প্রচেষ্টার পরেও বজ্রবিদারণ মন্ত্র তাহার মুখস্থ হয় নাই। সে মহাপন্থককে জানাইয়াছে—

'সাত দিন যেমন হয়েছে অষ্টম দিনেও অনেকটা সেইরকম। বরঞ্চ একটু খারাপ।'

মহাপঞ্চক—খারাপ। তার মানে কী হল।

পঞ্চক —জিনিসটা যতই পুরানো হচ্ছে মন ততই লাগছে না। ভুল ততই করছি—ভুল যতই বেশীবার করছি ততই সেইটেই পাকা হয়ে যাচ্ছে। তাই, গোড়ায় তোমরা যেটা বলে দিয়েছিলে আর আজ আমি যেটা আওড়াচ্ছি দুটোর মধ্যে অনেকটা তফাত হয়ে গেছে। চেনা শক্ত।[১]

এইখানে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চকের সঙ্গে অবদানের পঞ্চকের মিল পাওয়া

১। অচলায়তন, পৃঃ ১০।

যায়। আনুষ্ঠানিক সাধনায় তাহাদের হৃদয় সাড়া দেয় নাই। অবদানে বুদ্ধের আবির্ভাবে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়মূলক সাধনায় পন্থক সত্যের সন্ধান পাইয়াছে এবং কালে সেই বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করিয়াছে। 'অচলায়তন' নাটকেও গুরুর আবির্ভাবে পঞ্চকের জীবন-সাধনা চরম পরিপূর্ণতায় সার্থক হইয়াছে। বুদ্ধদেব পন্থককে গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। নাটকে দাদাঠাকুর পন্থককে অচলায়তনের ভাঙা ভিতের উপর আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী নূতন সৌধ রচনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন।

মহাপন্থক চরিত্রের সঙ্গে মহাপঞ্চকের মিল উভয়ের পাণ্ডিত্যে ও ধীশক্তিতে। অবদানকার তাঁহার আশ্চর্য ধীশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন 'স যদা মহান্ সংবৃত্তস্তদা নিপ্যামুপন্নস্তঃ, সংখ্যায়াং গণনায়াং মুদ্রায়াং ব্রাহ্মণিকায়ামীর্যায়াং শৌচে সমুদাচারে ভস্মগ্রহে ঔস্কারে ভোস্কারে ঋগ্বেদে যজুর্বেদে সামবেদেঽথর্ববেদে যজনে যাজনেঽধ্যয়নেঽধ্যাপনে দানে প্রতিগ্রহে। ষট্কর্মনিরতো ব্রাহ্মণঃ সংবৃত্তঃ। স পঞ্চশতগণং ব্রাহ্মণকর্ম ওঁ বাচয়িতু মারব্ধঃ।'[১] পিতার মৃত্যুর পর মহাপন্থক বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন। জ্ঞান ও সাধনাবলে বিহারের ভিক্ষুদের মধ্যেও তিনি অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অবদানকার বৌদ্ধ বিহারে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তির দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন। ধ্যানে ও অধ্যয়নে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়া তিনি বিহারের পঞ্চশত শিষ্যের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়চেতা ও জ্ঞানতপস্বী। রবীন্দ্রনাথের মহাপঞ্চকও জ্ঞানমার্গের সাধক। শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্রতন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং চরিত্রের কঠিন দৃঢ়তা তাঁহাকে নাটকের মধ্যে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। মহাপন্থকের ন্যায় তিনিও পিতার মৃত্যুর পর অচলায়তনে প্রবেশ করিয়াছেন। বিদ্রোহী ভ্রাতাকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—'পিতার মৃত্যুর পর কী দরিদ্র হয়ে, সকলের কী অবজ্ঞা নিয়েই এই আয়তনে আমরা প্রবেশ করেছিলাম। আর আজ কেবল নিজের শক্তিতে সেই অবজ্ঞা কাটিয়ে কত উপরে উঠেছি, আমার এই দৃষ্টান্তও কি তোমাকে একটু সচেষ্ট করে না?'[২] অবদানের মহাজ্ঞানী পণ্ডিত পন্থককে রবীন্দ্রনাথ আরো দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নাটকে মহাপঞ্চকের যে শক্তি

১। দিব্যাবদানম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২৭।

২। অচলায়তন, পৃঃ ১১।

—'সে শক্তি নিষ্ঠার শক্তি, অবিচলিত বিশ্বাসের শক্তি, প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া, বিচার-বিতর্ক-বুদ্ধিকে লোপ করিয়া, জীবন-মরণপণে সাধনাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার শক্তি।' ১

নৃত্যনাট্য শ্যামা

'কথা ও কাহিনী' কাব্যের 'পরিশোধ' কবিতাটিকে অবলম্বন করিয়া কবি নৃত্যনাট্য শ্যামা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মূল মহাবস্তু অবদানের 'শ্যামা জাতক'।[২] পরিশোধ কবিতায় শ্যামা জাতকের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। অবদানের শ্যামা চরিত্রে যে দুর্দমনীয় ভোগলিপ্সা ও ছলনার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিতায় কবি তাহার পরিসংস্কার করিয়াছেন। এখানে সে কেবল ছলনাময়ী বিলাসিনী নহে—নিষ্ঠুরহৃদয়া, প্রেমস্বর্গচ্যুতা হতভাগিনী। এই হতভাগিনী 'পরিশোধ' কবিতায় প্রেমাস্পদের ক্ষমাভিক্ষা পায় নাই, কিন্তু কবির অন্তরের এক কোণায় নিজের ঠাঁই করিয়া লইয়াছে। পরবর্তীকালে নৃত্যনাট্য শ্যামায় কবি তাহার কৃতপাপের বোঝা আরো হাল্কা করিয়া দিয়াছেন। এখানে সে ইন্দ্রিয় লালসাময়ী নয়, স্নেহমমতা ভালবাসায় গড়া নারী! অবদান আখ্যানের প্রবঞ্চনার আশ্রয় সে লয় নাই, আবার 'পরিশোধ' কবিতার ন্যায় নিদারুণ নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্তও তাহার জীবনে পাওয়া যায় না। রাজার কোটাল মহেন্দ্র-নিন্দিতকান্তি বজ্রসেনকে চোর বলিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া শ্যামা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহার প্রাণরক্ষার জন্য সে তাহার অনুগতদের নিকট আবেদন জানাইয়াছে—

ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো,
আছ কি বীর কোনো,
দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অন্যায় অপবাদে

এই আবেদন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের নিকট আবেদন। এই আবেদনে সাড়া দিয়াছে উত্তীয়। শ্যামার প্রেমের চরম মূল্য দিতে সে প্রস্তুত—

১। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩১১।

২। Mahāvastu Avadānaṁ, Senart, Vol. II, pp 166-77.

প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে,
নেবে মোর প্রাণ ঋণ
তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে
বাঁধা রব চিরদিন
মরণডোরে।

উত্তীয়ের মৃত্যু এখানে শ্যামা অনুনয় করিয়া মাগিয়া লয় নাই। ইহা এই গোপন প্রণয়ীর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্ঘ্য। অবদানে ভোজনপাত্রবাহী শ্রেষ্ঠিপুত্র নিজের অজ্ঞাতে শ্যামার ছলনায় মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'পরিশোধ' কবিতায় উত্তীয় শ্যামার অনুনয়ে বজ্রসেনের চুরির অপরাধ নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে আর শ্যামা নৃত্যনাট্যে এই মৌন প্রণয়ী স্বেচ্ছায় তাহার জীবন অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছে।

মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে
যারে জান নাই, যারে জান নাই, যারে জান নাই
তার গোপন ব্যথায় নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান॥[১]

কারাগারে প্রহরী উত্তীয়কে প্রাণদণ্ড প্রদানোদ্যত হইলে শ্যামা পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তীয়ের প্রাণ রক্ষা করিতে পারে নাই, আবার বজ্রসেনের নিকটও তাহার সুগভীর প্রেম উপেক্ষিত হইয়াছে। তাহার দুঃখ-ক্ষত অশ্রুজল সে মুছাইয়া দেয় নাই। বজ্রসেন নিষ্ঠুর ও ক্ষমাহীন। 'পরিশোধ' কবিতায় বজ্রসেনের অবজ্ঞা, অবহেলা ও ঘৃণা কুড়াইয়া অভাগিনী নারী চিরতরে ফিরিয়া গিয়াছে, অবদানে শ্যামা একবেণীধরা হইয়া বজ্রসেনের জন্য অপেক্ষা করিয়াছে। আর নৃত্যনাট্যে সে করুণা পারাবার বুদ্ধের চরণে আশ্রয়প্রার্থিনী হইয়াছে। বজ্রসেনের আঘাত ও ঘৃণার উপর কবি বুদ্ধের কল্যাণ ও করুণার ছায়াসম্পাত করিয়াছেন। বজ্রসেন জানে প্রেম ও মৈত্রীর আধার ভগবান বুদ্ধ শ্যামার মহাপাপ নির্বিকার প্রশান্ত চিত্তে ক্ষমা-সুন্দর চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিবেন—

জানিগো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।

১। নৃত্যনাট্য শ্যামা, ১৩৫৮, পৃঃ ৯।

ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজন শরণ প্রভু ॥ [১]

অবদান কাহিনীর শ্যামার পাপকে কবি সমর্থন করেন নাই কিন্তু তাহার সুগভীর প্রেমকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এজন্যই তাঁহার নৃত্যনাট্যে পাপীজন-শরণ বুদ্ধের চরণতলে প্রেম ও বেদনায় গড়া প্রতিমা শ্যামাকে তিনি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

১। নৃত্যনাট্য শ্যামা, পৃঃ ২১।

পরিশিষ্ট

(ক) প্রবন্ধ-নিবন্ধ—

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও চর্চার প্রভাবে বাঙালী জীবনে এক নূতন উৎসাহ ও প্রেরণা জাগ্রত হয়। বৌদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডারের ব্যাপক প্রচারের ফলে বৌদ্ধ বিষয়ক আলোচনায় প্রবল অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয়। এই অনুসন্ধিৎসার পরিচয় তাহার প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও দার্শনিক রচনা সমূহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যেও একটি অখণ্ড মানস চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধ সমূহের বিষয়বস্তু যেমন পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের উপকরণে সমৃদ্ধ তেমনই লেখকের পাণ্ডিত্য, চিন্তাশক্তি ও ভাবুকতার ঐশ্বর্যে সমাদৃত। দ্বিতীয় খণ্ডের গদ্য সাহিত্য পরিচ্ছেদে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা স্থান পাইয়াছে। বর্তমানে আরো কয়েকজন প্রবন্ধকার যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের সৃষ্টিকর্মের বিষয় উল্লেখিত হইল।

ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া

ভারতীয় দর্শন ও প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ ডক্টর বড়ুয়ার রচনার প্রধান গুণ ব্যাপক দৃষ্টি ও ভারততত্ত্বে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক ও দার্শনিক উভয় প্রকার মননশীলতার অধিকারী ছিলেন। মধ্যমনিকায় ১ম ভাগ গ্রন্থের পরিশিষ্টে আলোচিত 'ধ্যান, সমাধি ও সমাপত্তি', 'প্রতীত্যসমুৎপাদ ও নির্বাণ' এবং 'আত্মবাদ ও নির্বাণ' শীর্ষক আলোচনায় তত্ত্বসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রকাশ ভঙ্গীর ঋজুত্বের জন্য এই আলোচনা অনবদ্য হইয়াছে। ডক্টর বড়ুয়া ছিলেন প্রাচীন ভারতের ধ্যানী-পুরুষ। তাঁহার ধ্যাননেত্রে সেযুগের ভারতের যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিফলন ঘটিয়াছে তাহাই তাঁহার সমস্ত সৃষ্টিকর্মকে পূতস্পর্শ দান করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহার একান্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের দ্বারা তিনি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে মলিন করেন নাই। 'বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষ'[১]

১। Indian Research Institute কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম ভাগ

তাঁহার চিন্তার বলিষ্ঠতা ও তত্ত্বগভীর ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ করে। ইহা বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের গবেষণামূলক প্রথম কোষ গ্রন্থ। প্রথম খণ্ড ১ম ভাগে পিটক গ্রন্থাবলীর আলোচনায় বৌদ্ধগ্রন্থের সাধারণ নাম ও শ্রেণী বিভাগ পালি পিটক ভাগ, বুদ্ধ বচনের শ্রেণী বিভাগ, ত্রিপিটক বিভাগ, সুত্ত ও অভিধম্ম-পিটকের বিভিন্ন বিভাগ ইত্যাদি আলোচনা স্থান পাইয়াছে। এই আলোচনার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পালি পিটক গ্রন্থাবলী সম্বন্ধীয় মৌলিক গবেষণা এবং ডক্টর বড়ুয়ার নিজস্ব গবেষণালব্ধ জ্ঞান, উপস্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধ মহা-সঙ্গীতিসমূহের বিবরণ মহাবীরের নির্বাণ ও বুদ্ধের পরিনির্বাণের ব্যবধান, উভয়ের সমসাময়িকতা এবং মহাবীর ও বুদ্ধের কাল নির্ধারণ বিষয়ক আলোচনায় তাঁহার সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক চেতনা ও তীক্ষ্ণ বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি'[১] গ্রন্থটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত বৌদ্ধ বিবাহমন্ত্রের সংশোধন মানসে তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বৌদ্ধদের বিশ্বাস সূত্র বা মন্ত্রদ্বারা বিবিধ ভয়, রোগ-শোক, অশান্তি ও উপদ্রব দূর হয় এবং শ্রোতার ও পাঠকের সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হয়। ডক্টর বড়ুয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে এই পরিত্রাণ সূত্রের উদ্ভব ও লৌকিক বৌদ্ধধর্মে ইহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে যুক্তি-নির্ভর আলোচনা করিয়াছেন। পরিত্রাণ সূত্রগুলিকে তিনি লৌকিক বৌদ্ধধর্মে দেববাদ, মন্ত্রবাদ ও নামবাদের বাহক বলিয়াছেন। তাঁহার মতে হিন্দু বা আর্যগুহ্যমন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধ পরিত্রাণ সূত্রসমূহের রচনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি খন্ধ পরিত্তের মূল ঋগ্বেদের অগস্ত্য সূক্তে, মোর পরিত্তের মূল সূর্যোপাসনায় এবং ধজগ্গ পরিত্তের মূল ধূমকেতু বিষয়ক রচনায় আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে পরিত্রাণ সূত্রগুলি বৈদিক মন্ত্রের রূপান্তর মাত্র। এই প্রসঙ্গে সহজ ভঙ্গীতে একটি ঐতিহাসিক সত্যকে তিনি স্বীকৃতি জানাইয়াছেন—

"আমরা যতই অতীতের দিকে অগ্রসর হই না কেন দেখিতে পাইব যে সর্বত্রই একটি মানব গৃহ্য ধর্মের ধারা রহিয়াছে এবং এই ধারার সহিত বিরোধ রফারফি করার ফলেই ব্রাহ্মণ্য, আজীবিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি উচ্চতর ধর্মের যুগে যুগে অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। একথা সত্য যে এ সকল উচ্চতর ধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যের ন্যায় আর কোনও ধর্ম মানব গৃহ্য ধর্মকে আত্মস্থ করিতে পারে নাই, অপর কোন ধর্ম নিজের সঙ্কীর্ণতা ও উদারতা দর্শন ও কুসংস্কার, বিধি ও ব্যবস্থা, সত্য শিব ও সৌন্দর্য দিয়া একটি পূর্ণায়ত হিন্দুধর্ম গঠন করিতে

১। কলিকাতা, ১৯২২।

পারে নাই।"[১] 'বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান'[২] প্রবন্ধে তিনি বৌদ্ধ বাঙালীদের রচিত শতবর্ষের বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ রচনা ইতিপূর্বে আর পাওয়া যায় নাই। 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া তরুণ বয়স, হইতে তিনি প্রচুর চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। 'শাক্য, লিচ্ছবি ও বৃজি বংশের ধ্বংস কাহিনী'[৩] নামক প্রবন্ধটি জাতক মজ্ঝিমনিকায় ও হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত। 'বৌদ্ধধর্ম ও পুনর্জন্ম'[৪], 'ভারুত ভাস্কর্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য'[৫], 'বৌদ্ধ দর্শনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব'[৬] এবং 'মারের ঐতিহাসিক তত্ত্ব'[৭] প্রবন্ধ সমূহ তাঁহার গভীর মননশীলতা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে।

বিমলাচরণ লাহা

ডক্টর লাহা বাস্তবধর্মী ও বিচার বিশ্লেষণী মননশীলতার অধিকারী ছিলেন। তিনি 'গৌতম বুদ্ধ', 'প্রেততত্ত্ব', 'বৌদ্ধরমণী, 'বৌদ্ধযুগের ভূগোল' গ্রন্থের প্রণেতা। বাংলা সাহিত্যে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের পরে তিনিই বুদ্ধদেবের ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ জীবনী গ্রন্থ[৮] প্রণয়ন করেন। পালি ও সংস্কৃত উৎস হইতে এই গ্রন্থে লেখক অনেক তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বুদ্ধ-জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী নিষ্ঠাসহকারে ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উপস্থাপিত হইয়াছে। বুদ্ধের জন্ম, শৈশব ও যৌবন, গৃহত্যাগ, সত্যের অনুসন্ধান, বুদ্ধত্বলাভ, ধর্মপ্রবর্তন ইত্যাদি আলোচনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বুদ্ধ ও পরিব্রাজক, বুদ্ধ ও নিগ্রন্থ, বুদ্ধ ও রাজন্যবর্গ, বুদ্ধ ও নারী প্রভৃতি পরিচ্ছেদে লেখক গৌতমবুদ্ধের ন্যায় মহান্ ব্যক্তিপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া সেযুগের পরিচয় সুস্পষ্ট করিয়াছেন। 'বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেততত্ত্ব' বাংলা ভাষায় এই ধরনের প্রথম গ্রন্থ। বৌদ্ধ সাহিত্যে লোকান্তরিত প্রাণীকে 'প্রেত' বলা হয়। 'পেতবত্থু' পালি খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত গাথায় রচিত একখানা মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থে পাপীরা কোন পাপে কোন প্রেত যোনি প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ শাস্তি ভোগ করে তাহার বর্ণনা আছে। পেতবত্থুর

১। ঐ, মুখবন্ধ, পৃঃ ৸৶—৸৵
২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, দ্বিপঞ্চাশৎ ভাগ, ১৩৫২
৩। জগজ্জ্যোতি, পুরাতন পর্যায় ৫ম—১০ম বর্ষ ধারাবাহিক
৪। ঐ, ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা
৫। তরুণ বৌদ্ধ, ১ম বর্ষ, ১৯২৬
৬। জগজ্জ্যোতি, ৭ম বর্ষ
৭। ঐ, ৮ম বর্ষ
৮। গৌতমবুদ্ধ, কলিকাতা, ১৩৪৫

অট্ঠকথায়ও প্রেতগণের বিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ডক্টর লাহা প্রথমতঃ তাঁহার গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত সমাজে গ্রন্থটি সমাদৃত হইলে তিনি তাহা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। 'প্রেততত্ত্ব' গ্রন্থে পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেততত্ত্ব, পেতবত্থু ও তাহার ভাষ্য পরমত্থদিপনী গ্রন্থে প্রেতের আলোচনা এবং উপসংহার অংশে লেখকের প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে গভীর গবেষণা ও ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া পালি সাহিত্যে উল্লেখিত কেন্তুপমা পেত, শূকরমুখ পেত, পূতিমুখ পেত, তিরোকুড্ড পেত প্রভৃতি সম্বন্ধে সুন্দর কাহিনীও ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। 'বৌদ্ধ রমণী'[১] গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে অন্যতম বিশিষ্ট রচনা। এই গ্রন্থে লেখক মূল পালি গ্রন্থের প্রমাণ সাপেক্ষে বৌদ্ধযুগের উদ্বাহতত্ত্ব ও ক্রীতদাসী প্রথা, নর্তকী ও বারবনিতাদের প্রসঙ্গ, মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা, বৌদ্ধ সঙ্ঘে নারীদের প্রবেশ ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘ গঠন এবং বহু খ্যাতনামা ভিক্ষুণী ও উপাসিকার জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি তাঁহার তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানচর্চার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের ভৌগোলিক তথ্য সমূহ আহরণ করিয়া তিনি 'বৌদ্ধযুগের ভূগোল'[২] গ্রন্থে পরিবেশন করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় প্রণীত তাঁহার Geography of Early Buddhism গ্রন্থ পাঠক সমাজে সগৌরবে স্বীকৃতি লাভ করায় তিনি বাংলা ভাষায় বৌদ্ধযুগের ভূগোল প্রণয়ন করেন। বাংলা ভাষায় ইহাই প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক গবেষণামূলক প্রথম গ্রন্থ। বুদ্ধদেব মধ্যদেশে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ও এই অঞ্চলে অতিবাহিত হয়। এইজন্য মধ্যপ্রদেশের উল্লেখ প্রাচীন পালি সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। ডক্টর লাহা জাতক, নিকায়, বুদ্ধঘোষের সমগ্র টীকাগ্রন্থ, মিলিন্দ প্রশ্ন, দীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি পালি গ্রন্থ এবং চৈনিক পর্যটকদের কাহিনীর অন্তর্গত ভৌগোলিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া 'বৌদ্ধযুগের ভূগোল' প্রণয়ন করিয়াছেন। 'লিচ্ছবি জাতি' তাঁহার অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ডক্টর লাহা পালি ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলি যেমন তথ্য পরিপূর্ণ ও সারগর্ভ তেমনি মৌলিক গবেষণার পরিচয়বাহী। অধ্যয়ন সাপেক্ষ ও গবেষণা প্রসূত প্রামাণ্য তথ্যাদি মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া ডক্টর লাহা তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ ছাড়াও

১। কলিকাতা, ১৯২৯
২। কলিকাতা, ১৯৩৪।

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু বৌদ্ধ বিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ সমূহের মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধযুগের ভারতের প্রকৃত ঐতিহাসিক চিত্র উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইয়াছেন।

বটকৃষ্ণ ঘোষ

দার্শনিক চিন্তাশীলতার স্বাতন্ত্র্যে এবং তীক্ষ্ণ বিচার বিতর্কমূলক আলোচনার বৈশিষ্ট্যে বটকৃষ্ণ ঘোষের প্রবন্ধ সমূহ উপভোগ্য হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তিনি প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। Prabodh Basu Mullick fellowship Lectures রূপে প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহ তাঁহার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করিতেছে। ইহার প্রথম প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানবাদের ক্রমবিকাশ১'-এ আদি বুদ্ধ-বচন ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিশেষে শান্তরক্ষিতের বিজ্ঞানবাদে পরিণতি লাভ পর্যন্ত মোট চতুর্দশ শতাব্দীর বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত দর্শনের মধ্যেই বৌদ্ধ দর্শনের সমস্ত মূলতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। বেদান্তের ব্রহ্মবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতি এবং যোগদর্শনের প্রায় সমস্ত মূল তত্ত্বগুলিকেই ভিত্তি করিয়া বৌদ্ধ দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদান্তের ব্রহ্মেরই বৌদ্ধ নাম বিজ্ঞান। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষের শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বৌদ্ধ দর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে।' শূন্যবাদী বৌদ্ধ ও ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকের মধ্যে অতি নিপুণভাবে একটি যোগসূত্র তিনি ধরিয়া দিয়াছেন। বসুবন্ধু তাঁহার 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি-বিংশতি' গ্রন্থে নিজের মতবাদের যে পরিচয় দিয়াছেন, বটকৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার 'বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি'২ প্রবন্ধে তাহার সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। 'বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা৩ প্রবন্ধে বুদ্ধদেবের নাস্তিক্য অপবাদ নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'ব্রহ্ম' ও 'বিজ্ঞান' দুই সমভাবে universal medium ; এইজন্যই তাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। ন্যায় বৈশেষিক মত ও কমলশীলের কারিকা আলোচনা করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন কিভাবে নৈয়ায়িকদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া শান্তরক্ষিত ও কমলশীল ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'শব্দব্রহ্মবাদ'৪ প্রবন্ধ শান্তরক্ষিত দ্বারা প্রথমে শব্দবাদ ও পরে ব্রহ্মবাদ খণ্ডনের ধারাবাহিক ও যুক্তিধর্মী আলোচনা। 'ন্যায়মতে

১। পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৪৫।
২। ঐ, আশ্বিন, ১৩৪৫
৩। ঐ, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫
৪। ঐ, চৈত্র, ১৩৪৫

আত্মবাদ'[১] প্রবন্ধদ্বয়ে আত্মার নিত্যত্ব ও সর্বব্যাপকতা এবং অনাত্মবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তরক্ষিতের প্রচেষ্টার বিচারবিশ্লেষণ। 'ক্ষণিকবাদ'[২] প্রবন্ধত্রয়েও লেখকের বিশ্লেষণীবৃত্তি ও পাণ্ডিত্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। নৈয়ায়িক বস্তুর অক্ষণিকত্বে বিশ্বাসী। বৌদ্ধেরা বলেন, প্রথম ক্ষণের বস্তু ও দ্বিতীয় ক্ষণের বস্তু এক নয়। পতঞ্জলি, জৈমিনি, কুমারিল, উদ্যোতকর, শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের মতবাদ আলোচনা করিয়া লেখক এই গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সর্বশেষে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, বৌদ্ধ ও নৈয়ায়িকের এই বিচার অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। কারণ, কোন পক্ষই উভয়বাদীসম্মত কোন দৃষ্টান্ত আহরণ করিতে পারেন নাই। 'মীমাংসকের মতে আত্মবাদ'[৩] প্রবন্ধে লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মীমাংসকেরা যাহাকে নিত্যবস্তু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন বৌদ্ধদের নিকট তাহাই নিরালম্ব ভ্রান্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 'জৈন ও বাৎসীপুত্রীয় মতে আত্মবাদ'[৪] প্রবন্ধে বাৎসীপুত্রীয় সম্প্রদায়ের আত্মবাদের প্রতি প্রবণতা আলোচিত হইয়াছে। 'প্রজ্ঞাপারমিতা'[৫] প্রবন্ধও লেখকের বলিষ্ঠ চিন্তা প্রসূত রচনা। তিনি বোধ্যবোদ্ধাহীন বুদ্ধিকে প্রজ্ঞাপারমিতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিজ্ঞানবাদী প্রজ্ঞাপারমিতা বেদান্তের অদ্বয় জ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র। সমন্বয়বাদী দৃষ্টি ও দার্শনিক প্রজ্ঞা তাঁহার প্রতিটি প্রবন্ধে পরিস্ফুট হইয়াছে। লেখকের নৈয়ায়িক সুলভ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশে প্রবন্ধ সমূহ উপভোগ্য হইয়াছে। 'হিন্দু ও বৌদ্ধ'[৬] প্রবন্ধটিও লেখকের বিশ্লেষণী শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

অনন্তকুমার ভট্টাচার্য

অনন্তকুমার ভট্টাচার্যের 'বৈভাষিক দর্শন'[৭] বাংলা ভাষায় লিখিত দর্শন গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার রচনায় দার্শনিক ভাবানুভূতি অপেক্ষা যুক্তিবোধের প্রাধান্য অধিক। ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি অক্ষণিকত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে ক্ষণিকত্ববাদী ও ঈশ্বরের অকর্তৃত্বে বিশ্বাসী বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনায় লেখক যুক্তিতর্কের

১। পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৪৬
২। ঐ, অগ্রহায়ণ,—১৩৪৬, মাঘ,—১৩৪৬, ফাল্গুন,—১৩৪৬
৩, ৪। ঐ, ভাদ্র, কার্তিক, ১৩৪৬
৫। ঐ, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯,
৬। ঐ, বৈশাখ, ১৩৪৩ ৭। ওরিয়েন্ট, ১৯৫৫

তীক্ষ্ণ মানদণ্ড ব্যবহার করিয়াছেন এবং মূল দার্শনিক প্রশ্নের স্বপক্ষের ও প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্কের চাতুর্যকে অতি নিপুণভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

অমূল্য সেন

ডক্টর অমূল্য সেনের 'অশোকলিপি'[১] ও 'বুদ্ধকথা'[২] বৌদ্ধ বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ। টীকা টিপ্পনীসহ সম্রাট অশোকের অনুশাসনাবলীর বঙ্গানুবাদ অশোক লিপি গ্রন্থে এমন সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, যাহাতে পাঠকের সন্দেহের নিরসন হইতে পারে। লিপির প্রাপ্তিস্থান, ভাষা, বর্ণমালা, পাঠান্তরও লেখক সহজবোধ্য ভাষায় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বাংলা ঐতিহাসিক সাহিত্যে একটি বিশেষ সংযোজনরূপে 'অশোকলিপি' স্থান পাইবার যোগ্য। মূল পালি গ্রন্থ, সিংহলী পালি গ্রন্থ, অট্ঠকথা, ললিতবিস্তর, বুদ্ধচরিত, জিনচরিত, মহাবস্তু, দিব্যাবদান প্রভৃতি পালি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থের উপকরণ আহরণ করিয়া তিনি তাঁহার 'বুদ্ধকথা' গ্রন্থে তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের শাশ্বতবাণী তাঁহার অন্তরে যে ভাবপুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়াছে, 'বুদ্ধকথা' গ্রন্থে তাহার রসমাধুর্য উপভোগ করা যায়। 'অশোকচরিত'[৩], 'রাজগৃহ ও নালন্দা'[৪] গ্রন্থ লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনা।

অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পালি, সংস্কৃত ও তিব্বতী ভাষায় সুপণ্ডিত ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী ভাষায় বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা। সম্প্রতি 'বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম,[৫] নামে তাঁহার একটি বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে পূর্বসূরিগণ বাংলাভাষায় নানাগ্রন্থে আলোচনা করিলেও এই গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইতে চরম পরিণতি পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনা স্থান পাইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রসার, বৌদ্ধ সংঘ, বৌদ্ধ সাহিত্য, শিক্ষাপদ্ধতি এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তার বিষয়ে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। হীনযান-মহাযান প্রভৃতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আলোচনাও তাঁহার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে বাংলায় লেখা আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। চুল্লবগ্গ ও সিংহলী ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বৎসর পরে বৌদ্ধসঙ্ঘে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। বৈশালীতে আহূত দ্বিতীয়

১। কলিকাতা, ১৯৫৩ ২। কলিকাতা, ১৯৫৫ ৩। জিজ্ঞাসা, ১৯৬৬
৪। কলিকাতা, ১৩৫৮ ৫। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৬

মহাসঙ্গীতিতে বৃজিপুত্র নামক অপরাধী ভিক্ষুরা সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৈশালীর উপকণ্ঠে এক মহাসঙ্গীতি আহ্বান করেন। দশ হাজারাধিক ভিক্ষু তাহাতে যোগদান করেন। এই সময় হইতে প্রাচীন পন্থীরা হীনযানী বা থেরবাদী বা স্থবিরবাদী এবং মহাসঙ্গীতিতে যোগ দানকারীরা মহাসাংঘিক নামে অভিহিত হইলেন। কালক্রমে স্থবিরবাদীগণ ১১টি শাখায় এবং মহাসাংঘিকেরা ৭টি শাখায় বিভক্ত হইয়া প্রাচীন বৌদ্ধসংঘ মোট ১৮টি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্প্রদায়গুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ধারা আলোচনা করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত অনুরূপ সুচিন্তিত বিষয় সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয় নাই। স্বল্প পরিসর একখানি গ্রন্থের অবয়বের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বিপুল বিস্তৃত ইতিহাস—তাহার অভ্যুদয়, উত্থান ও পরিণামকে সংক্ষিপ্ত অথচ অখণ্ড সামঞ্জস্যে উপস্থাপিত করিয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যে তাঁহার সহজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শিল্পকলা ও শিক্ষাসংস্কৃতি

বুদ্ধদেবের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার ধর্মের উদারতা ভারতীয় শিল্পে—ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় ও মূর্তিতত্ত্বে এক নূতন দিগন্ত রচনা করিয়াছিল। ভারত-শিল্পীর ছেদনী ও তুলির রেখায় রেখায় সেদিন সুন্দরের দেবতা নয়নাভিরাম ভঙ্গীতে নিজেকে ধরা দিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন, হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, নীহাররঞ্জন রায়, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, অজিত ঘোষ প্রমুখ শিল্প রসিক লেখকদের রচনায় সেই অনিন্দ্য শিল্প-সৌন্দর্যের রসোজ্জ্বল আলোচনা স্থান পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধ শিল্প'[১] এবং দীনেশচন্দ্র সেনের 'প্রজ্ঞাপারমিতা'[২] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি বুদ্ধ প্রতিমা'[৩], 'দশম শতকে গৌড়ীয় শিল্প'[৪] এবং 'গৌড়ীয় শিল্পের আদিযুগ'[৫], প্রবন্ধসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সুযোগ্য পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধদের দেবদেবীর বিষয়ে ইংরেজী ভাষায়

১। জগজ্জ্যোতি, পুরাতন পর্যায়, ২য় বর্ষ, ১ম সং, ১৩১৬।
২। ঐ, ৩য় বর্ষ, ২য় সং।
৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বিংশ ভাগ, ১৩২০।
৪। প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৫।
৫। ঐ, বৈশাখ, ১৩৩৫।

প্রচুর গবেষণা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহার বাংলাভাষায় লিখিত 'বৌদ্ধদের দেবদেবী' (বিশ্বভারতী, ১৩৬২) বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আদিবুদ্ধ বোধিসত্ত্বগণ, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ ও তাঁহাদের কুল, দার্শনিক দেবতা এবং বৌদ্ধবেশে হিন্দুদেবতাসম্পর্কে আলোচনা স্থান পাইয়াছে। 'ছদ্মবেশে দেবদেবী'[১] প্রবন্ধেও লেখক হিন্দু তন্ত্রোক্ত দশ-মহাবিদ্যার সঙ্গে সাধনমালায় বর্ণিত বৌদ্ধ দেবদেবীর তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'বৌদ্ধদের পূজা কি পৌত্তলিক' প্রবন্ধটিও (মানসী ও মর্মবাণী, ১৩৩৩, ৪র্থ সং) বিশেষ মূল্যবান। শিল্পী অসিত হালদারের 'বৌদ্ধযুগের চিত্রকলায় শান্তরস[২] ও 'বৌদ্ধধর্মে ভারতশিল্পের অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয়'[৩] প্রবন্ধদ্বয়ে ভারত শিল্পের মর্মবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। শান্তি ও সৌকুমার্যই হিন্দু-বৌদ্ধযুগের শিল্পের বৈশিষ্ট্য। জীবনের দুঃখকে জয় করার মহৎ সাধনার মধ্য দিয়াই ভারতের ধর্ম, দর্শন ও সুকুমার কলাশিল্পের অভ্যুদয়। এইজন্য লেখক অজন্তা ও অন্যান্য বৌদ্ধচিত্র ও ভাস্কর্যে শান্ত বেদনা ও স্নিগ্ধতা, শালীনতা ও শান্তির রস আস্বাদন করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন প্রাচীন পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যেই ভারতীয় শিল্প ও দর্শনের তথ্য নিহিত আছে। সাধনার দ্বারা তাহার পুনরুদ্বোধন আবশ্যক। দেশের শিল্পকে উপলব্ধি করার জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে ভারতশিল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়।

'বাংলার ভাস্কর্য' ও 'বাংলার লোক শিল্প' গ্রন্থের প্রণেতা কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বৌদ্ধ মূর্তিকলা ও ভাস্কর্যের বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার মধ্য দিয়া প্রকৃতই রূপরস বিমুগ্ধ সহৃদয় শিল্প রসিকের পরিচয় আভাসিত হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ ভারহুত স্তূপের সৌন্দর্য-নিকেতনে প্রবেশ করিয়া ভাবতন্ময়চিত্তে তিনি স্তূপপ্রাকারের নিখুঁত সৌন্দর্য, উৎকীর্ণ নানা নক্সার সুনিপুণ কলাকৌশল এবং অনবদ্য সৌন্দর্যের প্রতীক মূর্তি নিচয় নিরীক্ষণ করিয়া ভারতীয় তক্ষণশিল্পে ইহাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন।[৪] 'ভারত শিল্পে যক্ষ-যক্ষিণী'[৫] প্রবন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত—প্রাক্ বৈদিক ভারতের অসংস্কৃত জনগণের অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতা হইতে

১। হরপ্রসাদ সম্বর্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড, ১৩৩৯।
২। জগজ্জ্যোতি, ১ম বর্ষ, ২য় সং, ১৩৫৭।
৩। ঐ, ১ম বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সং, ১৩৫৮।
৪। ঐ, ৫ম বর্ষ, ১ম সং, ১৯৫৪, 'ভারহুতের মূর্তিকলা' প্রবন্ধ।
৫। ঐ, ৩য় বর্ষ, ১ম সং, ১৩৫৯।

যক্ষ-যক্ষিণীদের আবির্ভাব; কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতি ইহাদের ধ্বংস করিতে পারে নাই। বরং বৈদিক দেবদেবীগণ ইহাদের সঙ্গে আপোষ ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। পালি সাহিত্যে ও প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পে ক্রম বিবর্তনের এই স্তর ধরা পড়িয়াছে। লেখক এই বিবর্তনের মধ্যে ভারতসংস্কৃতির পৌনঃপুনিকতা ও অনির্বাণ প্রাণশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 'প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পের বিবর্তন'[১] প্রবন্ধে অশোকের শিলাস্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষস্থ মূর্তি, ভারহুতের ও সাঁচীর স্তূপবেষ্টনী ও মথুরার প্রতিমা সমূহের শিল্পকলার মধ্য দিয়া বৌদ্ধ শিল্পের ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। ভারহুত শিল্পকে নিম্ন স্তরের লোকশিল্প বলিয়া যাঁহারা অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া তিনি ইহাকে 'সুদূর প্রসারী সম্ভাবনাপূর্ণ সাধারণ শিল্প ধারারই প্রথম রূপায়ণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাজা মহারাজাদের অর্থানুকূল্যে নয়, পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীদের অর্থানুকূল্যে ভারহুতের স্তূপ প্রাকারের অনিন্দ্য শিল্পাগার গড়িয়া উঠিয়াছে।[২] বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের অন্যতম সম্পদ শাক্যরাজ মহিষী সৌভাগ্যবতী মায়াদেবীর স্বপ্ন। এক অপূর্ব সুন্দর শ্বেত-মাতঙ্গ উর্ধ্বলোক হইতে ধীর মন্থর গতিতে অবতরণ করিয়া মায়াদেবীর দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন—এই কাহিনী পালি নিদানকথা, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও ললিতবিস্তরে কাব্যরূপ পাইয়াছে। ভারহুত, সাঁচী, গান্ধার, মথুরা ও অমরাবতী শিল্পে এই শ্বেত গজোত্তম বিশ্বজগতে বুদ্ধের আবির্ভাব সূচনা করিতেছে। ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহামায়ার দিব্য স্বপ্ন'[৩] প্রবন্ধে মহামায়ার স্বপ্ন দর্শন, শ্রী বা সিরি দেবতা ও লক্ষ্মী এবং জৈন চিত্রাবলীতে মহাবীর জননী ত্রিশলার স্বপ্ন দর্শন ইত্যাদির বর্ণনা সাহায্যে ভারত সংস্কৃতির অবিভাজ্য প্রবাহ প্রদর্শিত হইয়াছে। তুলনাত্মক তথ্যগৌরবে ও লেখকের সূক্ষ্ম ভাবদৃষ্টির আলোক সম্পাতে প্রবন্ধটি সমুজ্জ্বল।

হারাণচন্দ্র চাকলাদারের 'উড়িষ্যার সুবৃহৎ প্রাচীন বৌদ্ধ পীঠ'[৪] প্রবন্ধে উদয়গিরি, ললিতগিরি, রত্নগিরি প্রভৃতি গিরিত্রয়ের বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্বমূর্তি ও অন্যান্য দেবীমূর্তি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পাইয়াছে। গৌড়ের গৌরবের

১। জগজ্জ্যোতি, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং, ১৯৫৩।
২। নালন্দা, ৩য় বর্ষ, ২য় ও ৩য় সং, ১৩৭৫।
৩। নালন্দা, ১ম বর্ষ, শ্রাবণী পূর্ণিমা, ১৩৭৩।
৪। প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৫।

দিনে যখন বৌদ্ধ শিল্প অঙ্গ-বঙ্গ-মগধকে পরিপ্লাবিত করিয়া বহির্ভারতেও বিস্তার লাভ করিতেছিল সেই সময় এই শিল্পের একটি তরঙ্গ এই তিনটি গিরিশিখরকে স্পর্শ করিয়া উড়িষ্যাকে একটি বৌদ্ধ পীঠস্থানরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধকার বৌদ্ধকলাশিল্পের সেই স্নিগ্ধভাবচ্ছবির নৈপুণ্য বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারতীয় প্রাচীন চিত্র শিল্পের দুই তীর্থ—অজন্তা ও বাঘগুহা। ভারত ইতিহাসের গৌরবময় যুগে যখন বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিতেছে সেই সময় বাঘগুহা নির্মাণ করা হয়। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী তাঁহার 'বৌদ্ধ কলাশিল্পের অনুপ্রেরণা ও বাঘগুহার পরিচয়'[১], প্রবন্ধে গুহার বর্ণনা, অলঙ্কার চিত্র, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ দৃশ্যে সিদ্ধার্থ ছন্দক ও কণ্টক, গৌতমী ও যশোধরার বিলাপ ইত্যাদি চিত্রের আলোচনা করিয়াছেন। 'গান্ধার শিল্পকলার অবতরণিকা'[২] এবং 'গান্ধার শিল্পকলা'[৩] প্রবন্ধদ্বয় এই লেখকের গভীর রূপচেতনার পরিচয়বাহী। গান্ধার ভাস্কর্যের বুদ্ধমূর্তি, হারীতী ও কুবের মূর্তির সত্য পরিচয় তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পীর তপস্যা তখনই সার্থক হইয়াছে যখন দেহকে আশ্রয় করিয়া দেহাতীতের আভাস পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গান্ধার শিল্প হেলেনীক্ আদর্শে অনুপ্রাণীত হইয়া বাহ্য মাংসল সৌন্দর্যকে সার্থক শিল্প সৃষ্টিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। গান্ধার ভাস্কর্যের পর অমরাবতী শিল্প ভারতীয় স্থাপত্যে গৌরবের আসন লাভ করিয়াছে। মূর্তি শিল্পই অমরাবতীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অজিত ঘোষ তাঁহার 'অমরাবতী ও তাহার ভাস্কর্যশিল্প'[৪] প্রবন্ধে অমরাবতীর প্রস্তর বেষ্টনী, স্তূপ, এবং খোদিত মূর্তির অননুকরণীয় শিল্প চাতুর্য ও সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের এই সুবর্ণ যুগে চিত্রকলাও উন্নতির শীর্ষ বিন্দুতে আরোহণ করে। অজন্তা, বাঘ, নাসিক, বেদসা, কার্লে, ভাজা প্রভৃতি গুহামন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া বৌদ্ধ শিল্পকলা পরিপুষ্টি লাভ করে। অজন্তার চিত্রকলার শিল্প নৈপুণ্য আলোচনা প্রসঙ্গে অজিত ঘোষ তাঁহার 'বৌদ্ধ শিল্পকলার আদর্শ ও অজন্তা গুহা[৫], প্রবন্ধে অজন্তা চিত্রের ভাব ব্যঞ্জনা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণা নদীর তীরে ও

১। পঞ্চপুষ্প, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং, ১৩৩৮
২। ঐ, শ্রাবণ
৩। ঐ ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সং, ১৩৩৮
৪। ঐ, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৯
৫। ঐ, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৯

অদূরবর্তী স্থানে গুণ্টুর জেলায় ইহা গড়িয়া উঠে। খৃঃ প্রথম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় চারি শতাব্দী অমরাবতী স্তূপের শিল্প সজ্জা ও শোভন কার্য চলিয়াছিল।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের 'গুণ্টুর জেলায় নূতন বৌদ্ধ শিল্পের আবিষ্কার'[১] প্রবন্ধ অমরাবতীর প্রাচীর বেষ্টনীর নাগরাজ মূর্তি, অনুপম দেহ সৌন্দর্যের অধিকারিণী যক্ষিণীমূর্তি, প্রেম লীলারত স্ত্রীপুরুষ, ছদ্দন্ত ও বেস্‌সন্তর জাতক কাহিনী, বুদ্ধের মার জয়, যশোধরার নিকট আগমন ও ধর্ম প্রচার ইত্যাদি দৃশ্যাবলী তাঁহার রূপরস বিমুগ্ধ চিত্তে যে সৌন্দর্য প্রভা বিচ্ছুরিত করিয়াছে তাহার শোভন সংযত প্রকাশ। 'ব্রহ্মদেশে বোধিসত্ত্ব লোকনাথ ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অন্যান্য দেবতা'[২] প্রবন্ধে ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব লোকনাথের একক মূর্তি এবং তারা ও হয়গ্রীব শোভিত মূর্তি, চাউবাউচ্যি মন্দিরের দেওয়ালের প্রাচীরে অঙ্কিত মূর্তি এবং হ্‌মজো (Hmawza) গ্রামে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্তির শিল্প পরিচয় দিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে মহাযান বৌদ্ধধর্মের আরো কয়েকটি দেবতা, তারা, মঞ্জুশ্রী এবং মিলনাবদ্ধ নরনারীর মূর্তির গড়ন ও মণ্ডনকলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'অজন্তা গুহার চিত্রাবলী'[৩] প্রবন্ধে অজন্তা গুহায় চিত্রাঙ্কনের কাল ও চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। সাজির ফুল ফেলা, সৌখিন বাবু, রাজকুমার সিদ্ধার্থ, ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বুদ্ধদেব, বুদ্ধের নিকট মাতা ও সন্তান, রমণীর প্রণয় নিবেদন, ছয়দন্ত জাতকের ছবি, বুদ্ধদেবের ধর্ম প্রচার, বিজয় সিংহের লঙ্কা জয় ও অভিষেক, আলঙ্কারিক ও ব্যঙ্গ চিত্র ইত্যাদি ঐশ্বর্য দীপ্ত দৃশ্যের অনবদ্য সৌন্দর্য ও অধ্যাত্ম তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য লেখকের রসোজ্জ্বল ব্যাখ্যায় সার্থক হইয়াছে। অজন্তা চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রচার। বৌদ্ধ ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকলাকে বাদ দিয়া বৌদ্ধ ধর্মের সহজ সরল আদর্শ ও বোধিসত্ত্বের ও বুদ্ধের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী মানুষের কাছে হৃদয়গ্রাহী করার এক বিশেষ প্রবণতা এই চিত্রসমূহে দেখা

১। প্রবাসী, ৪র্থ সং, মাঘ, ১৩৪০।

২। হরপ্রসাদ সম্বর্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৯

৩। প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২২, আশ্বিন, ১৩২২ ধারাবাহিক।

যায় বলিয়া লেখক মনে করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গীয় মহাকোষ' ১ম খণ্ড-এ 'অজন্টা'[১] শীর্ষক বিশদ বিবরণী-যুক্ত তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনোমোহন ঘোষের 'নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তি[২]', প্রবন্ধও মূল্যবান রচনা।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তপঃক্ষেত্র নির্জন গিরিগুহা এবং জনপদোপকণ্ঠে বা নগর সীমান্তে অবস্থিত শান্তসুন্দর বিহার বা পরিবেণগুলিই কালে বৌদ্ধশিক্ষা-নিকেতনরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছিল। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার ভূমিকা সম্বলিত শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়ার 'বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ'[৩] গ্রন্থটি মাতৃভাষায় বৌদ্ধ শিক্ষা সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন পদ্ধতি এবং বৌদ্ধযুগের অন্যান্য শিল্পকলার আলোচনা স্থান পাইয়াছে। পাটলিপুত্রের অশোকারাম ও হিমালয় অঞ্চলের সংখেয়্য পরিবেণও শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন যুগের আয়ুর্বেদ বৌদ্ধাচার্যদের কৃতিত্বের পরিচয় বহন করিতেছে। বাংলাদেশের সোমপুরী, বিক্রমশীলা ও জগদ্দল বিহার বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির জয় পতাকা উড্ডীন করিতেছে। বৌদ্ধবিদ্যাপীঠ গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে লেখক উল্লিখিত বিষয়সমূহ সুবিন্যস্ত করিয়া বৌদ্ধ যুগের শিক্ষাব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ রেখাচিত্র প্রদান করিয়াছেন। গণপতি রায়ের 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়'[৪] জগজ্জ্যোতি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র নন্দীর 'বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'[৫] প্রবন্ধও বিশেষ মূল্যবান রচনা।

অশোক ও প্রত্নতত্ত্ব

বৌদ্ধধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অশোক এই ধর্মের উন্নতি, বিশুদ্ধতারক্ষা, পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াও যিনি উদাসীন জীবন যাপন করিতেন সেই রাজভিক্ষু দেবানং

১। বঙ্গীয় মহাকোষ, প্রধান সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃ ৬৫৭—৬৯২
২। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, উনত্রিশ ভাগ, ১৩২৯।
৩। প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ, কলিকাতা, ১৩৪১
৪। ২য় বর্ষ, ৩য় সং হইতে, ১৩১৬
৫। উদয়ন, শ্রাবণ ১৩৪০

পিয় পিয়দসির চরিত্র, রাজ্যশাসন প্রণালী ও সেবামূলক কর্মকৃতির মূল্যায়ন বাংলা সাহিত্যে বহু জনে করিয়াছেন। সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সম্রাট অশোক বিষয়ক গ্রন্থ হইতেছে চারুচন্দ্র বসু ও ললিতমোহন কর সম্পাদিত 'অশোক অনুশাসন'। এই গ্রন্থটিতে অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ ৩৬টি অনুশাসনের মূলপাঠ, বাংলা অনুবাদ, বিবিধ টীকা, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ এবং একটি বিস্তৃত উপক্রমণিকাসহ প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ সেন 'অশোক'[১] পুস্তকে ঐতিহাসিক অশোকানুশাসন হইতে তথ্য আহরণ করিয়া অশোক যুগের বিচার বিশ্লেষণে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং অশোক সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়ার ভূমিকা সম্বলিত প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ধর্মবিজয়ী অশোক'[২] গ্রন্থ অশোকের জীবন কথা বা জীবনেতিহাস নয়, অশোকের চরিত্র ও ধর্মনীতি যাহা তাঁহাকে পৃথিবীর রাজন্যবর্গের মধ্যে অদ্বিতীয় স্থান দান করিয়াছে তাহাই এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। তিনি সাহিত্যে উল্লেখিত আখ্যান বা অশোক সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী বর্জন করিয়া অশোকানুশাসনের তথ্যের আলোকে অশোকের কৃতিত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। ধর্মবিজয় ও অহিংসা নীতি, অহিংসা ও রাজনীতি, ধর্মনীতি এবং ধর্মনীতির পরিণাম ইত্যাদি আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতামতের পুনর্বিচার করিয়াছেন। অশোকের ধর্মনীতি ও তাহার ফলাফল আলোচনা প্রসঙ্গে শিবাজী ও আকবরের তুলনা করিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া রচিত কিছু কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে হারাণচন্দ্র চাকলাদারের 'নবাবিষ্কৃত অশোক শিলালেখ'[৩], এবং রমাপ্রসাদ চন্দের ঐ নামীয়[৪] আর একটি প্রবন্ধও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লেখ-মালানুক্রমনী'[৫] বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই গ্রন্থে ধাতুফলকে, মূর্তির পাদপীঠে, শরীর গাত্রে ও প্রস্তর ফলকে গুপ্ত সম্রাটদের সময় পর্যন্ত (অশোক লিপি ব্যতীত) যে সমস্ত লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১। এ, মুখার্জী, ১৯৫৫, ২। পূর্বাশা, ১৩৫৪, ৫। ১ম খণ্ড, ১৩৩০
৩। প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৫ ৪। প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৫

এই প্রসঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি মূল্যবান প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার 'বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও প্রাচীন ভারতীয় লেখমালা'[১] প্রবন্ধটি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য রচনা। পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি সাহিত্যের বৌদ্ধ শাখা সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রাচীনতর হইলেও ভারতীয় লেখমালাই এই বিষয়ে সুপ্রাচীন সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ লেখমালা নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম, পরিচয় এবং তাহাদের প্রসার সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তিব্বতী কেঙ্গুরে সংরক্ষিত বসুমিত্র, ভব্য, বিনীতদেবের রচনা হইতেও বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিবরণ পাওয়া যায়। অধুনালুপ্ত ও অজ্ঞাত বহু বৌদ্ধ শাখা সম্প্রদায় যথা সফিনেয়ক, বাকিলিয় ও তাপসিয় প্রভৃতির নামও প্রাচীন লেখমালায় সংরক্ষিত আছে। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয়সমূহের বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'ছডশিলা ও ইহার একটি বৌদ্ধ পরিবার'[২] প্রবন্ধটিও বিশেষ মূল্যবান। ইতিহাস পত্রিকায় লিখিত ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিঙ্গ ও তাহার কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শন'[৩] এবং 'সালিহুণ্ডমের অধুনাপ্রাপ্ত প্রত্নসম্পদ'[৪] প্রবন্ধদ্বয় তাঁহার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মৌলিকত্বে উজ্জ্বল। অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত সালিহুণ্ডম গ্রামে খনন কার্যের ফলে নিম্নলিখিত প্রত্নদ্রব্য ও অন্যান্য বস্তু পাওয়া গিয়াছে—দুইটি চৈত্য গৃহের ধ্বংসাবশেষ, একটি চক্রাকৃতি স্তূপ, ইষ্টক নির্মিত একটি বৃত্তাকার স্তূপ, দুইটি বক্রায়মান রেখা বিশিষ্ট চৈত্য, তিনটি স্ফটিক নির্মিত স্তূপাকৃতি ধাতুপাত্র, প্রাচীন লেখ সম্বলিত একটি মৃন্ময় জলপাত্র। লেখমালা হইতে প্রত্নতাত্ত্বিক ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এই স্থানটিতে খৃঃ পূর্ব যুগ হইতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ প্রভাব ছিল। এখানের 'সালিপাটক মহাবিহার' নামক বিহারটি মহোদক পর্বতে অবস্থিত ছিল। ধ্বংসাবশেষের অন্তর্গত একটি মৃন্ময়খণ্ডে উৎকীর্ণ লেখমালাকে প্রবন্ধকার পূজাপাত্রের অংশবিশেষ বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং এই মৃৎখণ্ডে ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ 'পঞ্চবীর'

১। জগজ্জ্যোতি, ৩য় বর্ষ, ১ম সং, ১৩৫৯
২। ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ৪-৫ম সং, ১৩৬১
৩। ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সং, ১৩৬০
৪। ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সং, ১৩৬১

শব্দ পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি তাঁহার ইতিহাস দৃষ্টির গভীরতা ও তথ্যানুসন্ধানে দৃঢ় নিষ্ঠার সার্থক পরিচয় বহন করে।

ভারত ও বৃহত্তর ভারত—সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের যে বাণী সারনাথের মৃগদাবে মেঘমন্দ্র স্বরে ধ্বনিত হইয়াছিল সেই বাণী লোক মধ্যে প্রচারের জন্য বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন—'চরথ ভিক্‌খবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজন সুখায় লোকানু-কম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং। মা একেন দ্বে অগমিত্থ।' ভিক্ষুগণ, তোমরা দিকে দিকে যাও, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, দেবতা ও মানবের কল্যাণের জন্য। দুইজন একপথে যাইও না।

ভিক্ষু ও উপাসকগণ এই বাণীকে শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে, আনন্দে ও নিষ্ঠায় দেশ-দেশান্তরে উপনীত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অখণ্ড জীবনের বাণী ১৮০০ বৎসর সমগ্র এশিয়াকে প্রেমের ও একত্বের বন্ধনে বাঁধিয়াছিল। তাঁহারা আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান, তিব্বত, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশের মানুষের সঙ্গে ভারতের মনের সেতু বন্ধন করিয়া মৈত্রীকরুণার অমৃতমন্ত্রে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সেই অতীত ইতিহাসকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া বর্তমান যুগের বাঙালী প্রবন্ধকারগণ বাংলা ঐতিহাসিক সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের একটি প্রাচীনতম উপনিবেশ মধ্য এশিয়ার বালু সমুদ্রের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখানের খোটান অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের গভীরতর সংযোগ ছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও তৎসহ সুধাময়ী দেবী লিখিত 'মধ্য এশিয়ায় হিন্দু রাজত্ব'[১] প্রবন্ধে খোটানের অবস্থান, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিবর্তিত বৌদ্ধধর্মের মূঢ়তা ও ইসলাম আক্রমণ এবং দশম শতাব্দীর শেষাংশে মধ্য এশিয়ায় হিন্দু সভ্যতার বিলোপ ইত্যাদি ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। 'মধ্য এশিয়ায় হিন্দু সাহিত্য'[২] প্রবন্ধদ্বয়ে পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় মরুময় অঞ্চলে প্রাপ্ত ভারতীয় পুঁথির উদ্ধার কার্য এবং মধ্য এশিয়া, চীন ও তিব্বতে হিন্দু সাহিত্য বিস্তারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

১। বিচিত্রা, কার্তিক, ১৩৩৬

২। ঐ, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩৬

১৮৯০ খৃঃ মধ্য এশিয়ার বালুকার তলদেশে অবস্থিত পুঁথির বিষয়ে পণ্ডিত মণ্ডলীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। Bower, Stein প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকদের সংগৃহীত মূল্যবান পুঁথি ও শিল্পসম্ভারের নিদর্শন হইতে জানিতে পারা যায়, খোটানে ও খোটানের চতুর্দিকে চীনা তুর্কীস্থানের মরু প্রদেশগুলিতে একসময় চীনা, ভারতীয় ও প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মীলিপি, খরোষ্ঠী লিপি এবং গুপ্ত লিপিতে লিখিত পুঁথি এবং তুনহুয়াং মন্দিরে প্রাপ্ত প্রজ্ঞা পারমিতা, নীলকণ্ঠ ধারণী, প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়সূত্র, বজ্রছেদিকা ও অপরিমিতায় সূত্র ভারতের সঙ্গে সুদূর মধ্য এশিয়ার ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রমাণিত করে।

মধ্য এশিয়ার ইতিহাস পাঠে জানা যায় খৃঃ পূঃ তিন শত বৎসর পূর্বে মধ্য এশিয়ায় বুদ্ধদেবের মৈত্রীধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। পার্থিয়ান, শক বা খোটান বাসিগণ, কুচাবাসী শূলিকগণ বা সগ্‌ডিয়ানবাসী নানা জাতি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। চৈনিক ইতিহাস অনুযায়ী ৩৫ খৃঃ চীনের হান বংশীয় সম্রাট মিং-তির রাজত্বকালে ভারতের সঙ্গে চীনের প্রথম সংযোগ ঘটে। পরবর্তীকালে এদেশের শতকরা ৯০ জন লোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'চীনে হিন্দু সাহিত্য'[১] প্রবন্ধে কুমারজীব-এর কৃতিত্বের মূল্যায়ন করিয়াছেন। ধর্মক্ষেত্র, গুণভদ্র, ধর্মমিত্র, কালযশ, বোধিধর্ম, পরমার্থ অনূদিত বৌদ্ধশাস্ত্র যাহাদের মূল ভারতীয় গ্রন্থ হইলেও বর্তমানে অনেকগুলি ভারতে আর পাওয়া যায় না; লেখক এই প্রবন্ধে তাঁহাদের গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের উপর আলোক সম্পাত হইয়াছে।

বহির্ভারতে বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার মূলক রচনারূপে হিমাংশুভূষণ সরকারের 'দ্বীপময় ভারতে বৌদ্ধসাহিত্য ও মহাযান ধর্মমত'[২], ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন'[৩] প্রবন্ধও বিশেষ মূল্যবান। বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রবন্ধে মগধ হইতে বৌদ্ধ ধর্মের নানা দিগ্‌দেশে বিস্তার ও প্রসারের ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে গান্ধার, তুর্কীস্থান ও চীনদেশে, চীন হইতে কোরিয়ায়, কোরিয়া হইতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে। পরিণামে প্রায় সমগ্র এশিয়া এক

১। বিচিত্রা, ১৩৩৪ মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৩৫ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ

২। প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪০

৩। প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩২

বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভারতবাসী, চীনা ও জাপানীরা ভাষায়, ভাবে ও আদর্শে পৃথক্ হইলেও এক ধর্মসূত্র সবাইকে আপন করিয়াছে। পরে তিব্বতেও বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে এবং ভারতীয় ভিক্ষু ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের বিরাট চীনা ও তিব্বতী সাহিত্য গড়িয়া উঠে। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ এবং ইৎ-সিং প্রমুখ চৈনিক পরিব্রাজকগণ ভারত-চীন মৈত্রীবন্ধনের স্বর্ণসূত্র। এ ছাড়াও অষ্টম হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বহু চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। রমেশচন্দ্র মিত্র 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার সম্বন্ধে কয়েকটি চৈনিক বিবরণ'[১] প্রবন্ধে উক্ত সময়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চীন ভাষায় যে সকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাওয়া গিয়াছে তাঁহার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত পর্যটকদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। হুই-চাও-এর ভারত-ভ্রমণ ৭২৩ খৃঃ—৭২৯ খৃঃ সম্পন্ন হয়, উ-কংও ৭৫১—৭৯০ খৃঃ ভারতবর্ষের কাশ্মীর, বারাণসী, গৃধ্রকূট ও বৈশালী পরিদর্শন করেন, দশম শতাব্দীর শেষার্ধে কি-ইয়ে ভারতে আসেন এবং ৯৪৭ খৃঃ তাও-উয়েন ভারতে আসেন এবং প্রায় ১২ বৎসর এদেশে অবস্থান করেন। ৯৬৬ খৃঃ হিং-কিং ভারত-ভ্রমণে আসেন। 'মধ্যযুগের ভারতে কয়েকজন অজ্ঞাত ও স্বল্পবিদিত চৈনিক পরিব্রাজক'[২] প্রবন্ধে অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র মজুমদার পরবর্তীকালে যে কয়েকজন অজ্ঞাত ও স্বল্প বিদিত পরিব্রাজক চীন দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে ও সুষ্ঠুরূপে আলোচনা করিয়াছেন। এই পরিব্রাজকগণ খৃঃ অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ এই দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ভারততীর্থে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবরণী ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও সুবিদিত না হইলেও চীন-ভারত মৈত্রী স্থাপনের সহায়করূপে বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই স্বল্প। অধ্যাপক মজুমদার তাঁহার এই প্রবন্ধে তাও-হুয়েন, কি-য়ে, কুয়ান-যুয়েন, ৎসে-হুন, চি-ঈ, হোয়াই-ৎসি, ৎসি-ঈ, কোয়াঙ্-ফুৎ প্রমুখ পরিব্রাজক ও তীর্থযাত্রিগণ যাঁহারা ভারতের আধ্যাত্মিক গৌরবে আকৃষ্ট হইয়া এদেশে আগমন করেন তাঁহাদের বিবরণী, ভারতে অবস্থান কাল এবং তাঁহাদের ভারতে ও চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার মূলক বহুবিধ কাজের আলোচনা করিয়াছেন। এই অজ্ঞাত পরিচয় ভারততীর্থ যাত্রীদের ঐতিহাসিক চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া বাংলা

১। ইতিহাস, ৬ষ্ঠ খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৬৩

২। জগজ্জ্যোতি, ৬ষ্ঠ বর্ষ, আশ্বিনী পূর্ণিমা, ১৩৫৫

ইতিহাসাশ্রিত সাহিত্যের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। চীন দেশীয় ভ্রমণ কাহিনীর পর তিব্বতীয় পরিব্রাজকের একটি ভ্রমণ কাহিনী বাংলার ইতিহাস রচনায় আমাদের সাহায্য করে। খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবরণের প্রামাণ্য তথ্যরূপে তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু অনুবাদক ধর্মস্বামীর ভারত-ভ্রমণ কাহিনী বিশেষ মূল্যবান। পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ণ তিব্বতের এক মঠ হইতে এই ভ্রমণ কাহিনীর ফটোষ্টাট্ কপি লইয়া আসেন। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে তুর্কী সৈন্যদের অত্যাচারে বিক্রমশীল মহাবিহারের ও অন্যান্য বহু বৌদ্ধমঠ ও বিহারের ধ্বংসের করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ধর্মস্বামীর বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাকে বাংলা দেশের ইতিহাসের নূতন উপকরণরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন।[১] এই বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ত্রিহুত সম্বন্ধে অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং মগধের রাজা বুদ্ধসেনের কাহিনী হইতে বাংলার ইতিহাসের একটি বিবাদসঙ্কুল তথ্যের মীমাংসা করিয়াছেন। ডঃ মজুমদারের এই তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে অত্যাবশ্যক।

বৌদ্ধধর্ম ও তত্ত্বমূলক

বৌদ্ধধর্ম ও তত্ত্বমূলক প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধও বাংলা সাহিত্যে রচিত হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটিমাত্র আলোচিত হইল। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক প্রমথনাথ তর্কভূষণের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ও পালি ভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার রচিত 'বৌদ্ধধর্ম'[২] ৪টি ভাগে বিভক্ত—প্রথম বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় বুদ্ধের ধর্মের বিশদ আলোচনা, তৃতীয় তাঁহার ধর্মের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন শাস্ত্রের মিল এবং চতুর্থ বৌদ্ধ ইতিহাস। বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধের লক্ষণ ও চরিত্র, অর্হৎ ও প্রত্যেক বুদ্ধ সম্পর্কীয় আলোচনা লেখকের বিশ্লেষণধর্মী মননের পরিচয় বহন করে। বৌদ্ধ ইতিহাস আলোচনায় লেখক ১ম, ২য়, ৩য় ভিক্ষু সম্মিলনী, সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য, অশোকের মৃত্যুর পর হইতে কণিষ্কের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়ে বৌদ্ধধর্মের গতিপ্রকৃতি এবং কণিষ্কের রাজত্বকাল ও মহাযানের অভ্যুদয়

১। 'তিব্বতীয় ভিক্ষু ধর্মস্বামীর বিবরণ প্রবন্ধ, ইতিহাস পত্রিকা, নবপর্যায়, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ১৩৭৩

২। 'সমাজ' মাসিক পত্রিকা, স—রাধাগোবিন্দ নাথ, ১ম বর্ষ হইতে ৪র্থ বর্ষ ধারাবাহিক (১৩১৬—১৩২০ খৃঃ)

বিষয়ে গভীর তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করিয়াছেন। প্রখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা' নামক গ্রন্থখানি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানির আয়তন ক্ষুদ্র ; কিন্তু আলোচ্য বিষয়গুলির পরিধি বিস্তৃত। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ দর্শন পর্যন্ত 'আস্তিক ও নাস্তিক' এই দুইভাগে বিভক্ত ভারতীয় দর্শনের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। স্বল্প পরিসরে (পৃ ১০৯—১৬৭) বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে ডঃ দাশগুপ্ত যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার রচনা কৌশল ও অন্তর্দৃষ্টির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অপূর্ব রচনা-শৈলীর গুণে বৌদ্ধ দর্শনের দুরূহ তত্ত্বগুলি পাঠকের বুঝিবার পক্ষে সহজ হইয়াছে। বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কিত (হীনযান ও মহাযান) সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যেরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এই গ্রন্থে সুসংবদ্ধভাবে স্থান পাইয়াছে।

বর্তমান শতাব্দীর বাঙালী মনীষীরা উচ্ছ্বাস আবেগহীন বিচার বিতর্কমূলক বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায়ও অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই বিষয়ক বাংলা রচনায় প্রথম পথ প্রদর্শক পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। তাঁহার 'বৌদ্ধন্যায়'[১] প্রবন্ধে অশোক যুগে ন্যায়ের অস্তিত্ব, 'মিলিন্দ পঞ্‌হ' গ্রন্থে সেযুগের পক্ষ প্রতিপক্ষের বাদ-বিচার পদ্ধতি এবং ললিতবিস্তরে ও নাগার্জুনের মাধ্যমিক সূত্রে ন্যায়ের যে আলোচনা স্থান পাইয়াছে তাহা উপস্থাপিত করিয়াছেন। আর্যদেব, মৈত্রেয়, আর্য অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙনাগ, শীলভদ্র, ধর্মকীর্তি চন্দ্রগোমি, জেতারি, রত্নাকর শান্তি প্রমুখ বৌদ্ধ মনীষী ও নৈয়ায়িকগণ অদম্য জ্ঞানান্বেষণের প্রেরণায় তাঁহাদের সৃষ্টিকর্মে যে অক্লান্ত সাধনার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহার একটি ধারাবাহিক ও তথ্যনির্ভর আলোচনাও এই প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠে বিশাল ন্যায়শাস্ত্র বৌদ্ধচার্যদের দ্বারা কতটা উন্নত হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মূল সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ ন্যায়ের অল্প কয়েকটি মাত্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, অধিকাংশই তিব্বতী চীনা ইত্যাদি গ্রন্থে অনুবাদরূপে স্থান পাইয়াছে। পণ্ডিত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'বৌদ্ধ-ন্যায়'[২] প্রবন্ধে বৌদ্ধ-ন্যায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধন্যায়, প্রমাণবাদ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন।

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, একবিংশ ভাগ

২। হরপ্রসাদ সম্বর্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড, ১৩৩৯

রমাপ্রসাদ চন্দের 'গৌতমবুদ্ধের ধর্ম'[১] প্রবন্ধে লেখকের নিরপেক্ষ বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পালি পিটকের প্রাচীনতা ও মৌলিকতা এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ, দ্বাদশনিদান ও চারি আর্য সত্য ইত্যাদি আলোচনা করিয়া গৌতমবুদ্ধের ধর্মের সারকথা আহরণ করিয়াছেন। বুদ্ধের ধর্ম ও উপনিষদ, বুদ্ধের ধর্ম ও সাংখ্যমত ইত্যাদি তুলনাত্মক ও তথ্যনির্ভর আলোচনায়ও প্রবন্ধকার তীক্ষ্ণ বিচারবিশ্লেষণের পরিচয় দিয়াছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ ডক্টর নলিনাক্ষ দত্তের বাংলায় লিখিত 'বৌদ্ধদর্শনে অনাত্মবাদ'[২] ও 'অভিসময়ালঙ্কারকারিকা'[৩] প্রবন্ধে বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রকাশ-ভঙ্গীর গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়া তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মৈত্রেয়নাথ রচিত 'অভিসময়ালঙ্কারকারিকা' যোগাচারপন্থী-বৌদ্ধদের একখানা অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। ডঃ দত্ত তাঁহার প্রবন্ধে কারিকার লেখক ও পরিচয়, ইহার অনুবাদ ও ভাষা এবং প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে কারিকার সম্বন্ধ ও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। 'জাতক নিদান' গ্রন্থের ভূমিকায় বৌদ্ধ অনিত্যতা তত্ত্বের আলোচনা সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট হইয়াছে। শীলভদ্রের 'থেরীগাথা', মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ও ভিক্ষু অনোমদর্শীর 'ধম্মপদং' প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা এবং বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের 'সত্যদর্শন' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখকের গভীর মননশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন'[৪] প্রবন্ধ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জৈনধর্মের তুলনাত্মক আলোচনা। 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে অশ্বঘোষের স্থান'[৫] প্রবন্ধে অশ্বঘোষের জীবনী, সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাসে অশ্বঘোষের স্থান ও বাল্মীকি, কালিদাস ও অশ্বঘোষের তুলনাত্মক আলোচনা স্থান পাইয়াছে। 'বৌদ্ধধর্ম'[৬] ও 'আর্যসত্য'[৭] নামক প্রবন্ধ দুইটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বর্গত শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি'[৮] গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্য সংযোজন। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ অনাত্মবাদ, পুনর্জন্ম রহস্য, কর্মবাদ,

১। প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২২।
২। জগজ্জ্যোতি, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ—৫ম সংখ্যা ১৩৬০।
৩। হরপ্রসাদ সম্বর্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড, ১৩৩৯।
৪। জগজ্জ্যোতি, ১ম বর্ষ, ৪র্থ—৫ম সং, ১৩৫৮।
৫। ঐ, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৫৮।
৬। উদয়ন, ১ম বর্ষ, বৈশাখ ১৩৪০।
৭। জগজ্জ্যোতি, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ—৫ম সং।
৮। বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৪।

কুশলধর্মের তাৎপর্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন দুরূহ বিষয় তাঁহার ভাষা ও রচনা বৈশিষ্ট্যের জন্য সহজবোধ্য হইয়াছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন পদ্ধতি এবং তাঁহাদের লিখিত চর্যাগীতি ও দোহা-কোষের ধর্মমত ও ভাষা ইত্যাদি বিষয়ও লেখকের আন্তরিকতা ও পাণ্ডিত্যের স্পর্শে ওজস্বী হইয়া উঠিয়াছে। চর্যাগীতিতে বাঙলা ও বাঙালী প্রবন্ধে খৃঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনের, তাহার আচার-আচরণ ও ধর্মমতের একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর শূন্যপুরাণ গ্রন্থের ভূমিকা, 'বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ এবং উৎকলে বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয়'[১] ও 'বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়'[২] প্রবন্ধ সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চৈত্য-চেতিয়'[৩] এবং 'বুদ্ধ জয়ন্তী'[৪] প্রবন্ধদ্বয় তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণাত্মক রচনা। ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তাধারার ইতিহাসে তথাগতের প্রবর্তিত ধর্মের যে উদার আদর্শ রূপান্তর আনয়ন করিয়াছিল বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের 'সত্যদর্শন'[৫] গ্রন্থে তাহার আলোচনা স্থান পাইয়াছে। নলিনাক্ষ ভট্টাচার্যের 'বৌদ্ধদর্শন'[৬] রমেশ বসুর 'বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিণী ও যোগিনীদিগের কথা'[৭] এবং 'বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা'[৮], কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর 'শঙ্করাচার্য ও বৌদ্ধধর্ম'[৯], হরিদাস পালিতের 'গৌড়ীয় মঙ্গল চণ্ডীর গীতে বৌদ্ধ ভাব'[১০] এবং শরচ্চন্দ্র দাসের 'ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ'[১১] প্রবন্ধ সমূহ বাঙালীর বৌদ্ধধর্ম চর্চার পরিচয় বহন করিতেছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'করুণাঘন'[১২] মনোরঞ্জন রায়ের 'গৌতম বুদ্ধ'[১৩], শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর 'মহাশান্তি মহাপ্রেম'[১৪] বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহাদের গভীর ভক্তি ও আন্তরিকতার স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

১। হরপ্রসাদ সম্বর্ধন লেখমালা, ১ম, ১৩৩৮।
২। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, ১৩৩৭।
৩। শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৬৪।
৪। জগজ্জ্যোতি, বুদ্ধজয়ন্তী সং, ১৯৫৬।
৫। কলিকাতা, ১৩১৪।
৬। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, দ্বাত্রিংশ ভাগ, ১৩৩২।
৭। ঐ, ত্রয়স্ত্রিংশ ভাগ, ১৩৩৩।
৮। ঐ, চতুস্ত্রিংশ ভাগ, ১৩৩৪।
৯। ঐ, দ্বাবিংশ ভাগ, ১৩২২।
১০। ঐ, সপ্তদশ ভাগ, ১৩১৭।
১১। ঐ, সপ্তম ভাগ, ১৩০৭।
১২। বসুধারা, ১ম সং, ২য় বর্ষ হইতে ধারাবাহিক।
১৩। ১ম খণ্ড, কলিকাতা। ১৪। ১ম খণ্ড, ১৩৭২।

নলিনীনাথ দাশগুপ্তের প্রণীত 'বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম'[১] গ্রন্থটি বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ধারাবাহিক ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস গবেষণা। আদিযুগ হইতে গুপ্ত, পাল ও পালপর যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ধারাবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। লেখকের 'ভারতের নারী পরিচয়' গ্রন্থেও কয়েকজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ উপাসিকার জীবনী স্থান পাইয়াছে।

ডক্টর সুকুমার সেনের 'অশ্বঘোষের মহাকাব্যদ্বয়'[২] প্রবন্ধে মহাকবি কালিদাস ও অশ্বঘোষ-এর কাব্য হইতে পদ উদ্ধৃত করিয়া লেখক তুলনাত্মক আলোচনা করিয়াছেন। 'তিনটি বিলুপ্ত চর্যাগীতি পুনর্গঠিত'[৩] প্রবন্ধে তিনি কাহ্নুপাদ তান্তিপাদ ও কক্কুরীপাদ কবিত্রয়ের ২৪, ২৫ এবং ৪৮ সংখ্যক তিনটি চর্যার সম্ভাব্য প্রতিরূপ অঙ্কন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে কয়েকটি পাতা না থাকায় তিনটি গান বাদ গিয়াছিল। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই তিনটি গানের তিব্বতী অনুবাদ করিয়াছেন। এই উপকরণগুলির সাহায্যে ডক্টর সেন পদগুলি বাংলায় পুনর্গঠন করিয়াছেন। নবগঠিত পদে লেখক চর্যাপদের ভাষারীতি পদ ও বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ধম্মপদ পরিচয়'[৪] গ্রন্থে লেখক উপনিষদ, ধম্মপদ ও গীতাকে ভারতীয় সংস্কৃতির তিনটি জ্যোতিকেন্দ্ররূপে আখ্যাত করিয়াছেন। ইহারা ভারতের 'বিশ্ববিজয়ের প্রস্থানত্রয়'। ধম্মপদ বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ হইলেও ইহার আবেদন যুগোত্তীর্ণ, ধর্মের গণ্ডীদ্বারাও তাহার আসল স্বরূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই।

এই ধম্মপদ গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের একটি মূল্যবান সুচিন্তিত প্রবন্ধ ইতিহাস পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।[৫] প্রবন্ধটিতে অশোকধর্মের সহিত ধম্মপদের নৈতিক তত্ত্বের সাদৃশ্য আলোচনা করা হইয়াছে। ডক্টর ভাণ্ডারকার, বেণীমাধব বড়ুয়া, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ পণ্ডিতগণ অশোকের ধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া পালি সাহিত্য হইতে প্রামাণিক বুদ্ধবচন আহরণ করিয়া উভয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে

১। এ. মুখার্জী, ১৩৫৫।

২। হরপ্রসাদ সম্বর্ধন লেখমালা, ১ম, ১৩৩৮।

৩। জগজ্জ্যোতি, ৫ম বর্ষ, ১ম সং, ১৯৫৪

৪। ধম্মপদ পরিচয়, বিশ্বভারতী, ১৩৬০।

৫। ৪র্থ খণ্ড, ২য় সং, ১৩৬০—৬১, ধম্মপদ ও অশোক-লিপি প্রবন্ধ

অশোকলিপির মর্ম অনুধাবন করিতে হইলে বৌদ্ধ সাহিত্য (বিশেষভাবে পালি সাহিত্য) পঠন-পাঠন অপরিহার্য। ডক্টর বড়ুয়া ও অধ্যাপক মিত্র অশোক-লিপির অন্তর্গত কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ, বাচনভঙ্গী ও বাগ্‌ধারার সহিত পালি সাহিত্যের এই সব বৈশিষ্ট্যের আশ্চর্য সাদৃশ্য প্রমাণ করিয়াছেন। সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত ধম্মপদ গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা ফরাসী পণ্ডিত Senart এবং জার্মান পণ্ডিত Hultzsch অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের গবেষণা কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস মহাশয় ধম্মপদ-তত্ত্বের সহিত অশোক-ধর্মের সাদৃশ্য নির্ণয় করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ধম্মপদের বৈশিষ্ট্য ও রচনাকাল ইত্যাদিও তিনি আলোচনা করিয়াছেন। অশোকের ধর্মের অন্তর্গত একটি নীতিবাক্যের সঙ্গে (যথা মাতরি পিতরি সুস্রূসা,) ধম্মপদের নাগ-বগ্‌গের একটি গাথার বুদ্ধঘোষকৃত ব্যাখ্যার (যথা মত্তেয্যতা, পেত্তেয্যতা) ভাব-সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের ভাষা সাবলীল ও সহজবোধ্য। যুক্তিবাদী মনন চিন্তা ও প্রামাণ্য-তথ্য পরিবেশনে তাঁহার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। প্রবন্ধটি বাংলা গদ্য সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

রবীন্দ্র-শতদলের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ও সৌগন্ধ এবং অনুপম মহিমার স্বীকৃতিরূপে বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের অবতারণা। এই পর্যায়ের রচনায় বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রবীন্দ্রমানস অনুধ্যান ও অনুশীলন করিয়াছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধপ্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রজীবনে বৌদ্ধধর্মের গভীর প্রভাব বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বাংলা ভাষায় যাঁহারা উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গত শশীভূষণ দাশগুপ্ত[১], অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন[২], বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য[৩] এবং ডক্টর সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার[৪] কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

১। 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬৬ বর্ষ, ১৩৭১, রবীন্দ্রসংখ্যা।

২। ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ, এ. মুখার্জী, ১৯৬২।

৩। 'শ্যামাজাতক' ও রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিতা প্রবন্ধ, কাব্য-কৌতুক, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৩৬৩; অভিসার কবিতার উৎস সন্ধানে প্রবন্ধ, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, ১৩৭১।

৪। রবীন্দ্র সাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, ১৩৭৪

(খ) কাব্য-কবিতা

কাব্য গ্রন্থ ও খণ্ড কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও আধুনিক বাঙালী কবি ও অধ্যাত্মযোগী বৌদ্ধধর্মানুরাগী সাধু পুরুষগণ সার্থকতা অর্জন করিয়াছেন। ইঁহাদের অধিকাংশ রচনা বৌদ্ধ পত্রপত্রিকার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিলেও তাহাদের সৌন্দর্য ও কাব্যরস অনস্বীকার্য। বুদ্ধের অনন্ত মহিমা ও বৌদ্ধধর্মের বিপুল ভাবরাজী কাব্যরসধারায় সিক্ত হইয়া তাঁহাদের রচনায় শান্ত-সংযত শ্রী লাভ করিয়াছে।

ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০—১৮৯৪)

'মঘা থংমৌজা'[১] নামক এক অতি প্রাচীন হস্তলিখিত বার্মীজ গ্রন্থকে আদর্শ রাখিয়া 'ধর্মপুরাবৃত্ত'[২] রচনা করেন। ধর্মপুরাবৃত্তে দানধর্মের মাহাত্ম্যই কীর্তিত হইয়াছে। বুদ্ধ বন্দনায় পুস্তকের আরম্ভ। এই অংশে বুদ্ধের ঈশ্বর-ভাব এবং তাঁহার অনন্ত শক্তিমত্তার ভাব প্রকট হইয়াছে। একদিন শ্রাবস্তী নগরে বুদ্ধ 'মহাপ্রভু' শিষ্যগণসহ সমাসীন। এই সময় এক ব্যক্তি শুচিস্নাত হইয়া পুষ্প দূর্বা হস্তে ধর্মকথা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিল—

শুনিবারে ধর্মকথা ইচ্ছা মম মনে।
কহ প্রভু কিবা ফল হয় কোন্ দানে॥
কোন দানে নরগণ যায় দেবালয়ে।
কি পাপ করিলে নর নরক ভুঞ্জয়ে॥[৩]

অতঃপর 'বুদ্ধ ভগবান' সেতুদান মাহাত্ম্য, দীপদানে আকাশ প্রদীপ মাহাত্ম্য, চিমিতঙ্ (দীপমেরু বলয়) পুষ্প ও মাল্য, ছত্র, ধ্বজ, চন্দ্রাতপ দান এবং বুদ্ধ প্রতিমূর্তি স্থাপন মাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণনা করেন। এই গ্রন্থেও শ্রীমতীর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই শ্রীমতী রাজগৃহ নগরীর নটী বা অজাতশত্রুর পরিচারিকা নহেন, তিনি ভিক্ষু কশ্যপের পিতৃস্বসা-নন্দিনী। শ্রীমতী বুদ্ধ-ধর্মের পূজারিণী, কিন্তু সংঘের বিরোধী। এই অপরাধের জন্য তাঁহাকে বক্ষে কণ্টকবিদ্ধ অবস্থায় নরক গমন করিতে হয়। এই কাহিনীর

১। মঘা থংমৌজা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বৌদ্ধ গ্রন্থ। মঘা শব্দের পরিভাষিক অর্থ বার্মিজ অক্ষরে লিখিত পালি বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় রচিত বৌদ্ধ শাস্ত্র। প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। থংমৌজা শব্দের অর্থ অবদান বা অপদান।

২। ধর্মপুরাবৃত্ত, কলিকাতা, ১২৪৬ মগাব্দ।

৩। ঐ, পৃঃ ১৯—২০।

মধ্য দিয়া সঙ্ঘ মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে পাপের ফল, পঞ্চশীল, 'অনিচ্চা—দুক্খা-আনাত্তা', সদ্ভিক্ষু মাহাত্ম্য ও কর্মফল বর্ণনা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ধর্মরাজের এই রচনায় গভীর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের জন্যও গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান। প্রথমতঃ চট্টগ্রামে আরাকান আধিপত্যের সময় হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম যে রূপ লাভ করিয়াছে তাহার যথাযথ চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই রচনার দ্বারা বর্মাভাষা পরিত্যাগ করিয়া বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা সূচিত হইয়াছে।

সর্বানন্দ বড়ুয়া (১৮৭০—১৯০৮)

চট্টগ্রামবাসী বড়ুয়াগণের মধ্যে যাঁহারা প্রথম ইংরেজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন তাঁহাদের মধ্যে কবি সর্বানন্দ অন্যতম। তিনি সুলেখক ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। 'শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত', 'ঋষি সন্দর্শন', 'মহাবোধি সন্দর্শন' এবং 'জগজ্জ্যোতি' সহ গদ্যে ও পদ্যে মোট ২৫ খানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। Arnold-এর Light of Asia কাব্যে বুদ্ধকে 'এশিয়ার-আলো' বলিয়া অভিহিত করায় তিনি ক্ষুন্নমনে 'জগজ্জ্যোতি' রচনা করেন এবং নিজের সম্পাদিত 'বৌদ্ধ-পত্রিকা'য় ধারাবাহিক ভাবে তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 'বৌদ্ধ-পত্রিকা'টি বন্ধ হওয়ায় জগজ্জ্যোতির প্রকাশও বন্ধ হইয়া যায়।[১] মহাকবি নবীন সেন জগজ্জ্যোতির পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে গভীর আবেগে কবিকে বলিয়াছিলেন—'সর্বানন্দ, তুমি তোমার জগজ্জ্যোতি লিখিবে জানিলে আমি আমার অমিতাভ লিখিতাম না'। 'জগজ্জ্যোতি'র মূল্যায়নের জন্য কবির এই বাণীই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। 'জগজ্জ্যোতি' সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে মহাকবির বাণীর সত্যতা যাচাই হইয়া যাইত। প্রকাশ ভঙ্গীর সহজ ঋজুত্বের মধ্য দিয়া কবি ভাবী বুদ্ধকে গর্ভে ধারণের পর মাতৃ-হৃদয়ের অপরিসীম আনন্দের উল্লাসকে শান্ত সংযতরূপ দান করিয়াছেন—

তাঁর ভরিল হৃদয়
সে আনন্দে—লভে নাই যাহা কোন মাতা
এ যাবৎ পৃথিবীর ;[২]

১। জগজ্জ্যোতি, ১ম ভাগ, ৯ সং, পৃঃ ২০৭
২। জগজ্জ্যোতিঃ বা মহাভিক্রমণ, ১ম সর্গ, জগজ্জ্যোতি পত্রিকা, ১১শ বর্ষ, ৩য় সং

লুম্বিনী উদ্যানে মহান্ পরিত্রাতার জন্ম হইল। চরাচর আনন্দিত, পুলকিত; অস্পষ্ট এক কোমলধ্বনি উঠিল অন্তরীক্ষ হইতে—

ওহে মৃতগণ!
যাদের বাঁচিতে হবে—হে জীবিতগণ!
যারা আছ মৃতপ্রায়, সকলেই ওঠ,
শোন, আশা আছে—ভয় নাই আর,
আসিলেন বুদ্ধ দেখ তোমাদের তরে।[১]

শুধু বর্তমানের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব নয়, ভাবীকালের অনাগত মানুষও তাঁহার প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান। 'আশা আছে—ভয় নাই আর' এই আশ্বাস বাণীর অশ্রুত রাগিণী কালের দাবীকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে।

ছোট ছোট কথায় উঁচু ভাবাদর্শকে অর্থবহ ও সুন্দর করিয়া ব্যক্ত করিবার কৌশল তাঁহার জানা ছিল। 'নির্দুঃখে দুঃখান্ত লাভ করিবে মহিষী'[২], 'সুন্দর বস্তুর ছায়াও সুন্দর'[৩] তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জগদ্বন্ধু চৌধুরী

পালি-সংস্কৃত সূত্রে প্রাপ্ত গৌতম বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন আখ্যান ও বুদ্ধজীবনের মহান্ ঘটনাবলীর ভিত্তিতে জগদ্বন্ধু চৌধুরী তাঁহার 'সিদ্ধার্থ চরিত' কাব্য রচনা করেন। বঙ্গ গৌরব মহাকবি নবীন সেনের 'অমিতাভ' কাব্য রচনার পর বুদ্ধ চরিত রচনা করিয়া যশস্বী হওয়া কঠিন; কিন্তু জগদ্বন্ধু চৌধুরী কবিযশ প্রার্থী হইয়া কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহার কাব্য মহামানব বুদ্ধের উদ্দেশ্যে ভক্তিপ্রণত চিত্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই কাব্যে কবিত্ব অপেক্ষা হৃদয়ের নিগূঢ় ভাবের অধিকতর প্রকাশ ঘটিয়াছে। 'অমিতাভ' কাব্যে গৌতম বুদ্ধ মহাকরুণার পূর্ণ বিকশিত শতদল, স্নেহে-প্রেমে, দয়ায়-ক্ষমায়, ধ্যান ও তপস্যায় তাঁহার জীবন সুসমঞ্জস পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই জন্য তিনি আদর্শ মানব—পূর্ণায়ত মনুষ্যত্বের প্রতিভূ। 'বুদ্ধ চরিত' কাব্যে কবির অকপট প্রাণের সারল্য ও কুণ্ঠিত চিত্তের বিনয়ের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে। 'অমিতাভ' লিখিত শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী রসজ্ঞের জন্য আর 'সিদ্ধার্থ চরিত' সাধারণ্যের জন্য।

১। ঐ,
২। ঐ,
৩। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, দ্বিপঞ্চাশৎ ভাগ, পৃঃ ৬৬, ডঃ বড়ুয়ার 'বাংলা সাহিত্যে শত বর্ষের বৌদ্ধ অবদান' প্রবন্ধ।

নবীন সেনের কাব্যে যাহা কবির বিশিষ্ট কাব্য সত্তার সহিত জড়িত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে জগবন্ধুর কাব্যে তাহা গতানুগতিক ঘটনা প্রবাহে পরিণত হইয়াছে। সিদ্ধার্থের বিরাট বৈরাগ্য ও সংসার ত্যাগ কাব্যের মধ্যে ভাবনিবিড় হইয়া উঠে নাই। কাব্যে 'সিদ্ধার্থের বাল্যক্রীড়া' অধ্যায়ে বাৎসল্য রসের সুন্দর স্ফুরণ ঘটিয়াছে। সিদ্ধার্থ এখানে দেবশিশু নয়—চিরন্তন মানব শিশু। মহাপ্রজাপতিও চিরন্তনী মাতৃ প্রতিমা। মায়ের ক্রোড় হইতে শিশু পিতার দিকে হাত বাড়াইয়া দেয়, আবার পিতার ক্রোড় হইতে মায়ের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে। অনুপম সে দৃশ্য! গ্রন্থে স্থানে স্থানে লেখক প্রাচীন ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন। কাব্যে ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠার কারণ শাক্য পুরুষেরা বুদ্ধের নবধর্মের আশ্রয় লইয়াছেন, রমণীরা নিরাশ্রয়, অভিভাবক হীনা; এইজন্য বুদ্ধ কপিল নগরে গোপাদেবীর নেতৃত্বে ভিক্ষুণী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন।[১] স্থানে স্থানে হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয় মূলক ভাবাদর্শও অনুস্যূত হইয়াছে। শোকার্ত পিতার উক্তি—

বুঝিলাম প্রিয়ে! নর-নারায়ণ
জনমি পবিত্র করিল ঘর
বুঝিবা যশোদা তুমি ভাগ্যবতী
জনমিলে প্রিয়ে পালিতে তারে
এ যুগে দৈবকী তব দিদি সতী
মহামায়া গেল গরভে ধরে।[২]

কালিদাস রায়

বুদ্ধের অলোকসামান্য চরিত্রবল এবং বৌদ্ধধর্মের সুমহান্ আদর্শ যে কয়জন বাঙালী কবিকে কাব্য রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে, কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁহাদের অন্যতম। বৌদ্ধধর্মের মহৎ ভাবরাজী, তাহার করুণা, ক্ষমা, মৈত্রী ও আত্মোৎসর্গ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই অত্যুচ্চ ভাববৈচিত্র্য কবিকে এত গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে যে, তাহা তাঁহার কবিচিত্তে শত সুরের শত সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই উন্মাদনা ও ভাবাবেগকে হৃদয়বৃত্তির জারক রসে সংযত ও সংহত করিয়া লইতে পারেন এতখানি পরিপক্ক শক্তির তিনি অধিকারী। ফলে কবির বিশিষ্ট কাব্যসত্তার সহিত জড়িত হইয়া তাঁহার কাব্যে তাহা নিজস্ব রূপ ধারণ করিয়াছে।

১। সিদ্ধার্থ চরিত, পৃঃ—১৭২। ২। সিদ্ধার্থ চরিত, পৃঃ—১১১।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি কবির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও নিবিড় প্রত্যয় সমুজ্জ্বল 'অজন্তার চিত্র দর্শনে'[১] এবং 'অজন্তা গুহায়'[২] কবিতা দুইটি কবি প্রতিভার অক্ষয় নিদর্শন। কবি অজন্তার সৌন্দর্য-নিকেতনে প্রবেশ করিয়া ভাবতন্ময় চিত্তে বুদ্ধদেবের সম্মুখে মাতা-পুত্র ছবিটি দর্শন করিয়াছেন। চিত্রে গোপা রাহুলের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন, হাতে ভিক্ষাপাত্র, করুণ আঁখি পল্লবে নম্র নিবেদন; আর তাঁহার শিশু পুত্রটি যেন সারল্য আর আনন্দের প্রতিমা। এই অতুলনীয় চিত্র কবির অন্তরে আর একটি চিত্রকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। সে চিত্র মাতা অন্নপূর্ণার, মাতা অন্নপূর্ণা কাশীতে সমাসীনা, সমগ্র বিশ্বকে অন্ন বিতরণের ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার স্বামী ভিখারী শিব, তিনি পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরেন। অবশেষে একদিন ভিখারী শিব আসিলেন সতীর দ্বারে, হস্তে করোটীর পাত্র, অন্নমুষ্টির প্রার্থী তিনিও। একদিকে রাহুল-জননীর হৃদয়ের আর্ত নিবেদন—'ভগবন্, রাহুল কুমারকে তাঁহার পিতৃধন দান করুন'[৩]; অন্যদিকে গার্হস্থ্য জীবনের এই প্রীতি স্নিগ্ধ মধুর চিত্র। দুই চিত্রই কবির কাছে অতুলনীয়। কিন্তু কবির প্রশ্ন—যে শিল্পী কঠিন শিল্প সাধনার দ্বারা মাতাপুত্রের ছবি অঙ্কন করিয়াছেন তাঁহার মুক্তির উপায় কি? শুধু শিল্প সাধনার দ্বারাই কি তিনি অর্হত্ব লাভ করিতে পারেন না?

সে কোন শ্রমণ শিল্পী যেবা কৃচ্ছ্র তপ আচরণে
দিব্য শক্তি প্রজ্ঞাদৃষ্টি লভিল নয়নে
এই চিত্র করিয়া অঙ্কন
অর্হত্ব করিল লাভ জীবন্মুক্ত হল যেই জন।

কবির দৃঢ় প্রত্যয় এই চিত্রই ভারতের পরম ঐশ্বর্য। এইজন্য চরম দুঃখের দিনেও এই ঐশ্বর্যকে ভারত অতি সঙ্গোপনে নিজের বক্ষপঞ্জরের আড়ালে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। একদিকে সর্বত্যাগী অমৃত পারাবার বুদ্ধ আর তাঁহার সম্মুখে যুক্তপাণি রমণী, পাশে তাঁহার একটি মাত্র শিশু পুত্র—নন্দনের আশীর্বাদ। জননী আজ তাঁহার জীবনের সর্বস্ব ধন মহাপুরুষের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিবেন। এই ছবিই ভারতের প্রাণ-কণিকা। এইজন্যই—

১। কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ওরিয়েন্ট, ১৯৬৪, পৃঃ ১১
২। আহরণ, কালিদাস রায়, মিত্র ও ঘোষ, ২য় সং, পৃঃ ১৬৯
৩। Jataka, op. cit. Vol. I. p. 91.

আপন পঞ্জরতলে এ ভারত রাখিয়াছে ভরি,
যত্নে এই প্রস্তরত্নে বহু বর্ষ ধরি
অতুল ঐশ্বর্য তার সর্বাঙ্গের তাও তুচ্ছ গণি
এই চিত্রে ভাবি তার প্রাণ-বজ্রমণি।

বৌদ্ধ চৈত্য-মঠ-স্তম্ভ-স্তূপ ভারত আত্মার যথার্থ পরিচয় বহন করে না; কিন্তু অজন্তার এই মহত্তম চিত্র—

বিশ্বে অতুলন,
নত করে উদ্ধতের, শ্লথ করে ভবের বন্ধন।

'অজন্তা গুহায়' কবিতায় কবি অজন্তার অমর শিল্পীর হৃদয়ের একটি গোপন বেদনাকে ভাষা দিয়াছেন। মহাস্থবির শীলানন্দ এই নির্জন গিরিগুহায় সাধনা করেন, আর বৃদ্ধ শিল্পী সিদ্ধার্থের মার বিজয়ের দৃশ্যাবলী গুহাগাত্রে অঙ্কন করেন। শিল্প সাধনাই তাঁহার জীবনের ব্রত। শৈশব, কৈশোর, যৌবন এইখানেই তাঁহার কাটিয়াছে, ব্যয়িত হইয়াছে বুদ্ধ জীবনের অভিনব ঘটনাবলীর চিত্রাঙ্কনে। বার্ধক্যে উপনীত শিল্পী অশ্রু সজল কণ্ঠে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে প্রশ্ন করিয়াছেন— 'ভদন্ত, আমার জীবন তো পাহাড়ের গায়ে ছেদনীর আঘাত হানিতে ব্যয়িত হইয়াছে, এখন ভববন্ধ ছেদনের উপায় কি?' শীলানন্দ কাষায় চীবর প্রান্তে শিল্পীর অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—'হে শ্রাবক, তোমার ছেদনী কেবল শিলাই ছেদন করে নাই, জন্মের বন্ধনীও ছেদন করিয়াছে। তোমার শিলায় সাধনা তাই আমার শীলের সাধনার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। সুগতের জীবনের প্রতি ঘটনা তুমি শিলায় শিলায় ফুটাইয়া তুলিয়াছ। তোমার এই দৃঢ়ভক্তি, স্থির মতি, গাঢ় চিন্তা গূঢ় অনুভূতির পরিচয়! তোমার তপস্যালব্ধ সৃষ্টিও আজ আর তোমার একার নয়।

একনিষ্ঠ ভাবাবিষ্ট তপস্যার ফল
ভোগ্য নয় তোমার কেবল
বিশ্ববাসী এ ফলের হবে অধিকারী
তব সৃষ্টি হবে বন্ধু দেশে কালে দিগন্ত প্রসারী,
ইহলোকে তব সৃষ্টি রয়ে যাবে অক্ষয় অম্লান।
আমাকে ফিরিতে হবে, তুমি বন্ধু লভিবে নির্বাণ।'

ভিক্ষু আনন্দ[১], রাজা হর্ষবর্ধন[২], ভিক্ষুণী মালিনী[৩], নর্তকী শ্রেষ্ঠা অম্বপালি[৪] এবং সিদ্ধার্থ জননী গৌতমী[৫] ইঁহাদের প্রতি যুক্তপাণি কবির অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে। আনন্দ বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য, তাঁহার একান্ত অনুগত অনুচর। বুদ্ধ জ্ঞান-গঙ্গা, আনন্দ সেই জ্ঞান গঙ্গার ধারক ও বাহক; বুদ্ধ পরম বোধি, আনন্দ বোধিসত্ত্ব। আনন্দহীন বুদ্ধ যেন লক্ষ্মণবিহীন রাম, যেন তুষার বিহীন হিমালয়। কবি আনন্দের মূল্যায়ন করিয়াছেন—

হে আনন্দ! বোধিসত্ত্ব তোমা নাহি জানে যেই জন
বুদ্ধেরে সে জানে নাক। যেন রাম বর্জিত লক্ষ্মণ
অসম্পূর্ণ তথাগত তোমা ছাড়া। তিনি ত সচ্চিৎ
হলেন সচ্চিদানন্দ যুক্ত হয়ে তোমার সহিত।

মৌর্য নৃপতি অশোক, সম্রাট বিক্রমাদিত্য—ইঁহাদের কবি শ্রদ্ধা করেন; কিন্তু কবির 'মনের মানুষ' শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন। 'বুদ্ধভক্ত রাজাধিরাজ' কবিতায় তিনি রাজভিখারী কবি সম্রাট শিলাদিত্যের মহান্ কর্মকৃতির বিষয় মুগ্ধচিত্তে স্মরণ করিয়াছেন। রাজগৃহের নর্তকী শ্রেষ্ঠা কুবলয়া, মহাথেরী মালিনী, দাসী পুন্নিকা এবং কাশীনগরীর অন্যতমা রূপজীবা অর্ধকাশী ইঁহারা সকলেই কবিশেখরের একান্ত শ্রদ্ধার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ পূজা পাইয়াছেন বুদ্ধমাতা গৌতমী, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ সিদ্ধার্থকে যিনি বক্ষস্তন্যধারায় পোষণ করিয়াছেন; মাতৃহৃদয়ের এই গৌরবটুকু স্বয়ং বুদ্ধও অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। বুদ্ধের ভিক্ষুণী সঙ্ঘ গঠনে অনুমোদন দান তাহার নিদর্শন। জীবন সায়াহ্নে সে কথা স্মরণ করিয়া গৌতমী লিখিয়াছেন—

মুহুত্তং তণ্হা সমণং থীরং তং পায়িতো ময়া।
তয়াহং সন্তং অচ্চন্তং ধম্মকথীরং পি পায়িতো॥
রঞ্ঞোমাতা মহেসীতি সুলভং নাম মিথিনং।
বুদ্ধমাতা তিয়ং নামং এতং পরম দুল্লভং॥[৬]

কবিশেখরও অতি সহজ সুরে মাতৃহৃদয়ের শেষ গৌরব-রশ্মিটুকু তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত করিয়াছেন—

১। জগজ্জ্যোতি, ১ম বর্ষ, ৪র্থ—৫ম সং, ১৩৫৮, ২। ঐ, বুদ্ধজয়ন্তী সং, ১৯৫৬।
৩। ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সং ১৩৬০ ৪। ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং, ১৩৬০ ৫। ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৬১
৬। Apadāna, op. cit. p. 208,

তোমারে স্তন্য করেছিনু দান তব শিশুমুখ চুমি
অমৃত পিয়ায়ে মাতার সে ঋণে মুক্ত হয়েছ তুমি।
রাজমাতা হওয়া দুর্লভ নয়, হয়েছে তা অনেকেই
আমি ছাড়া এই ত্রিভুবন মাঝে বুদ্ধমাতা ত নেই।[১]

কবি বৌদ্ধ শাস্ত্র জাতক গ্রন্থও অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই অধ্যয়ন তাঁহার ব্যর্থ যায় নাই। জাতক পাঠের ফলে নিখিল মানবকে তিনি আত্মার পরমাত্মীয় রূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন এই বিশ্বের বুকে যুগে যুগে বহুবার বহুরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ফলতঃ সমগ্র বিশ্ব তাঁহার আত্মীয় পরিজনে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কাহাকেও আজ আর তাঁহার পর বলিয়া মনে হইতেছে না।

তাহাদেরি বংশধরে দেখি আজ ভরেছে ভুবন
মহামানবের মাঝে কেবা নয় আমার আপন।
তাই আজি মনে হয়, ঘিরে মোর এ জীবন্ত শব
একান্ত আত্মীয় হয়ে ঘিরে আছে নিখিল মানব।[২]

কবি আরো আশ্বাস পাইয়াছেন যে, নির্বাণ শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুরই অধিগম্য নয়। 'জন্মান্তর' কবিতায় তিনি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন—

শত বা সহস্র জন্ম পরে হোক, নাহিক সংশয়
একদা লইব মুক্তি তুমি যারে বলেছ নির্বাণ।[৩]

কবি উপলব্ধি করিয়াছেন মানুষের হিংসাবৃত্তি, ক্রূরতা ও পাশবতা আজ পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত। তাহাদের অহমিকার আকাশস্পর্শী উত্তুঙ্গতায়, শাসনে আর শোষণে এবং রক্তপাতের আদিম উন্মাদনায় বসুন্ধরা ভয়ার্তা। এশিয়ার জলেস্থলে আণব বোমার বিস্ফোরণে কবি শঙ্কিত, উদ্‌বিগ্ন। যে এশিয়া বুদ্ধের জন্মদাত্রী, বুদ্ধের ধাত্রী সেই এশিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে কবির পক্ষে তাহা অসহ্য। তাই চরমক্ষণে শিশুসুলভ সরল নির্ভরতায় কবি করুণাঘন বুদ্ধের পুনরাবির্ভাব আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন—

১। জগজ্জ্যোতি, ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৬১
২। ঐ, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং ১৩৫৯, জন্মান্তর কবিতা
৩। ঐ, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৬২, জন্মান্তর কবিতা

এস তথাগত পুনঃ ব্যথাহত ভারতের বোধিতরুর তলে।
জরা পীড়া কারা মরণের ভয় দূর কর প্রেম করুণাবলে।[১]

অন্যত্র—

সারা ধরা আজ আর্ত কাতর
হিংসার বিষে চেতনা হারা
* * *
প্রভু তথাগত রাখো ব্যথাহত
ধরণীর শিরে অভয় পাণি।[২]

'বুদ্ধগয়ায়'[৩] কবিতায় ভক্ত কবির অন্তরে বুদ্ধের দেশনা জাগ্রত হইয়াছে। 'বুদ্ধের বাণী'[৪], 'বোধি'[৫], 'উপক ও চাঁপা'[৬], 'নন্দ কল্যাণী'[৭], 'ভিক্ষুণী পটাচারা ও উপ্পলা'[৮], 'কৌষেয় ও কাষায়'[৯], 'উর্বরী'[১০], 'বুদ্ধদেব'[১১], 'বুদ্ধের বাণী'[১২] প্রভৃতি কবিতাগুচ্ছ ভগবান তথাগতের চারণ-কবি কালিদাসের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রশস্তিমূলক রচনা।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধকৃষ্টির প্রতি গভীর অনুরাগে বুদ্ধ-পূজারী কবি কয়েকটি কবিতায় 'আপন মনের মাধুরী'টি মিশাইয়া তাঁহার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। কবি পরিপূর্ণ শান্তি কামনায় অমিতাভের উদার মহিমার পাদপীঠতলে নিজের মাথা নত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার শান্তিকামী চিত্ত ক্ষমতাবানের প্রবল অত্যাচারে, দর্পীর পৌরুষ শাসনে তথাগতের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছে।

বুদ্ধ অনন্ত শক্তিমান, বিরাট বিশাল, ততোধিক তিনি করুণকমনীয়, শান্ত-স্নিগ্ধ ; ঈশ্বর অপেক্ষাও জীব তাঁহার বেশী প্রিয়। ইহাই তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁহার চিত্ত-বীণায় অহিংসার সুর ঝঙ্কৃত। এই অহিংসার কত মহিমা, কত তেজ, কত তাহার শক্তি। এই অহিংসার শক্তিতেই বুদ্ধ ভগবানকেও অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন—

১। জগজ্জ্যোতি, ১ম বর্ষ, ২য় সং, ১৩৫৭
২। নিরঞ্জনা, সুগত স্মরণে, ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩৬৩
৩। জগজ্জ্যোতি, ৫ম বর্ষ, ২য় সং, ১৩৬১ ৪। উদ্বোধন, ১ম সং, ১৩৭৫
৫। জগজ্জ্যোতি, ৫ম বর্ষ। ৬। ঐ, ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৬০।
৭। ঐ, ২য় বর্ষ, ৮। ঐ, ৯। ঐ, ৪র্থ বর্ষ।
১০। ঐ, ৩য় বর্ষ, ১৩৫৯-৬০ ১১। ঐ, ১২। ঐ, ৫ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩৬১

জীবে ভগবানে প্রভেদ—কি হবে বুঝি ?
জীবেরে পূজিয়া, ভগবানকেই পূজি
ডেকে বলো তুমি, দেখাও অসীম
শক্তি কি করুণার।[১]

বুদ্ধের সাধনা ছিল ধরিত্রীর বুকে সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাত্র্য প্রতিষ্ঠা—হিংসা-দ্বেষ, ক্রোধকালিমার যেখানে প্রবেশাধিকার থাকিবে না; কিন্তু ভারতের বুকে সেই মহান্ সভ্যতা তো টিকিতে পারিল না। মানুষ কি তবে আলোর অপেক্ষাও অন্ধকারকেই বেশী ভালবাসে ? সত্যের অপেক্ষাও মিথ্যাকে, সাধুতার অপেক্ষাও অসাধুতাকে বেশী গৌরব দেয় ? এইজন্যই কি একদিন নিষ্পাপ ঈশ্বর-পুত্রকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল ? শান্তি ও কল্যাণের পূজারী কবিচিত্তের স্বাভাবিক গঠন ভারতে বৌদ্ধ কৃষ্টির বিপর্যয়ের নিষ্ঠুরতায় পীড়া বোধ করিয়াছে। সভ্যতার নামধারী বর্বরতার প্রতি কবির ধিক্কার বর্ষিত হইয়াছে—

অমৃতের চেয়ে গরলে ধরার স্বাভাবিক অভিরুচি
সভ্যতার যে মধ্যেই ফেরে বর্বরতাকে খুঁজি
ভালোর এখানে আসা যাওয়া চলে, চলে নাকো
বাস করা
স্বর্গ তো নয় এটা যে মলিন ধরা।[২]

'বুদ্ধ পূর্ণিমা'[৩], 'পতিত বৌদ্ধ'[৪] কবিতাদ্বয় কবির বুদ্ধানুস্মৃতির বিশিষ্ট উদাহরণ।

নরেন্দ্র দেব

কবির যে বিশেষ চিত্তবৃত্তি তাঁহার বৌদ্ধ বিষয়ক কবিতার মধ্য দিয়া পাওয়া যায় তাহা হইতেছে সত্য সন্দর্শনের জন্য এক গভীর অন্বীক্ষা। এই অন্বীক্ষা তাঁহার হৃদয়ের মর্মমূলে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে ঘরের বাহির করিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে কবি কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যেন এক অনন্ত শান্তি সাগরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। এই সাক্ষাৎ ক্ষেপার ক্ষণদর্শন মাত্র নয়,—শান্ত নিঃসংশয় চিত্তে ধরণীর সীমা পার হইয়া অকূল মহাসাগরের মধ্যে আত্মমগ্ন হইয়া যাওয়া। 'নির্বাণের পথে'[৫] কবিতায় এই ভাব

১। বৌদ্ধধর্ম, জগজ্জ্যোতি, ৫ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩৬১
২। বৌদ্ধকৃষ্টি, জগজ্জ্যোতি, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং, ১৩৬০ ৩। ঐ. ৩য় বর্ষ ৪। ঐ।
৫। জগজ্জ্যোতি, ৫ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩৬১

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই কবিতায় পথিক যেন নীড় ছাড়িয়া মুক্ত আকাশে উধাও হইলেন। তিনি বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের শরণ লইলেন : 'অগ্রশ্রাবিকা'[১] কবিতা মগধেশ্বর শ্রেণিক বিম্বিসারের মহিষী সুন্দরী ক্ষেমার আত্মোপলব্ধির আখ্যান। বুদ্ধকে দর্শন করিয়া তন্বী গরবিনী নারীর রূপের অহংকার দূর হইল, অপনীত হইল সংশয়-সন্দেহ-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। বুঝিলেন—

দু'দিনের তরে চোখে যাহা লাগে ভালো
সে করে আড়াল মোহ-অঞ্জনে
ও পারের যত আলো।

অবশেষে একদিন নিঃসংশয় চিত্তে, পরম বিশ্বাসে সে বুদ্ধ-চরণে আত্মোৎসর্গ করিল—

দিল আপনার শ্রেষ্ঠ প্রণাম
বুদ্ধ চরণে আনি

'মল্লিকা,'[২] 'ঋদ্ধি-ঋক্',[৩] 'বিদ্রোহী বুদ্ধ',[৪] 'জন্মদিনের ভোরে'[৫] কবিতায়ও আমরা বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি কবি-চিত্তের গভীর অনুরাগের পরিচয় পাই।

অসিত হালদার

অসিত হালদারের সাহিত্যিক প্রতিভার জয়স্তম্ভ তাঁহার রচিত 'গৌতম-গাথা' কাব্য। তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি শিল্পী; কিন্তু যদি তিনি একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য সাধনা করিতেন তাহা হইলেও আধুনিক যুগের একজন খ্যাতনামা কবিরূপে স্বীকৃতি পাইতেন। 'গৌতম-গাথা' কাব্যে সংযত মন, উদাত্ত ভাব, ঐশ্বর্য দীপ্ত চিত্রকল্প, শুদ্ধ রসরুচি ও গভীর সৌন্দর্য চেতনার যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা দ্বারা এই ধারণাই সুদৃঢ় হয় যে অসিত হালদার শিল্প প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুপরিণত কবি মনেরও অধিকারী ছিলেন।

সৌন্দর্য পূজারী শিল্পী তাঁহার কাব্যে কেবল নির্বাণগুরু বুদ্ধের পূজা সমাপন করেন নাই, রূপরসময়ী বিশ্বের সৌন্দর্য তিনি প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। নিজে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন কয়েকটি বাণী-রেখার টানে

১। ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সং, ১৩৬১ ২। ঐ, ৭ম বর্ষ, ২য় সং, ১৩৬৪ ৩। ঐ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সং, ১৩৬৫
৪। ঐ, ৫ম বর্ষ, ৫। ঐ, ২য় বর্ষ।

তাহা পাঠকের অনুভূতি গোচর করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে চিত্রকল্প ভাবকে আকৃতি দিয়াছে, ভাব চিত্রকে গতিশীলতা দান করিয়াছে। চিত্রই এই কাব্যের দেহ, আর ভাব তাহার প্রাণ।

কাব্যের প্রারম্ভেই কল্পনার সঙ্গে তুলি, সুরের সঙ্গে মাধুর্য যেন একই সমান্তরালে চলিয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। মরকত বাপীতটে রাজা শুদ্ধোদনের প্রাসাদ-উদ্যান, শান্ত চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি কোকনদ শোভিত বাপীবক্ষে প্রতিবিম্বিত। পুরস্ত্রীয়া বলিলেন—বাপীবক্ষে চন্দ্রবিম্ব ধরণীতে নবচন্দ্রের অভ্যুদয় ইঙ্গিত করিতেছে। শুনিয়া নিঃসন্তানা রাণী মায়াদেবী আরো বিচলিতা হইয়া উঠিলেন। রাজা পুত্রহীনা রাজ-মহিষীদের সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন—

শোননি কি দেবীগণ মহাপ্রাজ্ঞ মনীষী বচন
শাক্যকুলে জন্মিবেন শাক্যসিংহ এক
রাজকুলে রাজেন্দ্র উত্তম
শাসিবারে ধরা—[১]

তারপর রামধনুকের ন্যায় বিচিত্র বর্ণের ঐশ্বর্যের আভাস বিচ্ছুরিত করিয়া ঢেউ-এর ন্যায় গতিশীলতায় কাব্য অগ্রসর হইয়াছে। লুম্বিনী উদ্যান মহামানবের মহান্ আবির্ভাবে ধন্য হইল। নবজাতক

পূর্বভাগে চাহিয়া বলিলেন—'প্রধান সবার আমি'
দক্ষিণ ভাগে চাহিয়া বলিলেন—'জীবমাঝে ধরণীতে সর্বশ্রেষ্ঠ আমি'
পশ্চিম ভাগে চাহিয়া বলিলেন—'এই শেষ জনম আমার'
উত্তর ভাগে চাহিয়া বলিলেন—'সর্বভূত সৃষ্টি লোক যাব অতিক্রমি।'
নবজাতক সপ্তপদ অগ্রসর হইলেন আর—

প্রতি পদক্ষেপে
মন্ত্রমুগ্ধ হেরিল সকলে
যেন সপ্ত স্নিগ্ধ নীলোৎপল
ভূমিপরে হইল উৎপন্ন![২]

ভাবী বুদ্ধের আবির্ভাবে সুখী হইলেন মাতাপিতা, আত্মীয়-পরিজন ও প্রজাপুঞ্জ, আনন্দিত হইলেন বিশ্ববাসী ও স্বর্গলোক। কিন্তু এই আনন্দের বন্যায় বেদনার একটি স্ফটিক বিন্দু দেখা দিল। মহামায়া ভগিনী মহাপ্রজাপতিকে বলিলেন—

১। জগজ্জ্যোতি, ২য় বর্ষ, ৪র্থ—৫ম সং, ১৩৫৯।
২। জগজ্জ্যোতি, ৩য় বর্ষ, ১ম সং, ১৩৫৯।

জাতকের সপ্তদিন এবে সমাগত
জগতের মায়ামুক্ত আমি
হইব বিগত।
পুত্রেরে আমার মানিয়া তনুজ
পালিবে সযত্নে নিজ পুত্রকন্যা সাথে।[১]

শেষ দুই পংক্তিতে মাতৃহৃদয়ের বেদনা যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। কবি এখানে কথার বাহুল্যে বেদনাকে তরলায়িত করেন নাই। তারপর সুপ্তা মায়া দেবী চিরনিদ্রাগতা হইলেন।

রজনীর দীপ সাথে জীবন প্রদীপ
নিভিল মায়ার।[২]

সিদ্ধার্থের শৈশব, যৌবন প্রাপ্তি ও বিবাহ, নগর ভ্রমণ ও চারি নিমিত্ত দর্শন বর্ণনা প্রাচীন আখ্যানের সঙ্গে কবি কল্পনার সংমিশ্রণে বিশিষ্ট রূপ পাইয়াছে। ক্রমে সিদ্ধার্থের অন্তরে মহাজীবন লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল। তিনি গৃহত্যাগের বাসনা করিলেন। একটি সুন্দর চিত্রকল্পের সাহায্যে কবি সিদ্ধার্থ হৃদয়ের সেই প্রবল বাসনাকে চিত্রায়িত করিয়াছেন।

রন্ধ্রলাভ করি যথা
ভূগর্ভ অনল ভূধর হইতে হয় বিনির্গত
গৃহনিষ্ক্রমণ তরে উদিল সিদ্ধার্থ মনে
প্রবল সঙ্কল্প।[৩]

স্নেহাসক্ত মাতাপিতা, অনিন্দিতা বনিতা, নবজাত শিশু পুত্র, অনুরক্ত প্রজাপুঞ্জ নিরাকাঙ্ক্ষ মনে পরিত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ মোক্ষপথ যাত্রী সিদ্ধার্থ চলিলেন কণ্টকিত বিপদসঙ্কুল পথ উত্তীর্ণ হইয়া; অথচ আপনার চির অনুগত অশ্বটির প্রতিও কত গভীর তাঁহার প্রীতি। বিচ্ছেদ সময়ে—

কন্থকেরে বারে বারে করি স্পর্শ সুকোমল করে
স্নেহাসক্ত নয়নে নেহারি—[৪]

তাহাকে তিনি চিরবিদায় দিলেন। ছন্দককে দিয়া পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন—

১। ঐ, ৩য় বর্ষ, ২য় সং. ১৩৫৯ ২। ঐ
৩। ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৫৪ ৪। ঐ, ৫ম বর্ষ, ১ম সং. ১৯৫৫

এ সংসারে বিচ্ছেদেরে মানি ধ্রুব
মতি মোর মোক্ষের সন্ধানে।
জীবনের সর্বশোক নাশ আকাঙ্ক্ষায়
হয়েছি নির্গত
পীড়িত ভুবন হতে।[১]

সত্যানুসন্ধিৎসু গৌতম চলিয়াছেন—ধীরস্থির, প্রশান্ত উজ্জ্বল যেন একটি চলমান প্রদীপশিখা। মর্ত্যের এই দীপ শিখা যেন আকাশের সূর্যের অপেক্ষাও ভাস্বর। কিন্তু তাঁহার সত্যানুসন্ধান চিরাচরিত পথে নয়। আশ্রমবাসী মুনি ঋষিদের কঠিনতম কৃচ্ছ্রতা ও স্বর্গলাভ কামনায় তপশ্চর্যা তাঁহার মনঃপূত হইল না। বলিলেন—

স্বর্গলাভ প্রবৃত্তি লইয়া দেখি হেথা ধর্মের সাধনা
ভিন্ন প্রকৃতির আমি
চাহি ধর্ম নিবৃত্তির।[২]

দুই পথে কত তফাৎ। চরম ভোগ বিলাসের মার্গ যেমন তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই, তেমনি কঠিন কৃচ্ছ্রতার মার্গও তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। তারপর একদিন—

ধ্যান অন্তে কমলাক্ষ করি উন্মিলিত
হেরিলেন বোধিসত্ত্ব
দেবলোক হতে শচীর প্রেরিতা
আসিতেছে স্বর্ণ পাত্র হাতে
আনন্দে বিহ্বলা
শুচিস্নাতা, নীলাম্বর করিয়া ধারণ।[৩]

পল্লীর গৃহলক্ষ্মী সুজাতার এই চিত্র অনুপম; মর্ত্যের হইয়াও সে স্বর্গীয়া, মানবী হইয়াও সে দেবী। এই চিত্রে তাহার সৌন্দর্য, তাহার পবিত্রতা, তাহার মাধুর্য কোনটাই কবি পাঠকের কাছে অপরিজ্ঞাত রাখেন নাই। তাহার আবির্ভাবে যে কল্যাণের সূচনা তাহা শুধু চিত্রের বর্ণবিন্যাস বা কথার বাঁধুনির বিশিষ্ট ভঙ্গী মাত্র নয়, অমৃতপাত্রহস্তা সুজাতার কল্যাণ আবির্ভাব গৌতমের সিদ্ধি লাভকে ত্বরান্বিত করিল। সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া গৌতম ধ্যানে উপবিষ্ট হইলেন।

১। ঐ, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৫৯। ২। ঐ, ৫ম বর্ষ, ২য় সং, ১৯৫৪।
৩। ঐ, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৬২।

কঠোর কঠিন তাঁহার প্রতিজ্ঞা—হয় সিদ্ধি লাভ, না হয় ধ্বংস। সসৈন্য মার সে ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারিল না। মার সর্বশেষ বাণ নিক্ষেপ করিল। এ সেই বাণ—

সূর্য যাতে সংজ্ঞাহীন, শান্তনু বিমূঢ়
শম্ভুরেও করেছে চঞ্চল।
* * *
যে পুষ্প বাণেতে শম্ভু
শৈল সুতা গৌরীতে আসক্ত, হইলেন বিচলিত
হেরি ব্যর্থ তারে কামদেব
চিন্তাগ্রস্ত, যুদ্ধক্লান্ত, পরাজিত বীর অবাঙ্মুখ
করে পলায়ন।[১]

শঙ্কিত বিপন্ন মার অনুচরদের প্রশ্ন করিলেন—'এই ভিক্ষু কেন আমায় পরাজিত করেছে। সর্বকালে সর্বলোকের বাসনা পূর্ণ করা আমার কাজ। তাহাই আমি করি, কে আমার কাজের সাক্ষ্য দিবে'। অনুচরেরা বলিল—'প্রভু দিব সাক্ষ্য, মোরা তার।'

মার বলিল—'এ জগতে আমার মত কার এত বদান্যতা? এমন কি এত বদান্যতা দেখাইয়াছে কখনও, তাহার বদান্যতার কোনও প্রমাণ কি আছে, কে তাহার সাক্ষ্য দিবে'? ভূমিগর্ভ হইতে পৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া সুকঠোর বজ্রধ্বনির ন্যায় বাণী উত্থিত হইল—

'দিব সাক্ষ্য আমি।'

শুনিয়া মার সসৈন্যে পলায়ন করিল। আর—

অনন্ত আত্মায় নিজ আত্মারে নিবদ্ধ রাখি
নিস্তব্ধ ধ্যানেতে রহিলেন লীন শাক্যমুনি।[২]

গৌতম মারজিৎ হইলেন। মহাবোধি তাঁহার আয়ত্ত হইল। সমগ্র বিশ্বে তিনি 'বুদ্ধ' বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কবির গৌতম এখন যেন বিরাট হিমালয়—দেশ দেশান্তর হইতে, দিগ্‌দিগন্তর হইতে মেঘরাশি যেমন আশ্রয়ের জন্য বিরাট অতুচ্চ ভূধরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি বুদ্ধের নিকট শরণ গ্রহণের জন্য

১। ঐ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সং, ১৩৬২
২। ঐ,

বারাণসী নগর হইতে বুদ্ধের নিকটে
বহু ধনী, মধ্যবিৎ, দরিদ্র ধার্মিক
আসে জ্ঞান লাভ তরে মুমক্ষু অন্তর।[১]

শিল্পী-কবি অসিত হালদারের গৌতম বৈকুণ্ঠের দেবতা নহেন, তিনি মানবতার পূর্ণ আদর্শ—মৈত্রী-ক্ষমা-করুণা ও ধ্যান-ধারণা তাঁহার মধ্যে সুসমঞ্জস পরিণতি লাভ করিয়াছে। তিনি আদর্শ মানুষ—সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে 'গৌতম-গাথা' বাংলা ভাষায় বুদ্ধের জীবনী-কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে নিঃসন্দেহে বিশেষ স্থান অধিকার করিবে। নবীন সেনের 'অমিতাভ' উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে বুদ্ধ-পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার। 'গৌতম-গাথা'র অংশ বিশেষ 'অমিতাভ' কাব্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। বরং চিত্রকল্প সৃষ্টিতে তিনি কবি নবীন সেনকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং শুধু শিল্পাচার্য বলিলে অসিত হালদারের পরিচয় অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের আকাশে তিনিও এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

প্রমথ নাথ বিশীর 'কুণাল'[২] কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। এই কবিতায় বৌদ্ধ আখ্যানের পুষ্পপাত্রে সৌন্দর্য পূজারী কবি সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর পূজার আয়োজন করিয়াছেন। ঘাতক নালকের প্রতি সম্রাট অশোকের আদেশ—রাজকুমার কুণালের চক্ষু তারকা উৎপাটন করিতে হইবে। কুণাল কুমার-কিশোর, যেন—'বিশ ফাগুনের অর্ঘের থাল।' শত শত চক্ষুমান ধরণীর শোভাকে অগ্রাহ্য করিয়া পথ চলে; কিন্তু সে এই শব্দস্পর্শময়ী পৃথিবীর রূপ-রস আকণ্ঠ পান করিয়াছে। প্রকৃতির শিশির বিন্দু, বিজন বনের করবী ফুল, শিরীষ শাখার পুষ্প গুচ্ছের সৌন্দর্য কণিকা সে তিল তিল করিয়া আহরণ করিয়াছে। এক অনন্ত সৌন্দর্যময়ী—চির সৌন্দর্যলোকে যাহার বাসস্থান সেই-ই তাহার মানস-প্রিয়া। এই মহিমময়ী বিশ্বের সৌন্দর্য-লক্ষ্মী আবার কুণালেরও অন্তরলোকবাসিনী। সে জানে বাহ্যিক দৃষ্টি যদি যায় অন্তর দুয়ার হইবে উন্মোচিত—

চোখ যদি যায় এমন কি ক্ষতি
মানস প্রদীপে করিব আরতি

১। ঐ, বুদ্ধজয়ন্তী সং, ১৯৫৭
২। প্রমথ নাথ বিশীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ওরিয়েন্ট, ১৩৬৭, পৃ—৮৩

মানসী দেবীরে মোর—
আঁখি যদি যায় যাবে মোর আলো
উজল ভুবন লাগিবে ঘোরালো—
যাবে নাকো আঁখি-লোর।

বহির্বিশ্বের যা কিছু সৌন্দর্য সমস্তই সেই আদি সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অঙ্গদ্যুতি। কুণালের বিশ্বাস স্থূল চক্ষুরিন্দ্রিয় যে দিন অবলুপ্ত হইয়া যাইবে সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মী সেদিন অচঞ্চল ভাবময়রূপে তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।

বিদায় লভিলে নয়নের আলো
ভেদিয়া সন্ধ্যা আঁধারের কালো
জাগিবে নাকি গো তারা।

সেদিন মানস প্রদীপের পুণ্য শিখায় তাহার জীবন আলোয় আলোয় পূর্ণিমার আকাশে পরিণত হইবে।

(গ) গল্প, উপন্যাস ও নাটক

প্রমথনাথ তর্কভূষণের 'তুকুল ও পারিকা'[১] এবং 'মণিভদ্র'[২] বৌদ্ধ যুগের পরিবেশে রচিত উপন্যাস। 'তুকুল ও পারিকা' জাতক কাহিনী অবলম্বনে রচিত ছোট আখ্যান। 'মণিভদ্র' উপন্যাসে প্রাচীন ভারতের ধর্ম, নীতি, সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা এবং ভগবান বুদ্ধের করুণার আদর্শ প্রতিভাত হইয়াছে। গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ এবং সামাজিক জীবনের চিত্রও এই উপন্যাসে উজ্জ্বলতর রূপ পাইয়াছে। তারকচন্দ্র রায়ের 'উপগুপ্ত' বৌদ্ধ ধর্মমূলক উপন্যাস। যুবরাজ অশোকের সিংহাসন প্রাপ্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষু উপগুপ্তের নিকট দীক্ষা গ্রহণ এই উপন্যাসের উপজীব্য। সংস্কৃত 'অশোকাবদান'-এর কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে ইহা রচিত। জলধর সেনের ভূমিকা সম্বলিত ভিক্ষু সুদর্শনের 'চতুর্বেদ'[৩] চারিটি ছোট গল্পের সমষ্টি; গল্পচ্ছলে উপদেশ দান এই কাহিনীগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষপাথরে'[৪]ও বুদ্ধের প্রসঙ্গ স্থান পাইয়াছে। এই পুস্তকের 'রবিবারের আসরে' আদিম পৃথিবীর শক্তিমদে মত্ত জীবজগতের আত্মঘাতী কলহ আর পরস্পর দ্বন্দ্ব এবং রক্তারক্তির মর্মান্তিক

১। জগজ্জ্যোতি, ৩য় বর্ষ, ৫ম সং হইতে ৪র্থ বর্ষ ১২ সং ধারাবাহিক।
২। কলিকাতা ১৩১৭।
৩। চতুর্বেদ, গুরুদাস চট্টোঃ, ১৩২৮।
৪। কলিকাতা, ১৩৬৪।

ভীষণতার রাজ্যে চৈতন্যকে দীপ্ততর করিয়া, বোধকে বোধিতে পরিণত করিয়া একটি মানুষ আপন স্বর্গরাজ্যের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন সকল মানুষের জন্যই আমার তপস্যা। ইনিই শাক্য রাজকুমার সিদ্ধার্থ। তারাশঙ্করের গভীর শিল্পবোধ এই কাহিনীতে বুদ্ধদেবকে অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে।

ডক্টর সুকুমার দত্তের 'সপ্তপুরা'[১] প্রাচীন কাহিনী আশ্রিত ছোটগল্প সংগ্রহ। এই সংগ্রহের 'মল্লিকা', 'এষা', 'অগ্নিদাহোদ্বারে' ইত্যাদি গল্পে লেখক প্রাচীন পাত্রে চিরকালীন বিরহবেদনার অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন। এই গল্পগুলির বিষয়বস্তু বুদ্ধদেবের দুঃখ, অনাত্মার বাণী বা নির্বাণের দেশনা নয়—মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রুই ইহাদের সামগ্রী। 'মল্লিকা' গল্পে লেখক প্রাচীন বৌদ্ধ কাহিনীকে রসসমৃদ্ধ করার জন্য কাহিনী অংশের অদল বদল ও নূতন তথ্য সংযোজন করিয়া প্রাচীনের নবীকরণ করিয়াছেন। তিনি গল্পে প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের সর্বজনপ্রিয় বুদ্ধশিষ্য আনন্দকে উপস্থাপিত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আনন্দ ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন। গল্পের নায়িকা মল্লিকাও চিরন্তনী নারী, সে যেমন করুণ, তেমনি রক্তমাংসের উষ্ণস্পর্শে মনোরম। লেখকের অন্তরের সহানুভূতিও লাভ করিয়াছে লাঞ্ছিতা, অবমানিতা মল্লিকা। অভাগিনী মল্লিকার দুঃখে বেদনার্ত কণ্ঠে তিনি বলিয়াছেন—'মানুষের জীবনে বুদ্ধ সত্য কি মল্লিকা সত্য কে বলিতে পারে?' 'এষা' গল্পেও বৌদ্ধ যুগের পরিবেশে অমর প্রেমের জয় ঘোষিত হইয়াছে। কাহিনীর নায়িকা মেত্তিয়া চির অভিসারিকা, তাহার প্রেম অজর, অমর; অন্বেষণ তাহার জীবন-ধর্ম। চিরপ্রতীক্ষিতা মেত্তিয়ার প্রেমের অনির্বাণ দীপ্তি ও প্রদীপ্ত তেজ তাহাকে মহিমান্বিতা করিয়াছে। 'অগ্নিদাহোদ্বারে' মহারাজ মহীপালের রাজত্বকালে নালন্দায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ও তাহার চরম পরিণতির পটভূমিকায় নালন্দা বিহার ধ্বংসের একটি কাল্পনিক কাহিনী। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মন্ত্রতন্ত্র ও বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান-প্রিয়তা এই সময়ে কোন্ স্তরে উপনীত হইয়াছিল লেখক তাহার সুন্দর চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। 'সহজিয়া', 'জগন্নাথের মন্দির' ইত্যাদি গল্পেও বৌদ্ধ প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখিত প্রাতিমোক্ষ, এহি ভিক্ষু, উপসম্পদা, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সঙ্ঘাদিশেষ, পরিবাস, মানত্ত এবং বহু তান্ত্রিক গুহ্যমন্ত্র কাহিনীর অবয়বের সঙ্গে সুষম সামঞ্জস্যে একদেহী হইয়া গিয়াছে।

১। এ. মুখার্জী, ১৩৬৬।

প্রাচীন বৌদ্ধ আখ্যানকে নূতন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিয়া লেখক আধুনিক যুগের পাঠকের সামনে উপস্থিত করিয়াছেন।

মন্মথ রায়ের 'অশোক'[১] নাটকে নাট্যকার অশোকের জীবন-আখ্যানের মূল উৎস সংস্কৃত বা পালি সাহিত্যের তথ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন নাই। মূল আখ্যানের সঙ্গে স্থানে স্থানে নিজস্ব কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটাইয়া নাটকীয় কাহিনীতে অভিনবত্ব আনয়ন করিয়াছেন। যেমন 'অশোক' নাটকে রাজমহিষী দেবীকে লাভ করিবার জন্য অশোকের কলিঙ্গ জয়; দেবীর মৃত্যুই এই নাটকের অনিবার্য পরিণাম। অশোক ও দেবীর চরিত্রের মধ্যে যে বিরোধ, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর দেবীর মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। চণ্ডাশোকের যে প্রচণ্ড আসক্তি ও কামনা ভিক্ষুণী দেবীকে লাভ করার অন্তরায় ছিল, দেবীর মৃত্যুতে তাহা অপসারিত হইয়াছে এবং চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহার মোহগ্রন্থিও ছিন্ন হইয়াছে। দেবী মৃত্যু বরণ করিয়া অশোকের মধ্যে সত্য-ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সর্বশেষ বীতশোকের মৃত্যুতে সমস্ত নৃসংশতার অবসান ঘটিয়াছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়া দেবী ও অশোকের মৃত্যুহীন মিলন সম্ভব হইয়াছে। সম্রাট কামনা দ্বারা দেবীকে লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে লাভ করিলেন বৌদ্ধধর্মের কল্যাণ আদর্শ গ্রহণ করিয়া। নাটকের শেষাংশের সর্বত্যাগী, রাজভিখারী অশোক ইতিহাসের মহোত্তম পুরুষ—যাঁহার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের রক্ত-সায়রে বুদ্ধের বাণী শ্বেত-শতদলের সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। মন্মথ রায়ের 'রাজপুরী'[২] একাঙ্কিকার আখ্যান ভাগও বৌদ্ধ বিষয়ক। এই একাঙ্কিকায় রাণী পালি সাহিত্যের বাসবক্ষত্রিয়া (যিনি শাক্যরাজের দাসীগর্ভ জাত কন্যারূপে পরিচিতা ছিলেন) এবং অশোকের সর্বশেষ মহিষী তিষ্যরক্ষিতা (যিনি অশোক-পুত্র কুণালের প্রতি আসক্তা ছিলেন)—এই দুই নারী চরিত্রের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন। কাহিনীর বিরুধক ও রাজা প্রসেনজিৎ ঐতিহাসিক চরিত্র এবং কবি শেখর কাল্পনিক পুরুষ। বিশুদ্ধাচার ভিক্ষুর 'মারবিজয়'[৩] গীতি নাটিকায় লেখক ধর্মরস পরিবেশন করিয়াছেন।

(ঘ) বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকা

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে বৌদ্ধ সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে আলোচনার প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ

১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৩৪।
২। একাঙ্কিকা, ১৩৬২।
৩। ২য় সং, ১৯৫১।

হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সত্তর বৎসরাধিক কাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম, কলিকাতা ও রেঙ্গুন হইতে অনেকগুলি বৌদ্ধ পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে যাহাদের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মানুরাগী বাঙালী পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্মের গৌরবোদীপ্ত মহিমা, গবেষণালব্ধ প্রামাণ্য তথ্যাদি যুক্তির সাহায্যে উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইয়াছেন। পালি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্রম পরিণতি এবং ভারতীয় জীবনে তাহার অনিবার্য প্রভাব ইত্যাদি বিষয়েও এই পত্রপত্রিকা সমূহ হইতে বহুমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। বাঙালী জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন করিতে হইলে বৌদ্ধ পত্রপত্রিকাসমূহের যে উপাদান তাহা সংগ্রহ করা আবশ্যক। বহু পুরাতন বৌদ্ধ পত্রপত্রিকা এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে ; যাহা পাওয়া যায় তাহাও প্রায় অসম্পূর্ণ। এই পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে যতগুলি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। যতদূর জানা যায় চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত 'বৌদ্ধ-পত্রিকা' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম বৌদ্ধ পত্রিকা। 'বৌদ্ধ-পত্রিকা' ১৯০৬ খৃঃ বিপিনচন্দ্র বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পরে কবি সর্বানন্দ বড়ুয়ার সুষ্ঠু সম্পাদনায় ইহা আরো খ্যাতি অর্জন করে। এই পত্রিকায় সর্বানন্দ বড়ুয়ার 'জগজ্জ্যোতি'-কাব্য ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। পত্রিকাটি দুই বৎসর মাত্র বর্তমান ছিল।

জগজ্জ্যোতি

বৌদ্ধ পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে 'জগজ্জ্যোতি' একটি উচ্চতর মান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ১৩১৫ সালে ২৪৫২ বুদ্ধাব্দে আষাঢ় মাসে গুণালঙ্কার মহাস্থবির ও সমণ পুন্নানন্দের সম্পাদনায় জগজ্জ্যোতির প্রথম আবির্ভাব। ইঁহাদের সুদক্ষ পরিচালনায় এই পত্রিকাটি একটি গবেষণামূলক পত্রিকার গৌরবপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া গুণীজন মহলে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। জগজ্জ্যোতির প্রথম সংখ্যায় ইহার আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'যে বৌদ্ধধর্মের মহত্ব সর্বজন স্বীকৃত, যাহা ভারতকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল সেই বৌদ্ধধর্ম আবার ভারতে প্রচার করা জগজ্জ্যোতির প্রথম উদ্দেশ্য, বঙ্গদেশবাসী বৌদ্ধদের স্বধর্ম শিক্ষাদান ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল পালি সাহিত্য হইতে ভগবান বুদ্ধের অমৃত উপদেশ উদ্ধার করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন। চতুর্থ উদ্দেশ্য সিংহল ও বর্মা দেশে স্থানান্তরিত বৌদ্ধশাস্ত্র সমূহের প্রকাশ ও অনুবাদ কাজে বাঙালীকে সাহায্য করা'।

উদ্বোধনে বঙ্গদেশবাসীর প্রতি বলা হইয়াছে—

'আসিয়াছি আমি প্রাবৃট কালের
তোমাদের দ্বারে জলদ গর্জনে
নাম মম জগজ্জ্যোতি। দামিনীর খেলা সনে
অজ্ঞান আঁধারে আষাঢ়ী পূর্ণিমা
মায়াবদ্ধ জীবে শুভলগ্ন দেখে
দেখাতে সদ্ধর্ম জ্যোতি। এনু উৎফুল্ল মনে।'……

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে জগজ্জ্যোতি পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা বৌদ্ধধর্মের নির্যাস স্বরূপ নিম্নলিখিত গাথা বা শ্লোকটিকে শিরোভূষণরূপে ব্যবহার করিয়াছে—

সব্বপাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং এতং বুদ্ধানুসাসনং।

ড: বেণীমাধব বড়ুয়া, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিনাথ দে, গণপতি রায়, বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী, সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শরচ্চন্দ্র দাস, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, চারুচন্দ্র বসু, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমাপ্রসাদ চৌধুরী, ননীগোপাল মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন, দক্ষিণারঞ্জন মুৎসুদ্দী, পণ্ডিত ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির—ইঁহারা গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, পালি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যের কতকগুলি বিশিষ্ট অংশের অনুবাদ এবং বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে কতকগুলি আখ্যায়িকা অবলম্বনে ছোট গল্প বা উপন্যাস প্রভৃতি রচনা দ্বারা জগজ্জ্যোতিকে সমৃদ্ধ করেন। বাঙালীর বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে অনুসন্ধিৎসার নিবৃত্তি সাধনে ইঁহাদের রচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বহু পণ্ডিত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পত্রিকাটির সম্পাদনা কার্য পরিচালনা করিয়াছেন। ইহার কয়েকটি সংখ্যা সমণ পুন্নানন্দ ও বেণীমাধব বড়ুয়ার যুগ্ম সম্পাদকত্বে, তৃতীয় বর্ষ ৮ম—৯ম সংখ্যা কেবল গুণালঙ্কার মহাস্থবিরের সম্পাদকত্বে, দশম বর্ষের কয়েকটি সংখ্যা রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদের সম্পাদনায় ও এই বর্ষের আরো কয়েকটি সংখ্যা সমণ পুন্নানন্দ ও বেণীমাধব বড়ুয়ার যুগ্ম সম্পাদনায় এবং দ্বাদশ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবিরের পরিচালনায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকবর্গ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পত্রিকাটির সম্পাদনা কার্য সম্পন্ন করেন। এই সুপরিচালিত পত্রিকাটি দীর্ঘকাল বাংলার

বৌদ্ধধর্মানুরাগী জনগণের সমাদর লাভ করিয়া অবশেষে তিরোহিত হইয়াছে।

১৩৫৭ সালের শুভ আশ্বিনী পূর্ণিমায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার হইতে ত্রৈমাসিক বৌদ্ধ পত্রিকারূপে জগজ্জ্যোতির (নবপর্যায়ের) পুনরাবির্ভাব ঘটে। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়া ও ধর্মাধার মহাস্থবির। শীলানন্দ ব্রহ্মচারী বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে ইহার সম্পাদনার কাজ পরিচালনা করিয়া জগজ্জ্যোতিকে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতিমূলক এক শ্রেষ্ঠ মুখপত্রের স্তরে উন্নীত করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, কবিতা, পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, বৌদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা, এবং বিশ্ববৌদ্ধ সংবাদ প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ হইয়া জগজ্জ্যোতি তাহার পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাপদ' এবং প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে জগজ্জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সংঘমিত্রা পরিচালিত কিশোরতীর্থ বিভাগটি শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসু, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং স্বপন বুড়োর রচনা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। কালিদাস রায়, নরেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, রমা চৌধুরী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, রাধাগোবিন্দ বসাক, সজনীকান্ত দাস, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, রেজাউল করিম, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল ওদুদ, অনুরূপা দেবী এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনা এই পত্রিকার প্রধান ঐশ্বর্য।

বৌদ্ধবন্ধু

ইতিপূর্বে চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত 'বৌদ্ধ-পত্রিকা'র কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যতদূর জানা যায় চট্টগ্রাম হইতে আরো কয়েকখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে 'বৌদ্ধ-বন্ধু' নামক পত্রিকাখানি বিশেষ মূল্যবান। এই পত্রিকাটি খুব সম্ভবতঃ শ্রীকালী কিঙ্কর মুৎসুদ্দীর সম্পাদনায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর চলিবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। সতীশচন্দ্র বড়ুয়ার সম্পাদকত্বে পত্রিকাখানি আবার পুনর্জীবিত হয়; কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কলিকাতাস্থ কয়েকজন বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিতের প্রচেষ্টায় পত্রিকাখানি পুনঃ প্রকাশ লাভ করে। এই পত্রিকা

সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য—'বৌদ্ধ-বন্ধু বহুবার মরিয়া বহুবার বাঁচিয়াছে।'[১] ১৩২২ সালে শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামীর সম্পাদনায় পত্রিকাখানির পুনরাবির্ভাব ঘটে। ইহার তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত আছে—'১৩২২ সালের ২৪৫৯ বুদ্ধাব্দে বৈশাখ মাসে বৌদ্ধবন্ধু চতুর্থবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।' শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি প্রচার দ্বারা বৌদ্ধ সমাজের উন্নতিবিধান ইহার আত্মপ্রকাশের কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির প্রমুখ মনীষীদের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া বৌদ্ধবন্ধুও জগজ্জ্যোতির ন্যায় সমসাময়িক কালের এক শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক মুখপত্রের খ্যাতি অর্জন করে। 'বৌদ্ধবন্ধু' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় বঙ্গানুবাদসহ ধম্মপদের এই বুদ্ধ-বচনটি প্রারম্ভিক বাণীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—

আরভথ নিক্খমথ, যুঞ্জথ বুদ্ধসাসনে,
ধুনাথ মচ্চুনো সেনং নলাগারংব কুঞ্জরো।

দুঃখের বিষয় এইরূপ মূল্যবান পত্রিকাটিও বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। কয়েক বৎসর পরে ইহা আবার বন্ধ হইয়া যায়। অবশ্যই 'বৌদ্ধবন্ধু' নামটি একেবারে মরিয়া যায় নাই। এই নামটির পুনরাবির্ভাব ঘটে ১৩৪৬ সালে; কিন্তু মাসিক পত্রিকা হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ইহার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন জয়দ্রথ চৌধুরী ও প্রফুল্ল কমল বড়ুয়া। কয়েক বৎসর পরে ইহাও আত্মগোপন করে।

সম্বোধি

১৩৩১ সালে গজেন্দ্রলাল চৌধুরী ও ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়ার যুগ্ম সম্পাদনায় চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার হইতে এই মাসিক পত্র ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা ও বৌদ্ধ সাহিত্য বঙ্গাক্ষরে প্রচার করার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাটির আবির্ভাব।

তরুণ বৌদ্ধ

১৯২৬ খৃঃ রেঙ্গুন হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, দ্বিপঞ্চাশৎ ভাগ, ১৩৫২

ছাত্রসঙ্ঘ

১৩৩৪ সালে রেঙ্গুন হইতে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার ১৩৩৫ সালের ২য় বার্ষিক সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন জ্যোতিষ রঞ্জন বড়ুয়া।

সঙ্ঘশক্তি

১৯২৯ খৃঃ শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মিশনের মাসিক বাংলা মুখপত্র রূপে রেঙ্গুন হইতে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নবম বর্ষের ২য় সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্র বিনোদ বড়ুয়া। আবার এই বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা শীলালঙ্কার স্থবির ও রাজেন্দ্র বিনোদ বড়ুয়ার যুগ্ম সম্পাদনায় বাহির হইয়াছে। ১০ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন শীলালঙ্কার স্থবির। আর্য বংশ ভিক্ষু, জ্যোতিপাল ভিক্ষু, শীলালঙ্কার ভিক্ষু প্রমুখ পর পর বিভিন্ন সম্পাদকের সুষ্ঠু সম্পাদনায় সঙ্ঘশক্তি প্রকাশিত হয়।

বৌদ্ধ-ভারত

১৯৩৪ খৃঃ ধর্মআদিত্য ধর্মাচার্যের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে এই মাসিক পত্রিকাটি বাহির হয়। ইতিহাস, সাহিত্য, প্রত্নতত্ব, চিত্রশিল্প, বৌদ্ধ শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ ও বৌদ্ধ জগৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও বিবরণী ইত্যাদি প্রকাশ করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

জাগরণী

১৩৪৬ সালের আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মুৎসুদ্দী। বৌদ্ধকৃষ্টি মূলক কিছু কিছু প্রবন্ধ এই পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিশ্ববৌদ্ধ

১৩৬১ সালে আশ্বিন মাসে প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে বিশ্ববৌদ্ধ মাসিক পত্রিকারূপে বহির্গত হয়। বাগীশ বন্ধু মুৎসুদ্দীর সম্পাদনায় ইহার প্রথম সংখ্যাটি মাত্র প্রকাশিত হয়। পরে জ্ঞানতিলক শ্রমণ ও ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়ার সম্পাদনায়ও বিশ্ববৌদ্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশ্ব বৌদ্ধ সংবাদ পরিবেশন এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরে একটি করিয়া প্রবন্ধও ছাপা হইত।

নিরঞ্জনা

১৩৬৩ সালে সার্ধদ্বিসহস্রতম বুদ্ধ জয়ন্তী বৎসর কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হইতে নিরঞ্জনার আবির্ভাব। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন

বনবিহারী গোস্বামী। বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় বুদ্ধবাণী প্রচারের সঙ্কল্প লইয়া ইহা প্রকাশিত হয়। সিংহলী ভিক্ষু স্বর্গত অনাগারিক ধর্মপালের জীবন-ব্যাপী প্রয়াসও ইহার প্রেরণারূপে কাজ করিয়াছে।

পূর্ণিমা

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশিত পূর্ণিমা পত্রিকার প্রথম সম্পাদক নলিনীরঞ্জন বড়ুয়া। ২য় বর্ষ হইতে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ গুহ ও শিশির রঞ্জন গুহ যুগ্ম সম্পাদক-রূপে পত্রিকাটির সম্পাদনার কার্যভার গ্রহণ করেন। অন্যান্য বিষয়ের সহিত বৌদ্ধ সংস্কৃতি মূলক কিছু কিছু প্রবন্ধও পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। যতদূর জানা যায় চট্টগ্রাম ও কলিকাতা হইতে আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এইগুলি এখন সমস্তই দুষ্প্রাপ্য। পত্রিকাগুলি দেখিবার সুযোগ না পাওয়ায় সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না। কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হইল—গৈরিকা, পারমিতা, কৃষ্টি, কিশলয়, উদয়ন ইত্যাদি।

নালন্দা

১৩৭৩ সালে বুদ্ধ পূর্ণিমায় পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের সম্পাদনায় কলিকাতা 'নালন্দা বিদ্যা ভবন'-এর মুখপত্ররূপে ত্রৈমাসিক নালন্দা পত্রিকার আবির্ভাব। প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে আদর্শ করিয়া নালন্দা বিদ্যাভবনের প্রতিষ্ঠা। 'সেইরূপ বৌদ্ধ তথা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের উদ্দেশ্যে নালন্দা পত্রিকার সূচনা।' ইহাতে বিশ্ব সংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, অনুবাদ, সাময়িক সংবাদ পরিবেশিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। নালন্দাই একমাত্র জীবিত বৌদ্ধ সংস্কৃতি মূলক পত্রিকা। বর্তমানে ইহার তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে।

(ঙ) বৌদ্ধ অনুবাদ সাহিত্য (পালি ও সংস্কৃত)

প্রায় সমগ্র পালি সাহিত্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বিরাট বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যও প্রাচীন ও মধ্যযুগে চীন এবং তিব্বতে অনূদিত হয়। বর্তমান কালেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপ কয়েকখানি মূল্যবান বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ হইতে বাঙালী পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ কাজে অগ্রসর হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি, ধর্মাঙ্কুর বিহার, চট্টগ্রামের বৌদ্ধ বিহার এবং রেঙ্গুন

বৌদ্ধ মিশন নামক বাঙালী প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া পালি সাহিত্যের এই অনুবাদ কার্য আরম্ভ হয়। এই কাজে বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দান অগ্রগণ্য। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই যুগের শিক্ষিত পণ্ডিতগণও মাতৃ ভাষায় পালি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ কাজে মনোনিবেশ করেন। মাতৃভাষায় বৌদ্ধ ভাবধারা ও জ্ঞানের বিস্তৃতি সাধনে এই অনুবাদ গ্রন্থসমূহের বিশেষ স্থান অনস্বীকার্য।

সম্ভবতঃ খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত 'সুত্তনিপাত' গ্রন্থটিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম অনুবাদক ধর্মরাজ বড়ুয়া। ১৮৮৭ খৃঃ কলিকাতা হইতে তাঁহার 'সুত্তনিপাত' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'সুত্ত-নিপাত'-এর ন্যায় একখানি দুরূহ গ্রন্থকে সরস সুন্দর ভাষায় মূলের শব্দ বিন্যাস ও অর্থ সঙ্গতি বজায় রাখিয়া তিনি পদ্যানুবাদ করেন। পয়ার, একান্ত মিল পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী—এই চারিটি ছন্দের ব্যবহার দ্বারা ধর্মরাজ তাঁহার রচনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত 'সুত্তনিপাত'-এর গদ্যানুবাদ মহাবোধি সোসাইটি হইতে ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। সুত্তনিপাতের পর 'ধম্মপদ' বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় অনূদিত গ্রন্থ। ইহা সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যের সংহত বাণীরূপ, গীতা যেমন ভাগবদ্ গ্রন্থের সার-নির্যাস, 'ধম্মপদ'ও তেমনি সমগ্র ত্রিপিটক সাহিত্যের সার সঙ্কলন। স্বর্গত চারুচন্দ্র বসু ১৯০৪ খৃঃ ধম্মপদ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া মাতৃ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তাঁহার অনুবাদের আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থে তিনি বাংলা অনুবাদের সঙ্গে মূল শ্লোকের অন্বয় ও সংস্কৃত ভাষান্তরও করিয়াছেন। ১৯০৫ খৃঃ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যের 'ধম্মপদম্' সংস্কৃত শ্লোকে ও বাংলা ভাষায় কপিলাশ্রম হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ খৃঃ ইহার ২য় সংস্করণ হইয়াছে। ১৯৫৩ খৃঃ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অনোমদর্শী এই গ্রন্থের ভাষাভিত্তিক আক্ষরিক অর্থ ও তত্ত্বার্থ করিয়াছেন এবং প্রতি শ্লোক কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধকণ্ঠে উদ্‌গীত হইয়াছে, 'ধম্মপদ অট্‌ঠকথা' গ্রন্থের উপাখ্যানগুলিকে অবলম্বন করিয়া তাহাও 'পরিচিতি' অংশে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নালন্দা বিদ্যাভবন হইতে প্রকাশিত শীলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত 'অমৃতধারা' ধম্মপদের গদ্যানুবাদ হইলেও ভাষায় মৌলিকত্ব আছে। ১৯৫৬ খৃঃ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভিক্ষু শীলভদ্র (২য় সং ১৯৫৩) এবং পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (১৯৬৬ খৃঃ) এই গ্রন্থের

সহজ গদ্যানুবাদ করিয়াছেন। বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী প্রথম এই গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। (জগজ্জ্যোতি—পুরাতন পর্যায়, তৃতীয় বর্ষ)। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও ইহার প্রথম কয়েকটি বগ্‌গকে কবিতায় অনূদিত করিয়াছেন। এই রীতিতে সর্বানন্দ বড়ুয়া, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক ললিতকুমার বড়ুয়াও এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। 'ধম্মপদ-অট্‌ঠকথা' বা টীকার রচয়িতা আচার্য বুদ্ধঘোষ। তিনি অসাধারণ জ্ঞানী, বাগ্মী ও বহু শাস্ত্রবিদ্‌ ছিলেন। অট্‌ঠকথায় তিনি প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যার সঙ্গে একটি উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন। শীলালঙ্কার মহাস্থবির এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড (যমক বগ্‌গ) ভাষান্তরিত করেন। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৯৩৪ খৃঃ রেঙ্গুন হইতে প্রকাশিত হয়। এই অনূদিত গ্রন্থখানি যথেষ্ট জনপ্রিয় হওয়ার জন্যই সম্প্রতি মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক তাহার দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবান বুদ্ধের ধর্মানুশাসনে আশ্রয় লাভ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা তাঁহাদের অতীত জীবন ও শাস্তার সাহচর্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভের বিষয় গাথার মাধ্যমে বিবৃত করিয়াছেন। থেরীদিগের ধ্যান-ধারণা ও জীবনাদর্শের প্রতিটি পর্ব 'থেরীগাথা'য় অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই অনুপম গাথাগুলিকে পদ্যানুবাদ করিয়া বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাভঙ্গী সরল ও কবিত্বময়। মূলের স্বাদ তাঁহার অনুবাদেও রক্ষিত হইয়াছে। ১৩৫৭ সালে ভিক্ষু শীলভদ্র গ্রন্থটিকে গদ্যে ভাষান্তরিত করিয়াছেন। 'থেরগাথা' বা স্থবিরগাথা গ্রন্থখানি জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাজ্ঞ স্থবিরদের জীবন আখ্যান। এই গ্রন্থে ২৪৬ জন বুদ্ধ-শিষ্য অর্হতের জীবনকথা স্থান পাইয়াছে। ১৯৩৫ খৃঃ রেঙ্গুন হইতে স্থবির এই গ্রন্থের টীকাসহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার অনুবাদের আন্তরিকতা প্রশংসনীয়; কিন্তু মূল গ্রন্থের গাম্ভীর্য ও সমুন্নতি অনুবাদে রক্ষিত হয় নাই।

বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত অপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ হইতেছে 'জাতক'। 'জাতক' গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত। স্বর্গত কালীপ্রসন্ন সিংহ লক্ষাধিক শ্লোকযুক্ত সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করিয়া বিদ্বৎ সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। Fausboll সম্পাদিত ৫৪৩টি জাতক সমন্বিত জাতকত্থকথার স্বয়ং অনুবাদ করিয়া ঈশানচন্দ্র ঘোষও সেইরূপ দৃঢ় মনোবল ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিয়াছেন। ঈশানচন্দ্র ঘোষ টীকা বা

'বেয্যাকরণ' বাদে সমগ্র জাতক (১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড) অনুবাদ করেন। তাঁহার এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বিশেষ সংযোজন। এই বিপুল গ্রন্থে ঈশানচন্দ্র ঘোষের অনুসন্ধিৎসা, প্রখর বিদ্যাবুদ্ধি ও পালি সাহিত্যে অসামান্য শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয়ও লাভ করা যায়। তাঁহার ভাষার তেজস্বিতা ও প্রাঞ্জলতা মূল গ্রন্থের ভাব প্রকাশে সহায়তা করিয়াছে। এই গ্রন্থ দ্বারা তিনি যথার্থই বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি 'নিদান-কথা'র অনুবাদ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 'নিদানকথা' শাক্য-শ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থের অতীত ও বর্তমান জীবনের আখ্যান। পালি ভাষায় ইহাই বুদ্ধের একমাত্র জীবনী গ্রন্থ। ধর্মপাল ভিক্ষু ১৩৬৯ সালে এই গ্রন্থ বাংলায় ভাষান্তরিত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সহজ ও অনাড়ম্বর। সহৃদয় প্রকাশভঙ্গি ও সহজ আন্তরিকতায় গৌতমের জীবনী-গ্রন্থ বাংলা ভাষায় সুষ্ঠুরূপ লাভ করিয়াছে।

সুত্তপিটকের অন্তর্গত মজ্ঝিমনিকায়ে বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মের আদিরূপ পরিলক্ষিত হয়। অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে প্রথম অগ্রসর হইয়াছেন ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া। তিনি ১৯৪০ খৃঃ 'মজ্‌ঝিমনিকায়' গ্রন্থের ১ম খণ্ড অনুবাদ করেন। ডঃ বড়ুয়ার প্রতিভার দীপ্তি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকেও গৌরবময় ঐতিহ্য দান করিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, গম্ভীর ও সহজবোধ্য। ১৯৫৮ খৃঃ 'মজ্‌ঝিমনিকায়' ২য় খণ্ডের অনুবাদ করিয়াছেন পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির। ১ম খণ্ডে অনুবাদক যথাসাধ্য পারিভাষিক পালি শব্দের বাংলা করিয়াছেন, ২য় খণ্ডে বহু পারিভাষিক শব্দ রহিয়া গিয়াছে; তৎসত্ত্বেও মহাস্থবিরের গ্রন্থের ভাষা বিষয়ানুসারে সরল হইয়াছে। এই জটিল গ্রন্থের অনুবাদ বাংলা পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপিত করিয়া তিনি গ্রন্থোক্ত তত্ত্ব-সমূহ জানিবার পথ সুগম করিয়াছেন।

'দীঘনিকায়' ৩৪টি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুত্তের সংগ্রহ। সুত্তগুলি এত দীর্ঘ যে প্রত্যেকটিকে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া যায়। ভিক্ষু শীলভদ্র দীঘনিকায়ের ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ করেন। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। দুরূহ পারিভাষিক শব্দের দ্বারা তাঁহার ভাষা মন্থরগতি হয় নাই। রেঙ্গুন হইতে রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির ১৯৬২ খৃঃ দীঘনিকায়ের ১ম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করেন। দীঘনিকায়ের অন্তর্গত কয়েকটি খণ্ড খণ্ড সুত্তও বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে

বুদ্ধদেবের অন্ত্য জীবন ও উপদেশাবলী সম্বলিত 'মহাপরিনির্বাণ সুত্র', 'গৃহী বিনয়' নামে অভিহিত 'সিগালোবাদ সুত্ত' ও 'মহাসতিপট্ঠান সুত্ত' উল্লেখযোগ্য। 'মহাপরিনির্বাণ সূত্রে' বুদ্ধ জীবনের শেষ তিন মাসের ঘটনাবলী ও উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম প্রচারক ব্রজগোপাল নিয়োগী ১৯০১ খৃঃ এই গুরুত্বপূর্ণ সুত্তটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত আলোচনা ও শাস্তার শেষ দেশনার সহিত পরিচিতি লাভ করিবার পথ সহজ করিয়াছেন। দীঘনিকায়ের অন্তর্গত 'সিগালোবাদ সুত্ত' বৌদ্ধ গৃহীদের নিকট বিশেষ সমাদৃত। এই সুত্তে গৃহস্থ পুত্র সিগালকের প্রতি শাস্তা গৃহীর কর্ত্তব্য নির্দেশ করিয়াছেন। এইজন্য আচার্য বুদ্ধঘোষ এই সুত্তটিকে 'গৃহী-বিনয়' নামে অভিহিত করিয়াছেন। মূল পালি, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া সম্পাদিত ও সঙ্কলিত 'গৃহীবিনয়' গ্রন্থ ১৯১৩ খৃঃ কলিকাতা ধর্মাঙ্কুর বিহার হইতে প্রকাশিত হয়। মূল গ্রন্থের ভাব ও বক্তব্য অনুবাদেও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। দীঘনিকায়ের অন্তর্গত 'মহাসতিপট্ঠান' সুত্তন্তের ন্যায় একটি দুরূহ বিষয়কেও ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া প্রথম বাংলা ভাষায় অনূদিত করেন।

লৌকিক ও লোকোত্তর ধর্মে যথাযথ অনুভূতি, সত্য আবিষ্কার, মনন, চিন্তন ও নিদিধ্যাসন হৃদয়ে যে মহান্ ভাব জাগ্রত করে তাহারই বাঙময় রূপ হইতেছে 'উদান'। বৌদ্ধ 'উদান'গ্রন্থ ভগবান বুদ্ধের ভাব সমাহিত বাক্ প্রতিমা। এই গ্রন্থটি সুত্তপিটকের অন্তর্গত এবং প্রধানতঃ গাথায় রচিত। জ্যোতিপাল ভিক্ষু রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন হইতে ১৯৩০ খৃঃ মূলসহ গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশ করেন। ঋজু প্রাঞ্জল ভাষায় 'উদান' গ্রন্থের অন্তর্গত বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি, আদর্শ ও নির্বাণের বিষয়কে তিনি সহজবোধ্য করিয়াছেন।

'বুদ্ধবংস' গৌতমবুদ্ধের এবং দীপঙ্কর, কৌণ্ডিণ্য, মঙ্গল, সুমন, রেবত প্রমুখ আরো ২৪ জন বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত একটি জীবনী গ্রন্থ। রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস হইতে ১৯৩৪ খৃঃ শ্রীধর্মতিলক স্থবির এই গ্রন্থ সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ভারতীয় ভাষায়ও ইহাই বুদ্ধবংশের সর্বপ্রথম অনুবাদ গ্রন্থ। ২৪ জন বুদ্ধের জীবনী সম্বলিত এই মূল্যবান গ্রন্থটিকে মাতৃভাষায় বাণীরূপ প্রদান করিয়া লেখক বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। খুদ্দকনিকায়ের প্রথম গ্রন্থ 'খুদ্দকপাঠ'-এ বৌদ্ধধর্মের অবশ্য জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় এবং বিশেষ কয়েকটি সুত্ত গ্রথিত হইয়াছে। গ্রন্থটি আকারে

ক্ষুদ্র হইলেও গুরুগম্ভীর তত্ত্ব ও তথ্যপুঞ্জে এবং প্রসাদ গুণে সমুজ্জ্বল। অনেকেই এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ধর্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়ার ১৯৫৫ খৃঃ অনূদিত মূলসহ সহজ গদ্যানুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিনয় পিটকের অন্যতম গ্রন্থ 'মহাবগ্‌গ'। বহু তথ্যপুঞ্জে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির। গ্রন্থটি ১৯৩৭ খৃঃ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মূল বিষয়কে লেখক সহজ ও অনাড়ম্বর ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন। বিনয় পিটকের অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'পাতিমোক্‌খ'। এই গ্রন্থটিকে সমগ্র বিনয় পিটকের ভিত্তিভূমি বলা যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বাংলা ভাষায় 'ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ' গ্রন্থের অনুবাদ করেন (তাঁহার 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সন্নিবেশিত)। বাংলা দেশে পালি আলোচনায় তিনিই প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁহার পরে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ১৩২৭ সালে 'ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ' অনুবাদ করেন। তাঁহার এই গ্রন্থ বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য তাঁহার বাণী ভঙ্গির প্রাঞ্জলতায় বাঙালী পাঠকের নিকট প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট হইয়াছে। ফুলচন্দ্র বড়ুয়া 'পাদ্দিমুখ' নামে প্রাতিমোক্ষের গদ্যানুবাদ করেন। বংশদীপ মহাস্থবিরও ১৯৩৭ খৃঃ ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ অনুবাদ করিয়াছেন।

অভিধর্ম পিটকের সার সংগ্রহ গ্রন্থের নাম 'অভিধম্মত্থ সংগহ'। আচার্য অনিরুদ্ধ পালি ভাষায় 'অভিধম্মত্থ-সংগহ' প্রণয়ন করেন। অভিধম্ম সাহিত্যে যুগ যুগ ধরিয়া যে নিগূঢ় ও গভীর জ্ঞান সঞ্চিত ও সংরক্ষিত আছে 'অভিধম্মত্থ সংগহ' তাহার সার সঙ্কলন। বাংলা ভাষায় অভিধর্ম গ্রন্থের সর্বপ্রথম অনুবাদক- ডঃ রামচন্দ্র বড়ুয়া। স্বর্গত বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী এই গ্রন্থের অন্যতম অনুবাদক (১৯৪০ খৃঃ)। তাঁহার অনুবাদ বাঙালীর অভিধর্ম জ্ঞান স্পৃহা পূর্ণ করিয়াছে। অভিধর্মের বিষয় যতই গুরু-গম্ভীর, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং দুরাবগাহ হউক না কেন মুৎসুদ্দী মহাশয়ের সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় এবং পরিবেশন গুণে তাহা সুস্পষ্ট ও মননদীপ্ত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থকে কেবল অনুবাদ গ্রন্থের পর্যায়- ভুক্ত করা যায় না। গ্রন্থে মূলানুগত অনুবাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও অনুশীলনী সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে লেখকের গভীর বিচারধর্মী মননের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার আচার্য বুদ্ধঘোষ। ত্রিপিটকে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার প্রথম রচিত গ্রন্থের নাম 'বিসুদ্ধিমগ্‌গ'। স্বর্গত

গোপালদাস চৌধুরী ও শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী ১৩৩০ সালে এই গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তরিত করেন। 'বিশুদ্ধিমার্গ'-এর ভাষা মূলানুগত ও সহজবোধ্য। বংশদীপ মহাস্থবির সঙ্কলিত ও অনূদিত 'প্রজ্ঞাভাবনা' ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার তথ্যপূর্ণ ভূমিকাসহ ১৯৩৬ খৃঃ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। 'প্রজ্ঞাভাবনা' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ সংযোজন। গ্রন্থকার আক্ষরিক অনুবাদ না করিলেও গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

ত্রিপিটক বহির্ভূত গ্রন্থের মধ্যে 'মিলিন্দপঞ্‌হো'ই অন্যতম। এই গ্রন্থ স্থবির নাগসেন ও গ্রীক রাজ মিনান্দারের মধ্যে কথোপকথনরূপে লিখিত। গ্রন্থের মেণ্ডকপঞ্‌হ বা উভয়কোটিক প্রশ্নসমূহ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির নিদর্শন। যুক্তি-ভিত্তিক ও বিচারবিশ্লেষণধর্মী সাহিত্যরূপে 'মিলিন্দপ্রশ্ন' ভারতীয় সাহিত্যে তুলনারহিত মৌলিকতার দাবী রাখে। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে ও প্রেরণায় এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। গ্রন্থের ১ম ভাগ ১ম খণ্ডের এবং ২য় ভাগের অনুবাদ মূলসহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ১৩১৫ খৃঃ ও ১৩১৮ খৃঃ প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় পালি ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি সূক্ষ্ম বিচার নৈপুণ্য ও তথ্যযুক্তিনিষ্ঠ নির্ভীক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মূল গ্রন্থের আদর্শ ও ভাব তাঁহার অনুবাদেও রক্ষিত হইয়াছে। লেখকের সহৃদয় পরিবেশন গুণে অনুবাদ সাহিত্যও গতানুগতিকতার স্তর উত্তীর্ণ হইয়া সাহিত্য স্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি সম্পূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করিতে পারেন নাই। রেঙ্গুন হইতে সমগ্র 'মিলিন্দপঞ্‌হো'-রও আর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

'লোকনীতি' নামক ১৬৬টি গাথা সমন্বিত একটি উপদেশাশ্রিত গ্রন্থের মূলসহ বঙ্গানুবাদ ১৯৩২ খৃঃ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন হইতে প্রকাশিত হয়। চাণক্য শ্লোক যেমন লোকাচার নির্ভর, 'লোকনীতি'ও তেমনি সমসাময়িক আচার, অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার দূরীকরণে রচিত। গ্রন্থটি এতই সমাদৃত হয় যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৯৩৭ খৃঃ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। ভাষার সারল্যে ও পরিবেশনের কৌশলে মূল গ্রন্থের ভাববস্তু অনুবাদেও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ত্রিপিটক বহির্ভূত সাহিত্যের মধ্যে ৯৮টি গাথাসমন্বিত সিংহলী কাব্যগ্রন্থ 'তেলকটাহ' গাথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রজ্ঞালোক স্থবির রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন হইতে মূলসহ গ্রন্থটির পদ্যানুবাদ-প্রকাশ করেন। এই কাহিনী-নির্ভর অথচ গভীর তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তরিত

করিয়া তিনি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দ্বারিকা মোহন মুৎসুদ্দীর 'ভাটাবংস' অনুবাদও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পালি ভাষায় গ্রন্থ রচনার ধারা আধুনিক যুগ পর্যন্ত চলিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্রহ্মদেশে 'সাসনবংস' নামে একটি গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থের রচয়িতা ব্রহ্মদেশের মান্দালয় বিহারের আচার্য প্রজ্ঞাস্বামী। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতিহাস এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ভারত ও বহির্ভারতে এবং সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কাহিনী এইখানে আলোচিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পালিভাষায় বৌদ্ধধর্মের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ হইলেও প্রজ্ঞাস্বামী এই কাজে অশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অধ্যাপক ধর্মাধার মহাস্থবির ১৯৬২ খৃঃ এই মূল্যবান গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত করেন। এই ঐতিহাসিক তথ্যাশ্রিত গ্রন্থটিকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি প্রাচীন ভারত ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘনিষ্ঠ করিয়া দিয়াছেন।

পালি ভাষায় প্রচুর ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্র এবং অভিধান ইত্যাদি গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। বাঙালী পণ্ডিতগণ পালি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রসারের জন্য পালি ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার ইত্যাদির অনুবাদ কাজেও অগ্রসর হইয়াছেন। পালি ভাষার অন্যতম বৈয়াকরণ কচ্চায়ন। যতদূর জানা যায় সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় 'পালি ব্যাকরণ' রচনা করেন চট্টগ্রামের নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬ খৃঃ—১৮৯৬ খৃঃ)। বংশদীপ মহাস্থবিরও মূলসহ 'কচ্চায়ন' ব্যাকরণের এবং 'বালাবতার'-এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৩৪৪ সালে জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের 'পালি প্রবেশ' চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক নীরদ রঞ্জন মুৎসুদ্দী ও তৎসহ ভূপেন্দ্রনাথ মুৎসুদ্দী রচিত 'পালি ব্যাকরণ ও অনুবাদ শিক্ষা' নামক গ্রন্থখানিও উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থদ্বয়ে 'কচ্চায়ণ বৃত্তি', 'বালাবতার', 'মহারূপ সিদ্ধি', 'সদ্দনীতি' প্রভৃতি মূল ব্যাকরণ হইতে সূত্র সংগ্রহ করিয়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ ব্যাকরণের জটিল তত্ত্বগুলি আলোচনা করা হইয়াছে। অধ্যাপক মুৎসুদ্দী মহাশয়ের 'Pali Grammar and A Manual of Pali Translation' গ্রন্থের ন্যায় তাঁহার বাংলা ভাষায় রচিত ব্যাকরণটিও পালি ভাষা অনুশীলনকারীদের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে এবং ইহার অনেকগুলি সংস্করণও বাহির হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩৫ খৃঃ প্রকাশিত 'বালাবতার' গ্রন্থের অংশ বিশেষ ইংরেজীর সহিত বাংলা অনুবাদসহ

অধ্যাপক শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। পালি ছন্দ গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে সিংহল দেশীয় স্থবির সংঘরক্ষিত রচিত 'বুত্তোদয়'। অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ এই গ্রন্থ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের 'পালি প্রবেশ'-এর অন্তর্গত হইয়াছে। সংঘরক্ষিত রচিত পালি অলঙ্কার শাস্ত্র 'সুবোধালঙ্কার' গ্রন্থের মূলসহ বঙ্গানুবাদ আর্যবংশ ভিক্ষু কর্তৃক ১৩৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী সুনিপুণ শব্দ চয়ন ও সতর্ক ভাষা বিন্যাস গ্রন্থটিকে উল্লেখযোগ্য স্থান দান করিয়াছে। স্থবির জ্ঞানানন্দ স্বামীর 'অভিধান-প্রদীপিকা' বা পালিশব্দকোষ গ্রন্থে প্রত্যেক পালি শব্দের পার্শ্বে বাংলা প্রতিশব্দ ও গণনাঙ্কের দ্বারা অর্থের সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থটিও বিশেষ মূল্যবান।

বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদকগণ কেবল পালি গ্রন্থের অনুবাদ কর্মেই তাঁহাদের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। খাঁটি সংস্কৃত এবং বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদেও বাঙালী পণ্ডিতগণ অগ্রসর হইয়াছেন। কাশ্মীরদেশীয় মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষায় তাঁহার 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা' রচনা করেন। তিনি খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষাংশে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বিদ্যমান ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র সমসাময়িক কালের একজন যুগন্ধর কবি। বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার স্নিগ্ধ মধুর লালিত্যে ও রচনারীতির সৌষ্ঠবে সর্বজনের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা'য় ১০৮টি পল্লব; শেষ পল্লব তাঁহার যোগ্যতম পুত্র সোমেন্দ্রের রচনা। ভাষার গম্ভীর্য ও স্নিগ্ধমধুর লালিত্য গ্রন্থটিকে মহাকবি কালিদাসের রচনার সমকক্ষ স্থান দান করিয়াছে। 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র কাহিনী সমূহ গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত। সম্যক্ সম্বোধি লাভ করার পর তিনি নিজে তাহা ভিক্ষুদের নিকট বিবৃত করেন। স্বর্গত শরচ্চন্দ্র দাস ক্ষেমেন্দ্রের এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকে অধিকতর সমৃদ্ধি ও গৌরবময় পথে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে সোমেন্দ্রের রচনা 'জীমূতবাহনাবদন' ও সোমেন্দ্রকৃত তাঁহার পিতৃপরিচয় ১ম খণ্ডের প্রথমে স্থান পাইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাঁহার ভাষার গাম্ভীর্য ও মাত্রাবোধ, সাবলীল প্রকাশভঙ্গী ও প্রসাদগুণ মূল রচনার ভাব ও রসমাধুর্য প্রকাশের উপযোগী হইয়াছে।

মহাকবি অশ্বঘোষ দুইখানি অমর কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন—'সৌন্দরানন্দ'ও 'বুদ্ধচরিত'। বৌদ্ধধর্মের অনিত্যতা তত্ত্বের সঙ্গে বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যুবরাজ নন্দ ও নন্দপ্রিয়া শাক্যকুলবধূ সুন্দরীর আখ্যান 'সৌন্দরানন্দ' কাব্যে রস-সঞ্জীবিত হইয়া চিরন্তন অমরতা লাভ করিয়াছে। ডঃ বিমলাচরণ লাহা ১৩২৯ সালে এই গ্রন্থটি প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন। মূল গ্রন্থের ভাবগাম্ভীর্য ও কাব্যসৌন্দর্য অনুবাদেও রক্ষিত হইয়াছে। শান্তিদেবের 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের জীবনব্রত, তাঁহার সমুন্নত চারিত্রিক মহিমা ও বলিষ্ঠ আত্ম-প্রত্যয় ঘোষিত হইয়াছে। এই অনুপম গ্রন্থটি মূলসহ স্বর্গত গোপাল দাস চৌধুরী অনুবাদ করেন। অনুবাদ সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য। শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ও এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। মূলসহ তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থ বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্র কবিভারতী প্রণীত 'ভক্তিশতকম্' একটি সর্বজনোপভোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ১৮৯৬ খৃঃ শরচ্চন্দ্র দাস Buddhist Text Society হইতে শ্রীশীলস্কন্দ মহাস্থবির সম্পাদিত 'ভক্তিশতকম্' মনোরমা নামক তাহার টীকাসহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বৌদ্ধবন্ধু, ২য় সং, ১৩২৩—৫ম সং, ১৩২৩ ধারাবাহিক)। এই গ্রন্থের পরবর্তী অনুবাদক বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির ১৯৪৫ খৃঃ মূলসহ ইহার গদ্যানুবাদ করেন। বক্তব্য বিষয়ের সরসতা ও ভাষার সাবলীল গতির জন্য তাঁহার অনুবাদ কোথাও ক্লান্তিকর হইয়া উঠে নাই এবং পূর্ববর্তী অনুবাদ অপেক্ষা অধিকতর সমাদৃত হইয়াছে। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্যে কবি-প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ ঘটিয়াছে। এইজন্য 'বুদ্ধচরিত' গতানুগতিক জীবনীগ্রন্থে পরিণত না হইয়া মহাকাব্যে পরিণত হইয়াছে। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'বুদ্ধচরিত' কাব্যের আংশিক মূলসহ পদ্যানুবাদ করেন (জগজ্জ্যোতি, নবম বর্ষ, ১৩২৩)। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'বুদ্ধচরিত'-এর আংশিক গদ্যানুবাদ 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে (১৩৩৮-৩৯ সালে ধারাবাহিক)। ১৩৫১ সালে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুদ্ধচরিত'-অনুবাদ গ্রন্থের ১ম খণ্ড এবং ১৩৫৮ সালে ২য় খণ্ড বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও এই কাব্যের 'লুম্বিনী যাত্রিক' নামক সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত অনুবাদ করেন। মূল গ্রন্থের ভাবাদর্শ অতি সার্থক ও নৈপুণ্য-সহকারে উভয়ের গ্রন্থে সংরক্ষিত হইয়াছে। বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'মহাবস্তু' গ্রন্থটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পালি সাহিত্যে জাতক কাহিনীর যে গুরুত্ব, বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে অবদান কাহিনীর সেই গুরুত্ব স্বীকৃতি পাইয়াছে। ১৯৬৩ খৃঃ

পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের 'মহাবস্তু অবদানং' ১ম খণ্ড এবং ১৯৬৫ খৃঃ ২য় খণ্ড সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ডঃ বসাকের গ্রন্থ ত্রিভাষায় (Tri-lingual) প্রণীত। এই অনুবাদ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে তাঁহার এক অবিস্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভ। মূল গ্রন্থের প্রসাদগুণ ও ধ্বনি-গাম্ভীর্য ভাষান্তরেও রক্ষিত হইয়াছে। ডঃ হেরম্ব চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৮ ও ১৯৬২ খৃঃ দুই খণ্ডে নাগার্জুনের মূল মাধ্যমিক কারিকার ইংরেজীর সহিত বাংলা পদ্যানুবাদ সংযোজন করিয়া প্রকাশ করেন। মূলতত্ত্ব সহজবোধ্য করিবার জন্য এই গ্রন্থে বঙ্গানুবাদসহ বিশেষ ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে গজেন্দ্রলাল চৌধুরী অনূদিত 'বেসন্তর' (১৯১৫ খৃঃ) প্রজ্ঞানন্দ সঙ্কলিত 'বুদ্ধের অভিযান' (১৩৪২, চট্টগ্রাম) এবং বিশুদ্ধাচার স্থবির রচিত 'অশোক চরিত' (১৯৫৬, চট্টগ্রাম) গ্রন্থত্রয়ও অনুবাদাশ্রয়ী সাহিত্যরূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অশোক-চরিত' ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় রচিত 'জিনার্থ প্রকাশনী' গ্রন্থের পদ্যানুবাদ।

ইংরেজী ভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক বিশ্ববিখ্যাত কয়েকখানি গ্রন্থের অনুবাদ কার্যেও কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়াছেন। James Legge-এর 'A Record of Buddhist kingdoms', Beal-এর 'Buddhist Records of the Western World', 'The Mission of Sung-yun and Hwei-Sang to obtain Buddhist Books in the West' এবং 'Life of Hiuen-Tsiang', Watters-এর 'On Yuan-chwang' এবং Takakusu-এর 'A Record of Buddhist Religion' প্রভৃতি চীনা ভাষা হইতে ইংরেজীতে অনূদিত চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ('সমসাময়িক ভারত' গ্রন্থরাজির অন্তর্গত দ্বিতীয় কল্পের প্রথম হইতে চতুর্থ খণ্ডের মধ্যে) চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় রচনা করেন। চৈনিক পরিব্রাজককল্পে ফা-হিয়ান (ও তৎসহ সাং-ইয়ান ও হুই-সাং) ১ম খণ্ডে (১৩২০ সাল) হিউয়েন সিয়াং ২য় ও ৩য় খণ্ডে এবং আইৎ-সিং ৪র্থ খণ্ডে (১৩২৪ সাল) স্থান পাইয়াছে। লেখক নীরস ভ্রমণ কাহিনীকেও অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহ বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—'অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ অনেক দিন

ধরিয়া ইতিহাস ক্ষেত্রে তাঁহার উত্তম, অধ্যবসায় ও গবেষণার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। সুনির্বাচিত বৈদেশিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ নিচয়ের অনুবাদের দ্বারা বঙ্গভাষার যে বিশিষ্টভাবে পুষ্টিসাধন হইতে পারে তাহা নিঃসন্দেহ। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক রচনাপেক্ষ এইরূপ অনুবাদ বঙ্গভাষার কল্যাণ সাধন কল্পে অধিকতর প্রয়োজনীয়।' (ভূমিকা, পৃঃ ৮/—৮০/০ সমসাময়িক ভারত, প্রথম কল্প—প্রাচীন ভারত, ৫ম খণ্ড, ১৩২৯)

সাহিত্য সাধক সৌরীন্দ্র মোহন মুৎসুদ্দী মহাশয় Nanjio-এর 'A short History of the Twelve Japanese Buddhist Seots' নামক মূল্যবান্ গ্রন্থ খানির অনুবাদ করিয়াছেন। 'জাপানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়' নামে এই ইংরেজী গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ জগজ্জ্যোতি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (১ম ভাগ, ৫ম সং, ১৩১৫—১২ সং, ১৩১৬) প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে এই অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে নূতন সংযোজন রূপে স্বীকৃতি লাভ করিত। অনুবাদকের ভাষাও সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য। ভিক্ষু শীলভদ্রের Paul Carus-এর 'The Gospel of Buddha' গ্রন্থের অনুবাদ মহাবোধি সোসাইটি হইতে 'বুদ্ধ-পথ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া লিখিয়াছেন—'সম্প্রতি শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষু শীলভদ্র (শ্রীযুত কে. কে. রায়) এই গ্রন্থের গদ্যানুবাদ করিয়া শুধু বাংলার বৌদ্ধগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন নাই, বাংলা সাহিত্যেরও অঙ্গ পূর্ণ করিয়াছেন।' (ভূমিকা, পৃ—১, ১৩৬৬) 'বুদ্ধ পথ' গ্রন্থের ভাষাও সরল এবং সহজবোধ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় সং, সংস্কৃত প্রেস ডিপ্রজিটারী, ১৩১৪।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯।

অজিতকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩।

অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শাক্যসিংহ, ১৩১৮।

অনন্তকুমার ভট্টাচার্য, বৈভাষিক দর্শন, ওরিয়েন্ট, ১৩৬১।

অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ১৯৬৬।

অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির ;
রামগড়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৫ ; ত্রিবেণী, ঐ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, রূপা, ১৩৬৯।
ভারতশিল্প ; নালক।

অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, শাক্ত পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭।

অমূল্যসেন, বুদ্ধকথা, ১৯৫৫ ; অশোকলিপি, ১৯৫৩ ; অশোক চরিত, ১৩৭২ ;

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত বঙ্গীয় মহাকোষ, ইণ্ডিয়ান রিচার্চ ইনিস্টিটিউট্।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম ও ২য় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৯৫৯, ১৯৬২।
প্রাচীন বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৩৬২।

অসিত হালদার, অজন্তা, ১৩২০ ; কুণাল, এলাহাবাদ, ১৩৩৭ ;
বাগগুহা ও রামগড়, এলাহাবাদ, ১৩২৮।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৪ ; রতিদেবের মৃগলুব্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২২ ;
রামরাজার মৃগলুব্ধ সংবাদ, ঐ, ১৩২২।

আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বাইশ কবির মনসামঙ্গল, কলিঃ বিশ্বঃ, ১৯৫৪ ;
গোপীচন্দ্রের গান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯ ;
বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী এণ্ড কোং, ১৯৬৪ ;
বাংলার লোক-সাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৭।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অমনস্কবিবরণম্, কলিকাতা, ১২৯৯।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট, ১৩৬৪ ;
রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা, ঐ, ১৩৬৪ ; রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, ঐ ১৩৬৬।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শতনরী, বাগচী এণ্ড সন্স, ১৩৩৭।

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার ভাস্কর্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭।

কল্যাণী মল্লিক, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০।

কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ওরিয়েন্ট, ১৯৬৪ ; আহরণ, মিত্র ও ঘোষ, ২য় সং।

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, বুদ্ধদেব চরিত, ১৩৩৪।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যযুগে বাঙ্গলা, গুরুদাস চট্টো এণ্ড সন্স, ১৩৩০।

কৃষ্ণবিহারী সেন, অশোক চরিত, কলিকাতা, ১৯১০।

কৃষ্ণকুমার মিত্র, বুদ্ধদেব চরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ৪র্থ সং।

ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, কলিঃ বিশ্বঃ ১৯৩০।
বাংলার বাউল, ঐ, ১৯৫৪ ; জাতিভেদ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫০।

ক্ষীরোদ প্রসাদ, বিদুরথ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৯ ; অশোক—ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী।

ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, পুঁথিঘর, ১৩৬০।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বৈষ্ণব রস সাহিত্য, ১৩৫৩ ; সম্পাদিত—মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, কলিঃ বিশ্বঃ ১৯৪৪।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতি, ১৩৫৯।

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগণ, কলিঃ বিশ্বঃ ১৯৫৭।

গিরিশ গ্রন্থাবলী, ৭ম ভাগ, ১০ম ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩১২, ১৩২১।

গুরুদাস ভট্টাচার্য, বাংলা কাব্যে শিব, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং লিঃ, ১৮৮২।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যৌবনে যোগিনী, কলিকাতা, ১২৯০ ;
বীরবরণ, কলিকাতা, ১২৯০।

গোপীনাথ কবিরাজ, গোরক্ষ সিদ্ধান্ত, বেনারস, ১৯২৫।

চারুচন্দ্র বসু, অশোক বা প্রিয়দর্শী, কলিকাতা, ১৩১৮।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী, চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী, ১ম ভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৫ ; শূন্যপুরাণ, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, ১৩৩৬।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কালিকামঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫০।

চিরঞ্জীব শর্মা, কেশব চরিত, ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স, ১৯৩১।
জগবন্ধু চৌধুরী, সিদ্ধার্থ-চরিত, কলিকাতা, ১৯১৩।
জনৈক উদাসীন, রাজগৃহে ইন্দ্রগুপ্ত, ১৩৩১।
জাহ্নবী চক্রবর্তী, শাক্ত পদাবলী ও শাক্ত সাধনা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৩৭।
জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সিংহল বিজয়, ১৩১৯।
জ্ঞানানন্দ স্বামী, অভিধানপ্‌প দীপিকা বা পালি শব্দকোষ, কলিকাতা, ১৩২০।
তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১।
দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কলিকাতা, ১৯১৬;
কাশীদাসী মহাভারত, ভট্টাচার্য সন্স লিঃ, ১৯৫২;
পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০;
মৈমনসিংহ-গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮;
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দাশগুপ্ত এণ্ড সন্স, ১৩৫৬।
বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১; ঐ, ২য় খণ্ড, ১৩৪২;
দীনেশচন্দ্র সেন ও বনোয়ারীলাল সম্পাদিত, গোবিন্দদাসের করচা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬।
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নানা চিন্তা, শান্তিনিকেতন, ১৩২৭।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সিংহল বিজয়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ৩য় সং।
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়ন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৩।
ধর্মরাজ বড়ুয়া, ধর্মপুরাবৃত্ত, কলিকাতা, ১২৪৬ মগাব্দ।
নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, তীর্থ মঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১২;
শূন্যপুরাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪;
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১৩১৮; রাজন্যকাণ্ড, ১৩২১।
নরেন্দ্রনাথ লাহা সম্পাদিত, হরপ্রসাদ সম্বর্ধন-লেখমালা, ১ম, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৩৮, ১৩৩৯।
নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ১ম ভাগ;
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজাবিধান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৩।
নবীনচন্দ্র সেন, অমিতাভ, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৩৬৩;
নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন, নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর—১৭৯৬ শক।
নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত, মীনচেতন, ঢাকা সাহিত্য পরিষদ, ১৩২২ ;
নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম, এ. মুখার্জী, ১৩৫৫।
নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, বুক এমপোরিয়ম, ১৩৫৬ ;
রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৯।
পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, গোর্খ বিজয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬।
পদ্মনাভ ভট্টাচার্য, কামরূপ শাসনাবলী, ১৯৩১।
প্রতিমা দেবী, নৃত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, নাথধর্ম ও সাহিত্য, আলিপুরদুয়ার, ১৩৬৬।
প্রবোধচন্দ্র সেন, ধর্মবিজয়ী অশোক, পূর্বাশা লিমিটেড, ১৩৫৪ ;
ধম্মপদ পরিচয়, বিশ্বভারতী, ১৩৬০ ;
ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ, এ. মুখার্জী এণ্ড কোং, ১৯৬২।
প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ভারত ও চীন, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ১৩৫৭ ;
ভারত ও ইন্দোচীন, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ১৩৫৭ ;
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯ ;
ভারত ও মধ্য এশিয়া, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ১৩৫৭।
প্রবোধেন্দু ঠাকুর অনু—হর্ষচরিত,
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, ১ম-৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী।
প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫৪।
প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শাক্যসিংহ, ২য় সং, ১৩১৯।
প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, ১ম খণ্ড, ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৩৬০।
ঐ, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৮ ; প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ওরিয়েন্ট, ১৩৬৭।
প্রেমদাস মিশ্র, বংশীশিক্ষা, ভাগবতকুমার দেবগোস্বামী।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত সম্পাদিত, বলেন্দ্র রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৯।
বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাস-এর শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩, ১৩৬৪।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, শ্রীধর্মমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৭।
বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড, ১৩৪০।
বসুমতী, সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, ১৯১৯।
বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যজ্ঞভস্ম, কলিকাতা, ১৩১১, কথানিবন্ধ, ঐ, ১৩১২; হেঁয়ালী, ঐ ১৩২২; পঙ্কমালা, ঐ, ১৯১০।
বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ, ১৩২১।
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (জন্মশতবর্ষ স্মরণে), উদ্বোধন, ১ম—১০ম খণ্ড।
বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সাধনমালা ১ম ও ২য় খণ্ড জি. ও. এস.
অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ, জি. ও. এস. শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্র, জি. ও. এস.
বৌদ্ধদের দেবদেবী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬২।
বিপিনবিহারী গোস্বামী, নিত্যানন্দ প্রভুর বংশমালা, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, ১৮০৯ শক
বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, পাঁচশত বৎসরের বৈষ্ণব পদাবলী, জিজ্ঞাসা, ১৩৬৮; ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, জিজ্ঞাসা, ১৯৬১।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌরীফুল, মিত্রালয়, ১৩৬৩; মেঘমল্লার ১৩৬৫।
বিমলাচরণ লাহা, গৌতম বুদ্ধ, ১৩৩৫; বৌদ্ধরমণী, ১৯২৯; বৌদ্ধযুগের ভূগোল, ১৯৩৪; লিচ্ছবি জাতি।
বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৩২৯।
বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, নালন্দা নিবাস, চট্টগ্রাম, ১৯৪০।
বেণীমাধব বড়ুয়া, বৌদ্ধগ্রন্থ কোষ, ১ম ভাগ, Indian Research Institute; বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি, ১৯২২।
ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ণ বুক, ১৯৬১।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৭;
রামেন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৬।
ভিক্ষু কশ্যপ, অপদান, বুদ্ধ বংস—চরিয়াপিটক, শ্রীনবনালন্দা.মহাবিহার, ১৯৫৯।
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক প্রবন্ধ, ৫ম সং।
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতীয় সমাজপদ্ধতি, ২য় খণ্ড, বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৩।
মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, সহজিয়া সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২;
চর্যাপদ, কমলা বুক ডিপো;
দীন চণ্ডীদাস পদাবলী, ১ম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১;
বাঙ্গলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, কমলা বুক ডিপো, ১৯৪৭।

মহেশচন্দ্র ঘোষ, বুদ্ধ প্রসঙ্গ, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩।
মৃণালকান্তি ঘোষ সঙ্কলিত, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, কলিকাতা, ১৩৫৬;
শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল, ২য় সংস্করণ, ৪৪৪ গৌরাব্দাব্দ।
মৈত্রেয়ী বসু, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৬৫।
মোহিত লাল মজুমদার, স্মরগরল, রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ১৩৪৩;
বাংলার নবযুগ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৮৯৭ শক।
যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ, কলিকাতা, ১৩৩১।
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গ সাহিত্য, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৩।
যোগিলাল হালদার, রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন, ১৯৫৭
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সম্পাদিত, ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গল, ৩য় সং, ১৩১৮।
রজনীকান্ত গুপ্ত, ভারতকাহিনী, কলিকাতা, ১৯২৩।
রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সঙ্কলিত, বিশ্বভারতী ১৩৬৩। সাহিত্যের স্বরূপ, প্রাচীন সাহিত্য, কালান্তর, সাহিত্য, পথের সঞ্চয়, শিক্ষা ১৯৬০, ঘরে বাইরে, রাজর্ষি, বিসর্জন, নটীর পূজা, চণ্ডালিকা, নৃত্য-নাট্য চণ্ডালিকা, মালিনী, রাজা, অরূপরতন, শাপমোচন, নৃত্য-নাট্য শ্যামা, কথা ও কাহিনী, পরিশেষ, জন্মদিনে, পুনশ্চ, নবজাতক, চিত্রা—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বিতীয়, অষ্টম, ত্রয়োদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ, ত্রয়োবিংশ এবং চতুর্বিংশ খণ্ড—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
রবীন্দ্র মাইতি, চৈতন্য পরিকর, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২।
রমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজমালা, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯।
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা, কলিকাতা, ১৩২৪;
ধর্মপাল, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩২৯;
শশাঙ্ক; বাঙ্গালার ইতিহাস, কলিকাতা ১৩৩০;
পাষাণের কথা, কলিকাতা, ১৩২১।
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নানা প্রবন্ধ, কলিকাতা, ১৯১৪।
রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ-এর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ভক্তি গ্রন্থ ভাণ্ডার, ১৩৫৫;
ঐ, মধ্যলীলা, ১ম খণ্ড, ১৩৫৬; ঐ, অন্ত্যলীলা, ১৩৫৯;
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ১ম, প্রাচ্যবাণী, ১৩৬৩; ২য় ১৩৬৪।

রাধাগোবিন্দ বসাক, রামচরিত, জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স, ১৩৬০।
রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪৫।
রামদাস গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, বহরমপুর, ১৯০২।
শরচ্চন্দ্র সরকার, শাক্যসিংহ প্রতিভা বা বুদ্ধদেব চরিত, কলিকাতা, ১২৯৫।
শ্যামাচরণ শ্রীমানী, সিংহল বিজয়, কলিকাতা, ১৮৭৫।
শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্যাগীতি, নিরীক্ষা, ১৩৬৪,
ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৭।
শিবদত্ত সম্পাদিত অমরকোষ, ১৯৪৪।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক, ১৩৬৯।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ১ম ভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বুদ্ধদেব, সাহিত্য রত্ন গ্রন্থাবলী—১, ১৯০৪।
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা, ১৩৩০।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—বেলা শেষের গান, বিদায় আরতি, তুলির লিখন, কুহু ও কেকা, অভ্র-আবীর, মণিমঞ্জুষা, কাব্য সঞ্চয়ন।
সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, চৈতন্য ভাগবত, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৪২।
সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব, কলিকাতা, ১৮০৪ শক।
সুকুমার দত্ত, সপ্তপুরা, ১৩৬৬।
সুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ইস্ট এণ্ড কোম্পানী, ১৯৫৬।
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৫৯, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৬২, ২য় খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৯৬২; ৩য় খণ্ড, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৩৬৮,
৪র্থ খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৯৫৮।
সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, রূপরামের ধর্মমঙ্গল, সাহিত্য সভা, ১৩৫১।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দ্বীপময় ভারত, বুক কোম্পানী লিমিটেড, ১৯৪০;
ভারত সংস্কৃতি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৪।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম সম্ভার, ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, ১৩৬৩; ঐ, ২য় সম্ভার, ১৩৬৬।
সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, ৪র্থ সংস্করণ।

সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, শ্রীমদ্‌ভাগবত।

সুরেন্দ্রনাথ সেন, অশোক, এ. মুখার্জী, ১৯৫৫।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত, শ্রীশ্রীচণ্ডী, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৪।

সুশীল দে, নানানিবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬০।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধ-ধর্ম, পূর্বাশা লিমিটেড, ১৩৫৫;
বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৮।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মানিক গাঙ্গুলীর শ্রীধর্মমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

হরপ্রসাদ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ, ১৩৬৬।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ, গুরুদাস চট্টো., ১৩৬২।
বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, দেবসাহিত্য কুটীর, ১৩৬১।

হরিদাস দাস সঙ্কলিত, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অবতার তত্ত্ব, কলিকাতা, ১৩৩৫।
বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা, কলিকাতা, ১৩৪৩; প্রেমধর্ম, কলিকাতা, ১৩৪৫।

পত্রিকা: ইতিহাস ১৩৫১—১৩৭৩, উত্তরা ১৩৩৪—১৩৩৫, উদয়ন ১৩১৬, ১৩৪০, উদ্বোধন ১৩৪৯, ১৩৭৫, জগজ্জ্যোতি ১৩১৫-২৫ খ্রী, নবপর্যায়—১৩৫৭-৬৬, তরুণ বৌদ্ধ ১৩২২—১৩৩১, নারায়ণী ১৩২২, নালন্দা ১৩৭৩-৭৫, প্রবাসী ১৩২০-৪০, পঞ্চপুষ্প ১৩৩৯, পরিচয় ১৩৪৩-১৩৪৭, বঙ্গদর্শন ১৩১০, বিচিত্রা ১৩৩৪, বৌদ্ধবন্ধু ১৩২২-৩১, ভারতী ১২৮৬, শনিবারের চিঠি ১৩৬৪, সমাজ ১৩১৬-১৩২০, সাধনা ১২৯৯-১৩০১, সাহিত্য পত্রিকা ১৩১২, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩২২-১৩৭৫।

Pali :

Anukul Chandra Banerjee, Prātimoksha-Sūtram, 1954.
B. C. Law, Dāṭhāvaṁsa, Punjab Sanskrit Book Depot, 1925.
Fausboll, Jātaka, Vol. I—VI, London, Trūbner & Co.
Sutta-Nipāta, Part I, London, P.T.S.
Feer, Saṁyutta-Nikāya, Part I, 1884.
Geiger, Mahāvaṁsa, P.T.S.,
H. Smith, The Khuddaka-Pāṭha, Paramattajotikā 1, P.T.S., 1959.
Morris, The Aṅguttara-Nikāya, Part—I, P.T.S. 1885.
Muller, Paramatthadīpanī, P.T.S., 1893.
Oldenberg, The Vinaya Piṭakaṃ, Vol. I,
1879 Vol. III, 1882 Vol. V, 1883 Wlliams & Norgate.
Oldenberg & Pischel, Thera and Therī gāthā, P.T.S. 1883.
Rhys Davids & Carpenter, The Dīgha Nikāya, Vol.— I,
P.T.S. 1890, Vol. II, P.T.S., 1903,
Vol. III, Carpenter, P.T.S., 1911.
Steinthal, Udāna, P.T.S., 1948.
Takakusu & Niagai, Samantapāsādikā, Vol. I, P.T.S., 1924.
Taylor, Kathāvatthu, P.T.S. 1894.
Treunckner, Milinda pañho, 1880. Williams & Norgate.
Majjhima Nikāya, Vol. I, P.T.S. 1888.
Woodward, Sārattha-Ppakāsinī, P.T.S. 1929.

Buddhist Sanskrit and other books :

Arnold, Light of Asia, Kegan Paul, Trench Trubner & Co. Ltd. 1921.
Barua, A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy, C.U. 1921. Bhārut, Book III, 1937.
Inscriptions of Asoka, 2nd Vol., C.U. 1943.
Asoka and His Inscriptions, 1946.
Prolegomena to a History of Buddhist Philosophy, C.U. 1918.

B. Bhattacharyya, ed. Nispannayogavali, Abhayakara Gupta. GOS Baroda, 1949.
ed. Sādhanamālā, GOS, Vol. I, Vol. II, 1928.
ed. Two Vājrayana works consisting of the Jnānasiddhi of Indrabhuti and the Prajnopāyaviniscayasiddhi of Ananga Vajra, GOS, No. 44, Baroda, 1929.
ed. Guhyasamāja Tantra, GOS, No. 53, Baroda, 1931.

B. Bhattacharyya, Indian Buddhist Iconography, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1958.
An Introduction to Buddhist Esoterism, Humphrey Milford, Oxford University Press, 1932.

B. C. Law, A Manual of Buddhist Historical Traditions, C.U. 1941.
Geography of Early Buddhism, Kegan Paul, 1932.
A History of Pali Literature, Vols. I, II. Do, 1933.

Beal, The Buddhist Records of the Western World, Kegan Paul, 1906.
Travels of Fah-Hian and Sung—Yun, 1869.

D. C. Sen, Chaitanya and his Age, C. U., 1922.
The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal, C.U. 1917.

Eliot, Hinduism and Buddhism, Vol. III. Routlegde & Kegan Paul Ltd. 1954.

Getty, The Gods of Northern Buddhism, Oxford, 1914.

Grunwedel, Buddhist Art in India, London, 1901.

Gurusevak Upadhyaya, Hinduism and Buddhism, Banaras, 1956.

Haraprasad Shastri, ed. Advayavajrasangraha, GOS, No. XL, Baroda, 1927.

Hardy, Manual of Buddhism, Williams and Norgate, 1860.

Har Dayal, The Bodhisathva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature, Kegan Paul, 1932.

H. C. Roychaudhuri, Political History of Ancient India, C, U. 1953.

Jarret, Tr Ain-i-Akbari, Vol. III.

J. Banerjee, Pratimā-Lakshaṅa, C. U.

J. N. Sarkar, History of Bengal, Vol. II, D. U.
K. A. Nilakanta Sastri, History of Srīvijaya.
Kern, Manual of Indian Buddhism, Stressbourg, 1896.
Kimura, A History of the Hinayana and Mahayana and the Origin of Mahayana Buddhism, C. U. 1927.
Ludwing Bachhofer, Early Indian Sculpture, Part I.
Megovern, Manual of Buddhist Philosophy, Vol. I, 1923.
M. M. Bose, Post Chaitanya Sahajiya Cult of Bengal, C.U. 1930.
Mehta, Pre-Buddhist India, Bombay, 1939.
Nagendra Nath Basu, Archaeological Survey of Mayurabhanja, Vol. I, The Mayurbhanja State, 1911.
Nariman, Literary History of Sanskrit Buddhism, Bombay, 1920.
Nalini Kanta Bhattasali, Iconography of Buddhist & Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, Dacca, 1929.
N. Datta, Aspects of Mahāyāna Buddhism in relation to Hinayāna, Luzac & Co. London, 1930.
Development of Buddhism in Uttar Pradesh, Publication Bureau, 1956.
Early Monastic Buddhism, Vol. I, Calcutta, 1941. Vol. II, Calcutta, 1945.
N. Roy, Maurya and Sunga Art, C. U., 1945.
Oldenberg, Buddha : His life, His Doctrine, His Order, The Book Company Ltd., 1927.
P. L. Paul, The Early History of Bengal, Vol. I, Indian Research Institute, 1939, Vol. II, 1940.
P. L. Vaidya, ed. Lalita-Vistara, Mithila Institute, 1958.
ed. Avadāna Kalpalatā. Vol. I, M. I., 1959, Vol. II, 1959. ed. Avadāna-Śatakam, M. I, 1958.
ed. Divyāvadānam, M. I. 1959.
Radhagovinda Basak ed. Mahāvastu Avadānaṁ, Vol. I, 1963.
Lectures on Buddha and Buddhism, Sambodhi Publications 1961.
Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. I, George Allen & Unwin Ltd., 1948.

R. C. Majumdar, History of Bengal, Vol. I. D. U.
Rhys Davids, Buddhism, G, P. Putnam's Sons, 3rd Edition.
R. L. Mitra, The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, Royal Asiatic Society of India, 1882.
R. Mukherjee, Asoka, Goekwad Lectures.
Rockhill, Life of the Buddha, Kegan Paul, 1884.
Sarat Chandra Das, ed. Sumpa, Pag—Sam—Jon—Zang, Govt. of Bengal, Calcutta, 1908.
S. B. Das Gupta, Obscure Religious Cults, Firma K. L, Mukhopadhyay, 1962.
An Introduction to Tantric Buddhism, C. U. 1950.
S. N. Das Gupta, A History of Indian Philosophy, Vol. 1—III, Cambridge University.
S. Datta, Buddhist Monks and Monasteries of India, George Allen and Unwin Ltd., 1962.
Buddhism in East Asia, 1968.
Senart, Mahāvastu, Vol, II, III, Paris, A Limprimerie Nationale.
Sister Nivedita, Siva and Buddha, Udbodhan, 1946.
The Master as I saw him, Do, 1948.
S.K. Dey, Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal, General Printers & Publishers, 1911.
Smith, A history of Fine Arts in India and Ceylon, Oxford, 1911.
S. N. Sinha & N. K. Basu, History of Prostitution in India, Vol. I, Calcutta, 1933.
Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism, Luzac and Co., 1907.
Swami Vivekananda, Chicago Addresses, Advaita Ashrama, 1961.
Thomas, the life of Buddha, Kegan Paul.
Vogel, Indian Serpent Lore, 1962.
Ward, Mahayana, Buddhism, Vol. II, The Epworth Press, 1952.
Walther Schubring, Acāranga Sūtra, 1910.
Waddell, Buddhism of Tibet or Lamaism, W. Heffer & Sons Limited, Second Edition.
Winternitz, A History of Indian Literature, Vol. II, C. U. 1933.

Journal and Periodicals :

B. C. Law's Vol. I, 1945.
Indian Culture, Vol II, No. 1.
The Cultural Heritage of India, Vol. IV.
Journal and Text of the Buddhist Text Society of India, Vol. II, Part I, 1894.
Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. II, 1833 Vol. XIII, 1844, Vol. LXVII, part I no. 1.
Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, C. U. 1935.
Man in India, Vols. XXVII, 1947. Vol. XXVIII, 1948.
Epigraphia Indica, Vols. II, IV, VI, VII, VIII, XVIII, XII, XVII, XX.
Indian Historical Quarterly Vol. VI.
Visva Bharati Quarterly, April, 1943.

Dictionary and Encyclopaedia :

Franklin Edgerton
Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, Vol. II, 1953.
Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. I. T. & T. Clark, 1909 ; Vol, IV, 1911.
Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, Vol. I, London, 1937, Vol. II, London, 1938.
Rhys Davids & Stede, Pali-English Dictionary, P. T. S., 1925.
S. C. Das, Tibetan English Dictionary, 1902.
রাজশেখর বসু, চলন্তিকা, এম. সি. সরকার, ৮ম সংস্করণ।

নির্দেশিকা

ক

খ

গ

শুদ্ধিপত্র

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫	৭	নারিগণ	নারীগণ
৩৫	৮	রমণিগণ	রমণীগণ
৮৬	পাদটীকা	Encyclopaedia of Religion and Ethics 1958	—1909
১২৮, ১৩০	ঐ	শিবায়ণ	শিবায়ন
১৪২	ঐ	কালিষকথিনী বত্ত	কালিষকৃথিণী বত্থু
৩১৪	২৩	হীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৩৮৩	পাদটীকা	Sāmantappasādika	Samantapāsādikā
৪১৯	২০	মহাপরিনির্বাণ সূত্ত	মহাপরিনির্বাণ সূত্র